রবীন্দ্র পরিচয়

ডঃ মনোরঞ্জন জানা

রবীন্দ্র-পরিচয়

রবীন্দ্র-পরিচয়

ডঃ মনোরঞ্জন জানা

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ, ১৩৭৪

দাম : কুড়ি টাকা মাত্র

প্রকাশক : শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীভোলানাথ হাজরা
রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন : ব্যানার্জি কোং
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

আমার সহধর্মিনী

শ্রীমতী মৈত্রী দেবীকে

নিবেদন

কবির কাব্য আস্বাদ করিতে গেলে তাঁহার সকল সৃষ্টি-কর্ম্মের পশ্চাতে যে জীবন-দর্শন সক্রিয় তাহার সামগ্রিক পরিচয় লাভ প্রয়োজন। রবীন্দ্র-দর্শনের সে পরিচয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার সমগ্র রচনা-কর্ম্মের মধ্যে। কাব্য পাঠ করিবার পূর্বে তাই ভূমিকা অংশের প্রারম্ভে রবীন্দ্র-দর্শনের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করা হইয়াছে।

প্রাচ্য বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রকৃতিতত্ত্বের মূল সূত্রগুলি নির্দেশ করিয়া এই বিষয়ে কবির মৌলিক চিন্তার দিকগুলি উল্লেখ করিয়াছি 'প্রকৃতি ও প্রেম' অধ্যায়ে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত ধর্ম সম্পর্কে বিশেষ করিয়া ধ্বনিতত্ত্ব সম্পর্কে কবির সমগ্র কাব্য-ধারা বিশ্লেষণ করিয়া একটি বিস্তৃত আলোচনা 'ধ্বনি ও সুর' অধ্যায়ে সংযোজিত হইয়াছে।

কবির কাব্য আস্বাদ করিতে কবির নিজস্ব সাহিত্য তত্ত্ব বুঝিবার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রাচীন অলঙ্কারিকগণ হইতে তাঁহার সাহিত্য জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে যে সকল মৌলিক পার্থক্য আছে, সেই সকল দিক এবং উভয়ের এই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের পশ্চাতে মূল যে দার্শনিক উপলব্ধিগত পার্থক্য রহিয়াছে, 'সাহিত্য জিজ্ঞাসা' অধ্যায়ে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

বিশ্ব সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে যুগে যুগে কয়েকটি মূল চিন্তাধারা বিশ্ব-মানসকে নানাভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। বিশ্ব সভ্যতার এই সকল মূল চিন্তাধারার ক্ষেত্রে কবির মৌলিকতা কোথায় তাহা নির্দেশ করিয়াছি 'ইতিহাসের রূপ' অধ্যায়ে।

আলোচনাটির মধ্যে বিশেষ করিয়া পাশ্চাত্য চিন্তাধারাটিকে উপস্থাপিত করিয়াছি। গ্রীক, হিব্রু, খ্রীষ্টান, মধ্যযুগ, রেনেসাঁ, ফরাসী বিপ্লবের সহিত বিজড়িত হইয়া রোমান্টিক ধর্ম এবং আধুনিক বিজ্ঞানের যে একের পর এক পর্যায় পাশ্চাত্য ইতিহাসে লক্ষিত হয়, সেই প্রত্যেক পর্যায়ের বিশিষ্ট কতকগুলি

লক্ষণ যেমন নির্দেশ করিয়াছি, তেমনি বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, হিন্দু পুনরভ্যুত্থান, মুসলমান সংস্কৃতির সংযোগের ফলে ভারতীয় সাধন-ধারায় বিশেষ করিয়া ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রে যে বহু বিচিত্র সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে সেই সকল সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট লক্ষণগুলিও নির্দেশ করিয়াছি।

কবির কাব্যে এই উভয় সংস্কৃতির সেই সকল বিশিষ্ট লক্ষণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিচিত্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ইহাকে ঠিক প্রভাব বলা যায় না। কবির ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বের প্রায় তিন হাজার বৎসরের সাধনাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া তাহাকে নূতনতর সম্ভাবনার দিকে পরিচালিত করিয়াছে।

সাহিত্যে রোমান্সতন্ত্রের মূলত তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়; একটি ইংরেজি, একটি জার্মান এবং অন্যটি ইতালীয়। রবীন্দ্র-কাব্যে এই তিনটি ধারার বিচিত্র প্রভাব লক্ষ্য করা যায় বলিয়া ইহাদের প্রধান লক্ষণগুলি 'রোমান্সতন্ত্র' অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।

কাব্যগুলি পৃথক পৃথকভাবে আলোচিত হইলেও এবং তাহাতে কিছু কিছু পুনরাবৃত্তি অনিবার্যরূপে ঘটিলেও পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কাব্য-ধারার সহিত যতদিক দিয়া যোগসূত্র নির্দেশ করা সম্ভব তাহা করিয়াছি। তাহার ফলে কোন একটি দিকের যোগ সূত্র ধরিয়া কাব্যান্তর্গত সেই ধারাটি অনুসরণ করিয়া সমগ্র গ্রন্থ পাঠ করা সহজ সাধ্য হইবে।

কবির ধর্ম ও দর্শন ধীর পরিণামী এবং তাহা তাঁহার ব্যক্তিত্বের ধীর বিকাশের সহিত বিজড়িত। কবির ব্যক্তিত্বের ধীর বিকাশের সূত্রে তাই কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্ম্ম ধারাবাহিক ভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছি।

কবির ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ ঘটিয়াছে বিশ্ব-সত্তার যোগে। বিশ্ব-সত্তা বলিতে নিখিল বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব সংসার উভয়কেই বুঝায়। রবীন্দ্র-কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া এই উভয়দিক যেমন অনুসরণ করিয়াছি, তেমনি ব্যক্তি-সত্তার ধীর উন্মেষের সঙ্গে কবির সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের যে ধীর বিকাশ ঘটিয়াছে তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

কবি-সত্তার ধীর উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্র-কাব্যে বহু বিচিত্র দার্শনিক জিজ্ঞাসারও উদ্ভব ঘটিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া এই ধারারও একটি আনুপূর্বিক পরিচয় দান করিয়াছি। 'রবীন্দ্র-দর্শন' অধ্যায়ের মধ্যে যাহা আলোচিত হয় নাই এমন অনেক দিক কাব্য-আলোচনা প্রসঙ্গে করিয়াছি।

রবীন্দ্র-দর্শনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক দিক হইল ব্যক্তি-সত্তার

বিশিষ্ট মূল্য নিরূপণ। ভূমিকায় রবীন্দ্র-দর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে।

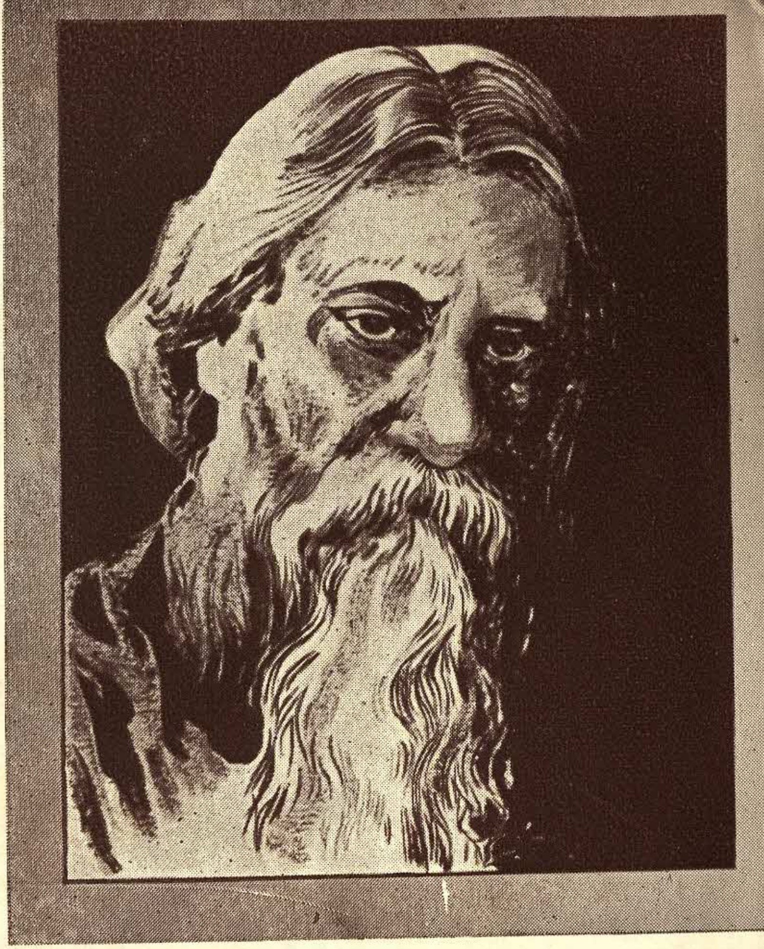
রবীন্দ্র-কাব্যের রসাস্বাদ করিতে এই গ্রন্থ যদি পাঠকবর্গের কিছুমাত্র সহায়তা করে তাহা হইলে আমার সুদীর্ঘকালের অক্লান্ত পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ করিব।

এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ সুনীল চন্দ্র কোনার।

এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া প্রকাশক শ্রীযুক্ত পরাণচন্দ্র মণ্ডল আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। গ্রন্থের মধ্যে মুদ্রণ ত্রুটি অনেক রহিয়া গিয়াছে পরে তাহা সংশোধন করিয়া দিবার বাসনা রহিল।

ইতি
বিনীত
মনোরঞ্জন জানা

সূচীপত্র



ভূমিকা

[১]

কেবল রবীন্দ্রনাথেরই নয় সমগ্র মানব-সমাজের অধ্যাত্ম সমস্যাকে যদি একটিমাত্র কথায় ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে বলা যায়, তাহা সামঞ্জস্য সাধনের সমস্যা। তাহা এমন একটি পরম ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান লাভ যাহার মধ্যে সমস্ত বিরোধ নির্বিরোধে স্থান লাভ করিতে পারে।

ব্যক্তির একদিকে দেহ ও প্রাণ, অন্যদিকে তাহার সচেতন মন। সেই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ও প্রেরণা একদিকে, অন্যদিকে মন চাইতেছে এই সমস্ত জয় করিয়া উঠিতে। দেহ-প্রাণ ও মনের ধর্ম মনে হয় সম্পূর্ণ পৃথক। একের সহিত অন্যের যেন কোন মিল বা সংযোগ নাই; একটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার বা দমিত না করিলে যেন অন্যটির বিকাশ সম্ভব নয়।

মন যতই সমৃদ্ধ হইতে থাকে, এই বহু বিচিত্র জটিল বিরোধ ততই তীব্র ও বিক্ষুব্ধকর হইয়া উঠে। মানুষ তাই এমন একটি চেতন-ভূমি লাভ করিতে চায় যেখানে সেই প্রাণ-মন তাহাদের সকল ধর্ম লইয়াই সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে।

এই দ্বন্দ্ব সর্বাধিক তীব্র ও সর্বনাশা রূপ পরিগ্রহ করে যখন দেহ-প্রাণ-মনের সহিত অধ্যাত্ম-চেতনা আসিয়া যোগ দেয়। তাহা এমন এক অলৌকিক নিগূঢ় সংবেগ, যাহাকে জাগতিক কোন বোধ দ্বারা মানুষ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। মানস-ধর্মের তাহা যেন এক সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। মানুষের সমগ্র সত্তার তাহার সমগ্র জাগতিক বোধের ইহা যেন এক নির্মম অস্বীকৃতি, নিষ্করুণ প্রতিবাদ।

মানুষ বুদ্ধির সহায়তায় জাগতিক জীবনের সহিত ইহার যখন কোন মিল খুঁজিয়া পায় না, তখন ইহাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে। তখন একদিকে সেই প্রাণ-মন, অন্যদিকে অধ্যাত্ম-চেতনা মানুষের সমগ্র সত্তাকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া দেয়। তখন জীবনের এক প্রেরণার সহিত আর এক প্রেরণার কোন মিল থাকে না।

মানুষের সমস্ত সত্তাকে এইরূপ দ্বিধা করিয়া লইলে সমস্যার একপ্রকার সমাধান লাভ হয়ত করা যায়, কিন্তু ইহাতে জীবনের অখণ্ডতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইহা তাই কোন সমাধান নহে। অখণ্ড সত্য দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মার পূর্ণ স্বীকৃতি এবং সামঞ্জস্যসাধনের মধ্যে।—প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক, অন্তর্লোক ও বহির্লোক এই উভয়ের পূর্ণ মিলনে।

বিশ্বের সকল রূপ এবং ব্যক্তির বিচিত্র বোধের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনই শুধু নয়, বিশ্ব ও ব্যক্তিকে আবার এক বৃহত্তর মিলনভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

ব্যক্তি ও বিশ্ব শুধু নয়, ইহার সহিত বিশ্বাতীত সকল লোক আবার এই সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বতর কোন চেতনার দ্বারা বিধৃত। মানুষের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা এই মিলন-তত্ত্বে আসিয়া পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে। বিরোধের এই বিভিন্ন দিকগুলিকে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। সেই সকল আলোচনার কিছু কিছু অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই ভেদ ও সামঞ্জস্যের জন্যই আমাদের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা। আমরা এর কোনটাকেই ছাড়তে চাইনে। আমাদের যা কিছু প্রয়াস যা কিছু সৃষ্টি সে কেবল এই ভেদ ও অভেদের অবিরুদ্ধ ঐক্যের মূর্তি দেখবার জন্যেই দুঃখের মধ্যেই এককেই লাভ করবার জন্য।" [শান্তিনিকেতন]

"প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত।"

[শান্তিনিকেতন]

বিচিত্র বোধের সামঞ্জস্যসাধনের মধ্যে যে মানুষের পরম কল্যাণ, মানুষের সমস্ত সাধনা যে পরিণামে এক অখণ্ড ঐক্য লাভ করিতে চায়, রবীন্দ্রনাথ তাহা স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"বস্তুতঃ স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও নীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে এই তার পাপের মূল এবং ধর্ম-নীতি তো এইজন্য তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী, প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয়, প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোন একটা প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপে প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়।" [শান্তিনিকেতন]

একদিকে মানুষ বিশিষ্ট অনন্য একক সত্তা, অন্যদিকে সে সমগ্র মানব-

সমাজের, বিশ্বের অন্তর্গত; সমগ্রতার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। জীবনের এই দুই কোটির উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন,

"মানুষকে একই সঙ্গে দুটি ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়! সেই দুটির মধ্যে এমন বৈপরীত্য আছে যে তারি সামঞ্জস্য সংঘটনের দুরূহ সাধনায় মানুষকে চিরজীবন নিযুক্ত থাকতে হয়। সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, ধর্মনীতির ভিতর দিয়ে মানুষের উন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই সামঞ্জস্য-সাধনের ইতিহাস।"

[শান্তিনিকেতন]

"মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে, তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি ও আত্মার দ্বন্দ্ব, স্বার্থের দিক ও পরামার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক ও অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।"

"সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্গত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোট বড়ো, অন্তর বাহির পূর্ণ সামঞ্জস্য।"

[ধর্মপ্রচার : ধর্ম]

"সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে।" [ধর্মপ্রচার : ধর্ম]

"কোন এক বৃহৎ সত্যের মধ্যে তাহার এই সকল বিরুদ্ধতার বৃহৎ সমাধান আছে, সমস্ত দুঃখ বেদনার একটি আনন্দ পরিণাম আছে এটা সে সহজে দেখতে পায় না।"

"অন্তরে বাহিরে এই সমস্ত দুঃসহ বাধা বিরোধ ছিন্ন বিচ্ছিন্নতা নিয়ে মানুষকে চলতে হচ্ছে। অন্তরে বাইরে এই ঘোরতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেই মানুষ আপনার অন্তরতম ঐক্য শক্তিকে প্রাণপণে প্রার্থনা করছে।"

মানুষের মধ্যে একটি ইচ্ছাশক্তি আছে। বিশ্ব-ইচ্ছার সহিত ইহার প্রতি-নিয়ত সংঘাত বাধিতেছে। এই ইচ্ছা-শক্তি বিসর্জন দিতে পারিলে সংঘাতের অবসান হয়ত ঘটে, কিন্তু তাহা আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়; কারণ মানুষের সমগ্র সত্তা একটি ইচ্ছা-শক্তি আশ্রয় করিয়া বিকাশ লাভ করে।

মনুষ্য-সত্তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ইচ্ছা-শক্তি ক্রমিক প্রবল আকার ধারণ করে। তাই ইচ্ছা-শক্তি বিসর্জন দিয়া নয়, বিশ্ব-ইচ্ছা-শক্তির সহিত সামঞ্জস্যসাধনের ভিতর দিয়া সমস্যার সমাধান লাভ করিতে পারে।

সামঞ্জস্যসাধনের এই প্রয়াসের ভিতর দিয়া ইচ্ছা-শক্তির সহিত মানুষের সমগ্র সত্তার ধীর বিলুপ্তি ঘটে না। ইহার ভিতর দিয়া তাহার সমগ্র সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইতে থাকে। ব্যক্তি-ইচ্ছাই শেষে বিশ্ব-ইচ্ছায় পরিণতি লাভ করে। তখন ব্যক্তি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তা কিংবা ব্যক্তি-ইচ্ছা ও বিশ্ব-ইচ্ছার মনে কোন পার্থক্য থাকে না।

"দেহের সঙ্গে দেহের বাহিরের শক্তির একটা সামঞ্জস্য প্রাণের মধ্যে ঘটিতেছে, আবার তাহার সঙ্গে ইচ্ছা-শক্তির একটা সামঞ্জস্য মনের মধ্যে ঘটিতেছে। ইহাতে মানুষের প্রকৃতি-যন্ত্রের সাধনা বড়ো শক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে প্রাণ-শক্তির সুর অনেক দিন হইতে বাঁধিয়া চুকিয়া গেছে, সে জন্য বড়ো ভাবিতে হয় না, কিন্তু ইচ্ছা-শক্তির সুর বাঁধা লইয়া আমাদিগকে অহরহ ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হয়।" [ততঃ কিম : ধর্ম]

"এই ইচ্ছা-শক্তিকেই বিশ্ব-শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য আনাই আমাদের পরমানন্দের হেতু। এই জন্য ইচ্ছাকে নষ্ট করা আমাদের সাধনার বিষয় নহে, ইচ্ছাকে বিশ্ব ইচ্ছার সঙ্গে এক সুরে বাঁধাই আমাদের সকল ইচ্ছার চরম লক্ষ্য।" [ততঃ কিম : ধর্ম]

অদ্বৈত বা মায়াবাদে মর্ত্য ও অমর্ত্য, জাগতিক ও আধ্যাত্মিক দিব্য-চেতনা ও প্রকৃতি, দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মার বিরোধ মীমাংসায় পরিণামে প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। একদিকে এই যেমন প্রকৃতিকে অস্বীকার করিয়া সমাধান লাভের চেষ্টা অন্যদিকে তেমনি রূপের জগৎকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া ঊর্ধ্বতর যে-কোন চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়।

এই উভয়ের স্বীকৃতি যেখানে আছে, যেখানে এই দুই এক অখণ্ডতার সৃষ্টি করে, সেখানে সেই পূর্ণ ঐক্য তত্ত্বের মধ্যেই মানুষের সত্যানুসন্ধান চরিতার্থ হইতে পারে। মনুষ্য চেতনাকে চিৎ ও প্রকৃতি এমন স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিবার কোন উপায় নাই; তাহা সত্য নহে বলিয়াই। মনুষ্য সত্তা একক, অখণ্ড, অবিভাজ্য।

মানস-লোকের নিম্নে যেমন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়-লোক, তেমনি তাহার ঊর্ধ্বে

উন্নততর নানা চেতনা-লোক আছে। চেতনার এই আদি-অন্ত কোন এক তত্ত্বসূত্রে বিধৃত। মানুষ সেই পরমতত্ত্বের সন্ধান লাভ করিতে চায়।

মানুষের সমস্যা কেবল এককে লাভ করা নয়, কেবল বহুকেও লাভ করা নয়। ঐক্য-বিরহিত বৈচিত্র্যবোধ শূন্যতামাত্র, কিন্তু বৈচিত্র্যবিহীন ঐক্য ততোধিক শূন্যতা। মানুষ তাই কোন একটিতে সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে না।

মানুষ এমন একটি তত্ত্ব লাভ করিতে চায়, যাহা একযোগে এক ও বহু। তাহা যেমন বহুকে বিনষ্ট করিয়া রূপহীন একাকারত্বের বোধ নয়, তেমনি উহা কেবল রূপের সমাহার নয়। মানুষ সেই এককে লাভ করিতে চায়, যে এক আবার অন্তহীন রূপে রূপে উদ্ভাসিত।

নিখিল বিশ্ব এক অন্তহীন শক্তির পরিস্পন্দ। এই শক্তির স্পন্দন সমুদ্রে মুহূর্তে সংখ্যাতীত রূপ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার একাকার হইয়া যাইতেছে! ব্যক্তি-চেতনা এই স্পন্দন সমুদ্রের বক্ষে এক একটি ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ মাত্র। অনন্ত কোটি ব্যক্তি-রূপ উহার বক্ষে ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বের এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়াছে। আমরা রূপ বলিতে যাহা বুঝি তাহা শক্তির এক একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গী। উহার বৈচিত্র্যই রূপে রূপে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। মানুষের চিন্তা ও অনুভূতি এই শক্তি-সংঘাতের ফল।

এই শক্তি-স্পন্দনের পশ্চাতে এক শাশ্বত স্থির চেতনা-লোক আছে, মানুষ এই স্পন্দন-জগতের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অনুবিদ্ধ করিয়া সেই অধিষ্ঠান ভূমি লাভ করিতে পারে।

জীবন-সাধনায় এই দুই সত্তা কোথাও স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। একদিকে সে কেবলমাত্র দিব্য-চেতনাকে মানিয়া দেশ-কালে সীমাবদ্ধ শক্তি-স্পন্দনকে অস্বীকার করিয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি-তত্ত্ব এবং শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের উল্লেখ এক্ষেত্রে করা যাইতে পারে। অন্যদিকে সে শক্তি-স্পন্দকেই একমাত্র তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। বৌদ্ধ স্পন্দবাদের উল্লেখ এই প্রসঙ্গে করা যাইতে পারে। এই স্পন্দনের যে শাশ্বত কোন স্থির অধিষ্ঠান ভূমি আছে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করেন না।

মানুষের সমস্যা হইল এই বিরোধ-বৈচিত্র্যের মধ্যে সার্থক সমন্বয়

সাধন করা। বাহির হইতে তাহা কেবলমাত্র নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং এইরূপে একটা আপোষ-মীমাংসা করিবার চেষ্টা নহে। পূর্ণ ঐক্যের উপলব্ধিতে দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মা পরস্পর পরস্পরের সহায়তায় একটি অখণ্ডতা বোধ জাগ্রত করে। আত্মার ঐশ্বর্য তখন ঐ মন-প্রাণ-দেহ আশ্রয় করিয়াই প্রকাশিত হয়। বাহির হইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও কুঁড়ির ঐশ্বর্য ফুলে পূর্ণ পরিণাম লাভ করে না, বরং ক্রমাগত শ্রীহীন ও বিকৃত হইয়া উঠিতে থাকে। প্রাণমূলে রসের সংযোগ ঘটিলে উহা ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও সৌরভ লইয়া ফলে পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়া ধন্য হয়। মানুষের জীবনেও এ-কথা সত্য। দিব্য চেতনাধিষ্ঠিত হইলে তবেই সকল চেতনার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয়। বাহির হইতে আর যে-কোন চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

সঙ্গীতের মধ্যে যেমন একটি অরূপ আনন্দ তত্ত্বের দিক আছে, এবং যে ওই আনন্দ তত্ত্বটিকে লাভ করিতে পারিয়াছে তাহার নিকট সঙ্গীতের বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধ সুর যেমন একটি অখণ্ড সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠে; তেমনি মানুষের মধ্যে একটি ঐক্য-তত্ত্ব আছে, তাহাকে লাভ করিতে পারিলে মানুষের দেহ-প্রাণ-মনের বহু বিচিত্র বিরুদ্ধ ভাবনার মধ্যে মুহূর্তেই পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া যায়। জীবন তখন এক অখণ্ড রূপে প্রতিভাত হয়।

জীবনের সংখ্যাতীত বিরুদ্ধ প্রেরণার দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়াই আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দেয়, তখন আমরা ব্যক্তিত্বকেই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করি। মানুষের সমস্যা ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করা নয়, তাহাকে বিকশিত করা এবং ধীরে তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা।

ভারতীয় ভক্তি-সাধনা যেমন জ্ঞান-সাধনাও তেমনি মূল ব্যক্তিত্বকে বিলুপ্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় ভক্তি-সাধনা কেবলমাত্র হৃদয়-বৃত্তি ও ভাব সম্ভোগের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। তাহাতে মানবিক আর সকল বোধ, দেহ-প্রাণ-মন ও বুদ্ধিবৃত্তির আর সকল ধর্ম সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। প্রেম বা ভক্তির যে দিকটি জীবন ও জগতের সকল দুঃখ-তাপকে স্বীকার করিয়া লয়, তাহাদের নিরাময় করিতে নিয়ত আত্মবিসর্জন করে, জীবন ও জগতের কোন কিছুকে অস্বীকার না করিয়া তাহাকেই আনন্দময় করিয়া তুলে ভারতীয় ভক্তি-সাধনায় জীবন ও জগতের এই পরিপূর্ণ স্বীকৃতির, দুঃখভোগ ও আত্মত্যাগের কোন প্রকাশ যে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভক্তি-রসের মধ্যে যে দিকটি সম্ভোগের দিক, কেবল সেইটিকেই একান্ত করে তুললে দুর্বলতা ও বিকার ঘটে। ওর মধ্যে একটি শক্তির দিক আছে, সেটি না থাকলে রসের দ্বারা মনুষ্যত্ব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়।"

[রসের ধর্ম : শান্তিনিকেতন]

"ভোগই প্রেমের একমাত্র ধর্ম নয়। প্রেমের একটি প্রধান লক্ষণ হচ্ছে এই যে, প্রেম আনন্দে দুঃখকে স্বীকার করে নেয়। কেন না দুঃখের দ্বারা, ত্যাগের দ্বারাই তার পূর্ণ সার্থকতা। ভাবাবেশের মধ্যে নয়—সেবার মধ্যে, কর্মের মধ্যেই তার পূর্ণ পরিচয়। এই দুঃখের মধ্যে দিয়ে, কথার মধ্যে দিয়ে, তপস্যার মধ্যে দিয়ে যে প্রেমের পরিপাক হয়েছে, সেই প্রেমই বিশুদ্ধ থাকে এবং সেই প্রেমই সর্বাঙ্গীণ হয়ে উঠে।" [রসের ধর্ম : শান্তিনিকেতন]

"তার সমস্যা হচ্ছে এই যে, কোন্ শক্তির দ্বারা সে দুঃখকে সহজেই স্বীকার করে নিতে পারে। দুঃখকে নিবৃত্ত করবার পথ যাঁরা দেখাতে চান, তাঁরা অহংকেই সমস্ত অনর্থের হেতু বলে একেবারে তাকে বিলুপ্ত করতে বলেন; দুঃখকে স্বীকার করবার শক্তি যাঁরা দিতে চান, তাঁরা অহংকে প্রেমের দ্বারা পরিপূর্ণ করে তাকে সার্থক করে তুলতে বলেন। *** এইজন্যে মানুষের ধর্ম-সাধনার মধ্যে যখন ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখনি সংসারে যেখানে যা-কিছু সমস্ত বজায় থেকেও মানুষের সকল সমস্যার মীমাংসা হয়ে যায়—তখন কর্মের মধ্যে সে আনন্দ ও দুঃখের মধ্যে সে গৌরব অনুভব করে; তখন কর্মই তাকে মুক্তি দেয় এবং দুঃখ তার ক্ষতির কারণ হয় না।"

[রসের ধর্ম : শান্তিনিকেতন]

এ-কথা তিনি অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

"মানুষ কেবলমাত্র হৃদয় পুঞ্জ নয় এবং নানা প্রকার উপায়ে শরীর মনের সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের ধারায় প্রবাহিত করতে থাকলে কখনোই সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসাধন হতে পারে না।"

[সামঞ্জস্য : শান্তিনিকেতন].

"সমস্ত চিত্তবৃত্তিকে কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের মধ্যে প্রতিসংহরণের চর্চায় মানুষ কখনোই মনুষ্যত্ব লাভ করে না এবং মনুষ্যত্বের যিনি চরম লক্ষ্য, তাঁকেও লাভ করতে পারে না।" [সামঞ্জস্য : শান্তিনিকেতন]

ভক্তি-সাধনার মত ভারতীয় জ্ঞান-সাধনাও জ্ঞানের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে গিয়া দেহ-প্রাণ-মনের অন্যসকল দিককে অস্বীকার করিয়া

বসিয়াছে। এই বোধের পরিণামে জীবন ও জগৎ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় দেহ-প্রাণ-মনের সকল ধর্মের সহিত অধ্যাত্মবোধের পূর্ণ সামঞ্জস্যসাধন প্রয়োজন। পূর্ণতা লাভের ক্ষেত্রে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয়ের পূর্ণ স্বীকৃতি আছে। এই উভয় দিককে লইয়াই জীবনের অখণ্ডতা। ইহাদের কোন একটি দিককে পরিহার করিবার চেষ্টা করিলে জীবন সত্যভ্রষ্ট হয়। ভারতীয় জ্ঞান-সাধনা সম্পর্কে তিনি এই মন্তব্যই করিয়াছেন,—

"সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত ক'রে সমস্ত প্রকৃতির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্রমূল বিস্তার করে দাঁড়াল,—সেইদিন থেকে তাপস আশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্ম রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে জগদ্‌ ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে শরীরের প্রাণ ক্রিয়াকে নিরুদ্ধ ক'রে একটি গুণ লেশহীন অবচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহ-মন-হৃদয় বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনোই প্রার্থনীয় হতে পারে না।"

[সামঞ্জস্য ঃ শান্তিনিকেতন]

রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মানুষ্যত্বের সাধনা। সেই মনুষ্যত্বের মধ্যে দেহ-প্রাণ-মন ও আত্মার সকল ধর্মই স্বীকৃতি ও সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

জড়লোক হইতে একের পর এক চেতনা পর্যায় পার হইয়া আজ মানুষের প্রকাশ ঘটিয়াছে। মানুষের মধ্যে তাই এই সকল চেতনা-পর্যায়ের ধর্ম বিদ্যমান। এই সকল বিপরীত, বিরুদ্ধ, পরস্পর পরস্পরের অবলুপ্তকারী সংখ্যাতীত বোধ বহন করিয়া আজ মানুষকে চলিতে হইতেছে। এই সকল বোধের মধ্যে মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত না সামঞ্জস্যসাধন করিতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার শান্তি নাই, সুখ নাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার জীবনের চতুর্দিক ঘিরিয়া মালিন্য ও বিক্ষোভ। ততক্ষণ পর্যন্ত সে জীবনের কোন ক্ষেত্রেই সুষমার বোধটিকে ফুটাইয়া তুলিতে পারে না।

"সৃষ্টির যুগযুগান্তরের ইতিহাসের বিপুল ধারা আজ মানুষের মধ্যে এসে মিলেছে। মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের মধ্যে জড়ের ইতিহাস, উদ্ভিদের ইতিহাস,

পশুর ইতিহাস সমস্তই একত্র বহন করছে। প্রকৃতির কত লক্ষকোটি বৎসরের ধারাবাহিক সংস্কারের ভার তাকে আজ আশ্রয় করেছে। এই সমস্তকে যতক্ষণ সে একটি উদার ঐক্যের জন্যে সুসংগত সুসংহত করে না তুলছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার মনুষ্যত্বের উপকরণগুলিই তার মনুষ্যত্বের বাধা, ততক্ষণ তার যুদ্ধ-অস্ত্রের বাহুল্যই তার যুদ্ধজয়ের প্রধান অন্তরায়। একটি মহৎ অভিপ্রায়ের দ্বারা যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার বৃহৎ আয়োজনকে সার্থকতার দিকে গেঁথে না তুলছে ততক্ষণ তারা এলোমেলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অহরহ জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে এবং সুষমার পরিবর্তে কুশ্রীতার জঞ্জালে চারিদিককে অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।"

[নববর্ষ ঃ শান্তিনিকেতন]

যে প্রাণ-ধারা নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে অন্তহীন নিত্য নব মাধুর্যরূপে প্রকাশমান, প্রাণের সেই একই আবেগ মানুষের মধ্যে নিত্য নবীন ভাবনা-কল্পনা রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। প্রাণের প্রৈতিই প্রথম জীব-কণা হইতে একের পর এক আবরণ উন্মুক্ত করিয়া আজ পরমাশ্চর্যময় মনুষ্য-চেতনার উদ্ভব ঘটাইয়াছে। চেতনার এই আবরণ উন্মোচন এইখানে আসিয়া তো শেষ হইয়া যায় নাই। সেই এক আবেগ মানবীয় চেতনাকে উন্নততর পরিণামের দিকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে অধিকতর সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য সমন্বিত ধর্মের প্রকাশ ঘটাইবার জন্য।

মানুষের সাধনার লক্ষ্য হইল এই দুর্লভ সত্তাটির কোন একটা উপায়ে বিকাশ সাধন করা নয়, এই ঊর্ধ্বাভিমুখীন আবেগকে আরও শক্তিশালী করা, এই অভিমুখীন প্রেরণার আরও আনুকূল্য করা, বিকাশকে আরও ত্বরান্বিত করা। জীবন এইরূপে জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। এইরূপে আপনার সুপ্ত ঐশ্বর্যকে ধীরে উদ্ঘাটিত করিয়া দিতেছে। এই পরিণামের ভিতর দিয়া জীবনের পূর্ণতাকে লাভ করাই মানুষের লক্ষ্য।

বিশ্বের অনন্ত ঐশ্বর্যের অন্তরালে যে এক বিরাজমান, সেই একের অস্তিত্ব মানুষের অন্তরে। এই চেতনা বিকাশের ভিতর দিয়া মানুষ যখন আপনার অন্তরস্থিত সেই একক লাভ করে তখন বিশ্বের একের স্বরূপও তাহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। আপনার অন্তরস্থিত পরম একক লাভ করলে মনুষ্য-সত্তার সকল বিরুদ্ধ প্রেরণার মধ্যে যেমন সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তেমনি বিশ্ব-একের তত্ত্বটিকে বোধ করিতে পারিলে মনুষ্য-চেতনা বিশ্বের মধ্যে পূর্ণ সুষমাটিকে বোধ করিতে পারে। ব্যক্তির পূর্ণ সুষমার সহিত বিশ্বের পূর্ণ সুষমার তখন সামঞ্জস্য

সাধিত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"তোমার তেজের উৎসের কাছে পৃথিবীর অন্তরগূঢ় প্রার্থনাই তো গাছ হয়ে, ঘাস হয়ে আকাশে উঠছে, বলছে, অপাবৃণু—ঢাকা খুলে দাও। এই ঢাকা খোলাই তার প্রাণের লীলা, এই ঢাকা খোলা থেকেই তার ফুল ফল। এই প্রার্থনাই আদিম জীবাণুর মধ্যে দিয়ে আজ মানুষের মধ্যে এসে উপস্থিত। মানুষের প্রাণের ঘাট পেরিয়ে মানুষের চিত্তের ঘাটে পাড়ি দিয়ে চলল। মানুষের ইতিহাস বলছে, অপাবৃণু, ঢাকা খোলো। জীব বলছে, আমার মধ্যে যে সত্য আছে তার জ্যোতির্ময় পূর্ণ স্বরূপ দেখি। হে পূষণ হে পরিপূর্ণ, তোমার হিরন্ময় পাত্রের মুখের আবরণ ঘুচুক, তার অন্তরের রহস্য প্রকাশিত হোক—সেই রহস্য আমার মধ্যে তোমার মধ্যে একই।

প্রাণ যখন ক্লান্ত হয় তখন বলি, সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব দূর হয়ে যাক, সৃষ্টির লীলা-তরঙ্গে আর উঠতে নামতে পারি নে ; পাত্রের ঢাকা কেবলই খুলে যাক তা নয়, পাত্রটাই যাক ভেঙে, একের বক্ষে বিরাজ না করে একের মধ্যে বিলুপ্ত হই। ভারতবর্ষে এই প্রার্থনা ক্ষণে ক্ষণে শুনতে পাই।

কিন্তু আমি বলি, অপাবৃণু, সত্যের মুখ খুলে দাও—এককে অন্তরে বাহিরে ভালো করে দেখি, তাহলেই অনেককে ভালো করে বুঝতে পারব। গানের মধ্যে আগাগোড়া যে একটি আনন্দময় এক আছে তাকে যতক্ষণ বুঝতে না পারি ততক্ষণ সুরের সঙ্গে সুরের দ্বন্দ্ব আমাকে সুখ দেয় না, আমাকে পীড়া দেয়। তাই বলে আমি বলব না, গান যাক্ লুপ্ত হয়ে ; আমি বলব, পূর্ণ গানটাকে অন্তরে যেন জানি, তাহলেই খণ্ড সুরের দ্বন্দ্বটা বাহিরে আমাকে আর বাজবে না, সেটাকেও অখণ্ড আনন্দের মধ্যে বিধৃত করে দেখব।" [পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি]

মানুষ তাহার শরীর ও মনের উৎকর্ষ সাধন করে তাহাদের সামর্থ্যযুক্ত করে বিশ্ব শরীর ও মনের সহিত সঙ্গত করিয়া। ইহা মানুষের ব্যাপ্তির দিক। কিন্তু একটি দিকে মানুষ সম্পূর্ণ হইয়া আছে। ইহা তাহার সমাপ্তির দিক। মানুষ কেবলই তাহার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধন করিবে না, সেই সঙ্গে অন্তরের এককেও লাভ করিবার চেষ্টা করিবে। অন্তরের পথ ধরিয়া আপনার আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে। মানুষ আপনার অন্তরস্থিত এককে যতই লাভ করে ততই তাহার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের বিচিত্র বিরোধ এবং বিক্ষোভ শান্ত হইয়া আসিতে থাকে, ততই তাহার সমগ্র সত্তা

একটি পূর্ণ সুষমা লাভের ভিতর দিয়া অখণ্ড হইয়া উঠে; ততই মানুষ আপনার ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের উপর অধিক কর্তৃত্ব লাভ করিতে থাকে।

ব্যাপ্তি ও সমাপ্তি মিলিত করিয়া সত্তার যে অখণ্ডতা মানুষের জীবনে তাহাই কাম্য। তাহা না হইয়া মানুষ আপনার ব্যক্তি-সত্তার মূলে কুঠারাঘাত করিবে, এইরূপে সকল সমস্যার সমাধান নয়, সকল সমস্যাকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিবে, তাহা কখনোই মানুষের লক্ষ্য হইতেই পারে না। রবীন্দ্রনাথ ইহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,

"আমার মধ্যে একদিকে চলা, এবং আর একদিকে পৌঁছানো, একদিকে বহু, আর একদিকে এক, এক সঙ্গেই রহিয়াছে, নহিলে অস্তিত্বের মতো বিভীষিকা আর কিছুই থাকিত না। একদিকে আমার বিচিত্র শক্তি বাহিরের বিচিত্রের দিকে চলিয়াছে, আর একদিকে আমার আনন্দ ভিতরের একের দিকে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে।" [ধর্মের অর্থ : সঞ্চয়]

"মানুষের সমস্যা এই যে, ছোটোকে বড়োর সঙ্গে মিলাইবার ভার তাহার উপর,—তাহার ছোটো শরীরের সার্থকতা বিশ্ব-শরীরের মধ্যে, তাহার ছোটো মনের সার্থকতা বিশ্ব-মানবমনের মধ্যে। এই শরীর মনের দিক মানুষের ব্যাপ্তির দিক। শুদ্ধমাত্র এই আমাদের ব্যাপ্তির দিকে আমরা প্রকৃতির অধীন, আমরা বিশ্বব্যাপী অনন্ত নিয়ম পরম্পরার দ্বারা চালিত—এখানে আমাদের পূর্ণ সুখ নাই, এখানে বাহিরের তাড়নাই আমাদিগকে কাজ করায়। আমাদের মধ্যে যেখানে সমাপ্তির দিক আছে, যে পরিমাণে সেইখানকার সঙ্গে আমাদের এই ব্যাপ্তির যোগ সাধন হইতে থাকিবে সেই পরিমাণেই আমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তখন আমার শরীর আমারই বশীভূত শরীর, আমার মন আমারই বশীভূত মন হইয়া উঠিবে। তখন সর্বমাত্মবশং সুখম্। তখন আমার শরীর মনের বহু বিচিত্র নিয়ম আমার এক আনন্দের অনুগত হইয়া সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাহার বহুলত্বের দুঃসহ ভার, একের মধ্যে বিন্যস্ত হইয়া সহজ হইয়া যাইবে।" [ধর্মের অর্থ : সঞ্চয়]

"আমরা যখন কেবলই অন্তহীন ব্যাপ্তির গম্যহীন পথে চলি তখন প্রত্যেক পদক্ষেপ নিরর্থক হইয়া আমাদিগকে কষ্ট দেয়—একটি পরিপূর্ণ পরিসমাপ্তির সঙ্গে যোগ করিয়া যখন তাহাকে দেখি তখনই তাহার সমস্ত ব্যর্থতা দূর হইয়া যায়। তখন প্রতিপদেই আমাদিগকে আনন্দ দিতে থাকে। তখন মৃত্যুই আমাদের কাছে মিথ্যা হইয়া যায়। তখন এক অখণ্ড অমৃতে

জগৎকে এবং জীবনকে আদ্যন্ত পরিপূর্ণ দেখিয়া আমাদের সমস্ত দারিদ্র্যের অবসান হয়।" [ধর্মের অর্থ : সঞ্চয়]

বিশ্বের অন্তহীন বৈচিত্র্যের মূলে একটি এক আছে। মানুষ যখন শুধু বৈচিত্র্যকে দেখে তখন সর্বত্রই মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া শোকনিমগ্ন হয়। যখন পরম একের সহিত যুক্ত হইয়া সে অনন্ত রূপ বৈচিত্রকে প্রত্যক্ষ করে তখন আনন্দ নিঃসীম হইয়া উঠে।

যাঁহাকে আমরা বলি পূর্ণ স্বরূপ ব্রহ্ম, তাঁহার মধ্যে মানুষের আধ্যাত্মিক এবং প্রাকৃতিক সকল ধর্মের পূর্ণ প্রকাশ। তিনি এক, তবে সকলকে মিলিত করিয়া। তিনি অখণ্ড, সকল খণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যে অখণ্ডের প্রকাশ। এই পূর্ণ স্বরূপব্রহ্মকে লাভ করিতে মনুষ্যত্বের সকল ধর্মের অনুশীলন এবং পূর্ণ বিকাশ-সাধন প্রয়োজন। মনুষ্যত্বের কোন একটি দিককে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিলে মানুষ পূর্ণতার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হয়। অসীম বা অরূপের সাধনা তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে এই কথাই বলিয়াছেন।

"এই যে পূর্ণ স্বরূপব্রহ্ম, সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ উৎকর্ষের দ্বারাই আমরা যাঁর সঙ্গে যুক্ত হতে পারি—তার যথার্থ সাধনাই হচ্ছে তাঁর যোগে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং সকলের যোগে তাঁরি সঙ্গে যুক্ত হওয়া—দেহ-মন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দ্বারাই তাঁকে উপলব্ধি করা এবং তাঁর উপলব্ধির দ্বারা দেহ-মন-হৃদয়ের সমস্ত শক্তিকে বলশালী করা—অর্থাৎ পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যের পথকে গ্রহণ করা।"

[সামঞ্জস্য : শান্তিনিকেতন]

"অসীমের আরাধনা মনুষ্যত্বের কোনো অঙ্গের উচ্ছেদ সাধন নয়, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ পরিণতি।" [ছোটো ও বড়ো : শান্তিনিকেতন]

"মনুষ্যত্বের মূলে আর একটি প্রকাণ্ড দ্বন্দ্ব আছে; তাকে বলা যেতে পারে প্রকৃতি এবং আত্মার দ্বন্দ্ব। স্বার্থের দিক এবং পরমার্থের দিক, বন্ধনের দিক এবং মুক্তির দিক, সীমার দিক এবং অনন্তের দিক—এই দুইকে মিলিয়ে চলতে হবে মানুষকে।" [দ্বিধা : শান্তিনিকেতন]

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিক যেমন একটি অখণ্ড গোলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে —প্রাকৃতিক এবং আধ্যাত্মিক তেমনি একটি অখণ্ডতার দ্বারা বিধৃত। এর মধ্যে একটিকে পরিহার করতে গেলেই আমরা সমগ্রতার কাছে অপরাধী হব—এবং সে অপরাধের দণ্ড অবশ্যম্ভাবী।" [সমগ্র : শান্তিনিকেতন]

সকল খণ্ড বা রূপকে আশ্রয় করিয়াই অখণ্ডের প্রকাশ। অনন্ত বা অরূপ

তাই সকল রূপ-বিবর্জিত কোন সত্তা নয়। তাহা হইলে অসীম বা অরূপকে আমরা উপলব্ধি করিতেই পারিতাম না। আবার রূপ নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া সরিয়া সরিয়া অরূপের অপ্রমেয়তাকে নিয়ত প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। পূর্ণতার উপলব্ধিতে তাই একদিকে সীমা, রূপ বা খণ্ড আছে, আবার অন্যদিকে আছে ইহাদের যোগে অসীম, অরূপ বা অখণ্ড।

"মানুষ একসঙ্গে সমস্তকে দেখবার চেষ্টা করলে সমস্তকেই ঝাপসা দেখে বলেই প্রথমে খণ্ড খণ্ড করে তারপরে সমস্তর মধ্যে সেটা মিলিয়ে নেয়। এইজন্য কেবল খণ্ডকে দেখে সমগ্রকে যদি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তবে তার ভয়ঙ্কর জবাবদিহি আছে; আবার কেবল সমগ্রকে লক্ষ্য করে খণ্ডকে যদি বিলুপ্ত করে দেখে তবে সেই শূন্যতা তার পক্ষে একেবারে ব্যর্থ হয়।" [সমগ্র : শান্তিনিকেতন]

মনুষ্যত্বের পূর্ণতা কোন একটি নির্বিশেষ পরিণাম লাভ করা নয়। মনুষ্যত্বের পূর্ণতা স্বধর্মের পূর্ণতা। বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির এই স্বধর্মের ধীর বিকাশ ও পূর্ণতা ঘটে। মানুষের সাধনা তাই ব্যক্তিত্বের বিলোপ নয়, ব্যক্তির সহিত বিশ্বের সামঞ্জস্য সাধন করা।

"মানুষের একপ্রান্তে বিশ্ব, অন্যপ্রান্তে তার বিশেষত্ব। এই দুই নিয়ে তবে তার সম্পূর্ণতা, তার আনন্দ।" [বিশেষত্ব ও বিশ্ব : শান্তিনিকেতন]

জীবন ও জগতের মধ্যে তাঁহারই পূর্ণ প্রকাশ। জ্ঞানে প্রেমে কর্মে তিনি আপনাকে সর্বতোভাবে বিশ্বে ধরা দিয়াছেন। বিশ্বের সহিত জ্ঞানে প্রেমে কর্মে মিলিত হইয়া তবেই আমরা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইতে পারি। মানবিক বিচিত্র প্রেম সম্পর্কের মধ্যে তাঁহারই প্রেমের প্রকাশ। তীব্রতায় ও গভীরতায় এই প্রেমই বিশ্বময় পরিব্যাপ্তি লাভ করে।

নিখিল মানবের হৃদয়পাত্র পূর্ণ করিয়া যে-প্রেম অন্তহীন ধারায় দিগ্বিদিকে বহিয়া চলিয়াছে ব্যক্তির হৃদয়কে সেই প্রেমধারায় নিমগ্ন করিতে হয়। এই প্রেমই ঈশ্বরের অসীম প্রেমের আস্বাদ দান করে।

জ্ঞানে প্রেমে কর্মে যে বিপুল মানবসমাজ আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, তাহাকে পরিহার করিয়া অবচ্ছিন্ন (abstract) কোন সত্তার ধ্যানে মানুষ শূন্যতাই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যই করিয়াছেন।

"তিনি পিতা-মাতার হৃদয়ের পাত্র দিয়ে আপনিই আমাদের স্নেহ দিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রীতির আকর্ষণ দিয়ে আপনি আমাদের হৃদয়ের গ্রন্থি মোচন করেছেন; এই পৃথিবীর আকাশেই তাঁর যে বীণা বাজে তারই সঙ্গে আমাদের

হৃদয়ের তার এক সুরে বাঁধা ; মানুষের মধ্য দিয়েই তিনি আমাদের সমস্ত সেবা গ্রহণ করছেন, আমাদের কথা শুনছেন এবং শোনাচ্ছেন ; এইখানেই সেই পুণ্যলোক সেই স্বর্গলোক যেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে সর্বতোভাবে তাঁর সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটতে পারে। অতএব মানুষ যদি অনন্তকে সমস্ত মানব-সম্বন্ধ হতে বিচ্যুত করে জানাই সত্য মনে করে, তবে সে শূন্যতাকেই সত্য মনে করবে।" [ছোটো ও বড়ো ঃ শান্তিনিকেতন]

পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনই মানবজীবনের লক্ষ্য। পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলিতে সেই দেহ-প্রাণ-মন ও অধ্যাত্ম সত্তার সকল ধর্মের অনুশীলন বুঝায়। ইহাদের কোন একটি দিক ঐকান্তিক হইয়া উঠিলে মানুষ আপনার সামঞ্জস্য হারাইয়া ফেলে। তবে প্রবৃত্তির কথা বিশেষ করিয়া বলা হয়, কারণ প্রবৃত্তি সহজেই অত্যন্ত স্ফীতি লাভ করিয়া মনুষ্যত্বের আর সকল প্রেরণাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। প্রবৃত্তিকে উন্মূলিত করা মানুষের লক্ষ্য নয়, প্রবৃত্তিকে অন্যান্য সকল ধর্মের সহিত সুসঙ্গত করিয়া তোলাই মানবজীবনের লক্ষ্য। যাহা এই সামঞ্জস্য-সাধনের পথে বিঘ্নকর তাহাই পাপ ; সামঞ্জস্য-সাধনই ধর্ম।

"বস্তুত স্বভাবের পরিপূর্ণতাকে লাভ করাই ধর্ম ও ধর্মনীতির শ্রেষ্ঠ লাভ। মানুষ নানা কারণে তার স্বভাবের ওজন রাখতে পারে না, সে সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে এই তো তার পাপের মূল এবং ধর্মনীতি তো এইজন্যই তাকে সংযমে প্রবৃত্ত করে।

এই সংযমের কাজটা কী? প্রবৃত্তিকে উন্মূল করা নয়, প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করা। কোন একটি প্রবৃত্তি যখন বিশেষরূপে প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্জস্যকে পীড়িত করে তখনই পাপের উৎপত্তি হয়।" [স্বভাব লাভ ঃ শান্তিনিকেতন]

মানুষের মধ্যে সেই প্রেম আছে যে প্রেমে মানুষ সীমার মধ্যেই অসীমকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। প্রেমের মধ্যে সেই শক্তি আছে যে শক্তিতে মানুষ সংসারে সকল দুঃখ-তাপকে একেবারে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে এবং তাহাকে আনন্দে রূপান্তরিত করিতে পারে। এই প্রেম সংসার সম্পর্কে মানুষকে উদাসীন থাকিতে দেয় না। তাহার সকল মালিন্য দূর করিতে তাহাকে সর্বদা সচেষ্ট করিয়া তুলে। প্রেমের অপরিমিতিতে আত্মবিসর্জন একান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

"প্রেমের দ্বারা চেতনা যে পূর্ণ শক্তি লাভ করে সেই পূর্ণতার দ্বারাই সে সীমার মধ্যে অসীমকে রূপের মধ্যে অপরূপকে দেখতে পায় তাকে নূতন কোথাও

যেতে হয় না। ওই অভাবটুকুর দ্বারাই অসীম সত্য তার কাছে সীমায় বদ্ধ হয়েছিল।

বিশ্ব তার আনন্দরূপ, কিন্তু আমরা রূপকে দেখছি আনন্দকে দেখছি নে, সেইজন্যে রূপ কেবল পদে পদে আমাদের আঘাত করছে আনন্দকে যেমনি দেখব অমনি কেউ আর আমাদের কোন বাধা দিতে পারবে না। সেই তো মুক্তি।

সেই মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়, সেই মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয় যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয় প্রকাশের মুক্তি।"

[মুক্তি : শান্তিনিকেতন]

সঙ্গীতের মূল আনন্দরস যাহা সুরের বৈচিত্র্যকে প্রতিমুহূর্তে একটি সুষমার মধ্যে বাঁধিয়া তুলিতেছে, একটি সমগ্রতা দান করিতেছে তাহাকে যতদিন না উপলব্ধি করিতে পারা যায় ততদিন বিচ্ছিন্ন সুর সৃষ্টি, সুরের সহিত সুরের সংঘাত আমাদের মনকে ক্লিষ্ট, পীড়িত ও ক্লান্ত করিয়া তুলে। মুহূর্তে মুহূর্তে এমন একটি মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে যে অবস্থায় সমস্ত সঙ্গীতকেই নিরর্থক নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ করে। মানুষ যখন সাধনার ভিতর দিয়া সঙ্গীতরসের সন্ধান পায় তখন সকল বিচ্ছিন্ন সুরকে অখণ্ড রূপে দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়া ধন্য হয়।

বিশ্বে শুধু রূপ তেমনি রসবোধ শূন্য এক একটি বিচ্ছিন্ন সুর, সুরের সহিত সুরের বিচিত্র সংঘাত। সে বিভীষিকায় হৃদয় মুহূর্তে মুহূর্তে বিশুষ্ক হইয়া উঠে। সাধনার ভিতর দিয়া মানুষ যখন সকল রূপকে অরূপের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে সমর্থ হয় তখন জগতের অমৃত রূপটি স্বতই ফুটিয়া উঠে। মুক্তির বোধে মানুষ চিরকালের জন্য বাঁচিয়া যায়।

"বিশ্ব কাব্যকে নিরর্থক অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করবার তপস্যায় প্রবৃত্ত না হয়ে বিশ্বকাব্য শোনাকে সার্থক করে তোলাই হচ্ছে যথার্থ মুক্তি।"

[মুক্তির পথ : শান্তিনিকেতন]

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-দর্শনের পশ্চাতে যে এই সামঞ্জস্য-তত্ত্বের স্থির উপলব্ধি ছিল, রাধাকৃষ্ণণ তাহা উল্লেখ করিয়া একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন।

"রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি সামগ্রিক। উহা দেহ ও মন, জড় ও চৈতন্য, ব্যক্তি ও সমাজ, সম্প্রদায় ও জাতি, ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে একান্ত বিচ্ছেদ স্বীকার করে না।"

বিজ্ঞান প্রকৃতি বা তথ্যের যে পরিচয় দান করে, তাহার একদিকে আছে এক এবং অন্যদিকে আছে বহু। এই এক এবং বহু কোন একটি উপায়ে যুক্ত হইয়া আছে। ইহার মধ্যে কোন সচেতন অভিপ্রায়ের প্রকাশ নাই। বিজ্ঞানের সহায়তায় উপলব্ধ এই জগৎকে বলা হয় বর্ণনাত্মক জগৎ। ইহা প্রকৃতির জড় রূপ।

প্রকৃতির আর একটি রূপ আছে যাহাকে ভাবাত্মক বা উপলব্ধির জগৎ বলা যায়। ইহা আমাদের অভিপ্রায় ব্যতিরিক্ত অন্য কোন অভিপ্রায়ের প্রকাশের উপলব্ধি। এই ভাবের জগতের উপলব্ধির মধ্যেও একটি অমোঘ নিয়মের অস্তিত্ব বর্তমান। এই জগৎও বৈজ্ঞানিক জগতের ন্যায় ক্রমেই প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

আমরা এমন একটি তত্ত্বের উপলব্ধি চাই, যেখানে ভাব ও বস্তু, প্রয়োজন ও মুক্ত লীলা, বর্ণনাত্মক ও আধ্যাত্মিক এই উভয় লোকের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয়-সাধন ঘটিয়াছে।

অভিব্যক্তি-তত্ত্ব এই উভয় লোকের মধ্যে পার্থক্য দূর করিতে চাহিয়াছে। যদি বস্তু আমাদের মনের বহিঃ-প্রকাশ হয়, তাহা হইলে মনের অভিব্যক্তির আর এক অর্থ ধরা পড়ে। বস্তুত প্রাকৃতিক এবং মানসিক ঘটনার মধ্যে একটি সাধারণ প্রক্রিয়া আছে।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের আদর্শবাদী মতগুলিকে বহির্বিশ্বের অস্বীকৃতির ক্রমিক গভীরতার দিক হইতে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমত Descartes এবং Locke, দ্বিতীয়ত Berkley এবং Hume এবং তৃতীয়ত Kant এবং Hegel। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৌদ্ধ-দর্শনের মধ্যে অনুরূপ তিনটি শাখা লক্ষ্য করা যায়।

বার্কলের মতে মনের বাহিরে প্রকৃতির কোন অস্তিত্বই নাই এবং মানবিক এই অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। বার্কলের দৃষ্টিতে বিশ্ব-প্রকৃতি এই রূপ মায়া হইয়া উঠিয়াছে এবং ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোন কারণ তিনি নির্দেশ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু আমাদের মানবিক জীবন প্রকৃতির বৃহত্তর জীবনের একটি অংশ মাত্র। সকল পার্থক্য সত্ত্বেও প্রকৃতির সহিত আমাদের গভীরতর সম্পর্কের সহিত আমাদের প্রতিবেশী মানবসমাজের সম্পর্কের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। Leibniz এর Monad গুলির মধ্যে কোন যোগসূত্র বা আদানপ্রদান নাই।

প্লেটোর জীবন-দর্শনে যে অসম্পূর্ণতা সর্বাধিক অনুভূত হয়, তাহা হেরাক্লিটিয় গতি ও পরিবর্তনের বোধ। পরিবর্তনশীল জগতের একটি স্থির চিত্ররূপ ফুটাইয়া তুলিতে তিনি উৎসুক। যে-কোন সাধারণ দার্শনিকের ন্যায় তিনি শৃঙ্খলাকে বিশেষভাবে ভালবাসেন। ডেমোক্রেসির মধ্যে যে ব্যক্তি মূল্যের স্বীকৃতি আছে, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। তিনি মনুষ্য-সম্প্রদায়কে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে মনোভাবের প্রয়োজন তাহাকে তিনি অকুণ্ঠিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রাষ্ট্র নিশ্চল এবং ইহা যাহাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তাহারা উদ্ভাবনা এবং পরিবর্তনকে সচেতন ভাবে পরিহার করে। ইহা এক শিল্পবিহীন বিজ্ঞান, ইহা শৃঙ্খলার মহিমা প্রচার করে এবং শিল্পের মূলে যে ব্যক্তিস্বাধীনতা তাহাকে সম্পূর্ণ পক্ষে অস্বীকার করে।

বস্তুত সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, দেশ-কাল ও দেশ-কালাতীত, চির স্থির ও চিরগতির যুগ্ম ধারণাকে আশ্রয় করিয়া সকল চিন্তা-পদ্ধতি সকল জীবন-দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সম্পর্কে A. N. Whitehead-এর একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"Ideals fashion themselves round these two notions, permanence and flux. In the inescapable flux, there is something that abides; in the over whelming permanence, there is an element that escapes into flux. Permanence can be snatched only out of flux; and the passing moment can find its adequate intensity only by its submission to permanence. Those who would disjoin the two elements can find no interpretation of patent facts." (*Process and Reality*: *A. N. Whitehead*)

ইহা নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি, যে ভারতীয় জীবন-দর্শনে এই দুইটি তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন। একদিকে দেশ-কালের অন্তর্গত স্তরবিন্যস্ত চিরন্তন সমাজ রূপ, অন্যদিকে দেশ-কালের অতীত তাত্ত্বিক উপলব্ধি।

[২]

মন ও বুদ্ধির সহায়তায় এই ঐক্য তত্ত্বটিকে লাভ করিতে পারা যায় না। আমাদের বুদ্ধি ও বোধ সীমাবদ্ধ, খণ্ডিত, বিভাজন ধর্মী। ইন্দ্রিয়ই মন ও বুদ্ধির আশ্রয়স্থল। ইন্দ্রিয়লব্ধ বোধগুলিকে মার্জিত করিয়া মন একটি সুস্পষ্ট রূপ দান করে। মনের শক্তি-সীমা এই পর্যন্ত। মনের ধর্ম রূপের পর রূপ যোজনা করা, রূপ হইতে রূপে বিহার করা। সকল রূপ যে অরূপের লীলা, মন তাই তাহাকে লাভ করিতে পারে না। অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে তাই আমিত্ব বা অহঙ্কারবোধ (অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির দ্বারা সীমিত বোধ) বিসর্জন দিতে হয়।

সকল অধ্যাত্ম-সাধনার গোড়ার কথা হইল এই অহঙ্কারবোধের বিসর্জন। যে-কোন অধ্যাত্ম-সাধনার, ধর্ম ও দর্শনের ইহা যেমন গোড়ার কথা, তেমনি শেষ কথাও বটে। কোন একটি উপায়ে এই সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে অসীমের উপলব্ধি ঘটে। জ্ঞান-কর্ম-ভক্তি সাধনার যে পথই হোক-না-কেন, অহঙ্কার-বিসর্জনই আদি ও অন্ত কথা।

এই জীবন ও জগৎকে দুইদিক হইতে দেখা আছে—একটি জাগতিক-দৃষ্টিতে দেখা, অপরটি অধ্যাত্ম-দৃষ্টিতে দেখা। একটি সীমার দিক হইতে দেখা, অপরটি অসীমের দিক হইতে দেখা। একটি মন ও বুদ্ধির সহায়তায় দেখা, অপরটি মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বতর চেতনাশ্রয়ী হইয়া দেখা। সকল অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য হইল এই জীবন ও জগৎকেই অসীমের দিক হইতে প্রত্যক্ষ করা। অসীমের দিক হইতে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা তাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও স্বাভাবিকভাবে লক্ষ্য করা যায়।

"হে সত্য আর কিছু নয়, যেদিকে তুমি, যেদিকে সত্য, সেইদিকে আমার মুখ ফিরিয়ে দাও, আমি যে কেবল অসত্যের দিকে তাকিয়ে আছি।...তোমার জ্যোতির দিকে আমাকে ফেরাও। আমি কেবল দেখছি মৃত্যু—তার কোন মানেই ভেবে পাচ্ছিনে, ভয়ে সারা হয়ে যাচ্ছি। ঠিক তার ওপাশে যে অমৃত রয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত মানে রয়েছে সে কথা আমাকে কে বুঝিয়ে দেবে।"

[রবীন্দ্রনাথ]

কিংবা

"সেই আমার হৃদয় যখন তার স্বাভাবিক সংশয়রহিত বোধশক্তির দ্বারাই পরম একেকে বিশ্বের মধ্যে এবং আপনার মধ্যে প্রত্যক্ষ অনুভব করে তখন মানুষ চিরকালের জন্য বেঁচে যায়। জোড়া দিয়ে অনন্তকালেও আমরা এককে পেতে পারি নে, হৃদয়ের সহজ বোধে এক মুহূর্তেই তাঁকে একান্ত আপন করে পাওয়া যায়।"

শেষোক্ত উদ্ধৃতির মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষণীয়। প্রথমত মন ও বুদ্ধির সহায়তায় আমরা রূপকে কেবল জোড়া দিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন, যে "জোড়া দিয়ে অনন্তকালেও আমরা এককে পেতে পারিনে।" দ্বিতীয়ত অসীম বা অরূপকে প্রত্যক্ষ করিতে হয়, "স্বাভাবিক সংশয় রহিত বোধশক্তি", অথবা "হৃদয়ের সহজবোধ" দ্বারা। এই জাতীয় শব্দ সমষ্টির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ মানুষের এমন একটি বোধের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, যাহা মন ও বুদ্ধি অতিরিক্ত। দর্শনশাস্ত্রে ইহাকে বলা হয় 'বোধি'। এই বোধি একপ্রকার অখণ্ড দৃষ্টি। বোধির ক্ষেত্রে ব্যক্তি-চেতনা বস্তুর স্বধর্ম ও স্বরূপ লাভ করে, ভাব ও বিষয় একাত্ম হইয়া যায়। ইহা বস্তুর সহিত একাত্ম হইয়া বস্তুকে দেখা।

মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলে, অন্তরে অপার শান্তি বিরাজ করিলে তবেই এই বোধির প্রকাশ ঘটে। মানুষের সকল বৃত্তি একমুখীন হইয়া যখন বিক্ষোভশূন্য, শান্ত, সমাহিত হয়, তখন ধ্যান তন্ময় চিত্ত নিষ্কম্প দীপ-শিখার মত জ্বলিয়া উঠে। ইহাই অধ্যাত্ম দৃষ্টি, ইহাই বোধি।

রবীন্দ্রনাথ ইহা আরও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মানুষের সাধনা কিসের জন্য, না "আমাদের জীবনে সত্যের সঙ্গে অনন্তের যে বাধা ঘটিয়ে বসেছি, যে বাধাবশত আমাদের জ্ঞানের বিকার ঘটছে সেইটে দূর করে দিতে থাকা।"

রবীন্দ্রনাথ ইহার পরেই বলিয়াছেন, "এই বাধা ঘটিয়েছে আমাদের অহং। এই অহং আপনার রাগদ্বেষের লাগাম এবং চাবুক দিয়ে আমাদের জীবাত্মাকে নিজের সুখ-দুঃখের সঙ্কীর্ণ পথেই চালাতে চায়।"

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির বিস্তারিত পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"তোমার দিক থেকে একেবারে জগৎ ভরে উঠল। তুমি আপনাকে দিয়ে আর শেষ করতে পারলে না। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ একেবারে ছাপিয়ে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু তোমার এই এতবড়ো আকাশ ভরা আত্মদান আমরা

দেখতেই পাচ্ছি নে, গ্রহণ করতেই পারছিনে, কিসের জন্য ওই এতটুকু একটুখানি আমির জন্যে। সে যে সমস্ত অনন্তের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বলছে আমি।"

"সে অহংকারের বাধা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দিয়ে নমস্কারের গৌরবকেই চাচ্ছে। পরিপূর্ণ প্রণতির দ্বারা নিখিলের সমস্তর সঙ্গে আপনার সুবৃহৎ সমতলতা লাভের জন্য চিরদিন সে উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। আপনার সেই অন্তরতম স্বধর্মটিকে যে পর্যন্ত সে না পাচ্ছে সেই পর্যন্ত তার যত কিছু দুঃখ যত কিছু অপমান।"

"মানুষ অহংকে দিয়ে যতই নাড়াচাড়া করুক, তাই দিয়ে জগতে যত ভয়ানক আন্দোলন আলোড়ন, যত উত্থান-পতনই হ'ক না কেন তবু সেটাই চরম সত্য কদাচ নয়।"

"এই বড়োর দিকেই মানুষের পথ, সেই দিকেই তার গতি, সেই দিকেই তার শক্তি, সেইদিকেই তার সত্য এই সহজ কথাটি কখন সে ভুলতে থাকে যখন সে আপন হাতের গড়া বেড়া দিয়ে আপনার চারিদিক ঘিরে তুলতে থাকে।"

পরিশেষে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন,

"এই নানা সংস্কারে আঁকা নানা প্রয়োজন আঁটা আমির পর্দাটিকে মাঝে মাঝে সরিয়ে ফেলতে পারলেই তখন চারিদিকে দেখতে পাব জগৎ কি আশ্চর্য অপরূপ। মানুষ কী বিপুল রহস্যময়।"

মানুষ যখন তাহার সীমার মধ্যে তাহার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অনুকূল করিয়া ভূমাকে লাভ করিতে চায়, তখন তাহার মধ্যে তাহার সীমাবোধ তাহার বহুবিচিত্র সংস্কারই বাহিরে রূপলাভ করিয়া চরিতার্থ হয়। উহা প্রকৃত ধর্ম নহে। ধর্ম একটি শাশ্বত মূল্যবোধ। ইহাকে লাভ করিয়া সাধনার ভিতর দিয়া মানুষ ইহার সন্নিকটবর্তী হইতে থাকে। পূর্ণতার আদর্শকে আপনার অনুকূল করিয়া গড়িতে গেলে এই বিকাশের গতি রুদ্ধ হয়। ধর্মের জন্য সংখ্যাতীত জীবন যদি যায় যাক, জীবনের জন্য ধর্মের আদর্শ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের সত্যোপলব্ধি।

ধর্ম্মের বিচিত্র রূপ, জটিলতা এবং বিরোধিতার একমাত্র কারণ এই যে মানুষ তাহার জীবনকে পূর্ণতার শাশ্বত আদর্শের অনুরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া পূর্ণতাকেই আপনার সামর্থ্যের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করে। রবীন্দ্রনাথ সে কথা বলিয়াছেন, "ইহার একমাত্র কারণ সর্ব্বান্তকরণে আমরা নিজের ধর্মের অনুগত না করিয়া ধর্মকে নিজের অনুরূপ করিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া।"

মানুষের সাধনা অসীমের অনুকূল করিয়া আমিকে গড়িয়া তোলা। অস্তিত্বকে স্ফীত করিয়া তাহার প্রয়োজন ও সামর্থ্যের অনুকূল করিয়া অসীমকে লাভ করিতে গেলে সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাই নিরন্তর এই প্রার্থনা জানাইয়াছেন,—

"ফিরাও ফিরাও তাহাকে আত্মাভিমান হইতে ফিরাও। দুর্বল প্রবৃত্তির নিদারুণ অপমান হইতে তাহাকে রক্ষা করো। বুদ্ধির জটিলতার মধ্যে আর তাহাকে নিস্ফল হইতে দিয়ো না। তাহাকে প্রতিদিন তোমার বিশ্বলোকে, তোমার সৌন্দর্যলোকে আকর্ষণ করিয়া তাহার চিরজীবনের দৈন্য চূর্ণ করিয়া ফেলো।" [উৎসব : ধর্ম]

মনুষ্য সমাজ সমগ্র সৃষ্টি রূপের একটি পর্যায়। আবার এই নিখিল বিশ্ব এক শাশ্বত চিরস্থির তত্ত্বের বক্ষে অস্থির একটি বিন্দু, একটি চঞ্চল বীচি বিক্ষেপ, একটি চপল ছায়া। ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত যে তত্ত্বে বিধৃত এই সমস্ত কিছু যাহার ক্ষণিক প্রকাশ, তাহারই মধ্যে এই জীবন ও জগতের অর্থ অন্বেষণ করিতে হইবে। কেবল ওই তত্ত্ব লাভ করিলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে। সেই রহস্য ভেদ করিলে সব কিছুর সহিত জীবনেরও রহস্যভেদ হইয়া যায়। কারণ এই জীবন ও জগৎ তাঁহার অনন্ত রূপ কল্পনার অন্তর্গত সামান্য একটি অংশ মাত্র।

জাগতিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় মন ও বুদ্ধির সহায়তায়। তাই জীবনের সম্পূর্ণ অর্থের প্রকাশ কোন রূপেই ঘটিতেছে না। জীবন ক্রমাগত জটিল ও সমস্যা সঙ্কুল হইয়া উঠিতেছে। অধ্যাত্ম জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় সম্পূর্ণ পৃথক এক প্রেরণা দ্বারা। উহার স্বরূপ তাই জাগতিক সংস্কার দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা বৃথা। উহার মূল্যবোধ নীতিবোধ আমাদের জীবনধারার এমনিই বিপরীত!

তখন তাহার সকল কর্ম, সকল ভাব ও ভাবনা দিব্য-কর্ম, দিব্য-ভাব ও ভাবনায় পরিণত হয়। মানুষ তখন হয় ঈশ্বরীয় কর্মের যন্ত্র স্বরূপ। তখন তাহার সকল প্রেরণা, সকল প্রয়াস অভ্রান্ত, অমোঘ ও অনিবার্য হয়।

এই দিব্য জীবন লাভের একমাত্র অন্তরায় মানুষের অহঙ্কার বা আমিত্ব বোধ। ইহাই সীমার বোধ। অহঙ্কার বিসর্জন না করিতে পারিলে দিব্য-জীবন লাভ করা অসম্ভব।

এই জন্যই নিরন্তর প্রার্থনা, এই জন্যই যোগাভ্যাস, এই জন্যই জ্ঞান, কর্ম ও

ভক্তি। কোন একটি পথ আশ্রয় করিয়া মন ও বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। ঈশ্বরীয় বোধে নিঃশেষ বিলুপ্তি, পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জন—ইহাই একমাত্র সাধনা। সমগ্র জীবন যেন হয় এক অখণ্ড প্রণাম আত্মনিবেদনের ভাবে ভরা।

জীবন আশ্রয় করিয়া তখন ঈশ্বরের ইচ্ছাই শুধু অভিব্যক্ত হয়। জীবন তখন মর্ত্তলোকে ঈশ্বরীয় চেতনা প্রকাশের পথ স্বরূপ হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয় চেতনাশ্রয়ী রূপাভিসারী, বহির্মুখী মনকে প্রথমে অন্তর্মুখীন করিয়া বিশ্ব হইতে সমগ্র সত্তাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে হয়। ইহাই ধ্যান। তখন অন্তরের মধ্যে যে মহানির্জনতা যে একাকীত্ব বোধ জাগে সেই নির্জনতা এবং নিঃসঙ্গ বোধের ভিতর হইতে উন্নততর চেতনার আহ্বান ধ্বনি শোনা যায়। হৃদয় বৃন্তে তখন আর এক আলোক শিখা জ্বলিয়া উঠে, যাহা পার্থিব নহে। সেই আলোকে দিব্যলোক উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এমনি করিয়া ব্যক্তি ও বিশ্বকে নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া আবার উহাকে সম্পূর্ণ নূতন করিয়া লাভ করিতে হয়। বস্তুত এই বিশ্বই তখন আর একরূপে প্রতিভাত হয়। প্রকৃত ধর্ম বলিতে তাই প্রার্থনা বা অনুষ্ঠান বুঝায় না। ধর্ম বলিতে বুঝায় সমগ্র বৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতা। বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা। দিব্য চেতনার সহিত অস্খলিত যোগযুক্ত হইয়া থাকা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মূল অধ্যাত্ম উপলব্ধি স্বরূপ কয়েকটি অভিজ্ঞতার কথা পরবর্তী জীবনে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের কয়েকটি পরিশেষে সংগ্রহ করিয়া একত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই সাক্ষাৎকারগুলি ঘটিয়াছিল কবির কৈশোরে কয়েকটি পরবর্তী জীবনে।

"একদিন অপরাহ্নের শেষ ভাগে আমি আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বারান্দায় পদ-চারণা করিতেছিলাম। সূর্যাস্ত আভার সহিত প্রায়ান্ধকার গোধূলি মিলিয়া আসন্ন সন্ধার ইঙ্গিত দান করিতেছিল। ইহা আমার নিকট এক বিশিষ্ট বিস্ময়কর আকর্ষণীয় সামগ্রী। মনে হইল যেন সন্নিকটবর্তী গৃহেরদেওয়ালগুলি সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম সন্ধ্যালোকের কোন যাদুস্পর্শে কি তুচ্ছতার আবরণ উঠিয়া গিয়াছে? তাহা নহে।

মুহূর্তে দেখিলাম, যে সন্ধ্যা আমার মধ্যে আসিয়াছে ইহা তাহারই ফল, ইহার ছায়া আমার আমিত্বকে মুছিয়া দিয়াছে। দিনের আলোকে আমার আমিত্ব উদগ্র থাকে বলিয়া আমার সমস্ত উপলব্ধি আমিত্ববোধ মিশ্রিত কিংবা উহার

দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এখন আমিত্ব পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বকে তাহার যথার্থ স্বরূপে দেখিতেছি। তাহার মধ্যে তুচ্ছতা বলিতে কিছু নাই, ইহা সৌন্দর্য ও আনন্দ পরিপূর্ণ।"

"আমাদের সর্দার স্ট্রীটের ঘর হইতে সর্দার স্ট্রীটের শেষ প্রান্ত এবং ফ্রী স্কুলের মাঠের গাছগুলি দেখা যায়। একদিন সকালে বারান্দায় ওইদিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি। গাছগুলির পত্রবহুল শীর্ষের মধ্য হইতে সদ্য সূর্যোদয় হইতেছে। উহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ মনে হইল আমার দৃষ্টি হইতে একটি আবরণ যেন খুলিয়া গিয়াছে। দেখিলাম সমস্ত জগৎ আশ্চর্য প্রভায় স্নান করিতেছে, চতুর্দিকে সৌন্দর্য ও আনন্দের ঢেউ উঠিতেছে। এই প্রভাময় মুহূর্তে আমার হৃদয়ে সঞ্চিত বিষাদ ও হতাশার আবরণ বিদীর্ণ করিয়া এক বিশ্ব ব্যাপ্ত আলোকের প্লাবন বহিয়া গেল।"

[মানুষের ধর্ম হইতে অনূদিত]

"সেই মুহূর্তটি এখনও আমার মনে পড়ে। একদিন বিকালে স্কুল হইতে ফিরিয়া গাড়ি হইতে আসিতেছি হঠাৎ আমাদের ঘরের উপরের বারান্দার পশ্চাতের আকাশ চোখে পাড়িল সেখানে বর্ষণ ভারাক্রান্ত ঘনকৃষ্ণ মেঘের প্রাচুর্য চতুর্দিকে সমৃদ্ধ. শীতল ছায়া বর্ষণ করিতেছে। ইহার অপরূপতায় এবং দাক্ষিণ্যে আমি এমন আনন্দবোধ করিলাম যাহাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে, ইহা সেই মুক্তি যাহা আমরা আমাদের প্রিয় বন্ধুর প্রেমের মধ্যে বোধ করি।"

['শিল্পীর ধর্ম' হইতে অনূদিত]

"পরিণত বয়সে একবার কোন গ্রামে দায়িত্ব পূর্ণ কর্মে নিযুক্ত ছিলাম। সেখানে সময়ের স্রোত অত্যন্ত মন্থর, আনন্দ ও বেদনার মধ্যে অকৃত্রিম এবং আদিম ছায়া ও আলোক। যে দিনটি বিশেষ অর্থান্বিত হইয়া আমার নিকট আসে তাহা সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা পূর্ণ। সকালের সামান্য কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে, স্নানে যাওয়ার পূর্বে মুহূর্তের জন্য জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছি, চোখে পড়িল শুষ্ক নদীর তীরে একটি বাজার। নদীর খাদে প্রথম বর্ষার জল নামিতেছে। অকস্মাৎ আমি আমার অন্তরস্থিত আত্মার চাঞ্চল্য সম্পর্কে সচেতন হইলাম। মুহূর্তের মধ্যে মনে হইল আমার অভিজ্ঞতার জগৎ যেন লঘু হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত তথ্য বিচ্ছিন্ন ও অস্পষ্ট ছিল তাহাদের মধ্যে একটি অর্থময় মহান ঐক্য খুঁজিয়া পাইলাম। কোন লোক যদি তাহার গন্তব্যস্থল না জানিয়া কুয়াশার মধ্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অকস্মাৎ অনুভব

করে যে উহা তাহার চোখের সম্মুখে অবস্থিত তাহা হইলে যে অবস্থা হয়, আমার তখনকার অবস্থা সেইরূপ হইয়াছিল।" [মানুষের ধর্ম হইতে অনূদিত]

"সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম—। আমার সেই পেনেটির বাগানের গুটি কতক দিন, তেতালার ছাতের গুটি কতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটি কতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটি কতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়, এই রকম কতকগুলি উজ্জ্বল সুন্দর স্বর্ণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।" [ছিন্নপত্র]

কোন তত্ত্বালোচনার সূত্র ধরিয়া নয়, সৌন্দর্যবোধকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণে ক্ষণে তিনি এমন একটি লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, যেখান হইতে বাক্য ও মন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

রবীন্দ্রনাথ অপনার জীবনে কত বারবার চেতনার এই সীমাহীন প্রসার বোধ করিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বীকৃতিটিই এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"তবু আমি নিশ্চিত যে এমন একটি মুহূর্ত আসিয়াছে, যখন আমার আত্মা অসীমকে স্পর্শ করিয়াছে এবং আনন্দবোধের বিকাশের ভিতর দিয়া ইহাকে অতি তীব্রভাবে বোধ করিয়াছে। আমাদের উপলব্ধিগুলির মধ্যে এরূপ উক্তি আছে যে চরম সত্য হইতে আমাদের মন ও বচন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। যে উহাকে আপন আত্মার প্রত্যক্ষ আনন্দ বোধের ভিতর দিয়া জানিতে পারে সে সর্ববিধ সংশয় ও ভয় হইতে বাঁচিয়া যায়।" [শিল্পীর ধর্ম হইতে অনূদিত]

[৩]

মন ও বুদ্ধির সীমা ছাড়াইয়া তাহাকে উত্তীর্ণ হইয়াই যে জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ ঘটে, জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান যে কেবলমাত্র ওই লোকেই লাভ করা যায় এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় ছিলেন।

জড়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একদিন প্রাণের প্রকাশ ঘটিয়াছে। প্রাণের এই আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টির এক অভাবিত রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর এই পৃথিবী কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া সূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। এই কক্ষাবর্তনের কালে এক সময় বিশ্ব-প্রাণ-সাগর মথিত করিয়া মানস-লোক ভাসিয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে সৃষ্টি সম্ভাবনার আর একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। আজ তাহার ঐশ্বর্য ও সামর্থ্যও যেন অকস্মাৎ সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

জড়ের মধ্যে প্রাণের এই প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রাণ কোন একটা উপায়ে সুপ্ত বা সংহত অবস্থায় ছিল বলিয়া। জড় একটি পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছাইতে প্রাণের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে। ইহা সম্পূর্ণ আকস্মিক বহিরাগত কোন অস্তিত্ব হইতে পারে না। মানস চেতনা সম্পর্কেও একথা সত্য। অর্থাৎ প্রাণের মধ্যে মানস-চেতনা সুপ্ত ও সংহত অবস্থায় না থাকিলে উহার প্রকাশ কোন প্রকারেই সম্ভব হইত না। প্রাণ একটি পরিণাম লাভ করিয়া তাই মানস-চেতনা রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহা হইলে ইহা সত্য যে জড় প্রাণ ও মনের আধার, এক অচিন্তনীয় মহাশক্তির সুপ্তাবস্থা।

মানুষের উপলব্ধি ও জ্ঞানের সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। এই সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিবে যতদিন পর্যন্ত না মন পূর্ণ পরিণাম লাভ করে।

বিশ্ব অভিব্যক্তির এই ধারা যদি সত্য হয়, তবে মানুষ একদিন মন ও বুদ্ধির সীমাকেও অতিক্রম করিয়া যাইবে। অর্থাৎ মন আপনার পূর্ণ পরিণাম লাভের পর অনিবার্যরূপে উন্নততর চেতনার প্রকাশ ঘটাইবে। অভিব্যক্তির এই প্রীতি দিব্য-চেতনায় পূর্ণ পরিণাম না লাভ করা পর্যন্ত নিরুদ্ধ হইতে পারে না।

মানুষ অন্তরের মধ্যে প্রতিনিয়ত অতৃপ্তি বোধ করে বলিয়াই বুঝা যায়, যে

মনুষ্য-চেতনা মন ও বুদ্ধি অপেক্ষাও উন্নত। তাহা না হইলে এই অতৃপ্তি বোধ জাগিত না। মানুষ আপনার এই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে চায়।

বিশ্ব-বিকাশের এই ধারা একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে মন ও বুদ্ধির উন্নততর পরিণামের দিকে তাহার প্রত্যেকটি ইঙ্গিত, ঐ পরিণাম লাভের জন্য তাহার সকল প্রয়াস।

জড়ের মধ্যে প্রাণ ও মন যেমন সুপ্ত অবস্থায় ছিল, পূর্ণ চেতনাও তেমনি উহার মধ্যে সুপ্ত হইয়া আছে। মন একটা পরিণাম লাভ করিয়া অনিবার্যরূপে উহার প্রকাশ ঘটাইবে। জড় তাই পূর্ণ চেতনারই এক মূর্চ্ছাবস্থা। পূর্ণ চেতনাই আপনার উপর আবরণের পর আবরণ টানিয়া, আপনাকে ক্রামাগত আচ্ছন্ন ও সীমিত করিয়া জড় রূপে সর্বশেষ পরিণাম লাভ করিয়াছে। জড় পূর্ণ চেতনারই সংবৃততম প্রকাশ।

এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের এই সমস্ত কিছু তাই দিব্য-চেতনারই প্রকাশ। এক দিব্য-চেতানই পর্বে পর্বে, পর্যায়ের পর পর্যায়ে মন-প্রাণ-জড় চেতনারূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। উহাই আবার আপনার পূর্ণ স্বরূপ ফিরিয়া লাভ করিতে চলিয়াছে। সুপ্ত দিব্য-চেতনা পর্বে পর্বে আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে জড় হইতে প্রাণে, প্রাণ হইতে মানস চেতনায়। জীবের পূর্ণ পরিণাম অপেক্ষা করিতেছে মনেরও উর্ধ্বতর চেতনা লাভের মধ্যে।

অভিব্যক্তির এই তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথের স্থির বিশ্বাস ছিল। তিনি তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে দান করিয়াছেন। এই সকল আলোচনা হইতে কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সংসারের মাঝখানে সেই ভীষণের রুদ্রলীলা চলছে বলেই তার দুঃসহ দীপ্ত তেজে অভাব থেকে পূর্ণতা, অসাম্য থেকে সামঞ্জস্য, বর্বরতা থেকে সভ্যতা অনিবার্য বেগে উদ্গত হয়ে উঠছে; তারই ভয়ঙ্কর পেষণ ঘর্ষণে রাজ্য সাম্রাজ্য শিল্প সাহিত্য ধর্ম কর্ম উত্তরোত্তর নব নব উৎকর্ষ লাভ করে জেগে উঠছে।"

[সুন্দর : শান্তিনিকেতন]

"সে তার আকারহীন বিপুল বাষ্প সংঘাত থেকে চলতে চলতে আজ মানুষে এসে পৌচেছে এবং এখানেই যে তার চলা শেষ হয়ে গেল এমন মনে করবার কোনো হেতু নেই।" [সুন্দর : শান্তিনিকেতন]

"প্রকৃতির মধ্যে একটি অনিদ্র অভিপ্রায় কেবলই তাকে তার ভাবী উৎকর্ষের দিকে কঠিন বলে আকর্ষণ করে চলেছে ব'লেই তার বর্তমান এমন একটি অব্যর্থ

শৃঙ্খলার মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করতে পারছে। কেবলই তাকে সামঞ্জস্যের বন্ধন ছিন্ন ক'রে ক'রে এগোতেই হচ্ছে, কেবলই তাকে গর্ভাবরণ বিদীর্ণ করে নব নব জন্মে প্রবৃত্ত হতে হচ্ছে।" [সুন্দর : শান্তিনিকেতন]

"এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জাগার মধ্যে দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে। অনন্তের মধ্যে আমাদের এই যে জাগরণ, এই যে নানা দিকের জাগরণ—গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি।***

মনুষ্যত্বের এই যে জাগা, এও কি একটি মাত্র জাগরণ। গোড়াতেই তো আমাদের দেহ শক্তির জাগা আছে—সেই জাগাটাই সম্পূর্ণ হওয়া কি কম কথা। *** তারপর মনের জাগা আছে, হৃদয়ের জাগা আছে, আত্মার জাগা আছে-বুদ্ধিতে জাগা, প্রেমেতে জাগা, ভূমানন্দে জাগা আছে—এই বিচিত্র জাগায় মানুষকে ডাক পড়েছে—যেখানে সাড়া দিচ্ছে না সেইখানেই সে বঞ্চিত হচ্ছে—যেখানে সাড়া দিচ্ছে সেইখানেই ভূমার মধ্যে তার আত্ম উপলব্ধি সম্পূর্ণ হচ্ছে, সেইখানেই তার চারিদিকে শ্রী সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য আনন্দ পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে।"

(জাগরণ : শান্তিনেকেতন)

বিশ্বলীলার মধ্যে অভিব্যক্তির রূপটিকে তিনি এইভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন,

"আমি শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রটা কোন কাল থেকে কেবল ভেরী বাজাচ্ছে আর পৃথিবীতে তারই উত্থান-পতনের সঙ্গে জীবের ইতিহাস যাত্রা চলেছে আবির্ভাবের অস্পষ্টতা থেকে তিরোভাবের অদৃশ্যের মধ্যে। একদল বিপুলকায় বিরাটকার প্রাণী যেন সৃষ্টিকর্তার দুঃস্বপ্নের মতো, দলে দলে এল আবার মিলিয়ে গেল। তারপরে মানুষের ইতিহাস কবে শুরু হল প্রদোষের ক্ষীণ আলোতে, গুহা গহ্বরের অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায়।*** একটি জগৎ জোড়া কলক্রন্দন শুনতে পাচ্ছি বটে, সেই ক্রন্দন ভরিয়ে তুলছে অন্তরীক্ষকে, যে অন্তরীক্ষের উপর বিশ্ব রচনার ভূমিকা, যে অন্তরীক্ষকে বৈদিক ভারত নাম দিয়েছে ক্রন্দসী। এ কিন্তু শ্রান্তিভারাতুর পরাভবের ক্রন্দন নয়। এ নবজাত শিশুর ক্রন্দন, যে শিশু উর্দ্ধস্বরে বিশ্বদ্বারে আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করে। তার প্রথম

ক্রন্দিত নিশ্বাসেই জানায়, 'অয়মহংভোঃ'। অসীম ভাবীকালের দ্বারে সে অতিথি। অস্তিত্বের ঘোষণায় একটা বিপুল কান্না আছে। কেননা বারে বারে তাকে ছিন্ন করতে হয় আবরণ, চূর্ণ করতে হয় বাধা। অস্তিত্বের অধিকার পড়ে পাওয়া জিনিস নয়, প্রতি মুহূর্তেই সেটা লড়াই করে নেওয়া জিনিস। তাই তার কান্না এত তীব্র, আর জীবলোক থেকে সকলের চেয়ে তীব্র মানব সত্তার নবজীবনের কান্না। সে যেন অন্ধকারের গর্ভ বিদারণ করা নবজাত আলোকের ক্রন্দন ধ্বনি। তারই সঙ্গে সঙ্গে নব নব জন্মে নব নব যুগে দেব লোকে বাজে মঙ্গল শঙ্খ, উচ্চারিত বিশ্বপিতামহের অভিনন্দন মন্ত্র।"

[পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, সেখানে মানুষ মন ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটাইতেছে, তাহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতেছে এবং এইরূপে পরিণামে মন ও বুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে চাহিতেছে। এই কয়েকটি উক্তির মধ্যে মনুষ্য-জীবনের সেই পর্যায়ের পরিচয় মিলিবে।

"দুর্গমের দিকে, গোপনের দিকে, গভীরতার দিকে, মানুষের সত্তাকে যখন টানে তখন মানুষ বড়ো হয়ে ওঠে, ভূমার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি মানুষের চিত্ত সর্বতোভাবে জাগ্রত হতে থাকে।"

"মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত, সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তার সঙ্গেই কারবার করে। সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহা-লোকেই তার লোক"।

"হে গুহাহিত আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে তুমি তার চিরন্তন বন্ধু, প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশা-পাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ। সেই ছায়া গভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোনো ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের সেই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই সঙ্গীত ললিতকলা অনির্ব্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ়বন্ধনকে ছিন্ন করছে, তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।"

যে অন্তর্লোকে চেতনা এইরূপ গভীর হইতে গভীরতর, ব্যাপক হইতে

ব্যাপকতর ব্যাপ্তি লাভ করিয়া চলে, তাহাই অধ্যাত্ম-লোক। মানুষ ইহাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছে তাহার জীবন ততই সকল দিকে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। অন্তরের ক্রম প্রসারিত সৌন্দর্য লোককে বাহিরে রূপায়িত করিয়া বহির্বিশ্বকে সে ক্রমাগত সুন্দর করিয়া তুলিতেছে। এমনি করিয়া মানুষ অন্তরের পথ বাহিয়াই একদিন পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে সমর্থ হইবে। চেতনাকে বাহিরে অনন্তকাল প্রসারিত করিয়াও মানুষ এই পূর্ণ পরিণাম কখন লাভ করিতে পারিবে না।

পূর্ণ চেতনা-লোক হইতে জাগতিক সর্ব নিম্ন পর্যায় জড় জগৎ পর্যন্ত সর্বত্র একই চেতনার লীলা। পূর্ণতা সকল পর্যায়ে বিরাজ করিতেছে। এই পূর্ণ চেতনা এবং তাহাকে ক্রম পরিমাণ স্বরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে যে তত্ত্ব, ইহার নাম ও স্বরূপ যাহাই হোক না কেন,—এই উভয়ের অবিচ্ছেদ্য মিলন চেতনার সকল পর্যায়ে। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ পরম সত্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিব্য-চেতনায় এই আবরণ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত, জড়ে এই আবরণ সর্বাধিক।

অভিব্যক্তি এই আবরণের ধীর উন্মোচন। দ্বৈতবোধ তাই চেতনার সকল স্তরে। এক দিব্য-চেতনা যে-কোন দ্বৈতবোধ শূন্য।

পূর্ণ-চেতনা ছাড়া এই যে অপর সত্তা, শঙ্করাচার্য ইহাকে বলিয়াছেন মায়া। এই মায়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা তিনি যে ভাবেই করুন না কেন, তাঁহার মতে উহা যে পূর্ণ চেতনা বিবিক্ত অপর কোন সত্তা তাহাতে সংশয় নাই।

তন্ত্র ইহাকে দিব্য-চেতনার শক্তি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। শক্তি ও শক্তিমান যেমন অভিন্ন, তেমন স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন। প্রকৃতি দিব্য-চেতনার চিৎ শক্তি। তাহা দিব্য চেতনাকে আবৃত বা সীমিত করিয়া অন্তহীন রূপ উৎসারিত করিতেছে।

সর্বোচ্চ চেতনা-লোক হইতে সর্বনিম্ন চেতনা-লোক পর্যন্ত এক পূর্ণ-চেতনার লীলা। বিকাশের তারতম্য অনুসারে বিশ্বের অনন্ত চেতনা বৈচিত্র্য।

বিশ্ব অভিব্যক্তির একটি ইতিহাস আছে। এই ইতিহাস ঊর্ধ্ব পরিণামের একটি ধারাকে সুস্পষ্ট করিয়া তুলে। চেতনার সর্বনিম্ন প্রকাশ জড়ের মধ্যে, প্রাণে তাহার ঊর্ধ্বতর প্রকাশ। প্রাণেরও ঊর্ধ্বতর প্রকাশ মানস-লোকে। মানুষের মধ্যে যাঁহারা মনস্বী ব্যক্তি, ঋষি ও দার্শনিক, তাঁহাদের মধ্যে এই চেতনা সমধিক বিকশিত। ইঁহাদের মধ্যে আবার দুই একজন আছেন, যাঁহাদের জীবনে চেতনার পূর্ণ লীলা প্রত্যক্ষ করা যায়।

চেতনার এই যে একের পর এক উন্নততর পর্যায়, উহাদের প্রত্যেকের ধর্ম বিভিন্ন। উন্নততর চেতনা নিম্নতর চেতনার প্রসার নয়। উভয়ের ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। জড়ের ধর্মকে যতই প্রসারিত করা যাক-না-কেন তাহার মধ্যে প্রাণের ধর্ম কোথাও পরিলক্ষিত হইবে না। প্রাণ-ধর্মকে যদৃচ্ছা প্রসারিত করিলেও মনোধর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। মনকে যদৃচ্ছা প্রসারিত করিয়াও তাই দিব্য-চেতনা লাভ করিতে পারা যায় না।

মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাস অভিব্যক্তির এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। অভিব্যক্তির এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলিয়াই ইতিহাসের মূল্য, তাহা না হইলে ইতিহাস অর্থহীন। বস্তুত ঐতিহাসিক বোধ বলিতে অভিব্যক্তির এই বোধটিকে বুঝায়। জীব ও জগৎ এমনি করিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার যুগ হইতে দিব্য প্রভাতের দিকে তাহার এই ধীর ক্লান্তিহীন পরিক্রমণ। তাহার এই যাত্রা ফুরাইয়া যায় নাই।

নিহিত এই অভিপ্রায়, এই ক্রম পরিণামের দিক হইতে যদি বিশ্ব-রচনা পাঠ না করা যায় তাহা হইলে বিশ্ব ব্যাপার অকারণ, উদ্দেশ্যহীন, শৃঙ্খলাশূন্য আবর্তন মাত্রে পর্যবসিত হয়। বস্তুত সমগ্র বিশ্ব ব্যাপারের পশ্চাতে একটি স্থির উদ্দেশ্য সক্রিয়। উহা ক্রমাগত চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে।

অভিব্যক্তি প্রেরণা আজ মনুষ্য-সমাজকে বর্তমান পরিণাম পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মানুষের মধ্যেই চেতনা বিকাশের কত-না পর্যায়। মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বতর পরিণাম এখনও অবশিষ্ট আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রেরণা ক্রমিক ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভ করিয়া মানস-লোক পর্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, সেই প্রেরণাই একদিন মানুষকে ইহার ঊর্ধ্বতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

মানুষের মধ্যে চেতনার এই যে বিভিন্ন লোক মানুষ ইহার যে কোন একটিতে বাস করিতে পারে। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের চিন্তা ও অনুভূতি ভিন্ন, কর্ম্মপ্রেরণাও পৃথক পৃথক। একটি জগতের সহিত আর একটি জগতের কোন মিল নাই।

মানস-লোক পর্য্যন্ত জীব-বিকাশ মুখ্যত প্রকৃতি প্রভাবাধীন। মানস-লোক প্রকৃতি প্রভাবের শেষ সীমা। মনুষ্য-চেতনার একদিকে আছে দিব্য-চেতনা অন্যদিকে প্রকৃতি। মানুষ এই উভয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

"যে চেতনার ক্রমাভিব্যক্তি তত্ত্বটি জানে, তাহার চেতনা আরও বিকাশ লাভ করে। গুল্ম, তরু ও জীবের মধ্যে একই চেতনার ক্রমিক উন্নততর প্রকাশ।

তরু ও গুল্মের মধ্যে কেবল প্রাণের প্রকাশ, কিন্তু হৃদয় ও চৈতন্যের প্রকাশ কেবল জীবের মধ্যে। চেতনা সম্পন্ন জীবের মধ্যে আবার আত্মা ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষের মধ্যে চিত্ত ও চৈতন্যের প্রকাশ দেখা গেলেও অন্য কোন প্রকার চেতনা উহাদের মধ্যে নাই। মানুষের মধ্যে আত্মা ক্রমিক বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। সে জ্ঞানের সর্বাধিক অধিকারী। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা সে জানে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্ত জগৎ তাহার পরিচিত।" [ঐতরেয় আরণ্যক]

শিল্পী যেমন করিয়া তাহার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে কর্ম আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলে, গায়ক যেমন করিয়া তাহার অন্তরের অনির্বচনীয় আনন্দকে সুরের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ করে, কবি তাহার অব্যক্ত ভাবনাকে বাণী-বন্ধনের ভিতর দিয়া যেমন ব্যক্ত-রূপ দান করে, ঈশ্বর তেমনি তাঁহার অপ্রমেয় আনন্দকে দেশ কালের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সকল রূপের পশ্চাতে রহিয়াছে এক আনন্দ প্রেরণা। তাহা একদিকে ব্যাপ্তির প্রেরণা, নিত্যনূতন রূপ সৃষ্টির পশ্চাতে যে প্রেরণা ক্রিয়াশীল, অন্যদিকে একই মুহূর্তে তাহা আবার সমাপ্তির প্রেরণা,—যাহা সকল রূপকে প্রতি মুহূর্তে এক অনন্ত সুষমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন, তিনি একদিকে অসম্ভূতি, দেশ-কালের অতীতে যিনি এক, অন্যদিকে তিনি সম্ভূতি, দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে যিনি বিভক্ত। সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি—এই উভয়কে মিলিত করিয়া দেখাই পূর্ণ দেখা।

"যিনি আনন্দ স্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশ-কালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।" [কর্মযোগ : শান্তিনিকেতন]

"উপনিষদ্ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশ-কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তবে সত্য করতে হবে।" [মানুষের ধর্ম]

ভারতীয় জ্ঞান এবং ভক্তি সাধনা সীমা ও অসীমের এই যোগের তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

উপনিষদ্ যে ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের সকল সাধনার পূর্ণ প্রকাশ। তাঁহার সহিত তাই মানুষ মিলিত হইতে পারে

চেতনার এই যে একের পর এক উন্নততর পর্যায়, উহাদের প্রত্যেকের ধর্ম বিভিন্ন। উন্নততর চেতনা নিম্নতর চেতনার প্রসার নয়। উভয়ের ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। জড়ের ধর্মকে যতই প্রসারিত করা যাক-না-কেন তাহার মধ্যে প্রাণের ধর্ম কোথাও পরিলক্ষিত হইবে না। প্রাণ-ধর্মকে যদৃচ্ছা প্রসারিত করিলেও মনোধর্মের সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে না। মনকে যদৃচ্ছা প্রসারিত করিয়াও তাই দিব্য-চেতনা লাভ করিতে পারা যায় না।

মনুষ্য সভ্যতার ইতিহাস অভিব্যক্তির এই তত্ত্বটিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে। অভিব্যক্তির এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলিয়াই ইতিহাসের মূল্য, তাহা না হইলে ইতিহাস অর্থহীন। বস্তুত ঐতিহাসিক বোধ বলিতে অভিব্যক্তির এই বোধটিকে বুঝায়। জীব ও জগৎ এমনি করিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। অন্ধকার যুগ হইতে দিব্য প্রভাতের দিকে তাহার এই ধীর ক্লান্তিহীন পরিক্রমণ। তাহার এই যাত্রা ফুরাইয়া যায় নাই।

নিহিত এই অভিপ্রায়, এই ক্রম পরিণামের দিক হইতে যদি বিশ্ব-রচনা পাঠ না করা যায় তাহা হইলে বিশ্ব ব্যাপার অকারণ, উদ্দেশ্যহীন, শৃঙ্খলাশূন্য আবর্তন মাত্রে পর্যবসিত হয়। বস্তুত সমগ্র বিশ্ব ব্যাপারের পশ্চাতে একটি স্থির উদ্দেশ্য সক্রিয়। উহা ক্রমাগত চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে।

অভিব্যক্তি প্রেরণা আজ মনুষ্য-সমাজকে বর্তমান পরিণাম পর্যন্ত টানিয়া আনিয়াছে। মানুষের মধ্যেই চেতনা বিকাশের কত-না পর্যায়। মন ও বুদ্ধির ঊর্ধ্বতর পরিণাম এখনও অবশিষ্ট আছে। প্রকৃতির মধ্যে যে প্রেরণা ক্রমিক ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভ করিয়া মানস-লোক পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে, সেই প্রেরণাই একদিন মানুষকে ইহার ঊর্ধ্বতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

মানুষের মধ্যে চেতনার এই যে বিভিন্ন লোক মানুষ ইহার যে কোন একটিতে বাস করিতে পারে। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ের চিন্তা ও অনুভূতি ভিন্ন, কর্ম্মপ্রেরণাও পৃথক পৃথক। একটি জগতের সহিত আর একটি জগতের কোন মিল নাই।

মানস-লোক পর্য্যন্ত জীব-বিকাশ মুখ্যত প্রকৃতি প্রভাবাধীন। মানস-লোক প্রকৃতি প্রভাবের শেষ সীমা। মনুষ্য-চেতনার একদিকে আছে দিব্য-চেতনা অন্যদিকে প্রকৃতি। মানুষ এই উভয়ের সংযোগস্থলে অবস্থিত।

"যে চেতনার ক্রমাভিব্যক্তি তত্ত্বটি জানে, তাহার চেতনা আরও বিকাশ লাভ করে। গুল্ম, তরু ও জীবের মধ্যে একই চেতনার ক্রমিক উন্নততর প্রকাশ।

তরু ও গুল্মের মধ্যে কেবল প্রাণের প্রকাশ, কিন্তু হৃদয় ও চৈতন্যের প্রকাশ কেবল জীবের মধ্যে। চেতনা সম্পন্ন জীবের মধ্যে আবার আত্মা ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষের মধ্যে চিত্ত ও চৈতন্যের প্রকাশ দেখা গেলেও অন্য কোন প্রকার চেতনা উহাদের মধ্যে নাই। মানুষের মধ্যে আত্মা ক্রমিক বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। সে জ্ঞানের সর্বাধিক অধিকারী। ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা সে জানে। দৃষ্ট ও অদৃষ্ট সমস্ত জগৎ তাহার পরিচিত।" [ঐতরেয় আরণ্যক]

শিল্পী যেমন করিয়া তাহার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে কর্ম আশ্রয় করিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলে, গায়ক যেমন করিয়া তাহার অন্তরের অনির্বচনীয় আনন্দকে সুরের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ করে, কবি তাহার অব্যক্ত ভাবনাকে বাণী-বন্ধনের ভিতর দিয়া যেমন ব্যক্ত-রূপ দান করে, ঈশ্বর তেমনি তাঁহার অপ্রমেয় আনন্দকে দেশ কালের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সকল রূপের পশ্চাতে রহিয়াছে এক আনন্দ প্রেরণা। তাহা একদিকে ব্যাপ্তির প্রেরণা, নিত্যনূতন রূপ সৃষ্টির পশ্চাতে যে প্রেরণা ক্রিয়াশীল, অন্যদিকে একই মুহূর্তে তাহা আবার সমাপ্তির প্রেরণা,—যাহা সকল রূপকে প্রতি মুহূর্তে এক অনন্ত সুষমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া তুলিতেছে।

উপনিষদ্ বলিয়াছেন, তিনি একদিকে অসম্ভূতি, দেশ-কালের অতীতে যিনি এক, অন্যদিকে তিনি সম্ভূতি, দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে যিনি বিভক্ত। সম্ভূতি এবং অসম্ভূতি—এই উভয়কে মিলিত করিয়া দেখাই পূর্ণ দেখা।

"যিনি আনন্দ স্বরূপ, মুক্ত, তিনিই নিয়মের বন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশ-কালে আপনাকে প্রকাশ করছেন।" [কর্মযোগ : শান্তিনিকেতন]

"উপনিষদ্ বলেন, অসম্ভূতি ও সম্ভূতিকে এক করে জানলেই তবে সত্য জানা হয়। অসম্ভূতি যা অসীমে অব্যক্ত, সম্ভূতি যা দেশ-কালে অভিব্যক্ত। এই সীমায় অসীমে মিলে মানুষের সত্য সম্পূর্ণ। মানুষের মধ্যে যিনি অসীম তাঁকে সীমার মধ্যে জীবনে সমাজে ব্যক্ত করে তুলতে হবে। অসীম সত্যকে বাস্তবে সত্য করতে হবে।" [মানুষের ধর্ম]

ভারতীয় জ্ঞান এবং ভক্তি সাধনা সীমা ও অসীমের এই যোগের তত্ত্বটিকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে।

উপনিষদ্ যে ঈশ্বরের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে মানুষের মনুষ্যত্বের সকল সাধনার পূর্ণ প্রকাশ। তাঁহার সহিত তাই মানুষ মিলিত হইতে পারে

আপনার পূর্ণতা সাধনের, মনুষ্যত্বের সকল ধর্মের চরমোৎকর্ষ সাধনের ভিতর দিয়া। মনুষ্যত্ব বিকাশের সকল সাধনাকে অস্বীকার করিয়া কোন একটি বিশেষ সিদ্ধি লাভের চেষ্টার ভিতর দিয়া তাঁহাকে তাই লাভ করিতে পারা যায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় নৈষ্কর্ম ও নির্মমতাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া বোধ করেন। তাঁহারা যে সোহং তত্ত্বের কথা বলেন, তাহা নিখিল মানব সমাজের মধ্যে ধীরে প্রকাশমান মনুষ্যত্ব নয়, তাহা সেই বিশ্ব-মানব, বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মনের তত্ত্ব নয়, যাহা মানুষের সকল অতীত ও বর্তমান ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। সমগ্র মানব প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিবার চেষ্টায় তাঁহারা দেহকে পীড়ন করেন, বুদ্ধি, মন ও হৃদয়ের সকল বৃত্তিকে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, এমন কি কর্মের স্বাধীন দায়িত্বকেও অস্বীকার করেন। যে আত্মাকে তাঁহারা লাভ করিতে চান তাহা সকলের সহিত যুক্ত প্রকাশ নয়।

ভক্তি সাধনার ক্ষেত্রেও জীবনের সকল কর্মকে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি হৃদয়বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া অথবা ভাব সম্ভোগের ভিতর দিয়া অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টাই লক্ষ্য করা যায়।

সুদূর অতীত কাল হইতে বিপুল মানব-সমাজের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া তাহার সকল প্রয়াস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সাধনা, ভাবনা প্রকাশের বিচিত্র চেষ্টার ভিতর দিয়া যে একটি সুনির্দ্দিষ্ট অভিপ্রায় রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ইহা কেবল অনির্দিষ্ট, ফল পরিণাম বিহীন, নিরর্থক আবর্তন মাত্র নয়। মানব সংসার জুড়িয়া এত বড় সত্যের ধীর প্রকাশকে তাই অস্বীকার করিবার স্পর্ধা প্রমত্ততা মাত্র।

"ভূমা থেকে উৎশিষ্ট যে শ্রেষ্ঠতার কথা অথর্ব্ববেদ বলেছেন সে কোনো একটি-মাত্র বিশেষ সিদ্ধিতে নয়। মানুষের সকল তপস্যাই তার মধ্যে, মানুষের বীর্য্যং লক্ষ্মীর্বলং সমস্ত তার অন্তর্গত। মনুষ্যত্বের বহুধা বৈচিত্র্যকে একটি মাত্র বিন্দুতে সংহত ক'রে নিশ্চল করলে হয়তো তার আত্মভোলা একটি আনন্দ আছে। কিন্তু ততঃ কিম্। কী হবে সে আনন্দে। সে আনন্দকে বলব না শ্রেয়, বলব না চরম সত্য। সমস্ত মানব সংসারে যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছে, অপমান আছে, ততক্ষণ কোনো একটিমাত্র মানুষ নিষ্কৃতি পেতে পারে না।"

[মানুষের ধর্ম্ম]

"আমাদের দেশে এমন সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোহহং তত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্মে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে

পীড়ন করেন জীব প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করবার জন্যে, মানুষের স্বাধীন দায়িত্বও ত্যাগ করেন মানব প্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্দ্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাঁকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সবকিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তাঁর মধ্যে কর্ম তত্ত্ব নেই। তাঁরা জানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ড কর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ—যাঁর মধ্যে জ্ঞান শক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞান শক্তি ও কর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।"

[মানুষের ধর্ম]

"সমস্ত মানুষে মিলে রৌদ্রে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে কালে কালে মানব মাহাত্মের যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করছে কে মনে করে সেই সুমহৎ সৃষ্টি ব্যাপার থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে নিভৃতে বসে আপনার মনে কোন একটা ভাব-রস সম্ভোগে মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলন, এবং সেই সাধনাই ধর্মের চরম সাধনা! * * * বিপুল ইতিহাসের দুর্গম দুরত্যয় পথে মানবাত্মার এই যে বিজয় রথ অহোরাত্র পৃথিবীকে কম্পান্বিত করে চলেছে তুমি কি অসাড় হয়ে চোখ বুজে বলতে চাও তার কেউ সারথি নেই? তাকে কেউ কোনো মহৎ সার্থকতার দিকে চালনা করে নিয়ে যাচ্ছে না? * * * কে বলতে চায় আমি মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদূরে পালিয়ে গিয়ে নিষ্ক্রিয়তার মধ্যে, নিশ্চেষ্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তাঁর সঙ্গে মিলব। কে বলতে চায় এই সমস্তই মিথ্যা—এই বৃহৎ সংসার, এই নিত্য বিকাশমান মানুষের সভ্যতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ করে আপনার সকল প্রকার শক্তিকে জয়যুক্ত করবার জন্যে মানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা, এই পরম দুঃখের এবং পরম সুখের সাধনা। যে লোক এই সমস্তকেই মিথ্যা বলে কত বড়ো মিথ্যা তার চিত্তকে আক্রমণ করেছে। এত বড়ো বৃহৎ সংসারকে এত বড়ো ফাঁকি বলে যে মনে করে সে কি সত্য স্বরূপ ঈশ্বরকে সত্যই বিশ্বাস করে। যে মনে করে পালিয়ে গিয়ে তাঁকে পাবে, কোথায় তাঁকে পাবে, পালিয়ে গিয়ে কতদূরে সে যাবে, পালাতে পালাতে একেবারে শূন্যতার মধ্যে গিয়ে পৌঁছবে এমন সাধ্য তার আছে কি!" [কর্মযোগ : শান্তিনিকেতন]

মানুষের পূর্ব পর্যন্ত চেতনা বিকাশের যে পর্যায় তাহাতে বিকাশ প্রেরণার

উপর জীবের কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। সে প্রেরণার ক্ষেত্রে তাহারা ছিল আত্ম-কর্তৃত্ব শূন্য। মনোধর্ম বিশিষ্ট মানুষের পর্যায়ে আসিয়া এই বিকাশ তত্ত্ব কতকটা ভিন্নধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ মানুষের ক্ষেত্রে এই বিকাশের প্রেরণা আত্ম কর্তৃত্ব শূন্য নয়। ইহার পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে ঈশ্বর ও মানুষ এক যোগে কর্ম করিবে।

স্বর্গ কোন বিশেষ দেশ-কালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া নাই, কোন মানুষের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটে নাই। স্বর্গ নীহারিকা রূপে মানুষের অন্তরে আছে। তাহাকে কর্মের ভিতর দিয়া বহির্বিশ্বে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। অসীমের সম্পদকে এইরূপে সীমায় সত্যরূপে প্রকাশ করিতে হইবে।

এই নিরন্তর প্রয়াসের ভিতর দিয়া মনুষ্য সমাজ সেই পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে, যে পরিণামে সমাজে কোন একটিমাত্র মানুষও অনাহার পীড়িত নয়, একটিমাত্র মানুষের মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত নয়, কোন একটিমাত্র মানুষ অশিক্ষার অন্ধকারে নিমগ্ন নয়।

"মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে ; কী করলে সে স্বর্গলোকের অধিকারী হতে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু, স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমার স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এতদিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে। সে সংসারকে ত্যাগ করে কেবলই দূরে দূরে গিয়ে নিস্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে। * * * কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে। না, তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব, আর সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার মধ্যেই আমার স্বর্গ সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভক্তি তোমার আত্ম- নিবেদনের অপেক্ষায় এত বড়ো একটা চরম সৃষ্টি হতে পারে নি। সর্ব-শক্তিমান এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, এক জায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে করে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গ রচনাই অসম্পূর্ণ রইল। এই জন্যে যে তিনি যুগ যুগান্ত ধরে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কতকাল ধরে অপেক্ষা করেন নি। আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী এমন

শস্য শ্যামলা হয়েছে, কত বাষ্প দহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশ শীতল হয়ে তারপরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে। তখন তার বক্ষে এমন আশ্চর্য্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটে নি। আজ নীল আকাশের নীচে পৃথিবীর কি অপরূপ সৌন্দর্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠে নি। তাঁর সেই রচনা কার্য্যে তিনি আমাদের সঙ্গে বসে গিয়েছেন; কিন্তু আমরা কেবল খাব, পরব, সঞ্চয় করব, এই বলে বলে সমস্ত ভুলে বসে রইলুম।" [সৃষ্টির অধিকার ঃ শান্তিনিকেতন]

মানুষ আপনার অন্তরের মধ্যে সার্বজনীন বিশ্ব মানবকে যতই লাভ করিতেছে তাহার সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি বহুবিচিত্র সৃষ্টি-রূপ ততই অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা লাভ করিতেছে, তাহার সামর্থ সীমা ততই প্রসারিত হইয়া যাইতেছে। তাহার কর্ম ঈশ্বরীয় কর্মের ন্যায় বিশ্ব-কর্ম হইয়া উঠিতেছে, তাহার জ্ঞান ঈশ্বরের ন্যায় ততই স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত হইয়া উঠিতেছে, তাহার শক্তি, তাহার প্রেম, ভক্তি ততই অপরিমেয় হইয়া উঠিতেছে।

"—নিয়মেই যেমন আনন্দের প্রকাশ, কর্মেই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতরেই আপনার প্রকাশ হতে পারে না বলেই আনন্দ বাহিরের নিয়মকে ইচ্ছা করে, তেমনি আপনার ভিতরেই আপনার মুক্তি হতে পারে না বলেই আত্মা মুক্তির জন্যে বাহিরের কর্মকে চায়। মানুষের আত্মা কর্মেই আপনার ভিতর থেকে আপনাকে মুক্ত করছে, তাই যদি না হত তা হলে কখনো সে ইচ্ছা করে কর্ম করত না।

মানুষ যতই কর্ম করছে ততই সে আপনার ভিতরকার অদৃশ্যকে দৃশ্য করে তুলছে, ততই সে আপনার সুদূরবর্তী ক্রমাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে। এই উপায়ে মানুষ আপনাকে কেবলই স্পষ্ট করে তুলছে—মানুষ আপনার নানা কর্মের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, আপনাকেই নানা দিক থেকে দেখতে পাচ্ছে।" [কর্মযোগ ঃ শান্তিনিকেতন]

"মানুষ আপনার মধ্যে যে একটি পরম ইচ্ছাকে পাইয়াছে, যে ইচ্ছা কোনো মতেই অল্পকে মানিতে চায় না, তাহা দুঃসহ তপস্যার মধ্য দিয়া জ্ঞানে বিজ্ঞানে শিল্পে সাহিত্যে মানুষের চিত্তকে আনন্দময় মুক্তির অভিমুখে কেবলই প্রবাহিত করিয়া চলিয়াছে এবং তাহা প্রেম ভক্তি ও পবিত্রতায় মানুষের সমস্ত চেতনা-

ধারাকে এক অপরিসীম অতল স্পর্শ অমৃত পারাবারের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া দিতেছে। মানুষের সেই পরম গতিকে যাহা কিছু বাধা দেয়, যাহা তাহাকে বিপরীত দিকে টানে, তাহাই পাপ, তাহাই দুর্গতি, তাহাই তাহার মহতী বিনষ্টি।" [দুই ইচ্ছা : পথের সঞ্চয়]

বিশ্ব মনের সহিত সকল মন যুক্ত বলিয়া সমাজে কোন একটি মাত্র মানুষ অসম্পূর্ণ থাকা পর্যন্ত একক ভাবে কোন মানুষ মুক্তি লাভ করিতে পারে না। বন্ধন যেমন মুক্তি তেমনি যোগের তত্ত্ব। মুক্তি একমাত্র বিশ্ব মানবের সহিত যোগেই সম্ভব।

বিশ্ব আমি, বিশ্বমন বা বিশ্ব-মানব লক্ষকোটি বিচ্ছিন্ন আমি, মন বা মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে ধীরে প্রকাশ করিতেছে। এই প্রেরণার ভিতর দিয়া মনুষ্য-চেতনা এমন এক পরিণাম লাভ করিতে পারে যে পরিণামে সে আপনাকে সকল মনুষ্য-চেতনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেখে। মহাপুরুষদের জীবনে আমরা ইহার নানা প্রকাশ দেখিতে পাই। এই প্রকাশ একদিন প্রত্যেকটি নর নারীর মধ্যে সত্য হইবে।

"সেই পিতৃতম বিশেষ কোনো স্বর্গে নেই, বিশেষ কোনো দেশ-কালে বদ্ধ ইতিহাসে নেই, ইনি বিশেষ কোনো একটি মানুষে একদা অবতীর্ণ নন, ইনি প্রেমের সম্বন্ধে মানুষের ভূত ভবিষ্যতকে পূর্ণ করে আছেন নিখিল মানব লোকে।" [মানুষের ধর্ম]

"যে আমি সকলের সেই আমিই আমারও এটি সত্য, কিন্তু এই সত্যকেই আপন করাই মানুষের সাধনা। মানুষের ইতিহাসে চিরকাল এই সাধনাই নানা রূপে নানা নামে নানা সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে চলেছে। যিনি পরম আমি, যিনি সকলের আমি, সেই আমিকেই আমার বলে সকলের মধ্যে জানা যে পরিমাণে আমাদের জীবনে, আমাদের সমাজে উপলব্ধ হচ্ছে সেই পরিমাণেই আমরা সত্য মানুষ হয়ে উঠছি।" [মানুষের ধর্ম]

"সকল মানুষের মন সমষ্টিভূত হয়ে বিশ্ব মানব মনের মহাদেশ সৃষ্ট, একথা বলব না। ব্যক্তি মন বিশ্ব মনে আশ্রিত কিন্তু ব্যক্তি মনের যোগফল বিশ্বমন নয়। তাই যদি হত তা হলে যা আছে তাই হত একান্ত, যা হতে পারে তার জায়গা পাওয়া যেত না। অথচ, যা হয়নি, যা হতে পারে, মানুষের ইতিহাসে তারই জোর তারই দাবি বেশি। তারই আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার হয়ে মানুষের

সভ্যতাকে যুগে যুগে বর্তমানের সীমা পার করিয়ে দিচ্ছে। সেই আকাঙ্ক্ষা শিথিল হলেই সত্যের অভাবে সমাজ শ্রীহীন হয়।" [মানুষের ধর্ম]

"জগতের বিপুল অভিব্যক্তিতে প্রথম অর্থ দেখলুম প্রাণ কণায়, তারপরে জন্তুতে, তারপরে মানুষে। বাহির থেকে অন্তরের দিকে একে একে মুক্তির দ্বার খুলে যেতে লাগল। মানুষে এসে যখন ঠেকল তখন যবনিকা উঠতেই জীবকে দেখলুম তার ভূমায়। দেখলুম রহস্যময় যোগের তত্ত্বকে, পরম ঐক্যকে। মানুষ বলতে পারলে, যারা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।" [মানুষের ধর্ম]

"মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মহাপুরুষদের দেখি। তাঁদের থেকে এই কথাটাই বুঝি যে, সমস্ত মানুষের অন্তরেই কাজ করছে অভিব্যক্তির প্রেরণা। সে ভূমার অভিবক্তি। জীব মানব কেবলই তার অহং আবরণ মোচন ক'রে আপনাকে উপলব্ধি করতে চাচ্ছে বিশ্বমানবে। বস্তুত সমস্ত পৃথিবীরই অভিব্যক্তি আপন সত্যকে খুঁজছে সেইখানে, এই বিশ্ব পৃথিবীর চরম সত্য সেই মহামানবে।" [মানুষের ধর্ম]

"সোঽহং সমস্ত মানুষের সম্মিলিত অভিব্যক্তির মন্ত্র, কেবল একজনের না।" (মানুষের ধর্ম)

এই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সমগ্র মনুষ্য-সমাজ একদিন দিব্য-চেতনা লাভে সমর্থ হইবে। যুগে যুগে ধর্ম ও দর্শন মানুষকে এই প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে। এই জগৎ দিব্য-জগতে সম্পূর্ণতা লাভ করিবে, এই জীবন দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত হইবে। যুগে যুগে ঋষি ও দার্শনিক মানুষকে এই আশ্বাস দিয়াছে। ইহা তাই মানুষের অলস কল্পনা নয়, বাস্তববোধহীন আশাবাদ মাত্র নয়, মানুষের শুদ্ধ জ্ঞানের উপর এই উপলব্ধির প্রতিষ্ঠা। এই দিব্য-সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ যুগে যুগে আত্মত্যাগ করিয়াছে, মানুষের বিচিত্র সাধনা এই লক্ষ্যাভিমুখীন হইয়া ফুটিয়াছে।

তাহার সাহিত্য ও কলা, তাহার ধর্ম ও দর্শন, তাহার বিশ্বাস ইহাকেই ক্রমাগত সত্য করিয়া তুলিয়াছে। ইহার বিপরীতমুখী যে-কোন প্রেরণা, যাহা মানুষের স্বার্থের দিক, লোভের দিক, পাপের দিক তাহাকে মানুষ একদিন সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠিবে।

বিশ্ব অভিব্যক্তির মর্মস্থলে সম্পূর্ণতার একটি স্থির ধ্যান আছে। মানুষের এই লক্ষ্যাভিমুখীন প্রয়াসই ধর্ম, ইহার বিপরীতমুখী যে-কোন প্রেরণা অধর্ম।

মানুষকে এই ধর্মাশ্রয়ী হইতে হইবে। বিকাশের স্বাভাবিক প্রেরণাগুলির মধ্যে অধিকতর শক্তি সঞ্চারিত করিয়া মনুষ্য-সমাজের ধীর পরিণামকে দ্রুততর করিয়া তুলিতে হইবে। যে চেতনা এই সম্পূর্ণতা সাধন করিতে চায় এই জীবনকে তাহার অভিপ্রায়ের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। তাহা হইলে এই দিব্য সমাজের স্বপ্ন অচিরেই সফল হইবে।

এই দিব্য-সমাজের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ যে নানাভাবেই দেখিবেন তাহা একান্ত স্বাভাবিক। তাঁহার এই স্বপ্নের পরিচয় ছড়াইয়া রহিয়াছে তাঁহার নানা রচনার মধ্যে।

"আমি বিশ্বাস করি যে সূর্যালোকে, ধরিত্রীর শ্যামলিমায়, নর-নারীর মুখের সৌন্দর্যে, মনুষ্য জীবনের ঐশ্বর্যে আপাত তুচ্ছ এবং অবহেলিত সামগ্রীর মধ্যেও স্বর্গ-লোকের ছবি দেখা দিবে। এই বিশ্বের সর্বত্র স্বর্গ-লোকের চেতনা জাগ্রত এবং সে তাহারই আহ্বান প্রেরণ করিতেছে। সেই আহ্বান আমরা না জানিলেও আমাদের অন্তঃকর্ণে আসিয়া পৌছাইতেছে। ইহা আমাদের জীবন-বীণার তার বাঁধিয়া তুলিতেছে।

উহা আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গীতের ভিতর দিয়া সীমার অতীতে প্রেরণ করিতেছে। কেবল প্রার্থনা এবং আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া নয়, প্রস্তরের মধ্যে চঞ্চলতার স্থির কেন্দ্র সমূহের উন্মনী-ধ্যান-রূপ নৃত্যের মধ্যে ইহার প্রকাশ।"

[শিল্পীর ধর্ম হইতে অনূদিত]

এই জীবনে স্বর্গের যে আভাস তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকেই তিনি জীবন ও জগতে ফুটাইয়া তুলিতে জীবনভোর চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি- রূপটিই এই স্বর্গের প্রতিচ্ছবি। এই রূপ সাক্ষাৎকারের কিছু পরিচয় এক্ষেত্রে লাভ করা যাইতে পারে।

"এই যে দশ দিকে তিনি আনন্দরূপে আপনাকে একেবারে দান করিয়া ফেলিতেছেন। তিনি তো লুকাইলেন না। যেখানে আনন্দে অমৃতে তিনি অজস্র ধরা দিয়াছেন, সেখানে প্রাচুর্যের অন্ত কোথায়, সেখানে বৈচিত্র্যের যে সীমা নাই; সেখানে কী ঐশ্বর্য, কী সৌন্দর্য। সেখানে আকাশ যে শতধা বিদীর্ণ হইয়া আলোকে আলোকে নক্ষত্রে নক্ষত্রে খচিত হইয়া উঠিল, সেখানে রূপ যে কেবলই নূতন নূতন, সেখানে প্রাণের প্রবাহ যে আর ফুরায় না। তিনি যে আনন্দ রূপে নিজেকে নিয়তই দান করিতে বসিয়াছেন—লোকে লোকান্তরে সে-দান আর ধারণ করিতে পারিতেছে না—যুগ যুগান্তরে তাহার আর অন্ত

দেখিতে পাই না। কে বলে তাঁহাকে দেখা যায় না; কে বলে তিনি শ্রবণের অতীত; কে বলে তিনি ধরা দেন না। তিনিই যে প্রকাশমান—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। সহস্র চক্ষু থাকিলেও যে দেখিয়া শেষ করিতে পারিতাম না, সহস্র কর্ণ থাকিলেও শোনা ফুরাইত কবে।…এ যে আশ্চর্য। মানুষ জন্ম লইয়া এই নীল আকাশের মধ্যে কী চোখই মেলিয়াছে। এ কী দেখাই দেখিলাম। দুটি কর্ণপুট দিয়া অনন্ত রহস্য লীলাময় স্বরের ধারা অহরহ পান করিয়া যে ফুরাইল না। সমস্ত শরীরটা যে আলোকের স্পর্শে বায়ুর স্পর্শে স্নেহের স্পর্শে প্রেমের স্পর্শে কল্যাণের স্পর্শে বিদ্যুৎ তন্ত্রী খচিত অলৌকিক বীণার মতো বারংবার স্পন্দিত-ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। ধন্য হইলাম, আমরা ধন্য হইলাম আমরা ধন্য হইলাম—এই প্রকাশের মতো প্রকাশিত হইয়া ধন্য হইলাম—পরিপূর্ণ আনন্দের এই আশ্চর্য অপরিমেয় প্রাচুর্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐশ্বর্যের মধ্যে আমরা ধন্য হইলাম। পৃথিবীর ধূলির সঙ্গে তৃণের সঙ্গে কীট পতঙ্গের সঙ্গে গ্রহতারা সূর্য চন্দ্রের সঙ্গে আমরা ধন্য হইলাম।"

[আনন্দ রূপ]

"আমি বলেছি এই চোখ দিয়েই চর্মচক্ষু দিয়েই এমন দেখবার আছে যা চরম দেখা—তাই যদি না থাকত তবে আলোক বৃথা আমাদের জাগ্রত করছে, তবে এতবড়ো এই গ্রহতারা-চন্দ্র-সূর্য খচিত প্রাণে সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ বিশ্ব জগৎ বৃথা আমাদের চারিদিকে অহোরাত্র নানা আকারে আত্ম প্রকাশ করছে।*** আমি বলছি, এই চোখেই আমরা যা দেখতে পাব তা এখনও পাই নি। আমাদের সামনে আমাদের চারিদিকে যা আছে তার কোনোটাই আমরা দেখতে পাই নি—ওই তৃণটিকে না***

কাকে দেখবে। তাঁকে, যাঁকে ধ্যানে দেখা যায়? না তাঁকে না, যাঁকে চোখে দেখা যায় তাঁকেই। সেই রূপের নিকেতনকে, যাঁর থেকে গণনাতীত রূপের ধারা অনন্তকাল থেকে ঝরে পড়ছে। চারিদিকে রূপ কেবলই এক রূপ থেকে আর এক রূপের খেলা; কোথাও আর তার শেষ পাওয়া যায় না—দেখেও পাইনে, ভেবেও পাইনে। রূপের ঝরনা দিকে দিকে থেকে কেবলই প্রতিহত হয়ে সেই অনন্তরূপ সাগরে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। সেই অপরূপ অনন্ত রূপকে তাঁর রূপের লীলার মধ্যেই যখন দেখব তখন পৃথিবীর আলোকে একদিন আমাদের চোখ মেলা সার্থক হবে, আমাদের প্রতিদিনকার আলোকের অভিষেক চরিতার্থ হবে। আজ যা দেখছি, এই যে চারিদিকে আমার যে কেউ

আছে যা কিছু আছে এদের একদিন যে কেমন করে, কী পরিপূর্ণ চৈতন্য যোগে দেখব তা আজ মনে করতে পারি নে—কিন্তু এইটুকু জানি আমাদের এই চোখের দেখার সামনে সমস্ত জগৎকে জাগিয়ে আলোক আমাদের কাছে যে আশার বার্তা আনছে তার এখনও কিছুই সম্পূর্ণ হয় নি। এই গাছের রূপটি যে আনন্দরূপ সে দেখা এখনও আমাদের দেখা হয় নি—মানুষের মুখে তাঁর অমৃত রূপ সে দেখার এখনও অনেক বাকি। "আনন্দ রূপমমৃতং" এই কথাটি যেদিন আমার এই দুই চক্ষু বলবে সেই দিনই তারা সার্থক হবে।" [দেখা]

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা ও দার্শনিক চিন্তা যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে তাহা একক মুক্তি। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া পরিণামে বিশ্বমুক্তির যে পরিচয় পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারায় লাভ করা যায় ভারতীয় চিন্তায় তাহার একান্ত অভাব।

পাশ্চাত্ত্য দর্শন যাহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহা ভারতীয় দর্শনের ন্যায় অত্যুচ্চ না হইলেও তাহাকে সর্বসাধারণের আয়ত্তগম্য করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় এই চেষ্টার একান্ত অভাব। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি ভারতীয় কয়েকজন ঋষি ও মনীষী ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সহিত পাশ্চাত্ত্য দর্শনের সর্বমুক্তির ধারণার সার্থক সমন্বয় সাধন করেন।

সাংখ্য দর্শনে যে অভিব্যক্তির কথা আছে, তাহার পশ্চাতে কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নাই। তাহাতে এক পর্যায়ের সহিত অন্য পর্যায়ের যোগের কোন রহস্যভেদ নাই। সাংখ্য মুক্তিকামী মানুষকে অন্য সকল মানুষ হইতে পৃথক করিয়া দেখিয়াছে। পরম অস্তিত্বের সহিত নিখিল বিশ্বের মিলনেরও কোন উপলব্ধি সাংখ্য দর্শনে নাই। সাংখ্যদর্শন ভারতীয় অন্যান্য দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির ন্যায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চক্রাবর্তনে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের বারংবার আবর্তনে বিশ্বাস করে। বস্তুত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের চক্রাবর্তনের উপলব্ধি অভিব্যক্তির উপলব্ধি নয়। সাংখ্য পরিণামে ব্যক্তির মুক্তিকেই লক্ষ্য করিয়াছে।

অভিব্যক্তি তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে তাই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির কিছু পরিচয় একান্ত প্রয়োজন।

এ্যারিস্টটলের পূর্বে এবং পরে গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারায় সর্বত্র অভিব্যক্তির কথা আছে। এ্যারিস্টটল যে অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা সুপ্ত সম্ভাবনার বাস্তবে ধীর রূপান্তর।

প্লেটো যাহাকে Ideas বলিয়াছেন, তাহা সৃষ্টি ক্ষমতা শূন্য, স্থিতিশীল।

এই Idea গুলির মধ্যে কোন যোগসূত্রও নাই। তিনি যে Idea of the Good-এর কথা বলিয়াছেন, তাহা অন্য সকল Idea হইতে পৃথক এক তত্ত্ব।

প্লেটোর মতে ঈশ্বর আপনার চিন্তা ভাবনাকে বিশ্বে রূপায়িত করেন নাই। ঈশ্বর Ideaর অনুরূপ করিয়া এই নিখিল বিশ্ব রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ঈশ্বর আবার কেবল মাত্র অমর সত্তাগুলিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত নিম্নতর কোন শক্তির দ্বারা এই সকল জগতের সৃষ্টি। তিনি ঈশ্বরের দুটি স্বরূপ কল্পনা করিয়াছেন। একটি Ideaর অনুরূপ করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অন্যটি Idea রও স্রষ্টা।

প্লেটো অস্তিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ স্বরূপ যে Idea of the Good এর কথা বলিয়াছেন, তাহাও একটি Idea। প্লেটোর দর্শনে এইরূপে অভিব্যক্তির কোন ধারণা নাই। ব্যক্তি মুক্তির একপ্রকার ধারণা থাকিলেও, বিশ্বমুক্তির কোন ভাবনা প্লেটোর দর্শনে নাই।

প্লটিনাস যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একাত্মতা লাভ, তাহার জন্য ব্যক্তিকে নিম্নতর চেতনা-লোক-সমূহ একের পর এক পরিহার করিয়া উর্ধ্বাভিসার করিতে হয়। পরিণামে ব্যক্তির চেতনা পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিগত মুক্তি, বিশ্ব মুক্তি নয়। জগতের বর্তমান নিয়তিকে তিনি চিরন্তন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

প্লেটো এবং প্লটিনাসের ন্যায় হার্টম্যানও জগৎকে দুটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুটি জগতের মধ্যে সংযোগ সূত্র স্বরূপ রহিয়াছে মানুষ। হার্টম্যানের এই প্রত্যেকটি জগৎ স্থির। ইহাদের মধ্যে বিকাশের কোন তত্ত্ব নাই।

ডারুইন এবং স্পেন্সারের অভিব্যক্তিবাদ এবং হেগেলের অভিব্যক্তিবাদের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। ডারুইন এবং স্পেন্সারের অভিব্যক্তি প্রাকৃতিক, কিন্তু হেগেলের অভিব্যক্তি আধ্যাত্মিক। প্রাকৃতিক অভিব্যক্তির কোন স্থির লক্ষ্য নাই বলিয়া ইহাকে অভিব্যক্তি বলা যায় না। প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি নৈতিক ও সামাজিক অভিব্যক্তিকে স্বীকার করে না। অন্যদিকে হেগেল চেতনা (spirit) বলিতে মুক্তিকে বুঝিতেন।

হেগেল নিম্নতম হইতে উর্ধ্বতম সকলপ্রকার উপলব্ধিকে চিন্তায় রূপান্তরিত করিয়াছেন। তাঁহার মতে চিন্তা এবং সৎ-এর মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্নতার ধারা আছে।

চিন্তার মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। পরে উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধিত হইয়া উন্নততর চিন্তার প্রকাশ ঘটে। এইভাবে চলিতে থাকে যে পর্যন্ত না মানুষ পরম সত্যে আসিয়া পৌছায়। ভিতরের দিক হইতে ইহা চিন্তার দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া বাহিরের দিক হইতে কালের ক্ষেত্রে ইহাই ইতিহাস সংজ্ঞা লাভ করে। এইভাবে হেগেলের দর্শনে দ্বান্দ্বিক এবং ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

বার্গসঁর অভিব্যক্তি একদিকে ডারুইন, স্পেন্সার প্রভৃতির অভিব্যক্তি হইতে যেমন পৃথক, তেমনি তাহা হেগেলের অভিব্যক্তি হইতে বিশিষ্ট। কিন্তু বার্গসঁর অভিব্যক্তিরও কোন স্থির লক্ষ্য নাই। তাঁহার অভিব্যক্তি অবিচ্ছিন্ন পরিণামী, তাহার উচ্চতর ও নিম্নতর কোন তত্ত্ব নাই।

বার্গসঁ বন্ধনহীন গতিকে প্রকৃত সত্তা বলিয়াছেন। এই গতির দুটি স্বরূপ; একটি বিশুদ্ধ গতি, অন্যটি বিরুদ্ধ বা বিপরীতমুখী গতি। এই বিপরীতমুখী গতির ভিতর দিয়া জড়ের সৃষ্টি।

বার্গসঁ প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক অভিব্যক্তিকে যেমন অস্বীকার করিয়াছেন, তেমনি উদ্দেশ্যমূলক অভিব্যক্তিকে স্বীকার করেন নাই। বার্গসঁর বোধির মধ্যে কোন পর্যায় নাই। তাঁহার পরিশুদ্ধ গতি পরিণাম বা লক্ষ্য শূন্য।

বার্গসঁ যে সৃষ্টিধর্ম্মী অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা একপ্রকার Emergent অভিব্যক্তি; কিন্তু এই অভিব্যক্তি যে কোন পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘটিতেছে তাহা তিনি অস্বীকার করেন। তাঁহার সৃষ্টিধর্মিতার ধারণা হইল আকস্মিকতা ও অনিশ্চয়তা। সত্তার মধ্যে কোন পরিকল্পনা নাই, কোন অবিচ্ছিন্নতার সূত্র নাই।

দার্শনিক আলেকজাণ্ডার মোটামুটি এই ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহাদের মতে অভিব্যক্তির ফলে যে নূতনের প্রকাশ ঘটিবে তাহা অতীত সকল চেতনার প্রকাশ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। আলেকজাণ্ডার যে অভিব্যক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাতে উচ্চতর তত্ত্বের প্রকাশে নিম্নতর তত্ত্ব সমূহের কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। মনুষ্য নিয়তি চির অপরিবর্তনীয় থাকিয়া যাইবে।

শ্রীঅরবিন্দ বার্গসঁ, আলেকজাণ্ডার, নীটশে, ব্র্যাডলে প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের ন্যায় Emergent অভিব্যক্তিতে বিশ্বাস করিতেন। তবে শ্রীঅরবিন্দের অভিব্যক্তির সর্ব প্রধান যে বৈশিষ্ট্য তাঁহাকে পাশ্চাত্য Emergent অভিব্যক্তি- বাদীদের হইতে পৃথক করিয়াছে তাহা হইল, অভিব্যক্তির ক্রমে

যে নূতন বোধের প্রকাশ ঘটিবে তাহাতে নিম্নতর সকল চেতনা পর্যায় সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়া যাইবে না। এই বোধের প্রকাশের ক্ষেত্রেও (ইহাকে তিনি Super Mind বলিয়াছেন) নিম্নতর সকল চেতনা পর্যায়ের অস্তিত্ব থাকিবে তবে ভিন্ন স্বরূপতা বা রূপান্তরতা লাভের ভিতর দিয়া।

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে পারা যায় যে জড়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রাণের প্রকাশ ঘটিয়াছে। জড় ও প্রাণের সংযোগ ছিন্ন হইতে মনের প্রকাশ ও প্রসার সম্ভব হইয়াছে। এইরূপে অধ্যাত্ম জগতে প্রবেশ করিতে হইলে জড়-প্রাণ ও মনের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিতে হয়।

শ্রীঅরবিন্দের মতে উন্নততর চেতনা-পর্যায় লাভ করিতে মানুষের দেহ-প্রাণ-মনকে অস্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তখনও এই সকল চেতনা পর্যায় থাকিয়া যায়, তবে তাহাদের মধ্যে রূপান্তরতা ঘটে।

যে চিন্তাধারা মানুষকে দেহ-প্রাণ এবং মন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া আনে এবং এইরূপ জীবন ও জগৎ হইতে আদৌ বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, তাহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা নহে। আধ্যাত্মিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা। আধ্যাত্মিক বলিতে সেই প্রেরণা বুঝায় যাহাতে ব্যক্তি ক্রমাগত বিশ্বের সহিত মিলিত হইতে পারে।

সঙ্গীতের যেমন একটি পূর্ণ আদর্শ বা রূপায়ণ সঙ্গীতকারের অন্তরে থাকে এবং সুরের জাল বিস্তার করিয়া তাহাকে তিনি ধীরে ধীরে রূপায়িত করিতে থাকেন, তেমনি এই সৃষ্ট জগতের একটি সম্পূর্ণ ধ্যান স্রষ্টার অন্তরে রহিয়াছে, সৃষ্টির এই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া তাহাকেই তিনি ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

সমগ্র সৃষ্টি লীলার পশ্চাতে স্রষ্টার অন্তরের একটি অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা আছে। বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিকাশ ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যে বিকাশ ঘটিবে, সেই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সকল বিকাশ তাঁহার অন্তরে যে পূর্ব নির্দিষ্ট হইয়া আছে, ইহা জড় অভিব্যক্তিবাদীরা স্বীকার করেন না। তাঁহারা এক অন্তহীন পরিণাম শূন্য বিকাশে বিশ্বাস করেন। সে অভিব্যক্তি কখন সম্পূর্ণতা লাভ করে না, তাহার সমাপ্তি নাই। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন।

"এ গান একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে তাঁর অন্তরে রয়েছে অথচ ক্রমাভিব্যক্তি রূপে প্রকাশ পাচ্ছে, কিন্তু এর প্রত্যেক সুরই সেই সম্পূর্ণ গানের আবির্ভাব এক সুরকে আর এক সুরের সঙ্গে আনন্দে সংযুক্ত করে চলেছে।

যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্ব জগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে জগতের ঈশ্বরও ক্রমশঃ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।"

নিটশের মতে মানবিক প্রয়াসের লক্ষ্য সকলের উন্নতিবিধান নয়, উন্নততর ব্যক্তিবিশেষের বিকাশ। সমগ্র মনুষ্যসমাজ নয়, অতিমানবই লক্ষ্য। বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মানবজাতির উন্নতি বিধানের জন্য যেন সচেষ্ট না হয়। মনুষ্যসমাজের বিকাশ ঘটিতে পারে না। ইহার অস্তিত্বই নাই, এক অমূর্ত্য ভাবনা মাত্র—ইহা সংখ্যাতীত ব্যষ্টির এক জটিল সমাবেশ। এই জটিল মানবসমাজ একটি বৃহৎ গবেষণাগার, যেখানে প্রত্যেক যুগে কিছু-না-কিছু অবশেষ থাকিয়া যায়—আর অধিকাংশই নষ্ট হয়। সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্য মনুষ্য সাধারণের সুখ সাধন নয়, প্রতিনিধির উন্নতিসাধন। যদি উন্নততর প্রতিনিধির উদ্ভব না ঘটে তবে সমাজ সৃষ্টি নিষ্প্রয়োজন। সমাজ ব্যষ্টির শক্তি এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের যন্ত্র স্বরূপ; সমষ্টি সমষ্টির লক্ষ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে অন্যতম চিন্তানায়ক জর্জ বার্নার্ডশর অভিব্যক্তি সম্পর্কিত ধারণার সামান্য পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

তাঁহার মতে জড়ের মধ্যে প্রকাশিত প্রাণই সজীব সত্তা। জীবসত্তার সৃষ্টির জন্য প্রাণ জড়ের মধ্যে অনুপ্রবেশ না করিতে পারিলে প্রাণের বিকাশ বা বিবর্তন সম্ভব নয়।

তাঁহার মতে মানুষ প্রথমে প্রয়োজন বোধ করে এবং যে বৃত্তি বা অঙ্গের সহায়তায় ইহা চরিতার্থ করা সম্ভব ক্রমে ক্রমে তাহার অস্তিত্ব কামনা করে। প্রথমে আকাঙ্ক্ষা, তাহার পর কল্পনা, তাহার পর সৃষ্টি।

জীবন বিকাশের প্রক্রিয়া প্রধানত নূতন শারীরিক অভ্যাস এবং শারীরিক বৃত্তি লাভের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অনুরূপ প্রক্রিয়া চিন্তার ক্ষেত্রেও চলিতে পারে।

আমরা কেবল শারীরিক নিত্য নূতন শক্তির বিকাশ ঘটাইতেছি না, সেই সঙ্গে মনের, অন্তর্দৃষ্টির, বোধির এবং বুদ্ধিবৃত্তিরও বিকাশ ঘটাইতেছি। আমরা ওই সমস্ত কিছু আকাঙ্ক্ষা করি কেবল তাহাই নয়, যাহাতে আমরা আরো সুচারুরূপে প্রাণের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি সেইজন্য প্রাণ ওই সমস্ত কিছু আমাদের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিতে চায়।

ইহা বোধ করিতে পারা যায় যে জড়ের মধ্যে প্রাণের অনুপ্রবেশ জীবন বিকাশের একটি সাময়িক পর্যায় মাত্র। প্রাণ জড়কে আশ্রয় করিয়াছে কেবল ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য, ইহা একটি সোপান এবং সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছাইয়া প্রাণ অন্য কোন কিছুতে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে।

চিন্তার মধ্যে শ' অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ বিষয়টিকে লাভ করিয়াছেন। বাটলারের চিন্তাপদ্ধতি আশ্রয় করিয়া শ' এই বোধ গড়িয়া তুলিলেও বাটলারের মধ্যে অবশ্য ইহার কোন পূর্ব-পরিচয় ছিল না। তিনি অভিব্যক্তির পদ্ধতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে অর্থান্বিত করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সর্বশেষ পরিণাম সম্পর্কে তিনি নীরব।

অর্থাৎ শ'র অভিব্যক্তির পরিকল্পনার মধ্যে কোন সম্পূর্ণ, অপরিবর্তনীয় অস্তিত্বের উপলব্ধি নাই—অভিব্যক্তির যাহা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। অথচ অভিব্যক্তি বলিতে কেবল গতি বুঝায় না, একটি লক্ষ্যাভিমুখীন গতিকে বুঝায়।

ঊনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল যে সত্য বস্তু দর্শন ও স্পর্শন-যোগ্য সামগ্রী এবং ইহা নিঃসংশয়ে জড়জগতে দৃষ্ট বিধানের আয়ত্তগোচর। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানে জড় কতকগুলি বিদ্যুৎ-কণা। বিদ্যুৎ-কণা আবার পরিণামে একটি শূন্যময় অস্তিত্বমাত্র, ইহা আদৌ কোন বস্তুপুঞ্জ নয়, কোথাও কেবল আমাদের চেতনার অভিক্ষেপ।

জগৎ সম্পর্কে আদর্শবাদীদের ব্যাখ্যা এই যে, জড় এমন একটি বিষয় যাহাকে কেবলমাত্র মনের সহায়তায় উপলব্ধি করা সম্ভব। একমাত্র মনের উপলব্ধির উপর জড়ের অস্তিত্ব। অধ্যাপক এডিংটন, স্যার জেমস্, উইলডন কের, নিও-আইডিয়ালিজমের প্রতিষ্ঠাতা ইতালির দার্শনিক ক্রোচে, জেণ্টাইল প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই অভিমত পোষণ করেন।

বস্তুত পদার্থবিজ্ঞান জড়বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে কোন জ্ঞানই দান করিতে পারে না কেবল উহার অমূর্ত্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। আমাদের অভিজ্ঞতায় মনই প্রথম এবং সর্বাধিক প্রত্যক্ষীভূত সামগ্রী। পদার্থবিজ্ঞানের পদ্ধতির অতীত সংযোগের দ্বারা মন প্রকৃতপক্ষে আপনার মানসিক এবং অধ্যাত্মিক স্বভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে।

স্যার জেমস্ জীনস্ তাঁহার The Mysterious Universe গ্রন্থে বিশ্বকে এক গানতিক চিন্তাশীলের চিন্তার প্রকাশ বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অধ্যাপক এডিংটনের মতে বিশ্ব নিখিল বিশ্বমনের প্রকাশ। অধ্যাপক হোয়াইটহেডের

মতে বিশ্ব মানবসত্তার ন্যায় একটি জৈবিক ঐক্য। বার্গসঁর মতে বিশ্ব প্রাণ-শক্তির স্রোতোধারা। এই সত্যকে তাই বিজ্ঞানের সহায়তায় লাভ করিতে পারা যায় না। শিল্পবোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বিশেষভাবে ধর্মবোধের ভিতর দিয়া ইহার কতকটা পরিচয় লাভ করা যায়।

পূর্বে বিজ্ঞান ধর্মকে অস্বীকার এবং অপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে, এখন বিজ্ঞান ধর্মকে কেবল যে সমর্থন করে তাহাই নয়, তাহার বিচিত্র অনুভূতিকে প্রমাণ করিতে সচেষ্ট!

বার্গসঁ তাঁহার 'Creative Evolution' গ্রন্থে বিশ্বকে একটি মাত্র তত্ত্বাশ্রয়ী করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাণের প্রবাহই, বার্গসঁর ভাষায় élan vital বিশ্বের মূল উপাদান। যুক্তি বা বুদ্ধির দ্বারা ইহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না; ইহা কেবল বোধিবৃত্তি-সম্পন্ন মনের উপলব্ধি গোচর। এই élan vital এর মূল ধর্ম হইল নিয়ত পরিবর্তন।

বিশ্ব যদি নিয়ত পরিবর্তনশীল élaln vital হয় তাহা হইলে জড়বস্তু নিশ্চয়ই মায়া। বার্গসঁ বলেন, এই মায়া সম্ভব হইয়াছে চিন্তাবৃত্তির উদ্ভবের ফলে। অভিব্যক্তির একটি পর্যায়ে এই চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়াছে বাস্তব কতকগুলি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। নিরবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের জগতে প্রাণ গুরুতর বাধার সৃষ্টি করিত। সেইজন্য চিন্তাবৃত্তির উদ্ভব ঘটিয়াছে। ইহার কাজ হইল প্রাণের প্রবাহকে খণ্ডিত করা, যাহা বস্তুত অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন, তাহার মধ্যে বিভাগ এবং পার্থক্য সৃষ্টি করা। এই সকল বিভাগ এবং বিচ্ছিন্নতার জন্য জগৎ আমাদের নিকট দেশে প্রসারিত স্থির, কঠিন বস্তুপুঞ্জরূপে প্রতীয়মান হয়। চিন্তাবৃত্তি নিয়ত পরিবর্তনশীল স্রোতোধারা হইতে সকল বস্তু গড়িয়া তুলিয়াছে; পৃথকভাবে ইহার কোন অস্তিত্ব নাই। চিন্তা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না, যে ভিন্নতর বৃত্তির সহায়তায় ইহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় বার্গসঁ তাহার নাম দিয়াছেন, 'intuition' বা বোধি।

যাঁহারা মন ও জড় উভয়কে দুটি পৃথক তত্ত্বরূপে স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে জড় হইতে প্রাণের উদ্ভব ঘটে নাই। ইহা এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব। জড়ের সহিত প্রাণ মিলিত হইয়া জীব-কণার প্রকাশ ঘটাইয়াছে। প্রাণ জীব-কণাকে আশ্রয় করিয়া উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে চায়। প্রাণ-কণা জড়ের দ্বারা আদি প্রাণের স্রোত হইতে সাময়িকভাবে সংযুক্ত প্রাণের একটি বিচ্ছিন্ন প্রকাশ।

স্বাতন্ত্র্য তাই উদ্দেশ্য নয়, উপায়। স্বাতন্ত্র্যকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

দেহ-রূপ ভাঙ্গিয়া পড়িলে প্রাণ আদি প্রাণস্রোতে মিশিয়া যায়। জীব সমগ্র জীবনের সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে দক্ষতা ও জ্ঞান, যে ক্ষমতা ও উপলব্ধি লাভ করে, আদি প্রাণস্রোতে সেই সকল মিশিয়া গিয়া তাহাকে আরো সমৃদ্ধ করিয়া তোলে। এইরূপে প্রাণ সামগ্রিক ভাবে উন্নততর জ্ঞান, দক্ষতা ও অন্তর্দৃষ্টি মিশ্রিত হইয়া ক্রমাগত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে এবং ক্রমে জড়ের সহিত মিলিত হইয়া উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে। আমরা তাই আমাদের পূর্বপুরুষদের চেষ্টার ফলভোগই কেবল করিতেছি না, ইহা যদিও আংশিকভাবে সত্য, সেই সঙ্গে পূর্ববর্তী সকল বংশানুগতির গুণাবলী মিশ্রিত প্রাণ-ধারারও ফলভোগ করিতেছি।

আধুনিক জীবতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্যের কয়েকটি ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারার পরিচয় লাভ করা যায় Toad-এর 'Matter, Life and Value' গ্রন্থে। বার্গসঁর 'Creative Evolution' গ্রন্থে আর এক ধারার পরিচয় আছে। দার্শনিক আলেকজাণ্ডার 'Space, Time এবং Deity' গ্রন্থে আর এক বিশিষ্ট ধারার পরিচয় দান করিয়াছেন। জেনারেল স্মাটের Holism মতবাদের মধ্যে আর এক ধারার পরিচয় আছে। তাঁহার মতে জীবতাত্ত্বিক অগ্রগতি বলিতে ক্রমাগত অধিকসংখ্যক উপাদানের সংযোগের ভিতর দিয়া ক্রমাগত বৃহৎ হইতে বৃহত্তর জৈবিক সমগ্রতা লাভ করা বুঝায়। তিনি বিশ্বাস করেন সমগ্র বিশ্ব এইরূপে এক অখণ্ড জৈবিক সত্তা। অধ্যাপক হোয়াইটহেডের মতে নিখিল বিশ্ব যে এক অখণ্ড জৈবিক সত্তা জীব-কণা তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে এমন কতকগুলি বিষয় থাকে যাহাকে আমরা মানবিক বোধ, যুক্তি ও বিচারের সহায়তায় ব্যাখ্যা করিতে পারি না। ধর্মের এই অংশকে আমরা বলি বিশ্বাস (faith)।

একশ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহারা ধর্মের কেবলমাত্র বিশ্বাস ভাগটিকে স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে ধর্মের ইহা সর্বোৎকৃষ্ট এবং একমাত্র ভিত্তি। হিউম তাঁহার "An Enquiry Concerning Human Understanding" গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন, যাঁহারা ধর্মকে যুক্তি দ্বারা বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে চান তাঁহারা ধর্মের শত্রু।

আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহারা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে

কেবলমাত্র মানবিক যুক্তি ও বিচারবোধকে একমাত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাঁহারা মানব ব্যবহার ও বোধগম্য চূড়ান্ত নীতিবোধকে যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। যুক্তির অতিরিক্ত কিছু মানব-সংসারে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। D'Holback তাঁহার 'Common Sense' গ্রন্থে অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

অপর আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁহারা এই উভয় জগতের মধ্যে অর্থাৎ মানবিক ও বিশ্বাসবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনে প্রয়াসী। তাঁহারা এই উভয় জগতের সত্যতায় বিশ্বাসী। এই উভয় জগৎ বিরুদ্ধ নয়। একে অন্যের উপর প্রতিষ্ঠা লাভের ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ সত্যের প্রকাশ লাভ সম্ভব। St Thomas Aquinas প্রভৃতি দার্শনিক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ইঁহাদের মধ্যে আদর্শবাদী আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁহারা অস্তিত্বের এই দুই স্বরূপকে আদৌ অস্বীকার করেন। তাঁহাদের দার্শনিক চিন্তায় তাই সমন্বয় বা সামঞ্জস্য সাধনের কোন প্রশ্ন উঠে নাই।

রবীন্দ্রনাথ এই আদর্শবাদী দার্শনিকগণের মধ্যে একজন। তাঁহার দার্শনিক চিন্তার বিস্তারিত পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। তাহার সহিত সাদৃশ্য রহিয়াছে এমন দুই একজন আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের কিছু কিছু উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

বহির্জগৎ আমাদের ভাবনা (idea) দ্বারা গড়িয়া তোলা সামগ্রী মাত্র। এই ভাবনা-লোক ছাড়া বহির্জগতের কোন স্বরূপ আমরা জানি না। ভাবনা ব্যক্তির জীবনে স্থির সামগ্রী, ইহা এক অমোঘ নিয়মের মত আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংখ্যাতীত মানুষের মধ্যে এমনি এক একটি 'বোধের জগৎ' রহিয়াছে। এই সকল 'বোধের জগৎ' যদি একান্ত বিচ্ছিন্ন হইত, তাহা হইলে আমরা আমাদের বোধকে অন্যের বোধের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে, কিংবা অন্যের বোধকে আমাদের বোধের আয়ত্তের মধ্যে আনিতে পারিতাম না। বিচ্ছিন্ন এই সকল ভাবনা-লোক নিশ্চয়ই বৃহত্তর কোন ভাবনা-লোকের মধ্যে সামঞ্জস্যীভূত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ ইহার নাম দিয়াছেন 'বিশ্বমন'। সকল অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মনকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া এই বিশ্বমনের অবস্থান।

এই সম্পর্কে Josiah Royce তাঁহার 'The Spirit of Modern Philosophy' গ্রন্থে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"You know your world in fact as a system of ideas about things, such that from moment to moment you find this system forced upon you by experience. Even matter you know just as a mass of coherent ideas that you cannot help having. Space and time, as you think them, are surely ideas of yours. Now, what more natural than to say that if this be so, the real world beyond you must in itself be a system of somebody's ideas ?"

"Everything finite is more or less obscure, dark, doubtful. Only the Infinite Self, the problem-solver, the complete thinker, the one who knows what we mean even when we are most confused and ignorant, the one who includes us, who has the world present to himself in unity, before whom all past and future truth, all distant and dark truth is clear in one external moment, to whom for and forgot is near, who thinks the whole of nature, and in whom are all things, the Logos, the world-possessor, only his existence, I say, is perfectly sure.····"

বিশ্ব-মনের সহিত সকল ব্যক্তি-মন বিজড়িত বলিয়া ব্যক্তির নিয়তি এবং সুখ-দুঃখ ও পাপ-পুণ্য ভোগের সহিত সমগ্র মানবসমাজ সংশ্লিষ্ট। একক মুক্তি-সাধনা তাই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক উপলব্ধির সহিত সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

"For just because this world is a moral order, we suffer together. Nor can it be wholly indifferent to any righteous man than his neighbour sins. In a sense the sin of every evil-doer amongst us taints all of us. For if I am a man, and if nothing human is alien to me, then, however much my individual free will may be set against any direct consent to the evil-doer's particular purpose, this my free will, * * is in no sense absolutely independent of the common human

nature that I share with the sinner. All human sin is therefore indeed in some sense my own. It is atleast my ill fortune, even where it is not at all my own individual choice. And in this sense every wise man, in contemplating sin and its consequences, in all cases where he must needs know of them, hears the echo of the word, that art thou, sounding in his own heart in a tone which is as tragic, as the assertion itself is here one-sided, but in its own partial measure, true, even for the saintiest of men. No man amongst us is wholly free from the consequences, or from the degradation or less developed neighbour; and the solidarity of mankind links the crimes of each to the sorrow of all."

(*Josiah Royce : The World and the Individual*)

ঈশ্বরীয় ইচ্ছার সহিত সচেতন যোগ লাভের পথে যে বিচিত্র বাধা তাহাই পাপ। ঈশ্বরীয় লীলা তো একক বা বিশিষ্ট কোন সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। নিখিল বিশ্বমানবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় সার্থকতা লাভ করিতে চায়। সকল ব্যক্তি-হৃদয়ের প্রতিবন্ধকতার বা পাপের একটি সমষ্টিগত রূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, যাহাকে বিশ্ব-অজ্ঞানতা (Universal Sin) আখ্যা দান করা যায়। ঈশ্বরীয় চেতনা সকল ব্যক্তি-হৃদয়াশ্রয়ী হইয়া নিখিল বিশ্বের অজ্ঞানতাকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। একমাত্র এই পরিণামে সকল ব্যক্তি-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরীয় প্রত্যক্ষ যোগের লীলা সাধিত হইতে পারে। পাপ তাই মিস্টিক সাধকদের মতে মায়া বা অবাস্তব নয়। ইহা বাস্তব সত্য। ইহার সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়া ব্যক্তির সহিত সমগ্র মানবসমাজ ঈশ্বরীয় যোগ লাভ করিতে চলিয়াছে।

"—the experience of life, amidst all the chaos of our present form of consciousness, brings home to us this great truth that the perfection of the spirit is a perfection through the including and transcending of sorrow, and brings it home in a form that leaves us no doubt that unless God knows sorrow,

he knows not the highest good, which consists in the overcoming of sorrow."

(*Josiah Royce : The World and the Individual*)

এমন একটি চেতনা আছে যাহার মধ্যে সকল অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ক্রিয়া, সকল ভাবনা প্রতিমুহূর্তে উদ্ভাসিত। —সকল অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আশ্রয় করিয়া একটি অখণ্ড ভাবের প্রকাশ। পরমার্থিক দৃষ্টিতে তাই সমস্ত কিছুই স্থির। ইহার মধ্যে অভিব্যক্তির কোন তত্ত্ব থাকিতে পারে না। ভারতীয় দর্শনে চতুর্যুগ সমন্বিত কল্পের পরিকল্পনা আছে। কল্পারম্ভে পর্যায়-ক্রমে এক একটি যুগের প্রকাশ ঘটে যে পর্যন্ত না কল্পাবসান হয়। প্রত্যেকটি কল্প, প্রত্যেক কল্পের প্রতিটি যুগ-পর্য্যায় আবার পূর্ব পূর্ব যুগের অনুরূপ। এখানেও দেখিতে পাই, সকল অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমেত এই নিখিল বিসৃষ্টি একটি স্থির রূপ। এই তত্ত্ব-দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়াও বিশ্ব-অভিব্যক্তিকে কেমন করিয়া মানিয়া লওয়া যাইতে পারে তাহার একটি মীমাংসা লাভ করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

"—the absolute possesses a perfect knowledge at one glance of the whole of the temporal order, present, past and future. And as there is an eternal knowledge of all indivi-duality, and of all freedom, free acts are known as occuring like the chords in the musical succession, precisely when and how they actually occur."

(*Josiah Royce : The World and the Individual*)

বিশ্ব-বিকাশের ক্ষেত্রে চেতনার আবির্ভাবের সঙ্গে বেদনাবোধেরও প্রকাশ ঘটিয়াছে। মানুষের মধ্যে চেতনার বিকাশ যেমন বেদনাবোধের প্রকাশও তেমনি সর্বাধিক। তাহার মধ্যে এখনও সেই সকল বৃত্তির লেশ আছে যাহা উন্নত পর্যায়ের প্রাণীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ইহাও সত্য যে সভ্য মানুষ এই সকল বৃত্তিকে ঘৃণা করে।

বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিরোধ যতই থাকুক না কেন, এই বিষয়ে তাঁহারা সকলেই একমত যে প্রাণীলোকে জীবনধারণের জন্য যে সংগ্রাম তাহা মানুষের নৈতিকবোধবিরুদ্ধ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই প্রাচীন চিন্তাশীলদের মধ্যে এই সত্যের উপলব্ধি ঘটে। তাঁহারা উপলব্ধি করেন, বিশ্ব-

অভিব্যক্তির ধারা এবং মানুষের নৈতিক বিকাশের ধারার মধ্যে কোন মিল নাই।

জগতের অন্যায় ও অবিচারকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ দার্শনিকগণ জন্মান্তর বা 'কর্ম'-বাদ তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। সকল ক্রিয়ার অতীতে যে এক শাশ্বত নির্বিকার অস্তিত্ব আছে তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করেন। কর্মের এই প্রবাহ বা অভিব্যক্তির ধারা হইতে মুক্তি লাভ করাই জীবের মুক্তি।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে অমিল যাহাই থাকুক না কেন, কর্মের অবসানকে উভয় দর্শন কোন-না-কোন ভাবে লক্ষ্য করিয়াছে। হিন্দুদের মুক্তি, বৌদ্ধদের নির্বাণ কিংবা স্টোইকদের Apatheiaর মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই।

মানুষের মধ্যে সৎ ও অসৎ বৃত্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে কী ভাবে বিশ্ব-অভিব্যক্তি তাহা হয়ত আমাদের শিক্ষা দিতে পারে, কিন্তু কেন যে অসৎ অপেক্ষা সৎকে আমরা অধিক আকাঙ্ক্ষা করি, বিশ্ব-অভিব্যক্তি তাহা ব্যাখ্যা করিতে পারে না।

প্রকৃতি-জগতের বিকাশের তত্ত্ব মনুষ্য-লোকে সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা লাভ করিয়াছে। সামাজিক অগ্রগতির অর্থই হইল প্রতি পদে বিশ্ব-ক্রিয়াকে নিরোধ করা এবং তাহার পরিবর্তে নৈতিক প্রেরণাকে স্বীকার করা। বস্তুত নৈতিকতার দিক হইতে যাঁহারা সর্বোত্তম, জীবনধারণে তাঁহারাই যোগ্যতম ব্যক্তি। মানুষের মধ্যে সেই অনন্ত শক্তির সম্ভাবনা আছে যাহার সহায়তায় মানুষ একদিন নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ক্রিয়াকে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিবে।

[৪]

"বিশেষ মানুষ জীবনে বিশেষ একটা পালাই সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছে।"

(প্রভাত সঙ্গীত : জীবন-স্মৃতি)

"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্য রচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন সাধনের পালা।" (প্রকৃতির প্রতিশোধ : জীবন-স্মৃতি)

দিব্য-চেতনা অব্যাকৃত ও অবিভক্ত থাকিয়াই দেশ-কালের মধ্যে আপনাকে অন্তহীন রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রহ্মই এই সমস্ত কিছুর মূল বা কারণই শুধু নন, তিনিই বিশ্বরূপে প্রকাশমান। আপনার অপার প্রেমে (কোন অ-সৎ বস্তু আশ্রয় করিয়া নয়) আপনাকে আপনি সীমিত করিয়াছেন।

"তিনি নিজের শক্তিকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর দিয়ে নিয়ত আমাদের জন্য উৎসর্জন করছেন। সমস্ত সৃষ্টি তাঁর কৃত উৎসর্গ। সেই স্বয়ম্ভূ সেই স্বতঃ-উৎসারিত প্রেমই সমস্ত সৃষ্টির মূল।" (রবীন্দ্রনাথ)

ব্রহ্মের সহিত বিশ্বের, কারণের সহিত কার্যের সম্পর্ক নির্দেশ করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ গায়কের সহিত গানের, শিল্পীর সহিত শিল্পের, কবির সহিত কাব্যের, মাতার সহিত সন্তানের সম্পর্কের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন। দর্শন-শাস্ত্রেও এই সকল উপমা প্রয়োগ করা হইয়াছে। একটি উপমা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই বিশ্ব-সঙ্গীতটিও তাঁর গায়ক থেকে এক মুহূর্তও ছাড়া নাই। তাঁর বাহিরের উপকরণ থেকেও এ গড়া নয়। একেবারে তাঁরই নিঃশ্বাসে তাঁরই আনন্দ রূপ ধরে উঠেছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

রবীন্দ্রনাথের নিকট এই বিশ্বজগৎ স্বরূপতঃ সৎ। তাহা দিব্য-চেতনা বিবিক্ত কোন অ-সৎ সত্তা নহে। তাঁহার আরও দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"তাঁর সেই আনন্দ এবং তাঁর কর্ম একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে ভূলোকে বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

তাঁহার আনন্দ দেশ-কালের সীমায় নিত্য রূপ লাভ করিতেছে। আবার সেই সকল রূপ তাঁহার রূপ-হারা আনন্দের মাঝে বিলীন হইয়া যাইতেছে।

"অন্তরের সেই আনন্দ বাহিরের সেই কর্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে, বাহিরের সেই কর্ম অন্তরের সেই আনন্দে আবার ফিরে ফিরে আসছে। এমনি করে অন্তরে বাহিরে আনন্দ ও কর্মের অপূর্ব আনন্দ চলেছে।" (রবীন্দ্রনাথ)

একের মত বৈচিত্র্যও সত্য। একের সহিত যুক্ত না করিয়া বৈচিত্র্যকে কেবলমাত্র বৈচিত্র্যস্বরূপে দেখিলে সম্পূর্ণ দেখা হয় না। অন্যদিকে বৈচিত্র্য-বিহীন একেকে লাভ করিবার সাধনা শূন্যতার সাধনা। বৈচিত্র্যকে একের সহিত মিলিত করিয়া কিংবা একেকে বৈচিত্র্যের সহিত যুক্ত করিয়া এক অখণ্ড স্বরূপে দেখিবার যে সাধনা তাহাই সত্য ও পূর্ণতার সাধনা।

অসীমের আনন্দই দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। যাহা কিছু প্রকাশমান, সেই সমস্ত কিছুই অসীমের আনন্দ রূপ, অমৃত রূপ। এই সীমা-রূপ যদি না থাকিত তবে অসীম অব্যক্ত হইয়াই থাকিতেন। তাহা শূন্যতারই নামান্তর।

অন্যদিকে অসীমের যোগেই কেবল আমরা সীমাকে উপলব্ধি করিতে পারি। একটা অবিচ্ছিন্নতা সূত্রে মুহূর্তগুলি বিধৃত হইয়া না থাকিলে মুহূর্তকে আমরা মুহূর্ত বলিয়া উপলব্ধিই করিতে পারিতাম না। সমস্ত চঞ্চলতার কেন্দ্রস্থলে একটি ধ্রুবত্বের অস্তিত্ব আছে। এই ধ্রুবত্বের যোগেই আমরা চঞ্চলতাকে বোধ করিতে পারি। শুধু মাত্র চঞ্চল মুহূর্ত প্রলয়। অসীমই সীমাকে একটি পূর্বাপর পরিণামসূত্রে বিধৃত করিয়া আছে। তাই মানব-চেতনায় এই রূপের বোধ সম্ভব হইয়াছে। স্থির, অচল প্রতিষ্ঠ বৃক্ষের ন্যায় অসীম এই অন্তহীন সীমা-রূপকে ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহারই অমোঘ শাসনে এই সমস্ত কিছু আবর্তিত হইতেছে।

সীমা প্রতি মুহূর্তে আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিয়াই, সরিয়া সরিয়া মৃত্যুকে স্বীকার করিতে করিতে অমৃতের অপরিমেয়তাকেই প্রকাশ করে। রূপ যদি স্থির হইয়াই থাকিত তবে অরূপকে আমরা কখনোই উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

কেবল রূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে রূপ ভয়ঙ্কর বিভীষিকা রূপে প্রতিভাত হয়। কী অচিন্তনীয় বিপুল বেগে সমস্ত কিছু আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে! চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া কী ভয়ঙ্কর বিনষ্টি! কী বিপুল সঙ্ঘাত! মানব-

মন এই অস্থিরতায় কোথাও মুহূর্তমাত্র স্থিতি লাভ করিতে পারে না বলিয়া ইহার অস্তিত্বমাত্রকে 'মায়া' বলিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা করে। মায়া, অর্থাৎ ব্যাখ্যাতীত, অনির্বচনীয় এক চিরন্তন প্রকাশ স্বরূপ।

অন্যদিকে সকল রূপের প্রকাশকে অনস্তিত্ব করিয়া তুলিয়া চেতনার যে নির্বিকার নিষ্ক্রিয় মাত্র রূপে স্থিতি লাভের চেষ্টা তাহা ততোধিক ভয়াবহ শূন্যতা।

গানকে বাহিরের দিক হইতে দেখিলে কেবল কঠিন প্রয়াসই চোখে পড়ে। তাহা সুরের সহিত সুরের ধ্বনির সহিত ধ্বনির নিয়ত অকারণ সঙ্ঘাত। গায়কের অন্তরে যে অনির্বচনীয় আনন্দ সুরজাল বিস্তার করিয়া একটি অখণ্ড রূপের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে, যে এক স্থির আনন্দ সকল বিচ্ছিন্ন সুর ও তালকে প্রতি মুহূর্তে একটি অখণ্ড সুষমা দান করিতেছে, তাহা যখন বোধ করিতে পারা যায় তখন সঙ্গীত আর বন্ধনস্বরূপ থাকে না, তখন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা মুক্তি লাভ করি। উভয়কে মিলিত করিয়া একত্র করিয়া দেখিবার সাধনাই পূর্ণতার সাধনা।

এই নিখিল বিশ্ব সেই শ্রেষ্ঠ বীণাকারের একটি অখণ্ড সঙ্গীত। যে আনন্দ-উৎস হইতে এই সুরের ধারা নিত্যকাল ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে সেই উৎসের সহিত চেতনাকে যুক্ত করিয়া বিশ্বকে অখণ্ড রূপে দেখিতে পারিলে বিশ্বের অমৃত রূপটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

সীমা ও অসীম তাই অবিচ্ছিন্ন তত্ত্ব। একটিকে পরিহার করিয়া আর একটির অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। তাই বলিয়া সীমা ও অসীমে যে পার্থক্য নাই তাহা নয়। পার্থক্য না থাকিলে অসীমের প্রকাশ ঘটিত না। আবার সামঞ্জস্য না থাকিলে সীমা অসীমকে প্রকাশ করিতেই পারিত না।

মানুষের সাধনা তাই সীমাকে অস্বীকার করা বা লঙ্ঘন করা নয়, সীমাকে সর্বাংশে অসীমের সহিত যোগে চরিতার্থ করা। এই যোগ সাধনের চেষ্টার ভিতর দিয়া সীমা ক্রমাগত বিশিষ্ট ও সৌন্দর্য মণ্ডিত হইয়া উঠিতে থাকে।

সীমা ও অসীমের এই যোগের কথা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে যে ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অসীমই সীমাকে সৃষ্টি করে এবং সীমাই অসীমকে প্রকাশ করিতে থাকে। বস্তুত এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে তাহাদের বিচ্ছেদ করিয়া একটি দিকই প্রবল হইয়া উঠে

সেইখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন। আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।"

(সীমা ও অসীমতা : পথের সঞ্চয়)

"সীমা ও অসীমতাকে যদি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিরুদ্ধ করিয়া দেখি তবে মানুষের ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নেই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা।" (সীমা ও অসীমতা : পথের সঞ্চয়)

"আমাদের দেশে ভক্তিতত্ত্বের ভিতরকার কথা এই যে, সীমার সঙ্গে অসীমের যে যোগ তাহা আনন্দের যোগ অর্থাৎ প্রেমের যোগ। অর্থাৎ সীমাও অসীমের পক্ষে যতখানি অসীমও সীমার পক্ষে ততখানি, উভয়ের উভয়কে নাহলে নয়।" (সীমা ও অসীমতা : পথের সঞ্চয়)

"সমস্ত চঞ্চলতার মাঝখানে একটি স্থিতি আছে বলিয়া সেই বিধৃতি সূত্রে আমরা যাহা কিছু জানিতেছি নাহলে সে জানার বালাই মাত্র থাকিত না— যাহাকে মায়া বলিতেছি তাহাকে মায়াই বলিতে পারিতাম না যদি কোনখানে সত্যের উপলব্ধি না থাকিত।

সেই সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই উপনিষৎ বলিতেছেন—

"এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতাস্তিষ্ঠন্তি।"

সেই নিত্য পুরুষের প্রশাসনে, হে গার্গি নিমেষ মুহূর্ত অহোরাত্র অর্ধমাস মাস ঋতু সংবৎসর সকল বিধৃত হইয়া 'স্থিতি' করিতেছে।

অর্থাৎ এই সমস্ত নিমেষ মুহূর্তগুলিকে আমরা একদিকে দেখিতেছি চলিতেছে কিন্তু আর একদিকে দেখিতেছি তাহা একটি নিরবচ্ছিন্নতা-সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। এইজন্যই কাল বিশ্বচরাচরকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া যাইতেছে না, তাহাকে সর্বত্র জুড়িয়া গাঁথিয়া চলিতেছে। তাহা জগৎকে চক্‌মকি ঠোকা স্ফুলিঙ্গ পরম্পরার মতো নিক্ষেপ করিতেছে না, আদ্যন্ত যোগযুক্ত শিখার

মত প্রকাশ করিতেছে। তাহা যদি না হইত তবে আমরা মুহূর্ত কালকেও জানিতাম না। কারণ আমরা একমুহূর্তকে অন্য মুহূর্তের সঙ্গে যোগেই জানিতে পারি বিচ্ছিন্নতাকে জানাই যায় না। এই যোগের তত্ত্বই স্থিতির তত্ত্ব। এইখানেই সত্য এইখানেই নিত্য।" (রূপ ও অরূপ : সঞ্চয়)

"সেইজন্যই উপনিষৎ বলেছেন,—

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।

তিনি চলেন এবং তিনি চলেন না, তিনি দূরে এবং তিনি নিকটে এ দুইই এক সঙ্গে সত্য। অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি, কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।"

(আমার জগৎ : সঞ্চয়)

"গাইয়ে যখন গান করে তখন তার গাওয়াটা প্রতিমুহূর্তে চলতে থাকে। কিন্তু সমগ্র গানটা সকল মুহূর্তকে ছাড়িয়ে স্থির হয়ে আছে। যেটা কোনো গাওয়ার মধ্যেই চলে না সেটা গানই নয়, যেটা কোন গানের মধ্যে স্থির প্রতিষ্ঠ হতে না পারে তাকে গাওয়াই বলা যেতে পারে না।" (আমার জগৎ : সঞ্চয়)

"এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ প'রে অভিসারে চলেছে—ওই কালোর দিকে, ওই অনির্বচনীয় অব্যক্তের দিকে। ***

আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে দেখতে পাই, ওই কালো অনন্ত আসছেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ময়ী আনন্দ মূর্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেইজন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজছে অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্ছে।*** অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলই আপনাকে প্রকাশ করছেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্ছেন।

এই অব্যক্ত কেবলই যদি না মাত্র শূন্যমাত্র হতেন তাহলে প্রকাশের কোন অর্থই থাকত না, তাহলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত তা হলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত। কেবলই আরো কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুলত না।***

কিন্তু মানুষ যদি উল্‌টো পিঠেই চোখ রাখে, বলে, সবই যাচ্ছে, কিছুই থাকছে না; বলে জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা কিছু দেখছি এ-সমস্তই 'না', তা হলে এই সব প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে ভয়ঙ্কর

ক'রে দেখে; তখন সে দেখে এই কালো কোথাও এগোচ্ছে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য করছে। আর, অনন্ত রয়েছেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মতো চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ করতে পারছে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই; আর যিনি কেবল মাত্র আছেন তিনি স্থির, তাই প্রলয়রূপিনী না থাকা তাঁকে লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই; এখানে যোগের অর্থ হচ্ছে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়। প্রলয়ে এক।" (জাপানযাত্রী)

"জগতের মধ্যে জগদীশ্বরের যে প্রকাশ, সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। এই সীমায় অসীমে বৈপরীত্য আছে, তা না হলে অসীমের প্রকাশ হতে পারত না, কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্য থাকত তা হলেও সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।

এক জায়গায় সীমার সঙ্গে অসীমের সামঞ্জস্য আছে। সে কোথায়? যেখানে সীমা আপনার সীমার মধ্যেই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে চলেছে। সেই চলায় তার শেষ নেই—সে চলায় সে অসীমকে প্রকাশ করছে।" (আমার প্রকাশ : শান্তিনিকেতন)

"সীমা আছে একথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন একথা তেমনি সত্য। আমরা উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখন আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনি আমরা একটা ভুল করিয়া বসি যে, আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব—যেন আত্মহত্যা করিলেই অমর জীবন পাওয়া যায়। যেন আমি না হইয়া আর কিছু হইলেই আমি ধন্য হইব। কিন্তু আমি হওয়াও যা, আর কিছু হওয়াও যে তাহাই, সে কথা মনে থাকে না। আমার এই আমির মধ্যে যদি ব্যর্থতা থাকে তবে অন্য কোন অস্তিত্ব লাভ করিয়া তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না।" (সীমার সার্থকতা : পথের সঞ্চয়)

"সীমাহীনতার প্রতি আমাদের একটি প্রবল আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণই আমাদের জীবনকে গতি দান করে। সেই আকর্ষণকে অবহেলা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে মঙ্গল নাই। ভূমাকে আমাদের পাইতেই হইবে, সেই পাওয়াতেই আমাদের সুখ।

কিন্তু নিজের সীমার মধ্যেই সেই অসীমকে পাইতে হইবে, ইহা ছাড়া গতি নাই।" (সীমার সার্থকতা : পথের সঞ্চয়)

"আমরা নিজের সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশকে উপলব্ধি করিব, ইহাই আমাদের সাধনা। কারণ সেই অসীমের আনন্দ আমার মধ্যে সীমা রচনা করিয়াছেন; সেই সীমার মধ্যেই তাঁহার বিলাস, তাঁহার বিহার।"

(সীমার সার্থকতা : পথের সঞ্চয়)

"অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর। এইজন্য জগৎ সৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে; সীমা হইতে সীমার অভিমুখে চলিয়াছে অসীমের অভিসার-যাত্রা।"

(সীমার সার্থকতা : পথের সঞ্চয়)

"এই সীমাকে পাওয়াই সৃষ্টি অর্থাৎ সত্য; কিন্তু সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা, তাহাই নিরানন্দ, তাহাই বিনাশ।" (সীমার সার্থকতা : পথের সঞ্চয়)

দেশ-কালের বোধ আপেক্ষিক। আমাদের মন এই দেশ-কালের অন্তহীন আপেক্ষিকতাকে বোধ করিতে পারে। ইহা মনের একটি বিশিষ্ট ধর্ম। দেশ-কালের পরিবর্তন ঘটিলে, তাহা ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম যাহাই হোক, রূপের বোধ আর থাকে না। বস্তুত দেশ-কালের বৈচিত্র্য সমেত মন যাহা বোধ করে তাহাই সৃষ্টি। আমাদের বোধ হইতে বিযুক্ত করিয়া কেবলমাত্র যুক্তির ক্ষেত্রে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকিতেই পারে না।

অসীম যেখানে সীমা-রূপ লাভ করিতেছেন, সেইখানেই মনের সৃষ্টি। এই মন অন্তহীন মানব-মন রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই অন্তহীন মানব-মনের সমষ্টি কিন্তু বিশ্ব-মন নয়। বিশ্ব-মন ইহাদের আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া চিরকাল বিরাজ করিতেছেন। তাই মনে মনে অন্তহীন বোধের এক-একটি বিশিষ্ট জগৎ থাকিলেও মনের সহিত মনের আদান-প্রদান সম্ভব।

অসীমের ইচ্ছা এই মনের তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া অন্তহীন দেশ-কালের মাত্রার, অর্থাৎ অনন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ এই রূপের জগতের সৃষ্টি করিয়াছে।

মনুষ্য-চেতনা ব্যক্তিগত অথবা সমষ্টিগত মনের সীমাকে অতিক্রম করিয়া সেই বিশ্ব-ইচ্ছায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, যেখান হইতে রূপের স্রোত ধারায় ধারায় দেশ-কালের বক্ষে ঝরিয়া পড়িতেছে।

সেইজন্য দেশ-কালের বৈচিত্র্য বা খণ্ডতা যেমন সত্য, দেশ-কালের অতীত অখণ্ডতা বা সমগ্রতাও তেমনি সত্য। শুধু খণ্ডতা বা আংশিকতা মিথ্যা, আবার অংশ বা খণ্ডতাবিহীন সমগ্রতাও মিথ্যা। উভয়কে মিলিত করিয়া দেখাই পূর্ণ দেখা।

সীমা ও অসীমে পার্থক্য আছে নহিলে সৃষ্টি হইত না। যদি উভয়ের মধ্যে একান্ত বিরোধ থাকিত তাহা হইলেও সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়িত। অসীম আপনার অসীমতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াই অন্তহীন সীমারূপে আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন। এইখানেই সীমার সহিত অসীমের সামঞ্জস্য।

'আমার জগৎ' নিবন্ধটির কিছু বিস্তারিত অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার মন ইন্দ্রিয়যোগে ঘন দেশের জিনিসকে একরকম দেখে, ব্যাপক দেশের জিনিসকে অন্যরকম দেখে, দ্রুত কালের গতিতে একরকম দেখে, মন্দ কালের গতিতে অন্যরকম দেখে—এই প্রভেদ অনুসারে সৃষ্টির বিচিত্রতা।*** বিচিত্র দেশ-কালের ভিতর দিয়ে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টির লীলা দেখা।*** দেশ-কালের বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে আমাদের মন যা দেখছে তাই সৃষ্টি।*** আমার বোধকে বাদ দিয়ে যুক্তি দ্বারা যা দেখছি তাই প্রলয়, আর বোধের দ্বারা যা দেখছি তাই সৃষ্টি।

* * *

আমার একটুকরো মন যদি বস্তুত কেবল আমারই হত, তাহলে মনের সঙ্গে মনের কোন যোগই থাকত না। মন পদার্থটা জগদ্ব্যাপী। আমার মধ্যে সেটা বদ্ধ হয়েছে বলেই যে সেটা খণ্ডিত তা নয়। সেইজন্যেই সকল মনের ভিতর দিয়েই একটা ঐক্যতত্ত্ব আছে। তা না হলে মানুষের সমাজ গড়ত না, মানুষের ইতিহাসের কোন অর্থ থাকত না।

* * *

অসীম যেখানে সীমাকে গ্রহণ করেছেন সেইটে হল মনের দিক। সেই দিকেই দেশকাল ; সেইদিকেই রূপ রস গন্ধ ; সেইদিকেই তাঁর প্রকাশ।***

তাই পুরাতন ঋষি বলছেন—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো যা উ বিদ্যায়াংরতাঃ।

যে লোক অনন্তকে বাদ দিয়ে অন্তের উপাসনা করে সে অন্ধকারে ডোবে।

আর যে অন্তকে বাদ দিয়ে অনন্তের উপাসনা করে সে আরও বেশি অন্ধকারে ডোবে।

বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে।

অন্তকে অনন্তকে যে একত্র করে জানে সেই অন্তের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয় আর অনন্তের মধ্যে অমৃতকে পায়।

তাই বলে সীমা ও অসীমের ভেদ একেবারে ঘুচিয়ে দেখাই যে দেখা তাও নয়, সে কথাও আছে। তাঁরা বলছেন অন্ত এবং অনন্তের পার্থক্যও আছে। পার্থক্য যদি না থাকে তবে সৃষ্টি হয় কী করে? আবার যদি বিরোধ থাকে তা হলেই বা সৃষ্টি হয় কী করে? সেইজন্যে অসীম যেখানে সীমায় আপনাকে সঙ্কুচিত করেছেন সেইখানেই তাঁর সৃষ্টি সেইখানেই তার বহুত্ব—কিন্তু তাতে তাঁর অসীমতাকে তিনি ত্যাগ করেন নি।

* * *

অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার। সোহমস্মি। সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি। সেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা। সমস্ত সীমার মধ্যেই অসীম বলছেন অহমস্মি। আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা।

এই এক আমি আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদি চ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ কিন্তু তাই বলে একথা বলাও চলে না এই প্রকাশেই তার প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেইজন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে।" (আমার জগৎ ঃ সঞ্চয়)

"যারা আয়তনকে ঐকান্তিক সত্য বলে মনে করে তারাই অসীমের সীমা শুনলে কানে হাঁত দেয়। কিন্তু, দেশই বল, আর কালই বল, যাতে করে সৃষ্টির সীমা নির্দেশ করে দেয়, দুইই আপেক্ষিক, দুইই মায়া।*** স্বল্পকালের সংহতিতে যা চঞ্চল, বৃহৎ কালের ব্যাপ্তিতে তাই স্থির। শুধু কাল কেন, আকাশ সম্বন্ধেও এই কথাই খাটে। আমাদের দৃষ্টির আকাশে গোলাপ ফুলকে যে আয়তনে

দেখছি অণুবীক্ষণের আকাশে তাকে সে আয়তনে দেখি নে। আকাশকে আরো অনেক বেশি আণুবীক্ষণিক করে দেখতে পারলে গোলাপের পরমাণু-পুঞ্জকে বৈদ্যুতিক যুগলমিলনের নৃত্য-লীলারূপে দেখতে পারি, সে আকাশে গোলাপ একেবারে গোলাপই থাকে না। অথচ সে আকাশ দূরস্থ নয়, স্বতন্ত্র নয়, এই আকাশই। তাই পরম সত্যকে উপনিষদ বলেছেন; তদেজতি তন্নৈজতি, একই কালে তিনি চলেনও তিনি চলেনও না।

সংস্কৃত ভাষায় ছন্দ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে কাব্যের মাত্রা, আর একটি অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মাত্রা আকারে কবির সৃষ্টি-ইচ্ছা কাব্যকে বিচিত্র রূপ দিতে থাকে। বিশ্ব-সৃষ্টির বৈচিত্র্যও দেশ-কালের মাত্রা অনুসারে। কালের বা দেশের মাত্রা বদল করবামাত্রই সৃষ্টির রূপ এবং ভাব বদল হয়ে যায়। এই বিশ্ব-ছন্দের মাত্রাকে আমরা আরও গভীর করে দেখতে পারি; তা হলে চরম বিশ্ব-কবির ইচ্ছাশক্তির মধ্যে গিয়ে পৌঁছতে হবে। মাত্রা সেখানে মাত্রার অতীতের মধ্যে; সীমার বৈচিত্র্য সেখানে অসীমের লীলা অর্থে প্রকাশ পায়।

দেশ-কালের মধ্যেই দেশকালের অতীতকে উপলব্ধি করে তবেই আমরা বলতে পারি 'মরি মরি'। সেই আনন্দ না হলে মরা সহজ হবে কেমন করে।"

(পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

ব্রহ্মের সীমা-রূপটিকে বলা হয় সত্য। এই সত্য প্রকাশ আপনার গতি-শীলতার দ্বারা নিয়ত সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। সত্যের এই নিয়ত প্রকাশ এবং পরিবর্তনশীলতার ভিতর দিয়া অনন্ত আপনাকে নিত্যকাল ধরিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

যাহাকে সীমা বলিতেছি তাহা বস্তুত সীমা নয়। সীমা যে প্রতিমুহূর্তে বিগলিত হইয়া কেবলই অসীমতাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে অসীম যিনি তিনি নিরন্তর সীমা-রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া শুদ্ধমাত্র অসীম বলিয়াও কিছু নাই। সীমা ও অসীম একেবারে ওতপ্রোত হইয়া এক অখণ্ড অস্তিত্বরূপে বিরাজ করিতেছে।

"অনন্ত ব্রহ্মের সীমা-রূপটি হচ্ছে সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্য নিয়মের সীমার মধ্য দিয়েই অনন্ত আপনাকে উৎসর্গ করছেন। প্রশ্ন এই যে, সত্য যখন সীমায় বদ্ধ তখন অসীমকে প্রকাশ করে কেমন করে। তার উত্তর এই যে, সত্যের সীমা আছে, কিন্তু সত্য সীমার দ্বারা বদ্ধ নয়। এইজন্যই সত্য গতিমান্‌। সত্য আপনার গতির দ্বারা কেবলই আপনার সীমাকে পেরিয়ে পেরিয়ে চলতে থাকে,

কোনো সীমায় এসে একেবারে ঠেকে যায় না। সত্যের এই নিরন্তর প্রকাশের মধ্যে আত্মদান করে অনন্ত আপনাকেই জানছেন—।'**

আমরা যাকে ভাষায় বলি সীমা সেই সীমা ঐকান্তিক রূপে কোথাও নেই, তাই সীমা কেবলই অসীমে মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমরা যাকে ভাষায় বলি অসীম সেই অসীমও ঐকান্তিক ভাবে কোথাও নেই, তাই অসীম কেবলই সীমায় রূপ গ্রহণ করে প্রকাশিত হচ্ছেন। সত্যও অসীমকে বর্জন করে শূন্য হয়ে বিরাজ করছেন না। এইজন্য ব্রহ্ম সীমা এবং সীমাহীনতা দুইয়ের অতীত, তাঁর মধ্যে রূপ এবং অপরূপ দুই-ই সঙ্গত হয়েছে।

তাঁকে বলা হয়েছে 'বলদা', তাঁর বল তাঁর শক্তি বিশ্ব সত্য রূপে প্রকাশিত হচ্ছে; আবার আত্মদা, সেই সত্যের সঙ্গে সেই শক্তির সঙ্গে তাঁর আপনার বিচ্ছেদ ঘটেনি—সেই শক্তির যোগেই তিনি আপনাকে দিচ্ছেন। এমনি করেই সসীম অসীমের অরূপ সরূপের অপরূপ মিলন ঘটে গেছে। সত্যং এবং অনন্তং অনির্বচনীয় রূপে পরস্পরের যোগে একই কালে প্রকাশমান হচ্ছে। তাই অসীমের আনন্দ সসীমের অভিমুখে, সসীমের আনন্দ অসীমের অভিমুখে।" (একটি মন্ত্র : শান্তিনিকেতন)

নদী যেমন আপনার গতির দ্বারা তীর সৃষ্টি করে এবং তীর সৃষ্টির ভিতর দিয়া আবার গতি লাভ ও রূপ লাভ করে, অসীম তেমনি দেশ-কালের সীমা-রূপের ভিতর দিয়া সীমা-রূপকে গতিশীল করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। দেশ-কালের বন্ধন না থাকিলে অসীম আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিত না। রূপ যদি স্থির থাকিত তবে রূপ বন্ধনস্বরূপ হইয়া অরূপকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকিত। নদীর কূলের মত রূপের সীমা আছে বলিয়া গতি আছে, আবার গতি আছে বলিয়া রূপ অরূপকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে।

অসীম দেশ কালের ভিতর দিয়া যে অন্তহীন রূপ দৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আপনার গতিশীলতা, পরিবর্তনশীলতার ভিতর দিয়া অসীমকে কেবলই প্রকাশ করিতেছে, এবং এই সরিয়া চলার ভিতর দিয়া দেশ-কালের অন্তর্গত এই রূপ-লোক ক্রমিক বিশিষ্টতা ও সুস্পষ্টতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

সমগ্র দেশ-কাল অর্থাৎ পরম আমি সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, ব্যক্তির অহং সম্পর্কেও একথা তেমনি সত্য। অহং নিয়ত রূপান্তরতার ভিতর দিয়া বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া আত্মাকেই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। এই নিয়ত রূপান্তরতার ভিতর দিয়া অহং-এর আধারটি ধীরে সুস্পষ্ট ও বিশিষ্ট হইয়া

উঠিতেছে, আত্মার আনন্দ ও অভিপ্রায় ক্রমে নিঃসংশয় হইয়া উঠিতেছে। অহং-এর সীমার তটে আহত হইয়া অসীমের ভাবনার অন্তহীন তরঙ্গ-লীলা

"এই আত্মা যে-দেশ দিয়ে যে-কাল দিয়ে চলেছে তার গতিবেগে সেই দেশ ও সেই কালের নানা উপকরণ সঞ্চিত হয়ে তার একটি সংস্কার রূপ তৈরি হতে থাকে—জিনিসটি কেবলই ভাঙছে, গড়ছে, কেবলই আকার পরিবর্তন করছে।***

আত্মা দেশ-কালের মধ্যে দিয়ে নানা উপকরণে এই যে নিজের উপকূল রচনা করতে থাকে তার প্রধান সার্থকতা এই যে, এই কূলের দ্বারাই তার গতি সাহায্য প্রাপ্ত হয়। এই কূল না থাকলে সে ব্যাপ্ত হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে অচল হয়ে থাকত। অহং লোকে লোকান্তরে আত্মার গতিবেগকে বাড়িয়ে তার গতিবেগকে এগিয়ে নিয়ে চলে। উপকূলই নদীর সীমা এবং নদীর রূপ— অহংই আত্মার সীমা আত্মার রূপ। এই রূপের মধ্য দিয়েই আত্মার প্রবাহ, আত্মার প্রকাশ। এই প্রকাশ পরম্পরার ভিতর দিয়েই সে নিজেকে নিয়ত উপলব্ধি করছে, অনন্তের মধ্যে সঞ্চরণ করছে। এই অহং-উপকূলের নানা ঘাতে প্রতিঘাতেই তার তরঙ্গ তার সঙ্গীত।" (নদী ও কূল : শান্তিনিকেতন)

"এইরূপে রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা অসীমকে প্রকাশ করছে। রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি না থাকলে অসীম তো অব্যক্ত হয়েই থাকতেন। ***

অহং আপনার মৃত্যুর ·রাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে। কোনো সীমাবদ্ধ পদার্থ নিশ্চল হয়ে এই অমর আত্মাকে নিজের মধ্যে একভাবে রুদ্ধ করে রাখতে পারে না। অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকে প্রকাশ করে।" (আত্মার প্রকাশ : শান্তিনিকেতন)

"অপূর্ণকে প্রতি মিনিটেই তিনি পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন বলিয়াই তো তিনি রস। তাঁহাতে করিয়া সমস্ত ভরিয়া উঠিতেছে, ইহাই রসের আকৃতি, ইহাই রসের প্রকৃতি।" (দুঃখ)

"সীমা একটি পরমাশ্চর্য রহস্য। এই সীমাই তো অসীমকে প্রকাশ করছে। এ কী অনির্বচনীয়! এর কী আশ্চর্য রূপ, কী আশ্চর্য গুণ, কী আশ্চর্য বিকাশ।*** সীমা যে ধারণাতীত বৈচিত্র্যে, যে অগণনীয় বহুলত্বে যা অশেষ পরিবর্তন পরম্পরায় প্রকাশ পাচ্ছে তাকে অবজ্ঞা করতে পারে,

এতবড়ো সাধ্য আছে কার।*** অসীমের অপেক্ষা সীমা কোনো অংশেই কম আশ্চর্য নয়, অব্যক্তের অপেক্ষা ব্যক্ত কোনো মতেই অশ্রদ্ধেয় নয়।" (সামঞ্জস্য)

জাগতিক অর্থে রূপের সীমা থাকিলেও পরমার্থত রূপের সীমা নাই। সীমা নিয়ত বিকাশ ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া, বিদীর্ণ, বিকীর্ণ, বিচ্ছুরিত ও রূপান্তরিত হইয়াই অসীমকে প্রকাশ করিতেছে। এত ভাবে এত করিয়াও সে অসীমকে সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাহার নিয়ত অস্থিরতার ভিতর দিয়া সে আপনার অসামর্থ্যকেই প্রকাশ করিতেছে, অসীমকেই অফুরান করিয়া তুলিয়াছে।

সীমা ও অসীমের যোগের তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ তাত্ত্বিক আলোচনার সহায়তায় যে ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহার আর একটি পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমরা তর্কের জোরে সোজা লাইনকে অনন্তকাল সোজা করে টেনে নিয়ে চলতে পারি। আমরা মনে করি অন্ধকারকে সোজা করে টেনে চললে সে অনন্ত কাল অন্ধকারই থাকবে। কারণ, অন্ধকারের একটা বিশিষ্টতা আছে, সেই বিশিষ্টতার কুত্রাপি অবসান নেই।

তর্কে এই প্রকার সোজা লাইন থাকতে পারে কিন্তু সত্যে নেই। সত্যে গোল লাইন। অন্ধকারকে টেনে চলতে গেলে ধীরে ধীরে বেঁকে বেঁকে এক জায়গায় সে আলোয় গোল হয়ে ওঠে। সুখকে সোজা লাইনে টানতে গেলে সে দুঃখে এসে বেঁকে দাঁড়ায়—ভ্রমকে ঠেলে চলতে চলতে এক জায়গায় সে সংশোধনের রেখায় আপনি এসে পড়ে।

এর একটি মাত্র কারণ অনন্তের মধ্যে বিরুদ্ধতার পক্ষপাত নেই।"

(নির্বিশেষ : শান্তিনিকেতন)

"এমনি করে বিশেষের পথ পার হয়ে সেই নির্বিশেষ আনন্দের মধ্যে যেমনি পৌঁছানো যায় অমনি লাইন ঘুরে আবার বিশেষের দিকে ফিরে আসে। কিন্তু তখন এই সমস্ত বিশেষকে আনন্দের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই—আর সে আমাদের বদ্ধ করতে পারে না।" (নির্বিশেষ : শান্তিনিকেতন)

সীমা ও অসীমের যোগের তত্ত্বটিকে তিনি নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই সকল ব্যাখ্যা হইতে আরো কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এমনি করে যিনি অসীম তিনি সীমার দ্বারাই নিজেকে ব্যক্ত করছেন,

যিনি অকাল স্বরূপ খণ্ড কালের দ্বারা তার প্রকাশ চলেছে। এই পরমাশ্চর্য রহস্যকেই বিজ্ঞানশাস্ত্রে বলে পরিণাম-বাদ। যিনি আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত তিনি ক্রমের ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্র রূপে মূর্তিমান করছেন—জগৎ রচনায় করছেন, মানবসমাজের ইতিহাসে করছেন।

প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য, আর আত্মার মধ্যে অহঙ্কারের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য। এই সীমা যদি তিনি স্থাপিত না করতেন তাহলে তাঁর প্রেমের লীলা কোনো মতে সম্ভবপর হত না। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্যের ভিতর দিয়ে তাঁর প্রেম কাজ করছে। তাঁর শক্তির কেন্দ্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ প্রকৃতি, আর তাঁর প্রেমের কেন্দ্র হচ্ছে অহঙ্কারবদ্ধ জীবাত্মা। এই অহঙ্কারকে জীবাত্মার সীমা বলে তাকে তিরস্কার করলে চলবে না। জীবাত্মার এই অহঙ্কারে পরমাত্মা নিজের আনন্দের মধ্যে সীমা স্থাপন করেছেন—নতুবা তাঁর আনন্দের কোনো কর্ম থাকে না।" (পার্থক্য)

"পরিপূর্ণ আনন্দ অপূর্ণের দ্বারাই আপনার আনন্দ লীলা বিকশিত করে তুলেছেন। বহুতর দুঃখ সুখ বিচ্ছেদ মিলনের ভিতর দিয়ে ছায়ালোক বিচিত্র এই প্রেমের অভিব্যক্তি কেবলই অগ্রসর হচ্ছে। স্বার্থ ও অভিমানের ঘাত-প্রতিঘাতে আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে কত বিস্তারের মধ্য দিয়ে, ছোট বড়ো কত আসক্তি-অনুরক্তিকে বিদীর্ণ করে জীবাত্মার প্রেমের নদী প্রেম-সমুদ্রের দিকে গিয়ে মিলছে। প্রেমের শতদল পদ্ম অহঙ্কারের বৃন্ত আশ্রয় করে আত্ম হতে গৃহে, গৃহ হতে সমাজে, সমাজ হতে দেশে, দেশ হতে মানবে, মানব হতে বিশ্বাত্মায় ও বিশ্বাত্মা হতে পরমাত্মায় একটি একটি করে পাপড়ি খুলে দিয়ে বিকাশের লীলা সমাধান করছে।" (পার্থক্য)

"অতএব গানের তানের মতো আমাদের স্বাতন্ত্র্যের স্বার্থকতা হচ্ছে সেই পর্যন্ত যে পর্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরও অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার করে অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলা রূপে সুন্দর তাকে বিদ্রোহ রূপে বিকৃত না করে।" (চির নবীনতা)

(৫)

দিব্য জীবন লাভের জন্য মানুষকে নূতন দেহ গড়িয়া তুলিতে হয়। উহা এমন কতকগুলি বৃত্তির বিকাশ যাহাতে মর্ত্য-দেহে দিব্য-চেতনার লীলা সম্ভব।

জীবের বারংবার মৃত্যু ঘটাইয়া প্রকৃতি এই দেহাধারে নূতনতর সামর্থ্য সকল গড়িয়া তুলিবার সাধনায় রত। জীবের মৃত্যুর সার্থকতা এইখানে।

এই ধারণা পরিস্ফুট করিয়া লইলে ব্যক্তি ও আমির পৃথক মূল্য নিরূপণের যে চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সকল পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় তাহার দার্শনিক স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে।

সমগ্র মানবসমাজকে আশ্রয় করিয়া যে ধীর অভিব্যক্তি ঘটিয়া চলিয়াছে, তাহা ব্যষ্টির জীবনেও সত্য। কারণ ব্যষ্টিকে লইয়াই তো সমষ্টি। নিখিল বিশ্বের অভিব্যক্তির একটি ধারা রবীন্দ্রনাথ আপনার ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছেন। সকল ব্যক্তি-সত্তার ন্যায় কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া একটি বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে।

ব্যক্তি-সত্তা এইরূপে আপনার বিশিষ্ট যে একটি নিয়তিকে ধীরে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে তাহাকে ব্যক্তির স্বধর্ম বলা যাইতে পারে। ব্যক্তির বিকাশ যেখানে সম্পূর্ণ সেখানে ব্যক্তির স্বধর্মের সম্পূর্ণতা। ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির চেতনা যুক্ত বলিয়া সমষ্টিরও সেখানে সম্পূর্ণতা। প্রত্যেকটি ব্যষ্টি সম্পূর্ণ হইয়া সমষ্টির সম্পূর্ণতাকে চরিতার্থ করিবে। মণিহারের মধ্যে এক একটি মণি যেমন সম্পূর্ণ অথচ তাহা সমগ্রতার এক একটি অংশ।

কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার স্বধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের একটি অভিপ্রায় ধীরে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে। কবির এই ব্যক্তি-সত্তার প্রকাশ না থাকিলে ঈশ্বরের সে অভিপ্রায় অচরিতার্থ রহিয়া যাইত। বিশ্বে তাহার দ্বিতীয় আর নাই। এইরূপে তিনি ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি ব্যক্তি-সত্তার এক দুর্লভ গৌরব আবিষ্কার করিয়াছেন। বস্তুত এই গৌরবের দিক হইতে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের দিক হইতে বিচার করিলে সত্তার মূল্যের আর তারতম্য থাকে না। সত্তার এই অনন্যসাধারণ মূল্যটি তিনি এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

"এই আমিটিকে আর সকল হতে স্বতন্ত্র করে অনাদি কাল থেকে তুমি

বহন করে আসছ। কোন নীহারিকার জ্যোতির্ময় বাষ্প নির্ঝর থেকে পরমাণুকে চালন করে কত পুষ্টি, কত পরিবর্তন, কত পরিণতির মধ্য দিয়ে এই আমিকে আজ এই শরীরে ফুটিয়ে তুলেছ। তোমার সেই অনাদি কালের সঙ্গ আমার এই দেহটির মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে। অনাদি কাল থেকে আজ পর্যন্ত অনন্ত সৃষ্টির মাঝখান দিয়ে একটি বিশেষ রেখা পাত হয়ে এসেছে, সেটি হচ্ছে এই আমির রেখা।"

"এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই; আমি যদি হারাই তবে লোক-লোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। সেইজন্যেই আমাকে নহিলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেই জন্যই সমস্ত জগতের ভগবান বিশেষ রূপেই আমার ভগবান, সেইজন্যই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।"

(জাগরণ : শান্তিনিকেতন)

বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির স্বধর্মকে আশ্রয় করিয়া বিকাশের যেখানে সম্পূর্ণতা সেইখানেই ব্যক্তির মুক্তি। মুক্তির অর্থ,—ওই পরিণাম লাভ করিলে ব্যক্তির সহিত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ যোগের লীলা সংসাধিত হয়। এই লীলায় ব্যক্তির দিক হইতে আর বাধার লেশ মাত্র থাকে না।

ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যে একটি বিশিষ্ট অর্থ ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার সমগ্র অর্থটি বা তাহার যথার্থ স্বরূপ এই পরিণামী অবস্থায় বোধ করা অসম্ভব। জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া জীবন যেখানে সম্পূর্ণ হয় কেবলমাত্র সেই পরিণামে আসিয়া পৌছাইলে অতীত জীবনের সকল স্মৃতি একটি পরিপূর্ণ অর্থের সহিত সঙ্গত হইয়া উদ্ঘাটিত হয়। একটি কবিতা-পাঠ সম্পূর্ণ হইলে যেমন ইতিপূর্বের সকল পংক্তির বিচ্ছিন্ন অর্থ একটি অখণ্ড ভাবের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত হইয়া প্রকাশ পায় ইহাও কতকটা তেমনি।

এই সম্পর্কে ইংরেজ কবি স্টপফোর্ড ব্রুকের সহিত তাঁহার যে আলোচনা হয়, সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"তাঁহার বিশ্বাস নানা জন্মের মধ্য দিয়া যখন আমরা একটি জীবনচক্র

সমাপ্ত করিব, তখন আমাদের পূর্ব জন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণ হইয়া জাগ্রত হইবে। এ কথাটি আমার মনে লাগিল। আমার মনে হইল, একটি কবিতা পড়া যখন আমরা শেষ করিয়া ফেলি তখনি তাহার সমস্ত ভাবটি পরস্পর গ্রথিত হইয়া আমাদের মনে উদিত হয়; শেষ না করিলে সকল সময় সেই সূত্রটি পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে একটি অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়া এক-একটি জন্মমালা গাঁথিয়া চলিয়াছি; গাঁথা শেষ হইলেই যে একেবারে ফুরাইয়া যায় তাহা নহে, কিন্তু একটি পালা শেষ হইয়া যায়। তখনি সমস্তটাকে স্পষ্ট করিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" (স্টপফোর্ড ব্রুক: পথের সঞ্চয়)

মুক্তি তাঁহার নিকট অহং বা আমিত্ব বোধের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি নয়, আমিত্বের সম্পূর্ণতা। তিনি এইরূপে ব্যক্তির অহং-এর আর একটি পৃথক মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সকল উপকরণ যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, মানুষের সৃষ্টি ঠিক তেমনি নয়। অথচ সেই একই সৃষ্টি-প্রেরণা মানুষের অন্তরে। মানুষও ঈশ্বরের মত সৃষ্টি করিতে চায়। মানুষ আপনার অহং-এর সীমার বেষ্টনের মধ্যে বিশ্বের কতকগুলি সামগ্রীকে আহরণ করিয়া আপনার বলিয়া গৌরব বোধ করে। তাহার পর সৃষ্টির ভিতর দিয়া এই সকল উপকরণ বিশ্বে প্রত্যর্পণ করে। অহং-বোধ না থাকিলে মানুষ এই সৃষ্টির গৌরব দানের গৌরব বোধ করিতেই পারিত না।

"শক্তির দ্বারা অহং শুধু যে উপকরণ সংগ্রহ করে তা নয়, সে উপকরণকে বিশেষভাবে সাজায়, তাকে একটি বিশেষত্ব দান করে গড়ে তোলে। এই বিশেষত্ব দানের দ্বারা সে যা-কিছু গড়ে তোলে তাকে সে নিজের জিনিস বলেই গৌরব বোধ করে। ***

এই যে তিনি আমার বলবার অধিকার দিয়েছেন, এই অধিকারটি কেন? এর চরম উদ্দেশ্যটি কী?

এর চরম উদ্দেশ্য এই যে পরমাত্মার সঙ্গে আত্মার যে একটি সমান ধর্ম আছে সেই ধর্মটি সার্থক হবে। সেই ধর্মটি হচ্ছে সৃষ্টির ধর্ম্ম অর্থাৎ দেবার ধর্ম। দেবার ধর্ম্মই হচ্ছে আনন্দের ধর্ম্ম। *** অহং-এর দ্বারা আমরা আমার জিনিস সংগ্রহ করি নইলে বিসর্জ্জন করবার আনন্দ যে ম্লান হয়ে যাবে।"

(অহং: শান্তিনিকেতন)

সুখ দুঃখ প্রভৃতি মানবিক বিচিত্র সংখ্যাতীত বোধের সমষ্টি লইয়া আমাদের এই জীবন। ইহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে কোন অর্থই লাভ

করিতে পারা যায় না। কিন্তু যদি এই বোধটি সত্য করিয়া জাগে যে এই সকল বিচিত্র বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধ বোধের ভিতর দিয়া একটি সত্য ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, এবং সেই সত্যবোধের মধ্যে এই সকল বোধ নিয়তই সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যাইতেছে; তাহা হইলে জীবনের সমগ্র অর্থটি ধরা পড়ে। তখন এই বোধটি জাগে যে যে-সৃষ্টি-প্রেরণা নিখিল বিশ্বের অন্তরালে থাকিয়া অন্তহীন সৃষ্টিরূপে আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে; ব্যক্তির সকল বোধের, সকল সৃষ্টি-প্রেরণার পশ্চাতে তাহাই নিগূঢ় প্রেরণা-রূপে ক্রিয়া করিতেছে। একই আনন্দ-প্রেরণায় ব্যক্তি ও বিশ্ব বিধৃত হইয়া আছে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ধীর বিকাশ ঘটে একমাত্র বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া। বহির্বিশ্বের বর্ণ, গন্ধ, ধ্বনি মানব-অন্তরে অন্তহীন ভাবনা সঞ্চারিত করিয়া দেয়, সংখ্যাতীত অনুভূতি, অলৌকিক বিচিত্র কল্পনা। সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে পরিণামে জীবন ও জগৎ সম্পূর্ণ অস্বীকৃত। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিত্বের যে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে হয় বিশ্বের সহিত যোগসাধনের ভিতর দিয়া। যে ব্যক্তি-সত্তার বিশ্বের সহিত যোগ যত বেশি তাহার ব্যক্তিত্বের প্রসারতাও তত বেশি। ইহা তাত্ত্বিক কোন যোগ নয়, মানবিক সকল বোধ, হৃদয়-মন ও মনীষা লইয়া বিশ্ব-হৃদয় মন ও মনীষার সহিত মিলন।

"জীবনের সমস্ত সুখ-দুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে অনুভব করি তখন আমাদের ভিতরকার এই সমস্ত সৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে —প্রত্যেক কথাটি বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত পদটির অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনশক্তির অখণ্ড ঐক্য-সূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি; বুঝতে পারি, যেমন গ্রহ নক্ষত্র চন্দ্র সূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি অনাদি কাল ধরে একটা সৃজন চলছে—আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে—এর থেকে কী হয়ে উঠবে জানিনে, কারণ আমরা একটি ধূলিকণাকেও জানিনে, কিন্তু নিজের প্রবহমান জীবনটাকে যখন নিজের বাহিরে সমস্ত দেশ-কালের সঙ্গে যোগ করে দেখি তখন জীবনের সমস্ত দুঃখগুলিকেও একটি বৃহৎ

আনন্দ সূত্রের মধ্যে গ্রথিত দেখতে পাই।* * আমার সঙ্গে আর অনন্ত জগৎ-প্রাণের সঙ্গে যে চিরকালের নিগূঢ় সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধের প্রত্যক্ষগম্য বিচিত্র ভাষা হচ্ছে বর্ণ গন্ধ গীত—চতুর্দিকে এই ভাষার অবিশ্রাম বিকাশ আমাদের মনকে লক্ষ্য অলক্ষ্য ভাবে ক্রমাগতই আন্দোলিত করছে—কথাবার্তা দিনরাত্রিই চলছে।" (ছিন্নপত্র)

আমরা ব্যক্তি-সত্তা বলিতে যাহা বুঝি তাহা ব্যক্তিমাত্রেরই এক সাধারণ নির্বিশেষ সত্তা, ইহাকে জীবাত্মা বলা হয়। মানুষের জীবনে ইহার উপলব্ধি ঘটিলে নিম্নতর সকল মানবিক বোধ স্খলিত হইয়া যায়,—তাহা ওই বোধ-লাভের ক্ষেত্রে অনস্তিত্ব হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-সত্তার যে পূর্ণতার কথা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ব্যক্তির নিম্নতম হইতে উচ্চতম সকল বোধ সামঞ্জস্যীভূত। ব্যক্তির শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক উপলব্ধির মূহূর্তে মানবিক বহু বিচিত্র জটিল পরস্পর বিরুদ্ধ বোধ একটি অখণ্ডতা লাভ করে, একটি পরিপূর্ণ সুষমার মধ্যে সঙ্গত হইয়া যায়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা সাধনের ক্ষেত্রে কোন বোধের অস্বীকৃতি নাই। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে জীব-সত্তা এবং অধ্যাত্ম-সত্তা স্পষ্ট দ্বিধাকৃত নয়। জীবন এক অখণ্ড তত্ত্ব। তাহাকে এইরূপে স্পষ্ট দ্বিধা করিবার কোন উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ এইরূপে ব্যক্তিত্বের যে একটি বিশিষ্ট মূল্যের আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাকে আধুনিক যুগের একটি বিশিষ্ট দার্শনিক উপলব্ধি বলা যাইতে পারে। ঊনবিংশ শতকের ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ইহার প্রথম প্রকাশ ঘটে। তাহার পর অবিচ্ছিন্ন ভাবে পাশ্চাত্যে যত নাস্তিক্য ও আস্তিক্য দর্শন, যত চিন্তা-পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলির মধ্যে কোন-না-কোন ভাবে ব্যক্তির একটি বিশিষ্ট, অনন্যসাধারণ মূল্য আবিষ্কারের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

এই সম্পর্কে একজন ইংরেজ সমালোচকের একটি মন্তব্য এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"In the Middle Ages, the quality which man shares with God and which the creatures do not have is a will that can make free choices, what separates man from God is sin; that he can and does choose wrongly, love himself, act selfishly. The function of the poet is to exhibit the human soul tempted

by competing loves, and to celebrate the ways in which she can be redeemed.

In the neo-Classical period, the divine human quality is reason, the capacity to recognize general laws, and the function of the poet is to celebrate the Rational City and to power scorn in its enemies.

Towards the end of the eighteenth century—Rousseau is one of the first symptoms—a new answer appears. The divine element in man is held to be neither power nor free will nor reason, but self-consciousness. Like God and unlike the rest of nature, man can say 'I'. ***

Thus the subject of the greatest long poem of this period, the Prelude is not a heroic action like the seize of Troy, nor a decisive choice like the Fall of Man, nor a threat to civilization like Goddess of Dulness, but the growth of a poet's mind."

(*Poets of the English Language : Auden and Pearson*)

রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতার স্বতন্ত্র মূল্য থাকিলেও এবং এইরূপে তাহা এক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণতা লাভ করিলেও সমগ্র কাব্য-প্রবাহের ভিতর দিয়া কবি সত্তার ধীর উন্মেষের পরিচয় লাভ করা যায়। সত্তার একের পর এক আবরণ উন্মোচনের, তাহার বহু বিচিত্র প্রকাশ-রূপই হইল তাঁহার কাব্যের বিষয়বস্তু।

সত্তার স্বধর্মের ভিতর দিয়া এই যে ধীর বিকাশ, যাহা জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া প্রকাশমান তাহাকেই তিনি আপনার ধর্ম বলিয়াছেন। ধর্মের সর্বজনীন সর্বকালিক একটি রূপ থাকিলেও ধর্ম ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এইরূপ বিশিষ্ট।

"আমরা বাহিরের শাস্ত্র থেকে যে ধর্ম্ম পাই সে কখনো আমার ধর্ম হয়ে ওঠে না, তার সঙ্গে কেবল একটা অভ্যাসের যোগ দৃঢ় হয়ে আসে—যে ধর্ম আমার জীবনের ভিতরে সংসারের দুঃসহ তাপে ক্রিস্টলাইজ্‌ড্‌ হয়ে ওঠে সেই আমার যথার্থ। * * * সেই জিনিসটাকে নিজের মধ্যে উদ্‌ভূত করে তোলাই মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্বের চরম ফল। চরম বেদনায় তাকে জন্মদান করতে হয়, নিজের শোণিত দিয়ে তাকে প্রাণদান করতে হয়—তারপরে জীবনে সর্বতো-ভাবে সুখী না হয়েও চরিতার্থ হয়ে মরা যেতে পারে।" (ছিন্নপত্র)

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইংরেজ সমালোচকদ্বয় যে মন্তব্য করিয়াছেন অনুরূপ মন্তব্য ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিক কবিদের প্রায়

প্রত্যেকের সম্পর্কে করা যাইতে পারে। নিম্নে কোলরিজের এক উক্তি উদ্ধৃতটি করিতেছি এবং সেই সঙ্গে কোলরিজের দার্শনিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বুঝাইতে J. H. Muirhead-এর উক্তি।

"In the lowest forms of thc vegetable and animal world we perceive totality dawning into individuation, while in man, as the highest of the class, the individuality is not only perfected in its corporeal sense, but begins a new series beyond the appropriate limits of physiology. The tendency to individuation, more or less obvious, constitutes the common character of all classes, as far as they maintain for themselves a distinction from the universal life of the plant ; while the degrees, both of intensity and extension, to which this tendency is realised, from the species and their ranks in the great scale of ascent and expansion." (*Coleridge*)

কোলারিজের উক্তির মূল বিষয় হইল বিশ্ব এবং প্রকৃতির মধ্যে ব্যক্তি-সত্তার পৃথক অর্থ ও স্থান নির্দেশ করা। কোলরিজের এই জীবন-দর্শন সম্পর্কে দার্শনিক J. H. Muirhead যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা প্রাণিধানযোগ্য।

"In nature individuality is not be looked for in any self sustaining atom or cell, but in the extent to which a structure is able to reach out to and assimilate elements lying beyond the limits of its own Space and time existence, and thus to link itself with the whole to which it belongs, whole at the same time rounding itself of into a self-maintaining unit with in the lager sphere. Towards such individuality, expressing itself in ever high forms, all nature moves, rising on stepping-stones, out of dead but of living selves, each reflecting at its own level and according to its own capacity to the glories of the whole.

In human life the seat of individuality, now become self-conscious personality, is similarly to be sought for not in any centre of isolated and insolating feeling. but in the degree to which a man passes beyond the limits temporal and spiritual with in which there feeling confines him, and identifies him-

self, in thought, feeling and action. With larger life about him while remaining a self-integrating member of it. The infinite whole of which this larger life consists may be the only complete individual, the only completely comprehensive and self sustaining being—therefore the only person in the fullest sense of the word. But infinite spirits may attain to a share in that fullest, in proportion as they approximate to its all-indusive life." (*J. H. Muirhead : Coleridge as Philosopher*)

গত প্রায় দেড় শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপে একটি দার্শনিক চিন্তাপদ্ধতির উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই চিন্তাপদ্ধতিকে বলা হয় অস্তিত্ববাদ (Existentialism)। এই মতবাদের প্রথম উদ্ভব হয় জার্মানিতে, পরে ফ্রান্সে, ইটালিতে, ইংলণ্ডে এবং পরে আমেরিকায় ইহার প্রভাব উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। Kierkgaard, Hussert, Karljaspers, Heidegger, Sartre, Marcel, Micolas Berdyaev প্রভৃতি মনীষী যাঁহারা এই চিন্তাধারার জন্মদাতা এবং পরিপোষক তাঁহাদের চিন্তা-পদ্ধতির ও উপলব্ধির মধ্যে বিলক্ষণ বৈচিত্র্য থাকিলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে মিল আছে।

তাঁহাদের উপলব্ধির একটি প্রধান দিক হইল ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রক্ষা করা, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মর্যাদা দান করা, ব্যক্তিত্বকে পূর্ণ বিকশিত করা। ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতিই শুধু নয়, জগৎকে তাহার এই স্বরূপেই পূর্ণ স্বীকৃতি দান করা তাঁহাদের চিন্তাধারার আর একটি বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তি ও বিশ্বের স্বীকৃতির সহিত ইহার বিকাশের একটি স্বীকৃতিও অধিকাংশ বাস্তববাদীদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা যে অতিজাগতিক বিচিত্র দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতে ব্যক্তি পরিণামে এক নির্বিশেষ আদি অন্তহীন চেতনা-সমুদ্রে বিলীন হইয়া যায়। ইহাই ব্যক্তির স্ব-স্বরূপতা লাভ। ইহাই মুক্তি। প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়াতীত চিরন্তন ভাব-লোকে আমাদের প্রত্যেকের যে আদর্শ প্রতিরূপ আছে, তাহাকেই ফিরিয়া লাভ করা ব্যক্তির স্ব-স্বরূপতা লাভ। তাহাই মুক্তি। ব্যক্তির অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের কোন স্বীকৃতি, তাই এই সকল দার্শনিক চিন্তায় নাই।

অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় (Democracy, Marxism, Fascism

প্রভৃতি যে কোন রাষ্ট্ররূপ) যন্ত্র ক্রমে ক্রমে যে স্থান অধিকার করিয়া চলিয়াছে তাহাতে ব্যক্তির পৃথক মূল্য আর নাই। মানুষ যন্ত্রকে পরিচালিত করিবার চেষ্টায় এক নির্বিশেষ যন্ত্র মাত্রে পরিণত হইয়াছে। অতিজাগতিক দর্শন হোক, অথবা জড়দর্শন হোক, ব্যক্তি তাহার স্বীয় বৈশিষ্ট্য ও অনন্যসাধারণ মূল্য হারাইয়াছে।

অতিজাগতিক দর্শনে যে সত্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহাতে জীবন ও জগৎ পরিণামে অস্বীকৃত। একটা যোগের কথা কোন না কোন ভাবে বলা হইলেও তাহার সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা সর্ব্বত্রই ব্যর্থ হইয়াছে। আদৌ পরমার্থিক বোধে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্যক্তি ও বিশ্বের সহিত যে যোগের উপলব্ধি তাহাতে ব্যক্তি ও বিশ্ব নিশ্চয়ই আর এই স্বরূপে অবস্থান করে না। অন্যদিকে জড়দর্শন মনুষ্য-সমাজ ও বিশ্বের জাগতিক সত্যকে স্বীকার করিয়া একদিকে অতিজাগতিক সত্য এবং অন্যদিকে ব্যক্তির অনন্যসাধারণ মূল্যকে অস্বীকার করিয়াছে।

অহং বা ব্যক্তি-সত্তা বলিতে অনেকে নৈতিক সত্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহাদের মতে নৈতিক সত্তাটিই যথার্থ ব্যক্তি-সত্তা। বহি-র্বিশ্বের প্রতিকূলতা ও প্রলোভনকে প্রতিনিয়ত জয় করিয়া এই সত্তাটিকে লাভ করিতে এবং অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়।

দার্শনিকদের মধ্যে আর একটি সম্প্রদায় আছেন, যাঁহাদের মতে ব্যক্তি-সত্তা পাপ বা অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছু নয়। তাঁহারা মানব-সত্তাকে উর্ধ্ব ও নিম্ন দুটি সত্তায় বিভক্ত করিয়াছেন। প্লেটো ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মধ্যে এই উপলব্ধির পরিচয় লাভ করা যায়। প্লেটোর চিরন্তন ভাব-লোকের উপলব্ধি এবং উর্ধ্বতর সত্তার ধারণার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। ব্যক্তি যতই আপনার নিম্নতর সত্তাকে বিস্মৃত হয়, যতই ইহার উর্ধ্বে উঠিতে পারে, তাহার চেতনা ততই চিরন্তন ভাব-লোকের সহিত মিলিত হইতে থাকে। উর্ধ্বতর সত্তা বস্তুত নির্ব্বিশেষ সত্তা। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের জীবনে ঈশ্বরীয় অনুপ্রেরণা অনুভূত হয়। এই অনুপ্রেরণাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ নিম্নতর সত্তার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। এ্যারিস্টটলের Creative Nous-এর মধ্যে অনুরূপ উপলব্ধির পরিচয় লাভ করা যায়। সমগ্র ভারতীয় দর্শনে মোটামুটি এই উপলব্ধিই ক্রিয়া করিয়াছে।

মানবীয় সত্তা আপনার বিচিত্রবোধ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিচিত্র প্রয়াস,

অনুভূতি, কল্পনা, অভিপ্রায় ও অনাকাঙ্ক্ষার এক আশ্চর্য জটিল প্রকাশ। এই সমস্ত কিছুকে আশ্রয় করিয়া সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া, সমস্ত কিছুর যোগসূত্র স্বরূপ একটি মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব কোন-না-কোন স্বরূপে থাকে। এই মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বটিই মানুষের জীবনে একটি অখণ্ডতা দান করে। এই অখণ্ডতা বোধের ক্ষেত্রে একজন মানুষ অন্য একজন মানুষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। এই সত্তাই বিশ্বে অনন্য।

ব্যক্তি-সত্তার এই বহু বিচিত্র বোধের মিলিত প্রকাশ স্বরূপতার জন্য, ব্যক্তির বিশ্ব-সত্তা লাভ বলিতে কোন মিস্টিক যোগ, কোন মানবিক বোধাতিরিক্ত তাত্ত্বিক মিলন বুঝায় না। ইহা এক অন্তহীন জটিল ঐক্য। ব্যক্তি এই স্বরূপ লইয়া যতই বিশ্ব-সত্তাকে লাভ করিতে থাকে, তাহার এই জটিলবোধ ততই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বিশ্বের পরিপূর্ণ সুষমার সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের মধ্যে ততই পূর্ণ সামঞ্জস্য বা সুষমা ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

এই পরিণাম লাভ ঘটিলে ব্যক্তি-সত্তার বিনষ্টি ঘটে না। কিংবা ব্যক্তি কোন এক নির্বিকার একাকারত্বের মধ্যে বিলীন হইয়া যায় না। এই পরিণামে ব্যক্তি আপনার যথার্থ মহিমা লাভ করে। ঈশ্বরীয় যে অভিপ্রায় অন্তহীন বৈচিত্র্য পরিপূর্ণ ব্যক্তি সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে চরিতার্থতা লাভ করিতেছে, সেই অভিপ্রায়কে ব্যক্তি-সত্তা তখন সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া চরিতার্থ করে। ব্যক্তির সহিত ঈশ্বরের তখন 'প্রত্যক্ষ যোগের লীলা' সাধিত হয়।

জীবন ও জগৎ এবং ব্যক্তি-সত্তার অনন্যসাধারণ মূল্যের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি ছাড়া সর্বাঙ্গীন কোন জীবন-দর্শনের প্রতিষ্ঠা বর্তমান যুগে একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে।

অতি জাগতিক সত্যের উপলব্ধির দিক হ তে যাহারা অস্তিত্ববাদীদের তীব্র প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাও ইঁহাদের ব্যক্তির অনন্য সাধারণ মূল্যের আবিষ্ক্রিয়ায় অভিনন্দন না জানাইয়া পারেন নাই। নিম্নে ইহার স্বীকৃতি সূচক দুই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"Hence we can say that person is subjective-intellectual-psychical life and action, as well as creative reality of the spirit,—distinct from the spirit as a mere impersonal 'it', the spirit of order and the world of spiritual forms. Most striking the person is a unity of intellectual, psychical and vital powers

and, through his autonomous though limited freedom, is capable of impressing his unique stamp on everything.

For this reason the person is not pure change or active movement, but ultimately the background of all its development and alterations which remains the same, a fact once more realized also by Marcel. According to him the person is not only changing existential subjectivity, but is also related to the being of the world, which retains its own dignity and represents not only what is 'at hand' and ultimately, to the being of God. Thus the being of the person as the growth of unfolding genuine existence joins both the being of finiteness and that of infinity." (*Beyond Existentialism* : *T. Von Rintelen*)

"True, the person is fundamentally unique existence, ** directed towards perfection in its own proper way. It can be apprehended neither by universal notions nor by the senses." (*Ibid*)

রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-ধর্মের মধ্যে এমনি একপ্রকার চলচঞ্চলতা, প্রবহমানতা, নিত্য-নূতন রূপলাভের রূপসৃষ্টির অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ইহাও নিঃসংশয়িত ভাবে সত্য যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের কোন পর্যায়ে অতি জাগতিক সত্যে বিশ্বাস হারান নাই। তাঁহার জীবন-দর্শনে একদিকে অতিজাগতিক সত্য, অন্যদিকে জাগতিক সত্য সর্বত্রই সামাঞ্জস্যসাধনের পথ খুঁজিয়া ফিরিয়াছে।

অস্তিত্ববাদীরা নিয়ত পরিবর্তনশীলতা মানেন, নিত্য নব রূপতা লাভ ও নব রূপ সৃষ্টিকে মানেন, কিন্তু ইহার ভিতর দিয়া কোন সত্য যে ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করেন না।

রবীন্দ্রনাথ নিত্য নূতন রূপ সৃষ্টির জন্য উন্মুখ। কিন্তু এই সকল রূপের ভিতর দিয়া সকল রূপের অতীত যে এক অরূপ বা অসীমের আস্বাদ লাভ ঘটিতেছে তাহাও তিনি বলিয়াছেন। নইলে রূপ সৃষ্টি ব্যর্থ। শুধু রূপ তো মৃত্যু। অরূপ রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে অন্তহীন ভাবে প্রকাশ করিতেছেন। সীমা অসীমের আনন্দ বা অমৃত রূপ। সকল রূপান্তরের পশ্চাতে একটি স্থির

বিকাশের ধারা আছে বলিয়া রূপের মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে। রূপ এইরূপে ক্রমাগত সুস্পষ্ট, অর্থযুক্ত, সুন্দর ও চিরন্তন মূল্য সমন্বিত হইয়া উঠিতেছে।

অতিজাগতিক সত্তার অস্তিত্ব যতখানি সত্য ঠিক ততখানি সত্য জীবন ও জগৎ। পূর্ণ জীবন-দর্শনে এই তিনের যোগের রহস্যভেদ চাই।

অস্তিত্ববাদীরা কেহ জড়বাদের দিক হইতে কেহ বা অতিজাগতিক সত্যের দিক হইতে ব্যক্তির চূড়ান্ত মূল্য স্বীকার করেন; কিন্তু তাঁহারা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, ব্যক্তির সহিত বিশ্বের, বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীত সত্যের যোগের রহস্য-ভেদ করিতে পারেন নাই।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি, বিশ্ব (নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতি ও নিখিল মানব-সমাজ) ও অতিজাগতিক সত্যের চূড়ান্ত অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তাঁহার পূর্ণ জীবন-দর্শন এই প্রত্যেকটি সত্তার মধ্যে পূর্ণ যোগসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ইহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে এক অনির্দেশ্য শক্তি তাঁহার জন্মজন্মান্তর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ব্যক্তি-সত্তায় তাহার কিছু আভাস-মাত্র লাভ করিতে পারা যায়।

বস্তুত মানস-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়াই তাহার কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যায়। মানস-লোকের গভীরে অধিচেতনা কিংবা আরও গভীরে দিব্য-চেতনার যে লীলা তাহার স্বরূপ কি, জীবনকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কোন্ সাধনা চলিতেছে, তাহার কোন উপলব্ধি ব্যক্তি-চেতনায় লাভ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের নিকটও তাই তাহার স্বরূপ অজ্ঞাত ছিল। কেবল দিব্য-চেতনা লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবনের সামগ্রিক রূপ, তাহার সমগ্র অর্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'মানব সত্য' নিবন্ধের মধ্যে জীবন-দেবতা সম্পর্কে এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন।

"পরমপুরুষ আছেন এই সমস্তকে অধিকার করে এবং অতিক্রম করে। সত্তার এই দুই দিককে সব সময়ে মিলিয়ে অনুভব করতে পারি নে। একলা আপনাকে বিরাট থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুখে-দুঃখে আন্দোলিত হই। তার মাত্রা থাকে না, তার বৃহৎ সামঞ্জস্য দেখি নে। কোন এক সময়ে সহসা দৃষ্টি ফেরে তার দিকে; মুক্তির স্বাদ পাই তখন। যখন অহং আপন ঐকান্তিকতা ভোলে তখন দেখে সত্যকে। আমার এই অনুভূতি কবিতাতে প্রকাশ পেয়েছে জীবন দেবতা শ্রেণীর কাব্যে।"

দার্শনিকগণ মন ও আত্মার মধ্যবর্তী উন্নততর ও সূক্ষ্মতর নানা চেতনা পর্য্যায়কে মনের প্রসার বলিয়া বোধ করেন বলিয়া মন ও আত্মার মধ্যে আর কোন চেতনা-লোকের স্পষ্টত উল্লেখ করেন নাই।

মনের ধর্ম যে লোকে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে, বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে নির্জ্ঞান মন, অবচেতনা অধিচেতনা, ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন, শাস্ত্রকারগণ যাহাকে বলেন বাসনা-লোক, অথচ আত্মার প্রকাশ সম্পূর্ণ নয়, এমন একটি চেতনা-পর্যায়কে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

বিশ্ব-চেতনা বা ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যবর্তী আর একটি পর্যায় যাহার মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক আর কিছুটা ব্যক্তি-স্বরূপতা লাভ করিয়াছে তাহাকে রবীন্দ্র-নাথ জীবন-দেবতা আখ্যা দান করিয়াছেন। ব্যক্তি-লীলা-রসাস্বাদই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী বলিয়া সর্ব-রস-সাধারণ বোধটিকে ক্রমাগত অ-সাধারণ করিয়া তুলিবার একটি প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবল ছিল। জীবন-দেবতা তাহারই প্রকাশ।

"এই সত্তার নিকট আমি আমার ভিতরের সৃষ্টির জন্য দায়ী। এই সৃষ্টি যেমন আমার, তেমনি তাঁহারও। হইতে পারে ইহা সেই একই সৃজনকারী মন যাহা বিশ্বকে তাহার চিরন্তনভাবে রূপায়িত করিতেছে, কিন্তু আমি মানুষটির মধ্যে তাহার একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্কের কেন্দ্র আছে। এই সম্পর্ক ক্রমিক গভীরতর চেতনা লাভ করিতেছে।"

আমাদের সকল কার্য, সকল চিন্তা, ভাবনা সমস্ত কিছু সংস্কাররূপে মনের মধ্যে থাকিয়া যায়, কখন বিনষ্ট হয় না। ইহার সহিত সচেতন মনের কিছু যোগ থাকে সত্য, কিন্তু এই সংস্কার আরও গভীরে যে সূক্ষ্ম বাসনা-লোক সৃষ্টি করে তাহার সহিত সচেতন মনের আর প্রত্যক্ষ কোন যোগ থাকে না। সচেতন মনের সীমার বহির্লোকে এই বাসনা-লোক।

মৃত্যুতে স্থূল দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু উহা সূক্ষ্ম ভাব বা বাসনা রূপে থাকিয়া যায়। শাশ্বত আত্মার সহিত এই সূক্ষ্ম রূপটিও শাশ্বত। নির্বিশেষ ও বিশেষের এই লীলা তাই চিরন্তন।

আত্মার সহিত সংলগ্ন এই বাসনা পুনরায় স্থূলরূপ পরিগ্রহ করে। পূর্ববর্তী জীবনের বাসনা বর্তমান জীবনের আমোঘ এবং অনিবার্য নিয়ন্তা হয়।

মুক্তির কোন তত্ত্ব স্বীকার না করিলে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত জীব ও আত্মার এই লীলাকেও শাশ্বত তত্ত্ব বলা যাইতে পারে।

বারংবার জন্ম ও মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব যতদিন পর্যন্ত না সম্পূর্ণরূপে ক্রিয়া অর্থাৎ ক্রিয়ার ফললাভমুক্ত অথবা বাসনামুক্ত হইতেছে, ততদিন ব্যক্তি-রূপ বিনষ্ট হয় না। জীব যখন আত্ম-স্বরূপতা লাভ করিয়া মুক্তি লাভ করে, তখনই ব্যক্তিরূপ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়।

রবীন্দ্রনাথ জন্মান্তর ও অভিব্যক্তিবাদ স্বীকার করিলেও অর্থাৎ ক্রমিক উন্নততর চেতনার বিকাশ স্বীকার করিলেও চিরন্তন ব্যক্তিরূপের পক্ষপাতী, তাই যে-কোন পরিণামে তাঁহার জীবন-দর্শনে নির্বিশেষ পরিণাম লাভের কোন প্রশ্ন উঠে নাই। তাঁহার লীলা-তত্ত্বের দিক হইতে এই ব্যক্তিরূপের লীলাটিকেও চিরন্তন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই বাসনা ও আত্মার মধ্যবর্তী আর একটি চেতনা-পর্যায় নির্দেশ করিয়াছেন। এই চেতনা-পর্যায়টি রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতা। লীলাস্বরূপে এই চেতনা পর্যায়গুলিকে তিনি উপলব্ধি করেন বলিয়া ব্যক্তি-চেতনার সহিত এই চেতনার মিলনরহস্য লীলা-রহস্যে পরিণত হইয়াছে।

নিখিল বিশ্বের মধ্যে যে চেতনা ক্রমিক উন্নততর পরিণামের দিকে জীবকে আকর্ষণ করিতেছে, যে নিগূঢ় প্রেরণায় প্রথম প্রাণ-কণা হইতে আজ এই মনোধর্ম বিশিষ্ট মানুষের প্রকাশ ঘটিয়াছে, সেই এক প্রেরণা কবির ব্যষ্টি জীবনেও ক্রিয়াশীল। বিশ্ব-সত্তা যেখানে ব্যক্তির জীবনে একটি বিশিষ্ট প্রেরণা রূপে ক্রিয়াশীল সেই বিশিষ্ট প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ জীবন-দেবতা আখ্যা দান করিয়াছেন।

কবির প্রত্যেক পর্যায়ের কাব্যের একটি স্বতন্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ মূল্য আছে। তাঁহার কাব্যের এই পৃথক মূল্য সম্পর্কে কবি সচেতন। দীর্ঘকাল পর সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের উপর আজ যখন তিনি সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টিপাত করেন, তখন বোধ করিতে পারেন তাঁহার সমগ্র কাব্য-প্রবাহের ভিতর দিয়া একটি নিগূঢ় কোন ভাবের ধীর প্রকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। এই ভাবনা তাঁহার সচেতন চিন্তা বা ভাবনার অতীত।

কবির সৃষ্টি-কর্মের পশ্চাতে তাহা হইলে কতকগুলি প্রেরণা ক্রিয়াশীল দেখিতে পাই। প্রথমত কবির সচেতন অভিপ্রায়, ভাব বা ভাবনা, দ্বিতীয়ত সচেতন ভাবনার অতীত ভাবনার প্রকাশ, তৃতীয়ত এই অতীত ভাবনার প্রকাশ ঘটাইতেছে কবির গভীরতর কোন একটি সত্তা। এই সত্তাই কবির সকল সৃষ্টি-কর্মকে প্রতিনিয়ত একটি অবিচ্ছিন্ন ভাব-সূত্রে বিধৃত করিতেছে

এই গভীরতর সত্তাটিই কবির জীবন-দেবতা। কবির জীবন উপলব্ধ বিচিত্র সুখ-দুঃখের অনুভূতি, বিচিত্র ভাব-ভাবনা ও কল্পনার উপকরণকে আশ্রয় করিয়া এই জীবন-দেবতা কবির অধ্যাত্ম-সত্তাটিকে গড়িয়া তুলিতেছেন জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"মানুষের মধ্যেও একটি সত্তা আছে যেটি গুহাহিত ; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি গুহাহিত তাঁহার সঙ্গেই কারবার করে—সেই তার আকাশ, তার বাতাস, তার আলোক, সেইখানেই তার স্থিতি, তার গতি, সেই গুহালোকই তার লোক।" (গুহাহিত)

"হে গুহাহিত, আমার মধ্যে যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বীটি রয়েছে, তুমি তারই চিরন্তন বন্ধু ; প্রগাঢ় গভীরতার মধ্যেই তোমরা দুজনে পাশাপাশি গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে রয়েছ—সেই ছায়াগম্ভীর নিবিড় নিস্তব্ধতার মধ্যেই তোমরা দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া। তোমাদের সেই চিরকালের পরমাশ্চর্য গভীর সখ্যকে আমরা যেন আমাদের কোন ক্ষুদ্রতার দ্বারা ছোটো করে না দেখি। তোমাদের ওই পরম সখ্যকে মানুষ দিনে দিনে যতই উপলব্ধি করছে, ততই তার কাব্য-সঙ্গীত ললিতকলা অনির্বচনীয় রসের আভাসে রহস্যময় হয়ে উঠছে, ততই তার জ্ঞান সংস্কারের দৃঢ় বন্ধনকে ছিন্ন করছে। তার কর্ম স্বার্থের দুর্লঙ্ঘ্য সীমা অতিক্রম করছে, তার জীবনের সকল ক্ষেত্রেই অনন্তের ব্যঞ্জনা প্রকাশ পেয়ে উঠছে।" (গুহাহিত : শান্তিনিকেতন)

"আমার একটি যুগ্ম সত্তা আমি অনুভব করেছিলাম যেন যুগ্ম নক্ষত্রের মতো আমারই ব্যক্তিত্বের অন্তর্গত, তারই আকর্ষণ প্রবল।

পরম দেবতার পূজা যুগ্ম-সত্তায় মিলে, এক সত্তায় ভিতর থেকে আদর্শের প্রেরণা, আর এক সত্তায় বাহিরে কর্মযোগে তার প্রকাশ।" (চিত্রা)

"চিত্রায় জীবন-রঙ্গ ভূমিতে যে মিলন-নাট্যের উল্লেখ হয়েছে তার কোন নায়ক-নায়িকা জীবের সত্তার বাহিরে নেই এবং তার মধ্যে কেউ ভগবানের স্থানাভিষিক্ত নয়।" (চিত্রা)

রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে গুহাহিত বলিয়াছেন তাঁহাকে জীবাত্মা বলা যাইতে পারে। যাহাকে তিনি বলিয়াছেন, 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের গুহাহিত' তাঁহাকে পরমাত্মা বলা যায়। ব্যক্তির যে গোপন পুরুষ, যে নিভৃতবাসী তপস্বী, তাহাকে ব্যক্তির অধ্যাত্ম-সত্তা বলা যায়। জীব-সত্তাটিকে কবি বলিয়াছেন, 'আমি'। কবির

জীবন-দেবতা জীবাত্মা ও অধ্যাত্ম-সত্তার মধ্যবর্তী একটি তত্ত্ব। জীবাত্মা ব্যক্তির স্বধর্মের ভিতর দিয়া যে পরিণামে কতকটা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, সেই পরিণাম-পর্যায়টিকে কবি জীবন-দেবতা আখ্যা দান করিয়াছেন।

আরও একটি বিশিষ্ট দিক এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সত্তার গভীর হইতে গভীরতর লোকে নিমজ্জিত হইতে হইতে এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছেন যেখানে জীবন-দেবতা তত্ত্ব দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরীয় তত্ত্বে পরিণত হইয়াছে। তখন ব্যক্তির লীলা কেবল ঈশ্বরের সহিত। চেতনার ক্রমিক ঊর্ধ্বপরিণাম যদি সত্য না হইত তাহা হইলে পরিণাম কখন এমন স্বাভাবিক হইত না। বস্তুত কবির জীবন-দেবতা তত্ত্ব গড়িয়া উঠিবার পূর্বে আমরা পাই কবির সচেতন মনের নানা প্রেরণা, ভাব ও ভাবনা। এই কালে ঊর্ধ্বতর চেতনার চকিত ক্ষীণ আভাস ধীরে ধীরে স্পষ্ট হইয়া পরে জীবন দেবতা, আরও পরে ঈশ্বরীয় তত্ত্বে পরিণাম লাভ করিয়াছে।

অধ্যাত্ম-সাধনার পরম সিদ্ধি সম্পর্কে শাস্ত্রে এইরূপ উক্তি করা হইয়াছে, যে উহা লাভ করিলে মানুষ আপনার চেতনাকে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে এবং বিশ্বের সমস্ত কিছুকে আপনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট দেখে। ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা তখন একাত্ম হইয়া যায়। ব্যক্তি তখন আপনাকে বিশ্ব-রূপে প্রত্যক্ষ করে। ব্যক্তির দেহ-প্রাণ-মন তখন বিশ্বের জড় প্রাণ মনে পরিণত হয়। ব্যক্তির চেতনা তখন বিশ্ব-চেতনায় আপনাকে অপ্রতিহত সীমাহীন বলিয়া বোধ করে।

আমাদের মধ্যে একটি ঐক্য বোধ আছে। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা বহির্জগতে এই ঐক্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছি। যত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রেই হোক না কেন মানুষ মাত্রেরই জীবনে এই সন্ধান-ক্রিয়া চলিতেছে।

মানুষের অধ্যাত্মবোধ যত উন্নত হয়, ঐক্যবোধ যত গভীরতা ও ব্যাপ্তি লাভ করে, বহির্জগতে সে তত বেশী ঐক্যের সন্ধান পায়। অন্তর ও বহির্জগতে এই যে মিলন ইহাই একটি মানুষের অধ্যাত্ম বোধের সীমা। এই সীমা ক্রমাগত গভীরতা ও ব্যাপকতা লাভ করিতে থাকে। পরিণামে ইহা নিঃসীমতা প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব ও বিশ্বাতীত সকল লোক ইহার অন্তর্গত। এই অনন্ত বৈচিত্র্য পূর্ণ ঐক্য-তত্ত্বের বাহিরে আর কিছু নাই।

মানুষ তাই প্রকৃতিগত ভাবে ধার্মিক, কারণ কোন-না-কোন স্বরূপে সে জীবনে এই ঐক্যের সন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। এই অনুসন্ধিৎসাই ধর্ম, তাহা যে কোন জীবন-পদ্ধতি এবং জীবনের যে কোন গভীর তত্ত্ব আশ্রয় করুক না কেন। ইহার কোন বিধি-বন্ধন নাই।

"আধ্যাত্মিক সাধনার যে চরম লক্ষ্য কী, তা উপনিষদে স্পষ্ট লেখা আছে—

"তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানং সর্বমেবাবিশন্তি।"

ধীর ব্যক্তিরা সর্বব্যাপীকে সকল দিক থেকে পেয়ে যুক্তাত্মনা হয়ে সর্বত্রই প্রবেশ করেন।"

বিশ্বের সহিত বিশ্বাত্মার যে সম্পর্ক, জীবের সহিত জীবাত্মার সেই সম্পর্ক। আত্মা স্বরূপত উভয়ের এক। বস্তুত এক অখণ্ড অনন্ত স্বরূপই বিশ্বাত্মা এবং জীবাত্মা রূপে প্রকাশমান।

অন্তরের ঐক্যবোধটিকে মানুষ বাহিরে বিশ্বের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে চায়।

এইরূপে বিশ্বের যোগে ব্যক্তি ধীর বিকাশ লাভ করিতে থাকে, তাহার ঐক্যবোধের সীমা বাড়িয়া যায়। এই অনুসন্ধান সেইখানে সম্পূর্ণতা লাভ করে, যেখানে ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা একাত্ম হইয়া যায়।

অনন্তের সহিত অনন্ত স্বরূপে বিশ্বের সহিত একাত্ম হইয়া যে অখণ্ড রূপে দেখা,—ইহাই অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য। মানুষ তখন আর আপনাকে বিশ্ব হইতে পৃথক কতকগুলি বাসনা, কামনা চিন্তা ও ভাবনার সমষ্টি বলিয়া বোধ করে না।

মানুষ তখন এমন এক পরম সত্যের উপর আপনাকে প্রতিষ্ঠিত দেখে যাহা শাশ্বত, সর্বব্যাপ্ত, অখণ্ড, অনন্ত স্বরূপ। মানুষের তখন আর হারাইয়া যাইবার ভয় থাকে না। মৃত্যুভয় তো অনস্তিত্বের ভয়। পরম অস্তিত্বকে লাভ করিয়া মানুষ তখন মৃত্যুভয় জয় করিয়া উঠে। যে সত্য, যে প্রেম ও করুণা, যে সুষমা ও শান্তি ব্রহ্ম হইতে পরমাণু পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত, মানুষ আপনাকে তৎস্বরূপেই প্রত্যক্ষ করে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তিগুলির মধ্যে মুক্তির স্বরূপ পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

"আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করা হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।"

"আমরা যে পরম এককে খুঁজছি সে কেবল আমাদের নিজের এই একের তাগিদেই। এই নিজের ঐক্যকে সেই পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে মাঝখানে কিছুতেই থামতে পারে না"

"আমরা নিজের মধ্যে একটি এক পেয়েছি এবং সেই এককেই আমরা বহুর মধ্যে সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"এমনি করে আপনাকে পাওয়ার মধ্যে সমস্তকে পাওয়া আপনার সত্যের দ্বারা সকল সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি সমগ্র হয়ে ওঠা, নিজেকে কেবল কতকগুলো বাসনা এবং কতকগুলো অনুভূতির স্তূপরূপে না জানা, নিজেকে কেবল বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয়ের মধ্যে খুঁজে খুঁজে না বেড়ানো এই হচ্ছে আত্মবোধের আত্মোপলব্ধির লক্ষণ" (আত্মবোধ ঃ শান্তিনিকেতন)

"যখন সমস্তকে সংহত সংযত করে, এক করে আত্মাকে পাই, তখন আমি সত্য যে কী তাহা জানি, তখনই আমার সমস্ত বিচ্ছিন্ন জানা একটি প্রজ্ঞায় ঘনীভূত হয়, সমস্ত বিচ্ছিন্ন বাসনা একটি প্রেমে সম্পূর্ণ হয়ে উঠে এবং জীবনের ছোটোবড়ো সমস্তই নিবিড় আনন্দে সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। তখন আমার সকল চিন্তা ও সকল কর্মের মধ্যেই একটি আনন্দের অবিচ্ছিন্ন যোগ থাকে।

তখনই আমি আধ্যাত্মিক ধ্রুব-লোকে আপনার সত্য প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করে সম্পূর্ণ নির্ভর হই। তখন আমার এই ভয় ঘুচে যায় যে, আমি সংসারের অনিশ্চয়তার মধ্যে মৃত্যুর আবর্তের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ। তখন আত্মা অতি সহজেই জানে যে সে পরমাত্মার মধ্যে চিরসত্যে বিধৃত হয়ে আছে।"

(আত্মবোধ ঃ শান্তিনিকেতন)

"তাহা নিত্য তাহা ভূমা তাহা আমাদিগকে বেষ্টিত করিয়া আমাদের অন্তর ও বাহিরকে ওতপ্রোত করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে।"

"তিনি অন্তরে বাহিরে সর্বত্র তিনি অন্তরতম তিনি সুন্দরতম। তাঁহার মধ্যে আমরা সত্য তাঁহার আনন্দে আমরা ব্যক্ত।"

"আমরা জানি বা না জানি, ব্রহ্মের সহিত আমাদের যে নিত্য সম্বন্ধ আছে সেই সম্বন্ধের মধ্যে নিজের চিত্তকে উদ্বোধিত করে তোলাই ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনা।"

সমগ্র মনুষ্যসমাজ এই পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে। তাহার জ্ঞানে, তাহার প্রেমে, তাহার কর্মে, সর্বক্ষেত্রে ঐক্যের আভাস গভীর হইতে গভীরতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। সমগ্র মনুষ্যসমাজ বিকাশের ইতিহাসকে এই একঃ মাত্র সংজ্ঞার দ্বারা নির্দেশ করা যাইতে পারে। মানুষের ধর্মতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব যে পরিমাণে এই ঐক্যবোধ করিতে এবং প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে সেই পরিমাণে সে সভ্যও উন্নত। এই একটিমাত্র আদর্শের সহায়তায় সভ্যতার মান নির্ণয় করিতে পারা যায়।

সমগ্র মনুষ্যসমাজ যে একদিন এই পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সংশয় নাই। তাহার ধর্মনীতি, সমাজনীতি সমস্ত কিছু এক অখণ্ড ঐক্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। মনুষ্যসমাজ হইবে পূর্ণ ঐক্যতত্ত্বের ভাব প্রতীক স্বরূপ।

ঐক্যবোধের ধীর বিকাশের সূত্র ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ সমগ্র মনুষ্যসমাজের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া পরিণামে যে পরম ঐক্যতত্ত্বের সন্ধান লাভ করেন, তাহার পরিচয় লাভ করিতে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"এই বোধের শেষ কথা এই যে, যে মানুষ আপনার আত্মার মধ্যে অন্যের আত্মাকে ও অন্যের আত্মার মধ্যে আপনার আত্মাকে জানে, সেই জানে সত্যকে।" (মানুষের ধর্ম)

"এক আত্মলোকে সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সত্য, এই সত্যের আলোকে বিচার করতে হবে মানুষের সভ্যতা, মানুষের অনুষ্ঠান, তার রাষ্ট্রতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র এর থেকে যে পরিমাণে সে ভ্রষ্ট, সেই পরিমাণে সে বর্বর। (মানুষের ধর্ম)

"নিজের মধ্যে সর্বকালীন বিশ্বভূমীন মনুষ্যধর্মের উপলব্ধিই সাধুতা, হীনতা সেই মহামানবের উপলব্ধি থেকে বিচ্যুতি হওয়া।" (মানুষের ধর্ম)

বাহিরে আমরা কেবল বস্তুর পর বস্তু, রূপের পর রূপ স্তূপীকৃত করিয়া তুলি, তাহাদের মধ্যে অভিপ্রায়মুখী কোন শৃঙ্খলা নাই, সামঞ্জস্য নাই। অন্তর্জগতেও এই একই ভাব। এখানে বিপরীতমুখী সহস্র চিন্তা ও ভাবনা উপলব্ধি ও প্রেরণার মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষ চলিতেছে। মানুষ চায় একটি অখণ্ড বোধকে অন্তরে ও বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে, যে অখণ্ডতায় ব্যক্তি ও বিশ্ব সমাশ্রিত। তাঁহারই আনন্দ বস্তুর ভাঙ্গা-গড়া উঠা-নামার ভিতর দিয়া পূর্ণ সুষমায় নিত্য উচ্ছ্বসিত।

মানুষ আপনার বহুমুখী সাধনার ভিতর দিয়া এই ঐক্যকে গভীর হইতে গভীরতর ভাবে উপলব্ধি করিতেছে। সমগ্র মানুষ-সমাজ যে পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে, এককভাবে কোন মানুষ যখন তাহা লাভ করে তখন ব্যক্তি ও বিশ্ব-চেতনা একাত্ম হইয়া যায়। বিশ্বের অন্তহীন প্রাণলীলায় তখন ব্যক্তিপ্রাণ পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বিশ্ব-রূপের সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া যেন তাঁহারই আনন্দ রূপ উদ্বেলিত হইতে থাকে। নিম্নে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথের উক্তি দুইটির মধ্যে এই উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"আনন্দ আপনাকে নানা রূপে নানা কালে প্রকাশ করেছেন, আমরা সেই নানা রূপকেই দেখছি, কিন্তু আমাদের আত্মা দেখতে চায় নানার ভিতর দিয়ে সেই মূল এক আনন্দকে। যতক্ষণ সেই মূল আনন্দের কোন আভাস না দেখি ততক্ষণ কেবলই বস্তুর পর বস্তু, ঘটনার পর ঘটনা আমাদের ক্লান্ত করে ক্লিষ্ট করে আমাদের অন্তহীন পথে ঘুরিয়ে মারে। আমাদের বিজ্ঞান সমস্ত বস্তুর মধ্যে এক সত্যকে খুঁজছে, আমাদের ইতিহাস সমস্ত ঘটনার মধ্যে এক অভিপ্রায়কে খুঁজছে, আমাদের প্রেম সমস্ত সত্তার মধ্যে এক আনন্দকে খুঁজছে।"

"বিশ্বজগতে যে শক্তির আনন্দ নিরন্তর ভাঙা-গড়ার মধ্যে লীলা করছে—তারই নৃত্যের ছন্দে তাঁদের জীবনের লীলার সঙ্গে তালে তালে মিলে যেতে

থাকে ; তাঁদের জীবনের আনন্দের সঙ্গে সূর্যালোকের আনন্দ, মুক্ত সমীরণের আনন্দের সুর মিলিয়ে দিয়ে অন্তর-বাহিরকে সুধাময় করে তোলে।"

চূড়ান্ত অধ্যাত্ম উপলব্ধি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। উক্তিগুলি 'মানুষের ধর্ম' হইতে সংগৃহীত।

"মানুষের অন্তর্দৃষ্টি যখন আত্মার আলোক-বিধৌত হয়, তখন সেই মুহূর্তে সে সমস্ত পার্থক্যের ঊর্ধ্বে এক অধ্যাত্ম ঐক্যের প্রসারতা বোধ করে।"

"সে বোধ করে যে শান্তি বহিঃসন্নিবেশের মধ্যে নাই, আছে সত্যে, আর সুষমায়।"

"আমাদের আত্মায় আমরা অসীম সত্য সম্পর্কে সচেতন, ইহা ভূমা, দিব্য-মানব এবং এই ব্যক্তি অধ্যাত্ম সত্তা যখন দিব্য চেতনার জন্য ব্যক্তি-বিসর্জন দেয় তখনই আনন্দ বোধ করে।"

"অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইয়া যখন বস্তুর উপর আছাড় খাইয়া পড়ি তখন তাহাকেই একমাত্র আশার পাত্র বোধ করিয়া জড়াইয়া ধরি। যখন আলোক আসে তখন আমাদের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, তখন বোধ করি, যে অনন্ত অখণ্ডতার মধ্যে আমরা বিধৃত উহা তাহার সামান্য একটি অংশ মাত্র।"

ব্যক্তির চেতনা বিশ্ব-চেতনার সহিত যুক্ত হইলে ব্যক্তির কর্ম অনায়াস, স্বতঃস্ফূর্ত হইয়া উঠে। তাহা তখন আর মানবিক বুদ্ধি ও বিচারবোধের দ্বারা নিয়ত ক্লিষ্ট এবং ভ্রম-প্রমাদ-পরিপূর্ণ নয়। তখন কর্ম অভ্রান্ত, নিঃসংশয়, অপ্রতিহত, অবিশ্রান্ত রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহার সকল আচরণের মধ্যে তখন একটি দিব্য সুষমা ফুটিয়া উঠে। কর্মের এই পরিণামটিকেই বলা হয় বিশ্ব-কর্ম। ব্যক্তির প্রেরণার লেশমাত্র তখন আর তাহার মধ্যে থাকে না। কর্মের এক অবিশ্রাম স্রোতোধারা ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিপুল আবেগে আনন্দোচ্ছ্বাসে বাহিরে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে।

কর্ম সম্বন্ধে যেমন জ্ঞান ও ভক্তি সম্পর্কেও তেমনি একথা সত্য। অর্থাৎ এই পরিণাম লাভ করিলে ব্যক্তির জীবনে জ্ঞান সীমাহীন হইয়া পড়ে। ব্যক্তির অভ্রান্ত দৃষ্টি সমক্ষে সত্য তখন সমুজ্জ্বল হইয়া সর্বত্রই প্রতিভাত হয়। প্রেম তখন অপরিমিত হইয়া যে-কোন প্রাণীর জন্য আত্ম-বিসর্জনকে একান্ত সহজ করিয়া তুলে। কারণ তিনি তখন সকলের বাঁচার মধ্যে আপনার বাঁচাকে সত্য করিয়া বোধ করিতে পারেন। মানবজীবনের যে-কোন সৃষ্টি-প্রেরণা সম্পর্কে একথা সত্য।

যে-কোন সৃষ্টি-প্রেরণাশ্রয়ী হইয়া ব্যক্তি-চেতনা যতই বিশ্বসত্যের অভিমুখীন হয়, ব্যক্তির সৃষ্টি প্রেরণা ততই দুর্নিবার হইয়া প্রকাশ পায়, সৃষ্টি ততই দুর্লভ মহিমা লাভ করে, ততই অনির্বচনীয় ব্যঞ্জনা বিজড়িত হইয়া যায়।

"যে গায়ক আপনার মধ্যে এই গানের মূল আনন্দে গিয়া পৌঁছিয়াছে গান সম্বন্ধে সে মুক্তি লাভ করিয়াছে। সে সমাপ্তিতে পৌঁছিয়াছে। তখন তাহার গলায় যে তান খেলে তাহার মধ্যে আর চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, ভয় নাই। যাহা দুঃসাধ্য তাহা আপনি ঘটিতে থাকে। তাহাকে আর নিয়মের অনুসরণ করিতে হয় না, নিয়ম আপনি তাহার অনুগত হইয়া চলে।***এই আনন্দ-লোকটিকে আবিষ্কার করিতে পারিলেই কাব্য সম্বন্ধে কর্মী মুক্তিলাভ করে। কবির কাব্য কর্মীর কর্ম তখন স্বাভাবিক হইয়া যায়।" (ধর্মের অর্থ : সঞ্চয়)

"কবি আপন কবিত্বশক্তির মধ্যে, কর্মী আপন কর্মশক্তির মধ্যে সমস্তের মূলগত আপনাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই ভিতরকার আপনাকে যতই সে লাভ করে ততই কবির কাব্য অমর হইয়া উঠে; সে তখন বাহিরের অক্ষরগণা কাব্য হয় না। ততই কর্মীর কর্ম অমর হইয়া উঠে, সে তখন যন্ত্র চালিতবৎ কর্ম হয় না। কারণ প্রত্যেকের আপন পদার্থটি আনন্দময়—এইখানেই স্বতঃ-উৎসারিত আনন্দের প্রস্রবণ।" (ধর্মের অর্থ : সঞ্চয়)

"চিত্রকর যখন সত্য আপনার মধ্যে সকল কর্মের মূলে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। আনন্দে গিয়া পৌঁছে, তখন তাহার চিত্র আঁকার কর্মের আর অবধি থাকে না। বস্তুত তখন তাহার কর্মের দ্বারাই আনন্দের পরিমাপ হইতে থাকে, দুঃখের দ্বারাই তাহার সুখের গভীরতা বুঝিতে পারি।" (ধর্মের অর্থ : সঞ্চয়)

"কবির আনন্দ কাব্যে, শিল্পীর আনন্দ শিল্পে, বীরের আনন্দ শক্তির প্রতিষ্ঠায়, জ্ঞানীর আনন্দ তত্ত্বাবিষ্কারে যেমন আপনাকে কেবলই কর্মের আকারে প্রকাশ করতে যাচ্ছে, ব্রহ্মবিদের আনন্দ তেমনি জীবনের ছোট বড় সকল কাজেই সত্যের দ্বারা, সৌন্দর্যের দ্বারা, শৃঙ্খলার দ্বারা, মঙ্গলের দ্বারা অসীমকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।" (কর্মযোগ : শান্তিনিকেতন)

মুক্ত অবস্থা বলিতে বিশ্ব বিলুপ্তি বুঝায় না। অর্থাৎ ওই পরিণাম লাভ করিতে এই নিখিল বিসৃষ্টি, দেশ-কাল অন্তর্হিত হইয়া যায় না। মুক্তি বলিতে অহঙ্কার বিলুপ্তি বুঝায়। তখন ব্যক্তির পৃথক কোন অস্তিত্ব বোধ থাকে না। তাঁহার সকল কর্ম, চিন্তা ও ভাবনা ঈশ্বরীয় কর্ম চিন্তা ও ভাবনায় পরিণত হয়।

এই পরিণাম লাভ করিলে জগৎ ও জীবনের অর্থের সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে। মুক্তি তাই এক ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে জগৎ ও জীবনকে দেখা। আমরা জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করি, ব্যবহার করি প্রাণ-মন ও বুদ্ধির সহায়তায়, অর্থাৎ ব্যক্তি-চেতনার দিক হইতে, ইহাই বন্ধন। জগৎ ও জীবনকে দিব্য-চেতনার দিক হইতে প্রত্যক্ষ করাকে বলে মুক্তি।

এই পূর্ণ পরিণাম লাভের পর মানুষ ব্রহ্মস্থিত হইয়া ব্রহ্মকেই সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহার ভাবনা ও চিন্তা তখন শুধু ব্রহ্মময়। ইহাকেই বলে ব্রহ্মস্থিতি, ব্রহ্মবিহার।

ইহা জন্ম ও মৃত্যুর উর্ধ্বতর এক শাশ্বত অচঞ্চল অবস্থা। মানুষ তখন বোধ করে যে তাহার আত্মা মুক্ত, কেবল গুণত্রয় প্রকৃতি কর্মে লিপ্ত। কর্ম তখন আর তাহাকে লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

দিব্য-চেতনা অচঞ্চল অপরিবর্তিত থাকিয়াই আপনাকে দেশ-কালের সীমায় অন্তহীন রূপে রূপে নিত্য উৎসারিত করিতেছেন।

অন্তরের পূর্ণ প্রশান্তির ভিতর দিয়া মানুষ যখন দিব্য-চেতনার সহিত নিত্য যুক্ত থাকে, তখন দিব্য-চেতনার অচিন্তনীয় শক্তি বিপুল কর্মধারায় নিম্নে নামিয়া আসে। তাহা ব্রহ্মেরই মত অনায়াস, লীলাময়। এই সকল মানুষের জীবনে একদিকে থাকে অবিক্ষুব্ধ শান্তি, নীরবতা, মহামৌন ভাব, অন্যদিকে থাকে চূড়ান্ত কর্মতৎপরতা।

জীবের এই ধীর অভিব্যক্তিকে দ্রুততর করিয়া তুলিবার জন্য যুগে যুগে একশ্রেণীর মানুষ আবির্ভূত হন, যাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জড়বন্ধন মুক্ত। দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া জড়দেহ আশ্রয় করিয়াই তাঁহারা কর্ম করেন মানুষের মধ্যে উর্ধ্ব পরিণামমুখী আবেগকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্য। সমগ্র জীব ও জগতের অন্তঃস্থিত যে শক্তি পূর্ণ পরিণাম লাভের জন্য সদা সক্রিয়, তাহার বিরুদ্ধ শক্তিগুলিকে দূরীভূত করিয়া তাহার প্রকাশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য তাঁহারা কর্ম করেন।

মানুষের বহুমুখী অনুসন্ধিৎসা বহুবিধ সৃষ্টি-প্রেরণার ভিতর দিয়া একটি প্রেরণা ধীরে উর্ধ্ব পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে দিব্য-শক্তি নিম্নে প্রতিমুহূর্তে আপনাকে সঞ্চারিত করিতেছে। মহাপুরুষদের দিব্য-দেহ আশ্রয় করিয়া দিব্য-শক্তি নিম্নতর ভূমিতে লীলায়িত হয়। তাঁহারা ঈশ্বর ও মানুষের, মুক্তি ও বন্ধনের মধ্যবর্তী সংযোগ সেতুস্বরূপ।

"মানুষের জীবনে এই ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ যে কী সেটি তাঁরাই প্রকাশ করতে আসেন। এই প্রকাশ সর্বাঙ্গীণরূপে কোন ভক্তের মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে এমন কথা বলতে পারিনে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এই প্রকাশকে উত্তরোত্তর পরিপূর্ণ করে তোলাই তাঁদের কাজ। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ কেবলই সুগম করে দিচ্ছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)

মানুষের জীবনে পাপ-পুণ্য, সৎ-অসতের দ্বন্দ্ব এক চিরন্তন সমস্যা। মানুষকে বীরের মত এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয়, জীবন ও জগৎ হইতে অসত্য ও পাপ দূরীভূত করিবার জন্য। এই জীবন হইবে দিব্য-জীবন, এই জগৎ হইবে দিব্য-জগৎ।

স্বয়ং ঈশ্বর মর্ত্য-লোকে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছেন। মানুষের অন্তরে থাকিয়া মানুষের সহিত তিনিও পাপ ও অসতের পীড়ায় জর্জরিত ক্ষতবিক্ষত হইয়া ইহাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছেন। মানুষকে সচেতন হইয়া এই সংগ্রামে ঈশ্বরের সহযোগিতা করিতে হইবে।

মহাপুরুষদের জীবন হইতে আমরা এই সত্যই উপলব্ধি করি যে বিশ্বে স্বর্গ-রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে ঈশ্বরের সহিত একযোগে অন্যায়, অসত্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়।

"অসত্যের সকল প্রকার আক্রমণ হইতে ধর্মরাজ্য 'ক্ষত্র'কে প্রসারিত করিবার জন্য উহা মানুষকে ঈশ্বরের শাশ্বত চেতনার সহিত একত্রে কর্ম করিবার জন্য আহ্বান করে।" (রবীন্দ্রনাথ)

এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পথ কি, কেমন করিয়া কর্ম করিতে হয়, কোন্ কর্ম জীবনে সিদ্ধি লাভ ঘটায়, সর্বাধিক কর্মশক্তি কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, কোন্ বোধাশ্রয়ী হইয়া কর্ম করিলে কর্ম ও মুক্তি একাকার হইয়া যায়, মহাপুরুষদের জীবন ও বাণীর মধ্য হইতে সেই রহস্যই আমরা শিক্ষা করি।

সেই রহস্য কি, না মনুষ্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম না করিয়া দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম করা। ব্যক্তি যেখানে ঈশ্বরীয় চেতনার সহিত মিলিত হইয়া কর্ম করে সেখানে কর্মসিদ্ধি যেমন ঘটে, তেমনি ঈশ্বরীয় বোধে নিষ্কাম কর্ম বলিয়া ওই জাতীয় কর্ম কখন বন্ধন সৃষ্টি করে না, তখন কর্ম ও মুক্তি একাকার

হইয়া যায়। তাঁহাদের অন্তরে একদিকে থাকে অখণ্ড শান্তি অন্যদিকে এই নৈঃশব্দ্যের ভিতর দিয়া কর্ম সহস্রধারায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইতে থাকে।

চূড়ান্ত গতিবেগের জন্যই দিব্য-চেতনা অচঞ্চল। মহাপুরুষদের অন্তরে অপার শান্তি তাহা চিন্তার চূড়ান্ত গতিচাঞ্চল্য হেতু, তাহা জড়াবস্থা নহে।

মহাপুরুষদের প্রশান্ত চিত্ত হইতে তাই কর্মধারা বিপুল বন্যা রূপে নিয়ত উৎসারিত হইতে থাকে। অন্তরের গভীর প্রশান্তির ভিতর দিয়া তাঁহারা দিব্য-চেতনার সহিত নিত্য যোগযুক্ত হইয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের জীবনে এই প্রকাশ সম্ভব। দিব্য-চেতনার অচিন্তনীয় শক্তি নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসিয়া চূড়ান্ত কর্ম-চাঞ্চল্য রূপে প্রকাশ পায়।

এক্ষেত্রে যাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি তাহা এই, যে মহাপুরুষগণ দিব্য-চেতনার সহিত যোগ যুক্ত হইয়া কর্ম করেন। তাঁহারা যে কর্ম করলেন তাহা যোগযুক্ত কর্ম। ইহাই কর্ম যোগ। রবীন্দ্রনাথ এই কর্মযোগের উল্লেখ করিয়াছেন, এইভাবে।

"শাশ্বতের সম্মুখে যে কর্ম, প্রশান্ত আত্মার যে নিষ্কাম সংগ্রাম উহা পরম ব্রহ্মের সহিত যুক্ত থাকিতে আমাদের সহায়তা করে।"

সাধারণ মানুষের কর্ম হইতে মহাপুরুষদের কর্মের পার্থক্য কেবল এইখানে; অর্থাৎ সাধারণ মানুষ কর্ম করে একমাত্র মন ও বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া অন্যদিকে মহাপুরুষগণ কর্ম করেন দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া, ইন্দ্রিয়-প্রাণ মনকে উহার যন্ত্র স্বরূপ করিয়া।

মহাপুরুষদের জীবনের সকল কর্ম-প্রেরণা দিব্য-চেতনা-প্রসূত। মন ও বুদ্ধি-প্রভূত কোন তত্ত্ব কিংবা কোন নৈতিক আদর্শের দ্বারা তাঁহাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় না। তাঁহাদের কর্মপ্রেরণা তাই অভ্রান্ত, ঋজু, সংশয় বোধ লেশহীন। তাঁহাদের জ্ঞান আশ্চর্য্য সরল, স্বতঃস্ফূর্ত, অনিবার্য্য, অনুবিদ্ধ, অনুপ্রাণিত।

মহাপুরুষগণের জীবনের বৈশিষ্ট্য কেবল এইখানে, কোন অলৌকিক আচরণের মধ্যে নয়। তাঁহাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত। সাধারণ মানুষের জীবন প্রকৃতি-তাড়িত, অনিয়ন্ত্রিত, প্রাণ ও মনের অবশ প্রেরণা ক্ষুব্ধ, দ্বিধা ও সংশয় বিহ্বল, অস্থির।

যে রহস্যের ফলে পরম নৈঃশব্দ্যের মধ্য হইতে দেশ-কালের পরিসীমায় অন্তহীন রূপ অনন্ত ধারায় উৎসারিত হইতেছে, মহাপুরুষদের জীবনে সৃষ্টির সেই রহস্য প্রত্যক্ষ করা যায়।

তাঁহাদের অন্তরের অচঞ্চল প্রশান্তি আশ্চর্য নীরবতা হইতে কর্মস্রোত শত ধারায় নামিয়া আসে। ধ্যান-তন্ময়তার ভিতর দিয়া তাঁহাদের চেতনা পরম চেতনার সহিত নিয়ত যুক্ত থাকে বলিয়া নিম্নতর চেতনা-লোকে তাহারই দুর্বার আবেগ বিচিত্র কর্ম-ধারা রূপে প্রকাশ পায়। তাঁহাদের জীবনের এক-প্রান্তে মহাশান্তির বিপুল নৈঃশব্দ্য অন্য প্রান্তে অচিন্তনীয় কর্মচাঞ্চল্য। সাধারণ মনুষ্যজীবনে এই অবস্থা কল্পনাতীত।

দিব্য-চেতনা লাভে মানুষের বিচিত্র অনুভূতি একটি অখণ্ডতা বোধে অন্তর্হিত হইয়া যায়। সমস্ত কিছু তখন চৈতন্যময় হইয়া যায়। মহাপুরুষগণ সমস্ত কিছুর মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহারই সেবা বা পূজা-বোধে কর্ম করেন। কর্মের জন্য ভক্তির এই পৃথক বোধটি ও কখন কখন লুপ্ত হইয়া যায়। ব্যক্তি, বিশ্ব ও দিব্য-চেতনা তখন একাকার হইয়া যায়।

দিব্য-চেতনা লাভের সাধনা তাই জীবন বিমুখতা নয়, পূর্ণ জীবনেরই স্বরূপ লাভের সাধনা, জীবন ও জগৎকেই এক ভিন্ন স্বরূপ হইতে দেখা।

মহাপুরুষগণ পূর্ণ চেতনা লাভের পরও দেহ আশ্রয় করিয়া জগতে কর্ম করেন যে পর্যন্ত না জগৎ হইতে অসত্য ও পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়া যায়, এই মর্ত্যে স্বর্গ-লোকের প্রতিষ্ঠা হয়।

সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক চেতনাশ্রয়ী হইয়া কর্ম করেন বলিয়া তাঁহাদের সকল প্রয়াস ও জীবন-পদ্ধতির মধ্যেও একপ্রকার অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। উহা আমাদের চিন্তা ও জীবন-পদ্ধতির এতদূর বিপরীত যে উহা আমাদের বোধকে আঘাত না করিয়া পারে না। মহাপুরুষগণ তাই যুগে যুগে উপেক্ষা, ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। যে কেহ চতুষ্পার্শ্বের জীবন কিছুমাত্র ছাড়াইয়া উঠে, তাহাকেই লোকে সংশয় করে এবং সমাজ হইতে অশ্রদ্ধা ও লাঞ্ছনা তাহাকে অনিবার্য্যরূপে লাভ করিতে হয়।

(৭)

সঙ্গীতের একদিকে যেমন ব্যাপ্তি বা চলার দিক আছে, তেমনি অন্যদিকে আছে সমাপ্তির স্থির একটি দিক। এই দুইয়ের মিলনে সঙ্গীতের আনন্দ-রূপের, মুক্তি-রূপের প্রকাশ। পরিসমাপ্তি নাই কেবল চলা বা ব্যাপ্তি আছে তাহা যেমন প্রলয়, তেমনি ব্যাপ্তি বা প্রসারের দিক নাই কেবল পরিসমাপ্তি আছে তাহা তেমনি শূন্যতা।

জীবনের একদিকে আছে ক্রমপ্রসারতা, নিত্য নব রূপতা, নিত্য নূতন লোক ও রহস্য উদ্ঘাটনের, নিত্য নূতন সম্পদ আহরণের, নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা লাভের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস। জীবনের অন্যদিকে আছে অন্তরের দিকে অনন্তের সহিত মিলিত হইবার স্থির যোগের তত্ত্ব। এই অসীমের উপলব্ধি জীবন-বিকাশের কোন একটি পর্যায়ে ঘটে না, তাহার সহিত জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে মিলিত হইবার পথ আছে। জীবন এইরূপে প্রত্যেক পর্যায়ে অখণ্ড স্বরূপ।

মন, বুদ্ধিবৃত্তি এবং চিত্তবৃত্তি প্রসারের এই দিকটিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা যেমন করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং এইরূপে জীবনকে যেরূপ অনন্ত সম্ভাবনার সম্মুখীন করিয়াছে, নিত্য নূতন ঐশ্বর্যে ভূষিত করিয়াছে, তেমন করিয়া সমাপ্তির দিকটিকে গ্রহণ করে নাই, বরং অভাবিত ঐশ্বর্য লাভের অস্থিরতায় এই দিকটিকে একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছে।

অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় সাধনা বিশুদ্ধ, পরিপূর্ণ আনন্দলাভের প্রেরণায় মন, বুদ্ধিবৃত্তি এবং হৃদয়বৃত্তিকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া যাহা আছে তাহাকেই কোন-প্রকারে টিকাইয়া রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে।

বিকাশের অন্তহীন বৈচিত্র্যমাত্রকে আশ্রয় করিয়া ইউরোপ পরিসমাপ্তির আদর্শকে বলিয়াছে মায়া বা মিথ্যা। সকল পরিণামশূন্য, বিকার বা বিকাশ-শূন্য তত্ত্বাশ্রয়ী আনন্দের প্রেরণায় ভারতবর্ষ জীবনের সকল প্রয়াস, মন ও বুদ্ধিবৃত্তির সকল ক্রিয়া, অন্তহীন অতীত ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া দেশ-কালের মধ্যে মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশের যে দিক তাহাকে বলিয়াছে মিথ্যা বা মায়া।

শাস্ত্র বলিয়াছেন, ঈশ্বর আপনার অপরিমেয় আনন্দ হইতে এই নিখিল বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। আনন্দাদ্ধেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হইতে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি হইয়াছে, আনন্দের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে, আবার আনন্দের মধ্যেই তাহারা অবসান লাভ করে। শাস্ত্র আবার একথাও বলিয়াছেন, তিনি তপস্যার দ্বারা এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন—স তপোঽতপ্যত।

ভারতবর্ষ আনন্দকেই কেবল দেখিল, জীবনে দুঃখের তপস্যাকে বলিল মায়া। ইউরোপ দুঃখের তপস্যাকেই শুধু দেখিল, আনন্দময় সমাপ্তিকে বলিল মায়া।

আনন্দ এবং তপস্যা সম্পূর্ণতার দুটি দিক। পরিসমাপ্তির দিক আনন্দ, ব্যাপ্তির দিকটি হইল তপস্যা। পরিসমাপ্তি ও ব্যাপ্তি—দুইয়ের মিলন সাধন প্রয়োজন। ইহাদের মধ্যে কেবল একটি মাত্র দিক আশ্রয় করিলে জীবন দুঃখময় পরিণাম, মহৎ বিনষ্টি লাভ করে।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

একদিকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা—

"তাহারাই এমন কথা বলিয়া থাকে, কোনো একটি চরম পরিণাম মানব-জীবনের লক্ষ্য নহে; কেবল অবিশ্রাম ধাবমান গতির মধ্যেই আপনাকে প্রসারিত করিয়া চলাই জীবনের উদ্দেশ্য। তাহারা অনিশ্চিতের মধ্যে নির্ভয়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেবলই নব নব সম্পদকে আহরণ করিয়া আসিতেছে। তাহারা কোনো একটি কোণে বাসা বাঁধিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না।"

(জলস্থল : পথের সঞ্চয়)

অন্যদিকে ভারতীয় প্রকৃতি—

"তাহারা যে কেবল ক্ষুধার খাদ্যটিকে সঙ্কীর্ণ করিতে চাহে তাহা নহে, তাহারা ক্ষুধাটাকে সুদ্ধ মারিয়া নিকাশ করিয়া দিতে চায়। তাহারা যেটুকু খাইয়াছে তাহাকেই কোনোমতে স্থায়ী করিবার উদ্দেশে কেবলই চারিদিকে সুনিশ্চিতের সনাতন বেড়া বাঁধিয়া তুলিতেছে।"

"আমরা দেখিলাম আনন্দকে, আর দুঃখকে বলিলাম মিথ্যা মায়া; উহারা দেখিল দুঃখকে, আর আনন্দকে বলিল মিথ্যা মায়া। কিন্তু, পরিপূর্ণ সত্যের মধ্যে তো কোনোটাই বাদ পড়িতে পারে না; পূর্ব ও পশ্চিম সেখানে না মিলিলে পূর্বও মিথ্যা হয়, পশ্চিমও মিথ্যা হয়। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি

জায়ন্তে—অর্থাৎ আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু জন্মিতেছে—একথা যেমন সত্য, 'স তপোঽতপ্যত' তপস্যা হইতে দুঃখ হইতেই সমস্ত কিছু সৃষ্ট হইতেছে, একথা তেমনি সত্য। গায়কের চিত্তে দেশকালের অতীতগানের পূর্ণ আনন্দও যেমন সত্য আবার দেশকালের ভিতর দিয়া গান গাহিয়া প্রকাশ করিবার বেদনাও তেমনি সত্য। এই আনন্দ এবং দুঃখ, এই সমাপ্তি ও ব্যাপ্তি, এই চিরপুরাতন এবং চিরনূতন, উভয়কে মিলিত করিয়া স্বীকার করা সত্যকে স্বীকার করা।" (জলস্থল : পথের সঞ্চয়)

"যেমন বিজ্ঞান বলছে বিশ্বজগৎ কেবলই পরিণতির অন্তহীন পথে চলেছে, তেমনি য়ুরোপ আজকাল বলতে আরম্ভ করেছে—জগতের ঈশ্বরও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। তিনি যে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মানতে চায় না, তিনি নিজেকে করে তুলছেন এই তাদের কথা।

*   *   *

আমাদের দেশে ঠিক এর উল্টো বিপদ। আমরা চিত্তের ভিতরের দিকটাতেই ঝুঁকে পড়েছি। শক্তির দিককে, ব্যাপ্তির দিককে, আমরা গাল দিয়ে পরিত্যাগ করতে চাই। ব্রহ্মকে ধ্যানের মধ্যে কেবল পরিসমাপ্তির দিক দিয়েই দেখব, তাঁকে বিশ্ব ব্যাপারে নিত্য পরিণতির দিক দিয়ে দেখব না, এই আমাদের পণ।"

(কর্মযোগ : শান্তিনিকেতন)

"ভারতবর্ষে একদিন জ্ঞান অত্যন্ত বিশুদ্ধ অবস্থা পাবার প্রলোভনে সমস্তকে বর্জন করে নিজের কেন্দ্রের মধ্যে নিজের পরিধিকে বিলুপ্ত করবার চেষ্টা করেছিল এবং হৃদয় আপনার হৃদয়বৃত্তিতে নিজের মধ্যেই নিজের লক্ষ্য স্থাপন করে আপনাকে পূর্ণ করে তুলেছিল।

পৃথিবীর পশ্চিম প্রদেশ তখন এর উল্টো দিকে চলেছিল। সে বিষয়-রাজ্যের বৈচিত্র্যের মধ্যে অহরহ ঘুরে ঘুরে বহুতর তথ্য সংগ্রহ করে সেগুলিকে স্তূপাকার করে তুলছিল—তার কোনো অন্ত ছিল না, কোনো ঐক্য ছিল না।"

(ব্রাহ্মসমাজের সার্থকতা)

একদিকে পাশ্চাত্ত্য প্রকৃতি—

"শক্তির ক্ষেত্রে যারা কাজ করে তারা অনন্ত উন্নতির কথা বলে। অর্থাৎ অনন্ত গতির উপরেই তারা জোর দেয়, অনন্ত স্থিতির উপর নয়। তারা অনন্ত চেষ্টার কথাই বলে, অনন্ত লাভের কথা বলে না।" (পাওয়া : শান্তিনিকেতন)

অন্যদিকে প্রাচ্য সাধনা—

"কোথায় পাই ? বাহিরে নয়, প্রকৃতিতে নয়, বিজ্ঞান-তত্ত্বে নয়, শক্তিতে নয়—পাই জীবাত্মায়। কারণ সেখানে তাঁর আনন্দ, তাঁর প্রেম। সেখানে তিনি নিজেকে দিতেই চান। যদি কোনো বাধা থাকে তো সে আমাদেরই দিকে, তাঁর দিকে নয়।" (পাওয়া : শান্তিনিকেতন)

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা, বিশেষ করিয়া অদ্বৈতবাদ যে এককে লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহা উপনিষদোক্ত সেই ঈশ নহেন, যিনি সকল মানুষের মধ্যে পরম যোগের তত্ত্বরূপে বিরাজমান, যিনি সকলের সহিত যোগে এক, সকল খণ্ডকে আশ্রয় করিয়া যিনি অখণ্ডস্বরূপ। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় জীবমাত্রকেই শিবরূপে যে উপলব্ধি তাহা তাত্ত্বিক উপলব্ধি মাত্র, তাহা শুদ্ধ অবচ্ছিন্ন (abstract) জ্ঞানমাত্রকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহা পরম দুঃখপ্রসূত প্রেমের, হৃদয়ের উপলব্ধি নয়।

ইহার জন্য আমাদের সমাজ এত বিচিত্র বাধায়, বিচিত্র নিষেধে বিচ্ছিন্ন। যে বন্ধন এই বিপুল মানব সমাজকে বিধৃত করিয়া আছে, তাহা সংস্কারের, আকারের, প্রথার কৃত্রিম বন্ধন মাত্র।

ইহারই জন্য কোন এক শ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা, ব্যথা-বেদনা, মনুষ্যত্ব লাঞ্ছনায় সমাজের অন্য এক শ্রেণী কিছুমাত্র দুঃখ, বেদনা বা অসম্মান বোধ করে না। সমাজের সকলের জন্য সে স্বতঃস্ফূর্ত আত্মত্যাগ, সেবাতৎপরতা, তাহার লেশমাত্র পরিচয় আমাদের সমাজে লক্ষিত হয় না। সমাজের সকলের দুঃখভার মোচনের জন্য, দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য, শিক্ষাপ্রসারের জন্য নিয়ত চেষ্টার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ রূপটি আমাদের সমাজে কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।

ইহার মূল কারণ, দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে সেই একের সহিত বহুর যোগকে আমরা স্বীকার করি নাই।

অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সমাজজীবনে যে অখণ্ডতা, সকল স্তরের মানুষের দারিদ্র্য, আশিক্ষা, দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার জন্য যে প্রাণপণ প্রয়াস, পারস্পরিক আত্মত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পশ্চাতে নিঃসন্দেহে সেই ধর্মবোধ আছে যে ধর্ম জীবনের দুঃখভারকে পরিহার করিবার চেষ্টা না করিয়া তাহাকে অমৃতে রূপান্তরিত করিবার শিক্ষা দেয়।

ভারতীয় জ্ঞানের সাধনা যেমন যুক্তির সহায়তায় সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করিয়া একটি তত্ত্বমাত্রকে লাভ করিতে চাহিয়াছে, ভারতীয় ভক্তি বা ভাব মার্গ

তেমনি আপনার সকল চিত্তবৃত্তিকে ভাবাবেগে অত্যন্ত স্ফীত করিয়া তাহাকে একমুখীন করিয়া একটি রস পরিণাম দান করিয়া যাহা লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহাতে জীবন ও জগৎ সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।

আর ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির বোধকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া নিষ্কাম কর্মের যে তত্ত্ব তাহা ব্যক্তি-মুক্তির তত্ত্ব মাত্র তাহা মানুষের সহিত সকল মানবিক বোধ লইয়াই মিলিত হইবার তত্ত্ব নহে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় একদিকে জীবন ও জগৎ উদ্দেশ্যবিহীনভাবে, কতকগুলি আচার মাত্র পালন করিয়া একভাবে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, অন্যদিকে জীবন ও জগৎ বিচ্ছিন্ন সকল সীমার বোধ মুক্ত এক অস্তিত্ব মাত্রের উপলব্ধি।

পূর্ণ মনুষ্যত্বের চর্চা এবং নিষ্কাম কর্ম দুইটি এক জিনিষ নয়। একটির মধ্যে রহিয়াছে মনুষ্যত্বের সকল প্রকার বৃত্তির বিকাশ এবং তাহার জন্য সর্ববিধ জ্ঞান, কর্ম ও সৌন্দর্যবোধ প্রভৃতিকে আশ্রয়; অন্যটির মধ্যে রহিয়াছে আসক্তি বা ফল শূন্য হইয়া কর্ম করিয়া যাওয়া। এই কর্ম জন্মগত ভাবে লব্ধ। ইহারই উপর বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। এই নিরাসক্ত কর্মের ভিতর দিয়া মানুষ পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয়। এই পূর্ণ জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে সমাজের উচ্চতম পর্যায়ের মানুষের সহিত নিম্নতম পর্যায়ের মানুষের কোন পার্থক্য নাই। মানুষ্যত্ব বিকাশের ক্রম পূর্ণতার উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন ক্রমের সৃষ্টি করে না।

জীবন ও জগতের সহিত কোন যোগ না থাকিবার ফলে ইহা সম্ভব হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন ব্যবধান না থাকিবার জন্য মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্রম দিব্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে ক্রমের সৃষ্টি করে। মনুষ্যত্বের বিকাশ মুখ্যতঃ স্বধর্মকে আশ্রয় করিয়া ঘটে। একটি মানুষ কেন একটি বিশিষ্ট স্বধর্ম আশ্রয় করিয়া জন্মগ্রহণ করে তাহা এক ব্যাখ্যাতীত সামগ্রী। এই স্বধর্মের সহিত বর্ণাশ্রম ধর্মের সুদূর কোন সংযোগ নাই। ইহারই ফলে বর্ণাশ্রম ধর্ম স্থিতিশীল না হইয়া সম্পূর্ণ গতিশীল হইয়াছে। সামাজিক পর্যায় জন্মের দ্বারা লব্ধ নয়, মনুষ্যত্ব বিকাশের দ্বারা লব্ধ। মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য যে-কোন প্রকার উপকরণ সে সমাজের যে-কোন স্তর হইতে আহরণ করিবে।

সমাজকে সম্পূর্ণরূপে স্থিতিশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টায় পশ্চাতে দার্শনিক সত্যনিষ্ঠা যেমন ছিল, তেমনি সামাজিক ভোগ-সুখ, শক্তি ও সামর্থ্যকে বংশানুগত করিয়া তুলিবার চেষ্টাও ছিল।

বর্ণাশ্রম ধর্মকে আশ্রয় করিয়া সমাজ তাহার সকল মূল্যবোধ লইয়া আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে। ইহাও যেমন স্থির, অর্থাৎ ইহার মূল্যবোধের আদৌ যেমন পরিবর্তন ঘটিতেছে না, দিব্য চেতনাও তেমনি স্থির। তাহার সহিত সামাজিক মূল্যবোধের কোন যোগ নাই।

সীমা ও অসীমের যোগের উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের জীবনে সত্য ছিল বলিয়া এবং অসীমই সীমার ভিতর দিয়া আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া অভিব্যক্তি তত্ত্বে তিনি স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বাসী ছিলেন। বিশ্বের সকল সমাজ ও রাষ্ট্রের এই ধীর বিকাশ ঘটিতেছে বর্ণাশ্রম ধর্মের স্থির কাঠামো অনুযায়ীও নয়, বিকাশ ঘটিতেছে সমাজের নিয়ত চলাচলের ভিতর দিয়া।

সীমা ক্রমাগত বিকাশলাভ, উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে, এই বিশ্বাস এবং উপলব্ধি মানুষকে বহুমুখী প্রয়াসের সম্মুখীন করিয়াছে। ইহা মানুষকে আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে দিতেছে না। সমাজ হইতে দারিদ্র্য, রোগ, বিচিত্র দুঃখভোগ ও পাপ বিদূরিত করিবার জন্য তাহার প্রচেষ্টার আর অন্ত নাই। প্রাচীন ধর্ম সাধনা ও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে এই প্রয়াসের রূপটি ফুটিয়া উঠে নাই।

বস্তুত পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতায় জীবন ও জগৎ সম্পূর্ণরূপে স্বীকৃত। সীমা ও অসীমের মিলনেই সম্পূর্ণতা।

এই ভাবনার পরিচায়ক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

"তাহা মানুষের কোনো দুঃখ কোনো অভাবকেই উদাসীন ভাবে পাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারে না। মানুষের সর্বপ্রকার দুর্গতি মোচন করিবার জন্য নিত্য নিয়তই তাহা দুঃসাধ্য চেষ্টায় নিযুক্ত রহিয়াছে। এই চেষ্টার কেন্দ্রস্থলে যে একটি স্বাধীন শুভবুদ্ধি আছে, যে বুদ্ধি মানুষকে স্বার্থত্যাগ করাইতেছে, আরাম হইতে টানিয়া বাহির করিতেছে এবং অকুণ্ঠিত মৃত্যুর মুখে ডাক দিতেছে তাহাকে শক্তি যোগাইতেছে কে? কোথায় সেই অমৃত আছে যাহা এই উদার মঙ্গলকামনাকে এমন করিয়া সতেজ রাখিয়াছে।

খ্রীষ্টের জীবন-বৃক্ষ হইতে যে ধর্মবীজ য়ুরোপের চিত্তক্ষেত্রে পড়িয়াছে তাহাই সেখানে এমন করিয়া ফলবান হইয়া উঠিয়াছে। সেই বীজের মধ্যে যে জীবনী-শক্তি আছে, সেটি কী। সেটি দুঃখকে পরম ধন বলিয়া গ্রহণ করা।

স্বর্গের দয়া যে মানুষের প্রেমে মানুষের সমস্ত দুঃখকে আপনার করিয়া লয়, এই কথাটি আজ বহুশত বৎসর ধরিয়া নানা মন্ত্রে অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে য়ুরোপ শুনিয়া আসিতেছে। শুনিতে শুনিতে এই আইডিয়াটি তাহার এমন একটি গভীর মর্মস্থলকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যাহা চেতনারও অন্তরালবর্তী অতিচেতনার দেশ—সেইখানকার গোপন নিস্তব্ধতার মধ্য হইতে মানুষের সমস্ত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠে—সেই অগোচর গভীরতার মধ্যেই মানুষের সমস্ত ঐশ্বর্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়।" (যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)

"ভগবানের প্রেমে মানুষের ছোটো ও বড়ো সমস্ত দুঃখ নিজে বহন করিবার শক্তি ও সাধনা আমাদের দেশে পরিব্যাপ্ত ভাবে দেখিতে পাই না, একথা যতই অপ্রিয় হউক, তথাপি ইহা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে। প্রেমে ভক্তির মধ্যে যে ভাবের আবেগ, যে রসের লীলা, তাহা আমাদের যথেষ্ট আছে; কিন্তু প্রেমের মধ্যে যে দুঃখ স্বীকার, যে আত্মত্যাগ, যে সেবার আকাঙ্ক্ষা আছে, যাহা বীর্যের দ্বারাই সাধ্য, তাহা আমাদের মধ্যে ক্ষীণ। আমরা যাহাকে ঠাকুরের সেবা বলি তাহা দুঃখপীড়িত মানুষের মধ্যে ভগবানের সেবা নহে। আমরা প্রেমের রসলীলাকেই একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছি, প্রেমের দুঃখ-লীলাকে স্বীকার করি নাই।" (যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)

"চারিদিকের মানুষকে আমরা অন্তরের সহিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই, তাই আপনাকে আনন্দের সহিত ত্যাগ করিতেও পারিলাম না।

"মানুষকে এইরূপ সত্য করিয়া দেখা, ইহা আত্মার সত্যদৃষ্টি অর্থাৎ প্রেমের দ্বারাই ঘটে। তত্ত্বজ্ঞান যখন বলে 'সর্বভূতই এক', সে একটা বাক্য মাত্র; সেই তত্ত্বকথার দ্বারা সর্বভূতকে আত্মবৎ করা যায় না। প্রেম-নামক আত্মার যে চরম শক্তি, যাহার ধৈর্য অসীম, আপনাকে ত্যাগ করাতেই যাহার স্বাভাবিক আনন্দ, সেই সেবাতৎপর প্রেম নহিলে আর কিছুতেই পরকে আপন করা যায় না; এই শক্তির দ্বারাই দেশপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত দেশের মধ্যে উপলব্ধি করেন, মানবপ্রেমিক পরমাত্মাকে সমস্ত মানবের মধ্যে লাভ করেন।"

(যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)

"এখানেও আধ্যাত্মিকতার একটা বড় দিক প্রকাশ পাইয়াছে। আমাদের দেশের যাঁহারা সাধক তাঁহারা কেহ বা জ্ঞানে, কেহ বা ভক্তিতে অখণ্ড স্বরূপকে সমস্ত খণ্ড পদার্থের মধ্যে সহজেই স্বীকার করিতে পারেন। এইখানে জ্ঞানের দিকে, ভাবের দিকে, অনেক কালের চিন্তায় এবং সাধনায়, তাঁহাদের বাধা অনেক পরিমাণে ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য আমাদের দেশের যাঁহারা সাধু পুরুষ তাঁহারা চিৎলোকে বা হৃদয়ধামে অনন্তের সঙ্গে সহজে যোগ উপলব্ধি করিতে পারেন।" (যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)

উভয় দেশের সাধনা মিলিত হইয়া একদিন পরিপূর্ণ সত্তাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে।

"মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের

সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।" (যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)

"সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণতা * * আধ্যাত্মিক সাফল্যের সত্য পরিচয়।"

(যাত্রার পূর্বপত্র : পথের সঞ্চয়)

ভারতীয় সাধনায় মধ্যেযুগে এই সামগ্রিক দৃষ্টি নানা কারণে বিপর্যস্ত হইয়া যায়। মনোজগৎ বা অধ্যাত্ম-জগৎকে একান্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিলে মানুষ ক্রমে বহির্জগৎ সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবে উদাসীন হইয়া যায়। অন্তর ও বহির্জগতের কোন অসঙ্গতি আর দৃষ্টিগোচর হয় না, উহা মনকে কোন প্রকারে পীড়িত ও বিক্ষুব্ধ করে না। এককালে ইহাই জাতি-মানসের মূল প্রেরণা হইয়া উঠে বলিয়া এই অসঙ্গতির পরিচয় তাহার জীবনের সকল বিভাগেই লক্ষ্য করা যায়। অন্তরের ভাবকে বাহিরে রূপায়িত করিতে বহির্বিশ্বের সহিত সঙ্গতি বা সুষমা স্থাপনের প্রয়োজন সে বোধ করে নাই। প্রতীক ইত্যাদি নাম দিয়া প্রাকৃতিক সকল সংস্কারকে উহা হেলায় অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে এ কথা যেমন সত্য, তাহার অধ্যাত্ম-সাধনার আশ্রয়স্বরূপ তাহার বিচিত্র দেব-দেবীর মূর্তি পরিকল্পনা সম্পর্কে এই একই কথা বলা যাইতে পারে।

ভারতীয় শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে এই অসঙ্গতির মূলে রহিয়াছে এই সামগ্রিক জীবনবোধের অভাব। সামগ্রিক জীবনবোধের দিক হইতে ভারতীয় শিল্প-সাধনার বিচার আজও হয় নাই। কেবল শিল্প-সাধনা নয়, জীবন-সাধনার সকল বিভাগের এই জাতীয় বিচার প্রয়োজন। সামগ্রিক জীবনবোধ বলিতে প্রাকৃতিক ও অধ্যাত্মিক উভয়ের পূর্ণ সামঞ্জস্য বুঝায়।

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় জীবন-সাধনার এই অসঙ্গতির বিচিত্র দিকগুলিকে নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহারও বিচার বিশ্লেষন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাঁহার সেই সকল আলোচনা হইতে একটি বিস্তৃত অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"গ্রীকদের নিকট বহির্জগৎ বাষ্পবৎ মরীচিকাবৎ ছিল না, তাহা প্রত্যক্ষ জাজ্বল্যমান ছিল, এইজন্য অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে মনের সৃষ্টির সহিত বাহিরের সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইত। কোনো বিষয়ে পরিমাণ লঙ্ঘন হইলে বাহিরের জগৎ আপন মাপকাঠি লইয়া তাঁহাদিগকে লজ্জা দিত। সেইজন্য

তাঁহারা আপন দেব-দেবীর মূর্তি সুন্দর এবং স্বাভাবিক করিয়া গড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন ; নতুবা জাগতিক সৃষ্টির সহিত তাঁহাদের মনের সৃষ্টির একটি প্রবল সংঘাত বাধিয়া তাঁহাদের ভক্তির ও আনন্দের ব্যাঘাত করিত। আমাদের সে ভাবনা নাই। আমরা আমাদের দেবতাকে যে মূর্তিই দিই না কেন, আমাদের কল্পনার সহিত বা বহির্জগতের সহিত তাহার কোনো বিরোধ ঘটে না। কারণ, বাহিরের জগৎ আমাদের নিকট প্রবল নহে, প্রত্যক্ষ সত্য আমাদের নিকট তেমন সুদৃঢ় নহে, আমরা যে কোনো একটি উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া নিজের মনের ভাবটাকে জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারি। * * * বহির্জগতের আদর্শকে যাহারা নিজের ইচ্ছামতে লোপ করিতে জানে না, তাহারা মনের সৌন্দর্য-ভাবকে মূর্তি দিতে কখনোই কোনো অস্বাভাবিকতা বা অসৌন্দর্যের সমাবেশ করিতে পারেনা।

য়ুরোপীয়েরা তাঁহাদের বৈজ্ঞানিক অনুমানকে কঠিন প্রমাণের দ্বারা সহস্রবার করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তথাপি তাঁহাদের সন্দেহ মিটিতে চায় না—আমরা মনের মধ্যে যদি বেশ একটা সুসঙ্গত এবং সুগঠিত মত খাড়া করিতে পারি, তবে তাহার সুসঙ্গতি এবং সুষমাই আমাদের নিকট সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহাকে বহির্জগতে পরীক্ষা করিয়া দেখা বাহুল্য বোধ করি। জ্ঞান-বৃত্তি সম্বন্ধে যেমন, হৃদয়-বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ। আমরা সৌন্দর্য-রসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু সেজন্য অতি যত্নসহকারে মনের আদর্শকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া তোলা আবশ্যক বোধ করি না—যেমন-তেমন একটা কিছু হইলেই সন্তুষ্ট থাকি ; এমন কি, আলঙ্কারিক অত্যুক্তির অনুসরণ করিয়া একটা বিকৃত মূর্তি খাড়া করিয়া তুলি এবং সেই অসঙ্গত বিরূপ বিসদৃশ ব্যাপারকে মনে মনে আপন ইচ্ছামত ভাবে পরিণত করিয়া তাহাতেই পরিতৃপ্ত হই ; আপন দেবতাকে, আপন সৌন্দর্যের আদর্শকে প্রকৃতরূপে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা করি না। ভক্তি-রসের চর্চা করিতে চাই, কিন্তু যথার্থ ভক্তির পাত্র অন্বেষণ করিবার কোন আবশ্যকতা বোধ করি না,—অপাত্রে ভক্তি করিয়াও আমরা সন্তোষ থাকি।

* * * এই অসন্তোষটি না থাকাতে বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে দেবতাকে দেবতা হইবার, পূজ্যকে উন্নত হইবার, মূর্তিকে ভাবের অনুরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। *** ইহাতে কেবল সমাজের দীনতা, শ্রীহীনতা এবং অবনতি ঘটিতে থাকে। বহির্জগৎকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনো-জগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করা হয়।" (সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ : পঞ্চভূত)

এক একটি বিশিষ্ট চেতনা-বিকাশের সঙ্গে সৃষ্টি শতদলের এক একটি দল খুলিয়া গিয়াছে। ওই বিশিষ্ট চেতনা তাহার অনুকূল কতকগুলি বৃত্তি সেই সঙ্গে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে আপনাকে লীলায়িত করিবার জন্য।

এইরূপে আজ মানসলোকে সৃষ্টির এক আশ্চর্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। জীবের বিকাশ এইখানে আসিয়া শেষ হইয়া যায় নাই। সে অসীম বা ভূমাকে যত গভীর করিয়া উপলব্ধি করিতেছে তাহার সৃষ্টি-প্রতিভা তত মহৎ তত বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে; তাহার জ্ঞান, তাহার কর্ম, তাহার প্রেম ঐক্যকে তত সত্য করিয়া লাভ করিতেছে। এমনি করিয়া মানুষের মধ্যে ভূমার প্রকাশ ধীরে সত্য হইয়া উঠিতেছে।

যে ভূমার উপলব্ধি মানুষের বুদ্ধি, প্রেম ও কর্ম, তাহার দেহ প্রাণ মন আশ্রয় করিয়া গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছে, তাহা কখন মানসধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ যে উন্নততর চেতনার বিকাশ স্বীকার করেন তাহা মানব-চেতনাকে ক্রমিক প্রসারিত ও বিকশিত করিয়া লাভ করা যায়, তাহা বিশ্ব-মন।

রবীন্দ্রনাথ মানস-ধর্মকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ করেন, উন্নততর যে পরিণাম· তাহা ইহার বিকাশমাত্র। তাই ভূমাকেও তিনি মানস-ধর্মী করিয়া তুলিয়া তাহাকে বিশ্বমন আখ্যা দান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীব-ধর্ম সীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি, তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনই অমানব নয়, তাহা মানব-ব্রহ্ম।" (মানুষের ধর্ম)

"মানব-মনের সমস্ত লক্ষণ সম্পূর্ণ লোপ করে দিয়ে সেই নির্বিশেষে মগ্ন হওয়া যায়, এমন কথা শোনা গেছে। এ নিয়ে তর্ক চলে না। মন সমেত সমস্ত সত্তার সীমানা কেউ একেবারে ছাড়িয়ে গেছে কিনা, আমাদের মন দিয়ে সে কথা নিশ্চিত বলব কী করে। আমরা সত্তা-মাত্রকে যেভাবে যেখানেই স্বীকার করি, সেটি মানুষের মনেরই স্বীকৃতি। সেই কারণেই

দোষারোপ করে মানুষের মন স্বয়ং যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে শূন্যতাকেই সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না।*** মানুষের বুদ্ধির, যুক্তির কাঠামোর মধ্যে কেবল মানুষই তাকে আপন চিন্তার আকারে আপন বোধের দ্বারা বিশিষ্টতা দিয়ে অনুভব করে। এমন কোন চিন্তা কোথাও থাকতে পারে যার উপলব্ধির জগৎ আমাদের জাগতিক পরিমাপের অতীত, আমরা যাকে আকাশ বলি সেই আকাশে সে বিরাজ করে না। কিন্তু যে জগতের গূঢ়-তত্ত্বকে মানব আপন অন্তর্নিহিত চিন্তা-প্রণালীর দ্বারা মিলিয়ে পাচ্ছে তাকে অতিমানবিক বলব কি করে।*** মানুষের বহিরিন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয়ের যত কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে। তার অর্থই এই যে, মানব ব্রহ্ম, তাই তার জগৎ মানব-জগৎ। এ ছাড়া অন্য জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।" (মানুষের ধর্ম)

"আপনাকে ত্যাগ না করে আপনার মধ্যেই সেই মহান্ পুরুষকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্র আছে তিনি নিখিল মানবের আত্মা। তাকে সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়ে কোন অমানব বা অতি-মানবিক সত্যে উপনীত হওয়ার কথা যদি কেউ বলেন, তবে সে কথা বোঝবার শক্তি আমার নেই। কেন না আমার বুদ্ধি, আমার হৃদয় মানব-হৃদয়, আমার কল্পনা মানব-কল্পনা। তাকে যতই মার্জনা করি, শোধন করি তা-মানব চিত্ত কখনই ছাড়াতে পারে না। আমরা যাকে বিজ্ঞান বলি তা মানব-বুদ্ধিতে প্রমাণিত বিজ্ঞান, আমরা যাকে ব্রহ্মানন্দ বলি তাও মানবের চৈতন্যে প্রকাশিত আনন্দ। এই বুদ্ধিতে, এই আনন্দে যাঁকে উপলব্ধি করি তিনি ভূমা কিন্তু মানবিক ভূমা। মানুষকে বিলুপ্ত করে যদি মানুষের মুক্তি, তবে মানুষ হলুম কেন।" (মানব সত্য)

মানস-চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা যে ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় তিনি স্বয়ং দান করিয়াছেন। যে কারণেই হোক কবি ওই পথ পরিহার করেন।

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর চেতনাকে কবি এক্ষেত্রে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিলেও এককালে তিনি এই সত্তা সম্পর্কে নিঃসংশয় ছিলেন। মানবীয় চেতনা অতিক্রম করিয়া তাহাকে যে লাভ করা যায় এমন অভিমতও তিনি করিয়াছিলেন। সেই পরিচয় লাভ করিতে কবির একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেশ-কালের বাহিরে আমাদের যদি কোনো গতিই না থাকে তাহলে যিনি দেশ-কালের অতীত, যিনি অভিব্যক্ত নন, যিনি আপনাতে পরিসমাপ্ত,

তিনি আমাদের পক্ষে একেবারেই নাই। সেই পূর্ণতার স্থিতিধর্ম যদি আমাদের মধ্যে একান্তই না থাকে তবে অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি আমরা যা কিছু বিশেষণ প্রয়োগ করি সে কেবল কতকগুলি কথা মাত্র আমাদের কাছে তার কোন অর্থই নেই।"

ঈশ্বরীয় বোধ হইল মানবীয় বোধেরই পূর্ণ পরিণাম। তাঁহার সহিত মানুষের বিচিত্র সম্পর্ক, এবং ওই সম্পর্ক স্থাপনের নানা পন্থার নির্দেশ করা হইয়াছে 'মানুষের ধর্মের' মধ্যে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইলে সৎ স্বরূপ এবং মানুষের ধর্ম সম্পর্কে তাঁহার ধারণা সুস্পষ্ট হইবে।

"এই গ্রন্থে আমি যাহা উল্লেখ করিতে চাহিয়াছি তাহা এই যে, দিব্য-সত্তার যে নামই দেওয়া যাক্‌-না কেন, উহার মানব-ধর্মের জন্যই উহা আমাদের ধর্মের ইতিহাসে সর্বোচ্চ আসন লাভ করিয়াছে। এই মানব-ধর্মই আমাদের পাপ-পুণ্য বোধকে অর্থান্বিত করিয়াছে, উহা সম্পূর্ণতার সকল প্রকার আদর্শের শাশ্বত পটভূমিস্বরূপ। উহার সহিত মানুষের নিজস্ব প্রকৃতির সামঞ্জস্য রহিয়াছে।"

এই মানব-ব্রহ্মের সহিত মানুষ তাহার এই স্বরূপ লইয়াই কি ভাবে আচরণ করিবে, ওই স্বরূপ সম্পর্কে তাহার মনোভাব কিরূপ থাকিবে রবীন্দ্রনাথ তাহাই নির্দেশ করিতে চাহিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন,

"যে ধর্ম একমাত্র মানুষের সহিত সম্পর্কান্বিত হইয়া মানুষকে অসীমের মানবিক সত্তা সম্পর্কে তাহার মনোভাব এবং উহার সহিত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সহায়তা করিতেছে, আমি ধর্মের সেই বিষয়ের উপর আমার লক্ষ্য স্থির রাখিয়াছি।"

ধর্ম বলিতে তিনি বুঝিতেন।

"ধর্ম হইল আমাদের একক সত্তা হইতে মুক্ত হইয়া বিশ্ব-সত্তা লাভ। বিশ্ব-সত্তা আবার মানবিক সত্তা।"

সৎ স্বরূপের অতি মানবিক যে সত্তা এবং উহাকে লাভ করিবার জন্য মানবীয় চেতনাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার যে সাধনা তাহাকে রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে কোথাও কোথাও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুত ভারতীয় ঋষিদের সহস্র বৎসরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি জাত সত্যকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। এই উপলব্ধিকে স্বীকার করিয়া লইয়া পরে তিনি আপনার সাধনার স্বরূপ এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

"আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁহারা দ্বৈতের জন্য প্রার্থনা করেন, যেন ঈশ্বরের সহিত চিরকাল ভক্তির বন্ধন থাকে। তাঁহাদের নিকট ধর্ম পরম সত্য এবং যাহারা মানবিক সত্তাবোধের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে প্রস্তুত তাঁহাদের ইঁহারা ঈর্ষা করেন না। তাঁহারা জানেন যে মানুষের দুঃখের মূলে আছে তাহার অপূর্ণতা, কিন্তু প্রেমে আমাদের সীমা-লোকের মধ্যে সম্পূর্ণতা ঘটে, উহা সকল দুঃখ-দুর্দশাকে স্বীকার করিয়াও উহাদের সকলকে ছাড়াইয়া উঠে।"

দেশ-কালের অতীত মানবীয় চেতনার উর্ধ্বতর সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি।

"যদিও যোগ-প্রক্রিয়ার দ্বারা মানুষ মনুষ্য-চেতনার শেষ সীমা ছাড়াইয়া যাইতে পারে এবং পরম ব্রহ্ম অখণ্ড ঐক্যবোধের ভিতর দিয়া চেতনার শুদ্ধ সত্ত্ব অবস্থার মধ্যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। এই বিশ্বাসের বিরোধিতা করিতে পারে এমন কেহ নাই, কারণ ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফল, যুক্তি-তর্কের বিষয় নহে। এই সাক্ষ্যকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও, যাঁহারা মানবীয় সকল জ্ঞান ও কর্মের আকর স্বরূপ কোন সত্তার প্রতি গভীর প্রেম, তীব্র ঐক্যবোধ করিয়াছেন তাঁহাদের সাক্ষ্যকেও যেন সেই সঙ্গে বিশ্বাস করিতে পারি। তিনি কেবল তথ্যসমূহের সামগ্রিক প্রকাশ নহেন, তিনি অতীত ও বর্তমানের সমস্ত কিছুর সুদূরাতীত লক্ষ্য।"

মানুষে মানুষে দেশ-কালের ব্যবধান যথেষ্ট থাকিলেও মনুষ্যত্বের ক্ষেত্রে সকলের মধ্যে গভীর যোগ আছে। ইতিহাসের ভিতর দিয়া মানুষের এই সর্বকালীন সর্বজনীন মনুষ্যত্বটির ধীর বিকাশ ঘটিতেছে। অভিব্যক্তি রূপে প্রকাশমান এই চিরন্তন মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ-রূপটিকে তিনি বিশ্ব-মানব আখ্যা দান করিয়াছেন। সংখ্যাতীত মানব-সত্তার মধ্যে বিভক্ত রূপে থাকিয়া তিনি সকলের মধ্যে পরম যোগের তত্ত্ব রূপে বিরাজমান। এই যে বিশ্ব-মানব, বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-আমি তাহা সকল মানব মনের যোগের তত্ত্ব নয়। তাহা হইলে সমষ্টিভূক্ত মনের বিকাশের কোন ক্ষেত্রই থাকিত না। এই বিশ্ব-মন সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানব-মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া চিরকাল বিরাজ করিতেছেন।

এই বিশ্ব-মানব, বিশ্ব-মন বা বিশ্ব-আমিকেই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর আখ্যা দান করিয়াছেন। যাঁহার গূঢ় প্রেরণায় নিখিল মানব সমাজের মনুষ্যত্বের ধীর

বিকাশ ঘটিতেছে। মানবিক বোধের প্রসারের ভিতর দিয়া যাঁহার সহিত আমরা মিলিত হই তিনি মানবিক বোধ বিবিক্ত কোন সত্তা হইতেই পারেন না। তাঁহার মধ্যে মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ। তাঁহার যোগে মানুষ জীব-ধর্মের সীমা লঙ্ঘন করিয়া ক্রমাগত সার্বজনীন মনুষ্যত্বে উত্তীর্ণ হইতেছে,—নিখিল মানব-সমাজের অন্তরের মধ্যে যে সার্বজনীন মনুষ্যত্বের স্থির-আদর্শ বিরাজমান। তাঁহারই যোগে মানুষ সকল মানুষের অন্তরে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট দেখে। তখন মানুষের পক্ষে মানুষ মাত্রেরই জন্য আত্মত্যাগ একান্ত সহজ হইয়া উঠে। ইঁহার যোগে মানুষ যে কর্ম করে তাহা বিশ্ব-কর্ম, ইঁহারই যোগে মানুষের জ্ঞান ও শক্তি বিশ্ব-জ্ঞান ও বিশ্ব-শক্তি স্বরূপতা লাভ করে।

শাস্ত্র যাঁহাকে সগুণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন, সেই সগুণ ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের সাধ্য। তাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে, সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্,—অর্থাৎ তাঁহার মধ্যে মানুষের অন্তর ও বাহিরের সকল গুণ বর্তমান। মানুষের অন্তর ও বাহিরের সকল ধর্মের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে হয়। ইঁহাকেই তিনি বলিয়াছেন চিরমানব।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বর বা বিশ্ব-মানব তত্ত্বটিকে উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

—"ব্যক্তিগত মানুষগুলির মধ্যে দেশ-কালের ব্যবধান যথেষ্ট, কিন্তু সমস্ত মানুষকে দিয়ে আছে একটি বৃহৎ এবং গভীর ঐক্য। সেই ইন্দ্রিয়বোধাতীত ঐক্য সাংখ্যিক সমষ্টিকে নিয়ে নয়, সমষ্টিকে অতিক্রম করে। সেই হচ্ছে আমাদের এক গূঢ় আত্মা, একধৈবাণু দ্রষ্টব্যঃ, কিন্তু বহুধা শক্তি যোগে তার প্রকাশ।" (মানুষের ধর্ম)

"যিনি আমাদের দর্শনশাস্ত্রে সগুণ ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হয়েছে সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসম্। অর্থাৎ মানুষের বহিরিন্দ্রিয় অন্তরিন্দ্রিয়ের যত কিছু গুণ তার আভাস তাঁরই মধ্যে তার অর্থ এই যে, মানব ব্রহ্ম, তাই তাঁর জগৎ মানবজগৎ। এ ছাড়া অন্য-জগৎ যদি থাকে তাহলে সে আমাদের সম্বন্ধে শুধু যে আজই নেই তা নয়, কোনো কালেই নেই।" (মানুষের ধর্ম)

"তার যোগে আমরা যদি আমাদের জীবধর্ম সীমার অতিরিক্ত সত্তাকে অনুভব করি। তবে বলতে হবে, সে সত্তা কখনোই অমানব নয়, তা মানব ব্রহ্ম। আমাদের মতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা আত্মবিষয়ীকৃত করি।" (মানুষের ধর্ম)

সগুণ ব্রহ্মের অতীত যে নির্গুণ ব্রহ্ম তাঁহাকে দার্শনিক যুক্তিবিচারের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নাই। তিনি মানুষের সহিত প্রত্যক্ষ যোগে যুক্ত নন। তাঁহার সম্পর্কে মানুষের পাপ-পুণ্যের কোন বোধ নাই। চিরন্তন মনুষ্যত্বের যে বিকাশের ধারা তাহার সহিত নির্গুণ ব্রহ্ম সকল যোগ বিরহিত। মানবিক বিচিত্র বোধের সহিত তিনি বিজড়িত নহেন বলিয়া তাঁহার অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের মূল্য আমাদের নিকট সমার্থক। তিনি সে কথা বলিয়াছেন,

"—পরম মানবিক সত্তাকে পেরিয়ে পরম জাগতিক সত্তা আছে।*** মানবিক সত্তাকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যে নৈর্ব্যক্তিক জাগতিক সত্তা, তাঁকে প্রিয় বলা বা কোনো কিছুই বলার কোনো অর্থ নেই। তিনি ভালো-মন্দ সুন্দর-অসুন্দরের ভেদ-বর্জিত। তাঁর সঙ্গে সম্বন্ধ নিয়ে পাপ-পুণ্যের কথা উঠতে পারে না।" (মানুষের ধর্ম)

প্রকৃতি ও প্রেম

বৈদিক প্রকৃতি বন্দনাগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্যায়ে প্রাকৃতিক এক-একটি সৌন্দর্য দৃষ্টে ঋষি-কবির চিত্ত বিস্ময়বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছে,—একপ্রকার ভক্তিমিশ্রিত ভীতি-বিহ্বলতা! এই সকল প্রাকৃতিক ঘটনার পশ্চাতে তাঁহারা এক-একটি দেবতার লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিয়াছেন। এই পর্যায়ে প্রাকৃতিক এক-একটি ঘটনা বা রূপের প্রকাশ একান্ত বিশ্লিষ্ট বা বিচ্ছিন্ন রূপে অনুভূত। তখনও পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে কোন যোগের তত্ত্ব অনুভূত হয় নাই।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাকৃতিক এক-একটি ঘটনার অধিষ্ঠাত্রী এই সকল দেব-দেবীর মধ্যে একটি আত্মীয়বন্ধন ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে দেখিতে পাই। ইহাতে বোধ করিতে পারা যায় বাহিরের বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলীর মধ্যে তাঁহারা ধীরে একটি যোগসূত্রের সন্ধান লাভ করিতে সুরু করিয়াছেন।

তৃতীয় পর্যায়ে এই দেব-দেবীদের মধ্যে মিলনসাধন সম্পূর্ণ হইয়াছে। অর্থাৎ সকল প্রাকৃতিক ঘটনা ও রূপের অন্তরালে যে একটি অখণ্ড সত্তার অচঞ্চল প্রকাশ আছে, তাহারই নিঃসংশয় উপলব্ধি। দৃষ্টান্ত সহকারে বিষয়টি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে।

বৈদিক দেবতাদের মধ্যে অগ্নি, সূর্য, ইন্দ্র, মরুৎ, বিষ্ণু, বরুণ, মিত্র, আদিত্য, আর্যমান, উষা, অশ্বিন, সাবিত্রি প্রভৃতি প্রধান। ইঁহাদের মধ্যে অগ্নি এবং ইন্দ্রই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অগ্নি ত্রিলোক বিরাজিত। তিনি মর্ত্যে যজ্ঞাগ্নি রূপে, প্রাণের উত্তাপ, তৃণ-তরু-লতার প্রাণরূপে প্রকাশমান। অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপে তাঁহার প্রকাশ। স্বর্গে তিনি আলো, সূর্য, প্রভাত ও নক্ষত্রমণ্ডলী রূপে বিরাজিত।

অন্তরীক্ষে প্রাকৃতিক ঘটনার মনুষ্যরূপ ইন্দ্র। তাঁহার বজ্র-তাড়নায় মেঘ হইতে মর্তে জলধারা বর্ষিত হয়। মরুৎ ইন্দ্রের সহকারী। বিষ্ণুকে বলা হয় ত্রি-বিক্রম। সূর্যের উদয়, মধ্যাহ্নকালীন অবস্থান এবং অস্ত—এই তিন অবস্থা বা ক্রমকে বলা হয় ত্রিবিক্রম। বরুণ রাত্রির দেবতা। তাঁহারই নির্দেশে চন্দ্র ও নক্ষত্রমণ্ডল আকাশ পরিভ্রমণ করে। মিত্র আলোর দেবতা। তিনি

সূর্যের পথ উদ্ভাসিত করেন। আর্যমান গোধূলির দেবতা। অশ্বিন সূর্যের দুই পুত্র। ইঁহারা সূর্যমণ্ডলের চ্ছটার সহিত যুক্ত।

সূর্য সকল সচল ও নিশ্চল পদার্থের আত্মা। ইঁহার প্রকাশকে বলা হয় আদিত্য। বিষ্ণু, মিত্র, বরুণ, আর্যমান, পুষণ, ভগ, তম্রি প্রভৃতি সূর্যেরই বিভিন্ন নাম। অগ্নিকে আবার যম, বরুণ, মিত্র এবং সূর্যের সহিত একাত্ম করিয়া দেখা হইয়াছে।

আদিত্য, সাবিত্রি, অশ্বিনকুমারদ্বয় এবং বিষ্ণু, মিত্র ও আর্যমান এক সূর্যের বিভিন্ন প্রকাশের মনুষ্য-রূপ। উষা সূর্যের কন্যা। সূর্য অগ্নিরই প্রকাশ বলিয়া উভয়ের মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই। বরুণ রাত্রির দেবতা হইলেও সকল জ্যোতিষ্কমণ্ডলী এবং চন্দ্রকে পরিচালিত করেন বলিয়া আলোর সহিত ইঁহার যোগ। সূর্য ও অগ্নির সহিত বরুণকে তাই একাত্ম করিয়া দেখা হইয়াছে। যে এক আদি জ্যোতি উৎস নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে থাকিয়া বিশ্বের নিয়ামক শক্তি রূপে ঋত বা সত্য রূপে বিরাজিত ইন্দ্র ও মরুৎকে পরিণামে অন্যান্য সকল দেবতার ন্যায় তাহার সহিত একাত্ম করিয়া দেখা হইয়াছে।

বৈদিক ঋষিরা এইরূপে এক পরম আলোক বা সত্যের সন্ধান লাভ করিয়াছিলেন, যাহার সহিত সকল দেবতা একাত্ম হইয়া একই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশ রূপে অনুভূত হইয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উদ্ভিন্ন করিতে করিতে, গভীর হইতে গভীরে অনুপ্রবেশ করিতে করিতে তাঁহারা পরিশেষে যে রূপের সন্ধান লাভ করিলেন তাঁহাকে মর্ত্তের কোন আলো উদ্ভাসিত করতে পারে না। বাক্য ও মন সেখান হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির কেবল বহিঃসৌন্দর্যের ধ্যান করেন নাই, তাঁহারা এই সকল রূপকে অনুবিদ্ধ করিয়া তাহাদের অন্তরালস্থিত বিচিত্র ভাব-লোক আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সকল ভাব-লোকের সহিত কল্পনাযোগে তাঁহারা আপন হৃদয়ের নিগূঢ় যোগ অনুভব করিয়াছিলেন।

এই ভাব-লোকের সন্ধানলাভের ভিতর দিয়া রূপের একান্ত বিচ্ছিন্নতা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতে থাকে। একটি ভাব ও রূপ-কল্পনায় সকল দেব-দেবী ধীরে একাত্ম হইয়া যায়।

এইভাবে বিচিত্র রূপের পশ্চাতে বিচিত্র ভাব-লোকের সন্ধান লাভ করিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহারা এই ভাবের৷ জগৎকেও অনুবিদ্ধ করিয়া আরো গভীরে তাঁহাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করিতে চাহিলেন।

পরিশেষে তাঁহারা এমন এক ঐক্য-তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিলেন, এক আদি উৎস, যাহার মধ্য হইতে অন্তহীন কাল ধরিয়া সকল ভাব, সকল রূপ নিয়ত উৎসারিত হইতেছে। মানুষের আকাঙ্ক্ষা এইখানে আসিয়া পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে। এই চেতনার সহিত যুক্ত হইয়াই মনুষ্য-চেতনা আপনাকে বিশ্বময় লীলায়িত হইতে দেখে।

রূপ-সাক্ষাৎকার বা রূপ-সৃষ্টি বলিতে এই তিনের পূর্ণ সমন্বয় বুঝায়। ইহাদের যে-কোন একটির অভাবে শিল্প রূপ ব্যর্থ হইয়া যায়। এক প্রান্তে আকার বা সীমা, অন্য প্রান্তে নির্বিশেষ রস,—রূপ এই উভয়ের মিলিত প্রকাশ।

(খ)

কালিদাস যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে সমগ্র জীবন ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন, তাহা অমূর্ত্য বা ইনটিলেকচুয়াল সৌন্দর্য নয়, তাহা মর্ত্যের নারী রূপেরই ধ্যান। এই নারীর সহিত আমরা বিচিত্র স্নেহবন্ধনে বাঁধা। নারীর-শরীরী সৌন্দর্যই তাঁহার ধ্যানে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। তাঁহার কবি-প্রতিভা এক দিকে মর্ত্য-প্রেম এবং অন্যদিকে মর্ত্য-রূপের পূর্ণতাকেই লাভ করিতে চাহিয়াছে।

এই পরিপূর্ণ নারী-মূর্তিটিকেই গড়িয়া তুলিবার জন্যই তিনি প্রকৃতির দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু মধুর, কোমল, যাহা কিছু দীপ্ত ও উজ্জ্বল, সেই সমস্ত কিছুর উপর নারীর বিভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য আরোপ করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার পশ্চাতে কবির সেই এক গোপন আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্যকে এইরূপে তিল তিল করিয়া আহরণ করিয়া তাঁহার নারী-রূপের ধ্যান পরিণামে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি ও নারী একে অন্যকে আশ্রয় করিয়া একে অন্যকে উদ্ভাসিত করিয়া ধীরে পূর্ণ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একটিকে আর একটি হইতে তাই একান্ত রূপে বিচ্ছিন্ন করিবার কোন উপায় নাই।

কালিদাসের কাব্যে যে একটি ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতার পরিচয় আছে, তাহা প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং তাহারই আশ্রয়ভূতা নারী-রূপ। পরিণামে নারী-রূপ ও প্রকৃতির সৌন্দর্য একাত্ম হইয়া গিয়াছে। কিংবা বলা যায়, প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য মথিত করিয়া পরিণামে তাঁহার সৌন্দর্য-প্রতিমা ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া

উঠিয়াছে। কালিদাসের সমগ্র কাব্য ব্যাপিয়া এইরূপে একটি সৌন্দর্য্য-লোকের ধীর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়।

এই বিকাশ কোন ভাব বা আইডিয়া, কোন কল্পনা, জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত কোন অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার, কোন অত্যুচ্চ নৈতিকবোধ-প্রসূত নহে।

কালিদাস প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত জীবন ও জগতের যে পরিকল্পনাটিকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র জাতির জীবনে উপলব্ধ সত্য।

কালিদাসের কাব্যে নিখিল মানব সংসার ও বিশ্ব-লোক, ঐহিক ও পরমার্থিক সকল বোধ, স্তরবিন্যস্ত সামাজিক সকল প্রকার মূল্যবোধ এবং বিচিত্র সকল সংস্কার লইয়া একটি সূক্ষ্ম কারুকার্যবিশিষ্ট ইমারতের মত নিশ্চল। ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত জীবন, উর্ধ্ব ও নিম্নতর চেতনাসম্পন্ন সকল জীব আপন আপন নিয়তিকে এক সুনির্দিষ্ট নিয়মে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে। উর্ধ্বতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সকল চেতনা-পর্যায়ে নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী এক অমোঘ নিয়ম বিদ্যমান।

কালিদাস জীবন ও জগতের যে পরিকল্পনাটিকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করেন তাহা নিশ্চল বলিয়া তাঁহার সৌন্দর্যালোকটিও চিরস্থির অচঞ্চল।

কালিদাসের সৌন্দর্য রূপায়ণের ক্ষেত্রে মোটামুটি তিনটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত তিনি বিশ্বের বিচ্ছিন্ন বিচিত্র সৌন্দর্যকে পৃথক পৃথক ভাবে আস্বাদ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত এই সকল বিচ্ছিন্ন বিচিত্র সৌন্দর্যকে একে একে আহরণ করিয়া একটি আকাঙ্ক্ষিত স্থানে আপনার মানস অনুকূল করিয়া বিন্যস্ত করিয়াছেন। তৃতীয়ত এই মানস-লোকের মধ্যস্থলে সেই সকল সৌন্দর্যের সারভূতা এক-একটি নারী মূর্তি।

বিক্রমোর্বশী নাটকে মণি-হর্ম্য এবং তাহার পটভূমিকায় অপূর্ব লাবণ্যময়ী নারী মূর্তি উর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রমোদ ভবনের পটভূমিকায় নৃত্যরতা মালবিকা, মেঘদূতে অলকার মধ্যস্থলবর্তিনী বিরহিনী যক্ষপ্রিয়া, শকুন্তলায় মালিনী তীরবর্তী কণ্বাশ্রমে দুই প্রিয় সখী বেষ্টিতা কণ্বদুহিতা শকুন্তলা, কুমারসম্ভবে বসন্ত সমাগত তপোবন এবং তাহারই মধ্যস্থলে মূর্তিময়ী বসন্ত-স্বরূপিণী গৌরী।

প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার যে একটি ধ্যান ছিল, তাহাকেই তিনি আপনার কাব্য-কৃতির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এই সৌন্দর্য-লোকের স্থির প্রকাশ-রূপই তাঁহার কাব্যে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত

লক্ষ্য করা যায়। ইহাকে তাই সৌন্দর্য-লোকের ঠিক বিকাশও বলা যায় না। ইহা যেন কবি-কৃতিরই ধীর বিকাশ। রূপের এই স্থির ধ্যানটিকেই তিনি নানা পরিপ্রেক্ষির মধ্যে ফেলিয়া রূপায়িত করিয়াছেন।

কালিদাস প্রকৃতির কেবল বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যকে মানস অনুকূল চয়ন করিয়া একটি কল্পিত সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের মধ্যে কোন যোগের তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা তাঁহার মধ্যে ছিল না। যে একটি করিয়া নারী-প্রতিমা তিনি এই প্রত্যেকটি পট-ভূমিকার মধ্যস্থলে স্থাপিত করিয়া তাহার বিচিত্র রূপ ও ভাব পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, এবং সেই সকল পটভূমিকার সহিত মানসী নারীর হৃদয়বোধের সম্পর্ক কোথাও কোথাও প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহা একান্ত প্রত্যক্ষগোচর জীব-জগৎ ও প্রকৃতি-জগৎকে আশ্রয় করিয়াছে মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রকৃতির সৌন্দর্য নারীর সৌন্দর্যবিকাশে বিচিত্র পট-ভূমিকা রূপে কাজ করিয়াছে।

এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্যলোক এবং সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াও কালিদাস অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছেন। গভীর দুঃখভোগ এবং দুঃসহ তপস্যার ভিতর দিয়া তিনি পরিণামে ভারতীয় জীবন-সাধনার পথ ও আদর্শ অবলম্বন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছেন।

এই জাতীয় সৌন্দর্যাশ্রয়ী সাধনার মধ্যে অসম্পূর্ণতা বোধের কারণ, ইহা ব্যক্তি ও বিশ্ব-সত্তার একটি অংশ মাত্র। বিশ্বের সকল সৌন্দর্যকে এক যোগে এক ঠাঁই লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহা বিশ্ব-সত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা নহে। বিশ্বে অসুন্দর ভাগও আছে। বিশ্ব-সত্তা এমন একটি তত্ত্ব, যাহার মধ্যে বিশ্বের সকল সুন্দর ও অসুন্দরের মূল নিহিত। তাহা সকল সুন্দর অসুন্দরের মিলিত কোন প্রকাশ রূপও নয়। সেই অনিবার্য্য রহস্যটিকে ভেদ করিতে না পারিলে ব্যক্তির সম্পূর্ণতা তথা বিশ্ব-সত্তা লাভ ঘটে না।

অসম্পূর্ণতার জন্যই এই বেদনাবোধ। ভারতীয় জীবন-দর্শন এই সমস্যার সমাধান করিতে চায় নাই। এই অসম্পূর্ণতা-বোধের প্রেরণায় তাহা পরিণামে জীবন ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

(গ)

বিশ্বেশ্বরের আনন্দই বিশ্বের অন্তহীন রূপের ভিতর দিয়াই নিয়ত প্রকাশ লাভ করিতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তহীন রূপ-বৈচিত্র্যের সহিত মিলন-বোধের

ভিতর দিয়া আমরা সেই এক আনন্দকে নানা ভাবে আস্বাদ করি। বহির্বিশ্বের রূপ তাই আমাদের চেতনাকে বদ্ধ তো করেই না বরং নানাভাবে তাহাকে সেই পরম রসের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত যোগে কবি-চেতনা যতই গভীর ও ব্যাপ্ত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্ব ততই অন্তহীন মাধুর্য্য ও বিস্ময় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কবি-হৃদয় নিঃশেষে নিমগ্ন হইয়াও সেই মাধুরীর তল পায় নাই।

যে তত্ত্ব-দৃষ্টি নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতিকে একান্ত সীমার সামগ্রী বলিয়া বোধ করে, সেইহেতু অসীমের উপলব্ধি লাভের পথে অন্তরায় বলিয়া ইহাকে পরিহার করে রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবে সেই তত্ত্ব-দৃষ্টিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতিকে তিনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহার পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার কিছু কিছু অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি আত্মাকে বিশ্বপ্রকৃতিকে বিশ্বেশ্বরকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোঠায় খণ্ড খণ্ড করিয়া রাখিয়া আমার ভক্তিকে বিভক্ত করি নাই।

আমি, কি আত্মার মধ্যে, কি বিশ্বের মধ্যে বিস্ময়ের অন্ত দেখি না। আমি জড় নাম দিয়া, সসীম নাম দিয়া, কোনো জিনিসকে একপাশে ঠেলিয়া রাখিতে পারি নাই। এই সীমার মধ্যেই, এই প্রত্যক্ষের মধ্যেই অনন্তের যে প্রকাশ তাহাই আমার কাছে অসীম বিস্ময়াবহ। আমি এই জলস্থল তরুলতা পশুপক্ষী চন্দ্রসূর্য দিনরাত্রির মাঝখান দিয়া চোখ মেলিয়া চলিয়াছি, ইহা আশ্চর্য। এই জগৎ তাহার অণুতে পরমাণুতে, তাহার প্রত্যেক ধূলি-কণায় আশ্চর্য। আমাদের পিতামহগণ যে অগ্নিবায়ু-সূর্য-চন্দ্র-মেঘ-বিদ্যুৎকে দিব্যদৃষ্টি দ্বারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা যে সমস্ত জীবন এই অচিন্তনীয় বিশ্বমহিমার মধ্য দিয়া সজীব ভক্তি ও বিস্ময় লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বিশ্বের সমস্ত স্পর্শই তাঁহাদের অন্তরবীণায় নব নব স্তব সঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছিল ইহা আমার অন্তকরণকে স্পর্শ করে।" (আত্মপরিচয়)

নিখিল বিশ্ব পরমেশ্বরেরই আনন্দ রূপ। তাই তাঁহার আনন্দের আস্বাদ লাভ করিতে হইলে ব্যক্তি-চেতনাকে বিশ্বের সহিত মিলিত করিতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন,—

"আমি চোখ মেলে যা দেখলুম চোখ আমার কখনো তাতে ক্লান্ত হল না। বিস্ময়ের অন্ত পাই নি। চরাচরকে বেষ্টন করে অনাদিকালের যে অনাহত

বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত তাতে আমার মন প্রাণ সাড়া দিয়েছে, মনে হয়েছে যুগে যুগে এই বিশ্ববাণী শুনে এলুম। সৌরমণ্ডলীর প্রান্তে এই আমাদের ছোট শ্যামল পৃথিবীকে ঋতুর আকাশ দূতগুলি বিচিত্র রসের বর্ণ-সজ্জায় সাজিয়ে দিয়ে যায়, এই আদরের অনুষ্ঠানে আমার হৃদয়ের অভিষেক বারি নিয়ে যোগ দিতে কোনদিন আলস্য করি নি। প্রতিদিন উষাকালের অন্ধকার রাত্রির প্রান্তে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছি এই কথাটি উপলব্ধি করবার জন্য যে যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি। আমি সেই বিরাট সত্তাকে আমার অনুভবে স্পর্শ করতে চেয়েছি। যিনি সকল সত্তার আত্মীয় সম্বন্ধের ঐক্যতত্ত্ব, যাঁর খুশিতেই নিরন্তর অসংখ্য রূপের প্রকাশে বিচিত্রভাবে আমার প্রাণ খুশি হয়ে উঠছে—বলে উঠছে, 'কোহ্যেবাণ্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ।" (আত্মপরিচয়)

প্রকৃতিকে ঈশ্বরের আনন্দরূপ, অমৃতরূপ রূপে দেখিবার এই সাধনা রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার একান্ত ব্যক্তিগত অভিনব কোন আধ্যাত্মিক উপলব্ধি নয়। এই উপলব্ধি প্রাচীন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ছিল। তাঁহারা বিশ্বের অন্তহীন রূপের প্রকাশকে এক আনন্দময় অমৃতময়ের প্রকাশরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-বন্দনার ভিতর দিয়া তাঁহারা তাঁহারই নিত্য বন্দনা করিয়াছেন যিনি রূপে রূপে বিভক্ত হইয়াও সকল রূপের মধ্যে অবিভক্ত রূপে বিরাজমান।

গ্রীক দার্শনিক চিন্তায় জীবন ও জগতের এই জাতীয় স্বীকৃতি কোথাও নাই। সেক্ষেত্রে জীবন ও জগৎ এক পরম সত্যের আভাস রূপে সত্য। পরম উপলব্ধি লাভের মুহূর্তে এই জীবন ও জগৎ সম্পূর্ণ অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সাধনায় মধ্যযুগে প্রকৃতির এই দৃষ্টি সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। কালিদাস সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মনীতির ক্ষেত্রে তৎকালীন একটি স্থির রূপকে তাঁহার কাব্যে নানাভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই স্থির রূপটিকে যদি ক্লাসিক ধর্মের প্রকাশরূপে গণ্য করা যায়; তবে তাঁহার কাব্যান্তর্গত সৌন্দর্য ও প্রেমের চিরন্তন লোকটিকে রোমান্টিক আখ্যা দান করা যাইতে পারে।

কালিদাসের কাব্যে প্রকৃতি তাহার গৌরব ও মহিমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেও তাঁহার কাব্যে প্রকৃতি যেন বিচিত্র বর্ণের আলোকস্বরূপ হইয়া নারী-রূপকেই নানাভাবে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যে মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রকৃতির কোন প্রকাশরূপ নাই বলিলে

অত্যুক্তি করা হয় না। খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বের প্রভাবে পড়িয়া প্রকৃতি সেক্ষেত্রে পুরুষার্থ লাভের তথা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক সত্য লাভের অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া অনুভূত হইয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানবীয় চেতনাকে বহির্মুখী করিয়া মহৎ বিনষ্টিসাধন করে মাত্র। তাই প্রকৃতি হইতে মানবমন যতই বিমুখ হয়, তাহার অন্তর আধ্যাত্মিক সত্যের আলোকে ততই উদ্ভাসিত হইতে থাকে।

মধ্যযুগে একমাত্র রেনেসাঁ-কালে আমরা প্রকৃতির প্রথম সত্যপ্রকাশ লক্ষ্য করি। বস্তুত রেনেসাঁসের একটি বৃহৎ লক্ষণ হইল প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্যের আবিষ্কার। পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদের কাব্যে এই সত্যবোধটিই পূর্ণ মহিমায় বিচিত্র আধ্যাত্মিক লক্ষণাক্রান্ত হইয়া আত্মপ্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রকৃতি-সাধনার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া পূর্ব-পরিচয়ের সাক্ষ্য স্বরূপ বৈদিক ঋষি-কবিদের প্রকৃতি বন্দনার উল্লেখ করিলেও এই বিষয়ে তাঁহার জীবনে ও কাব্যে পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক কবিদের বিচিত্র প্রভাব অনস্বীকার্য।

(ঘ)

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-প্রেমের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার পূর্বে প্রারম্ভে তাঁহার কয়েকটি উপলব্ধি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমি বেশ মনে করতে পারি বহু যুগ পূর্বে তখন তরুণী পৃথিবী সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবীন সূর্যকে বন্দনা করছেন, তখন নূতন মাটিতে কোথা থেকে এক প্রথম জীবনোচ্ছ্বাসে গাছ হয়ে পল্লবিত হয়ে উঠেছিলুম। তখন পৃথিবীতে জীবজন্তু কিছুই ছিল না; বৃহৎ সমুদ্র দিন-রাত্রি দুলছে, এবং অবোধ মাতার মত আপনার নবজাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মত্ত আলিঙ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলেছে। তখন আমি এই পৃথিবীতে আমার সমস্ত সর্বাঙ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যালোক পান করেছিলুম, নব শিশুর মতো একটা অন্ধ জীবনের পুলকে নীলাম্বরতলে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলুম, এই আমার মাটির মাতাকে আমার সমস্ত শিকড়গুলি দিয়ে জড়িয়ে স্তন্যরস পান করেছিলুম। একটা মূঢ় আনন্দে আমার ফুল ফুটত এবং নব পল্লব উদ্গত হত। যখন ঘনঘটা করে বর্ষার মেঘ উঠত তখন তার ঘন শ্যামছায়া আমার সমস্ত পল্লবকে একটি পরিচিত করতলের মতো স্পর্শ করত। তারপরেও নব নব যুগে এই পৃথিবীর মাটিতে আমি জন্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখী করে বসলেই আমাদের সেই বহুকালের পরিচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে।"

(ছিন্নপত্র)

অনুরূপ আর একটি উপলব্ধি—

"এক সময়ে যখন আমি পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূর-বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্তর, কত দেশ-দেশান্তরের জলস্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দ রস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎ ভাবে সঞ্চারিত হতে

থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে—আমার এই যে মনের ভাব এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে এবং নারিকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্‌থর্‌ করে কাঁপছে।" (ছিন্নপত্র)

বিচ্ছিন্ন রূপ-সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি-চেতনা কল্পনায় ভর দিয়া কী ভাবে বৃহৎ বিশ্ব-প্রকৃতির মর্মমূলে পৌঁছাইয়া যাইত এবং তাহার সহিত একাত্ম হইয়া বিশ্বের অচিন্তনীয়, অতি অসহনীয় প্রাণের বিপুল তরঙ্গ-লীলাকে কী ভাবে উপলব্ধি করিতেন তাহার পরিচয় পরে লাভ করিতে পারা যাইবে। এক্ষেত্রে কবি-চেতনার ধীর পরিব্যাপ্তির কথা নয়, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার লোকলোকান্তর ব্যাপ্ত প্রাণের প্রবাহ লইয়া কী এক অনন্ত রস রূপে কবির দৃষ্টিসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছিল। ইহা কেবল দূর হইতে বিচ্ছিন্ন সত্তাবোধে সাক্ষাৎকারও নয় তাহার সহিত একাত্ম হইয়া কোন এক দিব্যচেতনাযোগে ইহার প্রাণ-লীলাকে যেন আপনার সত্তার মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা। এই উপলব্ধির মুহূর্তে ব্যক্তি ও বিশ্বের আর পৃথক বোধটি থাকে না।

ব্যক্তিকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তত্ত্বাশ্রয়ী যে মিলন ইহা আদৌ সেই জাতীয় কোন মিলন অনুভূতি নয়। ইহা ব্যক্তির দেহ-প্রাণ-মনের সহিত বিশ্বের দেহ-প্রাণ-মনের যোগ এবং এইরূপে বিশ্বের সকল দশাকে ব্যক্তির আপনার দশায় পরিণত করা।

বস্তুত, নিখিল মানবসমাজ ও বিশ্ব-প্রকৃতি তো দুটি বিচ্ছিন্ন, বিরুদ্ধ সত্তা নয়, উভয়ের মধ্য দিয়া এক আদি প্রাণ প্রেম ও সৌন্দর্য রূপে নিত্য স্পন্দিত হইতেছে। উভয়ে এক গভীরতর বৃহত্তর আনন্দ-সত্তার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। তাহা যদি না হইত মানব-চেতনা কোন প্রকারেই বিশ্বের অন্তর্লোকে প্রবেশ-লাভের পথ পাইত না। বিশ্বের সহিত মিলনে যে আমরা আনন্দবোধ করি তাহা এই সংযোগ আছে বলিয়া।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া কত লক্ষ কোটি জন্ম-জন্মান্তর পার হইয়া কত চেতনা-পর্যায় একের পর এক অতিক্রম করিয়া আজ মনুষ্য-চেতনার উদ্ভব। তাহার ফলে মনুষ্য-চেতনায় পূর্ব পূর্ব জীবনের সকল চেতনা-পর্যায়ের স্মৃতি বিদ্যমান। বৃহৎ বিশ্ব-প্রকৃতির মুখোমুখি হইয়া বসিলে সেই সকল অবচেতন

মনের স্মৃতি একে একে উদ্বেল হইয়া উঠে, ব্যক্তি-চেতনাকে বহির্বিশ্বের সকল চেতনা-পর্যায়ের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ইহাই বুঝাইয়াছেন—

"প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গূঢ় গভীর আনন্দ পাওয়া যায়, সে কেবল তার সঙ্গে আমাদের একটা সুবৃহৎ আত্মীয়তার সাদৃশ্য অনুভব ক'রে—এই নিত্য-সঞ্জীবিত সবুজ সরস তৃণলতা তরুগুল্ম, এই জলধারা, এই বায়ুপ্রবাহ, এই সতত ছায়ালোকের আবর্তন, এই ঋতুচক্র, এই অনন্ত আকাশ পূর্ণ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রবহমান স্রোত, পৃথিবীর অনন্ত প্রাণী-পর্যায়, এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়ীর রক্ত-চলাচলের যোগ রয়েছে—সমস্ত বিশ্ব-চরাচরের সঙ্গে আমরা একই ছন্দে বসানো—এই ছন্দের যেখানে যতি পড়ছে, যেখানে ঝঙ্কার উঠছে, সেইখানেই আমাদের মনের ভিতর থেকে সায় পাওয়া যাচ্ছে—প্রকৃতির সমস্ত অণু-পরমাণু যদি আমাদের সগোত্র না হত, যদি প্রাণে-সৌন্দর্যে এবং নিগূঢ় একটা আনন্দে সমস্তকাল স্পন্দমান হয়ে না থাকত, তাহলে কখনোই এই বাহ্যজগতের সংসর্গে আমাদের এমন একটা আন্তরিক আনন্দ ঘটত না। যাকে আমরা অন্যায়পূর্বক জড় বলে থাকি, সেই জগতের সঙ্গে আমাদের চেতনার একটা যোগাযোগের গোপন পথ আছে; নইলে কখনোই নির্জীবের প্রতি জীবনের, জড়ের প্রতি মনের, বাইরের প্রতি অন্তরের এমন একটা অনিবার্য ভালোবাসার বন্ধন থাকতেই পারে না। আমার সঙ্গে এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম পরমাণুর বাস্তবিক কোন জাতিভেদ নেই, সেইজন্যেই এই জগতে আমরা একত্রে স্থান পেয়েছি—নইলে আমাদের উভয়ের জন্যে দুই ভিন্ন জগৎ সৃজিত হয়ে উঠত। আমি যখন মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে যাব, তখন আমার অনন্ত প্রাণময় বিশ্বাত্মীয়ের সঙ্গে বন্ধন ছিন্ন হবে না—" (ছিন্নপত্র)

জগতে ত্রুটি আছে, অসম্পূর্ণতা আছে, মৃত্যু আছে বলিয়াই মানুষ এমন একটি জগৎ লাভের জন্য উৎসুক হয়, যেখানে মৃত্যু কখনো বিষাদের ম্লান ছায়াপাত করিতে পারে নাই, যাহা সকল ত্রুটি ও সম্পূর্ণতা মুক্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া কতকটা ভিন্নমুখী। মৃত্যু আছে, বিচ্ছেদ আছে, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আছে বলিয়াই তো মানবপ্রেমের এমন প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে,—এমন ব্যাকুল, এমন সদাজাগ্রত! এই প্রেমে অমৃতও অনাকাঙ্ক্ষিত

এই বোধাশ্রয়ী হইয়া বিশ্ব-প্রকৃতি তাঁহার নিকট আরও দুর্লভ মহিমায় আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে।

সৌন্দর্যবোধ বিকাশের কতকগুলি ক্রম বা পর্যায় আছে। সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র যখন সহায় তখন জগতের বিশিষ্ট কতকগুলি সামগ্রীকে মাত্র আমরা সুন্দর দেখি, যেমন ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর, ইত্যাদি ;—বিশ্বের অধিকাংশই তখন অসুন্দর বলিয়া বোধ হয়। সৌন্দর্যবোধ যখন আরো কতকটা বিকশিত হইয়া মনের ধর্মকে লাভ করে, তখন সৌন্দর্যের ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হইয়া যায়। ইতিপূর্বে যাহা অসুন্দর বা বিরূপ ছিল তখন তাহার অধিকাংশের মধ্যেই মানুষ সৌন্দর্য খুঁজিয়া পায়। তখন মানুষ রূপের অতীত ভাবের সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিরূপ, তাহা ভাবের দৃষ্টিতে রূপময় হইতে পারে।

এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তি, কল্যাণবৃত্তি প্রভৃতি বিকাশের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা যতই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকে সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্র ততই প্রসারিত হইয়া পরিণামে এমন একটি অবস্থা লাভ করে, যে অবস্থায় বিশ্বের সকল রূপ-বিরূপ এক অখণ্ডতার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত বা সুষমামণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়।

সৌন্দর্যবোধের বিকাশের প্রথম পর্যায়ে মানবীয় চেতনা বিশ্ব হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ লাভ করে মানবীয় চেতনা বিশ্বের অন্তহীন বিচিত্র সামগ্রীর সহিত ততই যুক্ত হইতে থাকে। এইরূপে সৌন্দর্য বোধের পরিণত অবস্থায় ব্যক্তি চেতনা বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট দেখে।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুধু চোখের দৃষ্টি নহে, তাহার পিছনে মনের দৃষ্টি যোগ না দিলে সৌন্দর্যকে বড়ো করিয়া দেখা যায় না।***

মনেরও আবার অনেক স্তর আছে। কেবল বুদ্ধি বিচার দিয়া আমরা যতটুকু দেখিতে পাই তাহার সঙ্গে হৃদয়ভাব যোগ দিলে ক্ষেত্র আরও বাড়িয়া যায়। ধর্মবুদ্ধি যোগ দিলে আরও অনেকদূর চোখে পড়ে, অধ্যাত্ম দৃষ্টি খুলিয়া গেলে দৃষ্টি ক্ষেত্রের আর সীমা পাওয়া যায় না।" (সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্য)

"সৌন্দর্যবোধ যখন শুদ্ধমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহায়তা লয় তখন যাহাকে আমরা সুন্দর বলিয়া বুঝি তাহা খুবই স্পষ্ট, তাহা দেখিবামাত্রই চোখে ধরা

পড়ে। সেখানে আমাদের সম্মুখে এদিকে সুন্দর আর একদিকে অসুন্দর এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব একেবারে সুনির্দিষ্ট। তারপরে বুদ্ধিও যখন সৌন্দর্যবোধের সহায় হয় তখন সুন্দর অসুন্দরের ভেদটা দূরে গিয়া পড়ে।** তারপরে কল্যাণবুদ্ধি যেখানে যোগ দেয় সেখানে আমাদের মনের অধিকার আরও বাড়িয়া যায়, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বন্দ্ব আরও ঘুচিয়া যায়।***

তবু মঙ্গলের মধ্যেও একটি দ্বন্দ্ব আছে। মঙ্গলের বোধ ভালো মন্দের একটি সজ্ঘাতের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এমনতরো দ্বন্দ্বের মধ্যে কিছুর পরিসমাপ্তি হইতে পারে না। ***আমাদের সৌন্দর্যবোধও সেইরূপ ইন্দ্রিয়ের সুখকর ও অসুখকর, জীবনে মঙ্গলকর ও অমঙ্গলকর এই দুয়ের ঘর্ষণের দ্বন্দ্বে স্ফুলিঙ্গ নিক্ষেপ করিতে করিতে একদিন যদি পূর্ণভাবে জ্বলিয়া উঠে তবে তাহার সমস্ত আংশিকতা ও আলোড়ন নিরস্ত হয়।

তখন কী হয়? তখন দ্বন্দ্ব ঘুচিয়া গিয়া সমস্তই সুন্দর হয়; তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া উঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।" (সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্য)

"জগতের এই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দরূপ দেখিবার পথে সুন্দর-অসুন্দরের ভেদটা প্রথমে একান্ত হইয়া মাথা তোলে। নাহলে সুন্দরের পরিচয় ঘটা একেবারে অসম্ভব।

আমাদের সৌন্দর্যবোধের প্রথমাবস্থায় সৌন্দর্যের একান্ত স্বাতন্ত্র্য আমাদিগকে যেন ঘা মারিয়া জাগাইতে চায়। এইজন্য বৈপরীত্য তাহার প্রথম অস্ত্র। *** অবশেষে সৌন্দর্যবোধ যতই বিকাশ পায় ততই স্বাতন্ত্র্য নহে; সুসংগতি—আঘাত নহে, আকর্ষণ—আধিপত্য নহে, সামঞ্জস্য আমাদিগকে আনন্দ দান করে। এইরূপে সৌন্দর্যকে প্রথমে চারিদিক হইতে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া সৌন্দর্যকে চিনিবার চর্চা করি, তাহার পরে সৌন্দর্যকে চারিদিকের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়া চারিদিককেই সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারি।" (সৌন্দর্য ও সাহিত্য: সাহিত্য)

সৌন্দর্য-সম্পর্কিত এই মূল ভাবটিকে তিনি নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—

"সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতায় একটা স্তর আছে, সেখানে সৌন্দর্য খুবই সহজ—ফুল সুন্দর, প্রজাপতি সুন্দর, ময়ূর সুন্দর। এ সৌন্দর্য একতলাওয়ালা—এর মধ্যে সদর অন্দরের রহস্য নেই, এক নিমেষেই ধরা দেয়, সাধনার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এই প্রাণের কোটায় যখন মনের দান মেশে, চরিত্রের

সংস্রব ঘটে, তখন এর মহল বেড়ে যায়; তখন সৌন্দর্যের বিচার ভুল হয় না।"

(সাহিত্যতত্ত্ব ঃ সাহিত্যের পথে)

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের এই যে ক্রমিক উন্নততর পরিণামের কথা বুঝাইয়াছেন, তাহার সহিত প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারার বহুলাংশে সাদৃশ্য রহিয়াছে।

ডিয়োটিমার চিন্তা-পদ্ধতি অনুসারে প্রেমিক প্রথমে বিশিষ্ট একটি সৌন্দর্য-সত্তা হইতে দৃষ্টিকে অনুরূপ বহু সৌন্দর্য-সত্তার দিকে নিবদ্ধ করিবে। প্রেমিক এইরূপে কায়িক সৌন্দর্য হইতে তাহার চিন্তাকে মন ও চরিত্রের সৌন্দর্যের দিকে আকৃষ্ট করিবে। ইহার পরবর্তী পর্যায়ে প্রেমিক সম্পূর্ণরূপে বিশিষ্ট সৌন্দর্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আপনাকে নাগরিক জীবনের বিধি-বিধান এবং ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে নিমগ্ন করে। ইহার মধ্যে পুরুষ এক নূতন সৌন্দর্য-লোক খুঁজিয়া পায়। এই সমুন্নত অবস্থার ভিতর দিয়া পুরুষ বিচিত্র জ্ঞান এবং দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে আকৃষ্ট হয়। প্লেটোনিক এই উধ্ব'ারোহণের সর্বোচ্চ অবস্থায় পুরুষ সৌন্দর্যকে নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত একটি বিশ্বজনীন ধর্মরূপে এবং ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন ক্ষম চিরন্তন আইডিয়া রূপে বোধ করে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই সৌন্দর্য-ব্যাকুলতা যে কত গভীর, কত ব্যাপক, কত সর্বগ্রাসী ছিল তাহারই পরিচয় লাভ করিতে দুই একটি অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"এই সমস্ত রঙ, এই আলো এবং ছায়া, এই আকাশব্যাপীনিঃশব্দ সমারোহ, এই দ্যুলোক ভূলোকের মাঝখানে সমস্ত শূন্য পরিপূর্ণ করা শান্তি এবং সৌন্দর্য, এর জন্যে কি কম আয়োজনটা চলছে! কত বড়ো উৎসবের ক্ষেত্রটা! এত বড়ো আশ্চর্য কাণ্ডটা প্রতিদিন আমাদের বাইরে হয়ে যাচ্ছে; আর আমাদের ভিতরে ভালো করে তার সাড়া পাওয়াই যায় না। জগৎ থেকে এতই তফাতে আমরা বাস করি! লক্ষ লক্ষ যোজন দূর থেকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে অনন্ত অন্ধকারের পথে যাত্রা করে একটি তারার আলো এই পৃথিবীতে এসে পৌঁছয় আর আমাদের অন্তরে এসে প্রবেশ করতে পারে না, সে যেন আরও লক্ষ যোজন দূরে। রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার থেকে একটি মাণিকের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের মনের মধ্যেও একটাও এসে পড়ে না। সেই বিলেত যাবার পথে লোহিত সমুদ্রের স্থির জলের উপরে যে একটি অলৌকিক সূর্যাস্ত দেখেছিলুম, সে কোথায় গেছে! কিন্তু ভাগ্যিস্ আমি দেখেছিলুম, আমার জীবনে ভাগ্যিস্ সেই একটি

সন্ধ্যা উপেক্ষিত হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায় নি—অনন্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি অত্যাশ্চর্য সূর্যাস্ত আমি ছাড়া পৃথিবীর আর কোনো কবি দেখেনি। আমার জীবনে তার রঙ রয়ে গেছে। অমন এক-একটি দিন এক-একটি সম্পত্তির মতো। আমার সেই পেনেটি বাগানের গুটিকতক দিন, তেতলার ছাতের গুটিকতক রাত্রি, পশ্চিম ও দক্ষিণের বারান্দার গুটিকতক বর্ষা, চন্দননগরের গঙ্গার গুটিকতক সন্ধ্যা, দার্জিলিঙে সিঞ্চল শিখরের একটি সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয় —এইরকম কতক গুলি উজ্জ্বল সুন্দর ক্ষণখণ্ড আমার যেন ফাইল করা রয়েছে।***

যদি বাসনা এবং সাধনা অনুরূপ পরকাল থাকে তাহলে এবার আমি এই ওয়াড়-পরানো পৃথিবী থেকে বেরিয়ে গিয়ে যেন এক উদার উন্মুক্ত সৌন্দর্যের আনন্দলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারি। যারা সৌন্দর্যের মধ্যে সত্যি সত্যি নিমগ্ন হতে অক্ষম তারাই সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের ধন বলে অবজ্ঞা করে—কিন্তু এর মধ্যে যে অনির্বচনীয় গভীরতা আছে, তার আস্বাদ যারা পেয়েছে তারা জানে—সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের চূড়ান্ত শক্তিরও অতীত; কেবল চক্ষু-কর্ণ দূরে থাক, সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রবেশ করলেও ব্যাকুলতার শেষ পাওয়া যায় না।" (ছিন্নপত্র)

"সৌন্দর্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা—যখন মনটা বিক্ষিপ্ত না থাকে এবং যখন ভালো করে চেয়ে দেখি তখন এক প্লেট গোলাপ ফুল আমার কাছে সেই ভূমানন্দের মাত্রা যার সম্বন্ধে উপনিষদে আছে: এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। সৌন্দর্যের ভিতরকার এই অনন্ত গভীর আধ্যাত্মিকতা এটা কেবল পুরুষরা উপলব্ধি করতে পেরেছে। এইজন্যে পুরুষের কাছে মেয়ের সৌন্দর্যের একটা বিশ্ব-ব্যাপকতা আছে। সেদিন শঙ্করাচার্যের আনন্দলহরী বলে একটা কাব্য-গ্রন্থ পড়ছিলুম, তাতে সে সমস্ত জগৎ সংসারকে স্ত্রী-মূর্তিতে দেখছে—চন্দ্র সূর্য আকাশ পৃথিবী সমস্তই স্ত্রী-সৌন্দর্যে পরিব্যাপ্ত করে দিয়েছে—অবশেষে সমস্ত বর্ণনা সমস্ত কবিতাকে একটি স্তরে একটি ধর্মোচ্ছ্বাসে পরিণত করে তুলেছে। বিহারী চক্রবর্তীর 'সারদামঙ্গল' সঙ্গীতটিও ঐ শ্রেণীর। শেলির এপিসিকিডিয়নেরও ঐ অর্থ। কীট্‌সের অধিকাংশ কবিতা পড়লে মনে ঐ ভাবটির উদ্রেক হয়। কেবল চক্ষুকে কিংবা কল্পনাকে নয়—সৌন্দর্য যখন একেবারে সাক্ষাৎভাবে আত্মাকে স্পর্শ করতে থাকে তখনই তার ঠিক মানেটি বোঝা যায়।" (ছিন্নপত্র)

[ঙ]

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনে বিশেষ করিয়া রোমান্টিক কবিদের কাব্যে সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের সে বিচিত্র প্রকাশ ধরা পড়িয়াছে তাহার সামান্য পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসাধনার উপর তাঁহাদের যে বিচিত্র প্রভাব ক্রিয়া করিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটোই সর্বপ্রথম সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন গড়িয়া তোলেন। প্লেটোর এই দার্শনিক চিন্তাধারা মধ্যযুগে রেনেসাঁ পর্য্যন্ত জীবনের সকল বিভাগকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে।

সিম্পোসিয়ামের মধ্যে প্রেমকে সেই শক্তিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যে শক্তি শূন্যতার মধ্য হইতে প্রথম এই বিশ্বলোক সৃষ্টি করিয়াছে। ফেড্রাসের মধ্যে বলা হইয়াছে, যে প্রেরণা মানুষকে চিরন্তন সৌন্দর্য-লোক আবিষ্কার করিতে এবং পরিণামে তাহার সহিত মিলিত হইতে সহায়তা করে তাহাই প্রেম। সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কিত প্লেটোর মূল এই দার্শনিক চিন্তাকেই প্লটিনাস ফিসিনো এবং স্পেন্সার প্রভৃতি দার্শনিক আরও বিস্তারিত এবং সুবিন্যস্ত করেন।

সিম্পোসিয়ামের মধ্যে প্রেমোপলব্ধির ক্রমটি এইরূপ। প্রেমের প্রথম পর্যায়ে সুন্দরপুরুষ সুরূপা নারীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করে সুসন্তান লাভের জন্য। ব্যক্তির বিশিষ্ট সৌন্দর্য হইতে প্রেম ক্রমে বিশ্বের সকল সুন্দর সামগ্রীকে উপলব্ধি করিতে পারে। কায়িক সৌন্দর্য হইতে প্রেম ক্রমোন্নত পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের এবং পরিণামে এক নির্বিশেষ সৌন্দর্য সত্তায় মানবীয় চেতনাকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। ইহাই মানবিক বোধের সর্বশেষ পরিণাম, সৌন্দর্যও প্রেমের পরাপ্রাপ্তি। ইহা নির্বিশেষ, বহিঃ নিরপেক্ষ, এক চিরন্তন সত্তা।

জাগতিক অস্তিত্বের অন্তরালে যে এক দিব্য অস্তিত্ব আছে সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া মানুষ তাহারই স্মৃতি ফিরিয়া লাভ করে। সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া মানুষ পরিণামে আপনারই দিব্য সত্তাকে ফিরিয়া লাভ করে। প্লেটোর মতে দিব্যলোকে দিব্য দেহে মিলনের স্মৃতিই মর্তলোকে বিশিষ্ট নরনারীকে প্রেমে আকৃষ্ট করে।

ঈশ্বরীয় মনে (Angelic Mind) প্রথম যে করুণা বা আকর্ষণের ক্ষমতা তাহাই সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্যের দ্বারা ঈশ্বরীয় প্রেম সঞ্চালিত হয়। এইরূপে প্রত্যেকটি জগতের প্রেম ইহার ঠিক অব্যবহিত উর্দ্ধজগতের সৌন্দর্যের দ্বারা সৃষ্ট। যে আদর্শলোক এবং অধ্যাত্ম সত্তা হইতে মানুষের উদ্ভব তাহাকে ফিরিয়া লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার নাম প্রেম। সৌন্দর্যের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সমগ্র সৃষ্টি ঈশ্বর অভিমুখীন হইয়া চলিয়াছে।

প্লেটো স্বর্গীয় প্রেমের প্রতীককে য়ুরেনিয়ান বা দিব্য এ্যাফ্রোডিটি এবং মর্ত্ত্য প্রেমের প্রতীককে প্যানডারমাস নামে অভিহিত করিয়াছেন।

দান্তে প্রেমের মোহের দিকটিকে যে ভাবে উর্ধ্বায়িত করিয়াছেন তাহার কোন পূর্ব পরিচয় আমরা লাভ করি না। তিনি প্রেমের নিম্নরূপ পর্যায় পরিকল্পনা করিয়াছেন,—

প্রথমত নরনারীর পারস্পরিক রূপের প্রতি আকর্ষণ। প্রেমের বিকাশে রূপের প্রারম্ভিক স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে। প্রেমের এই পর্যায়ে বিচ্ছেদ ঘটিলে নর-নারীর অন্তর শূন্যময় হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রেম দেহ-রূপের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। পুরুষ ধ্যানে বা কল্পনায় নারীর আর এক রূপ গড়িয়া তুলে। বিচ্ছেদ বা বিয়োগে বাহিরের রূপ হারাইয়া ফেলে পুরুষ এই ধ্যান রূপ আশ্রয় করিয়া আপনার প্রেমকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারে।

তৃতীয় পর্যায়ে সৌন্দর্যবোধ আরও কতকটা প্রসারিত হয়। এই পরিণামে পুরুষ বিশিষ্ট নারীর দেহাশ্রয়ী সৌন্দর্য ছাড়া বিশ্বের সকল সুন্দর সামগ্রী উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। বাহিরের যে রূপের জগৎকে প্লেটো দিব্য পরিকল্পনার প্রতিচ্ছায়া বলিয়াছেন, এই পরিণাম লাভ পর্যন্ত প্রেম এই ছায়া জগতের সীমায় আবদ্ধ।

চতুর্থ পর্যায়ে মনুষ্য চেতনা রূপের জগৎকে অনুবিদ্ধ করিয়া তাহার অতীতে দৃষ্টিপাত করিতে সুরু করে। মানুষ এই পর্যায়ে নারীর বহিঃ-সৌন্দর্যের অন্তরালে আত্মার সৌন্দর্য সাক্ষাৎ করিতে সমর্থ হয়।

পঞ্চম পর্যায়ে মানুষ এমন একটি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে যাহার সহায়তায় সে প্রথম ঈশ্বরীয় সৌন্দর্য (Angelic Beauty) বা দিব্য পরিকল্পনাটিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। মর্ত্ত্য প্রেমের আকাঙ্ক্ষা এই পরিণাম লাভ করিয়া আর এক ভিন্ন জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

ষষ্ঠ পর্যায়ে মানবীয় চেতনা মানব-প্রকৃতি অর্থাৎ সীমার ধর্মকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া অসীম সৌন্দর্যকে অপরোক্ষ করিতে পারে।

সপ্তম পর্যায়ে ঈশ্বরীয় সত্তার মধ্যে ব্যক্তির দিব্য সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তি ঘটে।

লক্ষ্য করিতে পারা যায় প্রেমের এই ঊর্ধ্বাভিসারের প্রথম পর্যায়ের পর হইতেই নারী-দেহাশ্রয়ী রূপ একান্ত গৌণ হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে দার্শনিক চিন্তাধারায় জীবন ও জগৎ স্বরূপত মিথ্যা বা মায়ারূপে অনুভূত হইয়াছে। মানবিক সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধের ক্ষেত্রেও মূলত এই দার্শনিক বোধটিই কোন-না-কোন রূপে ক্রিয়া করিয়াছে। তবে প্লেটো প্রভৃতি দার্শনিকগণের চিন্তাধারায় জীবন ও জগৎকে কতকটা স্বীকৃতি দানের চেষ্টা লক্ষ্য করা গেলেও চরম উপলব্ধির ক্ষেত্রে সর্বত্রই জীবন ও জগৎ মিথ্যা হইয়া গিয়াছে। তাহার ফলে প্লেটোর সৌন্দর্য ও প্রেমের সাধনায় প্রণয়ীযুগল জীবন ও জগৎ এবং তদাশ্রয়ী সৌন্দর্যকে পরিহার করিয়া ক্রমিক ঊর্ধ্বতর লোকে অভিসার করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধির স্বরূপ আমরা জানি। তাহাতে সীমা ও অসীম এক যুগ্ম অখণ্ড তত্ত্ব রূপে অনুভূত হইয়াছে। অসীম নিয়ত সীমা রূপ লাভ করিতেছে বলিয়াই তো আমরা অসীমকে উপলব্ধি করিতে পারি। আবার সীমা তো কেবল সীমা রূপে নিশ্চল হইয়া নাই। সীমা যে নিয়ত সরিয়া নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া সেই অপ্রমেয়, অপরিমিতিকেই মুহূর্তে মুহূর্তে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া সীমা কোথাও সত্য হইয়া নাই। সীমার ভিতর দিয়াই সেই কারণে আমরা অসীমকে উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। এই জীবন-দর্শনের জন্যই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও প্রেমের সাধনায় জাগতিক সৌন্দর্য ও প্রেমের আধার একান্ত রূপে কোথাও অস্বীকৃত হইয়া যায় নাই। বরং এই জাগতিক সৌন্দর্য ও প্রেমের আধারেই অসীমের অন্তহীন মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রেমে জীবন ও জীবনাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

জাগতিক এবং অতি জাগতিক বোধের মধ্যবর্তী সংযোগসূত্র রূপে রহিয়াছে প্রকৃতি। প্রকৃতি জীবন্ত গ্রন্থ এবং একমাত্র সাধন-মন্দির। ওয়াড়স্‌ওয়ার্থের কাব্যে প্রকৃতি এই স্বরূপে প্রতিভাত হয়। ওয়াড়সওয়ার্থের প্রকৃতিতত্ত্বের মূল কথা হইল অন্য সকল মূল্যের দিক অপরিবর্তিত থাকিলে প্রকৃতির সহিত নিবিড় মিলন এবং একাত্মতাবোধের ক্রমের উপর মনুষ্যত্বের ক্রম নির্ভর করে।

ওয়াড়স্‌ওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে এক অসীম আনন্দ রূপের সাক্ষাৎ পান। ইহা তাঁহার নিকট ঈশ্বরীয় আনন্দের সমতুল্য। আপন হৃদয়ে উপলব্ধ এই অসীম আনন্দকে তিনি কাব্যে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার Naming of Places কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণে পড়িতে পারে। প্রকৃতির ষড়ঋতুর আবর্তনের মধ্যেই তিনি ঈশ্বরের আনন্দময় রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। প্রকৃতির চিরচঞ্চল লীলা রূপের গভীরে তিনি এক চির অচঞ্চল অবিক্ষুব্ধ শান্তি উপলব্ধি করেন। তিনি উপলব্ধি করেন, '—the ultimate idea of the universe there was the calm of the unbroken law.' প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্যে এই প্রেমের যোগের লীলা। এই অনন্ত প্রেম বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত।

অন্যান্য কবিদের নিসর্গ প্রেম হইতে ওয়াড়স্‌ওয়ার্থের নিসর্গ প্রেমের পার্থক্য এই যে অন্য কবিরা যেখানে আপনাদের বিশিষ্ট ভাবকে প্রকৃতির উপর অভিক্ষেপ করিয়াছেন, ওয়াড়স্‌ওয়ার্থ সেখানে প্রকৃতিকে মানবসমাজ হইতে এক পৃথক সত্তা রূপে উপলব্ধি করেন। আমরা আমাদের ভাব-ভাবনাকে প্রকৃতির ভিতর দিয়া ফিরিয়া লাভ করি না। প্রকৃতি যে ভাব-ভাবনাকে মানব-অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দেয় তাহা প্রকৃতির নিজস্ব ভাবসম্পদ। মানুষ আপনার ব্যক্তিগত বোধের সীমার বাহিরে আসিতে পারিলে তবেই প্রকৃতির অনন্ত ভাবসম্পদ লাভ করিতে পারে, তখনই কেবল প্রকৃতি তাহার সম্মুখে এক সীমাহীন মাধুর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

প্রকৃতির এই পৃথক সত্তার বোধটি পরে একটি দার্শনিক ভাবনায় পরিণত হয়। প্রকৃতি ও মানুষের হৃদয়ের যোগে মানুষ সর্বত্র সুষমা ও স্বর্গ লোক প্রত্যক্ষ করিতে পারে, অন্তরে বিচিত্র কল্পনা জন্মলাভ করে। প্রকৃতি ও মানুষ নারী ও

পুরুষের মত পৃথক সত্তা। বিচ্ছিন্নতা ফিরিয়া মিলন লাভ করিবার জন্য। এই মিলনবোধের ভিতর দিয়া মানব অন্তরে বিচিত্র সৃষ্টিপ্রেরণা অনুভূত হয়। ব্যক্তি প্রাণ বিশ্ব প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া উভয়ে উভয়কে পরিপুষ্ট করে, যে পর্যন্ত না ব্যক্তি এবং বিশ্ব এক অসীম প্রাণ স্পন্দনে আপ্লুত হইয়া যায়।

ওয়াড়স্‌ওয়ার্থের কাব্যে একদিকে প্রকৃতি এবং আর একদিকে মানুষ—এই উভয় সত্তা এক গভীরতর প্রেমে বিধৃত।

তিনি বোধ করেন মানুষের মন এবং বুদ্ধি এমন একটি তত্ত্ব যাহার সহায়তায় মানুষ প্রকৃতির প্রাণের সহিত মিলিত হইতে পারে। ওয়াড়স্‌ওয়ার্থের দর্শন তাই মন ও বহির্বিশ্বের সহিত যোগের দর্শন।

ওয়াড়স্‌ওয়ার্থের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিজস্ব জীবনধারা আছে, তাহা মানব-জীবন হইতে স্বতন্ত্র। মানুষ এবং প্রকৃতি একই ঈশ্বরের প্রকাশ। মানুষ ও প্রকৃতি, মন ও বহির্বিশ্ব মিলিত হইয়া বিশ্বের অভিপ্রায়কে সম্পূর্ণ করে। উভয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ঘাত ও প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া আনন্দ ও বেদনা সঞ্চারিত হয়। ইহাই কবির কাব্যের মূল ভাব।

লক, বার্কলে এবং হিউমের ধারা অনুসরণ করিয়া হার্টলি মনের বিকাশের তিনটি পর্যায় নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে অনুভূতির ছাপ, পরে এই ছাপ হইতে সাধারণ ভাবনা বিকাশ লাভ করে। অবশেষে এই সকল ভাবনা হইতে জটিল ভাবনার প্রকাশ ঘটে। এই জটিল ভাবনা হইতে দুর্লভ মুহূর্তে কবি-কল্পনা জন্ম লাভ করে।

অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের ক্ষমতা বলিতে তিনি যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহা একদিক দিয়া ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া মনের সৃষ্ট রূপ, অন্যদিক দিয়া মন চিরন্তন চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া সে অচিন্তনীয় বিষয় লাভ করে। রূপ-কল্পনা এবং চিন্তার বাহিরে অন্তহীন উপলব্ধির জগৎ আছে।

সেই চরম মিস্টিক উপলব্ধিকে তো ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। সেই প্রাণময় চিরন্তন সত্তায় ব্যক্তি সত্তা বিগলিত হইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া কবি উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। কল্পনা তাঁহাকে ইন্দ্রিয়ের জগৎ হইতে চেতনার জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে।

প্রথমে বহিঃসৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া অন্তরের মধ্যে আর একটি রূপ-লোকের উপলব্ধি ঘটে। বহিঃসত্তার এইরূপে অন্তঃসত্তায় পরিণাম লাভ।

"—what I saw
Appeared like something in myself, a dream,
A prospect in the mind." (Prelude)

দ্বিতীয় পর্যায়ে স্বপ্নের ন্যায় রূপের সচেতনতা হইতে গভীরতর অবস্থায় উত্তরণ—এই অবস্থায় মনকে বলা হয়, 'into itself by image from without unvisited.' এই অবস্থায় জাগতিক জীবনের স্পন্দন নিরুদ্ধ। ব্যক্তির একপ্রকার চেতনা থাকে, কিন্তু সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান থাকে না। এই তন্ময় মুহূর্তে মিষ্টিক উপলব্ধি ঘটে।

তাঁহার মতে কল্পনা মানুষের সেই ক্ষমতা যাহার সহায়তায় সে অসীমকে উপলব্ধি করিতে পারে, এবং ইহার সহায়তায় মনের মধ্যে রূপ গড়িয়া উঠে।

প্লেটোর মতে প্রেম মর্ত ও অমর্ত জগতের মধ্যস্থলবর্তী একটি সত্তা। প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তরে ডিয়োটিমা বলিয়াছেন, "A great daem n, Socrates, and everything daemonical holds an intermediate place between what is divine and what is mortal." বহুবিচিত্র ডেমনের মধ্যে প্রেম একটি। শেলির মতে সর্বোত্তম।

শেলি মুখ্যত প্লেটোর এই দার্শনিক উপলব্ধিকে আশ্রয় করেন। ইহার সহিত গ্যেটে, দান্তে ক্যালদেরণ প্রভৃতি কবিদের ধারণা মিশ্রিত হইয়া শেলির মূল উপলব্ধি গড়িয়া উঠিয়াছে।

শেলির মতে প্রেম বা সৌন্দর্যকে দুটি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিতে হয়,—একটি অমূর্ত ও চিরন্তন এবং অন্যটি মূর্ত ও পার্থিব। একদিকে তিনি দার্শনিক চিন্তার জটিল জালমুক্ত হইয়া অমূর্ত্য প্রেম লাভের জন্য উৎসুক, অন্যদিকে তিনি মর্তে এমন একটি নারীকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন যাঁহার প্রেমের মধ্যে বিশ্ব-প্রেমের সকল ধর্মের প্রকাশ এবং এইরূপে তিনি বিশ্ব-প্রেম লাভের পথপ্রদর্শিকা।

শেলি এবং প্লেটোনিক প্রেমের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও বৈসাদৃশ্যও অনেক। শেলির প্রেম মর্ত-লোকে চিরন্তন ও অমূর্ত্য সৌন্দর্যের ছায়া অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে। অন্যদিকে প্লেটোর প্রেম পার্থিব সৌন্দর্যের ছায়াকে অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিয়াছে এবং মুহূর্তে ইহাকে অতিক্রম করিয়া নীতি এবং তত্ত্বজগতের যুক্তিকে আশ্রয় করিয়াছে।

প্রেম সম্পর্কে ডিয়োটিমা একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন—

"The divine nature cannot immediately communicate with what is human, but all that intercourse and converse which is conceded by the Gods of men, both whilst they sleep and when they wake, subsists through the intervention of Love; and he who is wise in the science of his intercourse is supremely happy, and participates in the daemonical nature whilst he who is wise in any other science or art remains

a mere ordinary slave. These daemons are, indeed, many and various and one of them is Love."

শেলির প্রেম-সম্পর্কিত ধারণার সহিত ডিয়োটিমার এই উক্তির গভীর সাদৃশ্য আছে।

Alastor-এর মধ্যে মানবীয় চেতনার সৎ-অসৎ উভয় প্রেরণা বিদ্যমান। একটি মানবাত্মাকে পার্থিব প্রেমের লোক হইতে Intellectual Beauty-র উচ্চতম লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়; অন্যটি মানবাত্মাকে নিম্নতর চেতনা-লোকে আকর্ষণ করিয়া আনে। Alastor-এর এই ভাবটিই এপিপসিকিডিয়নের মধ্যে আরো গভীর ও সুপরিণত হইয়াছে।

গ্যেটে সৌন্দর্য অপেক্ষা জ্ঞানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিলেও উভয়ের উপলব্ধির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য আছে। তাঁহার Weiteland এবং শেলির Intellectual Beauty উভয়ের পশ্চাতে সিম্পোসিয়ামের মধ্যবর্তী স্থলের ধারণা বিদ্যমান। Alastor এবং এপিপসিকিডিয়নের ন্যায় গ্যেটের মধ্যে ঊর্ধ্বাভিসারের একটি দিক আছে। ফাউস্টের মধ্যে এমন একটি জগতের কথা আছে, যেখানে সৎ সত্তা সকল শেলির মায়াতীত প্লেটোনিক জগতের ন্যায় সৌন্দর্য ও প্রেম উপলব্ধি করিতে পারে।

মর্তের বিশিষ্ট সৌন্দর্য আশ্রয় করিয়া শেলি সৌন্দর্য্যলোকে অভিসার করেন, এবং এইরূপে মর্ত ও অমর্ত্য সৌন্দর্যের মিলনসাধনের চেষ্টা করেন। পরে তিনি এই জাতীয় চেষ্টার ব্যর্থতা উপলব্ধি করিয়া ইহাকে পরিহার করেন।

"The error consists in seeking in a mortal image the likeness of what perhaps eternal.." (Shelley)

যে মূল ভাবটি শেলির সমগ্র কাব্য ব্যাপ্ত করিয়া আছে তাহা তাঁহার অমূর্ত চিরন্তন সৌন্দর্যের আলোক এবং একটি নারীর মধ্যে তাহার পার্থিব প্রকাশ। ইহাই সৌন্দর্য ও প্রেমের শেলি-প্লেটোনিক সামগ্রিক দর্শন।

মানবীয় চেতনা বিকাশের সর্বশেষ পরিণাম সম্পর্কে সক্রেটিস যে বর্ণনা দিয়েছেন,—

"There lives the very being with whom the knowledge is concerned—the colourless, formless, intangible essence visible only to mind the pilot of the soul".

ইহার সহিত শেলির Intellectual Beauty-র সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে।

মানবাত্মা উর্ধ্বাভিসার করিয়া মায়াবরণের উর্ধ্বে এই দিব্য-সত্তাটিকে লাভ করিতে পারে।

Guido Cavalcanti তাঁহার বিখ্যাত Cangoned' Amore গ্রন্থে প্রেমের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার পরিচয় এইভাবে দান করা হইয়াছে।

"In Cavalcanti's thought love is a human psychological phenomenon ameable to scientific analysis and exposition.... The love with which he is concerned is, of course, fine love. He maintains that love may exist continuously in the mind as the cherishing of an ideal image of feminine beauty; that it becomes active emotionally when a man cherishing such an image beholds, and is beheld by a woman who seems to him to be the counterpart of the ideal image in his mind; that he then seeks responsiveness, being in a death-like distress until it is attained, or, if it is withdrawn; and that the active phase of love ends whenever typically as a result of tensions inherent in the experience—itself the ideal and the real images cease to coincide in the lover's mind."

(Hatch Wilkins : A History of Italian Literature)

(জ)

কোন কোন সমালোচক কীটশের ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার কাব্যপ্রবাহ সামগ্রিক ভাবে বিচার করিলে দেখা যায় তিনি পরিশেষে ইন্দ্রিয়ের জগৎ অতিক্রম করিয়া এক আদর্শ লোকে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

তিনি উপলব্ধি করেন যে কাব্য ইন্দ্রিয়জাত আনন্দের প্রকাশ নয়। যে সত্য বিচিত্র সৌন্দর্যরূপে প্রকাশমান, সেই সত্যকে লাভ করিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া কাব্য জন্মলাভ করে।

তিনি উপলব্ধি করেন, যে কবি ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং জাগতিক

বিচিত্র ঘটনার ভিতর দিয়া আনন্দকে উপলব্ধি করিতে এবং প্রকাশ করিতে পারেন। তিনি ইহারই রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় কবি প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্যে কেবল আনন্দ লাভ করিতেছেন না, তাহার মধ্যে যে রহস্য, যে নিগূঢ় শক্তি, এমন কি তাহার যে ভয়ঙ্করতা তাহাকে পর্যন্ত যুক্তির সহায়তায় ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইন্দ্রিয়ের আনন্দ দার্শনিক উপলব্ধির আনন্দ ও বেদনার ভিতর দিয়া এমন এক অত্যুচ্চ বোধিতে পরিণাম লাভ করিয়াছে যাহা নিখিল মানব-হৃদয়ের ব্যথা বেদনাকে উপলব্ধি করিতে পারে।

Endymion-এর মধ্যে চাঁদ সকল বিশিষ্ট সৌন্দর্যের সম্মিলিত প্রকাশ। মানবাত্মা Endymion আদর্শ প্রেম Cynthia-র অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে। Indian lady মর্ত্ত্য প্রেমের প্রতীক। Endymion-এর ধারণা ছিল মর্ত্ত্য প্রেমকে স্বীকার করিলে আদর্শ প্রেম হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। Endymion পরে বোধ করেন জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক প্রেম একটি অপরটির পরিপূরক। একই সত্য দুই ভিন্নরূপে প্রকাশমান। এই ভাবে কবি আদর্শ ও বাস্তবের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

যে সত্য চরম, অতীন্দ্রিয় কীটশ তাহার সহিত কল্পনার যোগের রহস্য সন্ধানের চেষ্টা করেন Endymion-এর মধ্যে। বিশ্বের সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন বৈচিত্রময় সত্তার অন্তরালে যে এক আদি সৌন্দর্য-সত্তা বিরাজিত, যাহা সকল বিচ্ছিন্ন নিরুদ্ধ সত্তাকে এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে বিধৃত করিয়াছে, Endymion-এর মধ্যে সেই আদি সৌন্দর্য-সত্তা লাভের ব্যাকুলতাকে রূপকের আশ্রয়ে প্রকাশ করিবার চেষ্টা। Endymion-এর Cynthia-র জন্য আকাঙ্ক্ষা কবি আত্মার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা। Endymion-এর মধ্যে কবি সৌন্দর্য ও প্রেমের এক অপরিজ্ঞাত লোকে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি পরিশেষে সেই এক আদি সৌন্দর্যকে অপরোক্ষ করেন, যাহা অসীম হইয়াও এক অজ্ঞাত উপায়ে বিশ্বের সকল সীমা-রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছে। রূপময় চিন্তার ভিতর দিয়া কীটশের সৌন্দর্য-ধ্যান মানব চিত্তকে পরিণামে বাক্য-মনের অতীত এক লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাঁহার এই নবলব্ধ উপলব্ধির প্রথম প্রকাশ ঘটে Hyperion-এর মধ্যে। রোমান্টিক রূপ-কল্পনা চূড়ান্ত অবস্থায় মানুষের উপলব্ধির বাহিরে এক সীমাহীন লোকের আভাস দান করে। ইহার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কীটশের Ode to the

Nightingale-এর 'Charmed magic casement'। The Eve of st. Agnes-এর মধ্যে মূর্ত্ত রূপ-কল্পনা প্রায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

তিনি কেবল আনন্দের ভিতর দিয়া সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারিতেন; কিন্তু বেদনা ও আপাত বিরূপতার ভিতর দিয়াও যে সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল।

কীটশ এ্যাপোলোর ভিতর দিয়া উপলব্ধি করেন, এতদিন তিনি যে-লোকে বিচরণ করিয়াছেন, তাহা একান্ত সঙ্কীর্ণ, ইহার বাহিরে যে অনন্ত প্রসারিত জগৎ আছে তাহাকে নভোচারী চেতনার দ্বারা, অত্যুচ্চ কল্পনার দ্বারা, চরম আলোকে সর্বশেষ মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা লাভ করিতে হয়।

তিনি Ode to Autumn-এর মধ্যে প্রথম নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন যে এই পথে চরম সত্যকে লাভ করিতে পারা যায় না। ইহার জন্য তিনি Fall of Hyperion এর মধ্যে নূতন সাধনায় প্রবৃত্ত হন।

তিনি যে 'sanctuary' বা ভগ্নাবশেষের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছেন, যে ধূসর প্রাচীনতা তাহা সকল যুগের ব্যথার প্রতীক। এইরূপে কবি পরিণামে যে সত্যকে লাভ করেন তাহা সকল আনন্দ-বেদনা, সকল জীবন ও মৃত্যুর এক সম্মিলিত প্রকাশ।

(ঝ)

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ এবং পিউরিটান তন্ত্রের মধ্যে দুটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। এই উভয় আন্দোলনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা দেখা যায় সপ্তদশ শতকের ইংরেজ চিন্তাশীলদের মধ্যে। একটি ধারা যুক্তি ব্যতিরিক্ত আর সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করে, অন্য ধারা বিপরীত ভাবে কেবল ধর্ম-বিশ্বাস-লব্ধ-জ্ঞানকে একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করে। আর একটি ধারা এই উভয় দিকের সত্যতায় বিশ্বাসী। বিজ্ঞান যুক্তির সহায়তায় একজাতীয় সত্যকে লাভ করে, ধর্মবিশ্বাসের পথ ধরিয়া আর এক জাতীয় সত্যকে লাভ করে।

এই উভয় জগতের মধ্যে সংযোগ সাধনের চেষ্টা মিল্টনের সকল কবিতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। Comus-এর মধ্যে তিনি যে সমন্বয়ের সূত্র আবিষ্কার করেন তাহা তাঁহার পরবর্তী কবিতাবলীর মধ্যে সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া যায়। পরিণামে তাঁহার মধ্যে এমন একটি স্থির বিশ্বাস গড়িয়া উঠে যে ঈশ্বরীয় করুণা

ও প্রকৃতি, দেহ ও আত্মাকে কোন উপায়ে মিলিত করিতে পারা যায় না। ইহাদের ধর্ম এবং প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

অষ্টাদশ শতকের সমগ্র ইংরেজ দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যেই কোলরিজ অসম্পূর্ণতা বোধ করেন। এই অসম্পূর্ণতা বোধের ভিতর দিয়া তিনি একদিকে প্লেটোর দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি এবং অন্যদিকে সপ্তদশ শতকের খ্রীষ্টান প্লেটোনিস্টদের প্রতি আকৃষ্ট হন। এই উভয় চিন্তা-পদ্ধতি আশ্রয় করিয়া তিনি তাঁহার মূল দার্শনিক উপলব্ধি গড়িয়া তুলেন। তাঁহার চিন্তা-পদ্ধতির মূল তত্ত্ব হইল যুক্তি (reason) এবং উপলব্ধির (Understanding) মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ। কোলরিজের নিকট কল্পনা 'the agent of reason'। সত্যের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইতে যুক্তি উদ্ভূত হয়, বিচার বিশ্লেষণ হইতে নয়। ইহা ইন্দ্রিয়াতীত সত্যের উৎস ও বিষয়, আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ।

কাণ্ট যে ব্যবধানকে দুস্তর বলিয়া বোধ করিতেন, কোলরিজ তাহাদের মধ্যে যোগ-সূত্র আবিষ্কারে সচেষ্ট হন। কাণ্ট বোধ করেন প্রকৃত জগৎ আমাদের অজ্ঞাত, আমরা ইহার সম্বন্ধে কেবল এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে ইহা অনুভূতি সঞ্চার করে, এবং আমাদের জ্ঞান এই অনুভূতির জগতে সীমাবদ্ধ।

কোলরিজ বোধ করেন যুক্তি জাগতিক জ্ঞানের মধ্যে সীমিত নয়। প্লেটোর মত তিনি বিশ্বাস করিতেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের পশ্চাতে দৃশ্যমান জগতের অতীতে একটি চিরন্তন আদর্শ-লোক আছে, যাহাকে কেবলমাত্র যুক্তির সহায়তায় উপলব্ধি করা সম্ভব। নিয়ো প্লেটোনিস্ট চিন্তাধারার ন্যায় তিনিও বিশ্বাস করিতেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়বস্তু অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতীক স্বরূপ। আইডিয়াকে সিম্বল রূপে ছাড়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না। নিয়ো প্লেটোনিক চিন্তাধারার অনুরূপ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ঈশ্বরীয় মন এবং মানব মনের মধ্যবর্তী সেতু স্বরূপ। সমগ্র প্রকৃতি জগৎ ঈশ্বরের শিল্পরূপ, তাঁহার ভাবনার প্রকাশ।

সীমা ও অসীমের খ্রীষ্টান তত্ত্বকে টি, এস, ইলিয়ট তাঁহার Four Quartets-এর মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাল সম্পর্কিত খৃষ্টান ধারণার বিরুদ্ধ দুইটি মত আছে। একটির মতে কাল অন্তহীন প্রক্রিয়া। ইহা হইতে মুক্তি নাই। এই মত হইতে এই ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছে যে মানুষ ঐতিহাসিক শক্তি সমূহের দ্বারা সৃষ্ট এবং উহাদের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যাত। আধুনিক ইউরোপীয় চিন্তাধারায় এই মতবাদ গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে এবং ঐতিহাসিক ধারার

মধ্যে মুক্তি অন্বেষণকারী বিচিত্র মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছে। অবশ্য এই মুক্তি ব্যক্তিগত নয়, রাষ্ট্র বা জাতিগত। প্রাচ্য ধর্মগুলির মধ্যে কাল সম্পর্কিত ধারণা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ধারণা অনুসারে কাল মায়া, মুক্তি ইতিহাসের বাহিরে, সংসার আবর্তের বাহিরে আসিয়া কালাতীত সত্যের মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া। খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ব এই উভয়বিধ ধারণাকে পরিহার করিয়াছে। ইহা বিশ্বাস করে যে মানুষের একপদ কালে এবং অন্যপদ অনন্তে। ইতিহাস অন্ত এবং অনন্তের পারস্পরিক ছেদ। ইহা ইলিয়টের ভাষায় 'timeless moment'-এর ক্রম।

ইলিয়টের সমস্ত কবিতার মূল বিষয়বস্তু হইল সেই সত্যকে উপলব্ধি করা, যে সত্য কালের অতীত হইয়া দেশ-কালকে অনুবিদ্ধ এবং তাহাদের অর্থান্বিত করে।

(এ৩)

ইলিয়েট Prufrock-এর মধ্যে আপনার আদর্শ প্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করেন যৌন বোধের উপর। তাঁহার আকাঙ্ক্ষা মিষ্টিকদের ঈশ্বরের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ। The Hollow Man-এর মধ্যে ইলিয়টের উপর দান্তের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। দেহ ও আত্মার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা যে ব্যর্থ কবিতাটির মধ্যে এইরূপ একটি বিশ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

পবিত্র প্রেম যে ঈশ্বরীয় প্রেমের দর্পণ, তাহা যে যৌন ব্যতিরিক্ত সামগ্রী প্রেমের এই বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে Ash Wednesday-নরনারীর মধ্যে। বোদেলিয়ার তাঁহার Mme Marieকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

"Through you, Marie, I shall be strong and great. Like Petrarch I shall immortalize my Laura. Be my guardian Angel, my muse, and my Madonna, and lead me in the path of Beauty."

ইলিয়টের Ash Wednesday-র নারী সম্পর্কে এই মন্তব্য করা যায়।

পরে তিনি মানবিক সকল প্রেমকে পরিহার করেন। The Family Reunion-এর মধ্যে অধ্যাত্ম জীবনের সহিত পার্থিব আকাঙ্ক্ষার সামঞ্জস্য

এইসাধনের কোন চেষ্টা নাই। রূপে দান্তেকে পরিহার করিয়া তিনি St. John of the cross-এর অনুগামী হন।

ইলিয়টের কবিতার ট্র্যাজেডি হইল তাহার মধ্যে কোন বিয়াত্রিচে নাই। দান্তে তাঁহার প্রেম সম্পর্কে বলিয়াছেন, "Ladies, the end of my love was once the salutation of the lady whom you appear to mean; and in that dwelt my beatitude, which was the end of all my desires."

এই সমন্বয়ের আদর্শ ইলিয়েটের মধ্যে নাই। তাঁহার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব রহিয়া গিয়াছে। এক দিকে প্রেম, অন্যদিকে মুক্তি। এই ভাবধারা কেবল ইলিয়টের কবিতার ভাব বস্তু নয়, সমসাময়িক যুগের অনেক কবির কাব্যে লক্ষ্য করা যায়।

কোন বিশ্বাসের ভিতর দিয়া তিনি প্রেমকে লাভ করিতে পারেন নাই অথবা প্রেমের ভিতর দিয়া তিনি কোন বিশ্বাসকে লাভ করিতে পারেন নাই।

যে আনন্ত্যকে উপলব্ধি করিতে কালের ঊর্ধ্বে উঠিতে হয় 'The Rock'-এর মধ্যে ইলিয়ট সেই উপলব্ধির কথা বলেন নাই।

The Rock-এর মধ্যে Rock চিরন্তনতার দিক এবং Chorus জাগতিক কর্ম-চক্র। Murder in the Cathedral-এর মধ্যে Becket চিরন্তনতা এবং Woman of Canterbury, কালের প্রতীক। চিরন্তনতা ও কাল, স্থির ও গতি, আত্মা ও দেহ, দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া কর্ম, কর্মের ভিতর দিয়া দুঃখ-ভোগ—এই সমস্ত কিছুর মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

ইলিয়ট হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের সহিত হেরাক্লিটাসের দর্শনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য হইল কর্ম ও অ-কর্মের চক্রের উর্ধে উঠা। কিন্তু The dry Salvages-এর মধ্য দিয়া কালকে জয় করিবার কথাই ব্যক্ত হইয়াছে।

(ট)

টেনিসন যে সময়কার কবি সেই সময় বৈজ্ঞানিক বিচিত্র আবিষ্কার জন-সাধারণের মনে বিপুল আশার সঞ্চার করিয়াছে। কিন্তু সেইকালে তিনি বৈজ্ঞানিক বিচিত্র আবিষ্কারের সত্যতা সম্পর্কে বারংবার সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। জগতের ক্রমিক উন্নততর পরিণামেও তাঁহার সংশয় ছিল।

তবে জগৎ ও জীবন যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এমন নিঃসংশয় মন্তব্য অবশ্য তিনি কোথাও করেন নাই। এই সকল দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার বোধের অনৈক্য থাকিলেও বিশ্ব যে ঈশ্বরের অভিপ্রায়ের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত, মানবাত্মা যে অমর, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া তাহা যে ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়াছে, সকল খণ্ডতা ও অচঞ্চলতার উর্ধে যে এক চিরস্থির পূর্ণতার লোক আছে, সকল ধর্ম-সম্প্রদায় যে এক উন্নততর ধর্ম লাভের দিকে চলিয়াছে, এমনি বিচিত্র উপলব্ধির ক্ষেত্রে উভয় কবির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য আছে।

ব্যক্তিগতভাবে আধ্যাত্মিক সত্যকে উপলব্ধি করেন কোলরিজ, ওয়াড়স্‌ওয়ার্থ, টেনিসন, শেলি প্রভৃতি রোমান্টিক কবিগণ। প্রচলিত খৃষ্ট-ধর্মের মধ্যে ইঁহারা কেহই সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন নাই। এইভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির সহায়তায় উনবিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক সংশয়কে ইঁহারা জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করেন।

টেনিসনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের তাই সামান্য পরিচয় এক্ষেত্রে লাভ করা যাইতে পারে।

শৈশব হইতেই তিনি বোধ করেন যে প্রেমই বিশ্বের নিয়ন্তৃ শক্তি। এই উপলব্ধি তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

শৈশবে তাঁহার একটি মিষ্টিক ক্ষমতা গড়িয়া উঠে যাহার সহায়তায় তিনি ঈশ্বরের সহিত চিত্তের যোগযুক্ত অবস্থা বোধ করিতে পারিতেন। তাঁহার কবিতাবলীর মধ্যে এই উপলব্ধির বিচিত্র পরিচয় লাভ করা যায়।

আর একটি বোধ যাহা টেনিসনের জীবনে পূর্বাপর স্থায়ী ছিল, তাহা হইল আধ্যাত্মিক জীবনের নিত্যতা এবং জাগতিক জীবনের অনিত্যতা। "The Higher Pantheism" কবিতার মধ্যে এই ভাবটি গভীর ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। এই জগৎ এক গভীরতর সত্যের ছায়া।

তিনি বিশ্বের বৃহৎ বৃহৎ ধর্মমতগুলিকে আপেক্ষিক সত্য বলিয়া বোধ করিতেন এবং আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির ক্রমে অন্যান্য ধর্মমত প্রাচীন সকল ধর্ম বিশ্বাসকে ছাড়াইয়া যাইবে।

'In Memoriam' রচনা কালের মধ্যে তিনি আত্মার অমরতার কথা প্রচার করেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন ঈশ্বর প্রেম স্বরূপ এবং এই প্রেমই জগতের নিয়ন্তৃ শক্তি। মানুষের কর্তব্য তাহার স্বাধীন ইচ্ছার সহিত ঈশ্বরীয় ইচ্ছার

যোগ সাধন করা। তিনি পরবর্তী সমস্ত জীবন ধরিয়া মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরীয় ইচ্ছার সহিত সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

ঈশ্বরীর বা দিব্য প্রেম জাগতিক জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তিনি উপলব্ধি করেন সীমা ও অসীম একই জগতের দুই ভিন্ন প্রতীতি।

টেনিসন তাঁহার The Higher Pantheism কাব্যে বলেন যে ঈশ্বর মানুষের সীমিত ব্যক্তিত্বকে আপনার অনন্ত ব্যক্তিত্ব হইতে পৃথক করিয়াছেন। ইহার জন্য অসীমের সীমাকে পরিচালনা করা, এবং ঈশ্বরের সহিত মানুষের নৈতিক সম্পর্কের বোধটি গড়িয়া তোলা সম্ভব হইয়াছে। Pantheism দর্শনে এই ভাব গড়িয়া তোলা অসম্ভব বলিয়া তিনি এই ভাবের নাম দেন "The Higher Pantheism."

জগতের অনিত্যতা এবং আধ্যাত্মিক জীবনের নিত্যতার বোধটি টেনিসন গড়িয়া তুলেন আপনার মিষ্টিক অনুভূতির সাক্ষ্য স্বরূপ।

'Akbar's Dream' কবিতাটির মধ্যে তিনি মহান রাজার সেই চেষ্টার কথা বলিয়াছেন, যে চেষ্টার ভিতর দিয়া তিনি বিবদমান সমস্ত ধর্ম সম্প্রদায়ের পার্থক্য দূর করিয়া এক ঈশ্বরের উপাসনা প্রচার করেন। খৃষ্টান তত্ত্বে এই ঈশ্বর প্রেম এবং পারসিয়ান তত্ত্বে এই ঈশ্বর প্রেমের সূর্য্য।

নিখিল বিশ্ব যে ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত টেনিসনের এই নিঃসংশয় বিশ্বাস শেষ বারের মত প্রকাশ পায় 'Crossing the Bar' কবিতার মধ্যে।

(ঠ)

ইয়েট্‌স ছিলেন রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি। উভয়ের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ভাবের আদান প্রদানও ছিল। সেইজন্য প্রসঙ্গ ক্রমে ইয়েটসের কবি-ধর্মের কিছু আলোচনা এক্ষেত্রে করা যাইতে পারে। তাহাতে উভয় কবির মধ্যে ভাবগত সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

কবি ইয়েটস্ যৌবনের প্রারম্ভিক পর্যায় হইতেই আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা বিপরীত ভাবের প্রেরণা লক্ষ্য করেন। এই বৈপরীত্য গুলিকে তিনি প্রধানতঃ দুটি ভাগে বিভক্ত করেন। একটি তাঁহার কল্পনা ও ভাবনার জগৎ— সমগ্র বহির্জগত হইতে যেখানে তিনি বিচ্ছিন্ন। আর একটি তাঁহার কর্মময়

বহির্জগৎ। চিরাচরিত প্রথা, ভাবনা, রীতি-নীতি, সংস্কার ও ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা সম্পূর্ণ রূপে নিয়ন্ত্রিত।

কিন্তু শীঘ্রই তিনি এমন একটি পূর্ণ ব্যক্তিত্ব লাভের জন্য সচেষ্ট হন যাহার মধ্যে জীবনের এই সকল পৃথকমুখী প্রেরণার পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটে। একটি পরিণামে তিনি জীবনের সামঞ্জস্য লাভ করিতে সমর্থ হন।

আবার কবির জীবনে নূতনতর বৃহত্তর বোধের সঞ্চার হইয়াছে। কবি আবার আপনার ব্যক্তিত্বের সহিত তাহার সামঞ্জস্য অর্জনের চেষ্টা করিয়াছেন। এমনি করিয়া কবি-চেতনা ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই পর্যায়ে আসিয়া কবি মনুষ্য জীবনের এবং নিখিল বিশ্বের যে রূপ-কল্পনার সাক্ষাৎ পান তাহাকে তিনি তাঁহার Vision কাব্যের মধ্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সত্যের পিপাসা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাই কিছুকালের মধ্যেই তিনি আপনার লব্ধ Vision-এর সীমা বোধ করেন। সকল প্রতীক-তত্ত্বের রূপ-তত্ত্বের বাহিরে আসিয়া সত্যকে অপরোক্ষ করিবার জন্য তিনি গভীরতর তপশ্চর্যায় বিমগ্ন হন। তিনি শেলির মত উপলব্ধি করেন, The deepest truth is imageless। তাঁহার শেষ পর্যায়ে রচিত কাব্যগুলির মধ্যে ইহারই পরিচয় লাভ করা যায়।

কবি চেতনার এমনি একটি ধীর বিকাশের দিক আমরা রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও লক্ষ্য করি। তবে সেই বিকাশ ধারা সর্বাংশে একরূপ হইতে পারে না। তাঁহার চেতনা বিকাশের আদি হইতেই ছিল একদিকে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা—অন্য দিকে ছিল নিখিল বিশ্ব-লোক। নিখিল বিশ্বের সহিত ধীর মিলন বোধের প্রসারতার ভিতর দিয়া তাহার চেতনা ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই বিকাশ-প্রেরণা তাঁহার অন্তরে যেমন বিচিত্র বোধের সঞ্চার করিয়াছে তেমনি এই মিলন বোধের ভিতর দিয়াই সেই সকল বোধের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে সামঞ্জস্য ঘটিয়া গিয়াছে।

এমনি করিয়া কবি-চেতনা পরিণামে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে পরিপূর্ণ করিয়া আরো উচ্চতর তত্ত্ব লাভের দিকে প্রয়াণ করিয়াছে।

প্রভাত সঙ্গীতের পূর্ববর্তীকালে একটি পর্যায় ছিল যে কালে কবি বৃহৎ বিশ্বের সহিত সংযোগ বিরহিত হইয়া আপনার অন্তরের বিচিত্র অস্বাভাবিক, সেই কারণে অসুস্থ ভাবনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার পর

হইতে কবি নিখিল বিশ্বকে তাহার বৃহৎ মানব-সমাজ ও প্রকৃতি জগৎকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর ভাবে, বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর রূপে লাভ করিয়া চলিয়াছেন। এইরূপে লক্ষ্য করা যায় কবি তাঁহার ভাব-জীবনের প্রথম উন্মেষের কাল হইতেই আপনার সাধন-পথটিকে নিঃসংশয়ে লাভ করেন। বিরুদ্ধ বোধে বিক্ষত চিত্তের যে-রূপটি আমরা ইয়েট্‌সের মধ্যে লক্ষ্য করি তাহা এই কারণে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায় না।

কিন্তু উভয়ের কাব্য-সাধনা তথা জীবন-সাধনার লক্ষ্যের মধ্যে মিল আছে। কবি ইয়েট্‌স ভারতীয় তথা প্রাচ্য অধ্যাত্ম সাধনার সহিত পরিচয় লাভ করেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা যে পরিণামে অতীন্দ্রিয় চেতনা-লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া জীবনের সকল সমস্যার সমাধান নয়, সকল সমস্যা পরিহার করিতে চাহিয়াছে তাহার পরিচয় তিনি লাভ করেন; কিন্তু তিনি স্বয়ং জীবনে এই জাতীয় সাধনাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি এমন একটি সত্য লাভ করিতে চান যাহার মধ্যে উভয়ের অর্থাৎ জাগতিক এবং পরমার্থিক উভয় সত্তার পূর্ণ স্বীকৃতি আছে এবং উভয়ের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয় ঘটে। এই কারণে জীবনাতীতের প্রেরণা অপেক্ষা পরিণত বয়সে তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে জীবন ও জগতের প্রতি গভীর প্রীতি নানা ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। যে সত্য লাভ করিতে জীবন ও জগৎকে আদৌ পরিহার করিতে হয় সেই সত্য লাভের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা ছিল; বরং জীবন ও জগৎকে লাভ করিবার জন্য তিনি আর সমস্ত কিছুকে পরিহার করিতে প্রস্তুত।

এই সমন্বয় সাধনের চেষ্টার মধ্যে উভয় কবির মধ্যে আমরা মিল দেখিতে পাই।

এক্ষেত্রে যে কয়েকজন পাশ্চাত্য কবির কাব্য বিশ্লেষণ করিলাম তাহাতে জাগতিক এবং অতিজাগতিক সৌন্দর্য-সত্তার মধ্যে যে নিগূঢ় কোন যোগ আছে এই অধ্যাত্ম বিশ্বাস নানা ভাবে ক্রিয়া করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে সংযোগ আবিষ্কারের চেষ্টার ভিতর দিয়া কোন কবির কাব্যে কোথাও জাগতিক সৌন্দর্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কোথাও বা অতিজাগতিক সৌন্দর্য বোধের উপর।

রবীন্দ্র-কাব্যে এই সংগ্রাম সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া সহস্র পথে অনুসন্ধান তৎপর হইয়াছে। বস্তুত জাগতিক এবং অতিজাগতিক বোধের মধ্যে সংযোগ সূত্র আবিষ্কারের এই সংগ্রাম মানুষের চিরন্তন অধ্যাত্ম সংগ্রাম।

(ভ)

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনায় নিকটতম তৃণ পুষ্প হইতে সুদূরতম নক্ষত্র-লোক পর্যন্ত সমস্ত কিছুই বিধৃত। নিখিল বিশ্বের সকল রূপের ভিতর দিয়া সেই এক সৌন্দর্য-প্রতিমার রূপের দীপ্তি নানা ভাবে বিচ্ছুরিত। রবীন্দ্রনাথ যে সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধ্যান করিয়াছেন, তাহা বিশ্বাতীত হইয়াও বিশ্বের সকল সত্তা সকল নারী রূপকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত। সেই এক সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধ্যানে প্রকৃতি এবং নারী এক হইয়া গিয়াছে।

মানসী কাব্যে ইহার প্রথম নিঃসংশয় উপলব্ধি। সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী'র মধ্যে এই সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রথম পূর্ণ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনা কিছু বিশিষ্ট হইলেও মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, কল্পনা, ক্ষণিকা প্রভৃতি কাব্য-ধারার পর্যায়ে তিনি কালিদাসেরই মত পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোক এবং তদাশ্রয়ী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনিও এই সৌন্দার্যাশ্রয়ী হইয়া অসম্পূর্ণতার বেদনাকে জয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কালিদাসের মত তিনিও তপশ্চর্যার ভিতর দিয়া এই সৌন্দর্য-লোকটিকে পরিণামে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টা করেন। তাঁহার এই প্রাণপণ প্রয়াসের পরিচয় নিহিত আছে নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি, গীতিমালা ও গীতালি প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে। ইহার পর হইতে তাঁহার সাধন পথ কালিদাস তথা ভারতীয় জীবনাদর্শ হইতে কতকটা বিশিষ্ট হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ পরিণামে এমন একটি তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে বিশ্বের সকল আনন্দ ও বেদনা, রূপ ও বিরূপ, পাপ ও পুণ্য, এক অখণ্ডতার মধ্যে বিধৃত হইয়া আছে। বিরোধের এই বোধটিও অসম্পূর্ণতার। অখণ্ডতার মধ্যে কোন বিরোধ নাই বলিয়া সে অবস্থা অনির্বচনীয়।

এই তত্ত্বের সন্ধান লাভ করিয়াও তাঁহার অধ্যাত্ম এষণা নিরুদ্ধ হয় নাই। তিনি আরও গভীরে তাঁহার অধ্যাত্ম-দৃষ্টি প্রসারিত করিয়াছেন। ইহাতে তিনি বোধ করেন বিশ্বে রূপ-বিরূপের চিরন্তন দ্বন্দ্ব সত্য নয়। বিশ্বে বিরূপ বা অমঙ্গলের ধীর বিলুপ্তি ঘটিতেছে। পরিণামে জীবন যাহা লাভ করিতে

চলিয়াছে তাহা পুণ্যও নয়, পাপও নয়, তাহা এক অখণ্ড সুসম্পূর্ণ জীবনের মহিমময় প্রকাশ।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দার্শনিক চিন্তাধারায় জীবন ও জগৎ অ-সৎ বা মায়া বলিয়া উপলব্ধ হইয়াছে। জীবন ও জগতের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে মানবিক বোধের সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। মূল এই উপলব্ধিই মানব সংস্কৃতির সকল বিভাগকেই কম বেশী প্রভাবিত করিয়াছে।

রবীন্দ্র-দর্শনে সীমা ও অসীম, রূপ ও অরূপ, লোক ও লোকাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিতে চাহিয়াছে। এই উপলব্ধিই স্বাভাবিক ভাবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-প্রেরণার সকল বিভাগ, বোধের বিচিত্র দিককে প্রভাবিত করিয়াছে। তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রেমের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও ইহা সমান ভাবে প্রযোজ্য। রবীন্দ্র-কাব্যে সৌন্দর্য ও প্রেম-সাধনার এই বৈশিষ্ট্যটি সবিশেষ লক্ষনীয়।

ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বোধটিই দেশ-কালের ভিতর দিয়া ধীরে রূপ লাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। নারীর মধ্যে আজ যে এক আশ্চর্য সুষমার প্রকাশ তাহা এই অভিব্যক্তির ফল। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে পরিপূর্ণ রূপ লাভের যে বাসনা তাহা নারী রূপের মধ্যে আসিয়া এক অপরূপ পরিণাম লাভ করিয়াছে। কিন্তু রূপের ইহা চরমোৎকর্ষ নয় বলিয়া নারী রূপকে ঘিরিয়া আজ এত বেদনা। অসম্পূর্ণতা বোধের এই বেদনার ভিতর দিয়াই মানুষ স্বর্গ-লোকের কল্পনা করিয়াছে। সে কল্পনায় নারী-রূপ জাগতিক সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা মুক্ত। যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া পুরুষ স্বপ্নে তাহার সহিত মিলিত হইয়াছে। মর্ত্যে তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয় রূপে বোধ করেন অভিব্যক্তির ভিতর দিয়াই মর্ত্য রূপের অসম্পূর্ণতা ধীরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। স্বর্গের ধ্যান মর্ত্যে সত্য হইয়া উঠিবে। উর্বশীর সৌন্দর্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে সৌন্দর্য ও প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট উপলব্ধির কতকটা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"এক হিসাবে সৌন্দর্য মাত্রই অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্, সে তো বস্তু নয়, সে একটী প্রেরণা যা আমাদের অন্তরে রস সঞ্চার করে। নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের যে প্রকাশ উর্বশী তারই প্রতীক। সে সৌন্দর্য আপনাতেই আপনার চরম লক্ষ্য

সেইজন্য কোনো কর্তব্য যদি তার সাথে এসে পড়ে তবে সে কর্তব্য বিপর্যস্ত হয়ে যায়। এর মধ্যে কেবল অ্যাব্‌স্ট্রাক্‌ট্‌ সৌন্দর্যের টান আছে তা নয়, কিন্তু যেহেতু নারী রূপকে অবলম্বন ক'রে এই সৌন্দর্য সেইজন্য তার সঙ্গে স্বভাবত নারীর মোহও আছে।***

দেবতার ভোগ নারীর মাংস নিয়ে নয়, নারীর সৌন্দর্য নিয়ে—হোক-না-সে দেহের সৌন্দর্য, কিন্তু সেই তো সোন্দর্যের পরিপূর্ণতা। সৃষ্টিতে এইরূপ সৌন্দর্যের চরমতা মানবেরই রূপে। সেই মানব রূপের চরমতাই স্বর্গীয়।***

মানুষ সত্য যুগ এবং স্বর্গ কল্পনা করেছে। প্রতিদিনের সংসারে অসমাপ্ত ভাবে খণ্ডভাবে যে পূর্ণতার সে আভাস পায় সে যে অ্যাবস্ট্র্যাক্‌ট ভাবে কেবল মাত্র তার ধ্যানেই আছে, কোনোখানেই তা বিগ্রহীকৃত হয় নি, একথা মানতে তার ভালো লাগে না। তাই তার পুরাণে স্বর্গ-লোকের অবতারণা। যা আমাদের ভাবে রয়েছে অ্যাবস্ট্র্যাক্‌ট, স্বর্গে তাই পেয়েছে রূপ। যেমন, যে কল্যাণের পূর্ণ আদর্শ সংসারে প্রত্যক্ষ দেখতে পাইনে, অথচ যা আছে আমাদের ভাবে; সত্য যুগে মানুষের মধ্যে তাই ছিল বাস্তব রূপে এই কথা মনে করে তৃপ্তি পাই। তেমনি এই কথা মনে করে আমাদের তৃপ্তি যে, নারী রূপের যে অনিন্দনীয় পূর্ণতা আমাদের মন খোঁজে তা অবাস্তব নয়, স্বর্গে তার প্রকাশ উর্বশী, মেনকা, তিলোত্তমায়।"

এদেশে পৌরানিক আখ্যায়িকাগুলি (স্বর্গ-লোক প্রভৃতি সৃষ্টি) যে প্রেরণার ভিতর দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, পাশ্চাত্যে সেই একই প্রেরণায় প্লেটোনিক অপার্থিব সৌন্দর্য-লোকের সৃষ্টি। বিশ্বের এই অসম্পূর্ণ প্রকাশ-রূপটিই যে চিরন্তন এই সম্পর্কে উভয় দেশেই একপ্রকার নিঃসংশয় উপলব্ধি ছিল। সুতরাং সম্পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য তাহারা জীবন ও জগৎকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধনা করিয়াছে।

ভারতীয়- সংস্কৃতির অন্যান্য সকল বিভাগকে জীবন ও জগতের অসত্যতা বোধ নানা ভাবে প্রভাবিত করিলেও সৌন্দর্য ও প্রেম-সাধনার ক্ষেত্রে প্লেটোর উর্ধ্বাভিসারতত্ত্ব অথবা শেলির ইন্‌টেলেকচুয়াল সৌন্দর্য-তত্ত্বের কোন সাদৃশ্য প্রথম হইতেই লক্ষ্য করা যায় না।

বৈদিক সাহিত্যে যে রূপাবিষ্কার, রূপের বন্দনা তাহাতে জাগতিক সৌন্দর্য-মাত্রই এক দুর্লভ মহিমা লাভ করিয়াছে। তাহা রূপের অতীত রূপাবিষ্কারের তত্ত্ব দৃষ্টি নয়। তাহা সকল রূপাতীতের মাধুরী রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা।

কালিদাসের কাব্যে নাটকে নায়িকাদের যে রূপের বর্ণনা পাই, তাহা তাঁহাদের দেহ-রূপেরই বর্ণনা। বিশ্ব-প্রকৃতির সকল সৌন্দর্য্যের অংশ ভাগ দিয়া সেই সৌন্দর্য বিরচিত। উর্বশীর মধ্যে যে সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রথম প্রকাশ; মালবিকা, যক্ষপ্রিয়া, উমা প্রভৃতি নায়িকার ভিতর দিয়া শকুন্তলায় যে সৌন্দর্য-ধ্যানের পূর্ণতা তাহা নারীর দেহ-সৌন্দর্যেরই পূর্ণতা। সৌন্দর্যের প্লেটোনিক ধ্যাণ-ধারণার আভাস মাত্র সে সৌন্দর্য-ধ্যানের মধ্যে নাই।

সৌন্দর্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে এক জাতীয় দার্শনিক চিন্তা আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, যে সকল লক্ষণ পুরুষ ও নারীর সন্তান উৎপাদনের বা সন্তান ধারণের উপযুক্ত তাহাই নারী ও পুরুষের সৌন্দর্য। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া পুরুষ ও নারী সেই সকল লক্ষণকেই সুন্দর বলিয়া চর্চা করিয়াছে।

কালিদাসের কাব্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের পূর্ণতা ঘটিয়াছে প্রায় সকল নায়িকার ক্ষেত্রে উত্তম সন্তানের জন্ম দানের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান কালিদাসের মতনই মুখ্যত শরীরী সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান।

মানসীর মধ্যে যে সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রথম সুস্পষ্ট প্রকাশ, চিত্রার বিজয়িনীর মধ্যে যে সৌন্দর্য-ধ্যানের পূর্ণতা তাহা প্লেটোর আত্মিক সৌন্দর্য কিংবা য়ুরোনিয়ানের ধারণা হইতে সম্পূর্ণ বিলক্ষণ।

দেহ-রূপকে অতিক্রম করিয়া (রাজা নাটকে) রাণী রাজার যে এক রস-মূর্তি বা ভাব-মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছে তাহার সহিত প্লেটোর আত্মিক সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের পার্থক্য আছে। এই সৌন্দর্য আবিষ্কারের পর প্লেটোর প্রেমিক-প্রেমিকা একের পর এক সৌন্দর্য-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া ঊর্ধ্ব হইতে ক্রমিক ঊর্ধ্বতর লোকে অভিসার করিয়াছে; অন্যদিকে এই রূপাবিষ্কারের পর রাজা রাণীকে বহির্বিশ্বে আহ্বান করিয়া আনিয়াছে।

বিশ্বের কেবলমাত্র সৌন্দর্য ভাগকে আশ্রয় করিয়া যে সুষমা তাহা পূর্ণ সুষমা নহে, তাহা ব্যক্তির বিশ্ব-সত্তা লাভও নয়। এই পরিণাম লাভের পর রাণী পূর্ণতর সুষমা-লোকটিকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। বিশ্বের সকল রূপ-বিরূপকে আশ্রয় করিয়া যে পূর্ণ সুষমা বিরাজিত রাণী এখন সেই সুষমা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া বিশ্বে এই পূর্ণ সুষমার ধীর প্রকাশের উপলব্ধি এবং প্লেটোর দিব্য-সত্তার আবিষ্কার দুটি সম্পূর্ণ বিলক্ষণ। একটির পশ্চাতে ক্রিয়া করিয়াছে মর্ত্য ও অমর্ত্যের পরিপূর্ণ যোগের উপলব্ধি, উভয়ের চরম

সত্যতার নিঃসংশয় স্বীকৃতি। একটির পশ্চাতে ক্রিয়া করিয়াছে অমর্ত্য সৌন্দর্য-লক্ষীকে অপরোক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা, ইহার জন্য প্রজ্ঞাশ্রয়ী হইয়া মানবীয় চেতনার ঊর্ধ্বাভিসার, অন্যটির পশ্চাৎ প্রেরণা হইল মর্ত্য রূপের অসম্পূর্ণতা দূরীকরণের সাধনা। রবীন্দ্রনাথের আদর্শ সৌন্দর্য-লক্ষ্মী রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'মানব রূপের চরমতাই স্বর্গীয়'।

(চ)

ফাউস্ট মেফিস্টোফিলিসের সহায়তায় ইন্দ্রিয়-লোকের যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র-কাব্যে অবশ্য সেই জাতীয় নিদারুণ দুঃখকর অভিজ্ঞতার কোন পরিচয় থাকিতে পারে না। ইহা তাঁহার ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির জন্য এক প্রকার অসম্ভব। কিন্তু মানসীর পূর্ববর্তী কাব্য-ধারা পর্যন্ত তাহারই কতকটা আভাস যে লাভ করিতে পারা যায় তাহাতে সংশয় নাই।

দ্বিতীয় খণ্ডে দেখিতে পাই ফাউস্ট ইন্দ্রিয়-লোক হইতে চিরন্তন প্রেমের লোকে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্যে এই উত্তরণের প্রথম পরিচয় পাই 'মানসী'র মধ্যে। গ্যেটে সমগ্র ক্ল্যাসিক্যাল যুগ মথিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্য-লক্ষ্মী হেলেনের রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের সমগ্র কাব্য মথিত করিয়া তাঁহার আদর্শ সৌন্দর্য-লক্ষ্মী, তাঁহার প্রেয়সী, তাঁহার 'মালবিকা'র মূর্তিটিকে গড়িয়া তুলিয়াছেন। মানসীর 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে ইহার প্রথম প্রকাশ। প্রিয়া-স্থান লাভের জন্য কবি-মানসের সেই প্রথম স্বপ্ন কঞ্চরণ।

এই আদর্শ সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর বিচিত্র ধ্যান মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালী, কল্পনা প্রভৃতি কাব্য-ধারার ভিতর দিয়া ধীর বিকাশ লাভ করিয়াছে। গ্যেটের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের ক্ল্যাসিক্যাল অর্থাৎ গ্রীক সৌন্দর্য প্রীতি সুবিদিত। তবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ 'সৌন্দর্য্য প্রতিমা' প্রাচ্য ও পাশ্চত্য কাব্য ও সংস্কৃতি-লোকের সকল উপাদান দ্বারা গঠিত। রবীন্দ্র-কাব্যে এই সৌন্দর্য-প্রতিমার ধ্যান তাই আশ্চর্য সমুন্নতি ও প্রসারতা লাভ করিয়াছে। তাহা জন্ম-জন্মান্তর, নিখিল বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত; তাহা মানুষের সকল আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক প্রেরণার উৎস স্বরূপিণী।

রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানকে এই পরিণতি দান করিয়াও পরিতৃপ্তি

লাভ করিতে পারেন নাই। ইহারও একটি সীমা আছে। জীবনের মূল্য এই সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীম বিস্তৃত।

এই অসম্পূর্ণতা বোধের ভিতর দিয়া ফাউস্টের মত রবীন্দ্রনাথও ইহার ঊর্ধ্বতর তত্ত্ব লাভের জন্য ধ্যান-নিমগ্ন হন। ফাউস্টের মতই ঈশ্বরীয় করুণার স্রোতে তিনি পরিশেষে আপনাকে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পণ করেন। ঈশ্বরের এই করুণা ছাড়া মানুষ কেবল আপন চেষ্টায় শেষ সার্থকতা লাভ করিতে পারে না।

"All that is transitory is only a symbol ;
The inadequate here becomes event ;
The indescribable here it is done ;
The Eternal-Faminine draws us on and upward." (Goethe)

এই সম্পর্কে Mrs. Bayard Taylor-এর মন্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য।

"Love is the all-uplifting all-redeeming power on Earth and in Heaven ; and to Man it is revealed in its most pure and perfect form through woman. Thus, in the transitory life of Earth it is only a symbol of the diviner being ; the possibilities of Love, which earth can never fulfil, become realities in the higher life which follows ; the Spirit, which woman interprets to us here, still draws us upward (as Margaret draws the soul of Faust) there."

ঈশ্বরীয় করুণা নারী প্রেম রূপে মর্ত্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রেমই মহাকালের যাত্রায় একমাত্র আলোক বর্তিকা। এই উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথেরও ছিল।

ঈশ্বরীয় করুণার প্রকাশ স্বরূপিণী নারীর যে 'কল্যাণী' মূর্তি তাহার সহিত মানুষের চিরন্তন রূপের আকাঙ্ক্ষা, দেহ-রূপের সম্পূর্ণতার সামঞ্জস্য সাধনের দীর্ঘস্থায়ী চেষ্টার রূপটিও রবীন্দ্র-কাব্যে লক্ষ্য করা যায়।

মর্ত্য ও অমর্ত্য সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান আমরা প্লেটোর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি, গ্যেটের মধ্যে সেই ব্যবধান অনেকটা হ্রাস পায়। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই উভয় লোকের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা বিচিত্রমুখী হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রাচীন হিব্রু জাতির মধ্যে এইরূপ এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে ঈশ্বরের একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় একমাত্র তাহাদের প্রাচীন জাতিকে আশ্রয় করিয়া আত্ম প্রকাশ করিতে চায়। এই অভিপ্রায় চরিতার্থ হইলে বিশ্বে স্থায়ী সুখ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। জগৎ চিরকালের জন্য পাপ মুক্ত হইয়া যাইবে।

গ্রীক জাতির সকল সৃষ্টি প্রেরণার যে মূল উৎস বা নিগূঢ় প্রেরণা যাহাকে হেলেনিক সৌন্দর্য-ধ্যান বলা হয়, গ্রীক সংস্কৃতির প্রসার লাভের কালে এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর আদর্শটিকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার সচেতন অভিপ্রায় ছিল।

ভার্জিল তাঁহার মহাকাব্য Aenead এর মধ্যে পরিপূর্ণা সৌন্দর্য প্রতিমা ভেনাসের Aeneadএর ভিতর দিয়া আত্ম প্রকাশের যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহাতে রোমক সংস্কৃতির আদর্শটিকেই তিনি বিশ্বে স্থায়ী কল্যাণ সাধনের একমাত্র পথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এমনি একটি স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় তাঁহার ছিল।

আজ এই বোধটি নিঃসংশয়িত ভাবে সত্য হইয়া উঠিয়াছে যে ঈশ্বরের কোন এক দুর্জ্ঞেয় অভিপ্রায় বিশ্বের সকল জাতি-চেতনাকেই আশ্রয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

আজ জাতি-মানস মাত্রই বিশ্ব-মানসের মধ্যে একটি আদর্শ সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর সন্ধান পাইয়াছে। বিশ্ব-মানসের এই সৌন্দর্য-ধ্যান প্রত্যেকটি জাতি-মানসের সৌন্দর্য-ধ্যানের দ্বারা গড়িয়া তোলা। বিশ্ব সৌন্দর্য-লক্ষ্মী জাতি সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর মিলিত প্রকাশই শুধু নয়, তাহা এই সকল সীমিত রূপের মিলিত প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া অসীম বিস্তৃত।

জাতীয়তা বোধের বিকাশের কালে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশ একপ্রকার ছিল না বলা চলে। ব্যক্তি-মানস জাতি-মানসকেই আপনার সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিত মাত্র।

ব্যক্তি-মানসের উপলব্ধির ভিতর দিয়া প্রত্যেকটি জাতি আপন সার্থকতা লাভের পথের যেমন সন্ধান পাইয়াছে, তেমনি ব্যক্তি আপনার স্বাতন্ত্র্য বোধ, আপনার অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের এক অনাস্বাদিত-পূর্ব মূল্য লাভ করিয়াছে। এইরূপে পূর্ণ মনুষ্যত্ব সাধনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, জাতি ও বিশ্বের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধিত হইয়াছে।

মানসী কাব্য পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের যে সৌন্দর্য-ধ্যান তাহা মোটামুটি ব্যক্তি-মানস সৃষ্ট। এই ব্যক্তিগত সৌন্দর্য-লোক হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কবি সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যের মধ্যেই জাতির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার 'প্রেমের অভিষেক' কবিতাটি স্মরণে পড়িতে পারে। উমা-মহেশ্বর, অর্জুন-সুভদ্রা, নল-দময়ন্তী, দুষ্মন্ত-শকুন্তলা, পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা প্রভৃতির প্রেমোপাখ্যানের ভিতর দিয়া জাতি-চিত্তের যে চিরন্তন সৌন্দর্য-ধ্যান নানা রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে কবি সেই সৌন্দর্য ও প্রেম-লোকের সহিত আপনার প্রেমকে যুক্ত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। 'এবার ফিরাও মোরে' প্রভৃতি কবিতার ভিতর দিয়া কবি-মানস জাতির চিরন্তন সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকটিকে অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-মানসের সৌন্দর্য ও প্রেম-প্রতিমাটিকে লাভ করিবার জন্য অভিসার করিয়াছে।

(ত)

প্লেটোর সৌন্দর্য ও প্রেমের দর্শনে, দান্তের অমর প্রেম কাব্যে, শেলির বিচিত্র প্রেমের কবিতায় যেমন একটি উর্ধ্বাভিসারের তত্ত্ব আছে, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য ও প্রেম বোধের ক্ষেত্রে এই জাতীয় উর্ধ্বাভিসারের কোন তত্ত্ব নাই। এই দিক দিয়া বরং কীটশের সহিত তাহার স্বাধর্ম্যের মিল অনেকটা বেশি।

নিখিল বিশ্বের অন্তহীন সীমা রূপের ভিতর দিয়া অসীমের আনন্দ ও প্রেমই নিয়ত প্রকাশ লাভ করিতেছে, অন্যদিকে সকল সীমারূপ অসীমের অপরি-মিতিকে প্রকাশ করিতেছে বলিয়া সীমা মাত্রই সুন্দর। এই প্রেম ও সৌন্দর্য-বোধের মধ্যে ক্রমিক উর্ধ বা নিম্নাভিসারের কোন তত্ত্ব নাই। দুই ওতপ্রোত হইয়া একটি মাত্র অস্তিত্বকে ঘোষণা করিতেছে।

তাঁহার একটি অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি।

"অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং প্রতিধ্বনি রূপে সমস্ত দেশ কাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দ স্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক

দ্বিগুণতর আনন্দ। বিশ্ব কবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটিকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে, আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয় রূপে জানিতে পারি। যেখানে আমাদের সেই উপলব্ধি সেইখানে আমাদের প্রীতি; সেখানে আমাদেরও মন সেই অসীমের অভিমুখীন আনন্দ স্রোতের টানে উতলা হইয়া সেই দিকে আপনাকে ছাড়িয়া দিতে চায়। সৌন্দর্যের ব্যাকুলতার ইহাই তাৎপর্য। যে-সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট; তাহার যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘর ছাড়া করিয়া দেয়।" (জীবন স্মৃতি)।

(খ)

দেহ রূপের চরমোৎকর্ষতার ধ্যানই কালিদাসের কাব্যে সূক্ষ্মতা ও চারুতা লাভ করিয়াছে। কালিদাসের সমগ্র রচনায় সৌন্দর্য্য-ধ্যানের যে একটি ধীর বিকাশের পরিচয় লাভ করা যায় নিম্নে তাহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

চেতনা লব্ধ উর্ব্বশীকে প্রত্যক্ষ করিয়া রাজা বলিতেছেন, "ইহাতে বিস্ময়ের কী আছে, যে ঋষি নারায়ণের উরু জাত ইঁহাকে দেখিয়া প্রলুব্ধকারী সুর-কামিনীগন সকলেই লজ্জিত হইয়াছিলেন। কিংবা সম্ভবত ইনি ঋষি সৃষ্ট হইতেই পারেন না।

কারণ, কিরণ-বর্ষণকারী চন্দ্র, অথবা একমাত্র অনুরক্ত স্বয়ং মদন, অথবা পুষ্পমাস কি তাঁহাকে নির্মাণ করিয়াছেন? করণ বেদাভ্যাস জড় এবং ইন্দ্রিয় সুখ বিমুখ প্রাচীন ঋষি এমন মোহন রূপ সৃষ্টি করিবেন কি করিয়া?" রাজা মালবিকার বিস্মিত সৌন্দর্যের যে বর্ণনা দিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"তাঁহার নয়ন দুইটি দীর্ঘ, আননে শারদ চন্দ্রের কান্তি। বাহু দুইটি স্কন্ধে আনত, স্তনযুগল সংক্ষিপ্ত, নিবিড় এবং উন্নত, দুটি পার্শ্ব যেন মসৃন, পানি-পরিমিত কটিদেশ, জঘনদেশ গুরু, পদাঙ্গুলি সুঠাম····ইত্যাদি।"

যক্ষপ্রিয়ার রূপের বর্ণনাটি এইরূপ:—

"যাহার শরীর কৃশ, যৌবনের মধ্যম অবস্থা, দন্তসমূহ পরস্পর সম্মিলিত

এবং সূক্ষ্মাগ্র, পক্ববিম্বফলের ন্যায় আরক্তিম ওষ্ঠ, কটিদেশ ক্ষীণ, চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চল দৃষ্টি, নাভি গভীর, শ্রোণিভারে গমন মন্থর এবং স্তনভারে ঈষৎ আনত,—এইরূপে যে রমনী যুবতীগণের মধ্যে বিধাতার প্রথম সৃষ্টির ন্যায়.... ইত্যাদি।"

প্রণয়মুগ্ধ রাজা শকুন্তলার অনুরূপ বর্ণনা দান করিয়াছেন,—

"যখন তাহার দেহখানির কথা ভাবি ও বিধাতার ক্ষমতার কথা চিন্তা করি তখন মনে হয় বুঝি বা বিধাতা চিত্র অঙ্কনের পর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া অথবা মনে মনে জগতের সকল সুন্দর সামগ্রী একত্রে সমাবেশ করিয়া দ্বিতীয় স্ত্রী-রত্ন সৃষ্টি করিয়াছেন।"

কালিদাসের রচনা হইতে নারী সৌন্দর্য-ধ্যানের যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম তাহা মুখ্যত নারীর শরীরী সৌন্দর্যেরই ধ্যান। যে এক আদি সৌন্দর্য নিখিল বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া অন্তহীন রূপে রূপে নিরন্তর আপনাকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে, যে সৌন্দর্যে নিখিল বিশ্ব ও মানব সংসার বিধৃত, মানুষের অন্তশ্চেতনায় ক্ষণে ক্ষণে যাহার সূক্ষ্ম ছায়াপাত ঘটিয়া যায়, মানুষ আপনার সকল রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া যুগে যুগে যাহার আভাস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য নিরলস প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া চলিয়াছে, কালিদাসের সৌন্দর্য্য-ধ্যান রূপের সীমাকে অতিক্রম করিয়া সেই অপরূপে ক্ষণে ক্ষণে বিগলিত হইয়া যায় না। তাহা বিশ্বের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে এক ঠাঁই একটি বিগ্রহাশ্রয়ী হইয়া দেখিবার ব্যাকুলতা।

এখন পাশ্চাত্য কয়েকজন কবির কাব্য হইতে নারীর সৌন্দর্য্য ধ্যানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিতেছি।

দান্তে বিয়াত্রিচের যে অলৌকিক মাধুর্য মণ্ডিত রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বর্ণিত রূপের মধ্যে ব্যাপ্ত মহিমার দিকটি সুন্দর ভাবে পরিস্ফুট হইলেও তাহা সম্পূর্ণ পার্থিব বোধ মুক্ত। জাগতিক মোহ মুক্ত এই সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাই স্পষ্ট রেখা-বন্ধনে জীবন্ত হইয়া উঠে নাই। প্লেটোর মত তিনি বিশ্বাস করিতেন, পুরুষ নারীর মধ্যে এই জাতীয় সৌন্দর্য্যকে তখনই প্রত্যক্ষ করে যখন সে সেই রূপের সীমা, ইন্দ্রিয় বোধের আশ্রয়কে সম্পূর্ণ রূপে ছাড়াইয়া উঠে। ইহা সত্তার আত্মিক সৌন্দর্যের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার।

"Oft have I seen, when break of day was nigh,
The orient flushing with a rose-red gleam,

The rest of heaven adorned with calm blue sky,
Seen the sun's face rise shadowy and dim
Through veils of mist, so tempering his powers,
The eye might long endure to look on him ;
So, even so, through cloud of flowers
Flung from angelic hands and falling down
Over the car and all around in showers,
In a white viel beneath an olive-crown
Appeared to me a lady cloaked in green,
And living flame the colour of her gown ;
And instantly, for all the years between
Since here mere presence with a kind of fright
Could awe me and make my spirit faint with in,
There came on me, needing no further sight,
Just by that strange, out flowing power of hers,
The old, old love in all its mastering might."

এই সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত বৈদিক উষা বর্ণনার কতকটা সাদৃশ্য থাকিলেও সে প্রকাশ আরো সুদূর ব্যাপ্ত ও গভীর, ধ্যানগম্ভীর, অনেক বেশি সজীব বলিয়া বোধহয়।

দান্তের এই অশরীরী সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর ধ্যানের পরিচয় লাভ করা যায় শেলির কাব্যে। তাহা বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের উপর লঘু চঞ্চল ছায়াপাত করিয়া এই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছে। আবার এই কারণে তাহা একটি বিগ্রহের মধ্যে স্পষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। শেলির এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের পরিচয় লাভ করিতে তাঁহার 'Alastor' কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। অংশটি পাঠ করিবার কালে অনিবার্য ভাবে রবীন্দ্রনাথের কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতাটি স্মরণে পড়িবে। তাহাতে উভয় কবির সৌন্দর্য-ধ্যানের মর্মগত পার্থক্য কতকটা অনুভব করিতে পারা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-ধ্যান একদিকে যেমন স্পষ্ট রূপ লইয়া একান্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি তাহা আবার অন্তহীন বিস্ময় এবং সেইহেতু অপ্রাপণীয়ের চিরন্তন বেদনা বিজড়িত হইয়া অলৌকিক করুণ কোমল হইয়া উঠিয়াছে।

"He dreamed a veiled maid
Sate near him, talking in low solemn tones.
Her voice was like the voice of his own soul
Heard in the calm of thought; its music long,
Like woven sounds of streams and breezes, held
His inmost sense suspended in its web
Of many-coloured woof and shifeting hues.

* * *

—Wild numbers then
She raised, with voice stifled in tremulous sobs
Subdued by its own pathos: her fair hands
Were bare alone, sweeping from some strange harp
Strange symphoney, and in their branching veins
The eloquent blood told an ineffable tale.
The beating of her heart was heard to fill
The pauses of her music, and her breath
Tumultuously accorded with those fits
Of intermitted song. Sudden she rose,
As if her heart impatiently endured
Its bursting burthen: at the sound he turned,
And saw by the warm light of their own life
Her glowing limbs beneath the sinuous veil
Of woven wind, her outspread arms now bare,
Her dark locks floating in the breath of night,
Her beamy bending eyes, her parted lips
Outstretched, and pale, and quivering eagerly.
His strong heart sunk and sickened with excess
Of love. He reared his shuddering limbs and quelled
His gasping breath, and spread his arms to meet
Her panting bosom...she drew back a while,
Then, yielding to the irresistible joy,
With frantic gesture and short breathless cry
Folded his frame in her dissolving arms.
Now blackness veiled his dizzy eyes. and night
Involved and swallowed up the vision; sleep,
Like a dark flood suspended in its course,
Rolled back its impulse on his vacant brain."

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রকাশ রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার অনুরূপ আর একটি বিশিষ্ট চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় কীটশের 'Endymion' কাব্যের মধ্যে। নিম্নে তাহারও কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"Again I looked, and, O ye deities,
Who from Olympus watch our destinies!
Whence that completed form of all completeness?
Whence came that high perfection of all sweetness?
Speak, stubborn earth, and tell me where, O where
Hast thou a symbol of her golden hair?

*　　　*　　　*

Yet she had,
Indeed, locks bright enongh to make me mad;
And they were simply gordian'd up and braided,
Leaving, in naked comeliness, unshaded,
Her pearl round ears, white neck, and orbed brow;
The which were blended in, I know not how,
With such a paradise of lips and eyes,
Blush finted cheeks, half smiles, and faintest sighs
That, when I think there on, my spirit clings
And plays about its fancy, till the stings
Of human neighbourhood envenom all.
Unto what awful power shall I call?
To what high fane? Ah! see her hovering feet—
More bluely vein'd. more soft, more whitely sweet
Then those of sea born Venus, when she rose
From out her cradle shell."

যে এক পরিপূর্ণ, অখণ্ড সত্তা নিকটতম তৃণ পুষ্প হইতে সুদূরতম নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্যের মধ্যে নিত্য লীলা করিতেছে, বিশ্বের সকল রূপের ভিতর দিয়া যে ক্ষণে ক্ষণে তাহারই আভাস লাভ করা যায়, অথচ তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে কোথাও লাভ করিতে পারা যায় না এই বোধের ক্ষেত্রে শেলি, কীটশ এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সাদৃশ্য আছে বটে, কিন্তু কাব্য-রূপের মধ্যে ব্যবধান যথেষ্ট।

কীটশ এবং শেলির কাব্য হইতে যে দুইটি অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার

সহিত সোনারতরীর 'মানস সুন্দরী' অথবা চিত্রার 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতা মিলাইয়া পাঠ করিলে ইহার সত্যতা স্বতই প্রতীয়মান হইবে। সে সৌন্দর্য-ধ্যান একদিকে যেমন প্রাণের আবেগে কম্পিত, তেমনি অন্যদিকে তাহা আবার মুহূর্তে মুহূর্তে নির্বিশেষ এক সৌন্দর্য-সত্তার মধ্যে বিগলিত হইয়া যাইতেছে। তাহা ছাড়া বিশ্বের বিচিত্র রূপ যেখানে বিচিত্র দর্পন স্বরূপ হইয়া একই রূপকে নানাভাবে প্রতিফলিত করিতেছে এবং এইরূপে ধ্যান-নেত্রে একটি সমগ্রতার আভাস ফুটাইয়া তুলিতেছে সেই বিচিত্র রূপ বিন্যাস রবীন্দ্র-কাব্যে যে রূপ সংহত এবং এইরূপে সমগ্র কাব্যখানি এক জৈবিক অখণ্ডতার ভিতর দিয়া যে ভাবে রূপক ধর্মিতা লাভ করিয়াছে, তেমন প্রকাশ শেলি এবং কীটশের উদ্ধৃত অংশ দুইটির মধ্যে নাই।

রোমান্টিক কবিদের পরবর্তী Pre-Raphaelite কবিদের মধ্যে একমাত্র রোসেটির কাব্যে দেহ ও আত্মার সৌন্দর্যের মিলন সাধনের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, বিশ্বের সমস্ত কিছু, সমুদ্র, আকাশ বা নারীর মধ্যে সৌন্দর্যের একই তত্ত্ব বিদ্যমান। ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ এবং অপ্রকাশের ভিতর দিয়া ইহা মানব মনে চির অতৃপ্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়,তাহাকে নিত্য উৎসুক করিয়া তুলে।

এই সৌন্দর্য প্রেরণার সহিত প্রেমের বোধ অনিবার্যভাবে বিজড়িত। এই সৌন্দর্যবোধের জন্য তিনি নারী রূপের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হন। তাঁহার প্রেমে খ্রীষ্টান ধর্ম তত্ত্ব বা প্লেটোনিক ভাবনার মত দেহকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টা নাই। তিনি প্রেমে দেহ ও আত্মা উভয় পিপাসাকে চরিতার্থ করিতে চহিয়াছেন।

প্রেমের ধারণায় রোমান্টিক কবিদের একপ্রান্তে আছেন ডন (Donne) এবং অন্য প্রান্তে শেলি। একদিকে মুখ্যতঃ দৈহিক সৌন্দর্য, অন্যদিকে মুখ্যত আত্মিক সৌন্দর্য। রোসেটির মধ্যে উভয় সৌন্দর্যের মিলন সাধনের চেষ্টা আছে। তিনি বিশ্বাস করিতেন উভয় সৌন্দর্যের পশ্চাতে একই সুষমার তত্ত্ব বিদ্যমান। তিনি জানিতেন যে অধ্যাত্ম-সৌন্দর্যকে কেবলমাত্র দেহ-রূপের ভিতর দিয়াই লাভ করিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমকে লাভ করিতে চাহিয়া পরিণামে বাস্তব সৌন্দর্য ও প্রেমকে একপ্রকার অস্বীকারই করিয়াছেন।

(দ)

"কোন্ ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্র মন্থনে
উঠেছিল দুই নারী
অতলের শয্যাতল ছাড়ি।
একজন উর্বশী, সুন্দরী,
বিশ্বের কামনা-রাজ্যে রাণী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।" (বলাকা)

রবীন্দ্র-কাব্যে সৌন্দর্য ও প্রেম বোধের প্রথম সার্থক প্রকাশ দেখি মানসী কাব্যে বিশেষ করিয়া 'মেঘদূত' এবং 'অহল্যার প্রতি' কবিতা দুইটির মধ্যে।

এক পরিপূর্ণ বা অখণ্ড সৌন্দর্যই দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন খণ্ড রূপের ভিতর দিয়া নিয়ত প্রকাশ লাভ করিতেছে। সকল খণ্ড রূপের মধ্যে সেই এক আদি সৌন্দর্যের প্রতিভাস বা বিচ্ছুরণ। তাহারই প্রভায় সমস্ত কিছু ভাস্বর, তাহারই আভায় সমস্ত কিছু উদ্ভাসিত। এই দৃষ্টি প্লেটোনিক ধারণা হইতে বিলক্ষণ। নিখিল বিশ্বের মধ্যে যে রূপের প্রকাশ তাহা তাঁহার মতে দিব্য সৌন্দর্যের অনুকরণ মাত্র। চিত্রকর যেমন করিয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্ট রূপকে চিত্রফলকে রূপায়িত করেন ইহা কতকটা তেমনি। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির ক্ষেত্রে বহিঃ সৌন্দর্য বিচ্ছিন্ন কোন প্রকাশ রূপ নয়, দিব্য সৌন্দর্যই স্বয়ং পার্থিব সৌন্দর্য্য রূপে প্রকাশমান।

এই যে স্বর্গ হইতে মর্ত-লোক পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য্য, যাহা নিত্য নব রূপে মানব চিত্তকে অভিভূত করিয়া তুলিতেছে, তাহাকে একটি বিগ্রহের মধ্যে এক ঠাঁই প্রত্যক্ষ করিবার যে বিশিষ্ট ব্যাকুলতা রবীন্দ্র-কাব্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় তাহাও প্লেটোনিক উপলব্ধি হইতে পৃথক। প্লেটোনিক দর্শন যে সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিতে চায় তাহা বিশিষ্ট টাইপ সৌন্দর্য, তাহা আদৌ মর দৃষ্টিতে

উদ্ভাসিত নয়। তাহাকে কেবল আমরা স্বপ্নে চকিতের জন্য প্রত্যক্ষ করি। চিত্ত-ফলকে তাহারই বিদ্যুৎছবি প্রতিফলিত হইয়া যায়। ধ্যানে, প্রজ্ঞার আলোকে তাহাকে আমরা মুহূর্তের জন্য প্রত্যক্ষ করি মাত্র। মর জগতে তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

'মেঘদূত' কবিতার সেই অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি, যাহার মধ্যে কবি অখণ্ড সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"অনন্ত বসন্তে যেথা নিত্য পুষ্প বনে
নিত্য চন্দ্রালোকে, ইন্দ্রনীল শৈলমূলে
সুবর্ণ সরোজফুল্ল সরোবর কূলে
মণি-হর্মে অসীম সম্পদে নিমগণা
কাঁদিতেছে একাকিনী বিরহ বেদনা।
মুক্ত বাতায়ন হতে যায় তারে দেখা—
শয্যা প্রান্তে লীন তনু ক্ষীণ শশীরেখা
পূর্ব্ব গগণের মূলে যেন অস্ত প্রায়।" (মেঘদূত)

অসীমের মধ্যে পরিপূর্ণতার মধ্যেও যে বেদনা আছে, একথা রবীন্দ্র-কাব্যেই আমরা প্রথম লাভ করি। অসীম যে এই অলৌকিক বেদনা বা করুণার ভিতর দিয়া নিয়ত সীমাকে লাভ করিতে চাহিতেছে। তিনি যে সীমার দর্পণে আপনার অসীম অতুল মাধুর্য্যকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল।

এই পরিপূর্ণ শ্রীকে কেবল ধ্যানে বা স্বপ্নে চকিতে লাভ করিয়াই কবি পরিতৃপ্ত নন, কিংবা তাহাকে স্থায়ীরূপে লাভ করিবার জন্য অতি জাগতিক বোধের জগতে অভিসার করিতেও তিনি ইচ্ছুক নন, তাহাকে বাস্তবে একটি নারী বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল। সেই সাক্ষাৎকারের মধ্যে মর জীবনের মর দৃষ্টির চরম সার্থকতা।

"কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান ?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ ?
কেন প্রেম আপনার নাহিপায় পথ ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস সরসী তীরে বিরহ শয়ানে,
রবিহীন মণিদীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদীগিরি সকলের শেষে।" (মেঘদূত)

ইহা যে প্লেটোনিক পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকাজ্ক্ষা নহে তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না। প্লেটোর উপলব্ধি মতে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকাজ্ক্ষা মৃত্যুর পর কেবলমাত্র দিব্য-জগৎ লাভের ফলেই সম্ভব। দেহ-বন্ধন মুক্ত হইয়া প্রজ্ঞার আলোকে তাহাকে হয়ত প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়; কিন্তু সেই বোধ-দৃষ্টিতে জীবনের এই ব্যাকুলতা তো আর থাকে না। মানবিক বোধ সীমিত বলিয়া তাহার চেতনাকে ঘিরিয়া প্রেমের এমন আশ্চর্য প্রকাশ।

নিখিল বিশ্বের সৌন্দর্য-সার সংগ্রহ করিয়া তিনি যে অহল্যা মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"দিলে আজি দেখা
ধরিত্রীর সদ্যোজাত কুমারীর মতো
সুন্দর, সরল, শুভ্র; হয়ে বাক্যহত
চেয়ে আছ প্রভাতের জগতের পানে।
যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানু চুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
যে শৈবাল রেখেছিল ঢাকিয়া তোমায়
ধরণীর শ্যাম শোভা অঞ্চলের প্রায়
বহু বর্ষ হতে, পেয়ে বহু বর্ষাধারা
সতেজ সরস ঘন, এখনো তাহারা
লগ্ন হয়ে আছ তব নগ্ন গৌর দেহে
মাতৃদত্ত বস্ত্রখানি সুকোমল স্নেহে।

*   *   *

অপূর্ব রহস্যময়ী মূর্তি বিবসন,
নবীন শৈশবে স্নাত সম্পূর্ণ যৌবন—
পূর্ণ স্ফুট পুষ্প যথা শ্যাম পত্র পুটে
শৈশবে যৌবনে মিশে উঠিয়াছে ফুটে
এক বৃন্তে। বিস্মৃতি সাগর নীল নীরে
প্রথম উষার মতো উঠিয়াছ ধীরে।" (অহল্যার প্রতি)

অহ ার সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত অহল্যার অতীত সকল জীবন পর্যায়ের

স্মৃতি বিজড়িত। জড় লোক হইতে তৃণ-তরু-লতা প্রাণী-লোকের ভিতর দিয়া যে বর্তমান মনোধর্ম বিশিষ্ট মানস-চেতনার উদ্ভব ঘটিয়াছে সেই সকল অতীত ও বর্তমান চেতনা পর্যায়ের স্মৃতি অহল্যার সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত বিজড়িত। কেবল তাহাই নয়, মানব সভ্যতা সে সুদূর অতীতকাল হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে সেই সকল অতীত সভ্যতার স্মৃতিও ইহার সহিত বিজড়িত। পরিশেষে সমগ্র পৌরাণিক সৌন্দর্য বিজড়িত হইয়া অহল্যার সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্চর্য সমুন্নতি ও প্রসারতা লাভ করিয়াছে। অতীত সকল দেশ, সকল কাল যেন এক ঠাঁই সংহত হইয়া কবির ধ্যান-দৃষ্টির সম্মুখে এক অলৌকিক উপায়ে ভাসিয়া উঠিয়াছে।

সৌন্দর্য বোধের অনুরূপ অনুপ্রেরণার পূর্ণতর প্রকাশ রূপ লক্ষ্য করিতে পারা যায় ইহার পরবর্তী কাব্য সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী' কবিতার মধ্যে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা পরিণামে বিশ্বময় পরিব্যাপ্তি লাভ করে। ইহা একপ্রকার অলৌকিক অবস্থা। এই একাত্মতার মুহূর্তে নিঃসন্দেহে মানুষের মন ও বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে স্তম্ভিত। তাহার পর মানব মন যখন কতকটা সচেতন হয় তখন আবিষ্ট চিত্তের উপর দিয়া ওই বোধাশ্রয়ী বিচ্ছিন্ন রূপের ধারা স্রোতোধারার ন্যায় বহিয়া যাইতে থাকে। মন যখন আরো কতকটা সচেতন হয় তখন ওই রূপগুলির মধ্যে কতকগুলিকে সে গ্রহণ করে কতকগুলিকে বর্জন করে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন রূপ-কল্পনা একটি আবেগ সূত্রে গ্রথিত হইয়া একটি অখণ্ড রূপ-কল্পনায় ফুটিয়া উঠে।—পরিপূর্ণ সৌন্দর্যোপলব্ধির একটি প্রকাশ-রূপ। সমগ্র কবিতা এইরূপে একটি চিত্র-রূপ বা প্রতীকে পরিণত হয়।

নিম্নে উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে যে বিচিত্র রূপ-কল্পনা আছে, তাহা একটি ভাবাবেগের প্রবল আকর্ষণে এমন একটি অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে যাহার ফলে এই সকল বিচ্ছিন্ন রূপ একটি স্থির রূপকেই যেন নানা ভাবে আভাসিত করিয়া তুলে। ফলে ওই সকল বিচ্ছিন্ন রূপকে একটি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপের মধ্যে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য রূপে জাগে।

উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে পরিপূর্ণ রূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারকে কবি কেবল মূর্ত একটি রূপ দান করিতেই সমর্থ হন নাই, তাহা সেই সঙ্গে একপ্রকার নিখিল ব্রহ্মাণ্ডময় ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে। নিখিল বিশ্ব যে অর্থে অরূপের রূপক, উদ্ধৃত অংশটি সেই পরমাশ্চর্য রূপকের মহিমা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

কবি বা শিল্পী এইরূপে যে পরিপূর্ণ রূপকে অপরোক্ষ করেন, তাঁহারই আনন্দ প্রেরণায় কাব্য বা শিল্প-রূপের মধ্যে তাহারই কিছু আভাস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের চেষ্টার অন্ত থাকে না।

"এখন ভাসিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্ত্যভূমি
করিছ বিহার; সন্ধ্যার কনক বর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেখলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে
ললিত যৌবন খানি, বসন্ত-বাতাসে
চঞ্চল বাসনা ব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে
করিছ প্রকাশ; নিষুপ্ত পূর্ণিমা রাতে
নির্জন গগণে, একাকিনী-ক্লান্ত হাতে
বিছাইছ দুগ্ধ শুভ্র বিরহ-শয়ন;
শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন
শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভুলে গিয়ে শেষে,
তরুতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে
গভীর অরণ্য ছায়ে উদাসিনী হয়ে
বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে
কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকাল বেলায়
বসন বয়ন কর বকুল তলায়;
অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে
ঘন পল্লবিত কুঞ্জে সরোবর তীরে
করুণ কপোত কণ্ঠে গাও মুলতান;
কখন অজ্ঞাতে থাকি ছুঁয়ে যাও প্রাণ
অকৌতুক; করি দাও হৃদয় বিকল,
অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল
কলকণ্ঠে হাসি, অসীম আকাঙ্ক্ষা রাশি
জাগাইয়া প্রাণে, দ্রুত পদে উপহাসি'
মিলাইয়া যাও নভো নীলিমার মাঝে।" (মানস সুন্দরী

এইরূপে রূপকের আশ্রয়ে কবি যাহাকে আভাসে নানা দিক হইতে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অন্তহীন রূপের মধ্যে যে অতল রূপ রাশির অস্থির অস্থির চকিত প্রকাশ, তাহাকে তিনি আবার বহির্জগতে একটি রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার ব্যাকুলতায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়াই অতি জাগতিক সৌন্দর্য ও প্রেম এবং জাগতিক সৌন্দর্য-প্রেমের মধ্যে নিঃসংশয় যোগের উপলব্ধিটিই সকল বাধা-বন্ধ-মুক্ত অবস্থায় আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বলিয়াছি, এই যোগের রহস্য ভেদের জন্য অতি গভীর অধ্যাত্ম-সংগ্রাম রবীন্দ্র-কাব্যে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া এক জাতীয় চিন্তাধারা জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া অতি জাগতিক সত্যে স্থিত হইতে চাহিয়াছে। বিপরীত ভাবে আর এক জাতীয় চিন্তাধারা কেবল মাত্র জীবন ও জগৎকেই সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই উভয়ের চরম সত্যতা এবং যোগকে স্বীকার করেন। কেবল তাহাই নয়, যোগের ভিতর দিয়া জাগতিক সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধই ক্রমিক গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে, তাহার মধ্যে ক্রমিক গভীরতর তাৎপর্য, মাধুর্য ও বিস্ময়ের যে প্রকাশ ঘটিতেছে —এই সম্পর্কিত নিঃসংশয় উপলব্ধি।

"সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর একধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি?" (মানস সুন্দরী)

কবির পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের এই যে ধ্যান তাহা নিঃসন্দেহে কেবল মাত্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া আছে। কবির কাব্য-ধারায় পূর্ব্বাপর এই জাতীয় সৌন্দর্য-ধ্যান মুখ্য রূপে প্রকাশ লাভ করিলেও, এই সঙ্গে আর একটি প্রেরণাও অবিচ্ছিন্নভাবে বহিয়া গিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়, যে প্রেরণায় কবি এমন একটি পরিপূর্ণ সৌন্দয-সত্তা লাভ করিতে চাহিয়াছেন যাহা নিখিল বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব-সংসারকে আশ্রয় করিয়া এক যোগে প্রকাশিত। এই জাতীয় সৌন্দর্য প্রেরণার

একটি প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্যে। তিনি সে ক্ষেত্রে যাহাকে 'নিরুপমা সৌন্দর্য-প্রতিমা', কিংবা 'বিশ্ব বিজয়িনী পরিপূর্ণা প্রেম মূর্তিখানি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,—তাহার প্রকাশ তো কেবলমাত্র বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যেই ঘটিতেছে না, নিখিল মানব-সংসারের বিচিত্র দুঃখ মূর্তির ভিতর দিয়াও ঘটিতেছে।

কর্মময় বিপুল প্রকাশমান যে জগৎ তাহা যে বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত অবিচ্ছিন্ন ভাবে যুক্ত তাহা কবি নিঃসংশয়ে বোধ করিয়াছেন। অন্যদিকে ইহাও তিনি বোধ করিয়াছেন যে মানব-সংসার এবং প্রকৃতি-লোকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন রূপে যে রূপের প্রকাশ এই সমস্ত কিছুর গভীরে তাহার একটি স্থির ধ্যান-রূপ আছে।

"অনিমেষ
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যা শিরোদেশে
সারা সুপ্ত-নিশি, সুর নর স্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—।" (আবেদন)

সকল দেশ-কালাতীত সেই অচঞ্চল অখণ্ড সত্তা, যাহাকে তিনি বলিয়াছেন, 'সুর নর স্বপ্নাতীত নিদ্রিত শ্রী অঙ্গ',—ইহা তাহারই ধ্যান। সেই দেশ-কালাতীত সত্তা দেশ-কালের পরিসীমায় অন্তহীন রূপে রূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু এই অখণ্ড সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটিয়াছে, ইহার সহিত যোগ অনুভূত হইয়াছে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া। দেশ-কালের ভিতর দিয়া প্রবাহিত বৃহৎ মানব সংসারের প্রবাহ হইতে এই সৌন্দর্য্য-লোক বিচ্ছিন্ন। প্রাকৃতিক বিচিত্র সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া তাহারই ধ্যান তন্ময়তাকে আশ্রয় করিয়া এই অপর সৌন্দর্যকে মূহূর্তে মুহূর্তে অপরোক্ষ করা হইয়াছে। এই সৌন্দর্য লক্ষ্মীর যে শ্বেত ধবল প্রাসাদ এবং তাহারই অন্তর্গত যে বিচিত্র সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যেরই শ্রেষ্ঠ ভাগ, তাহারই নির্য্যাস স্বরূপ। ইহা সকল বিরূপতা, রূঢ়তা, মালিন্য এবং দুঃখকাতরতা মুক্ত প্রকৃতির সৌন্দর্য-ধ্যান।

দেশ-কালের অতীত যে সৌন্দর্য তাহা যেন স্বয়ং প্রকাশ নয়! তাহার চিরনিদ্রিত শ্রী অঙ্গকে যে অনিমেষ দীপ শিখা উদ্ভাসিত করিয়াছে তাহা দেশ-কালের অন্তর্গত অন্তহীন রূপের জগৎ। দেশ-কালের মধ্যে নিয়ত চঞ্চল যে

রূপ তাহাকে সকল দেশ-কাল সমেত সমগ্ররূপে দেখিলে চিরস্থির বলিয়া বোধ হয়। এই রূপের জগৎ না থাকিলে অরূপ অনুদ্ভাসিত থাকিয়া যাইত!

জ্যোৎস্না রাত্রের মধ্যে যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহা একান্ত রূপে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া প্রকাশিত।

"মৌন শান্ত অসীমতা নিশ্চল সাগর,
তারি মাঝখান হতে উঠে এস ধীরে
তরুণী লক্ষ্মীর মতো হৃদয়ের তীরে
আঁখির সম্মুখে।" (জ্যোৎস্নারাত্রে)

কিংবা

"—নন্দন বনের মাঝে
নির্জন মন্দিরখানি—সেথায় বিরাজে
একটি কুসুম শয্যা, রত্নদীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্ব সোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা।" (জ্যোৎস্নারাত্রে)

দেশ-কালের অতীত যে অচঞ্চল সৌন্দর্য-সত্তাটিকে তিনি 'সুর নর স্বপ্নাতীত নিদ্রিত শ্রী অঙ্গ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সেই পরিপূর্ণা সৌন্দর্য লক্ষ্মীকে তিনি জ্যোৎস্না রাত্রে কবিতার মধ্যে 'বিশ্ব সোহাগিনী লক্ষ্মী জ্যোতির্ময়ী বালা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই। এক্ষেত্রেও 'রত্নদীপালোকে'র নিহিত তাৎপর্যটি লক্ষনীয়। এক্ষেত্রেও এই পরিপূর্ণা সৌন্দর্য-প্রতিমাটিকে তিনি কেবল বিচিত্র প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে অপরোক্ষ করিয়াছেন। তবে আবেদন কবিতার মধ্যে বহির্লোক এবং অন্তর্লোক এক সাম্রাজ্ঞীর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইলেও দুটি সত্তা যেন স্পষ্টই বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। 'জ্যোৎস্না রাত্রে' কবিতার মধ্যে দেশ-কাল অন্তর্গত প্রাকৃতিক খণ্ড সৌন্দর্য এবং দেশ-কালের অতীত অখণ্ড সৌন্দর্যের মধ্যে নিবিড় যোগ অনুভূত হইয়াছে। রুদ্ধ দ্বার কক্ষের বিচিত্র উৎসব আনন্দের, তাহারই বিচ্ছিন্ন ধ্বনি ও সুর, তাহারই বিচিত্র সুমিষ্ট গন্ধের আভাস যেমন আমরা বাহির হইতে লাভ করি, প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, বিচিত্র রেখা ও রঙ, বিচিত্র ধ্বনি ও সুরের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক আদি সৌন্দর্য-সত্তার বিচিত্র আভাস লাভ করি।

রবীন্দ্রনাথ যে পরিপূর্ণা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে অপরোক্ষ করিয়াছিলেন, যাহার অপরিস্ফুটতা হইতে ধীর পরিস্ফুটতার একটি ধারা এ পর্যন্ত অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহার অত্যন্ত পরিস্ফুট একটি রূপের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইবে 'বিজয়িনী' কবিতার মধ্যে। এই জাতীয় সৌন্দর্য-ধ্যানই রবীন্দ্র-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। ইহা মূর্ত্য, নারী দেহাশ্রয়ী হইলেও ইন্দ্রিয়-প্রাণের সম্পূর্ণ বিক্ষোভ মুক্ত। এক্ষেত্রে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"জল প্রান্তে ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ন কম্পন রাখিয়া,
সজল চরণ চিহ্ন আঁকিয়া আঁকিয়া
সোপানে সোপানে, তীরে উঠিলা রূপসী—
স্রস্ত কেশভার পৃষ্ঠে পড়ি গেল খসি।
অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের তরঙ্গ উচ্ছল
লাবণ্যের মায়ামন্ত্রে স্থির অচঞ্চল
বন্দী হয়ে আছে, তারি শিখরে শিখরে
পড়িল মধ্যাহ্ন রৌদ্র—ললাটে অধরে
উরু 'পরে কটিতটে স্তনাগ্র চূড়ায়
বাহুযুগে, সিক্ত দেহে রেখায় রেখায়
ঝলকে ঝলকে। ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে আগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার, সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি নিল, আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে—ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।" (বিজয়িনী)

দেশ-কালের অতীত যে অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তা তাহাকেই ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে নিম্নরূপ শব্দ সমষ্টির ভিতর দিয়া।

"উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা—
তুমি অকুণ্ঠিতা।"
"বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকাশি"
"কুন্দ শুভ্র নগ্ন কান্তি সুরেন্দ্র বন্দিতা—"
"অকলঙ্ক হাস্যমুখে প্রবাল-পালঙ্কে ঘুমাইতে—"

"স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী—"
"অখিল মানস স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী—"

সেই অখণ্ড পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সত্তাই দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে রূপে প্রকাশমান। এই এক সৌন্দর্যের প্রকাশ মানবিক বিচিত্র বোধ উচ্চতম হইতে নিম্নতম পর্যন্ত সকল চেতনা-পর্যায়ে নানা স্বরূপে উপলব্ধ, নানা ধর্মাশ্রয়ী প্রেরণা-রূপে অনুভূত।

জাগতিক বিচিত্র সৌন্দর্য মানবিক বিচিত্র চেতনা-পর্যায়ে যে বিভিন্ন স্বরূপে উপলব্ধ তাহারই স্বরূপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে নিম্নরূপ শব্দ সজ্জার ভিতর দিয়া।

"ডান হাতে সুধাপাত্র বিষভাণ্ড লয়ে বাম করে—"
"মনিগণ ধ্যানভাঙ্গি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষ ঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল,—"
"তব স্তনহার হতে নভস্থলে খসি পড়ে তারা
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষোমাঝে চিত্ত আত্মহারা
নাচে রক্ত ধারা।"
"জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা—
ত্রিলোকের হৃদি রক্তে আঁকা তব চরণ-শোণিমা।"

এইরূপে উর্বশী কবিতার মধ্যে কবি জাগতিক এবং অতি জাগতিক সৌন্দর্য-সত্তার মধ্যে নিবিড় যোগের উপলব্ধিকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

বিশ্বমানস বা অখিল মানসের মধ্যে যে পরিপূর্ণ অখণ্ড সৌন্দর্য তাহাকেই তিনি 'স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী', অথবা 'অখিল মানস স্বর্গে অনন্ত রঙ্গিনী' ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই সৌন্দর্য-প্রতিমার বিচিত্র রূপের ধ্যান জাতি-চিত্তের ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাতি-চিত্ত আবার ব্যষ্টি-চিত্তের সামগ্রী বলিয়া ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া জাতি-চিত্তের সৌন্দর্য-ধ্যান নানারূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এইরূপে বিশ্বমন জাতি-মনকে এবং জাতি-মন ব্যক্তি-মনকে আশ্রয় করিয়া ক্রমিক গভীর ও ব্যাপক ভাবে আপনাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছে। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া বিশ্ব-মনের পরিপূর্ণ ধ্যান-রূপটি একদিন এই জীবনে এবং এই জগতে সত্য হইয়া উঠিবে, ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক প্রত্যয়।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া আজ নারীর অঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে যে মাধুর্যের

প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার কতটুকু মাধুর্য আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। আমরা নারী এবং প্রকৃতিকে জানি আমাদের বিচিত্র প্রয়োজন, স্বার্থ এবং সংস্কারের দিক হইতে। ইহাতে নারী ও প্রকৃতির প্রকাশ একান্ত খণ্ডিত হইয়া, আচ্ছন্ন হইয়া কোথাও বা বিকৃত হইয়া প্রকাশ পায়। সকল প্রয়োজন ও স্বার্থ, সকল সংস্কার ও নৈতিক-বোধের বাহিরে আসিয়া মানুষ যদি শুদ্ধ রস-দৃষ্টিতে নারী ও প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে তবে তাহার কী দুর্লভ মাধুরী না ফুটিয়া উঠে! কবি বা শিল্পী নারী ও প্রকৃতির সকল বন্ধন-মুক্ত নগ্ন সৌন্দর্যকে ফুটাইবার তুলিবার জন্য নিয়ত সচেষ্ট।

কল্পনার 'স্বপ্ন' কবিতা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবি স্বপ্নে যে সৌন্দর্য-প্রতিমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তাহা কালিদাসের সমগ্র কাব্য মথিত করিয়া গড়িয়া তোলা। কবিতার প্রত্যেকটি রূপ-কল্পনা কালিদাসের কাব্য হইতে সংগৃহীত। সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোক অতীতে একদিন সত্য ছিল। আমরা একদিন তাহার সহিত মিলিত হইয়া ছিলাম। কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্তমানের তীরে আসিয়া পৌছাইয়াছি। তাহার সহিত মিলিত হইতে চাই, কিন্তু পথ হারাইয়া গিয়াছে। তাহার ভাষাও বিস্মৃত হইয়াছি, কেবল অনির্দেশ্য ব্যাকুলতায় অন্তর বিগলিত হইয়া অশ্রু রূপে বাহির হইয়া আসে। বিদ্যুচ্চমকের মত বারংবার কেবল স্বপ্নে তাহার চকিত ছায়াপাত ঘটিয়া যায়। সেই ক্ষণিকমিলন লাভের পর আমরা আবার বাস্তবের রূঢ় মলিন লোকে স্খলিত হইয়া আসি। বাস্তবের দীনতা সেই স্মৃতির আলোকে আরো মলিন হইয়া দেখা দেয়।

কালিদাসের কাব্য-জগৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোক রূপে অনুভূত হয়। তাঁহার মালবিকা এই সৌন্দর্য-লোক মথিত করিয়া উদ্ভূত হইয়াছে। তাহা নারী দেহাশ্রয়ী সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ। ফাউস্ট যেমন করিয়া হেলেনের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন কবি স্বপ্নে তাঁহার প্রেয়সীর সহিত তেমনি করিয়া মিলিত হইয়াছেন।

দেশ-কালের অতীত অখণ্ড সৌন্দর্য-সত্তার সহিত্ দেশ-কালের অন্তর্গত মানবিক বোধের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান ইহা কেবল সেই ব্যবধানকে জয় করিয়া উঠিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সত্তাকে অপরোক্ষ করিবার ব্যাকুলতা নয়। প্লেটোনিক সৌন্দর্য সাধনায় আমরা এই জাতীয় ব্যাকুলতার পরিচয় লাভ করি। জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য অমর-লোকে প্রাকৃত সত্তায় আমাদের যে চিরন্তন মিলন বোধ

তাহারই স্মৃতি অন্তরের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তাহাকেই ফিরিয়া লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলে।

ইহা এক দেশের সহিত আর এক দেশের এক কালের সহিত আর এক কালের ব্যবধান। এই ব্যবধান তো বাস্তবে জয় করিয়া উঠিবার কোন উপায় নাই। আমরা স্বপ্নে মানস অভিসারের ভিতর দিয়া কেবল এই ব্যবধানকে কতকটা জয় করিয়া উঠিতে পারি। তাহাও দুর্লভ কয়েকটি মুহূর্ত্তের জন্য। আবার দেশ-কালের বোধ ফিরিয়া আসে, আবার দেশের ও কালের অনন্ত ব্যবধানের বোধ ফিরিয়া আসে। মুহূর্তের লব্ধ স্মৃতি তখন মায়া বলিয়া বোধ হয়। তাহা কোথাও কি কোন অবস্থায় সত্য ছিল? কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি মায়া? তাহা কি আদৌ চিত্ত বিভ্রম নয়?

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান কবিতাটির মধ্যে সে সৌন্দর্য প্রতিমার ধ্যান করিয়াছেন, তাহাকে তিনি দেশ-কালের অতীত চেতনা-লোকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, তাহাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন চিরকালের অতীত কোন কালে, যে কাল কখন সত্য ছিল না। ইহা রোমান্টিক সৌন্দর্য সাধনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সেই অংশটি এখন পাঠ করা যাইতে পারে—

"হেন কালে হাতে দীপ শিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বার প্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যা তারা করে।
অঙ্গের কুস্কুম গন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।
প্রকাশিল অর্ধচ্যুত বসন অন্তরে
চন্দনের পত্র লেখা বাম পয়োধরে।
দাঁড়াইল প্রতিমার প্রায়
নগর গুঞ্জন ক্ষান্ত নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়।" (স্বপ্ন)

বিচিত্রিতার 'মরিচিকা' কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। রূপকে আশ্রয় করিয়া যে লাবণ্য তাহা পুরুষের চেতনাকে মোহাবিষ্ট করিয়া তাহার অন্তরের মধ্যে এক অপূর্ব সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জগৎ গড়িয়া তুলে। পুরুষের চেতনা-বিহঙ্গম এই সৌন্দর্য-আকাশকে কোন পরিণামে লাভ করিতে পারে না।

নারীর সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে এই যেমন এক সৌন্দর্য-সত্তার উদ্ঘাটন, তেমনি তাহারই আলোক সম্পাতে নিখিলের এক অপরূপ রূপ উদ্ভাসিত হইয়া যায়। ইহা যেন এক যুগল রূপের প্রকাশ; যেন ফুল ও প্রজাপতির মিলন রূপ।

বস্তুত পুরুষের চিত্ত-লোকে গড়িয়া উঠা সৌন্দর্য-সত্তাই একটি অবস্থায় দ্বিধা হইয়া যায়। একটি সত্তা অপর সত্তার সৌন্দর্য ও মাধুর্য মুগ্ধ হইয়া আস্বাদ করে, প্রজাপতি যেমন বিভার হইয়া ফুলের মাধুর্য আস্বাদ ও মধু পান করে।

সৌন্দর্য-সত্তার এই প্রজাপতি অংশটি কখন সৌন্দর্য বক্ষে বিভোর হ য়া অবস্থান করে, তাহাতে নিমগ্ন হইয়া যায়, কখনো বা উড়িয়া উড়িয়া বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য আস্বাদ করে, আবার ব্যাকুল আগ্রহে সেই একটি মাত্র ফুলের বুকে ফিরিয়া আসিয়া বসে। মানব মন সৌন্দর্য স্বপ্নে বিভোর হইয়া কখন বিশ্বময় রূপ হইতে রূপে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, আবার কখন অন্তর্মুখীন হইয়া অন্তরের স্থির সৌন্দর্য-সত্তার ধ্যানে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়া যায়।

নারী রূপের মধ্যে যে সৌন্দর্যের প্রকাশ তাহার একটি অংশ কেমন করিয়া বিশ্বের মাধুরীর মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। আবার পরমুহূর্তে বোধ হয় নিখিল পরিব্যাপ্ত মাধুরী এক অলৌকিক রহস্যের বশে একটি মাত্র রূপকে আশ্রয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে।

নারীর সৌন্দর্যকে তিনি এমনি করিয়া এক পরিব্যাপ্ত মহিমা দান করেন। কবির সৌন্দর্য-ধ্যানের এই বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিপূর্ব্বে বারংবার লক্ষ্য করিয়াছি। পরবর্ত্তী কালেও এই বৈশিষ্টের বহুবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

কালিদাসের তথা সমগ্র প্রাচীন ভারতের সাহিত্য সম্পদ মথিত করিয়া কবির অন্তরে যে একটি অতি সমৃদ্ধ সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠিয়াছিল সেই সমগ্র সৌন্দর্য-লোকটিকে তিনি মাঝে মাঝে একটি নারী রূপের মধ্যে প্রতিফলিত করিয়া তাহাকে আশ্চর্য ব্যাপ্ত মহিমা দান করিতেন। নিম্নে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে কবি-ধর্ম্মের এই বৈশিষ্টের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারা যাইবে। সে সৌন্দর্যের সহিত সমগ্র অতীত সৌন্দর্যের স্মৃতি বিজড়িত; কেবল তাহাই নয়, কখন কখন সমগ্র ভবিষ্যতের সৌন্দর্য ব্যাকুলতাও তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে একটি মুহূর্তের মধ্যে প্রকাশিত সৌন্দর্য-সত্তাকে সকল দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত অসীম সৌন্দর্য-ধ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় সৌন্দর্য-সত্তার ধ্যানে একটি অবস্থায় মানবীয় চেতনাশ্রয়ী দেশ-কালের বোধ পর্যন্ত বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে একটি নারী রূপকে আশ্রয় করিয়া কালিদাসের রূপের অন্তর্লীন সকল মাধুর্যকে আশ্চর্য কৌশলে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এ নারী চিরন্তনী। সকল কালের মানব চেতনায় নারীর এই দুর্লভ মাধুরীর প্রকাশ।

"হে পুষ্প চয়নী,
ছেড়ে আসিয়াছ তুমি কবে উজ্জয়িনী
মালিনী ছন্দের বন্ধটুটে।
বকুল উৎফুল্ল হয়ে উঠে
আজো বুঝি তব মুখমদে।
নূপুর রঞ্জিত পদে
আজো বুঝি অশোকের ভাঙাইবে ঘুম।" (পুষ্পচয়নী)

নারী রূপের মধ্যে একটি দিক আছে সীমার। এই সীমার দিকটি আমাদের চিরকালের চেনা, চির পরিচিত। আমাদের বোধের মধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া পাই। তাহার সহিত আমাদের ভালো লাগা মন্দ লাগা, আমাদের সকল সুখ-দুঃখের সকল মান-অভিমানের রাগ-বিরাগের সম্পর্ক। তাহার সহিত আমরা জাগতিক বিচিত্র স্নেহ সম্পর্কে বাঁধা। এই বিচিত্র সম্পর্ক বন্ধন দিয়া নারীর সকল পরিচয়কে আমরা নিঃশেষ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত থাকি।

রূপের মধ্যে আর একটি দিক আছে যাহা অসীম। দুর্লভ এক একটি মুহূর্তে আমরা রূপের মধ্যে এই অপরূপকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্মিত হইয়া যাই। চিরকালের চেনার ভিতর হইতে চিরকালের অচেনা বাহির হইয়া আসে। তাহা এক অপ্রাপণীয়ের মাধুরী বিজড়িত, তাহা কোন্ দূরকালের কোন্ দূর দেশের সামগ্রী, তাহার সহিত মিলন লাভের পথ তো আমরা জানি না। নিখিল বিশ্বের মাধুরীর মধ্যে সেই মাধুরী। মূর্ত্য সৌন্দর্য কেমন করিয়া অমূর্ত্য সৌন্দর্যে পরিণত হইয়া যায়!

রবীন্দ্রনাথ একথা নানাভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যে সৌন্দর্য নারী কিংবা প্রকৃতি যাহারই হোক-না-কেন, তাহার দুর্লভ মাধুর্য মানুষ তখনই প্রত্যক্ষ করিতে পারে, যখন সে আপনার ব্যক্তি বোধের সীমার বাহিরে আসে। ক্ষণস্থায়ী এই মুহূর্তে বারংবার এই মাধুর্য-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া আবার আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

"তুমি রাগিণীর মত আস যাও
এক তারার তারে তারে।
সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।
তাকে বেড়াই বুকে করে ;
ওতে রং লাগাই, ফুলকাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্বভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে
মিলিয়ে যায় দোলন চাঁপার গন্ধে।"

(শেষ সপ্তক ঃ তেরো)

একটি রূপের পাত্র ভরিয়া নিখিল বিশ্বের রূপ মাধুরী পান করিবার সেই এক ব্যাকুলতা। এইরূপে রূপকে তাহার ঐকান্তিকতা হইতে মুক্ত করিয়া অন্তহীন বিস্ময় বিজড়িত করিয়া দেখিবার চেষ্টা। বীথিকার 'শ্যামলা' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণে পড়িতে পারে।

নির্বাক সন্ধ্যার আকাশে যে স্থির মৌন মহিমা নারীর মুখের মধ্যে তাহারই প্রকাশ। তাহার দৃষ্টিতে কোন্ দূর সমুদ্র পারের আভাস। বিস্তীর্ণ প্রান্তর শেষে গোধূলি বেলায় যে একটি ঘন কালো রেখা অঙ্কিত হইয়া অসীম অতল রহস্য লোকের আভাসে বিধূর হইয়া আসে, নারীর অস্থির কৃষ্ণ তারকায় তাহারই তো প্রকাশ ধরা পড়ে। নিশীথে গগনতল পূর্ণ করিয়া যে নিঃশব্দ সঙ্গীত বাজিয়া উঠে, নারীর ওষ্ঠ পুট যেন সেই অনাহত রাগিনীকে নিত্যধ্বনিত করিয়া তুলে। সেই সুর চিত্তে কোন্ দূর হিমাদ্রির শিখর দেশে হিম শীতল বাণীহীন নির্ঝরের ধ্যানের বারতা বহন করিয়া আনে। জল ভারাক্রান্ত মেঘ তমাল শ্রেণীর উপর যে করুণ, গম্ভীর শ্যাম ছায়া বিকীর্ণ করে নারীর ললাটে তাহারই স্থির মায়া। রাধিকার বিরহ স্মৃতিভারে একান্ত মন্থর, কলশব্দ বিহীন যমুনার মধ্যে যে পরিব্যাপ্ত বিষাদ, সেই চিরবিষাদ নারীর তনু বেষ্টন করিয়া আছে।

কোন কিছুকে আমরা তখনই সুন্দর বলি যখন তাহাকে আশ্রয় করিয়া অসীমের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়। নিখিল বিশ্বের মধ্যে অখণ্ড রূপে যে

সুষমা বিরাজিত, সুন্দর সামগ্রীর মধ্যে সেই একই সুষমার প্রকাশ। বিশ্ব-সুষমার সহিত যাহার মিল আছে তাহাকেই আমরা বলি সুন্দর। সুন্দর সামগ্রী দীপ শিখার মত কেবল আপনাকে নয়, সেই সঙ্গে বিশ্ব সুষমাকে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনা যে পরিণাম লাভ করিয়াছে।

"শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একে বারে—
ছোটো পত্র পুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে—"

নারীর সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনা সেই একই পরিণাম লাভ করিয়াছে।

"সেই দূর আকাশের বাণী—
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক মুখখানি।" (শ্যামলা)

চিত্তে আনন্দ ও রস সঞ্চারের দিক হইতে দেখিলে প্রকৃতির একটি অবহেলিত ফুল এবং নারী সৌন্দর্যের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। দুই-ই বিশ্ব-প্রাণের অহেতুক আনন্দের প্রকাশ।

সঙ্গীতের সুর রূপের মধ্যে অপরূপের প্রকাশ ঘটায় কেমন করিয়া! সুরের জালে বিজড়িত হইয়া জগৎ এমন দুর্লভ মাধুর্য লাভ করে কেমন করিয়া! ব্যক্তির সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা, নিখিলের আনন্দে ব্যথা-বেদনায় কেমন করিয়া রূপান্তরিত হইয়া যায়! এ জিজ্ঞাসা কবি চিত্তে বারংবার নানাভাবে জাগিয়াছে। তিনি ইহার একপ্রকার উত্তরদানও করিয়াছেন। আমরা অধিকাংশ সময় ব্যক্তিগত বোধের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকি। জীবনের প্রসার যে এই বোধের সীমাকে অতিক্রম করিয়া অনন্ত ব্যাপ্ত, এক অসীম রহস্য বিজড়িত তাহা আমরা বোধ করিতে পারি না। জগতের অন্তহীন মাধুর্য আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রহিয়া যায়। একটা ঘেরের মধ্যে জন্মলাভ করিয়া পরিণামে মৃত্যুর মধ্যে হারাইয়া যাই।

সঙ্গীতের সুর মানব চেতনাকে যত ক্ষণকালের জন্য হোক ব্যক্তিগত সীমিত বোধের জগৎ হইতে বাহির করিয়া আনিয়া অসীমের বোধে প্রতিষ্ঠিত করে

বলিয়া জীবন এবং জগৎ এমন আশ্চর্য মাধুর্যে ফুটিয়া উঠে। রূপের তখন আর তল পাওয়া যায় না। জীবন অন্তহীন প্রসার বলিয়া বোধ হয়। এক পরম অস্তিত্বের যোগে সমস্ত কিছুকে অস্তিত্ববান দেখিয়া জীবন এক অপার আনন্দে নিমগ্ন হইয়া যায়। পত্রপুটের পাঁচ সংখ্যক কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুর নিত্যদিনের পরিচয় বিজড়িত বিস্ময়হারা নারীর মধ্যে এক চির অপরিচিত বিস্মিত সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। সে নারী তথ্যের লোক হইতে, বিচিত্র সম্পর্কের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক চির মাধুর্য-লোকে উদ্ভাসিত হইয়া বিরাজ করে।

"শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে ;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘ নিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা। [পত্রপুট : পাঁচ]

রূপ অপরূপের আভাস দান করে বলিয়া তাহাকে বলি সুন্দর। বিশ্বের সমস্ত কিছু সেই অপরূপকেই কোন-না-কোন ভাবে নিয়ত প্রকাশ করিতেছে বলিয়া বিশ্বের সমস্ত কিছু কবির নিকট আজ দুর্লভ মাধুরী বিজড়িত বোধ হইতেছে। সকল রূপের অতীতে বা গভীরে, সকল রূপের বুকের মাঝখানে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্তা বিরাজিত। এই পরিপূর্ণ অখণ্ড সত্তার আভাস, তাহারই দীপ্তি, তাহারই অভিক্ষেপ বিশ্বের অন্তহীন বিচিত্র সৌন্দর্য-সত্তার মধ্যে। তাহারই রূপে ধরিত্রীর শ্যাম শোভা, তাহারই রূপে আকাশ এমন অতল নীল। আর এই আকাশ ও ধরিত্রী পরিপূর্ণ করিয়া যে জ্যোতির নিত্য প্লাবন তাহা তো তাহারই আভার বিচ্ছুরণ। এই স্থির উপলব্ধি, কবির জীবনে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে তাহারই আর একটি পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমার প্রিয়ার সচল ছায়াছবি
সজল নীলাকাশে।
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যা তারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।

বারি ঝরা বনের গন্ধ নিয়া
পরশ হারা বরণ মালা গাঁথে আমার প্রিয়া।
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণ ধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়,
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে।" (সানাই)

কালিদাস একদিন বাস্তবে সত্য ছিলেন, জীব জীবনের সকল দুর্দশাই তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল ; উজ্জয়িনী রাজপ্রাসাদ ঘিরিয়া রাজনীতির যে বিচিত্র কূটিল সঙ্ঘাত তাহা তিনি নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, নানাভাবে তাহার ঢেউ কবির চিত্ত-তটকে স্পর্শ করিয়াছিল। আজ সেই কবি নাই, জীব জীবনের বিচিত্র দশা লইয়া তিনি কতকাল পূর্বে অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছেন। আর তাঁহার প্রিয়ভূমি উজ্জয়িনী, রাজপ্রাসাদ কালস্রোতে তাহার চিহ্নমাত্রও কোন কালে মুছিয়া গিয়াছে।

কিন্তু তিনি অলৌকিক বেদনাকে, যে সৌন্দর্যস্বপ্নকে কাব্যে রূপায়িত করিয়াছিলেন, কালস্রোতে তাহা সকল দেশ-কালের পরিচয় ছিন্ন হইয়া একা ভাসিয়া চলিয়াছে। তাহার নিম্নতটে যুগ যুগ ধরিয়া কত ভাঙাগড়া, কত উত্থানপতন চলিয়াছে, সে বাণী-লোকে তাহার ছায়াপাত মাত্র ঘটিতেছে না।

অনন্ত সৌন্দর্য আপনার বিশিষ্ট একটি রূপকে কবি-চেতনা আশ্রয় করিয়া কবির কাব্যে চিরকালের জন্য রূপ লাভ করিয়াছে। কিংবা বলা যায়, যুগে যুগে মহান কবিপ্রতিভা সেই অনন্ত সৌন্দর্য-প্রতিমাকে কোন একটি উপায়ে অপরোক্ষ করিয়া তাহাকেই সমস্ত জীবনের সাধনার ভিতর দিয়া বাণী-রূপ দান করেন।

পরিব্যাপ্ত দেশ-কাল যেন উদার অসীম বিস্তৃত নিশীথ গগন, আর এইরূপ এক একটি কাব্য সেই অন্ধকার আকাশপটে এক-একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক বিশেষ। কিংবা এই সকল কাব্য মহাকাল স্রোতে ভাসমান এক-একটি বিচ্ছিন্ন তরী কাল হইতে কালে ভাসিয়া চলিয়াছে।

কবির 'মানসী' তেমনি অচরিতার্থ সৌন্দর্যস্বপ্নের এক বাণী-রূপ। কবির জীবন সেই রচনাকাল হইতে কতদূরে সরিয়া আসিয়াছে। একদিন মৃত্যুতে কোথায় তিনি অন্তর্হিত হইবেন, আর সেই পদ্মা, আর তাহার বক্ষে বিচিত্র বর্ণের সাজ পরিহিত ষড়ঋতুর চক্রাবর্তন ; তাহার পরিচয় কবির জীবনে আজ

অবসিত। সেই দেশ আর সেই কাল বিলুপ্ত, কিন্তু সেই দেশ-কাল, কবির সেই যৌবনকে আশ্রয় করিয়া যে অনুভূতি তাহা তাঁহার কাব্যে সকল সূত্র ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে।

কবি তাঁহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্যপ্রতিমাকে স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, আর বোধ করিয়াছেন বিশ্বের বিচিত্র বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া তাহারই কেবল ক্ষীণ আভাস মাত্র লাভ করিতে পারা যায়। সেই সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া কবি স্বপ্নে কত বারংবার কোন্ ঊর্ধ্বে প্রয়াণ করিয়াছেন, সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য। বিচিত্র অলৌকিক উপলব্ধিতে হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বিদীর্ণ হইতে চাহিয়াছে, আবার কোথা হইতে কোন্ আঘাতে মর্ত্য লোকে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ভগ্নপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় ধূলিতলে লুটাইয়াছেন। যৌবনের সেই রক্তশোষণকারী প্রয়াসের কতটুকু পরিচয় কবির কাব্যে ধরা পড়িয়াছে!

কবির প্রথম সার্থক কাব্য মানসীর মধ্যে যে মূল ভাবের প্রকাশ দেখি কবির পরবর্তী কাব্যধারার মধ্যে সেই ভাবের বারংবার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

বহির্জগতে প্রেমের আশ্রয় যখন হারাইয়া যায়, তখন অন্তরে শূন্যতল পরিপূর্ণ করিয়া প্রেমিকের আর এক রূপ ফুটিয়া উঠে। প্রেমে অন্তরের মধ্যে এই যে পাওয়া তাহাই সার্থক পাওয়া। এই মূর্তিই পুরুষের চেতনাকে মুক্তি দেয়, তাহাকে আর আসক্তির বন্ধনে বাঁধে না। এই রূপ মানসধর্মিতা লাভ করে বলিয়া তাহা নিত্য নব রূপতা প্রাপ্ত হয়। মন সেই নিত্য নব রূপ আস্বাদ করিয়া আর শেষ করিতে পারে না। বাহিরের রূপ অন্তরের বিরহ আকাশে এমন এক সুদূর ব্যাপ্ত মহিমা লাভ করে পুরুষের কল্পনা তাহাকে কোন পরিণামে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে পারে না। মর্তের নারী অন্তরে এইরূপে যখন মানসী মূর্তি পরিগ্রহ করে একমাত্র তখনই সেইরূপ বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে আপনার মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। বিশ্বের সকল রূপের সহিত তাহার মিলন ঘটে। একটি রূপের যোগে পুরুষের চেতনা তখন সকল রূপের মাধুর্য আস্বাদ করিতে পারে।

যদি সেই বিরহিনী মূর্তিকে কোন একটি উপায়ে আবার বাস্তবে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায়, তবে তাহার মানসী মূর্তির সহিত বাস্তব মূর্তির আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মানসী মূর্তির মুক্ত স্বরূপের, তাহার ব্যাপ্ত মহিমার, পুরুষের বেদনা দিয়া গড়া দুর্লভ মাধুর্যের কতটুকু পরিচয় বাস্তব নারীর বিশিষ্ট কয়েকটি রেখা-বন্ধনের মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। পুরুষের অন্তরে

নারীর যে মূর্তি বিরহের অনল রেখায় অঙ্কিত হইয়া যায় তাহা চিরকালের জন্য একটি স্থির পরিণাম লাভ করে। বাহিরে রূপের জগতে কত পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, কত উত্থান-পতন কত ভাঙা-গড়া কিন্তু অন্তর্লোকে. সেই মূর্তি চিরন্তনী হইয়া বিরাজ করে। জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত প্রেমে একটি রূপ পুরুষের হৃদয়-আকাশে সত্য হইয়া থাকে। বাস্তব নারী-রূপের মধ্যে নিত্য রূপান্তরতা আছে বলিয়া মানসী মূর্তির সহিত তাহার আর কোথাও মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয়, তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।" (সানাই : মায়া)

বিধাতার যে আদি ধ্যান-রূপ নিখিল বিশ্বে, নারীর দেহে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে রূপকারের তপস্যা বিধাতার সেই আদি ধ্যান-রূপটিকে ধ্যানে অপরোক্ষ করিবার। মনঃ সীমানার পরপারে তাহারই অতি চকিত যে আভাস সে লাভ করে তাহাকেই সে আপনার সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষগোচর করিতে চায়। স্থপতি প্রস্তরপিণ্ডে সেই পলাতকাকে স্থির রূপ দান করিবার দুঃসাধ্য সাধনায় রত।

সংসারের বিচিত্র প্রয়োজনের দ্বারা নারীর প্রকাশ খণ্ডিত। নারীর আপনাকে ঘিরিয়া কত লজ্জা কত ভয় সংকোচ সংশয়। কত সংস্কারের, কত শাস্ত্র বচনের ঘেরের দ্বারা নারীর সত্য প্রকাশ আচ্ছন্ন। রূপকার এই সকল বিধিবিধানের ব্যবধান দূরে ফেলিয়া পুরুষের বিচিত্র ভোগে সীমার অতীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নারীর চিরন্তন ভুবনমনমোহিনী পরিশুদ্ধা নগ্ন সৌন্দর্যটিকে আবিষ্কার করিতে চায়। নারীর রূপের পাত্র ভরিয়া সে সেই অমৃতের আস্বাদ লাভ করিতে চায়। ইহার জন্য তাহার বেদনার অন্ত নাই। এই আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়াই তো পুরুষের কণ্ঠে গান, তাহার বিচিত্র কাব্য, চিত্র, মূর্তি রচনা। দেবালয়ে দেবালয়ে দেবীর স্তুতির মধ্যে পুরুষ-প্রাণের এই এক আকাঙ্ক্ষা। এই যে কালে কালে দেশে দেশে বিচিত্র রূপ সৃষ্টি তাহাতে প্রত্যহের মালিন্যের কোন স্পর্শ নাই। বিশ্বের সকল সৌন্দর্যকে আপনার বেদনার টানে আকর্ষণ করিয়া পুরুষ যে রূপ সৃষ্টি করে তাহাতে রূপ আর অরূপের মিলন ঘটে। নারীর মধ্যে যে পূর্ণ প্রকাশ আচ্ছন্ন বিরহী পুরুষ আপনার

চিত্ত-লোকে তাহারই ছবি ফুটাইয়া তুলিবার জন্যধ্যানমগ্ন। সানাই কাব্যে 'নারী', 'মানসী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবের সুন্দর প্রকাশ রূপটি লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য কবির চির অনালব্ধ রহিয়া গিয়াছে। তাহা কবির নিকট চির অজ্ঞাত। মনের মধ্যে তাহারই বিচিত্র আভাস আসিয়া পৌছায়, কিন্তু তাহাকে স্থিররূপে লাভ করিতে পারা যায় না। মর্ত্যের বিচ্ছিন্ন রূপের মধ্যে তাহারই অসম্পূর্ণ প্রকাশ। ফুলের সৌরভে যেন তাহারই রুক্ষ চুলের গন্ধ, অতি লঘুপদে সে নারী অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করিয়া ফিরে। নীপবন হইতে যে সৌরভ ভাসিয়া আসে যেন তাহার মধ্যে সেই অচেনার নিরব বাণী বিজড়িত। তাহা পাঠ করিবার রহস্য ভুলিয়া গিয়াছি বলিয়া এমন উদ্বেগ ব্যাকুলতা। জোনাকির বিকীর্ণ আলোয় যেন তাহারই হার-ছেঁড়া মণির দীপ্তি। সেই নারীই তো অগণিত নক্ষত্রের পাত্রে মদিরা পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিয়াছে। আমরা স্বপ্নে কেবল তাহার সহিত মিলিত হই, তাহাকে বাস্তবে লাভ করিবার পথ জানি না।

(খ)

রবীন্দ্র-কাব্যে এই জাতীয় সৌন্দর্যবোধের পাশেপাশে আর এক জাতীয়-বোধের ধারা পূর্বাপর সমান ভাবে বহিয়া গিয়াছে। ইহাকে প্রেমের সৌন্দর্য বলা যাইতে পারে। প্রেমের এই বিশিষ্ট উপলব্ধিই তাঁহাকে ঈশ্বরীয় করুণার লোকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। এই প্রেমই পরম একের সহিত কবি-চেতনাকে যুক্ত করিয়া কবিকে পরিণামে পরম সান্ত্বনা দান করিয়াছে।

যাহা চিত্তে অসীমের জন্য ব্যাকুলতা সঞ্চার করিয়া দেয় তাহাই সৌন্দর্য। তাই সৌন্দর্যপ্রেরণার মধ্যে এমন অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা। তাহা আমাদের ঘর-ছাড়া করিয়া দেয়, আমাদের উদ্‌ভ্রান্ত করে। তাহার মধ্যে নিঃশেষ প্রাপ্তি বলিয়া কিছু নাই। গভীর হইতে গভীরে গহন হইতে গহনতর লোকে চেতনার কেবল নিমগ্নতা, মাধুর্য ও রস-লোকের অতলে কেবল তলাইয়া যাওয়া।

যাহা বিশেষকে, নির্দিষ্টতাকে লাভ করিতে চায়, যাহা সকল বৈচিত্র হইতে চেতনাকে একের দিকে আকর্ষণ করিয়া আনে তাহাই প্রেম।

রবীন্দ্র-কাব্যে কোথাও উভয়কে একত্রে লাভ করিবার ব্যাকুলতা দেখা যায়, কোথাও একটি কোথাও বা অন্যটি একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সোনার তরীর 'মানস-সুন্দরী' কবিতার মধ্যে এই উভয় জাতীয় প্রেরণার পরিচয় আমরা লাভ করি।

যে সৌন্দর্য বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, যাহার বর্ণ ও প্রকাশ বৈচিত্রের অন্ত নাই, রহস্যময়তায় যাহা চিত্তকে মুহুর্মুহু উদ্‌ভ্রান্ত করে, যাহা নিয়ত চঞ্চল, সেই সৌন্দর্যকে তিনি আবার একটি নারীবিগ্রহের মধ্যে অচঞ্চল রূপে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুল। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যসাধনার ক্ষেত্রে বারংবার এই প্রেরণা কোন-না-কোন ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার স্বরূপ কি? ইহা কি ইন্দ্রিয় পিপাসার এক পরমাশ্চর্য ব্যাপ্তি? ইহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 'মানস-সুন্দরী'র কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ বিহীন,
জীবনের প্রতিরাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রুজল। প্রতিকাজে
রবে তব শুভ হস্ত দুটি। গৃহ মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।" (মানস সুন্দরী)

ইহা তো দৈহিক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ধ্যান নয়। ইহা তো এক বিশিষ্ট ভাবের সৌন্দর্যকে ধ্যান করা। আমরা প্রেমে পরস্পরের জন্য আত্মত্যাগ করি, দুঃখভোগ করি, পরস্পরের ত্রুটি দুর্বলতাকে ক্ষমা করি। ইহা আমাদের প্রতি মুহূর্তের কর্মকে পরিপূর্ণ সুষমা দান করে। ইহা সেই মঙ্গলময় সৌন্দর্যের ধ্যান।

সোনার তরীর 'অক্ষমা' 'দরিদ্রা'. 'আত্মসমর্পন' প্রভৃতি কবিতা এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতে পারে।

এই জীবনে ত্রুটি-দুর্বলতা আছে, অসম্পূর্ণতা ও অসামর্থ আছে, বিচ্ছেদ ও মৃত্যু আছে। আর এইজন্যই এত প্রেম, প্রেমের এমন আশ্চর্য্য প্রকাশ। বস্তুত এই প্রেম ত্রুটি দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতাকে আকাঙ্ক্ষা করে। শ্যামল মেঘের বুকেই রামধনুর পরমাশ্চর্য প্রকাশ। প্রেমের এই উপলব্ধির পর আর কিছু নেই। তাহা মুহূর্তের মধ্যেই অসীমতার আস্বাদ দান করে।

চিত্রার 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রাম প্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটীরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নত নয়নে
চন্দন চর্চিত ভালে রক্ত পট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরি সঙ্গীতে। তারপরে
সুদিনে দুর্দিনে; কল্যাণ কঙ্কণ করে,
সীমন্ত সীমায় মঙ্গল সিন্দুর বিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে, পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।" (স্বর্গ হইতে বিদায়)

ক্ষণিকার 'কল্যাণী' কবিতার মধ্যে এই বোধেরই এক পরমাশ্চর্য প্রকাশ। সমগ্র কবিতাটি কেমন এক স্নিগ্ধ সরল নিরাভরণ মাধুর্যে পরিপূর্ণ!

এই প্রেম যে একপ্রকার অধ্যাত্ম বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায়। এখানে সকল যুক্তি ও বিচার সকল তত্ত্ব চিন্তা পরাভূত হইয়া যায়। রূপের অহমিকা, জ্ঞানের অহমিকা ধিকৃত হইয়া ফিরিয়া আসে। বাহিরে রূপের জগতে কত পরিবর্তন হয়, কিন্তু যে ভাব-লোকের উপর এই সৌন্দর্যের প্রতিষ্ঠা তাহা চির জ্যোতির্ময়ী ধ্রুবতারকা রূপে বিরাজ করে।

মানুষ বাহিরের জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যত চেষ্টা করুক, আঘাত-সঙ্ঘাতের মাঝখানে খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যতই সংগ্রাম করুক, আর সকলের উপর রহিয়াছে জ্ঞানপ্রসূত বিচিত্র তত্ত্ব চিন্তা; কিন্তু পরিশেষে এই

বিশ্বাসকে স্বীকার না করিয়া পারে না। এই বিশ্বাসের মধ্যে সে চরম শান্তি লাভ করে। আমাদের শতধা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন জীবন এই বিশ্বাস সূত্রে বাঁধা।

"রূপসীরা তোমার পায়ে
রাখে পূজার থালা,
বিদুষীরা তোমার গলায়
পরায় বরমালা।
* * *
তোমার শান্তি পান্থজনে
ডাকে গৃহের পানে,
তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।" (কল্যাণী)

টেনিসনের 'Happy' কবিতার মধ্যে একজন কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত পুরুষের স্ত্রী তাহার স্বগতোক্তির ভিতর দিয়া স্বামীর ভাবের সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইহা দেহের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করিয়া আত্মার সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিবার ব্যাকুলতা। ইয়েটসের 'Sailing to Bazantium' কবিতাটির মধ্যে এমনি একটি ভাব লক্ষ্য করা যায়।

এই প্রেম বোধের ভিতর দিয়া মানুষ শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপলব্ধির লোকে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। এই বিশ্বাস-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম পরিণামী প্রেমের বিচিত্র বন্দনা রহিয়াছে স্মরণ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে।

এই প্রেমই মানব-চেতনাকে অধ্যাত্মবোধের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়—

"যে জন আজিকে ছেড়ে চলে গেল খুলি দ্বার
সেই বলে গেল ডাকি,
'মোছো আঁখি জল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি'।" (স্মরণ)

নৈর্ব্যক্তিক সৌন্দর্য ও প্রেম বিশ্বের অন্তহীন বিশিষ্ট নারীরূপের মধ্যে নিয়ত প্রকাশলাভ করিয়া মৃত্যুতে আবার নির্বিশেষ পরিণাম লাভ করিতেছে।

এই প্রেমই মর্ত্য ও অমর্ত্য জগতের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া মৃত্যুকে মোহনীয় করিয়া তুলে।

"জীবনের পরপার হতে
প্রতিক্ষণে মর্ত্যের আলোতে

পাঠাইছ তব চিত্তখানি
মৌন প্রেমে সজল কোমল।" (স্মরণ)

একমাত্র অন্তরের পথে ঈশ্বরের সহিত মিলনসাধন ঘটে। বাহিরে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার কোন উপায় নাই। আবার কল্যাণাশ্রয়ী প্রেমই বিচিত্র মুখী মানব প্রেরণাকে অন্তর্মুখীন করিয়া তাহাকে একটি স্থির রূপের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

"যেথা মোর পূজা গৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেথায় নীরবে এসো দ্বার খুলি ধীরে-
মঙ্গল কনক ঘটে পুণ্যতীর্থ জল
সযত্নে ভরিয়া রাখো, পূজা শতদল
স্বহস্তে তুলিয়া আনো। সেথা দুইজনে
দেবতার সম্মুখেতে বসি একাসনে।" (স্মরণ)

এই সৌন্দর্য জীবনের এক সম্পূর্ণ ভিন্নতর বোধকে আশ্রয় করিয়াছে। নারীর বহিঃসৌন্দর্য এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অবান্তর হইয়া গিয়াছে। ইহা জীবন ও জগতের গভীরতর এক ভাবের সৌন্দর্যকে উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা। জীবন অতীতে কোন সত্য আছে কি-না, কোন পূর্ণতার লোক আছে কি-না, এই প্রেমে সেই জাতীয় কোন ব্যাকুলতা নাই। ইহা জীবন ও জগতকে তাহার এই স্বরূপেই চূড়ান্ত রূপে মানিয়া লয়। মৃত্যুর কৃষ্ণ পটে তাহা এক অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণ রেখা। মুহূর্তে জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যায়। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি জানি না, মৃত্যুতে কোথায় হারাইয়া যাইব তাহাও জানি না, কেবল এইটুকু জানি নারী প্রেমে যে মাধুর্যের আস্বাদ লাভ করিয়াছি তাহা জীবনের এমন এক চরিতার্থতা সাধন যাহাতে আর সকল জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

বিশ্বের প্রকাশ বৈচিত্রের অন্তরালে একটি ধ্রুবের আদর্শ নিঃসংশয় রূপে আছে বলিয়া বৈচিত্র এত সরস, এত মধুর। বস্তুত ধ্রুবের সহিত যুক্ত আছে বলিয়া বৈচিত্রকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। তাহা না হইলে বৈচিত্রকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতাম না।

মানবজীবন সম্পর্কেও একথা সত্য। অর্থাৎ আমাদের বৈচিত্রমুখী প্রেরণা যদি অন্তরের একটি ঐক্যবোধের সহিত যুক্ত না থাকে, তবে মানবচেতনা মুহূর্তে কোন্ শূন্যতার মধ্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া যাইত। তাহা জীবনের এক মহৎ বিনষ্টি।

যে প্রেরণা বহির্মুখী সকল প্রেরণাকে অন্তর্মুখীন করিয়া নর-নারীকে

একটি মাত্র রূপের ধ্যানে নিমগ্ন করে তাহাই তো প্রেম। প্রেমের এই বোধই মানব চেতনাকে অধ্যাত্ম জগতের উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

> "বহুরে যা এক করে বিচিত্রেরে করে যা সরস,
> প্রভুতেরে করি আনে নিজ ক্ষুদ্র তর্জনীর বশ,
> বিবিধ প্রয়াস ক্ষুব্ধ দিবসেরে লয়ে আসে ধীরে
> সুপ্তি সুনিবিড় শান্ত স্বর্ণময় সন্ধ্যার তিমিরে
> ধ্রুবতারা দীপ্ত দীপ সুতৃপ্ত নিভৃত অবসানে,
> বহুবাক্য ব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
> বেদনার সুধা রসে—সেই প্রেম হতে মোরে প্রিয়া
> রেখো না বঞ্চিত করি ;—" (স্মরণে)

উর্বশী সম্পর্কে কবি স্বয়ং মন্তব্য করিয়াছেন, উর্বশী বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্যের মূর্ত্য প্রকাশ স্বরূপের ধ্যান। কিন্তু কাব্য মধ্যে উর্বশীর প্রকাশ রূপকে আশ্রয় করিয়া কবি দ্বি-বিধ সৌন্দর্যের ধ্যান করিয়াছেন। সমুদ্রতল তথা কবির চিত্ত তল মথিত করিয়া যে নারী-মূর্তির প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার এক হস্তে সুধা অপর হস্তে বিষ। অর্থাৎ তাহার মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের মিলিত প্রকাশ। সীমার অসীমের জন্য ব্যাকুলতাকেই তিনি নাম দিয়াছেন, সৌন্দর্য। সেইজন্য পুরুষের সৌন্দর্য-পিপসার মধ্যে এক অনিঃশেষ নির্বিশেষ ব্যাকুলতা। তাহার মধ্যে কোথাও পরিণাম বা অবসান নাই। তাহা মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া চির পরিচিত স্থিতির জগৎ হইতে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনে। তাহারই অনুসন্ধান তৎপরতার ভিতর দিয়া দেহ-প্রাণ-মনের আধার জীর্ণ হইয়া ধীরে ভাঙিয়া পড়ে। সৌন্দর্যের এই জাতীয় প্রেরণাকে তাই বিষ আখ্যা দান করা হইয়াছে।

যে প্রেরণা পুরুষের অন্তরে একটি রূপের মধ্যে চরিতার্থতা লাভের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করিয়া দেয়, বহির্মুখী পরিব্যাপ্ত সমগ্র চেতনাকে অন্তর্মুখী করিয়া তুলে, এইরূপে বাহিরের রূপ সম্পূর্ণ গৌণ এবং একটি পরিণামে অস্বীকৃত হইয়া একটি ভাব-রসে স্থিতিলাভ করায়, তাহাকেই তিনি বলিয়াছেন প্রেম। এই প্রেমই নর-নারীর চেতনাকে অধ্যাত্মমুখী করিয়া তাহাকে ঈশ্বরীয় সত্তার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-ধারার মধ্যে এই উভয়বিধ সৌন্দর্যবোধের কখন

একটি কখন অন্যটি মুখ্য হইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়, যে কবির জীবনে প্রেমের বোধটিই ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া সৌন্দর্যবোধের প্রেরণাটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে দূরস্মৃত, স্বপ্ন-দৃষ্ট কোন বোধের ন্যায় সৌন্দর্য-প্রেরণা কবি-প্রাণকে উন্মুখ করিয়া তুলিয়াছে।

উর্বশী প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে মিলিত করিবার চেষ্টা করিলেও কবির মনের মধ্যে ধীরে ধীরে এই বোধ যেন সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, এই উভয় প্রেরণাকে মিলিত করিতে পারা যায় না। দুটি প্রেরণা যেন সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বা বিপ্রকৃতিক। বলাকার ২৩ সংখ্যক কবিতাটি এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেক্ষেত্রে দুটি বোধ এবং এই দুই বোধাশ্রয়ী দুটি নারী-রূপের ধ্যান সম্পূর্ণ পৃথক। একের সহিত অন্যটির কোন মিল নাই।

একজনা মানব চেতনাকে বেদনায় নিপীড়িত করিয়া অন্তরের মধ্যে বসন্তের আবেশ বিহ্বলতা সঞ্চার করিয়া দেয়। পুষ্পে পুষ্পে কিংশুকে গোলাপে যে রাগরক্ত উন্মুখ বাসনা হৃদয়ে সেই বাসনা সঞ্চার করিয়া তাহাকে নিদ্রাহীন করিয়া তুলে।

অন্যজনা মানব চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া তাহাকে অশ্রুধৌত স্নিগ্ধ মহিমা দান করে। শান্তির মধ্যে যে পূর্ণতা ও সফলতা এই নারী পুরুষের জীবনে সেই সফলতা ও পূর্ণতা দান করে। এই নারীর অচঞ্চল মাধুর্যের মধ্যে আছে অমৃত। নিখিলের মধ্যে ঈশ্বরের যে পরিব্যাপ্ত আশীর্বাদ, পুরুষের চেতনা নারীর এই মাধুর্যকে আশ্রয় করিয়া সেই আশীর্বাদ লাভ করে। এই প্রেমই জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে। এই প্রেমেরই আলোকবর্তিকা হাতে করিয়া পুরুষ লোক হইতে লোকান্তরে যাত্রা করে। এই প্রেমই অনন্তের সহিত পুরুষের চেতনাকে যুক্ত করিয়া দেয়। এই প্রেমই অসীমের পূজার কুসুম।

পূরবীর 'লীলা-সঙ্গিনী' কবিতাটি কবির জীবনে গভীর তাৎপর্য বহন করিয়া আছে।

জীবনের একটি পর্যায় বহির্মুখীনতার। মানুষের সৌন্দর্য প্রেরণা বস্তুত এই বহির্মুখীনতাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়।

অবসিত যৌবনে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সামর্থ যখন অনিবার্য ভাবে হ্রাস পায়, তখন ভিন্নতর এক বোধের উপর চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। এই বোধই

অধ্যাত্ম বোধ। এই বোধই প্রেম। প্রাকৃতিক আমোঘ নিয়মের বশে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন আশ্রয়ী জীবন ও জগৎকে একটা পরিণামে পরিহার করিতে হয়, কিন্তু সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া যদি অধ্যাত্মবোধের ধীর নিঃসংশয় প্রকাশ না ঘটে তবে জীবন এক মহৎ শূন্যতার মধ্যে হাহাকারে হারাইয়া যায়। জীবনে সান্ত্বনা লাভের তখন আর কিছুই থাকে না।

কবির জীবনে একটি পর্যায়ের নিঃশেষ অবসান লাভ ঘটিয়াছে। আর কোন উপায়ে ওই জীবনকে আশ্রয় করিয়া থাকিবার কোন উপায় নাই। ইচ্ছায় না হইলে প্রকৃতি অনিচ্ছায় একটা পরিণামে বাহিরের আশ্রয় ছিন্ন করিয়া দেয়।

কবি অন্তরের মধ্যে প্রস্তুত হইতেছেন প্রাণ-মন নিরপেক্ষ অধ্যাত্ম সত্তায় স্থিতিলাভ করিবার জন্য। সুদীর্ঘ অতীত জীবনের সৌন্দর্য প্রেরণা বিচিত্র অন্তহীন সৌন্দর্য-লীলার সংস্কার সকল প্রয়াসকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আজও বারংবার আত্মপ্রকাশ করে :

"আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস প্রতিমাগুলি ?
কল্পনা পটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি ?" (লীলা সঙ্গিনী)

এই সৌন্দর্য-সাধনায় কবি তাঁহার অতীত জীবনের সৌন্দর্য-সাধনার সহিত মিল খুঁজিয়া পাইবেন।

কিন্তু এই জাতীয় সৌন্দর্য-সাধনা যে যৌবন আশ্রয়ী, বহির্মুখী চেতনাকে আশ্রয় করিয়াই যে ইহার প্রকাশ এ সম্পর্কে কোন সংশয়ই থাকে না, যখন এই জাতীয় পংক্তি পাঠ করি।

"দেখো না কি হায়, বেলা চেলে যায়,
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিনীর বীণ।" (লীলা সঙ্গিনী)

অর্থাৎ ওই জাতীয় সৌন্দর্যবোধ এবং সৌন্দর্য-কল্পনা কেবলমাত্র যৌবনেই সম্ভব।

পুনশ্চের 'পুকুর ধারে' কবিতাটির মধ্যে যে সৌন্দর্য্য-ধ্যান তাহা নিঃসন্দেহে নারীর কল্যাণী মূর্তির ধ্যান। এই ধ্যান কবির কাব্যে বিচিত্র প্রকাশ রূপকে আশ্রয় করিয়া বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই নারী পুরুষের চিত্তে যে

প্রসন্নতার লোকে বিরাজ করেন, সেখানে বাহিরের রূপ পরাভূত, বিদুষীর জ্ঞান নিগৃহীত। অধ্যাত্মবোধাশ্রয়ী, অধ্যাত্মবোধমুখীন বলিয়া ইহা আদৌ এক বিশ্বাসবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারীর জীবনকে আশ্রয় করিয়া এমন নিরন্তর সেবা, নিয়ত আত্মত্যাগ, সকল মালিন্যের এমন অক্ষোভ মার্জনা ; দুঃখ, লাঞ্ছনা ও অবমাননাকে এমন নিত্য অমৃতে রূপান্তরিত করিয়া তোলা, তাহা কোন জ্ঞান কোন যুক্তি বিচারকে আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া উঠা একপ্রকার অসম্ভব। তাহা নারীর যুগ যুগান্তরের সাধনলব্ধ এক বিশিষ্ট শক্তি। ইহার স্থির উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের জীবনে ছিল বলিয়া নারীর এই প্রকাশ-রূপকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তিনি কত বন্দনাই না করিয়াছেন। একটি সত্যবোধের উপর কবি-চিত্ত নিঃসংশয়িত রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইহা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

বিচিত্রিতার 'বধূ' কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহা এই প্রেম স্বরূপিণী নারী-রূপেরই ধ্যান।

"কোন্ দূরের কল্যাণে
সঁপিছে করুণ ভক্তি দেবতার ধ্যানে।
আগন্তুক অজানার পথ-পানে থেমে
উদ্দেশে নিজেরে সঁপে আগামিক প্রেমে।" (বধূ)

নারীর মধ্যে বিরাজ করে একটি চিরকালের বধূ। যাহাকে সে কখন দেখে নাই সেই অজ্ঞাত পুরুষের জন্য দেহ-প্রাণ-মনের নিত্য প্রস্তুতি, নিত্য মার্জনা, রুচিরাভিরাম সজ্জা, তাহারই কল্যাণ কামনায় ঈশ্বরের নিকট নিত্য উৎকণ্ঠিত প্রার্থনা, অন্তরের মধ্যে তাহারই বিচিত্র রূপ-কল্পনা, তাহারই ধ্যান, অশ্রুজলে তাহার সহিত মিলন কামনা ;—ইহাকে আমরা কি বলিয়া ব্যাখ্যা করিব।

এই যে জন্ম হইতেই আত্মোৎসর্গ, তাহারই জন্য প্রস্তুতি ইহা যে সকল যুক্তি বিচার ও বিতর্ককে সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া দেয়। নারীর এই বধূরূপের প্রকাশ যেন বিধাতৃ নির্দিষ্ট জন্মজন্মান্তরের লব্ধ কোন সামগ্রী। এই বোধ যে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারকে আশ্রয় করিয়া আছে, তাহার সহিত আমরা পরিচিত নই।

জীবনে ত্রুটি আছে, অসম্পূর্ণতা আছে, অপরাধ আছে, অবসানও আছে, সেইজন্যই জীবন আমাদের নিকট এত প্রিয়, তাই জীবনকে ঘিরিয়া এত উৎকণ্ঠা, এমন ব্যাকুলতা। মানব প্রেমের এমন প্রকাশ জীবনের এই স্বরূপের জন্যই সম্ভব হইয়াছে। মর্ত প্রেমের মধ্যে সেই সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, যাহা

জীবনের দুঃখ তাপকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পারে। তাহাকে অলৌকিক উপায়ে অমৃতে রূপান্তরিত করিয়া দেয়।

যে সৌন্দর্য সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত, অপরাজেয়, আপনার নিরতিশয় মহিমার আপনি মহিমান্বিত, অমর্ত সেই সৌন্দর্যকে তো আমরা ভালোবাসিতে পারি না। সে সৌন্দর্য হৃদয়হীন নিষ্ঠুর।

স্বর্গের অম্লান জ্যোতির সঙ্গে যখন ছায়া মেশে তখনই করুণার প্রকাশ ঘটে, আমাদের হৃদয় তখনই তাহাকে অন্তরের মধ্যে পরমাত্মীয় রূপে বরণ করিয়া লয়।

স্বর্গে যে দেবতার প্রকাশ তাহার সহিত আমাদের প্রেমের যোগ নাই। তাহা একান্ত নিষ্কলঙ্ক বলিয়া নিরতিশয় নিষ্ঠুর। মর্তে যখন তাঁহার প্রকাশ ঘটে, তিনি যখন জীব-জীবনের বিচিত্র দুঃখ ভোগ করেন, যখন মানুষের নিকট প্রেম যাজ্ঞা করেন তখনই প্রেমে মর্তের মানুষের সহিত দেবতার মিলন ঘটে। করুণা আশ্রয়ী এই প্রেমই মর্তের এক পরমাশ্চর্য প্রকাশ। স্বর্গে ইহার কোন পরিচয় নাই।

এই প্রেমকেই তিনি কামনা করিয়াছেন। এই প্রেমকেই তিনি এক দুর্লভ মহিমা দান করিয়াছেন। সে মহিমায় স্বর্গলোকও ম্লান অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া গিয়াছে। বীথিকার 'ভুল' কবিতার মধ্যে এইভাবেরই প্রকাশ।

"অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো;
আমার সাধনাতে
এল তোমার প্রদোষ বেলা সাঁঝের তারা হাতে।" (ভুল)

আর এই যে রূপের ধ্যান তাহার সহিত 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতার সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রকৃতিগত কত পার্থক্য!

"সহসা তুমি করেছ ভুল গানে,
বেধেছে লয় তানে,
স্খলিত পদে হয়েছে তাল ভাঙা-
সরমে তাই মলিন মুখ নত,
দাঁড়ালে থতমতো,
তাপিত দুটি কপোল হল রাঙা।

নয়ন কোন করিছে ছলো ছলো
শুধালে তবু কথা কিছু না বল,
অধর থরো থরো,
আবেগ ভরে বুকের পরে মালাটি চেপে ধর।" (ভুল)

এখানে সমগ্র সৌন্দর্য-ধ্যানের মধ্যে যে আবেগ কম্পন, সৃষ্টির সকল রূপের মধ্যে সেই এক আবেগের চঞ্চলতা। তাই মর্ত্যের সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া এমন পরিব্যাপ্ত বিষাদ, এমন করুণা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যসত্তা সম্পূর্ণ অচঞ্চল। তাহা নিখিল প্রাণ চাঞ্চল্যের পূর্ববর্ত্তী অবস্থা।

পরিপূর্ণতার মধ্যে কেমন করিয়া অসম্পূর্ণতার বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গেল। সেই বেদনাবোধের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া পরিব্যাপ্ত প্রাণের প্রকাশ ঘটিল, তাহা মানব মনীষায় হয়ত চিরকালের জন্য অপরিজ্ঞাত থাকিয়া যাইবে।

এই প্রেম, এই সৌন্দর্যধ্যানই ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া কবির হৃদয়ে নিঃসংশয় একক মহিমা লাভ করিয়াছে। নারীকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে এই বোধের প্রকাশই অধ্যাত্মবোধের প্রকাশ। এই অর্থে, যে এই বোধকে আশ্রয় করিয়াই মানবীয় চেতনা অসীমের সহিত মিলন বোধ করে। ইহা সম্পূর্ণ অন্তরময় এক অনুভূতি, বাহিরে ইহার কোন পরিমাপ নাই। সকল তত্ত্বচিন্তা এখানে মূক।

'রোগশয্যায়' এবং 'আরোগ্যের' মধ্যে নারীর এই বিশিষ্ট সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানই নানা রূপে অসঙ্কোচ আত্ম প্রকাশ করিয়াছে।

বিশ্বের মধ্যে যে প্রেম, যে প্রাণ-ধারা পরিব্যাপ্ত তাহা প্রকৃতির মধ্যে নিয়ত জীর্ণতাকে ঝরাইয়া তাহাকে সজীব, নবীন করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু বিরূপ, বিকৃত, তাহাকে দূর করিয়া তাহার স্থলে সুন্দরের নিত্য প্রতিষ্ঠা ঘটাইতেছে।

প্রকৃতির এই সেবারত শুশ্রূষু প্রাণের প্রকাশ দেখিতে পাই নারীর মধ্যে। পুরুষের জীবন ঘিরিয়া যাহা কিছু অসুন্দর ও বিরূপ নারী তাহার অতন্দ্রিত সেবার দ্বারা তাহাকে নিত্য মার্জনা করেন। পুরুষের মধ্যে যেখানে প্রাণের দীনতা সেখানে নারী আপনার অপরিমিত প্রাণ-ধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাকে নবীন করিয়া তুলিবার জন্য তৎপর।

"বিশ্বের আরোগ্য লক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশু পক্ষী তরুতে লতায়

নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যু পীড়িতেরে
অমৃতের সুধা স্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তার আবির্ভাব
দেখেছিনু যে দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে—" (রোগশয্যায়)

নিয়ে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে নারীর উভয় প্রকৃতি, স্বর্গের অপ্সরী এবং স্বর্গের ঈশ্বরীর মধ্যে মিলন সাধনের চেষ্টা নয়, তাহাতে অপ্সরীও ধীরে ধীরে ঈশ্বরীতে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। পুরাণ, কাব্য, শিল্প প্রভৃতিকে আশ্রয় করিয়া যে সৌন্দর্য-ধ্যান, যাহা তাঁহার যৌবনের গানকে মদির বিহ্বল করিয়াছে, বারংবার উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া গৃহছাড়া করিয়াছে তাহাকে তিনি কল্যাণী মূর্তিতে বিগলিত করিয়া শান্ত হইয়াছেন। নারী সৌন্দর্যের অপর প্রেরণাকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টা।

"যেন কোন্ পুরাণী আখ্যানে
স্তব্ধ মোর ধ্যানে
ধীর পদে এল কোন্ মালবিকা
লয়ে দীপ শিখা
মহাকাল মন্দিরের দ্বারে
যুগান্তের কোন্-পারে।
সদ্য স্নান পরে
সিক্ত বেণী গ্রীবা তার জড়াইয়া ধরে,
চন্দনের মৃদু গন্ধ আসে
অঙ্গের বাতাসে।
*　　*　　*
সুললিত বাহুর কঙ্কণে
প্রিয়জন কল্যাণের কামনা বহিছে সযতনে।
প্রীতি আত্মহারা
আদি সূর্যোদয় হতে
বহি আনে আলোকের ধারা।" (রোগ শয্যায়)

সৃষ্টির এই নিয়ত চঞ্চলতা এবং পরিবর্তন শীলতার অন্তরালে একটি স্থিতির

দিক আছে, যাহা বৃক্ষের ন্যায় স্থির স্তব্ধ থাকিয়া চঞ্চল এই সমস্ত ভুবনকে ধারণ করিয়া আছে। নারীর মধ্যে যে কল্যাণের প্রকাশ তাহা বিশ্বের এই স্থিতি বা ধ্রুবের দিকটির সহিত চেতনাকে যুক্ত করিয়া দেয়। এই বোধে মানুষ মৃত্যুভয় জয় করিয়া উঠে।

"তোমারে দেখি না যবে মনে হয় আর্ত কল্পনায়
পৃথিবী পায়ের নিচে চুপি চুপি করিছে মন্ত্রণা
সরে যাবে বলে।
আঁকড়ি ধরিতে চাহি উৎকণ্ঠায় শূন্য আকাশেরে
দুই বাহু তুলি।
চমকিয়া স্বপ্ন যায় ভেঙ্গে;
দেখি, তুমি নত শিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।" (রোগ শয্যায়)

ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সামর্থ যখন স্বাভাবিক ভাবে হ্রাস পায়, তখন ইহাদের আশ্রয় করিয়া জগতের যে অস্তিত্বের অনুভূতি, যে বিচিত্র বোধের প্রকাশ তাহাও ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতে থাকে। তখন এক উন্নততর বোধের উপর চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, যাহা আদৌ ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনকে আশ্রয় করিয়া নাই। ইহাকেই অধ্যাত্ম বোধ বলা হয়। এই বোধটিকে আশ্রয় না করিলে জীবন অনিবার্যভাবে শূন্যতার অতলে তলাইয়া যায়।

প্রাচীন অধ্যাত্ম চিন্তা এই দুই বোধের জগৎকে তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ এই দুই জগতের একান্ত বিরোধিতাকে স্বীকার করিতেন না, ব্যাখ্যাতীত হইলেও এই উভয়ের মধ্যে কোথাও কোন স্বরূপে যেন মিল আছে।

এই প্রেমই পুরুষের চিত্তে স্নিগ্ধ সান্ত্বনার স্তব্ধতা দান করে। এই প্রেমই বিশ্বের অন্তরালবর্তী অচঞ্চল শান্তির সহিত চেতনাকে যুক্ত করায়। এই প্রেমই পুরুষকে একটি রূপের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে ধ্যান তন্ময় করে। এই প্রেমের মধ্যে নিশীথিনীর পরম গম্ভীর, অতল গভীর পরিব্যাপ্ত মহিমা। এই প্রেমই অন্তরের অন্তহীন ঐশ্বর্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এই প্রেমের আলোকে নিখিল বিশ্বের পূজারতা মূর্তিটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরালে একটি সদা জাগ্রত পরিব্যাপ্ত শক্তি আছে।

ইহাকেই কবি বলিয়াছেন পালনের শক্তি, অর্থাৎ প্রাণের শক্তি। নারীর মধ্যে এই অফুরন্ত প্রাণ শক্তির প্রকাশ। বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরালে সুপ্ত থাকিয়া যে-প্রাণ নিয়ত সৃষ্টি করিতেছে, প্রতি মুহূর্তের জীর্ণতাকে, শুষ্কতাকে ঝরাইয়া প্রকৃতিকে চিরনবীন রাখিয়াছে, সেই এক প্রাণ-শক্তি নারী-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মানব সমাজকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহার মধ্যে যাহা কিছু বিকৃতি ও অনাচার, মালিন্য ও অপরাধ তাহাকে নিত্য মার্জনা করিয়া মানব সমাজকে চিরসুন্দর করিয়া রাখিয়াছে। যাহা রোগ ক্লিষ্ট, প্রাণ সম্পদে দীন, যাহা জীর্ণ, যাহা বিরূপ ও বিকৃত, নারী অসীম ধৈর্যে অক্লান্ত সেবায় তাহাকে শ্রীমণ্ডিত করিয়া তুলিবার দুঃসাধ্য সাধনায় রত। ইহার বিনিময়ে পুরুষের নিকট সে কিছু প্রত্যাশা তো করেই না, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বুদ্ধিভ্রষ্ট, অসহিষ্ণু পুরুষের নিকট হইতে অপমান, অবজ্ঞাই লাভ করে। নারী চিত্তে ইহার বিরুদ্ধে অভিযোগ নাই। নারীর অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া এত ত্যাগ এত ক্ষমা! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী আপনার দেব দুর্লভ সেবার অর্ঘ অযোগ্য পুরুষের পদপ্রান্তে উজাড় করিয়া দেয়। বোধহয় মর্তে এত অসুন্দর এত দীনতা এবং হীনতা আছে বলিয়া নারী প্রেমের এমন অমৃতময় প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। ঈশ্বরীয় প্রেম ও করুণার কতকটা আভাস আমরা মর্তে এই জাতীয় নারীর ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করি।

ধ্বনি ও সুর

"একদা মৃত্যু শোকের বেদ মন্ত্র
তুলে ধরেছে বিশ্বের আবরণ, বলেছে—
পৃথিবীর ধূলি মধুময়।
সেই সুরে আমার মন বললে—
সঙ্গীতময় ধরার ধূলি।" (পত্রপুট)

(ক)

ভাব, রূপ বা ধ্বনি—যে দিক দিয়াই সৃষ্টিকে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হোক-না-কেন, সেই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ বা অর্থ সমন্বিত স্ফুটতর ধ্বনির অতীতে যে একটি সূক্ষ্ম রূপ ও ধ্বনির জগৎ আছে, এমনি একপ্রকার নিঃসংশয় উপলব্ধি সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়।

রূপাতীত ইন্দ্রিয়াতীত এই যে জগৎ তাহাও রূপময় বা ধ্বনিময় তবে সূক্ষ্মতর অস্ফুট। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে নানা দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে সূক্ষ্মতর অস্ফুট জগৎকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই যে বৈচিত্রময় ইন্দ্রিয়াতীত ভাব, রূপ ও ধ্বনিময় জগৎ তাহা আবার কোন মূল উৎস হইতে উদ্ভূত কি-না, ইন্দ্রিয়াতীত বৈচিত্রের এই বোধেরও মূলে কোন অবিদ্যার বোধ ক্রিয়াশীল কি-না, যাহার ফলে তত্ত্বত একই বহুবিচিত্র রূপে অনুভূত হয়, সেই মূল উৎসেরও অতীতে কোন অপ্রকাশ তত্ত্ব আছে কি-না যাহার সহিত তুলনায় সকল সূক্ষ্মরূপের উৎসও অবিদ্যা বা মায়াধীন তাহার বহু বিস্তারিত দার্শনিক আলোচনা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেই আছে।

এই শব্দ ব্রহ্মের উল্লেখ আমাদের দেশে ঋগ্বেদ, মহাভারত, শতপথ ব্রাহ্মণ, কাথক, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ প্রভৃতির মধ্যে যেমন লক্ষ্য করা যায়। তেমনি হিব্রু শাস্ত্রে, গ্রীক Logos প্রভৃতি শব্দের মধ্যে এই একই ধারণার প্রকাশ। হেরাক্লিটাসের মতে Logos সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব। স্টোইকগণের মধ্যেও এমনি একপ্রকার বিশ্বাস আছে। বিশ্বে প্রকাশমান সমস্ত কিছুর অতীন্দ্রিয় একটি pattern বা কল্প-রূপ আছে। এই

অতীন্দ্রিয় কল্পরূপই হইল প্লেটোর মতে Logos। প্লেটো যাহাকে Types বা অতীন্দ্রিয় কল্পরূপ বলিয়াছেন, আলেক্সাণ্ড্রিয়ান ফিলোর মতে তাহাই ভাবের (Idea) জগৎ। ঈশ্বর প্রথম এই জগৎ সৃষ্টি করেন, এবং এই অতীন্দ্রিয় ভাবের জগৎ হইতে এই জড় জগতের প্রকাশ। সকল Idea বা Type যে আদি উৎস হইতে উদ্ভূত, তাহাকেই ইভানজেলিস্টরা যিশুখ্রীষ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন।

রূপের অতীত যে একটি অতীন্দ্রিয় বৈচিত্রময় জগৎ আছে এবং এই বৈচিত্রময় রূপ যে একটি মূল উৎস হইতে উদ্ভূত এবং এই অতীন্দ্রিয় রূপের জগৎ হইতে যে স্থূল জড় জগতের উদ্ভব এই সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে গভীর সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সমগ্র জীবন ধরিয়া রবীন্দ্রনাথ এই উভয় জগতের মধ্যে যোগের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। এক্ষেত্রে কেবল ধ্বনি ও সুর আমাদের বিচার্য। তিনি বহির্বিশ্বের স্ফুটতর অর্থ সমন্বিত ধ্বনি, ছন্দ বা সুরের সহিত এই প্রত্যেকটির যে ইন্দ্রিয়াতীত চিরন্তন কল্পরূপ (archetypal) ধ্বনি আছে, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রভাত সঙ্গীতের মধ্যে কবি সর্বপ্রথম বহির্বিশ্বের রূপ ও ধ্বনির অতীত এক চিরন্তন রূপ ও বাণী-রূপ অপরোক্ষ করেন। এই অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি নিঃসংশয়ে বোধ করেন স্ফুটতর অর্থযুক্ত বাণীর অতীতে যে একটি চিরন্তন বাণী-লোক আছে তাহা এই সকল অর্থযুক্ত পরিস্ফুট শব্দের কল্পরূপ।

কেবল এই উপলব্ধিই কবি লাভ করেন নাই। যে উপলব্ধি সাঙ্খ্য, তন্ত্র বা ভর্তৃহরির শব্দ তত্ত্ব হইতে কবিকে বিশিষ্ট করিয়াছে, তাহা হইল এই কল্প-রূপের চিরন্তনতা বোধের সঙ্গে অর্থময় পরিস্ফুট শব্দেরও চিরন্তনতা। এই পরিস্ফুট অর্থবিশিষ্ট শব্দের ভিতর দিয়াই আমরা সেই কল্পরূপের আভাস লাভ করি।

বিশিষ্ট ধ্বনির সহিত বিশিষ্ট রূপ যেমন শাশ্বত কালের জন্য বিজড়িত, তেমনি বিশিষ্ট রূপের সহিত অনিবার্যভাবে বিশিষ্ট ধ্বনিও চিরকালের জন্য সংযুক্ত।

বিশ্বের সকল রূপ যে এক অন্তহীন ধ্বনির প্রবাহ এবং এই ধ্বনি প্রবাহ হইতেই যে সংখ্যাতীত রূপ বা বস্তুপুঞ্জ নিয়ত জাগিয়া উঠিয়া আবার ধ্বনি প্রবাহের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে, এই উপলব্ধিকেই কবি প্রতিধ্বনি কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রতিধ্বনি কবিতার ভাব-বস্তু সম্পর্কে কবি পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন,—

"যে ভাবে তখন আমাকে আবিষ্ট করেছিল সেটা এই যে, বিশ্ব সৃষ্টি হচ্ছে একটি ধ্বনি আর সে প্রতিধ্বনিরূপে আমাকে মুগ্ধ করছে, ক্ষুব্ধ করছে, আমাকে জাগিয়ে রাখছে, সেই সুন্দর সেই ভীষণ। সৃষ্টির সমস্ত গতি প্রবাহ নিত্যই একটা কোন্ কেন্দ্রস্থলে গিয়ে পড়ছে আর সেখান থেকে প্রতিধ্বনি রূপে নির্ঝরিত হচ্ছে আলো হয়ে রূপ হয়ে ধ্বনি হয়ে।"

বিশ্বের অন্তহীন ধ্বনি বা রূপ, যাহা নিয়তই জাগিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, তাহার একান্ত রূপে বিনষ্টি ঘটিতেছে না, কোন এক ধ্বনন্ময় মহান রূপ-সমুদ্রে নিয়তই ঝরিয়া পড়িতেছে, আবার তাহারই প্রতিঘাতে প্রতিধ্বনি রূপে অন্তহীন রূপ, বর্ণ ও গন্ধের প্রকাশ ঘটিতেছে।

"অরণ্যের পর্বতের সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীত স্বর,
দিবসের প্রদোষের রজনীর গীত
চেতনার নিদ্রার মর্মর,
বসন্তের বরষার শরতের গান,
জীবনের মরণের স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর।
পৃথিবীর চন্দ্রমার গ্রহ-তপনের
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত।" (প্রতিধ্বনি)

মহাসঙ্গীতের যে উৎস হইতে নিত্যকাল ধরিয়া অন্তহীন রূপের বিচ্ছিন্ন তান সৃষ্টি হইতেছে কিংবা সকল রূপ-ধ্বনি মিলিত হইয়া একটি যে অখণ্ড সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ব্যক্তি-চিত্তকে একমাত্র তাহার সহিত যুক্ত করিতে পারিলে বিশ্বের সকল রূপের সহিত একযোগে মিলন ঘটে। কবি সেই পূর্ণ উপলব্ধি লাভের জন্য উৎসুক।

"সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিবারে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত,
তোর মুখে কেমন শুনায়।"

ছিন্নপত্র হইতে কবির এই জাতীয় একটি উপলব্ধির পরিচয় এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"সমস্ত জলে স্থলে আকাশে কী একটা পরিপূর্ণ নীরবতা-অনেকক্ষণ চুপ করে অনিমেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় যদি এই চরাচর ব্যাপ্ত পূর্ণনীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদিভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় (তাহলে) কী একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে! আসলে তাই হচ্ছে! কেননা,জগতের যে কম্পন আমাদের (চক্ষে) এসে আঘাত করছে তাই আলোক আর যে কম্পন কানে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সঙ্গীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎ ব্যাপী দৃশ্য প্রবাহের অবিশ্রাম (কম্পন) ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়।"

এক্ষেত্রে বিশিষ্ট দুটি জগতের উপলব্ধির পরিচয় আমরা লাভ করি। একটি দৃশ্যমান রূপের জগৎ। এই জগৎ নিয়ত ভাঙ্গা-গড়া, রূপান্তরতার ভিতর দিয়া একটি সুষমাকে নিত্যকাল ধারণ করিয়া আছে। আবার বাহিরের এই সুষমার ভিতর দিয়া ইহার অতীত এক অতীন্দ্রিয় সুষমার আভাস লাভ করিতে পারা যায়।

জীবনে বাহিরের অখণ্ড সুষমার উপলব্ধির শেষে যে অতীন্দ্রিয় অখণ্ড সুষমার উপলব্ধি ঘটে তাহা অবশ্য সত্য নয়। জীবনে উভয় লোকের উপলব্ধি যুগপৎ ঘটিতে থাকে। একটির উপলব্ধির সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া আর একটি উপলব্ধির সম্পূর্ণতা ঘটে। কারণ দুটি জগৎ অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

বিশ্ব সুষমার ক্ষেত্রে ইহা যেমন সত্য, বিশ্ব সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ইহা তেমনি সত্য। অর্থাৎ বহির্বিশ্বে স্ফুটতর বিচিত্র ধ্বনির ভিতর দিয়া একটি শ্রুতিগম্য সঙ্গীত নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। এই অখণ্ড সঙ্গীতকে আশ্রয় করিয়া ইহার অতীত একটি অখণ্ড অশ্রুত সঙ্গীতের আভাস আমরা লাভ করি। এই দুটি সঙ্গীতের জগৎ চিরন্তন। দুটি জগৎ চিরন্তন সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের সঙ্গীত-লোকের মধ্যে যেমন অতীন্দ্রিয় সঙ্গীত-লোকের মধ্যে তেমনি অখণ্ডতা বোধের ধীর বিকাশ ঘটিতে থাকে। একটি লোকের উপলব্ধির মধ্যে যেখানে সম্পূর্ণতা সেখানে অন্য লোকেরও উপলব্ধির সম্পূর্ণতা। একটির উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ করিয়া পরিশেষে আর একটি লোকে উত্তরণের যে ক্রম প্লেটো নির্দেশ করিয়াছেন, সেই ক্রমের উপলব্ধি এক্ষেত্রে অস্বীকৃত।

এইরূপে কবি মর্তের রূপ ও বাণীকে ইহার অতীত স্পন্দনের সহিত যুক্ত করিয়া তাহাকে ক্রমাগত তুর্লভ এবং আশ্চর্য ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুলিয়াছেন। কবির রূপ ও ভাবের জগৎ এবং বাণীর সামর্থ-সীমা এইরূপে ক্রমাগত প্রসারতা লাভ করিয়াছে। তিনি অতীন্দ্রিয় ধ্বনি ও রূপের জগতের আকাঙ্খায় রূপ ও ধ্বনিময়ব হির্বিশ্বকে অস্বীকার করেন নাই ;— যে আকাঙ্খার আতিরেকে তন্ত্রের বীজমন্ত্রগুলির উদ্ভব। বীজ (Archetypal) ধ্বনিরূপে ইহার সত্যতা এবং সামর্থ-সীমা প্রমাণ সাপেক্ষ হইলেও রবীন্দ্রনাথ ইহাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার অতীন্দ্রিয় জগতের উপলব্ধি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বাণী ও রূপের জগৎকেই ক্রমাগত মহান ও মাধুর্য মণ্ডিত করিয়াছে।

সমস্ত গগণতল পরিপূর্ণ করিয়া একটি মহান্ সঙ্গীত নিয়ত উপচাইয়া পড়িতেছে। কোন্ মহাশূন্য হইতে উত্থিত হইয়া কোন্ মহাশূন্যের দিকে তাহা উধাও হইয়া চলিয়াছে ? কোন্ তন্ত্রী হইতে কাহার অঙ্গুলি ঘাতে তাহার সৃষ্টি ?

সে সঙ্গীতের ছন্দে ছন্দে মহাকাল তাল দিতেছেন। দশদিক ঘিরিয়া তাহার আর নৃত্যের বিরাম নাই। এই অন্তহীন রূপলোক, আকাশের যত গ্রহ-নক্ষত্র সেই সঙ্গীত স্রোতের যেন এক একটি বীচি বিক্ষেপ। সে সঙ্গীতের তালে তালে মহাসিন্ধুর তরঙ্গ হিল্লোল, শাখা বাহু প্রসারিত মহা অরণ্যের বিপুল আন্দোলন। উপল ঘর্ষণে নির্ঝরিণী তাহারই তালে তাল দিয়া পাষাণ ভেদ করিয়া ছুটিয়াছে। ষড় ঋতু ষড় বর্ণের বাস পরিধান করিয়া ভবন বেদীতলে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। তাহাদের নৃত্যের তালে তালে মর্তের কাননে ফুল ফোটাও ঝরার বিরাম নাই।

আর এক সুরের সুরধুনী বহিয়া চলিয়াছে নিখিল মানব-চিত্ত-লোক আশ্রয় করিয়া হাসি-অশ্রুর, ব্যথা-বেদনার, আশা-নৈরাশ্যের ফেন পুঞ্জ তুলিয়া তুলিয়া। তাহাও আদি-অন্তের পরিচয় হারা।

অন্তর ও বহির্বিশ্বের তুটি তান একত্রে মিলিত হইয়া দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত এক মহান, মধুর, পরম গম্ভীর এক পূর্ণ রাগিণীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই সঙ্গীত রূপটি পূর্ণ বিকশিত। তাহা অপরিবর্তনীয় চিরস্থির হইলেও বিচ্ছিন্ন তানের ক্ষেত্রে বিকাশের অনন্ত সম্ভাবনা পূর্ণ।

সুদূরতম রূপ-লোক হইতে নিকটতম তৃণ-পুষ্প পর্য্যন্ত, বৃহত্তম সত্তা হইতে ক্ষুদ্রতম সত্তা পর্য্যন্ত, বৃহত্তম কাল পরিমাপ হইতে ক্ষুদ্রতম কাল পরিমাপ পর্য্যন্ত সমস্ত কিছুই নিয়ত সৃজন প্রলয়, ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া নিত্যকাল ধরিয়া

একটি অখণ্ড সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। অজ্ঞাত অতীতকাল ধরিয়া কত সৃষ্টি হইয়াছে, কত সৃষ্টি হারাইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতে অনন্তকাল ধরিয়া কত সৃষ্টিই না হইবে,—এই সমস্ত কিছুই সেই এক অখণ্ড রাগিণীর অন্তর্ভুক্ত।

বিশ্ব প্রকৃতিই শুধু নয়, সকল অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিখিল মানব সমাজের সুখ-দুঃখ, স্নেহ-প্রেম, আঘাত-সংঘাতকে আশ্রয় করিয়া যে একটি অখণ্ড রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে তাহাও এই এক বৃহৎ সঙ্গীতের অন্তর্গত।

এক অখণ্ড সঙ্গীত বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া নিত্যকাল ধরিয়া ধ্বনিত হইতেছে। এই এক সুরে বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-সমাজ বিধৃত।

এক্ষেত্রে সোনারতরীর 'পুরস্কার' এবং 'বিশ্বনৃত্য' কবিতা দুইটি পাঠ করা যাইতে পারে। এই রূপে রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্বনৃত্য বা বিশ্ব-সঙ্গীতের পরিচয় দান করিয়াছেন তাহাতে বহির্বিশ্বের স্ফুট সঙ্গীত এবং অন্তর্বিশ্বের অস্ফুট বা অশ্রুত সঙ্গীত সম্পূর্ণ একাত্ম হইয়া গিয়াছে।

বিশ্ব-চিত্ত লোক বলিতে কবি সেই সৃষ্টি উৎসের কথাই বুঝাইয়াছেন, যে আদি স্পন্দন হইতে রূপের বন্যা লক্ষ ধারায় লক্ষদিকে নিরন্তর ছুটিয়া চলিয়াছে। রূপ সেই এক অখণ্ড রাগিণীর এক একটি ছিন্নতান। তাঁহার চেতনা যখন ক্ষণে ক্ষণে সেই লোকের সহিত মিলন বোধ করিয়াছেন, তখনই তিনি মুক্তির আস্বাদ বোধ করিয়াছেন। ওই পরিণাম লাভ করিলে ব্যক্তি আপনার চেতনাকে বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে লীলায়িত হইতে দেখে। বিশ্বের সকল রূপের সহিত মুক্ত স্বরূপে এই যে লীলা তাহাতে বস্তুর ভার বা বন্ধন আর থাকে না। তখন দেশ-কাল পরিপূর্ণ, দেশ-কালাতীত এক অখণ্ড প্রাণ-স্পন্দনে ব্যক্তি-প্রাণ স্পন্দিত হইতে থাকে। কবি আপনার জীবনে কত বারবার মুক্তির এই আস্বাদ লাভ করিয়াছেন। এই উপলব্ধির পরিচায়ক কয়েকটি উক্তি :

"—সেই বিশ্ব-চিত্ত লোকে, যেথা সুগভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীত ধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।" (সত্যেন্দ্রনাথ)

"—নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন।" (মুক্তি)

জড়ের বন্ধন মুক্তি ঘটে কোন একটা উপায়ে অনস্তিত্ব বোধ সৃষ্টির ভিতর দিয়া নয়। সকল জড় রূপের মধ্যে অখণ্ড সঙ্গীতের মত এক পূর্ণ সুষমা বা সামঞ্জস্য

যখন ফুটিয়া উঠে তখন জড় আর বন্ধন স্বরূপ থাকে না। জড় ও ভাবের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে এইরূপে নিঃসংশয় অবসান লাভ করিয়াছে।

বহির্বিশ্বের রূপ ও বাণীর অতীত লোকে একটি চিরন্তন রূপ ও বাণী-লোক আছে, যাহাকে বিশ্বের প্রত্যেকটি রূপ ও বাণীর Types, Universals বা Ideas বলা হয়। বাহিরের রূপ ও বাণীর বিনাশ ঘটিলে অতীন্দ্রিয় সত্তায় তাহার কল্প-রূপ থাকিয়া যায়। রূপের অতীত এই চিরন্তন ভাব-লোকের উপলব্ধি মানুষের সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার ধন। এই উপলব্ধি বিশ্বে মানুষকে প্রথম অমৃতের আস্বাদ দিয়াছে। মানুষের প্রথম অমর সত্তার বিজয় ঘোষণা।

"মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।" (চিররূপের বাণী)
"বায়ু সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুত বাণীর চক্র লহরী,
কিছুই হারায় না।" (চিররূপের বাণী)

বিশ্বের এই যে গণনাতীত রূপের প্রকাশ তাহা তো সঙ্গীতের তালে তালে ফুটিয়া ওঠা, বিতত হইয়া যাওয়া। কালের সীমায় প্রতিহত হইয়া এক অশ্রুত স্পন্দন অন্তহীন বৈচিত্র পরিপূর্ণ রূপ, রঙ, রেখা ও ধ্বনিতে কেমন করিয়া রূপান্তরিত হইয়া যায়! ক্ষুদ্রতম দেশ-কাল হইতে বৃহত্তম দেশ-কাল পর্যন্ত দেশ-কালের বোধ মাত্রেরই মধ্যে সর্বত্র এক রহস্য পরিব্যাপ্ত যে রহস্যে অরূপের বক্ষ হইতে অন্তহীন রূপ নিত্যকাল ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তাই তো কালকে বলা হয় জাদুকর। এই গণনাতীত আপেক্ষিক দেশ-কালের বোধ সৃষ্টি, সেই সঙ্গে আপেক্ষিক রূপ উপলব্ধির তত্ত্ব চির রহস্যাবৃত। তাই ইহাকে বলা হয় জাদু, অনির্বচনীয় মায়া।

বিশ্বের এই প্রকাশ রূপ এবং তাহার ধীর বিকাশের পশ্চতে একটি অচঞ্চল ভাব-লোকের অনুপ্রেরণা আছে। বিশ্ব-প্রকৃতি তাই অন্ধ জড় প্রবাহ নহে।

মানব-মনের যে নিঃসীম ভাবনা-কামনা, রূপ ও বাণীর সীমাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিতেছে, তাহারও পশ্চাতে এই এক ভাব-লোকের গূঢ় প্রেরণা। মানুষের সৃষ্টি-কর্ম তাই ব্যক্তির খাম খেয়ালি কোন বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। সকল অতীত-বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমেত মানব মনের সমগ্র সৃষ্টি-ক্রিয়ার পশ্চাতে একটি প্রেরণা বিকাশ সূত্রে সমস্ত কিছুকে গ্রথিত করিয়াছে। কেবল সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতি কলাই নয়, জড় জগতের রূপান্তর সাধনের চেষ্টার পশ্চাতেও সেই

এক প্রেরণা নিহিত। অর্থাৎ মানব মন বুদ্ধি ও বোধ দিয়া যাহা কিছু করিতেছে, সেই সমস্ত কিছু এক বিশ্ব-নিয়মের অধীন।

সৃষ্টি প্রেরণা হইল এই চিরন্তন অতীন্দ্রিয় ভাব বা বাণী-লোকের ব্যক্তি-সত্তাশ্রয়ী হইয়া আত্ম-প্রকাশের প্রেরণা। নদী স্রোত আকার বিহীন। স্রোত প্রবাহের তীরে কোন খাদ থাকিলে জল যেমন মুহূর্তে ওই খাদ পূর্ণ করিয়া উহার আকার ধারণ করে অথচ তাহার নির্বিশেষ রূপটি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না; তেমনি এক একটি ব্যক্তি মানসকে পূর্ণ করিয়া অন্তহীন বাণী প্রবাহের কতকটা অংশ একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। যাঁহার মনের প্রসার যত বেশি তাঁহার মনের সীমানায় অতীন্দ্রিয় ভাব-লোক তত অধিক পরিমাণে ধরা পড়ে।

কবির সমগ্র কাব্য-রূপটি হইল কবির মনঃ সীমানায় বাধা প্রাপ্ত, তাহার কক্ষের মধ্যে আবর্তিত চিরন্তন বাণী বা রূপ-লোকের কতকটা অংশ মাত্র।

চিরন্তন ভাব-লোক কবির চিত্ত-লোকে নিয়ত আঘাত করিতেছে রূপ লাভ করিবার জন্য। তাহার কতকটা অংশ কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিচিত্র সৃষ্টি-প্রেরণা রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। আর যাহা প্রকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না তাহা কবির চিত্ত-গুহা ত্যাগ করিয়া পুনরায় চিরন্তন ভাব স্রোতে মিশিয়া যাইতেছে। আর কোন ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া আর কোন কালে তাহারা প্রকাশ লাভ করিবে।

এক পূর্ণ, অখণ্ড ভাব-লোক আপনার পূর্ণ স্বরূপটিকে ফিরিয়া লাভ করিবার জন্য পর্যায়ের পর পর্যায় ক্রমে বিচিত্র দেশ-কাল এবং তাহার অন্তর্গত বিচিত্র রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া ক্রমিক উন্নত পর্যায়ের সৃষ্টি রূপে আত্ম প্রকাশ করিতেছে। সেই আকাঙ্খার ভিতর দিয়া বর্তমান মনুষ্য-সত্তার প্রকাশ। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অসীম ভাবনা আপনার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ-পর্যায়কে রূপ-বদ্ধ করিতে চায়।

ব্যক্তি যতই আপনার ব্যক্তি-বোধের সীমাকে অতিক্রম করিয়া এই বিশ্ব ভাবনা-লোকটিকে আশ্রয় করিতে থাকে তাহার মধ্যে প্রকাশের বাধা ততই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যায়, সৃষ্টি প্রেরণা ততই দুর্বার হইয়া উঠিতে থাকে।

মানুষের সৃষ্ট রূপ ও বাণী-লোকের মধ্যে একটি অতীন্দ্রিয় রূপ ও বাণী লোকের প্রেরণা আছে। কেবল ইহাই সত্য নয়, ইহার মধ্যে আবার একটি বিকাশের ধারাও আছে। মানুষের মনোরাজ্য ও সৃষ্টি-লোক আশ্রয় করিয়া ভাব ও রূপ ধীর সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে।

মানব-সংসারে দুটি ভিন্ন জাতীয় সৃষ্টি প্রেরণা দেখিতে পাই। একটি আধিভৌতিক, বৈজ্ঞানিক বিচিত্র সৃষ্টি প্রেরণা; অন্যটি আধ্যাত্মিক, অন্তর্জগতের যে-কোন সৃষ্টি-রূপ, অন্তহীন ভাব-ভাবনা, কল্পনা, সৌন্দর্য-প্রেরণা, গভীরতর সংখ্যাতীত বিচিত্র বোধের জগৎ। সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি চিরকাল অপরটিকে পরিহার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। উভয়ের দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত চলিয়াছেই। রবীন্দ্রনাথ এই উভয় জাতীয় প্রেরণার একান্ত বিরোধকে স্বীকার করিতেন না। উভয়ের যোগে পূর্ণ সমন্বয় সাধনে যে মানুষের সম্পূর্ণতা তাহা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এক আদি প্রেরণা মানুষের উভয়বিধ সত্তাকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে উৎসর্জিত করিতেছে। সেই অনিবার্য যোগের উপলব্ধির প্রকাশ।

"মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি
তাদের খেলার হতে সাথি।

* * *

অতীতের গৃহ ছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয় তীরে তীরে।" (বলাকা)

পরিশেষের 'আলেখ্য' কবিতাটির মধ্যে অনুরূপ ভাবের পরিচয় লাভ করা যায়।

"অপেক্ষা করিয়াছিলি শূন্যে শূন্যে কবে কোন গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।" (আলেখ্য)

এই ভাবের আরও একটি কবিতা—

"বিরাট মানব চিত্তে
অকথিত বাণী পুঞ্জ
অব্যক্ত আবেগে ফিরে কাল হতে কালে
মহাশূন্যে নীহারিকা সম।

সে আমার মনঃ সীমানার
সহসা আঘাতে ছিন্ন হয়ে
আকারে হয়েছে ঘনীভূত,
আবর্তন করিতেছে আমার রচনা কক্ষপথে।"

মানুষের কোন ভাব-ভাবনা, কোন চিন্তা, কোন কল্পনা একান্ত রূপে বিনষ্ট হয় না। একটি চিরন্তন ভাব-লোকে তাহারা মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া থাকে। এই চিরন্তন ভাব-লোক রূপ পরিগ্রহ করিবার জন্য ব্যাকুল। ব্যক্তি-চেতনাকে আশ্রয় করিয়া রূপের মাধ্যমে তাহারই একটি অংশ একবার রূপ লাভ করিতেছে, আবার জীর্ণ রূপের আধার ভাঙ্গিয়া ভাব মাত্র রূপে পরিণত হইতেছে। এমনি ভাব হইতে রূপে অবিরাম আসা ও যাওয়া।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিবার। প্রথমত ব্যক্তির ভাবনা খাম খেয়ালি কোন একটি বিচ্ছিন্ন ক্রিয়া নয়। দ্বিতীয়ত তাহা বহির্বিশ্বের সামগ্রীও নয়। এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ রূপে ভাব বা আদর্শবাদী। তবে অন্যান্য ভাব বা আদর্শবাদী হইতে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির কিছু পার্থক্য আছে। তাঁহার উপলব্ধির ক্ষেত্রে দেখিতে পাই এই সুসম্পূর্ণ ভাবের জগৎ রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছে। চিরন্তন ভাব-লোকের মধ্যেই সৃষ্টি-ক্ষম শক্তি আছে। প্লেটোর ধারণা মত তাহা সৃষ্টি লাভের জন্য অপর কোন শক্তির মুখাপেক্ষী নয়। রবীন্দ্রনাথের ভাবের জগৎ এক যোগে গতিশীল এবং সৃষ্টিক্ষম।

নিখিল মানুষের বিচিত্র সৃষ্টি-ক্রিয়ার পশ্চাতে এইরূপে তিনি একটি অভিব্যক্তির দিক নির্দেশ করিয়াছেন। জড় জগৎ এবং জীবনকে আশ্রয় করিয়া রূপের যেখানে সম্পূর্ণতা সেখানে বস্তু ও ভাব পরস্পরকে cancel বা অস্বীকার করিবে। একমাত্র এই পরিণামে আসিয়া উভয়ের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিবে।

সুরের স্পন্দনে বিশিষ্ট রূপ যে কোন্ দুর্লভ মহিমা লাভ করে, কোন্ অপার বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায় তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

"সুরের সুরেন্দ্র লোকে মন গেছে চলে
নিখিলের সব ভাষা মিলে গেছে অখণ্ড সঙ্গীতে।
অন্তহীন কাল সরোবরে
মাধুরীর শতদল—

তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।" (ভীরু)

সঙ্গীত, ছন্দ সুর সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে এ কথা বলিয়াছেন, যে বিশ্বের সকল রূপকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া যে একটি অখণ্ড সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে, সঙ্গীত, ছন্দ বা ধ্বনি মানব-চিত্তকে পরিণামে সেই অখণ্ড সঙ্গীতের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। আর সেই সুরের সহিত যুক্ত হইয়া মানবীয় চেতনা বিশ্বের সকল রূপ বা ধ্বনির সহিত একযোগে স্পন্দিত হইতে থাকে।

বিশ্ব সঙ্গীত একবার আপনার মধ্যে আকুঞ্চিত, সংহত হইয়া একটি পরিপূর্ণ সুষমাকে ফুটাইয়া তুলিয়া আবার অন্তহীন দেশ কালে সংখ্যাতীত রূপ বা সুরের মধ্যে আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। ইহা কল্প কল্পান্তের ধ্যান নহে। প্রতি মুহূর্তে এই লীলা সাধিত হইতেছে।

কোন একটি রূপের ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া ধ্বনি, ছন্দ বা সুর, বিশ্ব-ধ্বনি, ছন্দ বা সঙ্গীতের সহিত যখন যুক্ত হইয়া যায়, তখন ওই বিশিষ্ট রূপটিও সেই সঙ্গে স্পন্দিত হইয়া নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত পরিপূর্ণ সুষমার সহিত একাত্ম হইয়া যায়। 'ভীরু' কবিতাটির মধ্যে কবির এই যে উপলব্ধি সেই একই ভাবের আরো গভীর আরো সুস্পষ্ট উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে বীথিকার 'গীতচ্ছবি' কবিতাটির মধ্যে। নিম্নে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"অনাদি বীণায় বাজে যে রাগিণী গভীরে গম্ভীরে
সৃষ্টিতে প্রস্ফুটি উঠে পুষ্পে পুষ্পে তারায় তারায়
উত্তুঙ্গ পর্বত শৃঙ্গে, নির্ঝরের দুর্দম ধারায়,
জন্ম মরণের দোলে ছন্দ দেয় হাসি ক্রন্দনের,
সে অনাদি সুর নামে তব সুরে, দেহ বন্ধনের
পাশ দেয় মুক্ত করি, বাধাহীন চৈতন্য এ মম
নিঃশব্দে প্রবেশ করে নিখিলের সে অন্তরতম
প্রাণের রহস্য লোকে যেখানে বিদ্যুৎ সূক্ষ্ম ছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।"
(গীতচ্ছবি)

কিংবা 'শ্যামলা' কবিতার এই অংশটি

"অধরে তোমার বীণাপানি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝঙ্কার।" (শ্যামলা)

নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া যে সুর ধ্বনিত হইতেছে; নক্ষত্রে, নক্ষত্রে, পর্বত শৃঙ্গে, নির্ঝরিণীর নূপুর নিক্কনে, পুষ্পে পুষ্পে, তৃণ-তরু-লতায় প্রাণের যে নিয়ত স্পন্দন, সঙ্গীত মানব-চিত্তকে পরিণামে সৃষ্টির সেই আদি স্পন্দনের সহিত মানব মনকে যুক্ত করিয়া দেয়। সুরের স্পন্দনকে আশ্রয় করিয়া মানব মন নিখিল প্রাণের সেই গূঢ়তম লোকে প্রবেশ করে, যেখানে প্রাণের একটি দোলায় অন্তহীন খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ দেশ-কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে, আবার আর একটি দোলায় এই সকল রূপ একটি পরিপূর্ণ সুষমায় সংহত হইয়া আসিতেছে। মর্তের বিশিষ্ট রূপকে আবেষ্টন করিয়া এই স্পন্দন যখন বিশ্ব-স্পন্দনের সহিত যুক্ত হইয়া যায় তখন তাহা এক অলৌকিক রহস্যের বশে বিশ্বের সকল রূপের সহিত যুক্ত হইয়া আপনারই দুর্লভতম মহিমা লাভ করে।

সুরের কম্পনে ব্যক্তি-চেতনা বিশ্ব-কম্পনের আভাস লাভ করিবামাত্র দৃষ্টি সমক্ষের সমস্ত দৃশ্যপটটাই যেন পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। রূপের চুমকি বসান, সূক্ষ্ম কারুকার্য ভরা এই মর্তের উত্তরীয়খানি ধীরে সরিয়া গিয়াছে, আর সেই অতল শূন্যতার মধ্য হইতে আর একটি রূপ ধীরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। সে সাক্ষাৎকার অনির্বচনীয়।

"শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
অগোচরের অপরূপ প্রকাশ;
তার লঘু গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে;
অপ্রাপণীয়ের সে দীর্ঘ নিশ্বাস,
দুরূহ দুরাশার সে অনুচ্চারিত ভাষা।" (পত্রপুট)

আর এই স্পন্দনের সহিত বিজড়িত হইয়া পরিচিত রূপ অপরিচয়ের বিস্ময় বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। সে যেন কোন্ অমরার অধিবাসিনী, যেন কোন্ জন্মান্তরের প্রেয়সী তাহাকে লাভ করিবার জন্য হৃদয় অনির্দেশ্য ব্যাকুলতায় নিয়ত সজল। স্বপ্নে আমরা তাহার সহিত মিলিত হই, আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কত অশ্রুপাত করি; কিন্তু বাস্তবে তাহাকে লাভ করিবার কোন পথ নাই।

যে নারী একান্ত পরিচিত, সহস্র তুচ্ছতার মধ্যবর্তিনী যে নারী, যাহার আদি অন্ত সকল পরিচয় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ করিয়াছি, তাহার মধ্যে এ কোন্ অপরূপের প্রকাশ! তাহার এবং আমার মাঝখানে এ কী দুস্তর ব্যবধান! এই ব্যবধান পার হইয়া তাহার সহিত কোন কালে কেমন করিয়া মিলিত হইব।

ভীরু, গীতচ্ছবি, শ্যামলা ও পত্রপুট এই চারিটি কবিতা আশ্রয় করিয়া কবি-ভাবনার একটি দিকের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিয়াছে।

রূপ মাত্রেই এক একটি নির্দিষ্ট ছন্দ। অণু পরমাণুর এক একটি বিশিষ্ট নৃত্যভঙ্গী। এই বিশিষ্ট স্পন্দন-রূপের সহিত বিশ্ব-স্পন্দন-রূপের যতই মিল ঘটে রূপের মধ্যে ততই অপরূপতার আভাস ফুটিয়া উঠে।

সুর একটি বিশিষ্ট রূপকে বিশ্ব রূপের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহাতে রূপের মধ্যে বিস্ময় সীমাহীন হইয়া পড়ে।

বিশ্ব স্পন্দনের এক দোলায় রূপের সহস্র দল একটির পর একটি পাপড়ি মেলিয়া আপনাকে পূর্ণ বিকশিত করিতেছে। আর এক দোলায় এই সকল রূপ আপনার মধ্যে সংহত বিলীন হইয়া যাইতেছে। এমনি লীলা চলিতেছে অন্তহীন কাল ধরিয়া। নিখিল সুষমার ক্ষেত্রে ইহা যেমন সত্য বিশ্বের যে-কোন বিশিষ্ট রূপ সম্পর্কেও ইহা ঠিক তেমনি সত্য।

সুরের স্পর্শে একটি বিশিষ্ট রূপ দেখিতে দেখিতে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত এক মহান মহিমা লাভ করে। চিরকালের চেনার মধ্য হইতে কোন্ চিরকালের অচেনা বাহির হইয়া আসে। যার এক দোলায় রূপ আপনার বিশিষ্ট সত্তাটিকে ফিরিয়া লাভ করে। সুরের তরণী বাহিয়া মন রূপের লোক হইতে অপরূপ লোকে বারংবার আসা যাওয়া করিতে থাকে। কোনটি সত্য, কোনটি মায়া?

বিশ্বে সত্তামাত্রই অমর। কারণ বিশ্ব প্রাণের যোগে তাহার অস্তিত্ব। সেখানে সূর্য আর সূর্যমুখী ফুলে অভেদাত্মা।

সঙ্গীত একটি বিশিষ্ট রূপকে বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দের সহিত যুক্ত করিয়া নিখিলের সংখ্যাতীত সত্তার প্রকাশের মাঝখানে আর একটি দুর্লভ সত্তার মহিমা দান করে।

সীমিত প্রকাশ বদ্ধ নর-নারীই অসীমের দূত হইয়া দেখা দেয়, এক অনির্বচনীয় ভাব-বিগ্রহ, এক নিত্যকালের অধিবাসী, যখন সুরের ভিতর দিয়া তাহাদের বিশিষ্ট রূপ বিশ্ব-স্পন্দনের সহিত যুক্ত হইয়া যায়। বিবাহে শাহানার

যে সুর ধ্বনিত করিয়া তোলা হয় তাহার মধ্যে আছে নর-নারীর মিলন সুরের সহিত সীমাহীন ভাব, ছন্দ বা রূপ-লোকের সহিত মিলন সাধন করিবার চেষ্টা। তাহাতে বরবধূ আপনাদেরই এক চিরন্তন ভাব-রূপের পরিচয় লাভ করে। তুচ্ছতা ও নিত্যদিনের গ্লানি পরিপূর্ণ পরিচিত অবহেলিত মানুষ সেই সুরের স্পর্শে অপরিচয়ের বিস্ময় বিজড়িত হইয়া অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র-লোকের সঙ্গে এক যোগে দুর্লভ সত্তা লাভ করিয়া বসে। নর-নারীর অন্তরে এই সীমাহীন বোধটিকে সঞ্চার করিয়া দিবার প্রেরণার ভিতর দিয়া কবির বিচিত্র সুর সৃষ্টি।

"আর কিছু নয়, আমি গান জোগাতে পারি
তোমাদের মিলন রাতে
আমার সেই নিদ্রাহারা সুদূর রাতের গান ;
তার সুরে পাবে দূরের নূতনকে,
তোমার লাগবে ভালো,
পাবে আপনাকেই আপনার সীমার অতীত পারে।" (পত্রপুট)

যে উপলব্ধি কবির আদি ও অন্তের সকল সৃষ্টি-প্রেরণাকে একটি বৃন্তে বিধৃত করিয়াছে, যে স্থির অধ্যাত্ম পলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া কবির সমগ্র জীবন-দর্শন আবর্তিত হইয়াছে নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"কল্পনায় দেখেছিনু প্রতিধ্বনি মণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর কন্দর-মাঝে।
সেথা বাঁধে বাসা
চতুর্দিক হতে আসি জগতের পাখা-মেলা-ভাষা।
সেথা হতে পুরাণো স্মৃতিরে দীর্ণ করি
সৃষ্টির আরম্ভ বীজ লয় ভরি ভরি
আপনার পক্ষপুটে ফিরে-চলা যত প্রতিধ্বনি।" (কেন)

প্রভাত সঙ্গীতে কবির একটি মূল অধ্যাত্ম উপলব্ধি দুই ভিন্ন রূপে কবি-চেতনায় প্রতিভাত হয়। একটি সীমার সকল বোধ মুক্ত আনন্দের উপলব্ধি। আর একটি রূপ, ধ্বনি, বাণী বা ভাবের চিরন্তনতা বোধ। একদিকে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' অন্যদিকে 'প্রতিধ্বনি' কবিতা।

অগণিত তারকা খচিত রাত্রি এবং সকল রূপের প্রকাশক দিবসের পর্যায় ক্রমে আসা ও যাওয়া, একের পর এক ষড়ঋতুর পরিক্রমা, তাহারই সুরে স্পন্দিত

হইয়া মানুষের হৃদয়-বীণায় দুঃখ সুখের বিচিত্র রাগিণীর ঝঙ্কার, সমুদ্র-পর্বত-অরণ্য-ঝটিকার নিয়ত নিস্বন, প্রকৃতি ও মানব-লোক হইতে উত্থিত বিচিত্র ধ্বনি, কোন কিছুই একান্ত রূপে হারাইয়া যাইতেছে না তাহারা এই বিশ্বের অন্তঃপুরে কোন রূপে থাকিয়া যায়। তাহা আবার বিচিত্র ধ্বনি রূপে ফিরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ লাভ করে।

নিয়ত ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া সমগ্র সৃষ্টি-রূপকে যে ভাবে ধ্বনি তত্ত্বের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহা লক্ষণীয়।

কবির ব্যক্তি-সত্তাটি একটি বাণী-রূপ। কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্মটি সামগ্রিক একটি 'বাণী-ধারা'। কবির গভীরতম সত্তা যেন একটি ধ্বনির বীজ, বিকাশের ভিতর দিয়া ধীরে বিচিত্র বাঙ্ময় রূপ লাভ করিয়াছে।

এক একটি ব্যক্তি সত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই যে বাণীর এক একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, আধার জীর্ণ হইয়া গেলে এই বিশিষ্ট 'আমি' কি শূন্যে শূন্যে অনন্ত কাল রূপের ঘাটে ঠেকিয়া ঠেকিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে? তাহা কি আবার কোন কালে রূপ পরিগ্রহ করে? বাণীকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি রূপের প্রকাশ ও বিনষ্টির অর্থ কি? যে-বাণী কবি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া একটি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত একটির পর একটি পাপড়ি মেলিয়া পূর্ণ বিকশিত হইয়াছে, তাহার সমগ্র অর্থটি কি? এমনি বিচিত্র আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় কবি চিত্ত বিদীর্ণ হইয়া যাইতে চাহিয়াছে।

কবি ইয়েট্সের একটি উক্তি এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আমরা সত্য কি তাহা জানি না, তবে তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করি। যথার্থ সত্য কি তাহা আমরা জানি না, এই উক্তির মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নাই, কিন্তু তাহাকে শৃঙ্খলা বদ্ধ করি এই মন্তব্যটি তাৎপর্য পূর্ণ।

ব্যক্তি সত্তাকে আশ্রয় করিয়া একটা কিছু যে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে সে সম্পর্কে কবি নিঃসংশয় কিন্তু তাহার চরম প্রকাশটি ফুটিয়া উঠা না পর্যন্ত তাহার স্বরূপ আমরা জানিতেই পারি না। সেই কল্প রূপটি কোন্ দিব্য-সত্তার ধ্যানের মধ্যে রহিয়াছে! অন্তহীন ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কে এই একই উপলব্ধি সত্য।

একটি পরিপূর্ণ স্থির ধ্যান-রূপ অগণিত ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। জীবনে ও জগতে সেই প্রেরণা কোন্ দুর্লভ রূপের প্রকাশ ঘটাইবে তাহা কে জানে। আমরা এইটুকু জানি

আমাদের সকল ক্রিয়া, সকল ভাবনা, সকল প্রেরণা সেই এক প্রেরণার অন্তর্গত।

কবির সমগ্র প্রকাশ-রূপটি (আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক) যে একটি বাণী-বন্ধন, কবির এই উপলব্ধিটিই এক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষণীয়।

ভারতীয় রাগ রাগিণীগুলির মধ্যে বিশ্বের এই নির্বিশেষ স্পন্দনের সহিত মানব-হৃদয়কে যুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টাই লক্ষিত হয়। রূপের অতীত এক অন্তহীন ভাবনা-লোকের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা।

অসীম দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত অন্তহীন রূপ বিশিষ্ট এক একটি ছন্দে গড়িয়া তোলা পরমাণুর সমষ্টি। সঙ্গীত তেমনি সুরের আকর্ষণে, একটি বিশিষ্ট ছন্দের টানে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ধ্বনিকে একটি অখণ্ডতা দান করে। সঙ্গীতের রূপ বলিতে এই সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট ছন্দ বুঝায়। সঙ্গীতের এই বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ ছন্দের সহিত বিশ্বছন্দের মিল আছে,—যে আদি স্পন্দন-সমুদ্র হইতে অন্তহীন রূপের নিয়ত প্রকাশ ঘটিতেছে। বিশ্বের সকল স্পন্দিত সত্তার মত সঙ্গীতও একটি স্পন্দিত সত্তা। উভয়ের পশ্চাতে এক আদি স্পন্দনের লীলা। সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই উপলব্ধিকে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে কবির এই উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"অণু পরমাণু অসীম দেশে কালে
বানিয়েছে আপন আপন নাচের চক্র
নাচছে সেই সীমায় সীমায়
গড়ে তুলছে অসংখ্য রূপ।

* * *

মানুষের বোধ যখন বাহন করে সুরকে
তখন বিদ্যুচ্চঞ্চল পরমাণু পুঞ্জের মতোই
সুর সঙ্ঘকে বাঁধে সীমায়,
ভঙ্গি দেয় তাকে,
নাচায় তাকে বিচিত্র আবর্তনে।" (শেষ সপ্তক)

সঙ্গীত সকল নিরুদ্ধ, বিচ্ছিন্ন রূপকে একত্রে আকর্ষণ করিয়া একটি পূর্ণ ঐক্য বা সুষমা দান করে। এই ঐক্য বা সুষমার সহিত বিশ্ব ঐক্য বা সুষমার মিল আছে। এই মিলন লাভের ভিতর দিয়া রূপ আপনার নিত্য স্বরূপতা লাভ করে। বিশ্ব-রূপের যোগে রূপের যে নিত্যতা।

চেতনা-সমুদ্রের যে স্পন্দন হইতে দেশ-কালের সীমায় নিত্যকাল ধরিয়া রূপ নির্ঝরের মত ধারায় ধারায় কেবলই ঝরিয়া পড়িতেছে; সঙ্গীত সেই আদি বিশ্ব-স্পন্দনের কতকটা আভাস দান করিতে পারে। তাই সুরকে আশ্রয় করিয়া মনের মধ্যে কত সংখ্যাতীত, বচনাতীত অলৌকিক ভাবের কুসুম ফুটিয়া ঝরিয়া যায়। বিশ্ব-স্পন্দন-তত্ত্বের সহিত সৃষ্টি তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত। বিশ্বের এই স্পন্দনের সহিত যাহার চেতনা যত অধিক পরিমাণে যুক্ত তাহার চিত্ত-লোকে ভাব তত অফুরান হইয়া ধরা পড়ে।

"—বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু
নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলি পুটে।" (সানাই)

সঙ্গীতের সুর সৃষ্টির প্রথম উচ্চারিত বাণীকে অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দেয়, যে বাণী অসীম বা অরূপের বক্ষে জ্যোতি সীমা টানিয়া টানিয়া অন্তহীন রূপ-লোকের এই প্রকাশ ঘটাইয়াছে। ক্ষুদ্রতম দেশ-কালের বোধ হইতে বৃহত্তম দেশ-কাল পর্যন্ত সেই বাণীর মন্ত্রে বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে অন্তহীন রূপের নিয়ত ফোটা ও ঝরা। একই সৃষ্টি-প্রেরণা বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-সত্তার মধ্যে সঞ্চারিত।

"এ বাঁশি দিবে সে-মন্ত্র যে মন্ত্রের গুণে
আজি এ ফাল্গুনে
কুসুমিত অরণ্যের গভীর রহস্যখানি
তোমার সর্বাঙ্গে মনে দিবে আনি
সৃষ্টির প্রথম গূঢ় বাণী।
সেই বাণী অনাদির সুচির বাঞ্ছিত—
তারায় তারায় শূন্যে হল রোমাঞ্চিত,
রূপেরে আনিল ডাকি
অরূপের অসীমেতে জ্যোতিঃ সীমা আঁকি।" (দূরের গান)

বিশ্ব স্পন্দনই অসীম আকাশে অগণিত জ্যোতিষ্ক রূপে আপনাকে নিত্যকাল ধরিয়া প্রকাশ করিতেছে। আকাশে আকাশে তাই জ্যোতিষ্কের ভাষায় কথা কওয়া। সঙ্গীতের মধ্যেও বাণী নীরব জ্যোতিষ্কের ভাষা লাভ করে। অমনি সুদূর ব্যাপ্ত মহিমা! অমনি নিঃসীম ব্যাকুলতা!

সমগ্র রূপ-লোকের অন্তরে অরূপের জন্য যে চিরন্তন ব্যাকুলতা, সঙ্গীত যেন সেই রুদ্ধ ব্যাকুলতাকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ভারতীয় রাগ রাগিণীগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া এই চিরন্তন বেদনাকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়।

সুদূরতম রূপ-লোক হইতে নিকটতম তৃণ-পুষ্প পর্যন্ত প্রসারিত যে কম্পন, সেই একই স্পন্দন রহিয়াছে সঙ্গীতের অন্তরে। সঙ্গীত মানব-অন্তরে সেই এক স্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই স্পন্দনে ব্যক্তির সহিত বিশ্বের মিলন ঘটিয়া যায়। এই মিলনে ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বের অন্তহীন রূপের যোগে যে পরিব্যাপ্ত মহিমা লাভ করে তাহা অনির্বচনীয়। সঙ্গীত বিশ্ব স্পন্দনের কতকটা আভাস অন্তরের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে পারে বলিয়া চিত্তে কোন্ সুদূর পারের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই ব্যাকুলতা সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির অন্তরে। ইহাকেই প্রকাশ করিতে চাহিয়া তাহার কত কুসুম সজ্জা, কত বিচিত্র বর্ণের বেশবাস। এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া ব্যক্তির অন্তরে কত ভাবের কুসুম, কত ব্যথার মুকুল আকুল হইয়া ঝরিয়া যায়।

"এগানে দিগন্তের সুরে
আলোর কাঁপন খানি লেগেছিল সন্ধ্যা তারকার
সুগভীর স্তব্ধতায়, সে-স্পন্দন শিরায় আমার
রাগিণীর চমকেতে রহি রহি বিচ্ছুরিছে আলো
আজি দেয়ালির দিনে। আজি এই অন্ধকারে জ্বালো
সেই সায়াহ্নের স্মৃতি, যে নিভৃতে নক্ষত্র সভায়
নীহারিকা ভাষা তার প্রসারিল নিঃশব্দ প্রভায়—
যে ক্ষণে তোমার স্বর জ্যোতির্লোকে দিতেছিল আনি
অন্তরের-পথ-চাওয়া ধরিত্রীর সকরুণ বাণী।" (গানের স্মৃতি)

প্রকৃতির মধ্যে যে অর্থহীন নির্বিশেষ ধ্বনি-তরঙ্গ, ঝটিকার স্বননে, নির্ঝরিণীর কিঙ্কিনী ঝঙ্কারে. সমুদ্রের উল্লোল গর্জনে, বনস্পতির শাখা-বাহু আন্দোলনের ভিতর দিয়া প্রসার লাভ করিতেছে; প্রভাতে ও সন্ধ্যায় প্রকৃতি বিচিত্র বর্ণের

ভাষায় যে নিরুদ্ধ ভাব-ভাবনাকে ফুটাইয়া তুলিতে চায়, মানুষ এই বিচিত্র নির্বিশেষ ধ্বনি ও রূপ-তরঙ্গকেই জটিল নিয়ম-সূত্র জালে আবদ্ধ করিয়া তাহার অমর ভাষা-সম্পদ গড়িয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে রবীন্দ্রনাথ মানব ভাষা সৃষ্টি সম্পর্কে কোন মিস্টিক বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্বীকার করিতেন না।

"যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়ম সূত্র জালে
বার্তা বহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।" (জন্মদিনে)

ভারতীয় ধ্বনি-তত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধির আর একটি বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনে ধ্বনির সর্বোত্তম এবং আদি কল্প-রূপ হইতে (archetype) হইতে নিম্নতম জড় রূপ পর্য্যন্ত নিয়ত পরিবর্তন, ভাঙ্গা-গড়া, সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া একটি স্থির রূপ। রবীন্দ্রনাথের নিকট অতীন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সমগ্র প্রকাশ-রূপটি নিয়ত পরিবর্তন, ভাঙা গড়া ও সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। সে বিকাশ কেবল মনোজগতের ক্ষেত্রেই নয়, বহির্বিশ্বের ক্ষেত্রেও সত্য। এই রূপে মনুষ্যও প্রকৃতি সমেত সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মান ধীরে পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, এবং এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া একটি স্থির পূর্ণ রূপ-কল্প ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

"—এই সুর প্রত্যহের অবরোধ 'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবী যুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়।" (সানাই)

(খ)

বহির্বিশ্বের বিচিত্র রূপ ও ধ্বনির অন্তরালে, এই সমস্ত কিছুর অতীত মানুষের সকল ইন্দ্রিয়বোধের, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের পরে একটি সীমাহীন ভাবের জগৎ আছে। বহির্বিশ্বের সহিত সেই অন্তর্বিশ্বের মিল কোন-না-কোন রূপে আছেই; কিন্তু তাহা অনুরূপতার বা সাদৃশ্যের মিল নহে,

কতকটা বৈশাদৃশ্যের মিল। তাই বহির্বিশ্বের রূপ ও ধ্বনিকে অনুকরণ করিয়া অনুসরণ করিয়া অন্তর্বিশ্বের রূপ ও ধ্বনিকে কোন পরিণামে লাভ করিতে পারা যায় না। উভয়ের মর্মমূলে যে বৈপরীত্য আছে তাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। অথচ তাহা একান্ত বিরুদ্ধও নয়, কারণ তাহা হইলে মন কোন অবস্থায় তাহাকে লাভ করতে অথবা আস্বাদ করিতে পারিত না।

ভারতীয় সঙ্গীত ও শিল্প মুখ্যত এই অন্তঃরাজ্যের সুষমা ও ভাবটিকে বাণী ও রূপের আধারে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। প্রকৃতির অনুকরণের চেষ্টা যে আদৌ নাই তাহা নহে, তবে তাহা একান্তই গৌণ। এই চেষ্টা কোথাও এমন আতিশয্য লাভ করিয়াছে, যেক্ষেত্রে বহির্বিশ্বের রূপ ও ধ্বনির মানবিক বোধটিকে প্রায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা প্রথম দৃষ্টিতে একান্ত রূঢ়, ভীতি-বিহ্বল, বিরূপ, শ্বাস-রুদ্ধকারী বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে মানবিক সমগ্র বোধটিই বিদ্রোহ করিয়া বসে। নর নারীর অবয়বে মাধুর্য ও সুষমা ফুটাইয়া তুলিতে যে সকল শিল্পী অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই সকল মাধুর্যের কেন্দ্রগত মূর্তিটিকে বিকলাঙ্গ, বিরূপ, হস্ত-পদ বিহীন করিয়াছেন। ইহাতে ভারতীয় শিল্পের মূল ভাব প্রেরণা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। তাহা হইল সকল রূপের অতীত মাধুর্যের মধ্যে চিত্তকে নিমগ্ন করিয়া দেওয়া। তাহা যে বিশ্বের সকল মাধুর্যের সমাহার সারভূতা তিলোত্তমা নয় তাহা মানবিক সৌন্দর্য বোধের উপরে রূঢ় আঘাত হানিবার চেষ্টার দ্বারাই একান্ত স্পষ্টীকৃত। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুই একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি।

"বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈশাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুইয়ের মধ্যে মিল যে কোন্‌খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল।***

বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এই জন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনই সফল হইতে পারে না।** এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপতাকে উদ্‌ঘাটিত করিবার কাজেই গুণীরা নিযুক্ত।***

তাঁহারা দেখাইয়াছেন, জগতে রূপ জিনিষটা ধ্রুব সত্য নহে, তাহা রূপকমাত্র;

তাহার অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে তবেই তাহার বন্ধন হইতে মুক্তি, তবেই আনন্দের মধ্যে পরিত্রাণ।" (অন্তর বাহির : পথের সঞ্চয়)

তিনি সঙ্গীতের দৃষ্টান্তের দ্বারা এই ভাবটিকে পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমাদের দেশে ভোরবেলাকার যে সকল রাগ রাগিণী আছে, যেমন ভৈরোঁ টোড়ি প্রভৃতি তাহাতে ভোরের জগতেও কোন পরিচিত স্পন্দন বা ওই স্পন্দনাশ্রয়ী ভোরবেলাকার কোন বিশিষ্ট চিত্রও আমাদের মনে আসে না। ভোরের আকাশের যে বিচিত্র রঙ্গফেরা, মৃদু শীতল হাওয়ার স্পর্শে পাতায় পাতায় যে কম্পন প্রাণী-লোকের মধ্যে যে প্রথম প্রাণ-চাঞ্চল্য, গৃহে গৃহে মানুষের যে বিচিত্র সাড়া, প্রাণ স্পর্শে জল-স্থল-অন্তরীক্ষের সেই যে সাড় ও নিঃসাড় সমারোহ, তাহাদের মিলিত যে সিম্ফনি, তাহার কোন পরিচয় তো ভোর-বেলাকার রাগিণীর মধ্যে নাই। তবে তাহাদের ভোরের রাগিণী আখ্যা দান করিবার কারণ কি ?

"তাহার মানে এই, সকাল বেলার সমস্ত শব্দ ও নিঃশব্দতার অন্তরতর সঙ্গীতটিকে গুণীরা তাঁহাদের অন্তঃকরণ দিয়া শুনিয়াছেন। সকালবেলাকার কোনো বহিরঙ্গের সঙ্গে এই সঙ্গীতটিকে মিলাইবার চেষ্টা করিতে গেলে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" (অন্তর ও বাহির : পথের সঞ্চয়)

ভারতীয় রাগ রাগিণীগুলিকে ঋতুতে ঋতুতে শুধু নয়, দিবা ও রাত্রির নানা ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিভাগগুলির সহিত বাহিরের ঋতু পর্যায়ের কোন মিল নাই, দিন রাত্রির বিভাগের মধ্যেও নহে। তাহা এই জগতের অন্তরালবর্তী আর এক ঋতু পর্যায়, আর এক দিন-রজনীর কক্ষাবর্তন।

"বিশ্বেশ্বরের খাস মহলের গোপন নহবত খানায় যে কালে কালে ঋতুতে ঋতুতে নব নব রাগিণী বাজিতেছে, আমাদের গুণীদের অন্তঃকর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছে। বাহিরের প্রকাশের অন্তরালে যে একটি গভীরতর অন্তরের প্রকাশ আছে আমাদের দেশের টোড়ি কানাড়া তাহাই বাজাইতেছে।"

(অন্তর ও বাহির : পথের সঞ্চয়)

"বাহিরের প্রকাশের সঙ্গে এই অন্তরের প্রকাশ একেবারে ভিন্ন জাতীয়।"

(অন্তর ও বাহির : পথের সঞ্চয়)

মানুষের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের যে বোধ গান তাহাকেই ব্যক্ত করিতে চায় না। ইহা সঙ্গীতের রাজ্য নহে। গান মানুষের সুখ-দুঃখ প্রভৃতি মানবিক বোধের সীমাকে অতিক্রম করিয়া চেতনাকে এক ভিন্নতর অন্তহীন

বোধের লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। সে বোধের সমুদ্রে বিশ্বের সকল বোধের ধারা আসিয়া মিলিত হয়, সেই স্পন্দনের সহিত বিশ্বের সকল স্পন্দন মিল খুঁজিয়া পায়। সেই সুরে আমাদের হৃদয় স্পন্দন বিশ্ব-হৃদয় স্পন্দনের সহিত মিলিত হইয়া যায় বলিয়া সমস্ত কিছুর সহিত একাত্মতা বোধ করে। গান তাই ব্যক্তি হৃদয়ের সুখ দুঃখের স্পন্দন নহে, নিখিল বিশ্ব স্পন্দনের বিচিত্র অভিব্যক্তি।

"বস্তুত যেখানে অশ্রুর ভিতরকার অশ্রুটি ঝরিয়া পড়ে না এবং হাস্যের ভিতরকার হাস্যটি ধ্বনিয়া উঠে না, সেই খানেই সঙ্গীতের প্রভাব। সেইখানে মানুসের হাসি কান্নার ভিতর দিয়া এমন একটি অসীমের মধ্যে চেতনা পরিব্যাপ্ত হয় যেখানে আমাদের সুখ দুঃখের সুরে সমস্ত গাছ পালা নদী নির্ঝরের বাণী ব্যক্ত হইয়া উঠে এবং আমাদের হৃদয়ের তরঙ্গকে বিশ্ব হৃদয় সমুদ্রেরই লীলা বলিয়া বুঝিতে পারি।" (অন্তর ও বাহির : পথের সঞ্চয়)

সঙ্গীতের ভাব যেমন মানবিক বোধের অতীত তাহার নিজস্ব একটি বোধ, সঙ্গীতের ছন্দও তেমনি বহির্বিশ্বের ছন্দের অনুরূপ নহে। সঙ্গীতের ছন্দও তাহার একান্ত আপনার সামগ্রী।

"সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটার মতো সঙ্গীতের নিজের একটি ওঠা নামা আছে কিন্তু সে তাহার নিজেরই জিনিস; কবিতার ছন্দের মতো সে তাহার সৌন্দর্য নৃত্যের পাদবিক্ষেপ; তাহা আমাদের হৃদয়াবেগের পুতুল নাচের খেলা নহে।"

(অন্তর ও বাহির : পথের সঞ্চয়)

সঙ্গীতের বিশেষ করিয়া ভারতীয় সঙ্গীতের ফলশ্রুতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই কয়েকটি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি দেখেছি গানের সুর ভালো করে বেজে উঠলেই নেশাটি ঠিক ব্রহ্ম-রন্ধ্রের কাছে ধরে ওঠবা মাত্রেই; এই জন্ম মৃত্যুর সংসার, এই আনাগোনার দেশ, এই কাজ কর্মের আলো আঁধারের পৃথিবীটি বহুদূরে—যেন একটি প্রকাণ্ড পদ্মানদীর পরপারে গিয়ে দাঁড়ায়—সেখান থেকে সমস্তই যেন ছবির মতো বোধ হতে থাকে।* * * সঙ্গীত তার নিজের ভিতরকার সুন্দর সামঞ্জস্যের দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে যেন কী এক মোহমন্ত্রে সমস্ত সংসারটিকে এমন একটি পার্স্পেক্টিভের মধ্যে দাঁড় করায় যেখানে ওর ক্ষুদ্র ক্ষণস্থায়ী অসামঞ্জস্যগুলো আর চোখে পড়ে না—একটা সমগ্র একটা বৃহৎ একটা নিত্য সামঞ্জস্য দ্বারা সমস্ত পৃথিবী

ছবির মতো হয়ে আসে এবং মানুষের জন্ম মৃত্যু হাসি কান্না ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানের পর্যায় একটি কবিতার সকরুণ ছন্দের মতো কানে বাজে।"

(ছিন্নপত্র)

"গীতি কলার নিজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও বিশেষ কাজ আছে। গানে যখন কথা থাকে তখন কথার উচিত হয় না সেই সুযোগে গানকে ছাড়াইয়া যাওয়া, সেখানে সে গানেরই বাহন মাত্র। গান নিজের ঐশ্বর্যেই বড়ো ; বাক্যের দাসত্ব সে কেন করিতে যাইবে। বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেই খানেই গানের আরম্ভ। যেখানে অনির্বচনীয় সেইখানেই গানের প্রভাব। বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।***

গান রচনা করিবার সময় এইটে বারবার অনুভব করা গিয়াছে। গুন্ গুন্ করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখো না মনে', তখনই দেখিলাম সুর যে-জায়গায় কথাটা উড়াইয়া লইয়া গেল কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। তখন মনে হইতে লাগিল আমি যে গোপন কথাটি শুনিবার জন্য সাধাসাধি করিতেছি তাহা যেন বনশ্রেণীর শ্যামলিমার মধ্যে মিলাইয়া আছে, পূর্ণিমা রাত্রির নিস্তব্ধ শুভ্রতার মধ্যে ডুবিয়া আছে, দিগন্তরালের নীলাভ সুদূরতার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া আছে ; তাহা যেন সমস্ত জল-স্থল-আকাশের নিগূঢ় গোপন কথা।"

(গান সম্বন্ধে প্রবন্ধ ঃ জীবন স্মৃতি)

ভারতীয় সঙ্গীত যে রূপের অতীত এক সীমাহীন জগতের আভাস লাভ করিতে চাহিয়াছে, সুরের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া মানবীয় চেতনা যে নিষ্কারণ বেদনায় নিপীড়িত হইয়া সেই লোকে উত্তীর্ণ হইয়া অন্তহীন ব্যাকুলতায় আপনাকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়, রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে উপলব্ধ এই সত্যকে নানা ভাবে নানা প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"এতক্ষণ কোন কাজ না থাকাতে নদীর দিকে চেয়ে গুন্ গুন্ স্বরে ভৈরবী টোড়ি রামকেলি মিশিয়ে একটা প্রভাতী রাগিণী সৃজন ক'রে আপন মনে আলাপ করছিলুম, তাতে অকস্মাৎ মনের ভিতরে এমন একটা সুতীব্র অথচ সুমধুর চাঞ্চল্য জেগে উঠল, এমন একটা অনির্বচনীয় ভাবের আবেগ উপস্থিত হল, এক মুহূর্তের মধ্যেই আমার এই বাস্তব জীবন এবং বাস্তব জগৎ আগাগোড়া এমন একটি মূর্তি পরিবর্তন করে দেখা দিলে, অস্তিত্বের সমস্ত দুরূহ সমস্যার এমন একটা সঙ্গীতময় ভাবময় অথচ ভাষাহীন অর্থহীন অনির্দেশ্য উত্তর কানে

এসে বাজতে লাগল, এবং সেই সুরের ছিদ্র দিয়ে নদীর উপর বৃষ্টির জলের তরল পতন শব্দ অবিশ্রাম ধ্বনিত হয়ে এমন একটা পুলক সঞ্চার করতে লাগল জগতের প্রান্তবর্তী এই সঙ্গীহীন একটি মাত্র প্রাণীকে ঘিরে আষাঢ়ের অশ্রু সজল ঘন ঘোর শ্যামল মেঘের মতো "সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা" এমনি স্তরে স্তরে ঘনিয়ে এল—" (ছিন্নপত্র)

নিখিলের অন্তহীন রূপের সৃজন ও প্রলয়কে আশ্রয় করিয়া যে এক পূর্ণ সুষমা বিরাজমান, ইহা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন। রূপময়, আলোকময়, বর্ণময় এই বিরাট বিশ্বের বিচিত্র কম্পনকে যদি মনে মনে ধ্বনিতে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বিশ্ব সুষমা এক মহান সঙ্গীতে রূপান্তরিত হইয়া যায়। এই বিশ্ব সঙ্গীত কেবল মনের দ্বারাই শোনা সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ এই যে বিশ্ব-সঙ্গীতের কথা বলিয়াছেন, তাহা আদৌ অতি-জাগতিক বোধের কোন ক্রিয়া নয়। তাহা বহির্বিশ্বের রূপ-লোক আশ্রয়ী, বিচিত্র সকল স্নায়বিক কম্পনের যে রূপান্তর ক্রিয়া তাহাও মানস-ধর্মকে আশ্রয় করিয়াছে। অবশ্য মানস-ধর্মকে অতিক্রম করিয়া তাহার অন্তহীন ঊর্ধাভিসারের কথাও আছে।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উপলব্ধি পাঠ করা করা যাইতে পারে—

"অনেকক্ষণ চুপ করে অমিনেষ নেত্রে চেয়ে দেখতে দেখতে মনে হয় যদি এই চরাচর ব্যাপ্ত পূর্ণ নীরবতা আপনাকে আর ধারণ করতে না পারে, সহসা তার অনাদি ভাষা যদি বিদীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায়, তাহলে কী একটা গভীর গম্ভীর শান্ত সুন্দর সকরুণ সঙ্গীত পৃথিবী থেকে নক্ষত্রলোক পর্যন্ত বেজে ওঠে। আসলে তাই হচ্ছে। কেননা জগতের যে কম্পন আমাদের চক্ষে এসে আঘাত করছে তাই শব্দ। আমরা একটু নিবিষ্ট চিত্তে স্থির হয়ে চেষ্টা করলে জগতের সমস্ত সম্মিলিত আলোক এবং বর্ণের বৃহৎ হার্মনিকে মনে মনে একটি বিপুল সঙ্গীতে খানিকটা তর্জমা করে নিতে পারি। এই জগৎ ব্যাপী দৃশ্য প্রবাহের অবিশ্রাম [কম্পন] ধ্বনিকে কেবল একবার চোখ বুজে মনের কান দিয়ে শুনতে হয়।" (ছিন্নপত্র)

রূপ ও ভাব দেখিতে দেখিতে কেমন করিয়া সুরে স্পন্দিত হইয়া যায় এবং সুর কেমন করিয়া আবার ভাব ও রূপে আপনাকে ধরা দেয় তাহার পরিচয় লাভ করিতে রবীন্দ্রনাথের একটি উপলব্ধি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ, সমস্ত সুখ-দুঃখ এক হয়ে তরুলতা

বেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ষা নদীর দুই তীর থেকে একটি সকরুণ সুন্দর সুগভীর রাগিণীর মতো আমার হৃদয়ে এসে প্রবেশ করতে লাগল। *** মানুষের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে; সবসুদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদি অন্তশূন্য প্রশ্নোত্তরহীন মহাসমুদ্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তব্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে।" (ছিন্নপত্র)

ভারতীয় সঙ্গীতের করুণ রাগিণীগুলির মধ্যে যে বেদনা অভিব্যক্ত তাহা মানবজীবনের সীমিত লৌকিক ব্যথা-বেদনা নহে। নিখিল বিশ্বের মর্মমূলে যে অতৃপ্তি, অসম্পূর্ণতা, কোন এক অনির্দেশ্যকে লাভ করিবার জন্য যে চির-নিদ্রাহীন ব্যাকুলতা, যাহা সমগ্র রূপ-লোককে চিরকালের জন্য অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় করুণ রাগিণীগুলি যেন বিশ্বের সেই মর্মাহত বেদনাস্থলটিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

"রামকেলি প্রভৃতি সকাল বেলাকার সুরের একটু আভাস লাগবামাত্র এমন একটি বিশ্ব-ব্যাপী করুণা-বিগলিত হয়ে চারিদিককে বাষ্পাকুল করছে যে এই সমস্ত রাগিণীকে সমস্ত আকাশের সমস্ত পৃথিবীর নিজের দান বলে মনে হচ্ছে।" (ছিন্নপত্র)

"ভৈরবী সুরের মোচড়গুলো কানে এলে জগতের প্রতি এক রকম বিচিত্র ভাবের উদয় হয়—মনে হয় একটা নিয়মের হস্ত অবিশ্রাম আর্গিন যন্ত্রের হাতা ঘোরাচ্ছে এবং সেই ঘর্ষণ বেদনায় সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মর্মস্থল হতে একটা গম্ভীর কাতর করুণ রাগিণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে—সকাল বেলাকার সূর্যের সমস্ত আলো ম্লান হয়ে এসেছে, গাছপালারা নিস্তব্ধ হয়ে কী যেন শুনছে, এবং আকাশ একটি বিশ্বব্যাপী অশ্রুর বাষ্পে যেন আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে—অর্থাৎ, দূর আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় যেন একটা অনিমেষ নীল চোখ কেবল ছল্ ছল্ করে চেয়ে আছে।" (ছিন্নপত্র)

বহির্বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনির প্রত্যেকটির মধ্যে একটি স্বকীয় স্বয়ং সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য থাকিলেও সকল ধ্বনি মিলিয়া-মিশিয়া একটি অখণ্ড সুর ধ্বনিত করে। এই অখণ্ডতাকে বলে হার্মনি বা স্বরসঙ্গতি। কেবল বহির্বিশ্বেই নয়, মানবিক বিচিত্র বোধ তাহার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, আশা-নৈরাশ্য, সংশয় ও অসংশয়, ক্ষোভ-মান-অভিমান সমস্ত কিছু মিলিয়া-মিশিয়া একটি অখণ্ডতার সৃষ্টি করে। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত বহির্বিশ্বের এবং মানব-সমাজের এই হার্মনিটিকে নানাভাবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছে।

এই দিক দিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীতের মধ্যে একটি মূলগত বিভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্যটিকে তীক্ষ্ণ বিচার ও বিশ্লেষণের সহিত যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহারই কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার মনে হয় দিনের জগৎটা য়ুরোপীয় সঙ্গীত, সুরে-বেসুরে খণ্ডে-অংশে মিলে একটা গতিশীল প্রকাণ্ড হার্মনির জটলা। আর রাত্রের জগৎটা আমাদের ভারতবর্ষীয় সঙ্গীত; একটি বিশুদ্ধ করুণ গম্ভীর অমিশ্র রাগিণী।*** প্রকৃতির গোড়ায় একটা দ্বিধা একটা বিরোধ আছে; রাজা ও রাণীর মধ্যে সমস্ত বিভক্ত। দিন এবং রাত্রি, বিচিত্র এবং অখণ্ড, পরিব্যক্ত এবং অনাদি। আমরা ভারতবর্ষীয়েরা সেই রাত্রির রাজত্বে থাকি, আমরা অখণ্ড অনাদির দ্বারা অভিভূত। আমাদের নির্জন এককের গান, য়ুরোপের সজন লোকালয়ের সঙ্গীত। আমাদের গানে শ্রোতাকে মনুষ্যের প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের সীমা থেকে বের ক'রে নিয়ে নিখিলের মূলে যে একটি সঙ্গীহীন বৈরাগ্যের দেশ আছে সেইখানে নিয়ে যায়, আর য়ুরোপের সঙ্গীতে মনুষ্যের সুখ-দুঃখের অনন্ত উত্থান পতনের মধ্যে বিচিত্রভাবে নৃত্য করিয়ে নিয়ে চলে।" (ছিন্নপত্র)

তিনি অন্যত্র এই কথাই বলিয়াছেন,

"য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের দেশের সঙ্গীতের এক জায়গায় মূলতঃ প্রভেদ আছে সে কথা সত্য। হার্মনি বা স্বরসঙ্গতি য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রধান বস্তু, আর রাগরাগিণীই আমাদের সঙ্গীতের মুখ্য অবলম্বন। য়ুরোপ বিচিত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছে, আমরা একের দিকে। বিশ্ব সঙ্গীতে আমরা দেখিতেছি বিচিত্রের তান সহস্র ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতেছে, একটি আর একটির প্রতিধ্বনি নহে, প্রত্যেকেরই নিজের বিশেষত্ব আছে অথচ সমস্তই এক হইয়া আকাশকে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। হার্মনি, জগতের সেই বহু রূপের বিরাট নৃত্যলীলাকে সুর দিয়া দেখাইতেছে। কিন্তু, নিশ্চয়ই মাঝখানে একটি এক-রাগিণীর গান চলিতেছে; সেই রাগিণীর তান লয়টিকেই ঘিরিয়া ঘিরিয়া নৃত্য আপনার বিচিত্র গতিকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। আমাদের দেশের সঙ্গীত সেই মাঝখানের গানটিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই গভীর, গোপন, সেই এক—যাহাকে ধ্যানে পাওয়া যায়, যাহা আকাশে স্তব্ধ হইয়া আছে। চিরধাবমান বিচিত্রের সঙ্গে যোগ দিয়া তাল রাখিয়া চলা, ইহাই য়ুরোপীয় প্রকৃতি; আর চিরনিস্তব্ধ একের দিকে কান পাতিয়া, মন রাখিয়া, আপনাকে শান্ত করা, ইহাই আমাদের স্বভাব।

আমাদের দেশের সঙ্গীতে কি ইহাই আমরা অনুভব করি না। য়ুরোপের সঙ্গীতে দেখিতে পাই, মানুষের সমস্ত ঢেউ-খেলার সঙ্গে তাহার তাল-মানের যোগ আছে, মানুষের হাসি-কান্নার সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। আমাদের সঙ্গীত মানুষের জীবন লীলার ভিতর হইতে উঠে না, তাহার বাহির হইতে বহিয়া আসে। য়ুরোপের সঙ্গীতে মানুষ আপনার ঘরের আলো, উৎসবের আলো, নানা রঙের ঝাড়ে লণ্ঠনে বিচিত্র করিয়া জ্বালাইয়াছে; আমাদের সঙ্গীত দিগন্ত হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য বারবার ইহা অনুভব করিয়াছি, আমাদের সঙ্গীত আমাদের সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। *** আমাদের সঙ্গীত মানুষের প্রমোদ-লীলার সিংহদ্বারটা ধীরে ধীরে খুলিয়া দেয় এবং জনতার মাঝখানে অসীমকে আহ্বান করিয়া আনে। আমাদের সঙ্গীত একের গান, একলার গান—কিন্তু তাহা কোনের এক নহে, তাহা বিশ্বব্যাপী এক।

হার্মনি অতিমাত্র প্রবল হইলে গীতটিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, এবং গীত যেখানে অত্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া উঠিতে চায় সেখানে হার্মনিকে কাছে আনিতে দেয় না।" (সঙ্গীত : পথের সঞ্চয়)

অনুরূপ আর একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে পাঠ করা যাইতে পারে।

"য়ুরোপের গান এবং আমাদের গানের মহল যেন ভিন্ন; ঠিক এক দরজা দিয়া হৃদয়ের একই মহলে যেন তাহারা প্রবেশ করে না। য়ুরোপের সঙ্গীত যেন মানুষের বাস্তব জীবনের সঙ্গে বিচিত্র ভাবে জড়িত। তাই দেখিতে পাই, সকল রকমেরই ঘটনা ও বর্ণনা আশ্রয় করিয়া য়ুরোপের গানের সুর খাটানো চলে; আমাদের দিশি সুরে যদি সেরূপ করিতে যাই তবে অদ্ভুত হইয়া পড়ে, তাহাতে রস থাকে না। আমাদের গান যেন জীবনের প্রতিদিনের বেষ্টন অতিক্রম করিয়া যায়, এই জন্য তাহার মধ্যে এত করুণা এবং বৈরাগ্য; সে যেন বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব হৃদয়ের একটি অন্তরতর ও অনির্বচনীয় রহস্যের রূপটিকে দেখাইয়া দিবার জন্য নিযুক্ত; সেই রহস্যলোক বড়ো নিভৃত নির্জন গভীর—সেখানে ভোগীর আরাম কুঞ্জ ও ভক্তের তপোবন রচিত আছে, কিন্তু সেখানে কর্ম নিরত সংসারীর জন্য কোনো প্রকার সুব্যবস্থা নাই।***

আমি যখনই য়ুরোপীয় সঙ্গীতের রসভোগ করিয়াছি তখনই বারম্বার মনের মধ্যে বলিয়াছি, ইহা রোমান্টিক। ইহা মানব জীবনের বিচিত্রতাকে গানের সুরে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছে। আমাদের সঙ্গীতে কোথাও কোথাও

সে চেষ্টা নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সে চেষ্টা প্রবল ও সবল হইতে পারে নাই। আমাদের গান ভারতবর্ষের নক্ষত্র খচিত নিশীথিনীকে ও নবোন্মেষিত অরুণ রাগকে ভাষা দিতেছে, আমাদের গান ঘন বর্ষার বিশ্বব্যাপী বিরহবেদনা ও নব বসন্তের বনান্ত প্রসারিত গভীর উন্মাদনার বাক্য বিস্মৃত বিহ্বলতা।"

(বিলাতি সঙ্গীত : জীবন স্মৃতি)

রূপ ও ভাবের চিরন্তন দ্বন্দ্বকে রবীন্দ্রনাথ যে তত্ত্ব দৃষ্টির সহায়তায় জয় করিয়া উঠিয়াছিলেন, সেই এক তত্ত্বোপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া তিনি য়ুরোপীয় হার্মনি অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সম্মিলিত ধ্বনি রূপ এবং ভারতীয় গীত অর্থাৎ বাহিরের রূপ ও ধ্বনির অন্তরালবর্তী ধ্বনি ও সুষমাকে মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুত তিনি য়ুরোপীয় হার্মনি ও ভারতীয় গীতের দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ভাব ও রূপের, গীত ও হার্মনির সমন্বয় সাধনের সমস্যা বর্তমান মনুষ্য-সমাজের দার্শনিক সমস্যার একটি দিক। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের মধ্যে এই সমস্যার একটি সমাধান লাভ করিতে পারা যাইবে। সঙ্গীত সম্পর্কে তিনি একথা বলিয়াছেন—

"গীত ও হার্মনির যে মিলিবার দিন আসিয়াছে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। সেই মিলনের আয়োজনও শুরু হইয়াছে।" (সঙ্গীত : পথের সঞ্চয়)

বাহিরের রূপ ও মানবিক বিচিত্র বোধকে আশ্রয় করিয়া কবি-চিত্ত ক্ষণে ক্ষণে যে সীমাহীন প্রসার বোধ করে এবং এই পরিণাম মুহূর্তে কবি কণ্ঠে সুর যে আপন আপন বিশিষ্ট অখণ্ড রূপ লইয়া প্রকাশিত হয় তাহার নানা পরিচয় কবির রচনাবলীর মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়। বহির্বিশ্বের বিশিষ্ট কোন রূপ মানবিক কোন বোধ একটি অখণ্ড সঙ্গীত রূপে কবির নিকট অনুভূত হয়, আবার বিশিষ্ট কোন সুর কোন্ রহস্যের বশে একটি কোন রূপ ও ভাবকে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। এই রূপে কবি-চেতনা মুহূর্তে মুহূর্তে রূপ হইতে সুরে এবং সুর হইতে ভাবে আসা যাওয়া করিয়াছে। আপনার জীবনের এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেই তিনি হার্মনি ও গীতের মধ্যে যে একটি মিলন তত্ত্ব কোন-না-কোন রূপে আছে এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হন। তাহার পর সমগ্র জীবন ধরিয়া এই উভয়ের রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য যে দেশেই হোক-না-কেন সঙ্গীত প্রাকৃত জগৎকে প্রকাশ করে না। মানুষের বিশিষ্ট কোন আনন্দ-বেদনা, ভয় বা উৎসাহকে

প্রকাশ করে না। সঙ্গীত এই সমস্ত কিছুর নির্বিশেষ প্রকাশ। পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত তাই সর্বাংশে সত্য নহে। এই সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য এক দার্শনিকের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"—it never expresses the phenomenon, but only the inner nature, the in-itself of all phenomena, the will itself. It does not therefore express this or that particular and definite joy, this or that sorrow or pain, or horror or delight, or merriment, or peace of mind themselves, to a certain extent in the abstract, their essential nature, without accessories, and therefore without their motives."

(Sopenhauer : World as Will and Idea)

পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত যে কেবল মাত্র বহির্বিশ্বের বিচিত্র ভাব ও ধ্বনিকেই রূপায়িত করিতে চায় নাই, তাহাও যে বহির্বিশ্বের অন্তরালবর্তী চিরন্তন এক সঙ্গীতকে নানাভাবে রূপায়িত করিতে চাহিয়াছে তাহার নিদর্শন স্বরূপ আর একটিমাত্র উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। অনুরূপ নানা অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"There are three kinds of music, the music of the worlds, the music of humanity, the music of instruments. Of the music of worlds, one is of the elements, another of the planets, another of time. Of that which is of the elements, one is of number, another of weights, another of measure. Of that which is of the planets, one is of place, another of motion, another of nature. Of that which is of Time, one is of the days and the vicissitudes of light and darkness ; another of the months and the waxing and waning of the moon ; another of the year and the changes of springs, summer, autumn and winter. Of the music of humanity, one is of the body, another of the soul, another in the connextion that is between them."

(Hugh of St. Victor)

সাহিত্য-জিজ্ঞাসা

(ক)

একদিকে ব্যক্তি-সত্তা, অন্যদিকে নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব সমাজ। বহির্বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তি চেতনা যতই প্রসার লাভ করে, বিশ্বের বিচিত্র সামগ্রীর সহিত ব্যক্তি যতই একাত্মতা বোধ করিতে থাকে, ব্যক্তির সৌন্দর্য ও রসবোধের সীমা ততই বাড়িয়া যায়।

বিশ্বতোমুখীন মানব-চিত্তের আনন্দ, সৌন্দর্য ও রসবোধের ধীর বিকাশের এই প্রেরণাই সৃষ্টি প্রেরণা। সাহিত্যে শিল্পে বা আর্টে ইহারই প্রকাশ।

বিশ্বের সহিত মিলনের এই উপলব্ধির প্রকাশ যেখানে সত্য, সেখানে সাহিত্য, শিল্প বা আর্ট মানুষের অনিবার্য স্বীকৃতি লাভ করে। সাহিত্যে বা শিল্পে রিয়েলিটি বলিতে এই উপলব্ধিকে বুঝায়, বিষয়বস্তুর যাথার্থে বা শ্রেণী বিচারে নয়।

নিখিল মানব ও বিশ্বের সহিত মিলনে বাধার অন্ত নাই। সে বাধা শাস্ত্রের, প্রথার, প্রচলিত নীতি ও শিক্ষার। এই বিচিত্র সীমার বন্ধনে মানুষের মন বাঁধা পড়ে বলিয়া বহির্বিশ্বের অনন্ত সত্য স্বরূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। ব্যক্তির সেই বেদনাময় চৈতন্য দরকার যাহা বাহিরের এই জাতীয় বিচিত্র বাধাকে অতিক্রম করিয়া এক অখণ্ড সত্য স্বরূপকে নানা রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। কোন কবি বা শিল্পীর জীবনে এই সাক্ষাৎকার সত্য হইলে মানব-চিত্তে চিরকালের জন্য সে আপনার স্থানটিকে জয় করিয়া লয়।

বিশ্বের সহিত যোগে চেতনা যখন যথেষ্ট বিকশিত নয়, তখন বিশ্বে সৌন্দর্যের সামগ্রী একান্ত বিশিষ্ট। বিশ্বের অধিকাংশ ভাগই তখন অসুন্দর, সুন্দর-অসুন্দরের ভেদরেখা তখন অত্যন্ত স্পষ্ট। চেতনা যতই প্রসার লাভ করে, বিশ্বের সহিত ব্যক্তির যোগ যতই গভীর হয়, মানুষ ততই বাহিরের রূপের বন্ধনকে ছাড়াইয়া মানসিক বা চারিত্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে। আপাত দৃষ্টিতে তাহা হয়ত কোথাও আদৌ সুন্দর নয়। এই সাক্ষাৎকারের আনন্দ মানব-চিত্তে অনেক বেশি গভীর, অনেক স্থায়ী।

বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তি-চেতনার প্রসার ঘটে, আবার এই প্রসারতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপেরও ধীর রূপান্তর ঘটিয়া চলে। এইজন্য বিশ্ব প্রকৃতির স্বরূপ বা সৌন্দর্যের ধীর বিকাশের ধারা উপলব্ধির ভিতর দিয়া মানব মনের বিকাশের ধারা নির্দেশ একান্ত সম্ভব।

মনুষ্য-চেতনা যেখানে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট দেখিতে কোথাও লেশমাত্র বাধা বোধ করে না, যখন সে 'সর্বমেবাবিশন্তি' তখন আর রূপ-বিরূপের কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। তাহা নির্বিচার একাকারত্বের কোন বোধও নয়। বৈচিত্র্যের বোধ তখনও থাকে; কিন্তু এই পরিণামে বিশ্বের সকল রূপ ও বিরূপ এক অলৌকিক উপায়ে সামঞ্জস্যীভূত হইয়া পরিপূর্ণ শ্রী বা সুষমা লাভ করে। তাহাকে ঠিক সুন্দর বলা যায় না, তাহা 'মনোহর' বা 'অনুপম'।

সাহিত্য বিচার করিবার সময় তাই আমাদের দেখিতে হইবে স্রষ্টার সহিত বিশ্বের মিলন কত গভীর, কতদূর প্রসারিত। বিশ্বের সহিত মিলন যাহার যত গভীর তাহার সাহিত্য বা শিল্প তত উন্নত। সাহিত্যে এই মিলনের গভীরতাই বড় কথা। কিছু অনুশীলন সাপেক্ষ হইলেও অনুভূতির প্রসারতা বা গভীরতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে রূপের (Form) অলৌকিক উপায়ে ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতে থাকে।

বৃহৎ বিশ্বের সহিত যোগ বিরহিত যে ব্যষ্টি-সত্তা বা আমি তাহার কোন সৃষ্টি নাই। নিখিল মানব-সমাজের সমষ্টিভূত যে চৈতন্যময় আমি, তাহারই মধ্যে আপনাকে ধীর পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার ফলে যে আনন্দের সঞ্চার তাহাই বিচিত্র সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ব্যক্তি আমি এইরূপে ধীর আত্ম প্রসারের ভিতর দিয়া একটি পরিণামে সমগ্র মানব-সমাজের চেতনাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে পারে।

ব্যক্তি আমি যেমন সমষ্টি-আমির যোগে ধীর বিকাশ লাভ করে, সমষ্টি-আমি তেমনি বিশ্ব-আমির যোগে বিকাশ লাভ করে।

সমগ্র মানব-সমাজের সকল অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বিকাশের একটি স্থির ধ্যান-রূপ আছে বিশ্ব-আমির মধ্যে। এই বিশ্ব-আমিকে আশ্রয় করিয়া পরম জাগতিক আমি অন্তহীন সীমা রূপে নিত্যকাল ধরিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

সাহিত্য বলিতে তাই ব্যক্তি-আমির সহিত সমষ্টি-আমির এবং সমষ্টি-আমির

সহিত বিশ্ব-আমির এবং বিশ্ব-আমির সহিত পরম জাগতিক আমির ক্রমিক যোগের তত্ত্বকে বুঝায়।

শাস্ত্রে ভূমার উপলব্ধি সম্পর্কে একথা বলা হইয়াছে, যিনি ভূমাকে লাভ করেন তিনি আপনার চেতনাকে সর্বত্র অনুপ্রবিষ্ট দেখেন এবং সমস্ত কিছুকে আপনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট দেখেন। সেই পরম অস্তিত্ববোধে মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়। তখন যে-কোন প্রাণের জন্য প্রাণ বিসর্জন একান্ত সহজ হইয়া পড়ে। মানুষের চেতনা যতই বিশ্বতোমুখীন হয় তাহার মধ্যে আনন্দ ততই অপরিসীম হইয়া পড়িতে থাকে। এই অপ্রমেয়কে সে তখন আর আপনার সীমিত তুচ্ছ জীবনের আবেষ্টনের মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তখন মানুষ নানা ভাবে আত্মত্যাগ করে। সাহিত্য ও শিল্প মানুষের এই অপরিমিত বোধের প্রকাশ।

বিশ্ব-মানব তাহার সকল চেষ্টার ভিতর দিয়া যে-এক উদ্দেশ্যকে ফুটাইয়া তুলিতে ব্যাপৃত, মানুষ তখন আপনার ব্যক্তিগত বোধের সীমার বাহিরে আসিয়া সেই প্রয়োজন সাধনের কার্যে হস্তক্ষেপ করে। সেই মহা মানব জীবনের উপলব্ধির আনন্দকে মানুষ সাহিত্য ও শিল্পের ভিতর দিয়া প্রকাশ করে। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

"যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টিকে থাকার মধ্যেই আমার টিকে থাকা সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়; সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্য সকলে কাছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই আগের সঙ্গে ঐক্য বোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য ঘটে সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য; সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানাপ্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই। টিকে থাকবার অসীমতা বোধকে অর্থাৎ 'আপনার থাকা অন্যের থাকার মধ্যে' এই অনুভূতিকে মানুষ নিজেরই ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনিক ব্যবহারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখতে পারে না। তখন সেই মহাজীবনের প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে নানা প্রকার সেবায় ত্যাগে সে প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।"

(সাহিত্য : সাহিত্যে পথে)

ভারতীয় দর্শনে মায়াবাদ সকল সীমাবোধের, সকল রূপ-বিরূপের ঊর্দ্ধতর একটি তত্ত্ব পরিণামকে লক্ষ্য করিয়াছে। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রও এই

তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া সকল সীমা ও রূপবোধের ঊর্দ্ধতর সেই এক পরিণাম লাভকে সাহিত্যের লক্ষ্য স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছে।

মায়াবাদীগণের ব্রহ্ম যেমন সামঞ্জস্যের নিখিল যোগের তত্ত্ব নয়, তাহা যেমন সকল যোগ, সকল সামঞ্জস্যের ঊর্দ্ধতর পরিণাম, ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রও তেমনি সকল সামঞ্জস্য ও যোগের তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়াছে। মায়াবাদীগণের মত ভারতীয় অলঙ্কার ও সকল প্রকার শিল্পশাস্ত্রের লক্ষ্য ব্যক্তিগত মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সাধনায় যেমন, সাহিত্য সাধনাও তেমনি যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে তাহা পূর্ণ যোগ বা সামঞ্জস্যের উপলব্ধি।

সাহিত্যের লক্ষ্য আপনাকেই উপলব্ধি করা। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তা 'আমি' বা 'অহং' বলিতে পরিণামে যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে তাহা এক নির্বিশেষ চৈতন্যের উপলব্ধি। তাহাতে ব্যক্তির অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য, বিশ্বের সহিত যোগে সেই অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ধীর বিকাশ এবং এইরূপে পরিণামে বিশ্বাতীতের সহিত যোগ;—এই পরিপূর্ণ 'আমি'র কোন উপলব্ধি নাই।

ভারতীয় দার্শনিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে অহং-এর উপলব্ধিতে দেশ-কালের বোধ লইয়া মানবিক সকল বোধের নিঃশেষ বিলুপ্তি বুঝায়। রবীন্দ্রনাথের আমিত্বের পূর্ণ প্রকাশে বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তি-চেতনার ধীর প্রসার বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন বোধ এবং পরিশেষে বিশ্বাতীতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগের লীলা বুঝায়। রবীন্দ্রনাথের ইহাই মুক্তি তত্ত্ব।

বিশ্বের সহিত ব্যক্তির এই যোগের তত্ত্বটিই আবার রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-তত্ত্ব। সমগ্র দেশকাল, নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া এক অখণ্ড সুষমা বিরাজ করিতেছে। আমাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সুষমার অভাব বলিয়া আমরা ইহাকে দেখিতে পাই না। বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির বিচিত্র বোধের যতই বিকাশ ও সামঞ্জস্য ঘটিতে থাকে, ব্যক্তি বিশ্বের মধ্যে ততই সামঞ্জস্য বা সুষমা খুঁজিয়া পায়। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ মিলনে ব্যক্তি ও বিশ্বের সুষমা বোধেরও পূর্ণতা। তখন আমাদের অন্তরস্থিত একের সহিত বিশ্ব একের মিলন ঘটে।

কোন বস্তুকে আমরা তখনই সুন্দর বলি যখন তাহার মধ্যে একটি ঐক্য বা বা সুষমা ফুটিয়া উঠে। এই সুষমাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বিশ্ব সুষমার আভাস লাভ করে; কিংবা বলা যায়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ বিশ্ব সুষমার আভাস লাভ করে তাহাকেই আমরা বলি সুন্দর। সুন্দর সামগ্রীর সহিত

বিশ্ব সুষমার মিল আছে বলিয়া মানুষ যে-কোন সুন্দর সামগ্রী আশ্রয় করিয়া বিশ্ব সুষমাকে অপরোক্ষ করিতে পারে।

যাহা বিশ্ব-ছন্দ বা সুষমাকে যত অধিক পরিমাণে ফুটাইয়া তুলিতে পারে, এই ফুটাইয়া তুলিবার সামর্থ যাহার মধ্যে যত বেশি, তাহা তত সুন্দর। তাহা আমাদের গভীরতম সত্তাকে তত গভীর করিয়া আলোড়িত করে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার লক্ষ্য মুক্তি। তাহাতে কোন একটি উপায়ে মানবিক বোধকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার লক্ষ্য পূর্ণতা। বিশ্বের যোগে ব্যক্তির সমগ্র সত্তার ধীর বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধন।

ব্যক্তি-চেতনার বিকাশ লাভের এবং এইরূপে ব্যক্তি ও বিশ্বের সামঞ্জস্য সাধনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-সত্য ব্যক্তির অন্তরে ব্যাপকতর হইয়া ধরা পড়িতে থাকে। মিলন বোধের ভিতর দিয়া সত্যের যে উপলব্ধি তাহাই সৌন্দর্য বোধ। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের মিলন যেখানে সম্পূর্ণ সেখানে সত্য ও সৌন্দর্যের উপলব্ধিও সম্পূর্ণ।

বিশ্বের যোগে ব্যক্তির জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে এই যে পূর্ণতার সাধনা তাহার কোন পরিচয় যেমন ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় নাই, তেমনি সৌন্দর্য-তত্ত্বের এই সংজ্ঞাও ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে অপরিচিত। সেখানে সৌন্দর্যের সংজ্ঞাটিই অতি মানবিক বা অতিজাগতিক বোধ প্রসূত।

বিশ্ব হইতে বিশিষ্ট কয়েকটি সহ্য সুখ প্রদ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া আমরা এক একটি বোধের জগৎ, সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া তুলিয়া আশ্বস্ত হই। বিশ্বের আর সমস্ত কিছু আমাদের নিকট বিরূপ, অসুন্দর, অপরিচয়ের ভীতি বিজড়িত। ইহাদের সম্পর্কে আমাদের মন কেবল উদাসীন নয়, ইহাদের পরিহার করিবার জন্য আমরা সদা সচেষ্ট; কারণ ইহাদিগকে আমরা জীবন বিকাশের প্রতিকূল বলিয়া বোধ করি।

আমাদের বোধের জগৎ প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জীবন ও জগতের দুঃখকরতা ও বিরূপতার মধ্যেও আমরা নিহিত অর্থ এবং কল্যাণের সন্ধান পাই। একটি মহত্তর ভাবের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দর সুখকর ও দুঃখকর সকল সামগ্রী সামঞ্জস্যীভূত হইতে থাকে। উভয়কে তখন একটি গভীরতর সৌন্দর্যের প্রকাশ রূপে দেখা সম্ভব হয়। বিশ্বে অপরিচয়ের ভীতি জনিত বিরূপতা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। চেতনার এমন পরিণাম আছে, যে-পরিণামে

মনুষ্য-চেতনা বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এক অখণ্ড সুষমার সন্ধান লাভ করে, তাহার মধ্যে বিশ্বের সকল রূপ ও বিরূপ, সকল আনন্দ ও বেদনা, সকল পাপ ও পুণ্য বিধৃত হইয়া আছে। তাহা এক মহান ওঁ, অর্থাৎ হাঁ,—যাহার মধ্যে জগৎ ও জীবনের সমস্ত কিছুর পূর্ণ স্বীকৃতি।

বিশ্বের যোগে ক্রমিক আত্ম প্রসারের ভিতর দিয়া এবং এইরূপে পূর্ণ সৌন্দর্যাভিমুখী হইয়া মানুষ জগৎ ও জীবনের ক্রমিক উন্নততর, উদারতর সৌন্দর্য-লোক একের পর এক উদ্ঘাটন করিয়া চলিয়াছে।

নিখিল বিশ্বময় সকল সুন্দর ও অসুন্দর, সকল রূপ ও বিরূপকে আশ্রয় করিয়া এক অখণ্ডতা বিরাজ করিতেছে। এই অখণ্ডতার ভিতর দিয়া অসীমের আনন্দ নিত্যকাল ধরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

বিশ্বকে যখন কেবল প্রকাশ-রূপে দেখি তখন দেখি কেবল মৃত্যুর প্রবাহ, অবিরাম, অনর্থক, ভয়াবহ সঙ্ঘাত। বিশ্বকে যখন সমগ্র রূপে অখণ্ড রূপে পরিপূর্ণ আনন্দের দিক হইতে দেখি তখন বিশ্ব এক অন্তহীন আনন্দের প্রকাশ রূপে ফুটিয়া উঠে।

জীবনে দুঃখ আছে, প্রাণধারণের জন্য নিয়ত সংগ্রাম আছে; ইহা জীবনের একটি দিকের প্রকাশ। কিন্তু মানুষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়, দুঃখ ভোগ করে, এই সকলের অতীতে আনন্দ আছে বলিয়া। আনন্দ না থাকিলে মানুষ কোন রূপ চেষ্টাই করিত না। খেলার দুঃখ ভোগটুকুকে দেখা, খেলাকে সমগ্র রূপে দেখা নয়। আনন্দই দুঃখ ভোগ রূপে প্রকাশ পাইতেছে, এই দেখাই খেলার সমগ্র রূপটিকে দেখা। আনন্দ না থাকিলে কেহ খেলার দুঃখ ভোগ করিত না। জীবনের অখণ্ডতার এই দিকটির পরিচয় তিনি নিম্নরূপ ভাবে দান করিয়াছেন—

"জগতে শক্তির লড়াইটাকে প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা***। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড় কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি চলতে চান, জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই?***

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কো হোবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেই বা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত—অর্থাৎ কেই

বা দুঃখদ্বন্দ্ব লেশমাত্র স্বীকার করিত —আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখ-দ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে তত খানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ তো আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও, কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না।"

(কবির কৈফিয়ৎ : সাহিত্যের পথে)

মানুষের সৃষ্টি-রূপের মধ্যে নিখিল বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ একটি অখণ্ডতা বা সামঞ্জস্য আছে। এই অখণ্ডতা বা সামঞ্জস্য আছে বলিয়া রূপ সকল রূপের অতীত অনির্বচনীয় আনন্দকে প্রকাশ করে।

বস্তুত সৃষ্টি-রূপ বলিতে আমরা সেই রূপটিকেই বুঝি যাহা মানব মনকে সকল সীমা বা রূপের অতীত এক সীমাহীন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তবে রূপ-সৃষ্টি অর্থাৎ অখণ্ডতা বা সামঞ্জস্যের বোধ ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে আছে, ক্রমিক বৃহত্তর ক্ষেত্রেও আছে। ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য বলিতে উপাদানের স্বল্পতা বুঝায়, বৃহত্তর ক্ষেত্রে এই উপাদানগুলি সংখ্যায় বিপুল, সেগুলি যেমন বহু বিচিত্র তেমনি জটিল।

নিখিল বিশ্বের মধ্যে যে অখণ্ডতা ও সামঞ্জস্য, মানুষের সৃষ্টি-রূপের মধ্যে সেই এক অখণ্ডতা ও সামঞ্জস্য। মানুষের সৃষ্টি-রূপ তাই বিশ্ব-সৃষ্টির পূর্ণ সামঞ্জস্যের অনুরূপ। বিশ্বের অনাদ্যন্ত অখণ্ড সঙ্গীতের সহিত সুর মিলাইয়া মানুষের সৃষ্টি রূপ লাভ করে। মানুষের সৃষ্টি-রূপের মধ্যে যে সুষমা তাহা বিশ্ব সুষমাকে কোন-না-কোন রূপে প্রকাশ করে বলিয়া মানুষের সৃষ্টি আমাদের চেতনাকে বেদনায় নিপীড়িত করিয়া এক অতল মাধুরীর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

অনুরূপভাবপ্রকাশক রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি :

"আর যেখানে পূর্ণতার উপলব্ধি তার চিত্তে আবির্ভূত হয় সেখানে সেই দৈববাণীটিকে নিজের কোষাগারে, নিজের বিপুল রাজ্যে, সাম্রাজ্যে কোথাও আর ধরে রেখে দিতে পারে না। সর্বজনের ও নিত্যকালের হাতে তাকে সমর্পণ করা ছাড়া গতি নেই। একেই বলে প্রকাশ। (সাহিত্য : সাহিত্যের পথে)

"আনন্দ যেখানে রূপ ধরেছে সেইখানে সেই প্রকাশ মৃত্যুকে অতিক্রম করেছে।" (সাহিত্য : সাহিত্যের পথে)

"যেহেতু সাহিত্য ও ললিতকলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ, এই জন্যে তথ্যের পাত্রকে আশ্রয় করে আমাদের মনকে সত্যের স্বাদ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। এই স্বাদটি হচ্ছে একের স্বাদ অসীমের স্বাদ।" (তথ্য ও সত্য : সাহিত্যের পথে)

"রূপের সীমা আছে। কিন্তু রূপ যখন সীমা মাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জালিয়ে ধরে তখনই সত্য প্রকাশ পায়।" (সৃষ্টি : সাহিত্যের পথে)

"অখণ্ড একের মূর্তি যে আকারেই থাক না, অসীমকেই প্রকাশ করে : এই জন্যই সে অনির্বচনীয়, মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।" (তথ্য ও সত্য : সাহিত্যের পথে)

"যাকে জানা যায় না, যার সংজ্ঞা নির্ণয় করা যায় না, বাস্তব ব্যবহারে যার মূল্য নেই, যাকে কেবল একান্ত ভাবে বোধ করা যায়, তারই প্রকাশ সাহিত্য কলায় রসকলায়।" (সাহিত্যধর্ম : সাহিত্যের পথে)

সাহিত্য এবং সকল প্রকার শিল্প-কর্ম চরম সত্যের আভাসকেই যে নানা ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে চাহিয়াছে, এই সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য মনীষী মাত্রেই একমত। এই মনোভাবটিকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন এমন একজন পাশ্চাত্ত্য চিন্তাশীলের একটি বিস্তারিত অভিমত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি।

"This intuition of the Real lying at the root of the visible world and sustaining its life, is present in a modified form in the arts : perhaps it were better to say, must be present if these arts are to justify themselves as heightened forms of experience. It is this which gives to them that peculiar vitality, that strange power of communicating a poignant-emotion, half torment and half joy, which baffle their more rational interpreters, which was not to reproduce the illusion of ordinary men but to catch and translate for us something of that" secret plan", that reality which the artistic consciousness is able, in a measure to perceive. "Painting as well as music and poetry exists and exults in immortal thoughts," says Blake. That "life-enhancing power" which has been recognized as the supreme quality of good painting, has its origin in this contact

of the artistic mind with the archetypal-if or you like, the transcendental-world : the underlying verity of things.

A critic, in whom poetic genius has brought about the unusual alliance of intuition with scholarship, testifies to this same truth when he says of the ideals which governed the early Chinese painting. "In this theory every work of art is thought of as an incarnation of the genius of rhythm, manifesting the living spirit of things with a clearer beauty and intenser power than the gross impediments of complex matter allow to be transmitted to our senses in the visible world around us. A picture is conceived as a sort of apparition from a more real world of essential life."

(Laurence Binyon, Painting in the Far East : Eievyn Under hill : Mysticism)

(খ)

অসীমের প্রেরণায় সীমা কেবল পরিবর্তিত হইতেছে না, উহার ভিতর দিয়া সীমা ক্রমাগত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। নিখিল বিশ্ব এই প্রেরণায় আকার বিহীন অস্পষ্টতা হইতে ক্রমেই আকার বদ্ধ সুস্পষ্টতা লাভ করিতেছে।

নিখিল বিশ্ব রূপ সম্পর্কে একথা যেমন সত্য, ব্যক্তি রূপ সম্পর্কেও একথা তেমনি সত্য ; অর্থাৎ সেই একই প্রকাশের প্ররণায় ব্যক্তি রূপ ক্রমেই বিশিষ্টতা লাভ করিতেছে।

ব্যক্তির মধ্যে প্রকাশের যে প্রেরণা তাহাতে ব্যক্তির নির্বিশেষ জটিল বিচিত্র সৃষ্টি-রূপের ভিতর দিয়া ক্রমেই স্পষ্ট আকার লাভ করিয়া নির্দিষ্টতা লাভ করিতে থাকে। ইহাই একদিক দিয়া ব্যক্তির স্বাধর্ম্য লাভ। প্রকাশ রূপের নিয়ত চেষ্টার ভিতর দিয়া ব্যক্তির ধর্মটি ধীরে সত্য, সুনির্দিষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। অপ্রকাশ কুঁড়ি যেমন ফুলের মধ্যে আপনার প্রকাশ কতকটা খুঁজিয়া পায়, ফুল তেমনি ফলের মধ্যে আপনার প্রকাশকে আরও স্পষ্ট করিয়া লাভ করে। এমনি করিয়া স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরের দিকে রূপের নিয়ত গতি।

ব্যক্তি-মানসের বিচিত্র প্রকাশ রূপের ভিতর দিয়া বিশ্ব-মানসরূপটিও ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, ব্যক্তি মানসের ব্যক্তির স্বাধর্ম্যের এই বিকাশটিই রবীন্দ্র-দর্শনের একটি মূল উপলব্ধি। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া ব্যক্তি আপনার স্বাধর্ম্যটিকেই ক্রমাগত সত্য করিয়া লাভ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবন দেবতা শ্রেণীর কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যে তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা স্বয়ং সম্পূর্ণ হইলেও তাঁহার অজ্ঞাতে, তাঁহার সচেতন অভিপ্রায়ের অতীত কোন এক প্রেরণার ফলে সেই সকল কবিতাকে অতিক্রম করিয়া সর্বত্রই এমন একটি অর্থের প্রকাশ ঘটিয়া গিয়াছে, যাহা তাঁহার পূর্বাপর সকল কাব্য রচনাকে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাব-সূত্রে বিধৃত করিয়াছে। পরবর্তী কালে অতীত সকল সৃষ্টি কর্মকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করিয়া কবি এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছেন।

বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কেও একথা সত্য। অর্থাৎ বিশ্বের সকল সাহিত্য-কর্মের যেমন একটি স্বয়ং সম্পূর্ণতার দিক আছে, তেমনি একটি অবিচ্ছিন্নতার দিক আছে। এই অবিচ্ছিন্নতা সূত্রে বিশ্বের পূর্বাপর সকল সাহিত্য বিধৃত।

ব্যক্তির রচনা যেমন ব্যক্তি-মানসের ধীর প্রকাশের পরিচয় বহন করে, বিশ্ব-সাহিত্যও তেমনি বিশ্ব-মানব-মনের ধীর প্রকাশের পরিচয় বহন করে।

সংখ্যাতীত বৈচিত্রময় মানব মনকে আশ্রয় করিরা বিশ্ব-মন আপনাকে ধীরে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। এই প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিমন নানা বাধার সৃষ্টি করিয়া বসে। আমরা মানব মনকে গড়িয়া তুলিতে চাই বুদ্ধিগ্রাহ্য, বিচিত্র স্বার্থের অনুকূল নানা ধ্যান-ধারণা আশ্রয় করিয়া। এই ভাবে সর্বত্রই মানুষ কোন-না-কোন ভাবে প্রথম হইতেই অন্যের মনের মত হইয়া, অন্যের প্রয়োজনের অনুকূল হইয়া দাসের মত গড়িয়া উঠে। একদিকে জাতীয়তা বোধ, সমাজবোধ, ধর্মবোধ প্রভৃতি যেমন, তেমনি অন্যদিকে বর্তমান বণিক ও যান্ত্রিক সভ্যতাও মানুষকে নানা ভাবে মজুর করিতেছে মাত্র। মানুষ একান্ত আপনাকে, আপনার অসীমতা ও অন্তহীন মাধুর্যকে কোথাও আর লাভ করিতে ও প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। 'আমি' সেই বিশিষ্ট সত্তা যাহার তুলনা বিশ্বে আর কোথাও নাই। তাহা সম্পূর্ণ একক, অনন্য সাধারণ।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম ও সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে এইরূপে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য বোধ এক চূড়ান্ত পরিণাম এবং চরম মূল্য লাভ করিয়াছে।

আবার সকল মনকে আশ্রয় করিয়া পরমের একটি স্থির ধ্যান বা বিশ্ব-মানব-মনের প্রকাশ ঘটিতেছে বলিয়া তাহা অন্তহীন, অর্থহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে হারাইয়া যাইতেছে না। বন্ধন বাহিরে কোথাও নাই, কোন তত্ত্বের মধ্যে না,—তাহা সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্ম যাহাকে আশ্রয় করুক-না, তাহা আছে একমাত্র ব্যক্তির অন্তরে।

এই তত্ত্বাশ্রয়ী করিয়া তিনি সৃষ্টির স্বরূপ নির্দেশ নিম্নরূপ ভাবে করিয়াছেন—

"মানব প্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তি বিশেষের যে অনন্য সাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের।"

(সাহিত্যের বিচার : সাহিত্যের পথে)

"সাবেক কালের কাব্য নাটকে আমরা যাদের দেখতে পাই তারা এক একটি টাইপ, তারা শ্রেণীগত; তাই তারা একই জাতীয় অনেকগুলি মানুষের ভাঙা-চোরা উপকরণ দিয়ে তৈরি। কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যে আমরা যে চরিত্র দেখি তা ব্যক্তিগত।" (সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্যের পথে)

"যাকে আমরা পুরোপুরি দেখতে পাই তাকে আমাদের ভালো লাগে। যাকে উদাসীন ভাবে দেখি তাকে পুরো দেখি নে; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি তাকেও না; যাকে দেখার জন্যেই দেখি তাকেই দেখতে পাই।

* * *

কবি বল, চিত্রী বল, আপনার রচনার মধ্যে সে কী চায়। সে বিশেষকে চায়। মানুষের সৃষ্টি চেষ্টাও সেই রকম অনির্দিষ্ট সাধারণ থেকে সুনির্দিষ্ট বিশেষকে জাগাবার চেষ্টা। আমাদের মনের মধ্যে নানা হৃদয়াবেগ ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে সুরে কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে ওঠে তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান। হৃদয়াবেগকে প্রকাশ করা হল বলেই যে আনন্দ তা নয়। তাকে বিশিষ্টতা দেওয়া হল বলেই আনন্দ। সেই বিশিষ্টতার উৎকর্ষেই তার উৎকর্ষ। মানুষের যে কোন রচনা সেই উৎকর্ষ পেয়েছে তাকেই আর্ট সৃষ্টি রূপে দেখি; সেই একান্ত দেখাতেই আনন্দ।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

প্রকাশ-রূপের ভিতর দিয়া মানুষ স্বাতন্ত্র্য লাভ করে, এবং তাহারই অনবরত চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষের এই স্বাতন্ত্র্য ক্রমেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্য লাভই স্বধর্ম লাভ।

কিন্তু আমাদের প্রায় পনেরো আনা কাজই পরের কাজ; সমাজের, পরিবারের বা মনিবের। আপনার প্রকাশের ক্ষেত্রে দুঃখ ও কষ্টভোগ যতই

থাক তাহার পশ্চাতে আনন্দের অনুভূতি আছে বলিয়াই আকাঙ্ক্ষিত। কারণ দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। অন্যদিকে পরের কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রকাশের আনন্দ থাকে না বলিয়া সে দুঃখভোগে আত্মা নিগৃহীত ও ক্লিষ্ট হয়।

সমাজকে তাই এমন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে যে অবস্থায় সকল মানুষ আপনার স্বধর্মের অনুকূল কর্ম করিতে পারে। এই আনন্দ প্রেরণায় ব্যক্তির কাজ মাত্রেই সৃষ্টি। সে ক্ষেত্রে সমাজ মনুষ্য সমষ্টির সামগ্রিক সৃষ্টি রূপ।

স্বধর্মকে আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি আত্ম প্রকাশ করিতে পারিলে ব্যক্তি যে আপনার আনন্দ রূপ, আপনার পূর্ণ স্বরূপের সন্ধান পায়, কেবল তাহাই নয়, কেবল মাত্র এই উপায়ে বিশ্বমন আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া এবং এই প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের নানা স্বার্থ, মন গড়া নানা মত একান্ত বাধার সৃষ্টি করিতে পারে না বলিয়া তাহা সমগ্রের আহ্বানে ব্যক্তির সমগ্র সত্তার সাড়া বলিয়া সাহিত্য সৃষ্টির সঙ্গে আর সকল সৃষ্টি অন্তহীন হইয়া পড়ে। ইহাতে মানব সমাজ দ্রুত বিকাশ প্রাপ্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার স্থিতিশীল রূপটিকে স্বীকার করিতেন না। সভ্যতার এই রূপটিকে স্থিতিশীল সপ্রমাণ করিতে যে-সকল দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতি গড়িয়া তোলা হইয়াছে, স্বাভাবিক ভাবে সে গুলিকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

সমাজের সহিত সাহিত্যের নিগূঢ় যোগের কথা স্বাভাবিক ভাবে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের ক্ষেত্রে দার্শনিক বোধের পার্থক্যের জন্যই লাভ করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আসলে মানুষের গলদটা এইখানে যে পনেরো আনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ। যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মতো অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। ***

কিন্তু, মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয় নিজের মনিবকে নয় কোন প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্ম প্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর কেহ কিম্বা আর কিছুর মতো করিতে বাধ্য। ***

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের দাসত্ব করিতে হইতেছে।"

(কবির কৈফিয়ৎ : সাহিত্যের পথে)

যাহার চেতনা যত উন্নত, যত ব্যাপক, যত বিশ্বতোমুখীন, সমাজ ও জাতির অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি, ত্রুটি ও দুর্বলতা তাহার ততই দৃষ্টি গোচর হয়, বেদনা তাহাকে তত বেশি নিপীড়িত করে। সামাজিক অসঙ্গতি রবীন্দ্রনাথকে এত বেশি পীড়িত করিয়াছিল এবং এই সকল অসঙ্গতি ও মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনা হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার জন্য তাহাকে এমনি নিরন্তর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তাহার মূলে আছে আপনার চেতনাকেই সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দিবার অতি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা।

সমগ্র সমাজকে পরিব্যাপ্ত করিয়া যদি একটি অভিপ্রায়মুখী সদা জাগ্রত চেষ্টা না থাকে, সমগ্র সমাজে মঙ্গল-অমঙ্গলের যদি একটি সাধারণ মান না থাকে, যদি একটি ভাবগত ঐক্যে সকলে অনুপ্রাণিত না হয়, সমাজের কোন একটি অঙ্গের আঘাত যদি বেদনাকে সর্বত্র সমান ভাবে সঞ্চারিত না করে, সমাজের এক অঙ্গের অবমাননা যদি সমানভাবে সকলকে অপমানিত না করে, সাধারণ সুখ দুঃখ বোধে যদি সকলে সমানভাবে সুখ দুঃখ বোধ না করে, সমাজে সর্বত্র যদি সজীব মনুষ্যত্বের বিচিত্র ক্রিয়া চাঞ্চল্য না লক্ষ্য করা যায়, যদি বিচিত্র বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধ অভিপ্রায়ের দ্বারা সমাজ খণ্ড বিখণ্ড হয়, তবে সেই দেশে সেই সমাজে বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি হইতেই পারে না, মহৎ প্রতিভার জন্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে।

সমাজে যে কর্ম চাঞ্চল্যে যে অখণ্ডতাবোধে ভাবের যে একতান প্রবাহে বিচিত্র প্রতিভার জন্ম হয়, তাহা নিরুদ্ধ হইয়া জাতি দিনে দিনে অধোগতি প্রাপ্ত হয়, সর্বত্র মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের কর্মধারা উভয়মুখীন ছিল।—সাহিত্য সৃষ্টির ভিতর দিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে অখণ্ডতাবোধকে ধীরে জাগাইয়া তোলা, আবার এই অখণ্ডতা বোধের অনুপ্রেরণায় আপনার সৃষ্টি প্রেরণাকে নিরন্তর সঞ্জীবিত করিয়া রাখা।

যে দর্শন একক মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে, সমাজ ও জাতির তথা সমগ্র মনুষ্য-সমাজের বিকাশ ও উন্নতিকে অসম্ভব বলিয়া বোধ করিয়াছে, যেখানে মানুষ মানুষের সম্প্রদায়গত এবং সেইসঙ্গে অধিকারগত বিভাগকে জন্মলব্ধ, ঈশ্বর নির্দিষ্ট এবং পরম ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করে, সেখানে জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিতে

পারে না। রবীন্দ্রনাথ তাই বিশ্বাস করিতেন প্রাচীন মহাকাব্য ছাড়া ভারতীয় সাহিত্যে আজ পর্যন্ত জাতীয় সাহিত্য রচিত হয় নাই। তাহার মধ্যে ঐতিহাসিক বিকাশের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ নাই। সাহিত্য সৃষ্টি তাহা যত মহৎ হোক-না-কেন তাহা একক প্রতিভার ফল।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা ও সাহিত্য সাধনা পৃথক ছিল না। একটি ছাড়া অপরটির অস্তিত্ব অসম্ভব। সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণ বিকাশ ছাড়া ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ হইতেই পারে না। বিশিষ্ট সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণ বিকাশ সমগ্র বিশ্বের পূর্ণ বিকাশের যোগেই সম্ভব। এইরূপে পরিণামে সমগ্র বিশ্বের পূর্ণ বিকাশের সহিত ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ বিজড়িত। রবীন্দ্রনাথ একক মুক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। একটি মানুষের নিয়তির সহিত সমগ্র বিশ্বের নিয়তি বিজড়িত। বিশ্বে একটি মাত্র মানুষ অসম্পূর্ণ থাকিলে সকল মানুষের পূর্ণতা নিরুদ্ধ হইয়া থাকিবে।

সমগ্র মানব ভাগ্যের সহিত বিজড়িত করিয়া সাহিতের এই বিশিষ্ট সাধনা প্রাচীন ও মধ্যযুগে কোথাও ছিল না। এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ আধুনিক।

(গ)

বাহিরে যে জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি, যাহা তথ্যের বা রূপের জগৎ, বিজ্ঞান যে জগতের নিয়ম আবিষ্কার করিতে ব্যাপৃত, সেই বিপুল প্রকাশমান জগতের অতীতে একটি অচিন্তনীয় বিপুল জগৎ আছে, যাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়া মানবিক বুদ্ধি ও মন দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না। এই যে অপর আর এক জগৎ তাহার সহিত বহির্বিশ্বের যোগ কোন-না-কোন প্রকারে আছেই, কিন্তু সে যোগ অনুরূপতার যোগ নহে, তাহা বরং কতকটা বৈসাদৃশ্যের যোগ।

কবি বা শিল্পী বা গায়কের জীবনে এই উন্নততর জগতের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার কোন-না-কোন প্রকারে থাকে। সেই উপলব্ধির রহস্যকে তাঁহারা রূপের জগতে, সুরের, রেখার, রঙের সীমায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন। ইহা সম্পূর্ণ এক পৃথক অনুভূতি বলিয়া বাহিরের রূপ, ধ্বনি, রঙ ও রেখার অনুকরণের দ্বারা আদৌ প্রকাশ লাভ করিতে পারে না। কবি শিল্পী বা সঙ্গীতকারের সম্পূর্ণ রূপায়ণ প্রক্রিয়াটাই অলৌকিক।

রবীন্দ্রনাথ ইহা নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,—

"বাহিরের সঙ্গে ভিতরের একটা যোগ আছে বটে, কিন্তু সে যোগ

অনুরূপতার যোগ নহে; বরঞ্চ দেখিতে পাই, সে যোগ সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের যোগ। দুই মিলিয়া আছে, কিন্তু দুয়ের মধ্যে মিল যে কোন্‌খানে তাহা ধরিবার জো নাই। তাহা অনির্বচনীয় মিল; তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ যোগ্য মিল নহে।"

(অন্তর বাহির : পথের সঞ্চয়)

"বিশ্বরূপের অন্তরতর এই অপরূপকে প্রকাশ করিবার জন্যই শিল্পীদের গুণীদের এত ব্যাকুলতা। এইজন্য তাঁহাদের সেই চেষ্টা অনুকরণের ভিতর দিয়া কখনোই সাধন হইতে পারে না।*** এই পৃথিবীর অন্তরতর অপরূপতাই আমাদের চিত্তের সামগ্রী। অভ্যাসের আবরণ মোচন করিয়া সেই অপরূপকে উদ্‌ঘাটিত করিবার কাজেই কবিরা গুণীরা নিযুক্ত।" (অন্তর বাহির : পথের সঞ্চয়)

সাহিত্যের মধ্যে যে ভাবের জগৎ, তাহা যুগে যুগে নিত্য নূতন সাহিত্য-কর্মের ভিতর দিয়া নিত্য নূতন রূপ লইয়াই কেবল প্রকাশ লাভ করিতেছে না, তাহার ক্ষেত্রও ক্রমেই ব্যাপক হইয়া চলিয়াছে।

মানব মনের বহির্ভাগে একটি সীমাহীন বাণী-লোক, রূপ-লোক অথবা কল্প-লোক আছে, যাহা অন্তহীন মানব মনকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে বিচিত্র রূপে প্রকাশ করিতে চায়। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া মানব মনের যতই প্রসার ঘটিতেছে, এই বাণী-লোক বা কল্প-লোকের ততই প্রকাশ ঘটিতেছে।

প্লেটোর দার্শনিক চিন্তায় এমনি একটি চিরন্তন ভাব-লোকের পরিচয় লাভ করা যায়। শিল্পী বা কবি যেমন করিয়া বহির্বিশ্বের রূপ ও ভাবনাকে চিত্রে ও কাব্যে রূপায়িত করেন ঈশ্বর তেমনি করিয়া এই চিরন্তন ভাব-লোকের অনুরূপ এই নিখিল বিশ্বকে রূপায়িত করিয়াছেন।

সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় পৃথক কোন অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। তিনি বোধ করিতেন এই চিরন্তন ভাবনা বা বাণী-লোকের মধ্যেই রূপ লাভের প্রেরণা নিগূঢ় হইয়া আছে। তাহা নিত্য রূপ-লাভের জন্য মানুষের সুপ্ত চৈতন্যের দ্বারে দ্বারে ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়া ফিরিতেছে। কোন রূপই তো সম্পূর্ণ নয়; রূপ আবার কালে জীর্ণ হইয়া পড়ে। তখন এই সকল ভাবনা রূপ কল্পনা হারাইয়া যায় না। তাহারা আবার ওই রূপহীন চিরন্তন বাণী-লোকটিকে ফিরিয়া লাভ করে। এমনি ভাব ও রূপের চিরন্তন আসা ও যাওয়া।

যে কবির কল্পনা যত সমৃদ্ধ, যাহার চেতনার প্রসার যত বেশি তাঁহার কাব্যে রূপের অতীত অপরূপ জগতের আভাস তত বেশি ফুটিয়া উঠে। তাঁহার কাব্য পাঠে পাঠক চিত্ত ততই পরিতৃপ্তি লাভ করে।

"এই যে মানুষের জগৎ ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্য নূতন। নব নব ইন্দ্রিয় নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্য)

"হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্য)

"কবির কল্পনা সচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয় ততই তাহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানব বিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্য)

"আইডিয়ার প্রবাহ অনাদি উৎস থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শত সহস্র মনের মধ্যে দিয়ে অনন্ত কালের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই সূত্রে আমার সঙ্গে সমস্ত অতীত কালের এবং অনাগত কালের যোগ—সেই ভাবরাজ্যে আমি সমস্ত মনুষ্য। ** সেখানে আমার আনন্দ এবং বেদনা বিশ্বব্যাপী।" (ছিন্নপত্র)

ঈশ্বরের অসীম ভাবনার উৎস হইতে নিখিল বিশ্বের অন্তহীন রূপ নিয়তই ঝরিয়া পড়িতেছে। বিশ্বরূপ সেই মহাকবির মহাকাব্য। বিশ্বসঙ্গীত সেই মহান গায়কের অনির্বচনীয় আনন্দ-রূপের প্রকাশ। বহির্বিশ্বের রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের ভিতর দিয়া মানব অন্তরে বিচিত্র ভাবনা সঞ্চারিত হইয়া যায়। কবি শিল্পী বা গায়ক আপন আপন অন্তরে সঞ্চারিত ভাবনাকে বিচিত্র সৃষ্টি-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন মাত্র। তিনি এই কথাই বুঝিয়াছেন—

"ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত ; মানব হৃদয়ের আনন্দ সৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ সৃষ্টির আনন্দ গীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয় বীণা তন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে, সেই যে মানস-সঙ্গীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ।*** বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার সম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে, এই বাণীও তেমনি দেশে দেশে ভাষায় ভাষায়, আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্য)

তাই তিনি সাহিত্যের নিম্নরূপ সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন—

"বহিঃ প্রকৃতি ও মানব চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার

ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, ভাষা রচিত সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।" (সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্য)

এই চিরন্তন ভাব, বাণী বা রূপ-লোটিকেই রবীন্দ্রনাথ কোথাও অসীম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সৃষ্টি রূপের ভিতর দিয়া রূপকে অতিক্রম করিয়া মানুষ যখন এই অসীমকে উপলব্ধি করে তখন মানব অন্তরে সকল শূন্যতার ব্যথা অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহা অন্তরস্থিত অসীমতার উপলব্ধি। সৃষ্টি-রূপের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার সেই গভীরতম সত্তাকে নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করে যাহা বিশ্বেরও গভীরতম সত্তা। এই নিবিড় উপলব্ধিতে ব্যক্তি ও বিশ্ব একাকার হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ এই দিকটিকে পরিস্ফুট করিয়াছেন—

"কাব্যে, চিত্রে, গীতে শিল্প কলায়,*** যখন পরিপূর্ণ এককে চরম রূপে দেখি তখন আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়।"

(তথ্য ও সত্য : সাহিত্যের পথে)

"অন্তরের এক বাহিরের একের মধ্যে আপনাকে পায় বলে এরই নাম দিই আনন্দ রূপ।" (তথ্য ও সত্য : সাহিত্যর পথে)

"এই সমস্তকে বিরাজ করে এই সমস্তের অতীত একটি ঐক্য তত্ত্ব, তাকে বলি সৌন্দর্য। সেই ঐক্য উদ্‌বোধিত করে তাকেই যে আমার অন্তরতম ঐক্য, যে আমার ব্যক্তি পুরুষ।" (সাহিত্যতত্ত্ব : সাহিত্যের পথে)

"রসমাত্রেই তথ্যকে অতিক্রম করে তাকে অনির্বচনীয় ভাবে অতিক্রম করে। রস পদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না।" (সাহিত্যতত্ত্ব : সাহিত্যের পথে)

"আপন অন্তরে ব্যক্তি পুরুষকে নিবিড় করে অনুভব করি, যখন আপন বাহিরে গোচর হয়েছে রসাত্মক রূপ।" (সাহিত্যতত্ত্ব : সাহিত্যের পথে)

দৃশ্যমান জগতের অতীত এই যে চিরন্তন অনন্ত প্রসারিত ভাবনা, কল্পনা বা বাণী-লোক রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বলিয়াছেন বাস্তব। সাহিত্যের মর্মলোক এই বাস্তব অনুভূতিটিকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। এই অনুভূতি বহির্জীবনের নানা উপকরণকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশলাভ করে। প্রসারিত কালের ক্ষেত্রে তাহার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি নিয়তই ঘটিয়া চলে কিন্তু ওই আস্বাদ মৃত্যুঞ্জয়ী। এই আস্বাদকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য অমর। তিনি ইহা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন—

"তবে কবিদের অবলম্বনটা কী। একটা কিছুর 'পরে জোর করিয়া তাঁহারা তো ভর দিয়াছেন। সেটা অন্তরের অনুভূতি এবং আত্মপ্রসাদ। কবি যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব প্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহ থাকিবে না। বিশ্ববস্তু ও বিশ্বরসকে একেবারে অব্যবহিত ভাবে তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন, এইখানেই তাঁহার জোর।"

(বাস্তব : সাহিত্যের পথে)

"এই বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদা সর্বদাই হয়ে থাকে, যুক্তি সংগত। যে-কোন রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব। ছন্দে ভাষায় ভঙ্গিতে ইঙ্গিতে যখন এই বাস্তবতা জাগিয়ে তোলে, সে তখন ভাষায় রচিত একটি শিল্পবস্তু হয়ে ওঠে। তার কোনো ব্যবহারিক অর্থ না থাকতে পারে, তাতে একটা কিছু প্রকাশ পায় যা tease us out of thought as doth eternity." (সাহিত্য তত্ত্ব : সাহিত্যর পথে)

এক্ষেত্রে সাহিত্য বিচারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি তিনি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

এই বাস্তবতাকে যাহাকে তিনি বিশ্ববস্তু বা বিশ্বরস বলিয়াছেন, তাহাকে কেমন করিয়া লাভ করা যাইতে পারে? তাহা অসীমের উপলব্ধি বলিয়া মনকে সকল সীমার বোধ হইতে মুক্ত করিতে হয়। শিক্ষা, সংস্কার, প্রথা, শাস্ত্র, প্রচলিত নীতি এই সকলই সীমার বোধ। এই সকল বোধ হইতে চিত্ত যতই মুক্তি লাভ করে, উহা ততই প্রসারতা পরিশুদ্ধতা ও স্বচ্ছতা লাভ করে, দৃষ্টি ততই অবাধ পরিব্যাপ্ত হয়।

চিত্তের বন্ধন মুক্তি ঘটিলেই যে বাস্তবের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে তাহা সত্য নহে। চিত্তের বন্ধন মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বৃত্তির প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ তাহার নাম দিয়াছেন কল্পনা। এই কল্পনাবৃত্তি যাঁহার মধ্যে যত সমৃদ্ধ, যত উন্নত তিনি এই উন্নততর জগতের আভাস তত বেশি লাভ করেন। একমাত্র এই কল্পনার সহায়তায় মানুষ বিশ্ব-প্রকৃতি এবং বিশ্ব-মানবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে পারে। এই কল্পনাই বাস্তব কোন ঘটনাকে তাহার একান্ত

বাস্তবতা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সুদূরতা ও ব্যাপকতা দান করিয়া তাহাকে একটি অখণ্ড রূপ দান করিতে সমর্থ হয়।

এই ভাবনা সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি, এই কল্পনা শক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ ক'রে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ ক'রে তাকে মনোময় করে তুলতে পারে।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্যের পথে)

"ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।" (সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্যে পথে

(ঘ)

বিশিষ্ট কোন কবির সৃষ্টি প্রেরণার মধ্যে রূপ সৃষ্টির বা চরিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য অথবা ভাবনার বৈচিত্র্য যতই থাক-না-কেন সেই সমস্ত কিছুকে পরিব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া কবির একটি স্থির উপলব্ধির প্রকাশ কোন-না-কোন রূপে থাকে। তাহাকে নিঃসংশয় রূপে বুদ্ধি গ্রাহ্যতার সীমায় ধরিবার উপায় নাই, কিন্তু তাহার অস্তিত্বে কোন সংশয় থাকে না।

পাঠকের মধ্যে যদি স্রষ্টার সমধর্মিতা অন্তত আংশিক পরিমাণে থাকে, কাব্য পাঠের ভিতর দিয়া পাঠক যদি কবি কল্পনার সহিত অন্তত কতকটা একাত্মতা বোধ করিতে পারেন, তবে কোন-না-কোন ভাবে কবির ভাব জগতের, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির অপরোক্ষ বিশিষ্ট সাক্ষাৎকারের আভাস লাভ করিতে পারিবেন ; সেখান হইতে কবির সকল কল্পনা, ভাবনা, সৃষ্ট সকল চরিত্র শতধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

যিনি এই ভাব জগৎটির কোন-না-কোন রূপ পরিচয় দান করিতে পারেন তিনি সাহিত্যের প্রকৃত বোদ্ধা ও বিচারক।

কবির এই যে বিশিষ্ট ভাবনা-লোক তাহা কবি-মনের কৃত্রিম কোন রচনা নহে। নিখিল বিশ্ব প্রকৃতি ও মানব-সমাজ কবির বিশিষ্ট সংস্কার, রুচি,

প্রবণতা ও শিক্ষার সহিত মিশ্রিত হইয়া কবি-মনে একটি বিশিষ্ট সত্য রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। ইহাই কবির ভাবনা-লোক।

কবি মনের এই ভাবনা আবার বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। সকল মনের নিকট তাহার আবেদন আছে। সকল মন কবির ভাবনা-লোকের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিতে পারে, তাহার কারণ সকল মনকে পরিপূর্ণ করিয়া ব্যাপ্ত করিয়া পরিণামে তাহাদের অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে একটি সর্বসাধারণ বোধের জগৎ। রবীন্দ্রনাথ এই বোধের জগতের নাম দিয়াছেন বিশ্বমন।

কবি কল্পনা যতই প্রসারিত ও উন্নত হয়, কবি-চেতনা বিশ্ব-মানব এবং প্রকৃতির সহিত যতই একাত্মতা বোধ করে তাঁহার মধ্যে বিশ্বমনের আভাস ততই ফুটিয়া উঠে।

বিশ্বমনের যে প্রেরণা নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া আপনাকে নিরন্তর সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিতেছে, সেই একই প্রেরণা অন্তহীন ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া অবিরাম সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। স্রষ্টার সৃষ্টি প্রেরণা তাই বিশ্বান্তর্গত এক অমোঘ নিয়মের অধীন। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"তাঁহাদের নিজের অগোচরে তাঁহাদের চেষ্টার অতীত প্রদেশ হইতে একটা বিশ্বব্যাপী গূঢ় চেষ্টার প্রেরণায় সমস্ত বাধা ও অস্পষ্টতার মধ্য হইতে আপনিই একটি মানস রূপ, যাহাকে 'ধরি ধরি মনে করি ধরতে গেলে আর মেলে না', কখনো অল্পমাত্রায় কখনো অধিকমাত্রায় প্রকাশ হইতে থাকে। যে গূঢ়দর্শী ভাবুক, কবির কাব্যের ভিতর হইতে এই সমগ্র রূপটিকে দেখিতে পান তিনিই যথার্থ সাহিত্য বিচারক।

*** আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালি ব্যাপার নহে, ইহা বস্তু সৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণু পরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবল বেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্বত কানন নদ-নদী মরু-সমুদ্রকে দেখি সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে; ইহাও আমার তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটা ভাগ।" (সাহিত্য সৃষ্টি : সাহিত্য)

সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে তিনটি জগতের যুগপৎ ক্রিয়া বিগুমান। স্রষ্টার মন বহির্বিশ্ব হইতে নিয়ত আপনার মনের অনুকূল করিয়া কতকগুলি সামগ্রী

সংগ্রহ করিতেছে। এই সামগ্রীগুলির সহিত স্রষ্টার মন কল্পনা যোগে একাত্মতা বোধ করে। বহির্বিশ্ব এইরূপে মনোধর্মিতা লাভ করিয়া সম্পূর্ণ মানসিক হইয়া উঠে। ইহাই স্রষ্টার মনোজগৎ। সাহিত্য সৃষ্টি কেবলমাত্র এই মনোজগতের রূপায়ণ নয়।

বিশ্বমন এই মানসিক জগৎ হইতে আপনার অনুকূল করিয়া বিশিষ্ট কতকগুলি সামগ্রী সংগ্রহ করে। এই সংগৃহীত সামগ্রীই সাহিত্যের সামগ্রী। ব্যক্তি মনে তন্ময় অবস্থায় বিশ্বমনের যে আভাস আসিয়া পৌছায় সেই সাক্ষাৎকারের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া মনোজগতের কতকগুলি সামগ্রী আকৃষ্ট হইয়া আসে। সাহিত্য-রূপ বলিতে এই আকৃষ্ট সামগ্রীকে বুঝায়। সৃষ্টি বিশ্ব-মনের এক একটি স্পন্দন-রূপ। রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক কয়েকটি উক্তি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"মন প্রাকৃতিক জিনিসকে মানসিক করিয়া লয়, সাহিত্য সেই মানসিক জিনিসকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।" (সাহিত্যের বিচারক : সাহিত্য)

"জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানব মন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানব মন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্বাচন্ করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।"

(সাহিত্যের বিচারক : সাহিত্য)

"জগতের উপর মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপর বিশ্বমনের কারখানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।"

(সাহিত্যের বিচারক : সাহিত্য)

মানুষ আপনাকে নিবিড় করিয়া উপলব্ধি করিতে চায়। এই নিবিড় উপলব্ধিই আনন্দের। বহির্বিশ্বের সহিত যোগ প্রসারের ভিতর দিয়া মানুষের এই ব্যক্তিত্বের উপলব্ধির প্রসারতা ঘটে। দেহকে বিশ্ব-দেহের, প্রাণকে বিশ্ব-প্রাণের, মনকে বিশ্ব-মনের এবং পরিশেষে ব্যক্তি-আত্মাকে বিশ্বাত্মার সহিত যোগ সাধনের নিয়ত চেষ্টার ভিতর দিয়া মানব বিশ্ব-মানব হইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে। ওই পরিণাম লাভের দিকে তাহার সকল গতি। বিশ্ব-পুরুষের সহিত এইভাবে ব্যক্তি-পুরুষের বিচিত্র যোগ সাধনের যে আনন্দ সাহিত্য সেই আনন্দোপলব্ধির প্রকাশ।

সমাজে অধিকাংশেরই মন অসাড়। আপনাদের সীমায় আপনারা একান্ত

আবদ্ধ বলিয়া উপলব্ধির আনন্দ বঞ্চিত। স্রষ্টার জীবনে সত্তার উপলব্ধি নিবিড়, বিশ্বের সহিত যোগে তাহা বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত। সমাজের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের বক্ষে তাঁহাদের সৃষ্টি এক একটি উজ্জ্বল আলোক বর্তিকা স্বরূপ।

সমাজ জীবনের ন্যায় জাতির জীবনে এমনি এক একটি উপলব্ধির যুগ আসে, যে সময়ে জাতি আপনাকে গভীর ও ব্যাপক ভাবে উপলব্ধি করে; তাহার আনন্দ তখন বিচিত্র সৃষ্টি রূপে আত্ম প্রকাশ করে। বিশ্বমানব সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রেও এমনি এক-একটি উজ্বল মুহূর্তের পরিচয় আছে। অবিচ্ছিন্ন কালের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের মধ্যে এই মুহূর্তগুলি এক একটি উজ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।

এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুই একটি অভিমত পাঠ করা যাইতে পারে।

"আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিত কলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমানে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।" (সাহিত্য তত্ত্ব : সাহিত্যের পথে)

"মানব চিত্তের এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকা ক্ষেত্রে বেদনা-বোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান করে তুলছে। রূপে সেই সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তি পুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত। এই ব্যক্তি পুরুষ মানুষের অন্তরতম ঐক্য তত্ত্ব; এই মানুষের চরম রহস্য। এ তার চিত্তের কেন্দ্র থেকে বিকীর্ণ হয়ে বিশ্ব পরিধিতে পরিব্যাপ্ত—আছে তার দেহে, কিন্তু দেহকে উত্তীর্ণ হয়ে; আছে তার মনে কিন্তু মনকে অতিক্রম ক'রে; তার বর্তমানকে অধিকার ক'রে অতীত ও ভবিষ্যতের উপকূলগুলিকে ছাপিয়ে চলেছে। এই ব্যক্তি পুরুষ প্রতীয়মান রূপে যে সীমায় অবস্থিত সত্যরূপে কেবলই তাকে ছাড়িয়ে যায় কোথাও থামতে চায় না; তাই এ আপন সত্তার প্রকাশকে এমন রূপ দেবার জন্য উৎকণ্ঠিত যে-রূপ আনন্দময়, যা মৃত্যুহীন। সেই-সকল রূপ সৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা। এই সকল সৃষ্টিতে ব্যক্তি-পুরুষ পরম পুরুষের বাণীর প্রত্যুত্তর পাঠাচ্ছে, যে পরম পুরুষ আলোকহীন তথ্যপুঞ্জের অভ্যন্তর থেকে আমাদের দৃষ্টিতে আপন প্রকাশকে নিরন্তর উদ্ভাসিত করেছেন সত্যের অসীম রহস্যে, সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তায়।"

(সাহিত্যতত্ত্ব : সাহিত্যের পথে)

ঈশ্বরের মধ্যে পরিপূর্ণতার একটি ধ্যান রূপ আছে। বাহিরে রূপের জগতে অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া এই ধ্যান-রূপটিকেই তিনি ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। নিখিল বিসৃষ্টির অন্তরালে পূর্ণতাভিমুখীন এই ইচ্ছাই মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল। এই প্রেরণার বশবর্তী হইয়া মানুষ আপনাকে অন্তহীন সৃষ্টি বৈচিত্র্যরূপে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। এই সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া সে ক্রমেই আপনার লক্ষ্যকে গভীর করিয়া লাভ করিতেছে।

যেখানে মানুষের সকল জ্ঞানের কর্মের প্রেমের সম্পূর্ণতা তাহার আদর্শ সকল অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছে। তাহা চিরস্থির অচঞ্চল এবং ধ্রুব। মানুষ তাহার সাধানার সকল দিক ব্যাপ্ত করিয়া সেই আদর্শকে ক্রমাগত সত্য করিয়া লাভ করিতেছে। পরিপূর্ণতার এই যে আদর্শ তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বিশ্ব মন।

বিশ্বমনের মধ্যে পূর্ণ যে প্রকাশ-রূপ মানব মনে তাহারই কোন-না-কোন প্রকার আভাস থাকে। মন যতই বিস্তৃত হয় বিশ্বরূপের আভাস তত অধিক রূপে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। অন্তহীন মানব মনের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিশ্বমনের প্রকাশ কোন-না-কোন রূপে ঘটিতেছেই।

সেই পূর্ণতার আদর্শ কি, তাহা ব্যক্তিমন বা সমষ্টিভূত মনের উপলব্ধিগম্য হইতেই পারে না, তাহা সমষ্টিভূত মনের সীমাকে সকল সময় ছাড়াইয়া রহিয়াছে বলিয়া।

তবে সকল মনের সকল সৃষ্টি প্রেরণার পশ্চাতে এক বিশ্বমনের প্রেরণা আছে বলিয়া নিঃসন্দেহে এই সকল সৃষ্টি-প্রেরণার ভিতর দিয়া তিনি আপনার রূপ-কল্পনাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

বহির্বিশ্বে নিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া যেমন একটি বিকাশ নিয়তই ঘটিয়া চলিয়াছে, তেমনি তাহার যোগে মানুষের জগতেরও ধীর বিকাশ ঘটিতেছে। মানুষের এই যে বহিরের এবং অন্তর্জগতের বিকাশ তাহার পশ্চাতে একটি দৈবী প্রেরণা ক্রিয়াশীল। সচেতন চেষ্টার অতীত সেই বিশ্ব ব্যাপ্ত গূঢ় প্রেরণার বশবর্তী হইয়া স্রষ্টাগণ আপন আপন সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া তাহাকে ধীরে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

স্রষ্টা মাত্রেরই একটি ভাব-লোক আছে। ইহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার জীবনের সকল ক্রিয়া, সকল ভাব-ভাবনা সকল চিন্তা ও কল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই ভাব-লোকটি গড়িয়া উঠে বহির্বিশ্বের যোগে বিচিত্র অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া। চেতনা যতই বিকাশ লাভ করে ব্যক্তির ভাব-লোক ততই গভীর ও ব্যাপক হয়।

স্রষ্টার সাহিত্য-কর্মের ভিতর দিয়া এই যেমন একটি বিশিষ্ট ভাব-লোকের প্রকাশ ঘটে, তেমনি এই সকল বহু বিচিত্র ভাব-লোক আশ্রয় করিয়া একটি গভীরতর স্থির কোন ভাব-লোকের ধীর প্রকাশ যে ঘটিয়া চলিয়াছে তাহাও বোধ করিতে পারা যায়। ইহাকে বিশ্ব-মানস আখ্যা দান করা যাইতে পারে। যতই দিন যাইতেছে, বিচিত্র সাহিত্য-কর্মের ভিতর দিয়া বিশ্ব মানস বা ভাব-লোকের প্রকাশ ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্ব সাহিত্য পাঠের ভিতর দিয়া যে স্রষ্টা বিশ্ব-মনের এই গতি-প্রকৃতিকে যত অধিক পরিমাণে আয়ত্ত করিতে পারেন, যিনি আপনার সকল অনুপ্রেরণা ভাব-ভাবনাকে যত অধিক পরিমাণে ইহার অনুকূল করিয়া তুলিতে পারেন, তাঁহার সাহিত্য ততই বিশ্বজনীনতা লাভ করে।

যে চেতনা নিখিল বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া নিয়ত বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে আত্ম প্রকাশ করিতেছে, সেই এক চেতনা ব্যক্তির অন্তরে বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে লীলা করিতেছে। স্রষ্টার জীবনে ইহাই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধি।

এইরূপে রবীন্দ্রনাথ সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাহিত্য-কর্মকে একটি পূর্ণরূপের অন্তর্ভুক্ত এক একটি অংশমাত্র রূপে বোধ করিয়াছেন। সাহিত্য-ভাবনার যেমন সাহিত্য-রূপেরও তেমনি এই যে বিকাশের উপলব্ধি, এবং এই সমস্ত কিছুকে আবার একটি অখণ্ডতার অন্তর্গত করিয়া এই যে দেখা তাহার কেন পূর্ব পরিচয় প্রাচীন সাহিত্য চিন্তায় কোথাও লাভ করিতে পারা যায় না। সাহিত্য তত্ত্বের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ নিজস্ব না হইলেও সম্পূর্ণ যে আধুনিক তাহাতে সংশয় নাই।

প্রাচীন সাহিত্য চিন্তায় সমগ্র সৃষ্টি তাহার প্রত্যেক পর্যায়ের পৃথক পৃথক মূল্য বোধ লইয়া স্থির রূপ। সাহিত্য ও শিল্প প্রভৃতি বিচ্ছিন্ন মনের বিচ্ছিন্ন মূল্যের একক প্রকাশ। একজন স্রষ্টার মানস-লোকের সহিত অপর একজন স্রষ্টার মানস-লোকের ঐতিহাসিক পরিণামের কোন যোগ সূত্র নাই। সকল মনোজগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া বিশ্ব-মনের যোগ সূত্রের কোন উপলব্ধি নাই। নির্বিশেষ কোন তত্ত্বের সহিত যোগকে বিকাশ ধর্ম শূন্য বলিয়াই যোগ বলা যায় না।

নিম্নের উদ্ধৃতি দুইটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির সুস্পষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"বিশ্বমানব রাজমিস্ত্রি হইয়া এই মন্দিরটি গড়িয়া তুলিতেছেন; লেখকেরা নানাদেশ ও নানা কাল হইতে আসিয়া তাহার মজুরের কাজ করিতেছে। সমস্ত ইমারতের প্ল্যানটা কী তাহা আমাদের কারও সামনে নাই বটে, কিন্তু যেটুকু ভুল হয় সেটুকু বারবার ভাঙা পড়ে; প্রত্যেক মজুরকে তাহার নিজের স্বাভাবিক ক্ষমতা খাটাইয়া, নিজের রচনা টুকুকে সমগ্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া, সেই অদৃশ্য প্ল্যানের সঙ্গে মিলাইয়া যাইতে হয়।" (বিশ্ব-সাহিত্য : সাহিত্য)

"যে জানে মানুষ সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া নিজের গভীরতম অভিপ্রায়কে নানা সাধনায় নানা ভুল ও নানা সংশোধনে সিদ্ধ করিবার জন্য কেবলই চেষ্টা করিতেছে, সে জানে মানুষ সকল দিকেই সকলের সহিত বৃহৎভাবে যুক্ত হইয়া নিজেকে মুক্তি দিবার প্রয়াস পাইতেছে, * * * মানব বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আপনাকে উললব্ধি করিবার জন্য নিজেকে লইয়া কেবলই ভাঙাগড়া করিতেছে—সে ব্যক্তি মানুষের ইতিহাস হইতে লোক বিশেষকে নহে, সেই নিত্য মানুষের নিত্য সচেষ্ট অভিপ্রায়কে দেখিবার চেষ্টা করে। * *

তেমনি সাহিত্যের মধ্যে মানুষ আপনার আনন্দকে কেমন করিয়া প্রকাশ করিতেছে, এই প্রকাশের বিচিত্র মূর্তির মধ্যে মানুষের আত্মা আপনার কোন্ নিত্য রূপ দেখাইতে চায়, তাহাই বিশ্ব সাহিত্যের মধ্যে যথার্থ দেখিবার জিনিস। * * * জগতের মধ্যে মানুষের আত্মীয়তা কতদূর সত্য হইয়া উঠিল, অর্থাৎ সত্য কতদূর পর্যন্ত তাহার আপনার হইয়া উঠিল, ইহা জানিবার জন্য এই সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করিতে হইবে। ইহাকে কৃত্রিম রচনা বলিয়া জানিলে হইবে না; ইহা একটি জগৎ; ইহার তত্ত্ব আমাদের কোন ব্যক্তি বিশেষের আয়ত্তাধীন নহে; কিন্তু জগতের মতো ইহার সৃষ্টি চলিয়াছেই, অথচ সেই অসমাপ্ত সৃষ্টির অন্তরতম স্থানে একটি সমাপ্তির আদর্শ অচল হইয়া আছে।" (বিশ্ব-সাহিত্য : সাহিত্য)

(চ)

অস্তিত্ববাদীরা (Existantialist) সৃষ্টির স্বরূপকে যে ভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন নিম্নে তাহার একটি সাধারণ পরিচয় দান করিতেছি।

স্রষ্টার ইচ্ছা, অনুভূতি এবং কল্পনার দ্বারা সৃষ্ট সামগ্রীর দেশ কালের জগৎ চিরকালের জন্য স্থিরীকৃত। সৌন্দর্য সামগ্রী যেন মনে হয় অতিজাগতিক, আপনার বিশিষ্ট জগতে সত্তা বিশিষ্ট। অলৌকিক ভাবে বাস্তব জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন।

শিল্প বিষয় যে জগৎকে রূপায়িত করে তাহা সর্বপ্রকার বিচারের পূর্ববর্তী অবস্থা। আমাদের বাস্তব চেতনার দ্বারা নির্মিত সত্য কল্যাণ অথবা যে-কোন প্রকল্পিত অনুজ্ঞা ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। ইহা এমন একটি জগৎ যাহার মধ্যে সৎ কল্যাণ এবং প্রয়োজন বিশুদ্ধ সম্ভাবনা রূপে উপস্থাপিত। শিল্প বিষয় যে-কোন প্রকার বাস্তব বা তাত্ত্বিক অনুজ্ঞা বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ উপস্থাপনা। ইহা আমাদের কোন মূল্যবোধকে স্বীকার বা অস্বীকার করতে চায় না, কেবল একান্ত সরল ও নগ্নভাবে আমাদের অস্তিত্বময় জগতে আপনাকে উপস্থাপিত করে।

শিল্প বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে জগতের কোন সামগ্রী নয়, অথবা বাস্তব সামগ্রীর কোন অনুকরণ নয়। ইহা দেশ-কালের জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এমন একটি জগৎকে প্রকাশ করে যাহাকে আমরা প্রথম প্রত্যক্ষ করি।

শিল্প বিষয়ের উপলব্ধির পথে প্রধান বাধা হইল আমাদের বহু বিচিত্র তাত্ত্বিক ভাবনা। শিল্প বিষয় প্রত্যক্ষ উপলব্ধ রূপ, অনন্য সাধারণ এবং বিশিষ্ট রূপে উপলব্ধ সম্ভাবনা ছাড়া আর কিছু নয়। জাগতিক সত্তার মত শিল্প-বিষয় এক আবির্ভাব। জাগতিক সত্তা যেমন সত্তার, তাহা বাস্তব বা ভাবাত্মক যাহাই হোক-না-কেন, কোন পদ্ধতির অংশ নয়, শিল্পবস্তুও ঠিক তেমনি।

এই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতার জন্য শিল্প বস্তুর মধ্যে সকল মূল্যবোধ মুক্ত একপ্রকার স্বতঃস্ফূর্ততা লক্ষ্য করা যায়।

সকল মায়াবরণের অতীতে যে চিরন্তন সত্য শিল্প বস্তু চরম আবিষ্ট মুহূর্তে মানবিক চেতনাকে জাগতিক সকল বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া তাহার সহিত মুহূর্তের জন্য যুক্ত করিয়া দেয়। সেখান হইতে অন্তহীন রূপের বুদ্‌বুদ মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

অস্তিত্ববাদীদের অনুরূপ তত্ত্ব দৃষ্টির পরিচয় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসার মধ্যেও লাভ করিতে পারা যায়।

নিখিল বিসৃষ্টি রূপে এই যে এক অচিন্তনীয় মহান প্রকাশ ইহার অর্থ কি? প্রকাশ রূপের ক্ষেত্রে এই জিজ্ঞাসা অর্থহীন; অর্থাৎ প্রকাশই প্রকাশ রূপের

শেষ কথা। প্রকাশকে প্রকাশ রূপের চরম বলিয়া বোধ করিয়া যখন ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি তখনই ইহার অহেতুক আনন্দে আমরা যোগ দিতে পারি। তখনই মানবীয় চেতনা সকল রূপের সেই উৎসে গিয়া পৌঁছায় যেখান হইতে রূপের ধারা অন্তহীন ধারায় ধারায় দেশ কালের সীমায় ঝরিয়া পড়িতেছে।

বিশ্বের এই আনন্দ প্রেরণায় মানুষের যে সৃষ্টি তাহাও তেমনি এক অস্তিত্বের প্রকাশ মাত্র। বিশ্বের সকল প্রকাশ রূপের সহিত তাহার মিল।

অন্তহীন গ্রহ নক্ষত্রের মাঝখানে আমার এই সত্তার প্রকাশ উহাদেরই মত একটি। এ কী অচন্তনীয় বিস্ময়! মানুষের সৃষ্ট রূপও তেমনি অস্তিত্বের বাণী বহন করিয়া আছে।

আমার মধ্যে রহিয়াছে নিয়ত এক অস্তিত্বের ঘোষণা। বাহিরে কোন প্রকাশ রূপের মধ্যে যখন এই ঘোষণাটি ফুটিয়া উঠে, তখনই নিবিড় অস্তিত্বের উপলব্ধিতে আমার সত্তা এবং সৃষ্টি রূপ একাত্ম হইয়া যায়।

নিখিল বিশ্বময় এই যে আনন্দময় অস্তিত্বের পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ তাহা আমরা মনের জড়ত্বের জন্য, নানা প্রকার সীমিত বোধের জন্য বোধ করিতে পারি না। সৃষ্টি এই জড়ত্বের আবরণ ভেদ করিয়া মুহূর্তের মধ্যে সকল প্রকার সীমার বোধ ছিন্ন করিয়া মানব চিত্তে আপনার অনিবার্য স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়। এই সামর্থের জন্য কোন কিছু সৃষ্টি আখ্যা লাভ করে।

এই প্রকাশ তত্বের দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ সকল প্রকার সৃষ্টি রূপের যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন তাহার পরিচয় লাভ করিতে নিম্নে তাঁহার কয়েকটি উক্তি পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"সৃষ্টির মূলে এই লীলা নিরন্তর এই রূপের প্রকাশ। এই প্রকাশের অহেতুক আনন্দে যখন যোগ দিতে পারি তখন সৃষ্টির মূল আনন্দে গিয়ে মন পৌঁছায়। সেই মূল আনন্দ আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত, কারো কাছে তার কোনো জবাব দিহি নেই।

*　　　*　　　*

গড়বার শক্তিকে প্রকাশ করছি বলে আনন্দ নয়, কেন না সে শক্তি এক্ষেত্রে বিশেষ প্রকাশ পাচ্ছে না। একটি রূপ বিশেষকে চিত্তে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি বলে আনন্দ। সেই রূপটাকে শেষ লক্ষ্য করে দেখাই হচ্ছে সৃষ্টিকে দেখা; তার আনন্দই সৃষ্টির মূল আনন্দ।

*　　　*　　　*

এই খুশির খেলা ঘরে রূপের খেলা দেখে আমাদের মন ছুটি পায় বস্তুর মোহ থেকে একেবারে পৌঁছয় আনন্দে এমন কিছুতে যার ভার নেই যার মাপ নেই যা অনির্বচনীয়।

*   *   *

স্থষ্টির অন্তরতম এই অহেতুক লীলার রসটিকে যখন মন সেতে চায় তখনই বাদশাহি বেকারের মতো সে গান লিখতে বসে। চারখানি পাপড়ি নিয়ে একটি ছোট জুঁই ফুলের মতো একটুখানি গান যখন সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে তখন সেই মহা খেলা ঘরের মেঝের উপরেই তার জন্য জায়গা করা হয় যেখানে যুগ যুগ ধরে গ্রহ নক্ষত্রের খেলা হচ্ছে। সেখানে যুগ আর মুহূর্ত একই সেখানে স্বর্য আর স্বর্যমণি ফুলে অভেদাত্মা, সেখানে সাঁঝ সকালে মেঘে মেঘে যে রাগ রাগিণী আমার গানের সঙ্গে তার অন্তরের মিল আছে।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

"সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত করে অনুভব করি নিজের মধ্যে। আমার মধ্যে একটি এক নিয়ত বলছে 'আছি'। গানের মধ্যে ছবির মধ্যে এক যদি তেমনি জোরে বলে উঠতে পারে 'এই-যে আমি' তা হলেই তাতে আমাতে মিলনের স্বর পূর্ণ হয়ে বাজল। একেই বলে শুভ দৃষ্টি, ঐক্যের উপলব্ধিতে দেখবার বিষয় চোখে পড়া।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

"মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে, সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে আছে বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ না পাই শক্তি। সেই জন্য জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়ে চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে 'চেয়ে দেখো' তাহলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ; যেখানে সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

কেউ না ভেবে বসেন, যা চোখে ধরা পড়ে তাই সত্য। সত্যের ব্যাপ্তি অতীতে ভবিষ্যতে দৃশ্যে অদৃশ্যে বাহিরে অন্তরে। আর্টিস্ট সত্যের সেই পূর্ণতা যে পরিমাণে সামনে ধরতে পারে 'আছে' ব'লে মনের সায় সেই পরিমাণে প্রবল, সেই পরিমাণে স্থায়ী হয়; তাতে আমাদের ঔৎসুক্য সেই পরিমাণে অক্লান্ত, আনন্দ সেই পরিমাণে গভীর হয়ে ওঠে।

*   *   *

সত্তাকে সকলের চেয়ে অব্যবহিত ও সুস্পষ্ট করে অনুভব করি আমার নিজের মধ্যে। 'আছি' এই ধ্বনিটি নিয়তই আমার মধ্যে বাজছে। তেমনি স্পষ্ট করে যেখানেই আমরা বলতে পারি 'আছে' সেখানেই তার সঙ্গে কেবল আমার ব্যবহারের অগভীর মিল নয়, আত্মার গভীরতম মিল হয়।

* * *

বিশ্বের যেখানে প্রকাশের ধারা, প্রকাশের লীলা, সেখানে যদি মনটাকে সম্পূর্ণ করে ধরা দিতে পার তাহলেই অন্তরের মধ্যে প্রকাশের বেগ সঞ্চারিত হয়। আলো থেকেই আলো জ্বলে। দেখতে পাওয়া মানে হচ্ছে প্রকাশকে পাওয়া। ***বিশ্বের প্রকাশকে মন দিয়ে গ্রহণ করাই হচ্ছে আর্টিস্টের সাধনা ; তাতেই প্রকাশের শক্তি সচেষ্ট হয়ে ওঠে, প্রকাশের আঙ্গিক পদ্ধতি তার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি এসে পড়ে, কতকটা শিক্ষা ও চর্চার দ্বারা নৈপুণ্যকে পাকিয়ে তোলা হয়।" (পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি)

"এই বিষয়টিকে লক্ষ্য মাত্র করে ছন্দে বন্ধে বাক্য বিন্যাসে উপমা সংযোগে যে-একটি সমগ্র বস্তু তৈরি হয়ে উঠছে সেইটেই হচ্ছে আসল জিনিস। সেই জিনিসটি মূল বিষয়ের অতীত, তা অনির্বচনীয়।"

(তথ্য ও সত্য : সাহিত্যের পথে)

"বাঁশি একের আলো জ্বালিয়েছে। আকাশে রাগিণী দিয়ে এমন একটি রূপের সৃষ্টি করেছে যার আর কোন উদ্দেশ্য নেই, কেবল ছন্দে সুরে সুসম্পূর্ণ একেকে চরম রূপে দেখানো।" (সৃষ্টি : সাহিত্যের পথে)

"যাকে সৃষ্টি বলি তার নিঃসংশয় প্রকাশই তার অস্তিত্বের চরম কৈফিয়তে। সাহিত্যের সৃষ্টির সঙ্গে বিধাতার সৃষ্টির এইখানেই মিল।"

(সাহিত্যতত্ত্ব : সাহিত্যের পথে)

তবে অস্তিত্ববাদীদের উপলব্ধি হইতে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক উপলব্ধির মূলগত ব্যবধান আছে। তাহারই জন্য তাঁহার সাহিত্য ও শিল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা অস্তিত্ববাদীদের ব্যাখ্যা হইতে পৃথক।

রবীন্দ্রনাথের নিকট বিশ্বরূপ অপরূপের অসীম বা অরূপের অনির্বচনীয় আনন্দ রূপ বা অমৃত রূপের প্রকাশ।

রূপের যোগে অর্থাৎ রূপের সহিত একাত্মতার ভিতর দিয়া ব্যক্তি চেতনা যখন রূপের অতীত মাধুর্যকে আস্বাদ করে তখন সে সেই আস্বাদের অলৌকিক আনন্দের অপরিমিতিকে রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশ করে। তাহাই শিল্প

সাহিত্য সঙ্গীত প্রভৃতি। রূপের যোগে এই যে অপরূপতার আস্বাদ তাহা একদিক দিয়া ব্যক্তির আত্মসাক্ষাৎকার। কারণ সকল রূপের মধ্যে যে এক সে এক আছে ব্যক্তির অন্তরাত্মায়। সাহিত্য ও শিল্পের উপলব্ধি এক দিক দিয়া আপন অন্তরস্থিত একের উপলব্ধি। এইরূপে ব্যক্তি ও বিশ্বের পূর্ণ মিলন ঘটে।

ব্যক্তির সহিত বিশ্বের নিবিড় মিলন অনুভূতির কথা এবং ইহার ভিতর দিয়া এই সমস্তকে পরিপূর্ণ করিয়া ইহাদের অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে যে অসীম এক তাহার উপলব্ধির কথা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের মধ্যে নানা ভাবে ফিরিয়া ফিরিয়া আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। অস্তিত্ববাদীদের উপলব্ধি হইতে ইহা সম্পূর্ণ বিলক্ষণ।

সাহিত্য সঙ্গীত শিল্প প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টি-কর্মের পশ্চাতে যে অসীমের আনন্দোপলব্ধি আছে সকল প্রকার সৃষ্টি-কর্মই যে মানুষকে অসীমের আনন্দ দান করে এবং একমাত্র এই জন্যই যে তাহা সৃষ্টি আখ্যা লাভ করে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি নূতন বা অভিনব নয়। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র মূল এই সত্যোপলব্ধিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছে।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতার উপলব্ধি অদ্বৈতবাদীদের উপলব্ধির ন্যায় দেশ-কাল বিচ্ছিন্ন তাত্ত্বিক উপলব্ধি নয়। বিশ্বের যোগে ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ, ব্যক্তি ও বিশ্বের পূর্ণ মিলন এবং পরিণামে বিশ্বের যোগে বিশ্বাতীতের উপলব্ধি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতার উপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশ্ব এবং বিশ্বাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। অস্তিত্ববাদীদের সৃষ্টি দেশ-কালাতীত অস্তিত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত, কিন্তু তাহা এক অস্তিত্বের সহিত আর এক অস্তিত্বের যোগের রহস্য, বিশ্বের সহিত ব্যক্তির, ব্যক্তির সহিত সৃষ্টির যোগের রহস্য আবিষ্কার করিতে পারে নাই।

বিশ্বের সহিত যোগে মানব চেতনার ধীর প্রসারের কথা আবার মানব মনের সহিত যোগে প্রকৃতির মূল্যের ধীর রূপান্তরের কথা প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে কোথাও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে না। এই উপলব্ধি কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব।

কেবল প্রকৃতির মূল্যের পরিবর্তনের কথা নয়, সকল দেশের সকল কালের সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া একটি যে ধীর বিকাশ ঘটিতেছে, এইরূপে সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি সকল প্রকার সৃষ্টি প্রেরণাকে নিখিল বিশ্বের মানব সভ্যতা

বিকাশের সহিত যুক্ত করিয়া পাঠ করিবার যে চেষ্টা তাহার কোন পূর্ব পরিচয় প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মধ্যে ছিল না।

প্রাচীন আলঙ্কারিকগণের বোধ দেশের সীমাকে কোথাও অতিক্রম করিয়া তো যায় নাই, পরন্তু তাহা সমগ্র জাতির অভিব্যক্তি সূত্রের সহিতও বিজড়িত ছিল না। সৃষ্টি প্রেরণা ছিল একক বিচ্ছিন্ন অনুভূতির প্রকাশ।

(ছ)

সাহিত্যের স্বরূপ এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধ্যান-ধারণা আমরা এ পর্যন্ত তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিলাম। সাহিত্যের রূপ সম্পর্কে তাঁহার চিন্তাধারারও প্রসঙ্গত উল্লেখ প্রয়োজন।

সাহিত্যের যে রস বস্তু, একমাত্র অত্যুচ্চ কবি-কল্পনা যাহাকে কেবল মাত্র আভাসে লাভ করিতে পারে তাহাকে যে ভাষায় রূপদান করিতে হয় তাহার সামর্থ সীমিত। শব্দ মাত্রেরই আভিধানিক একটি অর্থ আছে। এই অর্থ প্রয়োজনের সীমায় সীমাবদ্ধ, নিঃশেষিত। সীমাবদ্ধ শব্দের সহায়তায় অসীমের অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া কবি বা সাহিত্যিক শব্দের মধ্যে, শব্দ সজ্জার মধ্যে নানা বিপর্যয় সাধন করেন। তাহার ভিতর দিয়া শব্দের মধ্যে নানা আভাস ইঙ্গিত নানা ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠে।

কবি বা সাহিত্যিক ভাষার মধ্যে ভাষাতীতকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন দুটি উপায়ে; একটিকে বলা হয় চিত্রধর্মিতা, অন্যটিকে বলা হয় গীতি ধর্মিতা। চিত্র ধর্মিতা ভাবকে আকার দেয়, গীতিধর্মিতা ভাবকে গতি দান করে।

"কবিতা যে ভাষা ব্যবহার করে সেই ভাষার প্রত্যেক শব্দটির অভিধান নির্দিষ্ট অর্থ আছে। সেই বিশেষ অর্থেই শব্দের তথ্য সীমা। সেই সীমাকে ছাড়িয়ে শব্দের ভিতর দিয়েই তো সত্যের অসীমতাকে প্রকাশ করতে হবে। তাই কত ইশারা, কত কৌশল, কত ভঙ্গি।"

(তথ্য ও সত্য : সাহিত্যের পথে)

"এই ভাষাকে কিছু আড় ক'রে, বাঁকা ক'রে, এর সঙ্গে রূপক মিশিয়ে, এর অর্থকে উলাট পালট ক'রে তবেই বস্তু বিশ্বের প্রতিঘাতে মানুষের মধ্যে যে ভাবের বিশ্ব সৃষ্টি হতে থাকে তাকেই সে প্রকাশ করতে পারে।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্যের পথে)

"অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্বচনীয়তাকে রক্ষা করতে হয়।" (সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্য)

"ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষ র মধ্যে দুইটি জিনিস মিশাইয়া থাকে, চিত্র এবং সঙ্গীত।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্যের পথে)

"চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য্য : সাহিত্যের পথে)

বস্তুত বুদ্ধি দ্বারা সাহিত্য রূপকে এই ভাবে ব্যাখ্যা করিবার যতই চেষ্টা করা হোক-না-কেন, সাহিত্য-রূপ সাহিত্যের ভাবোপলব্ধির সহিত অনিবার্য্য রূপে জন্ম লাভ করে। সাহিত্য-রূপ সৃষ্টি কবির সচেতন মনের ক্রিয়ার সম্পূর্ণ বহির্ভূত সামগ্রী। সাহিত্যের ভাবোপলব্ধির ন্যায় সমগ্র সাহিত-রূপটি তাই অলৌকিক।

রূপ রূপের অতীত ভাবনাকে প্রকাশ করে বলিয়াই রূপ সার্থক, তাহা না হইলে রূপ তো বন্ধ্যা। বস্তুত রূপাতীতকে প্রকাশ করিতে পারে বলিয়া আমরা কোন কিছুকে বলি রূপময়। যে কোন রূপ সম্পর্কে এ কথা যেমন সত্য, সাহিত্য রূপ সম্পর্কে ও একথা তেমনি সত্য।

"রূপের সীমা আছে। কিন্তু, রূপ যখন সেই সীমা মাত্রকে দেখায় তখন সত্যকে দেখায় না। তার সীমাই যখন প্রদীপের মতো অসীমের আলো জ্বালিয়ে ধরে তখনি সত্য প্রকাশ পায়।" (সৃষ্টি : সাহিত্যের পথে)

অসীমের অনুভূতিকেই সীমার মধ্যে প্রকাশ করিতে হয় বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে সম্পূর্ণ তথ্যানুসারিতা একপ্রকার অসম্ভব। তথ্য বাস্তবের বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া একটি অখণ্ড রূপ লাভ করে কবির কল্পনায়। সেখানে তথ্য গ্রহণ বর্জনের ভিতর দিয়া, অংশ বিশেষের উপর লঘুত্ব গুরুত্ব আরোপের ভিতর দিয়া আর এক ভিন্ন স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

"রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে, তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি দিতে হয়।" (তথ্য ও সত্য : সাহিত্যের পথে)

সাহিত্য ও শিল্পের রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণার পরিচয় লাভ করিলাম, ক্রোচের সাহিত্য চিন্তার মধ্যে অনুরূপ উপলব্ধির পরিচয় লাভ করা যায়।

ক্রোচের মতে সৌন্দর্য্যবোধ রূপ এবং রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। যে শিল্পী বা কবির মধ্যে রূপ নাই, তাঁহার সমস্ত কিছুই শূন্য। শিল্পের দুইটি দিক নাই, একটিমাত্র দিক। শিল্পের মধ্যে সমস্ত কিছুই সিম্বলিক, কারণ সমস্ত কিছু আদর্শ। সিম্বলকে বিষয়বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করা তাই অসম্ভব।

প্রকাশ রূপের কোন অংশের সৌন্দর্য বিচার করা যায় না, কারণ ইহা সমগ্ররূপে একাত্মীভূত।

নিও প্লেটোনিক ধারণাও অনুরূপ। অর্থাৎ যাহা রূপবদ্ধ তাহাই সুন্দর, যাহা আকার বিহীন তাহাই অসুন্দর।

শিলারের মতে সৌন্দর্যই জীবন, জীবন্ত রূপ। শিল্পীর দ্বারা খোদিত হইলে প্রস্তরের জীবন্ত রূপ থাকিতে পারে এবং কোন মানুষের জীবন ও রূপ থাকিলেও জীবন্ত রূপ না থাকিতে পারে। শিল্প তাই প্রকৃতিকে রূপ দ্বারা জয় করে। মহান শিল্পীর প্রকৃত রহস্য হইল তাঁহারা রূপ দ্বারা বিষয়কে অস্বীকার করেন এবং বিষয়বস্তু যতই অভিভূতকারী হয় ইহার বিশিষ্ট ফল ফুটাইয়া তুলিতে তত বেশি পরিশ্রম করিতে হয়।

রূপ পূর্ব চিন্তিত নয়, ইহার পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই; বিষয়বস্তু হইতে পৃথক বিষয়ের অলঙ্কার বা প্রকাশ বা গুণাবলী নয়। শিল্পীর মনের বিষয়বস্তু হইতে রূপ জন্মলাভ করে। শিল্পকর্মের মধ্যে শিল্পীর মনের বিশৃঙ্খল বিষয়বস্তু আদিম অবস্থায় প্রকাশ লাভ করে না, সামগ্রিক রূপে আপনার বিশিষ্ট মূল্য লইয়া, গুরুত্ব লইয়া আপনার স্বভাব-সৌন্দর্যে আরো বিকাশ লাভ করিয়া প্রকাশ পায়। সুতরাং রূপ সৃষ্টির জন্য বিষয়বস্তুর একান্ত প্রয়োজন, কিন্তু বিষয়বস্তুর অমূর্ত গুণাবলী শিল্পরূপ সৃষ্টি করে না। বিষয়বস্তু সুন্দর ও গুরুত্ব-পূর্ণ হইয়াও যদি শিল্পীর মন নিষ্ক্রিয় এবং প্রাণশূন্য হয়, যদি রূপ লাভ করিবার মত যথেষ্ট সক্রিয় শক্তি না থাকে এবং আপনাকে দুর্বল অথবা অস্থির রূপে প্রকাশ করে তবে শিল্পরূপে ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ। অন্যদিকে বিষয়বস্তু যদি অনৈতিক, নিরর্থক, মিথ্যা বা তুচ্ছ হইয়াও কোন সময়ে বা কোন অবস্থায় শিল্পীর মস্তিষ্কে প্রবলভাবে ক্রিয়া করিয়া রূপ লাভ করে তাহা হইলে সেই বিষয়বস্তু অমরতা প্রাপ্ত হয়।

রূপ বিচ্ছিন্ন শিল্পের সম্পূর্ণ মানসিক অনুভূতির এমনি একপ্রকার উপলব্ধির কথা শিল্প সমালোচক অনেকেই বলিয়াছেন।

লাসেলাস এ্যাবার ক্রম্বির অনুরূপ একটি অভিমত এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিতেছি।

"The moment of imaginative experience which possesses our minds the instant the poem is finished possessed the poet's mind the instant the poem began. For as soon as there flashed

into complete existence in his mind this mauy coloured experience with all its comlex passion, the poem which we know was conceived as an inspiration···So that it is possible to consider the inspiratiou of a poem as distinguishable from the verbal art of it ; namely as that which the verbal art exists to convey, and which can be distinctly known as such, however impossible it may be to describe it or express it at all in any other words than those of the poet."

ক্রোচেও বিশ্বাস করেন, শিল্পের অনুভূতি মূলত প্রকাশ হইলেও 'তাহা বিশুদ্ধ মানসিক ক্রিয়া এবং অনুভূতির বহিঃ প্রকাশ শিল্পের কলা কৌশলমাত্র। তিনি বিশ্বাস করেন, ভাষার অসামর্থ্যের অর্থ অনুভূতির অসামর্থ্য। সেইজন্য যাঁহারা বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মহান শিল্পীদের মত অনুভূতির প্রসারতা ও গভীরতা আছে, তবে তাঁহারা তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে অসমর্থ, ক্রোচে তাঁহাদের পরিহাস করিয়াছেন।

তবে কোন কোন শিল্প সমালোচক আছেন, যাঁহারা সম্পূর্ণ প্রকাশ বিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ মানসিক অনুভূতির অবস্থাকে স্বীকার করেন না। এই শ্রেণীর একজন দার্শনিক সমালোচকের একটি অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"—the artist's work proceeds not from a finished imaginative experience to which the work of art corresponds, but from passionate excitement about the subject matter ;........that the poem is wrung from him by the subject which excites him, and that he possesses the imaginative experience embodied in his words just in so far as he had spoken them. In no sense is the poem the translation of the state of mind, for he does not know till he has said it, either what he wants to say or how he shall say it—two things which are admittedly one. The imaginative experience supposed to be in his mind does not exist there what does exist is the subject matter which detains him and fixes his thoughts and feeds his intetest, giving a colour to his excitement which would be different with a

different subject matter. Excitement caused and detained by the subject, and at once enlarged, enlightened, and inflamed by insights into its bubbles over the words or the movements of the brush or burin or chisel.'

(Art and the Material : Alexandar)

শিল্পবোধের ক্ষেত্রে ভাব ও রূপ এমন অঙ্গাঙ্গী ভাবে বিজড়িত বলিয়া সমালোচকগণ কেহ রূপকে শিল্পের সার, কেহ বা ভাবকে শিল্পের সার বলিয়া অভিহিত করেন। ইঁহাদের মতে শিল্পরূপ কেবলমাত্র কলাকৌশল হইলে বিষয়বস্তু এবং শিল্পীর মনের মধ্যে এমন অঙ্গাঙ্গী মিলন সম্ভব হইত না।

কবি বা শিল্পী যে রূপ কল্পনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক তাহাকে তিনি প্রথমে মনের মধ্যে গড়িয়া তুলেন তাহা নয়, প্রকাশের ভিতর দিয়াই তাহাকে তিনি লাভ করেন, এবং প্রকাশ লাভ না করা পর্যন্ত ইহা তাঁহার নিকট অজ্ঞাত থাকে। ইহা তাঁহার নিকট আসে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার রূপে।

তাই ইহা সত্য নয় যে কবিতা কবির ধ্যানের মধ্যে থাকে এবং ভাষায় প্রকাশ করা একটি বহিরঙ্গিক কলাকৌশল মাত্র। ব্যক্তির আপনার বিষয় বস্তুর উপর কল্পনা দৃষ্টি থাকিতে পারে; কিন্তু কেবলমাত্র যখন এই অন্তর্দৃষ্টি তাঁহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে উদ্দীপ্ত করে তখনই তিনি কবি। উচ্চারিত শব্দ, ছন্দ, আবেগ এবং উদ্দীপনার মধ্যে কাব্যের অস্তিত্ব। এইগুলির ভিতর দিয়া কবি বা শিল্পীর মানসিক ক্রিয়ার প্রকাশ ঘটে। কবির বিষয়বস্তু সম্পর্কিত সাক্ষাৎকার ভাষা-রূপের ভিতর দিয়া যদি প্রকাশ না পায় তাহা যেমন কাব্য নয়, তেমনি ভাব ছাড়া শব্দ সমষ্টিও কাব্য নয়।

তাঁহার মনের মধ্যে যে বহু বিচিত্র রূপ কল্পনা জন্ম লাভ করে তাহার ভিতর হইতে তিনি কতকগুলি গ্রহণ করেন এবং আপনার মানসিক অবস্থার অনুকূল করিয়া কতকগুলিকে বিস্তারিত এবং সংহত করেন। এইরূপে রূপ কল্পনাগুলি ভাষা এবং ছন্দের সহিত একাত্মীভূত হইয়া প্রকাশ পায়।

কবি বা শিল্পী আবেগের অনিবার্য প্রেরণায় বিষয়বস্তুকে আশ্রয় করে। এই বিষয়বস্তুর কতকটা থাকে তাঁহার সচেতন মনে, সচেতন অনুভূতি, রূপ কল্পনা, চিন্তা রূপে এবং কতকটা থাকে অবচেতন মানসে।

সাহিত্য-রূপের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি মৌলিক চিন্তার দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন।

সকল অধ্যাত্ম সাধনার চরম লক্ষ্য হইল অসীমের উপলব্ধি লাভ। অসীম সর্বতোব্যাপ্ত বলিয়া তাহাকে লাভ করিবার কোনও একটিমাত্র পথ, কোন একটিমাত্র পূজা পদ্ধতি, কোন একটিমাত্র প্রতীক রূপ থাকিতেই পারে না। মানব মনের বিকাশের তত্ত্ব যদি সত্য নাও হয়, তবে তাহার স্থিতি-রূপ কল্পনাতীত। মানব-মন নিত্য রূপান্তরতা লাভ করিতেছে। মন বলিতে এই রূপান্তর ধর্ম বুঝায়। এই কারণে অধ্যাত্ম-সাধনার প্রতীক রূপ, তাহার পূজা পদ্ধতি, সাধন-পথ এক রূপ হইতেই পারে না। তাহারও রূপান্তরতা প্রয়োজন।

সাহিত্য-রূপের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। সাহিত্যের যে রস বস্তু তাহা সাহিত্যের চিরন্তনতার দিক। মানব মনের রূপান্তরতার জন্যই সাহিত্য রূপেরও অনিবার্য পরিরর্তন ঘটিতেছে। সাহিত্যের বিষয় বস্তু বা আখ্যান ভাগ, বিন্যাস-পদ্ধতি, সৌন্দর্য-কল্পনা, অলঙ্কার-প্রয়োগ-রীতি, এই সমস্ত কিছুর মধ্যে অনিবার্য পরিবর্তন ঘটে, ইহা স্বাভাবিক। তাহা না হইয়া কেহ যদি বলেন, কবি-কল্পনা কেবলমাত্র প্রাচীন আখ্যায়িকা, প্রাচীন রূপ ও রূপক, প্রাচীন সৌন্দর্য কল্পনা, অলঙ্কার রীতিকে আশ্রয় করিয়াই প্রকাশ লাভ করিবে তবে তাহাতে একটি পরিণামে ব্যক্তি-চিত্ত সেই সঙ্গে জাতি-চিত্ত আত্মহত্যা করিয়া মরে। সাহিত্য-রূপের এই রূপান্তরতা ধর্মের উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। বস্তুত এই নব রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়াই স্রষ্টার সৃষ্টি-প্রতিভা সম্যক স্ফূর্তি লাভ করে। ইহার ভিতর দিয়াই সৃষ্টি প্রতিভার নিঃসংশয় পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। তিনি এই কথাই বলিয়াছেন,

"জগৎ সৃষ্টিতে যেমন সৃষ্টি কর্তার আনন্দ কোনো একটি মাত্র রূপে আপনাকে চিরকাল বদ্ধ করিয়া শেষ করিয়া ফেলে নাই,—অনাদি কাল হইতে তাহার নব নব বিকাশ চলিয়া আসিতেছে, তেমনি সাহিত্য শিল্প সৃষ্টিতেও মানুষের আনন্দ কোন একটি মাত্র বর্ণনায় আপনাকে চিরকালের মতো বন্দী করিয়া থামিয়া যায় নাই। সে কেবলই নব নব প্রকাশের মধ্যে লীলা করিতেছে।" (রূপ ও অরূপঃ সঞ্চয়)

(জ)

রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কয়েকটি ক্রমের পরিচয় নিম্নরূপ ভাবে দান করিয়াছেন।

প্রথমত কোন একটা কিছুকে উপলক্ষ্য করিয়া মনের কতকগুলি স্মৃতি একত্র হইয়া রূপ লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ এই পর্যায়ের পরিচয় দান করিয়াছেন।

"অবসর সময় যখন চুপচাপ বসিয়া আছি তখনো এই ব্যাপারটা চলিতেছে। হয়তো একটা ফুলের গন্ধের ছুতা পাইবা মাত্র অমনি কতদিনের স্মৃতি চারিদিকে দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিতেছে। একটা কথা যেমনি গড়িয়া উঠে অমনি তাহাকে আশ্রয় করিয়া যেমন-তেমন করিয়া কত কী কথা যে পরে পরে আকার ধারণ করিয়া চলে তাহার আর ঠিকানা নাই। আর কিছু নয়, কেবল কোন রকম করিয়া কিছু একটা হইয়া উঠিবার চেষ্টা। ভাবনা রাজ্যে এই চেষ্টার আর বিরাম নাই।" (সাহিত্য সৃষ্টি : সাহিত্য)

তাহার পরের পর্য্যায়ে কল্পনা সমৃদ্ধ ভাবুক চিত্তে এই অপরিস্ফুট অপরিণত ভাবগুলির কতকগুলি সুপরিণতি লাভ করে।

"এমন মন আছে যেখানে ভাবনা কেবলই আসে যায়। কিন্তু ভাব আকার ধারণ করিবার পূরা অবকাশ পায় না। কিন্তু ভাবুক লোকের চিত্তে ভাবনাগুলি পুরাপুরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে এমন রস আছে এমন তেজ আছে। অবশ্য অনেকগুলা ঝরিয়া পড়ে বটে, কিন্তু কতকগুলা ফলিয়াও উঠে।"

(সাহিত্য সৃষ্টি : সাহিত্য)

ইহার পরের পর্যায় হইল এই সুপরিণত ভাবটিকে বাহিরে বিশ্বমানবের মনের ক্ষেত্রে স্থায়ীরূপে ব্যক্ত করা।

"ভাবুকের মনে ভাবনাগুলা ভাব হইয়া উঠিলে তাহাদেরও সেই দরবার। তাহারা বলে, কোন সুযোগে যদি হওয়া গেল তবে এবার বিশ্ব মানবের মনের ভূমিতে নব জন্মের এবং চিরজীবনের লীলা করিতে বাহির হইব। প্রথমে ধরিবার সুযোগ, তাহার পরে ফলিবার সুযোগ, তাহার পরে বাহির হইয়া ভূমিলাভ করিবার সুযোগ, এই তিন সুযোগ ঘটিলে পর তবেই মানুষের মনের ভাবনা কৃতার্থ হয়। ভাবনাগুলা সজীব পদার্থের মতো সেই কৃতার্থতার তাগিদ মানুষকে কেবলই দিতেছে।" (সাহিত্য সৃষ্টি : সাহিত্য)

ইহার পর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির এক গভীরতর পর্যায়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। এই পরিণামের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অসামান্য মৌলিকতার পরিচয় দান করিয়াছেন। এই উপলব্ধির ভিতর দিয়া সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পূর্ণ রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত মানব মনে যে সকল ভাবনা নিয়ত অস্ফুটরূপে নীহারিকার ন্যায় ব্যাপ্ত হইয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সমষ্টিভূত মনের আশ্রয়কে অতিক্রম করিয়া যাহা বিশ্ব মনের ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত, যাহার কোন প্রকাশ রূপ নাই, এক একজন কবির কল্পনা তাহার এক একটি অংশকে আপনার মনঃসীমার আবেষ্টনের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তাহাকে সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট একটি রূপ দান করে।

"মানুষের মন যে সকল বহুতর অব্যক্ত ভাবকে নিরন্তর উচ্ছসিত করিয়া দিতেছে, যাহা অনবরত ক্ষণিক বেদনায় ক্ষণিক ভাবনায় ক্ষণিক কথায় বিশ্ব-মানবের সুবিশাল মনোলোকের আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এক একজন কবির কল্পনা এক একটি আকর্ষণ কেন্দ্রের মতো হইয়া তাহাদের মধ্যে এক-এক দলকে কল্পনাসূত্রে এক করিয়া মানুষের মনের কাছে সুস্পষ্ট করিয়া তোলে।" (সাহিত্য সৃষ্টি : সাহিত্য)

যে এক প্রেরণা প্রকৃতির অন্তরালে থাকিয়া অন্তহীন সৃষ্টিরূপে নিয়ত আত্ম-প্রকাশ করিতেছে, সেই প্রেরণাই মানুষের অন্তরে বিচিত্র ভাবনা জাগাইয়া তুলিয়া রূপলাভের জন্য মানুষকে নিত্য ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছে।

দেশকালে বিচ্ছিন্ন সংখ্যাতীত সকল সৃষ্টি-রূপের পশ্চাতে এই এক বিশ্বমনের প্রেরণা নিহিত বলিয়া তাহারা একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কেবল তাহাই নয় ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত মনের এই বিচিত্র প্রকাশ রূপের মধ্যে একটি বিকাশের ধারা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিয়াছেন। সকল সৃষ্টি কর্মের এই স্বরূপ উদ্‌ঘাটন সাহিত্য-তত্ত্ব চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এক বিস্ময়কর উপলব্ধির দিক। তিনি এই কথাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন,

"আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালী ব্যাপার নহে, ইহা বস্তু সৃষ্টির মতোই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। প্রকাশের যে একটা আবেগ আমরা বাহিরের জগতে সমস্ত অণুপরমাণুর ভিতরেই দেখিতেছি, সেই একই আবেগ আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে প্রবলবেগে কাজ করিতেছে। অতএব যে চক্ষে আমরা পর্বত কানন নদ নদী মরু সমুদ্রকে দেখি সাহিত্যকেও সেই চক্ষেই দেখিতে হইবে; ইহাও আমার তোমার নহে, ইহা নিখিল সৃষ্টিরই একটি ভাগ।" (সাহিত্য সৃষ্টি : সাহিত্য)

সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে তিনি আর এক দিক দিয়া আর একভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মানুষ বিশ্ব প্রকৃতির উপর নিয়ত আপনার মন প্রয়োগ করিতেছে। এইরূপে সে প্রতিনিয়ত জড় প্রকৃতিকে মানব প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছে। বহির্বিশ্বের সহিত যোগে এইরূপে মানবিক বোধের যতই প্রসার লাভ ঘটিতেছে, তাহারই ভাবানুষঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির মানবিক রূপের ততই পরিবর্তন ঘটিতেছে। ততই প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য ও মাধুর্য, তাহার নিহিত গভীর তাৎপর্য ফুটিয়া উঠিতেছে। এইরূপে এককালের একান্ত অপরিচিত বিশ্ব প্রকৃতি মানুষের সহিত ভাবের যোগে ক্রমেই পরিচিত হইয়া উঠিতেছে। এই ধীর পরিণতির সঙ্গে মানব মনও আবার ক্রমাগত প্রসার ও পরিণতি লাভ করিয়া চলিয়াছে। তিনি এই কথাটিই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"মানুষ তাই বিশ্বের উপর অহরহ আপন মন প্রয়োগ করতে থাকে। বস্তু বিশ্বের সঙ্গে মনের সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তোলে। জগৎটা মানুষের ভাবানুষঙ্গে অর্থাৎ তার অ্যাসোসিয়শনে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। মানুষের ব্যক্তি স্বরূপের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতির মানবিক পরিণতির পরিবর্তন পরিবর্দ্ধন ঘটে। আদি যুগের মানুষের কাছে বিশ্ব প্রকৃতি যা ছিল আমাদের কাছে তা নয়। প্রকৃতিকে আমাদের মানব ভাবের যতই অন্তরভুক্ত করে নিয়েছি আমাদের মনের পরিণতিও ততই বিস্তার ও বিশেষত্ব লাভ করেছে।

(সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্যের পথে)

বহিঃ প্রকৃতি এইরূপে মানুষের ভাবনার সহিত মিলিত হইয়া অন্তরের মধ্যে একটি ভাবলোক সৃষ্টি করে। ভাব-লোকের এই সঞ্চার এবং পরিণতি রসের বা আনন্দের বোধ জাগ্রত করে, চেতনার সে এক পরম বিশ্রান্তি। মানুষ এই অপরিমিত বোধকে তখন চেষ্টা করে বাহিরে সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিতে।

"বাহিরের তথ্য বা ঘটনা যখন ভাবের সামগ্রী হয়ে আমাদের মনের সঙ্গে রসের প্রভাবে মিলে যায় তখন মানুষ স্বভাবতই ইচ্ছা করে সেই মিলনকে সর্বকালের সর্বজনের অঙ্গীকার ভুক্ত করতে। কেননা রসের অনুভূতি প্রবল হলে সে ছাপিয়ে যায় আমাদের মনকে। তখন তাকে প্রকাশ করতে চাই নিত্যকালের ভাষায়; কবি সেই ভাষাকে মানুষের অনুভূতির ভাষা করে তোলে অর্থাৎ জ্ঞানের ভাষা নয় হৃদয়ের ভাষা, কল্পনার ভাষা।"

(সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্যের পথে)

যে শক্তির দ্বারা বহির্বিশ্বের মধ্যে মন অনুপ্রবেশ করিতে সমর্থ হয় সেই শক্তিকে বলা হয় কল্পনা শক্তি।

"যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন যয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনা শক্তি ; এই কল্পনা শক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা কিছু আমাদের থেকে পৃথক এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে তুলতে পারে।" (সাহিত্যের তাৎপর্য : সাহিত্যের পথে)

রূপ সৃষ্টির প্রথম পর্যায় হইল কবির বস্তুর সহিত একাত্মতা। মনকে সকল প্রকার শিক্ষা, সংস্কার এবং বিচিত্র নীতিবোধ হইতে মুক্ত করিয়া বিশ্বকে দেখিতে পারিলে বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ ধরা পড়ে। গ্যেটে এই পর্যায়ের পরিচয় দান করিয়াছেন,

"It was not on the whole my way ; as a poet, to stride after the embodiment of something abstract, I received within myself impression impressions of a hundred sorts, sensuous, lively, lovely, many hued as an alert imaginative energy presented them."

দ্বিতীয় পর্যায়ে সমালোচনার পূর্বে রূপগুলিকে তাহার সকল পরিবেশ সমেত দানা বাঁধিয়া উঠিতে দেওয়া প্রয়োজন। ইহা স্বপ্নাচ্ছন্ন একপ্রকার অবস্থা, যে অবস্থায় রূপগুলি দ্রুত মনের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যায়। অবচেতন মনের সামগ্রিক প্রকাশের জন্য ইচ্ছা ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ নিরোধ প্রয়োজন।

রূপ সৃষ্টির তৃতীয় পর্যায়ে কবির চেতনা আরো কতকটা সক্রিয় হয় ও সমালোচনার কাজ আরম্ভ হয় এবং কবিতার নূতন উদ্ভূত কল্প রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কতকগুলি রূপকে গ্রহণ এবং কতকগুলিকে বর্জন করা হয়।

প্রথমত অনুভূতি যাহা একটি বস্তুকে স্মরণীয় করে ; তাহার পর বহু স্মৃতি সঞ্চয়ের জন্য অভিজ্ঞতার বিস্তার, তাহার পর ধৈর্য, যাহার ভিতর দিয়া স্মৃতিগুলি আরো গভীরে গিয়া সুপরিণতি লাভ করে, তাহারপর পরিবেশ সৃষ্টির ভিতর দিয়া ইমেজ ধর্মিতা লাভ করে। পরিশেষে পরিশুদ্ধতার বিচার, যাহার সহায়তায় কবি অপ্রয়োজনীয় অংশকে পরিহার করিয়া ধীর বিকশিত কল্প-রূপকে ধীরে এবং আয়াস সহকারে পরিচালিত করেন। এইরূপে পরিশেষে কাব্যের কল্প-রূপ জন্ম লাভ করে।

ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকের সমালোচকগণ কল্প রূপকে কতকটা

অলঙ্কার স্বরূপ বোধ করিতেন। কল্পরূপ যে কবিতার প্রাণ, ছোট ছোট কল্পরূপ যে একত্র মিলিত হইয়া সমগ্র কবিতাটিকেই একটি কল্পরূপে পরিণত করে এই জাতীয় ভাবনার প্রকাশ পশ্চাত্ত্যে রোমান্টিক আন্দোলনের পূর্বে তেমন ঘটে নাই। কোলরিজ কল্পরূপের সংজ্ঞা দিতে গিয়া বলিয়াছেন, ভাব বা আবেগ যুক্ত শব্দ চিত্রই কাব্যের কল্পরূপ। তিনি বলিয়াছেন,

'Images however beautiful....do not of themselves characterize the poet. They become proofs of original genius only as far as they are modified by a predominant passion, or by associated thoughts or images awakened by that passion.'

কোলরিজের সংজ্ঞার গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল এই কয়েকটি শব্দ 'interrelating of images by passion'; অর্থাৎ ভাবাবেগের দ্বারা কল্পরূপগুলির সম্বদ্ধতা।

কাব্যলোক কৃত্রিম সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা আমাদের নিকট অর্থান্বিত হইয়া প্রকাশ পায়। ইহা তাহার রূপ-কল্পনার সহায়তায় সত্যলোকের অভাস দান করে। উপমা ও তুলনার সহায়তায় এই যোগের রহস্য উপস্থাপিত করা হয়। কল্পরূপ ইহার গভীরতর অর্থ দ্যোতনা করে। সত্য-লোকের মধ্যে যে কল্পরূপ আছে তাহা উপমা ও তুলনার ভিতর দিয়াই আমরা বোধ করি।

সকল প্রাকৃতিক ঘটনার সকল তথ্যের অন্তরালে যে ঐক্য তাহার উপলব্ধির ভিতর দিয়া কাব্যের সত্য আবির্ভূত হয়, এবং উপমা ও তুলনা সৃষ্টির প্রতিভার ভিতর দিয়া এই কল্পরূপের মধ্যে তুলনার নিয়ত আবিষ্কার এবং প্রাচীন তুলনার পুনরুজ্জীবন ঘটে।

তুলনা বহির্জগতের গভীরতর কল্পরূপ উদ্‌ঘাটনের পদ্ধতি। যখন সমাজরূপ পরিবর্তিত হয়, যখন সমাজের বিশ্বাস এবং কাঠামো বিশ্লিষ্ট হয়, তখন কবিরা নূতন কল্পরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য নূতন তুলনার সন্ধান করেন।

কবিতার কল্পরূপগুলি একত্রীভূত এবং সংহত হইয়া একটি কল্পরূপ গড়িয়া তুলে। অগাস্টাইন যুগের কবিতায় এই তুলনাগুলি চিন্তার সূত্রে বিধৃত। রোমান্টিক কবিতায় একটি রহস্য উদ্‌ঘাটন কারী আবেগের সূত্রে এই তুলনাগুলি বিধৃত থাকে। যে প্রতিভা কবিতার কল্পরূপ সৃষ্টি করে তাহাই কল্পনা।

কবিতার মধ্যে প্রভাবের অবিচ্ছিন্নতা না থাকিলে কাব্যের সত্যকে প্রকাশ করা যায় না। যে অভিজ্ঞতা হইতে কাবতা উদ্ভূত হয় তাহার সার্থক বিন্যাসের ফলে কাব্যে প্রভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা দেখা দেয়। একটি বিশেষ অভিজ্ঞতা

হইতে কোন কবিতার ভাব উদ্ভূত হইলেও ইহার তুলনাগুলি অনেক বৃহত্তর ক্ষেত্র হইতে কবির জীবনবোধের সামগ্রিকতা হইতে আসে।

কল্পনার সহায়তায় কবি সত্যলোকের কল্পরূপকে উদ্ঘাটিত করেন এবং কবিতার কল্পরূপগুলি আলোক বর্তিকা স্বরূপ হইয়া এই সকল কল্পরূপকে উদ্ভাসিত করে।

কল্পরূপের দুইটি স্তর আছে। একদিকে কল্পরূপগুলি একটি ভাবনার সহিত যুক্ত থাকে, অন্যদিকে এই ভাবনা একটি সাধারণ সত্যকে প্রকাশ করে।

(ঋ)

কবি বা শিল্পী প্রকৃতির অন্তরালবর্তী অসীম সত্যকে কোন-না-কোন ভাবে অপরোক্ষ করেন। তাহারপর এই অলৌকিক সাক্ষাৎকারকে বিচিত্র সাহিত্য ও শিল্পরূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার জন্য তাঁহাদের জীবনে নিরলস চেষ্টা দেখা দেয়।

এই উপলব্ধির জগৎ মানুষের বুদ্ধি বিচার ও যুক্তি বহির্ভূত এক ভিন্নতর জগৎ। সুতরাং যে ভাষা মানুষের জ্ঞান রাজ্যের, তথ্য রাজ্যের বাহন, যাহা প্রচলিত, আবিষ্কৃত তাহার সহায়তায় এই বোধের প্রকাশ একপ্রকার অসম্ভব।

গ্রীক শিল্পের কয়েক শতাব্দী ব্যাপী যে অস্তিত্ব তাহা কোন মূল্যকে বহন করিয়া আছে বলিয়া নয়। সেগুলি শিল্পের সামর্থ অনুযায়ী চিরন্তন সত্যকে প্রকাশ করে। তাহারা কোন নিশ্চয়তাকে অনুসন্ধান করিতে বা কোন আদর্শকে প্রকাশ করিতে চায় না। তাহারা এক একটি জৈবিক সত্তা। ইহাদের মধ্যে ভাবাবেগকে প্রবেশ করান যায়, সৎ ও অসতের আবরণে, আনন্দ ও বেদনা রূপে প্রকাশ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই প্রকাশ ক্রিয়াগুলি শিল্পের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। শিল্পের প্রত্যক্ষ গোচর রূপ প্রতিপাদ্য এই রূপ সত্তার ধারণা প্রকাশ করে।

শিল্পের ইতিহাসকে এই দিক হইতে উপলব্ধি করিতে হইবে। শিলার বলেন, "শিল্পের ইতিহাস হইল বোধি আশ্রয়ী জগতের বিরুদ্ধে নিয়ত অভিযান, ইহাকে আমাদের উপলব্ধির জন্য নিয়মিত করা এবং ইহা এক ধরণের উপলব্ধি যাহা কোন বিজ্ঞান দান করিতে পারে না। প্রত্যেকটি প্রকৃত শিল্পের উদ্দেশ্য হইল ইতিপূর্বে উপস্থাপিত কোন কিছু সৃষ্টি করা নয়, কোন প্রকার ভাবাত্মক কল্পনা সৃষ্টি করাও নয়, সমগ্র বহির্জগৎ এবং আত্মার দিকে অগ্রসর হওয়া, প্রত্যক্ষ

করা, তাহার মধ্যে সেই সকল বস্তুময় সত্যতা আরোপ করা,—যাহা বিধান এবং সংস্কারের দ্বারা আবৃত।"

শিল্পরূপ গোপন কোন কিছুকে নিশ্চয়ই নির্দেশ করে, এমন কোন কিছু যাহা সংকীর্ণ প্রতিবিম্বের সীমার মধ্যে ধরা যায় না। শিল্প আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ নয়, ইহা অতি মানবিক ভাবনাকে রূপদান করে। যাহা যুক্তি বিতর্কের বাহিরে শিল্প তাহাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রূপ দান করে, ইহা ভাবাত্মক উপলব্ধির গতিশীলতাকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর মধ্যে স্থির রূপ দান করে।

আমাদের মন ও বুদ্ধির অতীত যে সীমাহীন জগৎ সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে তাহাকেই অভাসিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা।

সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে এই অসীমকে, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে সত্য, রস, অখণ্ড এক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহাকে আমরা উপলব্ধি করি কি ভাবে?

তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে এমন একটি অখণ্ড ঐক্য প্রকাশ পায়, এমন একটি পরিপূর্ণ সুষমা এমন এক সুসম্পূর্ণ ছন্দরূপ এক প্রাণবান নৈতিক সত্তা-রূপ যাহার ভিতর দিয়া মন অসীমকে এককে বিশ্বছন্দ বা সুষমাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

(ঞ)

ব্যক্তির মনের মধ্যে যে বহুবিচিত্র বিরুদ্ধ প্রেরণা চিন্তা ও ভাবনা, আলৌকিক উপায়ে তাহাদের মধ্যে যখন পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত হয়, তখনই প্রতীক বা সিম্বল জন্মলাভ করে। এই সামঞ্জস্য সাধিত হয় ব্যক্তির সচেতন মনের বহির্ভূত কোন রহস্যের ভিতর দিয়া। এই ক্রিয়াকে মনস্তাত্ত্বিক ভাষায় বলে (individuation) ব্যক্তির স্বী-করণ। এই চেষ্টার ভিতর দিয়া ব্যক্তিত্ব একটি অখণ্ডতা লাভ করে।

অখণ্ডতা বোধের ভিতর দিয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের এই উপলব্ধি ইহার পর হইতে ক্রমিক প্রসারতা লাভ করিয়া চলে। এই প্রসার কোন একটি পরিণামে গিয়া যে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, এবং তাহার পূর্বের সমস্ত পর্যায়টাই যে আংশিক তাহা ঠিক নয়। ইহা বিকাশের সকল পর্যায়ে একটি পূর্ণতাকে ধারণ করিয়া থাকে।

কেবল ব্যক্তির বোধের ক্ষেত্রেই নয়, সমাজের মধ্যে সমসাময়িক কালে

বিপরীতমুখী বিচ্ছিন্ন বহুবিচিত্র প্রেরণা ব্যক্তিত্বের এই প্রসারতার ভিতর দিয়া পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিতে পারে। ইহাতে ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া যে বিচিত্র প্রতীকের উদ্ভব ঘটে তাহাতে একটি সমগ্র সমাজের বহু বিচিত্র প্রেরণা সুসামঞ্জস্য লাভ করিয়া একটি অখণ্ডতা প্রাপ্ত হয়।

ব্যক্তিত্বের এই প্রসার সমাজকে অতিক্রম করিয়া সমগ্র বিশ্বকে আশ্রয় করিতে পারে। তাহাতে ব্যক্তির সিম্বল বা প্রতীকরূপের মধ্যে সমসাময়িক যুগের সকল বিরুদ্ধ চিন্তা ও ভাবনা, সকল বিপরীত মুখী আবেগ ও প্রেরণা পূর্ণ সমন্বয়ের রূপ খুঁজিয়া পাইয়া ধন্য হয়।

ঈশ্বরীয় তত্ত্ব এমনি একটি প্রতীক। তাঁহার মধ্যে সকল দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সকল বিপরীত মুখী প্রেরণার, চিন্তা ও ভাবনার পূর্ণ সামঞ্জস্য রূপটি রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার ব্যক্তিত্ব কিরূপ ক্ষুদ্রতর সামঞ্জস্যের বোধ হইতে ক্রমিক বৃহত্তর সামঞ্জস্যের দিকে ধীর প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই বিকাশের ধারা পর্য্যালোচনা করিতে পারা যায় তাঁহার সৃষ্ট বা লব্ধ বিচিত্র প্রতীক রূপের সহায়তায়।

এইরূপে সাহিত্যে ও শিল্পে যে ইমেজ বা সিম্বল জন্ম লাভ করে এবং এই সকল ইমেজ বা সিম্বল মিলিত হইয়া কাব্যের যে একটি কল্পরূপ গড়িয়া তুলে তাহাকে প্রাচীন অতিজাগতিক মতবাদের সহায়তায় সম্পূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে দুই দিক হইতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথমত বিশ্বের সহিত যোগে মনের ধীর প্রসার। ইহাতে মনেরই কেবল ধীর প্রসার ঘটিতেছে না, সেই সঙ্গে মনের ভাবানুষঙ্গে প্রকৃতি মনের সামগ্রী হইয়া উঠিয়া নিত্য নূতন সামর্থ ও তাৎপর্য লাভ করিয়া ক্রমেই সৌন্দর্য ও মাধুর্য মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। ব্যক্তি মনের সহিত বহির্বিশ্বের এই মিলন বোধের আনন্দ প্রেরণাই সাহিত্যও শিল্প সৃষ্টির প্রেরণা।

দ্বিতীয়ত বিশ্বের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ভাবনাকে কবির মন আপনার মনঃসীমানার আবেষ্টনের মধ্যে কতকটা আবদ্ধ করিয়া তাহাকে একটি সুনির্দিষ্ট সুস্পষ্ট আকার দান করে। যাঁহার কল্পনা শক্তি যত অধিক, যাঁহার মনের সীমানা যত বেশি প্রসারিত, তাঁহার মধ্যে বিশ্ব ভাবনা তত অধিকরূপে ধরা পড়ে। এইরূপে ব্যষ্টির ও সমষ্টির মনকে আশ্রয় করিয়া বিচ্ছিন্ন রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া বিশ্বমনের ভাব-রূপটি ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

এই উভয় উপলব্ধির ক্ষেত্রেই ব্যক্তির সহিত বহির্বিশ্বের যোগেই যে সাহিত্যের উদ্ভব এই মূল সত্যটিকেই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

সাহিত্য ও শিল্প এইরূপে বিচিত্র প্রতীক রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া মানুষের বোধের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া চলিয়াছে। তবে এক্‌সিস্টানসিয়া-লিস্টদের ধারণা হইতে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও শিল্পবোধের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে।

একসিস্টানসিয়ালিস্টদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও শিল্পকে এক একটি প্রতীক রূপ বলিয়া বোধ করিতেন। এইরূপে প্রত্যেকটি সৃষ্টি রূপের একটি অনন্য সাধারণ একক মূল্য আছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বোধ করিতেন, দেশ কালে বিচ্ছিন্ন এই সকল একক সৃষ্টি রূপের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ডরূপ বা ভাবের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। এই বিকাশ সূত্রে বিধৃত বলিয়া কোন সৃষ্টি রূপ একান্ত বিচ্ছিন্ন নয়। এই অখণ্ড রূপ বা ভাবনাটিকেই তিনি বিশ্ব মানস আখ্যা দান করিয়াছেন।

(ট)

নিও আইডিয়েলিজ্‌ম্ একদিকে যেমন অসীম বা অরূপকে অস্বীকার করেন, তেমনি অন্যদিকে বহির্বিশ্বের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া কেবল মনকে আশ্রয় করেন।

ইঁহারা অসীমকে অস্বীকার করেন এই কারণে যে স্থির কোন একটি সম্পূর্ণতাকে স্বীকার করিলে কালে তাহার অগ্রগতিকে অস্বীকার করিতে হয়। তাহার ফলে অগ্রগতি বা বিকাশ বলিতে যাহা বুঝায় তাহাও থাকিতে পারে না। যদি চিন্তার কাঠামো ইতিপূর্বে সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরিবর্তন বা বিকাশশীল চিন্তার ক্রিয়া সম্পূর্ণের ধর্ম হইতে পারে না। পরিবর্তন বা বিকাশ না থাকিবার জন্য প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। বিকাশ বা ইতিহাসকে স্বীকার করিতে হইলে হেগেলের বৈচিত্র্যের অন্তরালে সম্পূর্ণকে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র বৈচিত্র্যকে মানিতে হয়। ক্রোচে এবং জেন্টিল এই মত পোষণ করেন। তাঁহাদের মতে সৃষ্টিক্রম, সক্রিয় মনের অতীতে কিছু নেই, এবং ইহাই জগতে একমাত্র সত্য বস্তু। ইঁহাদের মতে বিশ্ব মানসিক ক্রিয়ার ক্রম উন্মোচন। সত্য ক্রমাগত হওয়া, সম্পূর্ণতা ইহার বিরোধী তত্ত্ব।

মন ব্যতিরিক্ত কোন তত্ত্ব নাই। মনের অভিজ্ঞতা হইতে নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। বিশ্বমন বা চেতনা একমাত্র সত্য বস্তু। এই মন বস্তু জোগান দেয়, আবার এই মন বস্তুকে সজ্জিত ও শ্রেণী বিন্যস্ত করে। এই উভয় ধর্মের একটিকে বলা হয় সৌন্দর্য্যতত্ত্বের বোধি বিজ্ঞান, (intution—science of aesthetic) এবং অন্যটিকে বলা হয় যুক্তি বিজ্ঞান (science of logic)।

উপলব্ধির বাহিরে কোন আশ্রয় নাই, ইহা মনের ক্রিয়া, রূপকল্পনা ও বোধিরূপে আপনার তথ্য আপনি সৃষ্টি করে। এই ক্রিয়াকে সৌন্দর্য মূলক ক্রিয়া বলে এবং যে প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া চিন্তার তথ্য নির্মিত হয় তাহাকে কল্পনা বা বোধির ক্রিয়া বলে। মনের বোধি শক্তি আছে এবং এই বোধিকে মন রূপ কল্পনা রূপে প্রকাশ করে। অপ্রকাশিত বোধি বলিয়া কোন কথা নাই। দুইটি বস্তুত একই জিনিস। সাহিত্য বা শিল্পের রস গ্রহণও আমাদের বোধির প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ অসীম, বিশ্ব-মন (এইখানেই দেশ-কালের তত্ত্ব আসিয়াছে) ব্যক্তিমন এবং অন্তহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ বহির্বিশ্ব এই প্রত্যেকটি তত্ত্বের চরম সত্যতা স্বীকার করেন।

অসীম তাঁহার পরিপূর্ণ ধ্যানকে বিশ্বমন বা দেশ-কালের ভিতর দিয়া ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন (এইখানে অভিব্যক্তি বা বিকাশের তত্ত্ব আসিয়াছে, এইরূপে ঐতিহাসিক সত্যতাও স্বীকৃত)। ব্যক্তিমন বিশ্বমনকে ক্রমাগত গভীরভাবে লাভ করিবার ভিতর দিয়া বিকাশ লাভ করিতেছে। ব্যক্তি মনের বিকাশের ক্ষেত্রে দুইটি তত্ত্ব যুগপৎ ক্রিয়া করে, একটি বহির্বিশ্ব, অন্যটি বিশ্বমন। এই উভয়ের সঙ্ঘাতে মন গতি শীলতা লাভ করিয়াছে। এইরূপে অসীম বা অরূপকে স্বীকার করিয়াও দেশ-কালের মনের বা ঐতিহাসিক তত্ত্বকে কী ভাবে স্বীকার করা যায় রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে সেই রহস্যই আমরা লাভ করি।

দার্শনিক উপলব্ধির এই পার্থক্যের জন্য উভয়ের সাহিত্য জিজ্ঞাসার মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। ক্রোচে তাঁহার Aesthetics গ্রন্থে যে সকল ক্ষেত্রে সাহিত্য ও শিল্প-কর্মের পশ্চাদ্‌গত মানসিক প্রেরণার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন নিম্নে কেবল তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

ক্রোচে জ্ঞানের দুইটি রূপের কথা বলিয়াছেন,—একটি বোধিমূলক, অন্যটি বিচারমূলক, একটি কল্পনা লব্ধ, অন্যটি চিন্তা লব্ধ। বিজ্ঞান কর্ম এবং শিল্প কর্ম

অর্থাৎ জ্ঞান মূলক তথ্য এবং বোধিমূলক সত্যের মধ্যে পার্থক্য স্রষ্টার সামগ্রিক ফল পরিণামের মধ্যে। অর্থাৎ উপাদান গুলি পৃথক পৃথক অমূর্ত্য ভাবে না সামগ্রিক ভাবে তাহাই বিবেচ্য। শিল্প বা সাহিত্যের অংশগুলির গুণ সমগ্রের দ্বারা নির্দ্ধারিত। সাহিত্য দার্শনিক তথ্য পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহার সামগ্রিক ফল বোধিমূলক; কিন্তু দার্শনিক আলোচনার সামগ্রিক ফল তথ্য। সৃষ্টি প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বোধিকে প্রকাশ রূপ হইতে বিচ্ছিন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব। উভয়ের প্রকাশ ঘটে একই মুহূর্তে, তাহারা তাই দুই নয় এক।

প্লেটোর মতে শিল্প আত্মার সমুন্নত এবং জ্ঞানের সামগ্রী নয়, ইহা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়। ইহা তাই মনকে শক্তিশালী না করিয়া দুর্বল করে। ইহা ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী আনন্দ বলিয়া মানব চেতনাকে আচ্ছন্ন করে। সেইজন্য তিনি তাঁহার আদর্শ রিপাবলিক হইতে কাব্য এবং কবিদের বহিষ্কৃত করিয়াছেন।

বুদ্ধিমূলক জ্ঞান ছাড়া প্লেটো জ্ঞানের আর কোন প্রকাশ রূপ আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাঁহার এই বোধ অবশ্য যথার্থ যে প্রাকৃতিক সামগ্রীর ক্ষেত্রে কল্পরূপ সৃষ্টিতে অনুকরণ শেষ হইয়া যায় এবং তথ্য বা বিচার মূলক জ্ঞানে তাহা পৌঁছায় না। তিনি বিশ্বাস করিতেন বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ার পূর্বে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ছাড়া আর কিছু নেই।

কান্টের দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতির মধ্যে কল্পনার অভাব লক্ষ্য করা যায়। কান্ট ইহার সহিত যে কয়েকটি গুণকে বিজড়িত করেন তাহা বুদ্ধিবৃত্তি, বিচার এবং যুক্তি। চৈতন্যের শক্তিগুলির মধ্যে তিনি কল্পনার কোন স্থান খুঁজিয়া পান নাই, বরং ইহাকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির পর্যায় ভুক্ত করেন। প্রকৃত সৃষ্টিধর্মী কল্পনা বলিতে কি বুঝায় তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল।

কোথাও কোথাও কান্ট কতকটা ক্ষীণভাবে অনুভব করিয়াছেন যে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়ার পূর্বে এমন একটা কিছু আছে যাহা নিছক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় নয়, ইহা সম্পূর্ণ অন্য নিরপেক্ষ, বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত ভাবাত্মক রূপ। শিল্পবিষয়ক চিন্তার ভিতর দিয়া তিনি এই প্রকাশ রূপের আভাস লাভ করেন নাই। জ্ঞানের প্রক্রিয়া চিন্তা করিতে গিয়া তিনি ইহা লাভ করেন। চেতনা ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে রূপ দান করিলে ইন্দ্রিয়ানুভূতি চৈতন্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে যে রূপ দান করে শিল্পরূপ বলিতে তাহা বুঝায় না। ইহা বোধি, ইন্দ্রিয়ানুভূতির পূর্ববর্তী একটি সমগ্রতা।

রূপ কল্পনা

অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ভাবাত্মক, অন্তর্মুখীন, মুহূর্তকালের জন্য সকল ক্রিয়া মুক্ত। এই উপলব্ধিকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। আবিষ্ট বা তন্ময় মুহূর্তে প্রকাশ অসম্ভব। কবি সচেতন ভাবে স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়া ইহাকে ভাষায় রূপায়িত করিবার জন্য জাগ্রত চিন্তার সহিত ইহার সঙ্গতি দান করেন।

অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার সাধারণ চিন্তা হইতে মূলত পৃথক। ইহা স্বতস্ফূর্ত, অনায়াস লব্ধ। ইহার সৃষ্টি মূর্ত্য এবং এমন কতকগুলি চিত্র সমষ্টি যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। মানস পটে এই সকল চিত্রের তখনই প্রকাশ ঘটে যখন ইন্দ্রিয়-দীপ সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হইয়া যায়।

দুইটি উপাদানের পারস্পারিক সঙ্ঘাতের ফলে কবি-কল্পনায় চিত্র-রূপ গড়িয়া উঠে। প্রথমত বাহিরের অভিজ্ঞতা, দ্বিতীয়ত ভাবাবেগ কম্পিত আবিষ্ট মন। বাহিরের অভিজ্ঞতাকে মন আপনার উদ্দেশ্য অনুকুল করিয়া কমবেশী সাধারণীকৃত এবং ঐশ্বর্য মণ্ডিত করিয়া রূপদান করে।

কোন চিন্তা বা ভাবনাকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য রূপ কল্পনার ব্যবহার হয় না। ইহা কাব্যিক উপলব্ধির স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ। ইহাকে তাই পরবর্তী কোন সময়ে চিন্তা করিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। কাব্যের অন্তর ও বাহির, বিষয় ও ভাবনার সহিত রূপ-কল্পনা মিলন সাধন করে। রূপ-কল্পনা কাব্যের বাহিরের বিভিন্ন অংশের মধ্যে শুধু নয়, কাব্যের মধ্যেও একটি ঐক্য গড়িয়া তুলে। রূপ-কল্পনা চিন্তার অনন্যসাধারণ এবং বিশিষ্ট প্রকাশ। চিন্তা হইতে রূপ কল্পনাকে তাই পৃথক করিতে পারা যায় না। রূপ কল্পনা চিন্তার অলঙ্কার নয়, তাহার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাব্যে রচনারীতি এবং রূপ-কল্পনা একাত্ম হইয়া থাকে। রূপ কল্পনা কবির ব্যক্তিগত অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের অনন্য সাধারণ প্রকাশ। রূপকল্পনার প্রবাহ স্রোতোধারার ন্যায় সদ্য প্রসূত এবং স্বতস্ফূর্ত সাক্ষাৎকার রূপে অনায়াসে বাহির হইয়া আসে।

রূপ কল্পনা অলঙ্কৃত উক্তি নয়। সুন্দর কতকগুলি তুলনা আবিষ্কারের

আনন্দ হইতে রূপ কল্পনা জন্ম লাভ করে না। ব্যক্তি হৃদয়ে ব্যাকুলতা হইতে ইহার জন্ম। প্রত্যক্ষ অর্থ অপেক্ষা রূপ কল্পনা অনেক গভীর অর্থ দ্যোতনা করে।

সার্থক রূপ কল্পনার প্রকাশ অত্যন্ত সংহত। গভীরতর অর্থ দ্যোতনা করে বলিয়া রূপ কল্পনার মধ্যে অস্পষ্টতা অনিবার্য রূপে দেখা দেয়। সাধারণ রচনারীতি অপেক্ষা রূপ কল্পনা অনেক বেশী জটিল। রূপ কল্পনার মধ্যে দুইটি অর্থ থাকে,—একটি প্রত্যক্ষ, বাহিরের এবং অন্যটি অপ্রত্যক্ষ, অন্তরের।

রূপ কল্পনা যতই উন্নত হয় তাহার মধ্যে বৈচিত্র ও সমৃদ্ধি ততই বাড়িয়া যায়। অনেকগুলি রূপ কল্পনার জটিল সংমিশ্রণে একটি জৈবিক সমগ্রতা ফুটিয়া উঠে।

কবি মন সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই আনন্দিত। কখন কখন তিনি স্বয়ং ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। এই সাদৃশ্য কোথাও হয়ত আদৌ লক্ষ্য গোচর নয়, কেবল অনুভব গম্য।

এই সাদৃশ্য বুদ্ধি গ্রাহ্য না হইয়া কেবল আবেগময় হইতে পারে। দুইটি রূপের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াই যে তাহাদের পাশাপাশি আনা হয় তাহা নয়, তাহাদের মধ্যে ভাবগত ঐক্য আছে বলিয়া এই রূপ ঘটে। কবিরা এই অন্তর্লীন, ব্যাখ্যাতীত সাদৃশ্য নির্দেশ করিতে পটু, এবং ইহা কেবল অনুভূতি গোচর। এই সাদৃশ্য আবিষ্কারের মধ্যে কবি প্রতিভার সম্যক এবং প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা যায়। কবি কল্পনা দুইটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে অথবা বোধ করিতে পারে, কেবল তাহাই নয়, এই দুইটি বস্তুকে বিগলিত করিয়া এক করিয়া দেয়।

(খ)

বিশ্বের সহিত যোগে মানব মনেরই কেবল বিকাশ ঘটিতেছে না, সেই সঙ্গে মনের ভাবানুষঙ্গে বিশ্ব প্রকৃতিরও নিয়ত রূপান্তর ঘটিতেছে। প্রাচীন কালে প্রকৃতি যে স্বরূপে প্রতিভাত হইত আজ নিশ্চয়ই প্রকৃতির সেই স্বরূপ নাই। প্রকৃতির সৌন্দর্য মানুষের নিকট আরো গভীর এবং আরো ব্যাপক হইয়া ধরা পড়িয়াছে। প্রকৃতি মানুষের আরো বেশি পরিচিত এবং আরো আপনার হইয়াছে। মানব মনের যোগে প্রকৃতির বিচিত্র অজ্ঞাত কক্ষের দ্বার ক্রমাগত খুলিয়া যাইতেছে।

এই সৌন্দর্য্য ও ভাবনা-লোককে প্রকাশ করিতে তাই অধিকতর সামর্থ্য যুক্ত

নূতনতর রূপ-কল্পনার প্রয়োজন। বস্তুত তাহাই ঘটিতেছে। সাহিত্য ও শিল্পরূপ বিশ্লেষণ করিলে নিত্য নূতন রূপ-কল্পনা এবং তাহার ধীর বিকাশের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। বিশিষ্ট কয়েকটি রূপ-কল্পনার মধ্যে সাহিত্য বা শিল্পের প্রকাশ রূপকে তাই বাঁধিয়া রাখিতে পারা যায় না। ইহা মানব মনের বিকাশ ধর্ম ও সৃষ্টি-ধর্ম বিরুদ্ধ। কেবল রূপ-কল্পনার ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের সমগ্র প্রকাশ-রূপ সম্পর্কেও একথা সত্য।

রূপ-কল্পনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের নব নব সৃষ্টি প্রতিভার সামান্য পরিচয় নিম্নে লাভ করিতে পারা যাইবে।

(গ)

সৃষ্টির সেই প্রথম প্রভাতটি কী রূপ ছিল! পরিব্যাপ্ত অচঞ্চলতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই প্রথম চাঞ্চল্যের সঞ্চার। তাহার পর দেশ-কালের অন্তর্গত অন্তহীন রূপ-লোকের একটির পর একটি প্রকাশ। এক জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপের একটির পর একটি দল উন্মীলন।

সেই আদি রহস্যের একটু আভাস লাভ করিতে পারা যায় রাত্রি অবসানে প্রভাতের ধীর জাগরণের মধ্যে। এই আবির্ভাবকে কবি নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিত্য নূতন বিস্ময় রসে তাঁহার চেতনা আপ্লুত হইয়া গিয়াছে।

সবুজ আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া চাঁপার কনক আভার যেমন ঈষদ্ প্রকাশ ঘটে, রাত্রির আবরণ ছিন্ন করিয়া তেমনি উষার স্বর্ণময় আভাটি ফুটিয়া উঠে। তাহা এমনি কোমল, এমনি স্নিগ্ধ!

"অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন ফোটা কাঁটালি চাঁপার মতো।" (বীথিকা)

কুঁড়ি হইতে ফুলের প্রকাশের মধ্যে যে বিস্ময় অন্ধকারের আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া আলোর প্রথম আবির্ভাবের মধ্যে তেমনি বিস্ময়। কোন্ অরূপলোক হইতে নিত্যকাল ধরিয়া এমনি রূপের প্রকাশ ঘটিতেছে।

"কুঁড়ির মতো ফেটে গিয়ে
ফুলের মতো উঠল কেঁদে—" (বিকাশ : খেয়া)

আলোকের প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মর্ত্য-লোকে ধীরে বিচিত্র সাড়া

পড়িয়া যায়। পরিব্যাপ্ত নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রথম বাণীর সঞ্চারের মধ্যে কী অপার বিস্ময় !

"ভোর হয়ে ওঠা বিপুল রাত্রির প্রান্তে
প্রথম চঞ্চল বাণী জাগল যেন।" (শেষ সপ্তক)

জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তৃণ-তরু-লতায় নিঃশব্দ বিপুল জাগরণ।

"ধরণীর অন্তঃপুরে
রবিরশ্মি নামে যবে, তৃণে তৃণে অঙ্কুরে অঙ্কুরে
যে নিঃশব্দ হুলুধ্বনি দূরে দূরে যায় বিস্তরিয়া
ধূসর যবনি অন্তরালে—" (প্রণাম)

'নিঃশব্দ হুলুধ্বনি' শব্দ প্রয়োগটি এক্ষেত্রে সবিশেষ লক্ষনীয়। হুলুধ্বনির মধ্যগত স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের উচ্ছ্বাস, বিকীর্ণ আনন্দবোধ, শিহরণ প্রভৃতিকে ধ্বনি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টার মধ্যে কবি প্রতিভার নিঃসংশয় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

আলোর এই প্রথম মহিমময় প্রকাশ রূপের মধ্যে এমন একটি শুচিতা আছে, যাহাকে পার্বতীর মিলন সুখ তৃপ্ত হাস্য-মধুর আননের সহিত তুলনা করা যায়।

"কুহেলি গেল, আকাশে-আলো দিল-যে পরকাশি
ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসি।"

(সাগরিকা : মহুয়া)

কখন মনে হয় অসীম শূন্যলোক পার হইয়া এই আলোক যেন ধরিত্রীর সকল প্রাণী-লোকের জন্য দেবতার আশীর্বাদ বহন করিয়া আনিতেছে।

"ধীরে আসে আশীর্বাদ বহি
শেফালি কুসুম রুচি আলোর থালায়।" (রোগ শয্যায়)

একদিকে উষার ধীর প্রকাশ, অন্যদিকে রাত্রির অবসান। আকাশের এক প্রান্তে ম্লান চন্দ্র। যেন কুমারী রাত্রি বিদায় কালে উষার চরণ তলে আপনার কণ্ঠহার হইতে শ্রেষ্ঠ রত্নটিকে খুলিয়া উপহার দিতেছে। সেই আবির্ভাব যেমন, সেই বিদায় মুহূর্তটি তেমনি অপরূপ মাধুর্য মণ্ডিত।

"উষার চরণতলে মলিন শশী
রজনীর হার হতে পড়িল খসি।" (উদাসীন : বীথিকা)

দিগন্তে পুঞ্জিত মেঘের উপর উষার প্রথম আলোক আসিয়া পড়িয়াছে।

সুবর্ণ রঞ্জিত সেই মেঘখণ্ডগুলি যেন উষার অলক। একটি মাত্র সংহত উপমায় উষার সমগ্র প্রকাশ রূপটি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"দিগন্তে মেঘের গুচ্ছে তুলিয়াছে উষার অলক।" (মুক্তি : বীথিকা)

প্রভাত আলোক স্পর্শে বন বনান্তর ঝলমল করিতেছে। যেন প্রভাতের কণ্ঠের মণিহারের ঝিলিমিলি।

"প্রভাতের কণ্ঠ হতে মনিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।" (আরোগ্য)

আকাশে আলোর পরিব্যাপ্ত আভা। তরু শীর্ষে আলোক রশ্মি আসিয়া পড়িয়াছে। পাতার কম্পনে আলোকও কাঁপিতেছে। কম্পিত পাতায় পাতায় যেন আকাশের হৃদ্‌স্পন্দন।

"আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।" (আরোগ্য)

প্রায় অনুরূপ রূপ কল্পনার একটি পরিচয়—

—"Sky that danced among those leaves are still—"
(Evening Voluntaries : Wordsworth.)

রবীন্দ্রনাথের রূপ কল্পনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক কৃতিত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় লাভ করা যায় সেই সকল ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে তিনি রূপ বা বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাসের মধ্যে সঙ্গীতের বিচিত্র প্রকাশ রূপটিকে দেখিয়াছেন, কিংবা সুর বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া রূপের বিচিত্র মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট রূপ দেখিতে দেখিতে সুরে বিগলিত হইয়া যায়, অন্যদিকে সুর ধীরে একটি মূর্তি পরিগ্রহ করে। রূপ, বর্ণবিন্যাস এবং সঙ্গীতের মধ্যে সর্বত্রই সুষমা বিদ্যমান। এই অন্তর্নিহিত সুষমার দিক হইতে তিনি একটির মধ্যে আর একটির প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি কবি প্রতিভা যতই উন্নত হয় তাঁহার সাদৃশ্য কল্পনা ততই জটিল, গভীর, ততই দূরাকৃষ্ট এবং কতকটা যেন অস্পষ্ট হইয়া উঠিতে থাকে। —বিশ্বের সকল বিরোধ বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্য ও অখণ্ডতা কবি কল্পনা তাহাকে ততই অপরোক্ষ করিতে থাকে! সেখানে রূপ, রঙ, ভাব, ধ্বনি সব মিলিয়া একাকার হইয়া যায়। মুহূর্তে মুহূর্তে একটি অন্যটিতে কোন রহস্যের বশে নিয়ত রূপান্তরিত হইয়া যাইতেছে।

"ভোরের আলোকে যে গান ঘুমায়ে আছে,—" (উৎসর্গ)

উষার আলোক স্পর্শে ইতস্তত খণ্ড বিচ্ছিন্ন মেঘ সুবর্ণ রঞ্জিত হইয়া গিয়াছে। এই রূপের প্রকাশটিকে তিনি এক অখণ্ড সঙ্গীত রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

"সেদিন উষার নব বীণা ঝঙ্কারে
মেঘে মেঘে ঝরে সোনার সুরের কণা।" (মিলন : পরিশেষ)

সঙ্গীতের এক একটি বিচ্ছিন্ন সুর যেমন ঝরিয়া পড়ে তেমনি ভাবে এক একটি শেফালি ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। ফুলগুলি যেন নিখিল সঙ্গীত বা সুষমার এক একটি ছিন্ন তান।

"ভোরের বাতাসে
শেফালি ঝরিয়া পড়ে ঘাসে
তারাহারা রাত্রির বীণার
চরম ঝঙ্কার।" (শেষ : পূরবী)

এমনি আর একটি প্রকাশ—

"আকাশের আলোয় আজ যেন মেঠো বাঁশির সুর মেলে দেওয়া।"
(পত্র পুট)

কিংবা

"দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশ বাণী শেফালির কানে কানে বলা—" (প্রান্তিক)

উষার প্রথম আলোক সম্পাতের মধ্যে একটি গতিশীলতা আছে। তাহা যেন পরিব্যাপ্ত অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া আপনার পথ করিয়া লয়। পরিব্যাপ্ত অন্ধকার যেন নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র, তাহারই মাঝখানে আলোর প্রকাশ যেন এক খেয়াতরী—দ্রুত ছুটিয়া চলিতেছে। ইতস্তত লঘু শুভ্র মেঘ তাহার চন্দ্রাতপের শ্বেত ঝালর।

"দেখে অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংস শুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপ তলে।" (যাত্রা : পূরবী)

এই সকল বিচ্ছিন্ন রূপ একত্র মিলিত হইয়া প্রভাতের যে একটি অখণ্ড রূপ ফুটাইয়া তুলে তাহা আবার অ-দৃষ্ট আর এক লোকের আর একটি প্রভাত রূপের প্রতীক স্বরূপ মাত্র। কবিরা স্বপ্নে তাহার বিদ্যুৎ চকিত আভাস লাভ করেন।

বাতাসে শিশু-গাছের পাতায় পাতায় চঞ্চলতা। তাহার উপর রৌদ্রের কণা পড়িয়া ঠিকরাইয়া পড়িতেছে। ইহার সহিত কবি সেতারের দ্রুত ঝঙ্কৃত সুরের মিল খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

"শিশুগাছের কাপন লাগা পাতাগুলির থেকে
ঠিকরে পড়েছে যে রৌদ্র কণা
তার মধ্যে শুনেছি তার সেতারের দ্রুত ঝঙ্কৃত সুর।" (পত্রপুট)

অনুরূপ রূপ-কল্পনার প্রকাশ ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের কাব্যে কোথাও কোথাও যে আদৌ ধরা পড়ে নাই তাহা নহে। নিম্নে একটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি।

"A living death was in each gush of sounds,
Each family of rapturous hurried notes,
That fell, one after one, yet all at once,
Like pearl beads dropping sudden from their string."
(Keats)

(ঘ)

সন্ধ্যা কী অপার মহিমা ও বিস্মিত-মাধুর্য মণ্ডিত হইয়াই না কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল। সন্ধ্যার এই সকল রূপ কবি-চেতনার গভীর তলশায়ী হইয়া পরবর্তী কাব্য-ধারার মধ্যে নানা রূপে আত্ম প্রকাশ করিয়াছে। বাহিরের রূপ এইরূপে কবি চিত্তের গভীর হইতে গভীরতর লোক লাভ করিয়া কবির বিচিত্র ভাবনা, কামনা-বাসনা ও সংস্কারের সহিত বিজড়িত হইতে হইতে বিচিত্র তাৎপর্য মণ্ডিত হইয়া পরিণামে নানা প্রতীক স্বরূপতা লাভ করিয়াছে।

সন্ধ্যার আবির্ভাবের মধ্যে তিনি এক বিস্মিত মাধুর্যের প্রকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন। কী প্রশান্ত, কী স্নিগ্ধ, কী করুণাবিজড়িত, কী রহস্য নিবিড় সে রূপ! তাহার মধ্যে তিনি আপনার চির বাঞ্ছিত সৌন্দর্য্য-লক্ষ্মীর প্রকাশ মহিমার সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

"দেখা দিল দ্বার প্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মত সন্ধ্যাতারা করে।" (স্বপ্ন: কল্পনা)

বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র রূপের দিন যেন একটি রঙ্গের নদী, তাহার মধ্যে কত বর্ণের মুহুর্মুহু প্রকাশ,—দীর্ঘ যাত্রা শেষে তাহা সন্ধ্যা-সমুদ্রে আসিয়া বিলীন হইয়া যায়। রূপ কল্পনার কী আশ্চর্য্য পরিব্যাপ্তি।

"রঙের নদী পেরিয়ে সন্ধ্যাবেলায় অদৃশ্য হবে
নিস্তরঙ্গ ঘুমের কালো সমুদ্রে।" (পত্রপুট)

সমস্ত অন্তরীক্ষ, জল স্থল পরিপূর্ণ করিয়া এই যে বিচিত্র বর্ণের প্লাবন তাহার অলৌকিক সৌন্দর্যকে কবি কত বিচিত্র উপমার সহায়তায় না ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কখন মনে হয় যেন কোন দেবশিশু অঙ্গনে খেলা করিতে করিতে স্বর্ণ সুধার পাত্রখানা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া উর্দ্ধলোক হইতে তাহারই প্লাবন নিম্নে অন্তহীন ধারায় ধারায় নামিয়া আসিতেছে। সে রূপ দৃষ্টে পৃথিবী বিহ্বল।

"সুর লোকের খেলার অঙ্গনে
স্বর্ণ সুধার পাত্রখানা বিপর্য্যস্ত,
পৃথিবী বিহ্বল তার প্লাবনে।" (পত্রপুট)

আকাশে নক্ষত্রের প্রকাশ মহিমাকে ইংরেজ রোমান্টিক কবিগণ কত বিচিত্ররূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের কল্পনা বৈচিত্র্য এবং তাহার গভীরতা যে কত বেশি তাহা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

"Or glancing at each other cheerful looks,
Like separated stars with clouds between."
(On Nature's Invitation Do I Come : Wordsworth)

"Yon star upon the mountain-top
Is listening quietly." (Lines : Wordsworth)

"And loved you glittering in your bowers,
A starry multitude." (To the Daisy : Wordsworth)

"Mild as a star in water—" (Shelley)

"—like a throbbing star
Seen 'mid the sapphire heaven's deep repose"—
(Shelley)

"as, in sparkling majesty, a star
glides the bright summit of some gloomy cloud."
(Shelley)

"—faint smiling like a star" (Shelley)

উর্ধ্বে আকাশে সংখ্যাতীত তারার প্রদীপ জ্বালা, নিম্নে নিস্তরঙ্গ নদীবক্ষে সমস্ত আকাশের ছায়া।—অগণ্য তারার ছায়াতরী। সমস্ত আকাশকে আপনার বক্ষতলে ধরিয়া নদী সারারাত ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে।

"তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী" (বলাকা)

ইহার সহিত শেলির এই জাতীয় রূপ-কল্পনার কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়—

"And that strange boat, like the moon's shade did sway,
Amid reflected stars that in the waters lay."

(Laon and Cythna : Shelley)

কখনও মনে হয়, নদীর বুকে কে যেন অসংখ্য তারার ফুল ভাসাইয়া দিয়াছে। দুলিয়া দুলিয়া সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তাহারা কোথায় ভাসিয়া যায়।

"রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারা ফুল নিয়ে কালো জলে—" (বলাকা)

রাত্রির আকাশ যেন নীল মহাসমুদ্র। তাহার নিঃশব্দ স্রোতের আবর্তে যেন সংখ্যাতীত ফেনা মুহূর্তে মুহূর্তে আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে।

"তারার ফেনা ফেনিয়ে তোল
আকাশ গঙ্গার।" (কর্ণধার : সানাই)

কম্পমান নক্ষত্র মণ্ডলী কোন্ এক বিস্মৃত যুগের পুরাণ কাহিনী নিত্য গুঞ্জন করিয়া চলিয়াছে।

"তারার আলোয় গুঞ্জরিত পুরাণ কথা—" (পত্রপুট)

আকাশের একেবারে শেষ প্রান্তে কখন দেখা যায় নিঃসঙ্গ ধ্রুবতারা বা সন্ধ্যাতারা। কবি ইহার প্রকাশ মহিমায় বারংবার মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহার প্রশান্তির মধ্যে কী জানি এক অগাধ বিষাদ! করুণায় হৃদয় বিগলিত হইয়া যায়।

অস্তোন্মুখ সূর্যের পদপ্রান্তে সন্ধ্যাতারা যেন সলজ্জ সন্ধ্যার অর্ঘ্য নিবেদন।

"সন্ধ্যা যেমন সন্ধ্যা তারাটিরে
আনিয়া দেয় ধীরে
সূর্য্য ডোবার শেষ সোপানের ভিতে
সলজ্জ তার গোপন থালিটিতে।" (স্বপ্ন : সানাই)

(ঙ)

আমরা এপর্য্যন্ত যে সকল চিত্র উপস্থাপিত করিলাম তাহা মুখ্যত অন্ধকার রাত্রির। সেই রূপের মধ্যে তিনি দেখিয়াছেন বৈরাগ্য ও তপস্যার ভাব, মহান মহিমা ও রহস্যময়তার ভাব, সমাপ্তি বা অবসানের ভাব।

সন্ধ্যার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবের আর এক রূপ কবি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। যে সন্ধ্যা চন্দ্রালোকিত, সৌন্দর্য বিধুর, মায়াময়। চন্দ্রের প্রত্যেকটি কলার হ্রাস বৃদ্ধির সহিত সেই সৌন্দর্য-লোকের যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে, সেই সকল পরিবর্তিত রূপকে তিনি আশ্চর্য্য নিপুণতার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

দীর্ঘ রোগ ভোগের পর রূপসী নারীর মুখে যে ম্লান অবসাদ বিজড়িত স্মিত হাসি ফুটিয়া উঠে কবি তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে ক্ষীণ চন্দ্রের তুলনা খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

"কৃষ্ণপক্ষের কৃশ চাঁদ যেন রোগ শয্যা ছেড়ে
ক্লান্ত হাসি নিয়ে অঙ্গনে বাহির হয়ে এল।" (দেখা : পুনশ্চ)

পূর্ণ চন্দ্রের সৌন্দর্য কখন কবির নিকট বন্ধুর উচ্ছ্বসিত, অনাবিল হাস্য-ধ্বনির মত বোধ হয়। কখন তাহা রহস্য নিবিড়—যেমন রহস্য নিবিড় সুরলোকের সভাকবি বিরচিত কাব্য প্রহেলিকা।

"সামনে পূর্ণ চন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।
যেন সুরলোকের সভাকবির
সদ্যোবিরচিত কাব্য প্রহেলিকা
রহস্যে রহস্যময়।" (পত্রপুট)

স্বচ্ছজলে বহুদূর নিম্ন পর্য্যন্ত জ্যোৎস্না কিরণ দীর্ঘ রেখায় রেখায় নামিয়া আসিয়া কাঁপিতে থাকে। ইহার সৌন্দর্যের তুলনা কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন, উৎকণ্ঠিত মাতার গভীর স্নেহে কম্পমান দীর্ঘ অঙ্গুলির মধ্যে।

"পড়ে চন্দ্রালোক রেখা জননীর অঙ্গুলির মতো—" (পান্থ : পরিশেষ)

চাঁদের প্রকাশের সহিত তিনি কখন বা নগ্ন অবোধ শিশুর নিঃসঙ্কোচ হাসির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।

"ঊর্দ্ধে যায় দেখা
তৃতীয়ার শীর্ণ শশিলেখা।
যেন কে উলঙ্গ শিশু কোথায় এসেছে জানে না সে।
নিঃসঙ্কোচে হাসে।" (ছবি : পূরবী)

ইহার সহিত ইংরেজি রোমান্টিক কবিদের এই জাতীয় সৌন্দর্যের তুলনা লক্ষ্য করা যায়। সে সকল ক্ষেত্রে সৌন্দর্য মুগ্ধতার অপরূপ প্রকাশ থাকিলেও এমন কল্পনা বৈচিত্র্য কোথাও ফুটিয়া উঠে নাই।

"Yon crescent Moon, as fixed as if it grew
In its own cloudless, starless lake of blue,—"
(Dejection : An Ode : Coleridge)

রূপ স্বষ্টির রহস্তই এই। তাহার সমগ্রতার মধ্যে এমন একটি ব্যঞ্জনা থাকে যাহাকে বিশ্লেষণ করা অসম্ভব। বিশ্লেষণ করিতে গেলে সমগ্র মাধুর্য-লোকটি মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

বাতাসে যূথীর গন্ধ। যূথী তাহার সলজ্জ রুদ্ধ হৃদয় যেন বাতাসে মেলিয়া ধরিয়াছে। আকাশে একা পূর্ণ চন্দ্র। চন্দ্রালোকিত রাত্রি নিস্তব্ধ।

এই সমস্ত কিছুকে বিজড়িত করিয়া যে রহস্যের, যে অতল গভীর মাধুর্যের, যে স্নিগ্ধতা, সলজ্জ সকরুণতার ছবি ফুটিয়া উঠে তাহার তুলনা কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন একটি নারীর মধ্যে। বিস্মিত সৌন্দর্যের এই জাতীয় আবিষ্কার আমাদের মুগ্ধ না করিয়া পারে না।

"হাওয়ায় যখন যূথী বনের পরাণখানি মেলা,
আঁধার যখন চাঁদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে
চুপ করে শেষ তাকিয়ে থাকে চেয়ে—" (নিষ্কৃতি : পলাতকা)

এই জাতীয় আর একটি উপমা। কৃষ্ণ পক্ষের শুব্ধ নিশীথ রাত। কালো জলের প্রান্তে একটুখানি জ্যোৎস্নার রেখা। জুঁই ফুলের বনে আলো ছায়ার চাতুরী। ইহার সহিত তিনি একটি নারীর সৌন্দর্যের তুলনা করিয়াছেন। সে নারীর প্রকাশ কুণ্ঠিত, সে নারীর অন্তর সৌরভ পূর্ণ।

"ও যেন জুঁই ফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণ পক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।" (কালোমেয়ে : পলাতকা)

চামেলির প্রকাশ রূপটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া কেবল তাহার বিকীর্ণ লাবণ্যটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া তাহার সহিত কবি জ্যোৎস্নার লাবণ্যের তুলনা করিয়াছেন।

"পূর্ণিমায় দেহহীন চামেলির লাবণ্য বিলাসে" (বলাকা)

ইন্দ্রলোকে পারিজাতের ছায়াবীথিকায় শিশু চন্দ্রের প্রকাশের মধ্যে যে অতল মাধুরী ও রহস্যময়তা তাহা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন প্রেয়সী নারীর দৃষ্টির মধ্যে।

"হয়তো হেরি তোমার চোখে
আদি যুগের ইন্দ্রলোকে
শিশু চাঁদের পথ ভোলানো পারিজাতের ছায়াবীথি।" (স্বপ্ন : পূরবী)

কখন নদীর ওপারে গাছপালা ঝাপসা করিয়া বৃষ্টি নামে, এপারে তখনও মেঘে মেঘে আলোক রশ্মি জড়াইয়া থাকে। তাহার পর সেই বৃষ্টি ধারা দেখিতে দেখিতে নদীর উপর দিয়া দ্রুত ছুটিয়া আসিয়া আকাশ, নদী, তীর, তরু সমস্ত কিছুকে একাকার আবছায়া করিয়া দেয়। কখন পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে নদী জ্যোৎস্না প্লাবিত। কখন নিশীথ নীরব রাত্রে আকস্মিকভাবে জোয়ার আসে, তটে তাহারই শব্দ উঠে ছল্ ছল্। তপ্ত মধ্যাহ্নে নদী বক্ষে নিঃসঙ্গ নৌকা ভাসিয়া চলে, কখন পাল ভরে, কখন তীরের ধার ঘেষিয়া গুন টানিয়া টানিয়া।

নিশীথ রাত্রে নদীতে অকস্মাৎ জোয়ার আসে। তীরে তীরে কেবল জলের শব্দ শোনা যায় ছল্ ছল্। ইহা যেন ধরিত্রীর কাছে নদীর কি এক করুণ মিনতির গুঞ্জরণ। সে হৃদয় যেমন সে ব্যাকুলতাও তেমনি নিঃসীম।

"নৃত্যের চেতনা রাণীর বক্ষে এসে দুলে দুলে ওঠে,
নিশীথ রাত্রে সমুদ্রে জোয়ার এলে
তার ঢেউ যেমন লাগে তটভূমিতে
অশ্রুতে প্লাবিত করে দেয়।" (শাপমোচন : পুনশ্চ)

ইহার সহিত কোলরিজের এই জাতীয় রূপ-কল্পনার কতকটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

"A noise like a hidden brook
In the leafy month of June,
That through the sleeping woods all night
Singeth a quite tune."
(The Rime of the Ancient Mariner : Coleridge)

কোপাইকে তিনি দেখিয়াছেন বর্ষাকালে, যখন কূলে কূলে পরিপূর্ণ জল মত্ত আলোড়ন তুলিয়া ভীষণ বেগে আবর্ত্তিত হইয়া ছুটিয়া চলে। কখন দেখিয়াছেন বৈশাখে, যখন তাহার জলধারা শীর্ণ, গতি একান্ত মন্থর। কোপাইয়ের এই দুইটি বিশিষ্ট রূপের বিশিষ্ট সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে কবি দুইটি উপমার সহাতায় সম্পূর্ণ রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"যেমন নটী যখন অলঙ্কারের ঝঙ্কার দিয়ে নাচে
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোনে।" (কোপাইঃ পুনশ্চ)

(ছ)

রবীন্দ্রনাথের রূপ কল্পনার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও বর্ণ সুষমার প্রাধান্য লক্ষিত হয়। তাহা পাঠকের দৃষ্টিতে কেবল নানা বর্ণের অঞ্জন লাগাইয়া দেয়। ভাব বা রূপ সৃষ্টি সে ক্ষেত্রে গৌণ।

কবি বাণভট্টের 'কাদম্বরী'র মধ্যে বর্ণ বৈচিত্র্যের যে পরিচয় আমরা পাই তাহার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ। এক্ষেত্রে তাহার কোন পরিচয় লাভের সুযোগ আমাদের নাই।

বস্তুত সমগ্র কাদম্বরী কাব্যখানিই বর্ণ সমারোহে পরিপূর্ণ। এই বর্ণ-বিন্যাসের চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে কাদম্বরীর রূপ বর্ণনায়। কাদম্বরীর রূপ বর্ণনার পূর্বে মহাশ্বেতার রূপ বর্ণনার বোধহয় নিহিত একটি তাৎপর্য আছে। মহাশ্বেতার অত্যুজ্বল শুভ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে কাদম্বরীর বর্ণ বৈচিত্র্যকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে বলিয়া তাহার অত্যন্ত তীব্রতায় ও প্রাচুর্য্যে আমাদের দৃষ্টি যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। মহাশ্বেতার স্থির ধ্যানের রূপটি সমগ্র মহাকাব্যের পশ্চাতে শুভ্র কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছে এবং সেই কিরণ-ধারা অন্তহীন রূপে প্রতিহত হইয়া বর্ণের সহস্র বদ্বুদ পুঞ্জে ফাটিয়া পড়িয়াছে। কবি যেন নিখিল বিশ্বের অন্তহীন বর্ণ বৈচিত্র্যের আদি উৎসে উপনীত হইয়াছেন, যেখান হইতে শুভ্র আলোর প্রস্রবন দেশ-কালের সীমার আঘাতে সহস্র বর্ণের ধারায় ধারায় নিম্নে গড়াইয়া পড়িতেছে।

কবি দান্তে অমূর্ত্য, অতি সূক্ষ্ম, অত্যন্ত স্পর্শ কাতর, লঘু সৌন্দর্য্য-লোক বর্ণনা করিতে যে বিচিত্র বর্ণের সহায়তা গ্রহণ করেন তাহার পরিচয় লাভ করিতে নিম্নে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। বস্তুত রঙের তুলিকা ছাড়া এই জাতীয় সৌন্দর্য ফুটাইয়া তোলা একপ্রকার অসম্ভব।

"Gold and fine silver, crimson and ceruse,
Wood yellow-lustrous, clear cerulean dye,
Indigo, fresh-cracked emerald's brilliant hues,

Matched with the foliage and the flowers that lie
Heaped in that lap, would faint as minor faints
Beneath its mazor, and show dim thereby.
Here Nature had not only plied her paints,
But had distilled, unnamable, unknown,
The mingled sweetness of a thousand scents."

এখন রবীন্দ্র-সাহিত্য হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করি।

চৈত্রের রৌদ্রে আকাশ উজ্জ্বল নীল। নিম্নে সর্ষের ক্ষেতে হলুদের বন্যা। দিগন্ত প্রসারিত ঘন নীলের কোলে দিগন্ত প্রসারিত ঘন হলুদের বন্যা। উভয় বর্ণ বিন্যাসের মধ্যে যে আশ্চর্য সুষমা তাহা 'কবির লড়াই' শব্দ সমষ্টির দ্বারা ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। সুষমা গৌরবে কেহ কাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না।

"চৈত্রের রৌদ্রে আর সর্ষের ক্ষেতে
কবির লড়াই লাগল যেন
মাঠে আর আকাশে।" (শেষ সপ্তক)

আকাশ প্রান্তে নীল এবং সোনার মিশ্রণ। সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া হলুদ বর্ণের তৃণ। তাহার উপর আলো ছায়ার জাল বোনা হইতেছে।

"বেগনি-সোনা দিক্ আঙিনার কোনে
বসে বসে ভুঁই জোড়া এক চাটাই বোনে
হলদে রঙের শুকনো ঘাসে।" (আকাশ প্রদীপ)

উর্দ্ধে ঘন নীল আকাশ। নিম্নে শ্যামল ধরিত্রীর উপর আলো ছায়ার লীলা। যেন বিচিত্র বর্ণের সূত্র দিয়া ধরণীর উত্তরীয় বোনা হইতেছে।

"মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।" (আরোগ্য)

বৃষ্টি অথবা শিশির ধোয়া কচি চিক্কন পাতার উপর কোমল আলোর ঝিলিমিলি কবির নিকট বিশ্বের এক মহত্তম বিস্ময় রূপে অনুভূত হইয়াছে।

"হঠাৎ দেখি শিশিরে ভেজা বাতাবি গাছে
ধরেছে কচি পাতা;

সে যেন আপনি বিস্মিত।
একদিন তমসার কূলে বাল্মীকি
আপনার প্রথম নিশ্বসিত ছন্দে
চকিত হয়েছিলেন নিজে,
তেমনি দেখলেম ওকে।" (শেষ সপ্তক)

কচি শ্যামল তার গায়ের রঙ। গলায় সরু একগাছি সোনার হার। এই সৌন্দর্যের তুলনা কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন শরতের লঘু শুভ্র মেঘ খণ্ডের প্রান্তে ক্ষীণ রৌদ্র রেখার মধ্যে।

"কচি শ্যামল তার রঙটি;
গলায় সরু সোনার হার গাছি,
শরতের মেঘে লেগেছে
ক্ষীণ রোদের রেখা।" (শেষ সপ্তক)

কখন আকাশের প্রান্ত ঘিরিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসে। মাঝের ফাঁক দিয়া উজ্জ্বল রৌদ্র নামিয়া আসে তৃণাচ্ছাদিত সবুজ প্রান্তরের উপর। একটি অপরূপ সৌন্দর্য-লোক!—যেন হীরে বসান প্লাটিনামের আংটি।

"প্লাটিনামের আংটির মাঝখানে যেন হীরে।
আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ,
মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর আসছে মাঠের উপর।"
(সুন্দর : পুনশ্চ)

অস্তোন্মুখ সূর্য বিদায় গ্রহণের পূর্বে শেষ বারের মত জল-স্থল-আকাশকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দিতেছে। ইহার অলৌকিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে কবি একটি মাত্র উপমার সহায়তায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহা যেন সুর সভায় নৃত্যরতা অপ্সর কন্যার বাষ্পে বোনা চেলাঞ্চলের স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ-রশ্মিচ্ছটা।

"সুর সভা হতে সেথা নৃত্য পরা অপ্সর কন্যার
বাষ্পে বোনা চেলাঞ্চল উড়ে পড়ে, দেয় ছড়াইয়া
স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ-রশ্মিচ্ছটা।" (প্রান্তিক)

পর্বত বেষ্টিত উপত্যকা নিবিড় বনে সমাচ্ছন্ন। পাহাড়ের গা বাহিয়া ঝর্ণার ধারা নিম্নে বহিয়া যাইতেছে। ঊর্দ্ধে ঘন নীল আকাশ পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। কবি একটি উপমার সহায়তায় ইহার অসামান্য মাধুর্যকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে মর্ত্যের এই আকাশ, এই উপত্যকা, নিয়ত

ঝরঝরানি শব্দ আর এক আকাশ, আর এক উপত্যকা আর এক ঝর্ণার কলশব্দে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। তাহা এক চিরন্তন সৌন্দর্য-লোক।

"সবুজ বনের মিনে করা
উপত্যকার নীল আকাশের পেয়ালা,
তারি পাহাড় ঘেরা কানা ছাপিয়ে
পড়ছে ররঝরানির শব্দ।" (শেষ সপ্তক)

(জ)

নিম্নের রূপ কল্পনা কয়েকটির মধ্যে কবি-কল্পনার আশ্চর্য্য সমুন্নতি ও প্রসারতা লক্ষ্য করা যায়।

দিবাবসানের পূর্বে রাখাল যেমন শিঙা বাজায় এবং সেই শব্দ শুনিয়া ধেনু দল যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া গোষ্ঠ গৃহে মিলিত হয়, তেমনি কল্পান্তে দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপ-লোক একের ধ্যানের মধ্যে নিবিড় সংহত হইয়া আসে। সংখ্যাতীত গ্রহ নক্ষত্র যেন এক একটি আলোয় ধেনু, দেশ-কালের মধ্যে তাহাদের প্রকাশ যেন ধেনু দলের যদৃচ্ছা বিহার।

"কালের রাখাল তুমি, সন্ধ্যায় তোমার শিঙা বাজে,
দিন-ধেনু ফিরে আসে স্তব্ধ তব গোষ্ঠ গৃহ মাঝে
উৎকণ্ঠিত বেগে।" (তপোভঙ্গ : পূরবী)

নীলাকাশ বেষ্টিত শ্যামল ধরিত্রী যে দুর্লভ মাধুরী লইয়া কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছিল—

"নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পিয়ালা।"
(পঁচিশে বৈশাখ : পূরবী)

ঋতুর আবর্তনে বৎসরে বৎসরে বর্ষা আসে। তাহারই ধারায় স্নান করিয়া, তাহারই অমৃত ধারা পান করিয়া শিশু বৃক্ষ ধীরে বাড়িয়া উঠে। বর্ষার সমগ্র মাধুর্যকে কবি একটি উপমার সহায়তায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"ইন্দ্রের অপ্সরী আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কন
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি লীলা নৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন অমৃত রস—।" (বৃক্ষ বন্দনা : বনবাণী)

এই জাতীয় উপমার কতকটা পূর্বাভাস লাভ করা যায় মহাকবি কালিদাসের

মেঘদূত কাব্যে। বিরহী যক্ষ মেঘকে বলিতেছেন, "সেই কৈলাস পর্বতে সুর রমণীগণ কর কঙ্কনের সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগের প্রহারে জলবর্ষণ করাইয়া অবশ্যই তোমাকে স্থানপাতী করিবে।"

(ঝ)

অন্ধকার নেপথ্য হইতে ঝর্ণার প্রথম আলোকে বাহির হইয়া আসিবার মধ্যে যে আকস্মিক অপরিসীম বিস্ময়, অস্তিত্বের যে নিবিড় উপলব্ধি, তাহাকে কবি পর পর কয়েকটি উপমার সহায়তায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

"চঞ্চল নির্ঝর ধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুর সুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝঙ্কার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,
আপনারি রহস্যের পিছে পিছে উৎসুক চরণে
অশ্রান্ত সন্ধান।" (হাসির পাথেয় : বনবাণী)

ইহার সহিত তুলনায় ওয়াড়স্‌ওয়ার্থের এই জাতীয় রূপ-কল্পনা কত বিবর্ণ!

"And a few steps may bring us to the spot
Where haply, crowned with flowerets and green herbs,
The mountain infant to the Sun comes forth,
Like human life from darknss."
(Despondency : Wordsworth)

প্রকাশের নিঃসীম বিস্ময় এবং মাধুর্যকে প্রকাশ করিতে কবি নানা উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন।

"একটি গান উঠল জেগে
নীরব সময়ের বুকের মাঝখানে
একটি মাত্র নীলকান্ত মণি—" (পত্র : পুনশ্চ)

কিংবা

"জোয়ারের তরঙ্গ লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হল
চির দুর্লভের একটি রত্ন কণা
শত লক্ষ ঘটনার সমুদ্র বেলায়!" (শেষ সপ্তক)

শরতের নির্মল নীল আকাশে ইতস্তত লঘু মেঘ খণ্ডের সঞ্চরণ যেন নীল নিস্তরঙ্গ সিন্ধুবক্ষে ভাসমান দেব শিশুর কাগজের নৌকা।

"পাতলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে
দেব শিশুর কাগজের নৌকো—"

কুল হারা সমুদ্রের নীলিম বিস্তার, তাহার নিরন্তর গর্জন কবির নিকট জগৎ প্লাবী করুণ ক্রন্দন রোল বলিয়া অনুভূত হইয়াছে।

"অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা ঃ সোনার তরী)

নীল আকাশে নিঃসঙ্গ শঙ্খ চিল আবর্তিত হইয়া উড়িতেছে, যেন জপ মালায় পর্বতের নিঃশব্দ মন্ত্রোচ্চারণ—

"শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
ঊর্দ্ধ মুখ পর্বতের উধাত্ত চিত্তে
নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।" (শেষ সপ্তক)

প্রখর তাপদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যস্থলে ছায়া বিস্তার করিয়া নিঃসঙ্গ অশ্বথ গাছ, যেন সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষি।

"প্রান্তরে আপন ছায়ায় মগ্ন একলা অশথ গাছ,
সূর্য-মন্ত্র-জপ-করা ঋষির মতো।" (পত্র পুট)

আম্র মুকুলের গন্ধে যেন বিস্মৃত কোন জন্মের প্রিয়জনের কণ্ঠস্বর বিজড়িত!

"সুদূর জন্মের যেন ভুলে যাওয়া প্রিয় কণ্ঠ স্বর
গন্ধে তব রয়েছে সঞ্চিত—" (আম্রবন)

আম্র মুকুলের গন্ধ পরিব্যাপ্ত অরণ্যছায়ায় ব্যাকুল সুর ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে!

"আম্রের মুকুল গন্ধে ব্যাকুল কী সুর
অরণ্য ছায়ার হিয়া করিছে বিধুর—" (উৎসবের দিন ঃ পূরবী)

উপরের উপমা দুইটি অভিনবত্বে ও মাধুর্যে আমাদের মুগ্ধ করে। আমরা পূর্বেই ইহা উল্লেখ করিয়াছি যে কবি কল্পনা যতই সমৃদ্ধ হয়, ততই তাহা জগতের আপাত বিরোধ ও বৈষম্যের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজিয়া পায়। এই অত্যন্ত জটিল দূর প্রসারী মাধুর্য উপলব্ধি করিতে গভীরতর, সূক্ষ্মতর অন্তঃবৃত্তির প্রয়োজন।

এক একটি বিশিষ্ট রূপের মাধুর্যকে কবি এক একটি সুরের মাধুর্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। সে সৌন্দর্য যেমন, সে সঙ্গীতও তেমনি সুসম্পূর্ণ! সৌন্দর্যের এই উপলব্ধির সহিত কত বিচিত্র সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনাই না নিহিত আছে।

"স্বর্গ সুখে ক্লান্ত কোন দেবতার বাঁশির পূরবী
শূন্যতলে ধরে এই ছবি।" (ছবি ঃ পূরবী)

অন্ধকার রাত্রে শালের বনে ঝিল্লির একটানা ধ্বনি শুনিয়া মনে হয় ঝিল্লি যেন অন্ধকার রাত্রির জপের মালায় একটানা মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে। আনমনার কানে কবি তেমনি মৃদু মন্দ তানে সুছন্দ বাণী উচ্চারণ করিবেন। আনমনার চিত্ত অমনি অন্ধকার রাত্রির ন্যায় রহস্য বিজড়িত। কবির বাণী তাহার মর্ম মূলে সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া গভীর গোপন ব্যাকুলতা।

"ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
মন্দ মৃদুল তানে,
ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা নীরব রাতে
অন্ধকারের জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।"
(আনমনা ঃ পূরবী)

শিল্পী যেমন পাথর ছানিয়া ধ্যানের রূপটিকে ধীরে ফুটাইয়া তুলে, নারী প্রেম তেমনি আপনার ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে প্রেমের স্থির রূপটিকে গড়িয়া তুলে।

"এ যেন ছিল ওর ভালবাসার শিল্প রচনা
নির্দয় পাথরটাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে রূপ আবাহন করা
ব্যথিত বক্ষের নিরন্তর আঘাতে।" (দুর্বোধ ঃ শ্যামলী)

দিগন্তে নীল বন প্রান্তে গোধূলির শেষ আলো প্রকাশের মধ্যে যে সকরুণ মাধুরী, কবি তাহার প্রকাশ দেখিয়াছেন বাঙ্গালা দেশের নারীর কালো চোখের মধ্যে।

"তাদের কালো চোখের করুণ মাধুরীর উপমা দেখেছি
ঐ মাটির দিগন্তে
নীল বন সীমায় গোধূলির শেষ আলোটির
নিমীলনে।" (শেষ সপ্তক)

ইতিহাসের রূপ

ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় ইতিহাস বা কালের বোধ মায়া। ইহার এক-প্রকার বিপরীত ভাব লক্ষ্য করা যায় পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনে। সেক্ষেত্রে ইতিহাস বা কালের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভারতীয় দর্শনে চরম সত্য কালাতীত, অপরিবর্তনীয়।

ইতিহাস যে অন্তহীন আবর্তন মাত্র তাহা এ্যারিস্টটল বিশ্বাস করিতেন। স্টোইক এবং এপিকিউরিয়ানরা এই মতাবলম্বী ছিলেন। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় এই বিশ্বাস একান্ত সুস্পষ্ট। নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ রূপকে তাঁহারা তিনটি পর্য্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন,—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়। ইহার কাল পরিমাণকে বলা হয় কল্প। মহাকালের বক্ষে এমনি কত কোটি কল্পান্ত সাধিত হইয়াছে!

খ্রীষ্টান বা হিব্রুধর্মে যে অভিব্যক্তির কথা আছে, তাহা ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফল। মানুষ আপনার চেষ্টায় মন ও বুদ্ধির সহায়তায় এই সুসম্পূর্ণ জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে না।

বিজ্ঞানের আবির্ভাবের ভিতর দিয়া মানুষ প্রথম এই বিশ্বাস করিতে সুরু করিয়াছে, যে সে একদিন বিজ্ঞানের সহায়তায় আপনার মন ও বুদ্ধি দিয়া এক পরিপূর্ণ মনুষ্য-সভ্যতা গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

ইসরাইলের মনীষী দ্রষ্টাগণ ইতিহাসের যে স্বরূপ আবিষ্কার করেন, তাহা যুক্তি সঙ্গত। তাঁহাদের পূর্ব্বে ইতিহাসের এই জাতীয় ব্যাখ্যা আর কেহ দান করিতে পারেন নাই। কেবল নিয়তির উপর নির্ভর না করিয়া তাঁহারা মানবিক চরিত্র এবং আচরণের দ্বারা ইতিহাস ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা যে অভিব্যক্তি বা বিকাশের কথা বলিয়াছেন তাহা স্বতঃস্ফূর্ত নয়। মানুষকে দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া শিক্ষা লাভ করিতে হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন মানুষের সততা ও ন্যায় পরায়ণতা।

তাঁহারা কোন দার্শনিক আলোচনার ভিতর দিয়া নয়, বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত নৈতিক নিয়মের আবিষ্কারের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় ধারণা গড়িয়া তুলেন। যখন বিশ্বের

প্রায় সকল ধর্ম জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়াছে, তখন ইস্রাইলের দ্রষ্টাগণ জীবন ও জগৎকে অর্থান্বিত করিয়া তুলেন। তাঁহারা উন্নততর জীবন লাভের জন্য মানুষকে জাগতিক সম্পদ ও ক্ষমতা পরিহার করিবার উপদেশ দিয়াছেন। জীবন এই জগতেই সম্পূর্ণতা এবং চরম অর্থ লাভ করিবে। তাঁহারা যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহা ব্যক্তিগত নয়, জাতিগত।

গ্রীকদের ইতিহাসের বোধ না থাকিবার ফলে বংশানুগতি সম্পর্কে যেমন বিকাশ সম্পর্কেও তেমনি কোন ধারণা ছিল না। তাঁহারা বাস করিতেন এক নিশ্চল সুসম্পূর্ণতার লোকে। পরিবর্তনশীলতাকে তাঁহারা অস্বীকার করিতেন। কাল তাঁহাদের নিকট অন্তহীন আবর্তন মাত্র। তাঁহাদের জগৎকে রূপের জগৎ বলা যাইতে পারে। জীবনকে ক্রমাগত বিকশিত করা নয়, তাহাকে সুষমা মণ্ডিত করাই ছিল তাঁহাদের লক্ষ্য। মানুষের যে ইতিহাস নিত্য নূতনভাবে সৃজিত হইতেছে, এবং মানুষের যে স্বাধীন ইচ্ছা এই ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিবার কার্য্যে ব্যাপৃত তাহার উপর গ্রীকদের কোন বিশ্বাস ছিল না।

প্লেটোর মতে প্রকৃত সত্য বাস্তব জগতের বাহিরে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, পরিবর্তনশীল জগৎমায়া, অনুকরণ বা ছায়া।

"Plato's ideal republic incorporates the ideal of the bee-hive, in which there is no freedom, no individualism, no desire for self-realization, but only an unthinking devotion to the prescribed task. His chief concession to the potential humanity of the common people is the 'noble lie' that the philosopher will tell them about their origin, in order to keep them content with their menial status",

(The Uses Of the Past : H. J. Muller)

সমাজের এই 'bee-hive' পরিকল্পনাটি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রায় সকল সভ্যতায় অনুসৃত হইয়াছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব প্রায় পাঁচ শত বৎসরের মধ্যেই গ্রীক জীবন-দর্শনে যে একটি বোধ সুস্পষ্ট রূপে গড়িয়া উঠে তাহা স্কাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিস্ প্রভৃতি গ্রীক নাট্যকারগণের মূল প্রেরণা রূপে কাজ করিয়াছে।

তাঁহারা সেই কালেই নিঃসংশয় রূপে বোধ করেন যে জীবন ও জগতের অন্তরালে একটি অমোঘ নিয়ম আছে,—একটি নৈতিক শৃঙ্খলা, যাহা জড় জগতে

প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় মনুষ্য সমাজ এবং তাহার সকল নৈতিক ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ইহা অন্ধ নিয়তি নয়, এক চৈতন্যময় সত্তা, একটি উন্নততর চেতনা-লোক।

গ্রীক পুরাণে দেব-দেবীর সংখ্যা অনেক। মনুষ্য-সমাজের উপর তাঁহাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অপরিসীম, কিন্তু বাহির হইতে মনুষ্য-সমাজের উপর তাঁহারা কোথাও আপন আপন শক্তি প্রয়োগ করেন নাই। ঘটনা ও চরিত্রের অনিবার্য পরিণাম রূপে নাটকীয় চরিত্রগুলি বিশিষ্ট ফল লাভ করিয়াছে, এবং তাহারই ভিতর দিয়া সেই সত্যের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে, যে বৃহৎ সত্যে মনুষ্য ও দেব-লোক বিধৃত।

গ্রীক জীবন-দর্শনে এই উন্নততর চেতনা-লোকের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে এবং সেই সঙ্গে এই স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় আছে যে মনুষ্য-জীবনে জ্ঞানের পরিধি যতই বর্দ্ধিত হইবে, মানুষ ততই উন্নততর চেতনা-লোকের অমোঘ ক্রিয়ার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হইবে এবং মনুষ্য সমাজ সেই চেতনার সহিত ততই আপনাকে সামঞ্জস্যীভূত করিতে পারিবে। এই সামঞ্জস্যবোধের ক্রমিক গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সুখ ও শান্তি ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়া চলিবে।

বৈদিক সাহিত্যের 'ঋতে'র উপলব্ধির সহিত ইহার মূলগত সাদৃশ্য আছে। গ্রীক সাহিত্যে সেই উন্নততর সত্যকে ব্যক্তি, সমাজ এমনকি একটি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে লীলায়িত দেখিবার যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষা তাহা ভারতীয় সাহিত্যে পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ ব্যাহত হইয়াছে। ইহার জন্য দায়ী ভারতীয় বিশিষ্ট জীবনবোধ। তাহাতে জীবন ও জগৎ তাহার বিশিষ্ট বোধ লইয়া উন্নততর চেতনা-লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। ফলে গ্রীক জীবন-দর্শনের দুঃখভোগ ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া মনুষ্য-সমাজের ক্রম বিকাশের তত্ত্বটি ভারতীয় জীবন-দর্শনে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। (এক রামায়ণ ও মহাভারত ছাড়া পরবর্তীকালে নানা সচেতন অভিপ্রায়ের দ্বারা সে সত্য দৃষ্টিও বহুলাংশে আচ্ছন্ন ও বিকৃত) একটি সমগ্র রাষ্ট্র ও জাতির নিয়তি রূপে এই বোধের লীলা পর্য্যবেক্ষণ করিবার গভীর অধ্যাত্ম এষণা ভারতীয় সাহিত্যে কোথাও নাই।

রাষ্ট্র নৈতিক নানা কারণে ভারতীয় মধ্যযুগের সাহিত্যে এই ঋতের উপলব্ধি সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া গিয়াছে। এক অলৌকিক ভীতিবোধ

জাতিচেতনাকে সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন করিয়াছে। 'ঋতে'র উপলব্ধির স্থান গ্রহণ করিয়াছে এক অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছৃঙ্খল শক্তির পূজা, এক অন্ধচেতনার অতি নিষ্ঠুর মত্ততা।

যখন সাধারণ মানুষ প্লেটোর নৈরাশ্যবাদের প্রভাবে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আশা ত্যাগ করিয়াছে, ঠিক সেই সময় স্টোইক, সিনিক্স্, সাইরেনেইক্স্, এপিকুরিয়ান প্রভৃতি দর্শন গড়িয়া উঠে। তাঁহারা সকলেই ব্যক্তিগত মুক্তির বাণী প্রচার করেন। রাষ্ট্রনৈতিক মুক্তির সহিত এই মুক্তির কোন যোগ নাই।

এই জাতীয় জীবন-দর্শন রোমানদের রাষ্ট্রীয় সাধনার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ বলিয়া রোমানরা গ্রীক সংস্কৃতির সংযোগকে পরিহার করিত।

ভার্জিল প্রাচীন মানবতাবাদকে মানবধর্ম বলিয়া গ্রহণ করেন এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য রোমানদের পন্থাকে সমর্থন করেন। সমগ্র পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন, তখন ভার্জিল গ্রীক সংস্কৃতির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া রোমান রাষ্ট্র (অমর নগরী) এবং ইতিহাসের এক নূতন ব্যাখ্যা দান করেন।

তাঁহার সৃষ্ট ভেনাস, বিশ্ব নিয়মের ক্রিয়ার প্রতীক। ইহা যান্ত্রিক বা নিয়তি নিয়ম নয়। তাঁহার উদ্দেশ্য তাঁহার নির্বাচিত মনুষ্য ঈনিডের ভিতর দিয়া বিশ্ব-নিয়মকে উদ্ঘাটিত করা। তিনি মনুষ্য-জীবন ও প্রকৃতির এক নূতন ব্যাখ্যা দান করেন। তিনি পরমাণুবাদীদের যান্ত্রিক জড়বাদকে যেমন স্বীকার করেন নাই, তেমনি স্বাভাবিক ও স্বতস্ফূর্ত কল্যাণের ধারণাকেও অস্বীকার করেন। ঈনিড যে পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহার জন্য জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির নিশ্চিৎ ভিত্তি প্রয়োজন; ইন্দ্রিয় সুখোপভোগও অবাঞ্ছিত নয়, কিন্তু পরিণামে উভয়কেই অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে।

গ্রীক সভ্যতা জ্ঞানের ভিতর দিয়া এবং রোমানরা ইচ্ছা শক্তির ভিতর দিয়া মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। গ্রীকরা জাগতিক সকল লক্ষ্য এবং ফল লাভকে মায়া বা মিথ্যা বলিয়া জানে। রোমানরা মানুষের মধ্যে সেই সকল লক্ষ্যকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে চায়, যাহার ভিতর দিয়া জাগতিক ফল লাভ সম্ভব। গ্রীকরা বুদ্ধিবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া জাগতিক অসারতা সপ্রমাণ করিতে চায়। রোমানরা বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তায় লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য যুক্তি আশ্রয়ী ভিত্তি আবিষ্কার করিতে চায়।

ভার্জিলের নিকট ইতিহাস কতকগুলি ঘটনার সমষ্টি নয়। ইহার ভিতর দিয়া একটি অভিপ্রায় বা অর্থ চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ধর্ম বিবিক্ত প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়া মানব ইতিহাস তাহার শেষ লক্ষ্যে উপনীত হইবে। এই চরম লক্ষ্যটিকে তিনি বলিয়াছেন চিরন্তন রোম। ভার্জিল যাহাকে নিয়তি বলিয়াছেন, তাহার প্রকাশ ঘটে বিশ্বপরিব্যাপ্ত নিয়মের ভিতর দিয়া।

গ্রীক জীবন-দর্শনের একটি বড় ত্রুটি হইল ইতিহাসের নিত্য পরিবর্তন শীলতাকে স্বীকার না করা। সমাজের সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক স্থাপন করিতেও তাহারা পারে নাই। তাহারা রূপ (form) এবং বস্তুর আলোকে মানব-ইতিহাসকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে। মানুষ এইরূপে আদর্শ প্রতিরূপে(type) পরিণত হয়। আদর্শ প্রতিরূপের কোনরূপ পরিবর্তন নাই। এই মতবাদের ক্ষেত্রে তাই বিকাশ বলিতে বুঝায় ব্যক্তি-সত্তার ভিতর দিয়া আদর্শ-প্রতিরূপের আপনাকে নিত্য নূতন ভাবে লাভ করা। অন্যদিকে ব্যক্তি-সত্তা নিত্য নবীনতা লাভের ধর্মের দ্বারা আদর্শ প্রতিরূপের মধ্যে আপনার শেষ পরিণাম লাভ করিতেছে। মানুষের একমাত্র সম্পর্ক তাহার প্রতিরূপের সহিত। ইহার ফলে ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয় অনাবিষ্কৃত রহিয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম বুদ্ধিবৃত্তিকে সম্পূর্ণ পরিহার করিয়া বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্মে যে অনন্ত জীবনের কথা আছে, তাহা গ্রীক অতি জাগতিক বোধ হইতে পৃথক। ইহা দেহ ও আত্মার যোগের এক নূতন উপলব্ধির কথা এবং ইহার ভিতর দিয়া দেহকে পরিণামে জয় করিয়া উঠা।

গ্রীক দর্শনে এক এবং বহুর যোগের মধ্যে আছে চিরন্তন ভাব-লোক এবং জীব-জগৎ। এই জীবের মধ্যে রহিয়াছে আদর্শ প্রতিরূপ বা অধ্যাত্ম জগতের রূপ। অধ্যাত্ম জগৎ আদি অন্তহীন। খ্রীষ্টধর্মে যিশুখ্রীষ্টের ভিতর দিয়া যে মুক্তি তাহাই প্রকৃত দিব্য-চেতনা লাভ।

একমাত্র শিক্ষা ও বুদ্ধি এবং মার্জিত মনের দ্বারা উন্নততর জগতের উপলব্ধি লাভ সম্ভব, প্লেটোর এই যে মত, খ্রীষ্টধর্ম তাহাকে অস্বীকার করেন। খ্রীষ্ট-ধর্ম বলেন, চিন্তা ও কর্ম্মের আরম্ভ বিন্দু মানুষের উপলব্ধির বাহিরে চিরকাল থাকিয়া যাইবে। বুদ্ধিমত্তা তাই মানুষের লক্ষ্য হইতে পারে না। ইহার মতে পূর্ণ উপলব্ধির জন্য ঈশ্বরের প্রকাশে বিশ্বাস অপরিহার্য।

আধুনিক বিজ্ঞান যে বিশ্ব-বিধান আবিষ্কার করিয়াছে, খ্রীষ্টধর্ম তাহাকে

অস্বীকার করেন; কারণ ইহার সহায়তায় জীবন ও জগৎকে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। বৈজ্ঞানিক বিশ্ব-বিধির আবিষ্কারের দ্বারা দিব্য-বিধানকে কোন পরিণামেই লাভ করিতে পারা যায় না। খ্রীষ্ট-ধর্মে অধ্যাত্ম জগৎটিই প্রকৃত জগৎ। ইহার মধ্যে সকল সত্তার প্রকাশ বিধৃত হইয়া আছে। প্রাকৃত জগৎ তাই স্বয়ং ক্রিয় বা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়।

ক্লাসিসিজমের লক্ষ্য হইল প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে ক্রমাগত অধিকার করা। ভার্জিল মানুষের এই অভিযানকেই বন্দনা করিয়াছেন। তিনি সমগ্র মনুষ্য-সমাজের সুখ-সৌভাগ্যের স্বপ্ন দেখিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্য সমাজ ওই পরিণাম মুখী হইয়া চলিয়াছে।

খ্রীষ্টধর্ম বলেন মানুষের লক্ষ্য অনন্ত জীবন লাভ করা। এই অনন্তজীবন লাভ করা যায় ঈশ্বরীয় করুণা বা প্রেমের ভিতর দিয়া। এই লক্ষ্য সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। খ্রীষ্টধর্ম বলেন ক্লাসিক ধর্ম সৃজনী এবং নিয়ন্তৃতত্বকে বহির্জগতে অন্বেষণ করিয়াছে। খ্রীষ্টধর্মের মতে এই সৃজনী এবং নিয়ন্তৃ তত্ব হইল ত্রিত্ববাদ। এই ত্রিত্ববাদকে উপলব্ধি করাই মানুষের লক্ষ্য। ইহাই খ্রীষ্ট ধর্মে বিকাশ তত্ব।

খ্রীষ্টধর্ম যে পরিপূর্ণ জগতের কথা বলিয়াছেন, তাহা মানুষ কোনদিন আপনার চেষ্টার দ্বারা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইবে না। তাহা এক অতিপ্রাকৃত জগৎ। ইহার প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া প্রাকৃত জগতের অবসান ঘটিবে।

মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার অনুরূপ দান্তের উপলব্ধ জগৎও স্থির, সুসম্পূণ, বিকাশশূন্য, অপরিবর্তনীয়। পরলৌকিক আশা ছাড়া তাহার মধ্যে ইহ-লৌকিক কোন আশা বা সান্ত্বনা নাই।

রেনেসাঁ যুগে মানবতাবাদীরা ধর্মের আবেষ্টন হইতে মানুষকে মুক্ত দেয়। ইহার ফলে মানুষ আপনাকে বিচিত্র সৃষ্টি ক্রিয়ার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ মূল্যের আবিষ্কার রেনেসাঁ যুগের আর এক দান। তাহাদের মানবধর্মে স্বর্গ ও মর্ত্য উভয়-লোক বিধৃত। দেহ ও আত্মা উভয়কেই তাহারা আদর্শায়িত করে। তাহারা সত্য, শিব ও সুন্দরকে কেবল আবিষ্কার করে নাই, তাহাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনে সচেষ্ট হয়।

রেনেসাঁ যুগের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখ যোগ্য হইল মানুষের একটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধি, তাহার একক বা অনন্যসাধারণতা বোধ। সেই সঙ্গে সে এমন এক আদর্শ-লোকের কল্পনা করিয়াছে, যাহা কোন দেশ-কালের বোধের দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়।

এই যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য হইল প্রাচীন সংস্কৃতির নব মূল্যায়ন। খ্রীষ্টধর্মের প্রসারের ফলে গ্রীক জীবন-দর্শন ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই যে কেবল হ্রাস পায় তাহাই নয়, সেই সম্পর্কে একপ্রকার অবজ্ঞার ভাবও ফুটিয়া উঠিতে থাকে।

মানুষ এবং প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্য আবিষ্কারই শুধু নয়, প্রকৃতি এবং মানুষের বহিঃসৌন্দর্যের অন্তরালে যে একটি অসীম রহস্যময় ভাব-লোক আছে, তাহার প্রথম উপলব্ধি এই যুগের অপর এক কীর্তি। যাহা তুচ্ছ, একান্ত অবহেলিত, যাহা প্রাত্যহিকতায় ম্লান, তাহার মধ্যে এই যুগ এক নূতন মাধুর্যের সন্ধান পায়।

চার্চে নানা ত্রুটি এবং ব্যভিচার দেখা দিবার ফলে জনসাধারণের চিত্ত হইতে স্বাভাবিক ভাবে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনুরাগ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার ফলে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া জার্মানিতে আপনার পথে আপনার অনুভূতির ইঙ্গিত আশ্রয় করিয়া অধ্যাত্ম-লোকের গভীর হইতে গভীরে অনুপ্রবেশ করিবার যে আশ্চর্য নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়, যে সুগভীর দুঃখ-ভোগ ও তপশ্চর্যার পরিচয় লাভ করা যায়, তাহার তুলনা সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির মধ্যে আর কোথাও লাভ করিতে পারা যায় না।

ইউরোপের আর সকল স্থানে ধর্ম জীবনের সহিত সজীব যোগ স্থাপনে অসমর্থ হইয়া বাহিরের আরোপিত সামগ্রী হইয়া উঠে। একদিকে ছিল ইন্দ্রিয় পরতন্ত্রতা অন্যদিকে ছিল ভক্তি ও অনুশোচনা। প্রাচীন যুগের জীবই-ধারা, তাহার দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি এবং নিরীশ্বরবাদকে ইতালীয়রা গ্রহণ করে।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে সচেতনতার ফলে পাশ্চত্য দেশগুলির মধ্যে নানা চিন্তা-পদ্ধতি ও বিশ্বাস গড়িয়া উঠিতে থাকে। এইভাবে তাহাদের মধ্যে যে একটি ধর্মবোধ সর্বত্র রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে থাকে তাহা দিব্যরাষ্ট্র রূপের খ্রীষ্টিয় বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

ঈশ্বর এই জগৎকে যে এক দিব্য জগতে রূপান্তরিত করিতে চান খ্রীষ্টধর্মের এই বিশ্বাস দান্তেরও ছিল। তবে সেই সঙ্গে তিনি মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায়ও বিশ্বাস করিতেন। দিব্য ইচ্ছা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে যোগের রহস্যভেদ মধ্যযুগীয় ধর্ম ও দর্শন করিতে পারে নাই। ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছায় পাশ্চাত্ত্য দেশ সমুহ বিশ্বাসী। পাশ্চাত্ত্য ধর্ম, ও দর্শন ইহার পর হইতে

এই দুইয়ের যোগের রহস্যভেদ করিতে সচেষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন সংস্কৃতি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা তাহারই এক বিশিষ্ট রূপ।

সপ্তদশ শতকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের সঙ্গে মানুষ প্রকৃতির মধ্যে এক অখণ্ড নিয়মের সন্ধান পায়। এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ভাব-জীবনে এক আমূল পরিবর্তন আসে। এই বোধটিই অষ্টাদশ শতকে আরো গভীর আরো নিঃসংশয় রূপে প্রকাশ লাভ করে।

লক, বার্কলে, হিউম, কাণ্ট প্রভৃতি দার্শনিকগণ দার্শনিক জগতে যে চিন্তা করুন না কেন, এই সকল দার্শনিক চিন্তার বাহিরে সাধারণ মানুষ বিজ্ঞানের মধ্যে মুক্তির এক নূতন বাণী লাভ করে, মর্তে স্বর্গ রাজ্যের এক নূতন রূপ অপরোক্ষ করে।

ইহার পর হইতে কয়েকটি বিশিষ্ট চিন্তাধারার মধ্যে ক্রমাগত সঙ্ঘাত চলিতেছে।

(১) বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তি: বিজ্ঞানের সহায়তায় জড় জগতের উপর ক্রমিক আধিপত্য বিস্তারের ভিতর দিয়া মানুষ পরিণামে পরিপূর্ণ সুখ ও শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে। ইহাদের সম্পূর্ণ নির্ভরতা মানবিক যুক্তি ও বিচার বোধের উপর।

(২) আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তি: বিকাশ ঘটিতেছে সত্য, কিন্তু তাহা অন্তর্জগতের ধীর উন্মোচনের ভিতর দিয়া। মানুষ অধ্যাত্ম জগতে ক্রমিক উন্নততর মূল্য লাভ করিয়া চলিয়াছে। ইহাতে একটি পরিণামে এই জগৎ ও জীবন সকল পাপ মুক্ত দিব্য জীবন ও জগতে রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

(৩) বিবর্তনবাদ: এই তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে জগতে যে পরিবর্তন আমরা দেখিতেছি, তাহা কেবল রূপান্তরমাত্র; তাহার মধ্যে মূল্যের কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে না। সংখ্যাতীত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভিতর দিয়া, গণনাতীত কল্প-কল্পান্তরের ভিতর দিয়া সভ্যতার বারংবার প্রকাশ ঘটিতেছে মাত্র। অতএব সকল প্রকাশ ও বিলয়ের অতীতে যে চিরন্তন চিরস্থির ভাব-লোক আছে মানুষ একমাত্র তাহাকেই লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইবে। মনুষ্য জীবনে আর কোন সার্থকতা নাই।

(৪) আর একটি বিশিষ্ট চিন্তাধারা আছে। এক্ষেত্রে মানুষ বিশ্বের এই চিরন্তন নিয়তিকে স্বীকার করে না।—বিশ্বে সৎ-অসতের চিরন্তন যে স্থিতাবস্থা।

ইঁহারা বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর স্বয়ং একদিন এই জগৎ ও জীবনকে এক অলৌকিক উপায়ে পাপ মুক্ত করিয়া দিবে।

রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় ও চতুর্থ ধারার চিন্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার চিন্তার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তাঁহার পূর্ণ জীবন সাধনায় আধ্যাত্মিক বিকাশের সহিত মন ও বুদ্ধির বিকাশ-সামর্থও স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

রোমান্স তন্ত্র

প্রাচীনকালে আদিম সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া যে প্রথম সভ্য সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা হয় তাহার রূপ-কল্পনাটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সকল দেশেই একই রূপ। পাশ্চাত্ত্যে প্লেটোর রিপাবলিকের পরিকল্পনা এবং এদেশে স্মৃতি সংহিতগুলির পরিকল্পনার মধ্যে মূলগত কোন অনৈক্য নাই।

তাহাতে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকেই সভ্যতার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচারের মান স্বরূপ গ্রহণ করা হইয়াছে। চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে যে মানুষ যত উন্নত সে মানুষ তত বেশি সভ্য ও উন্নত এবং সেই অনুপাতে সে সমাজে ততবেশি সম্মান ও সুযোগ দাবী করিতে পারে।

পাশ্চাত্ত্যে প্লেটোর দার্শনিক চিন্তাধারার সহিত প্রথম সঙ্ঘাত দেখা দেয় খ্রীষ্ট ধর্মের অভ্যুদয়ের ফলে। উভয় চিন্তাধারার পার্থক্য নির্দেশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেবল একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ এক্ষেত্রে করা যাইতে পারে।

খ্রীষ্ট ধর্মে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের ক্রমের উপর মনুষ্যত্বের ক্রম আদৌ প্রতিষ্ঠিত নয়। মনুষ্যত্বের ক্রম ইহার ঠিক বিপরীত বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহা হয়ত খ্রীষ্ট ধর্মে কোথাও স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু যে ধর্ম বিশ্বাস এবং উপলব্ধির উপর উহা মানুষত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছে তাহার সহিত চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির কোন যোগ নাই। সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি আদৌ লাভ না করিয়াও অতি দুর্লভ মনুষ্যত্ব লাভ যে সম্ভব তাহা খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস রিপাবলিকের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত ও বিরুদ্ধ।

(২)

মানুষ মাত্রেই আত্ম চেষ্টায় পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে, বৌদ্ধধর্মের এই বিশ্বাস প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে ছিল না। খ্রীষ্ট ধর্ম একটি ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে যেমন সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিতে চাহিয়াছে, বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে সেইরূপ কোন ধর্ম বিশ্বাসের স্থান নাই; বরং চিন্তা ও বুদ্ধি

বৃত্তির সহায়তায় জীবন ও জগতের ক্ষণস্থায়িত্বের, প্রবহমানতার স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে চাহিয়াছে।

যে জাতীয় চিন্তাধারা মানব সভ্যতার ধীর বিকাশে বিশ্বাস করে এবং তাহাকেই যদি জীবন ও জগতের স্বীকৃতি বলিয়া গ্রহণ করা যায় তবে তাহার প্রকাশ খ্রীষ্ট ও বৌদ্ধধর্মে আদৌ নাই।

মোটামুটি সপ্তদশ শতাব্দী হইতে আর একটি চিন্তাধারা পাশ্চাত্যে জন্ম লাভ করিয়া বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই চিন্তাধারাকে রোমান্টিসিজম্ আখ্যা দান করা হয়। প্রাচীন সমাজ নৈতিক চিন্তাশীলদের মত, অথবা বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টধর্মের মত এই চিন্তা-পদ্ধতি সভ্যতার বিকাশকে অস্বীকার করে না। এই তন্ত্র বিশ্বাস করে একমাত্র এই সভ্যতার বাহিরে মানুষ আপনার আদর্শ সমাজ-রূপটি লাভ করিতে পারে। ইহারা যে জীবনকে আদর্শ স্বরূপ লাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি বিমুখতা।

এইরূপে ইহারা যে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে তাহা প্রাচীন চিন্তা-ধারা বিরুদ্ধ। সমাজ-রূপের বাহিরে যে মনুষ্যত্বের উচ্চ কোন আদর্শের প্রকাশ নাই, প্রাচীন চিন্তাধারা তাহা বিশ্বাস করে। কিন্তু ইহাদের মতে সমাজ-রূপের বাহিরে দুর্লভ মনুষ্যত্বের প্রকাশ একান্ত সুলভ। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার প্রাচীন চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। তাহাদের মতে একমাত্র সমাজরূপের বাহিরেই প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান লাভ সম্ভব। বায়রণ প্রভৃতি কবির চিন্তা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

প্রকৃতি প্রেম ইহার পূর্বে আর কোথাও যে এমন করিয়া অনুভূত হয় নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। অতিজাগতিক সত্যে তাহারা বিশ্বাস করে; কিন্তু প্রকৃতি ও মানব প্রেমের ভিতর দিয়া তাহার প্রকাশ। এইরূপে তাহাদের মধ্যে জাগতিক ও অতিজাগতিক বোধের মধ্যে সমন্বয় সাধনের যে চেষ্টা দেখা দেয় তাহারও কোন পূর্ব পরিচয় ছিল না।

রোমান্টিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতিকে আশ্রয় করিয়া আর একটি চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটে। বিজ্ঞান আশ্রয়ী এই চিন্তাধারা মনুষ্য সভ্যতার ক্রমোন্নতিতে বিশ্বাসী।

রোমান্টিকতাই হোক, অথবা বিজ্ঞান আশ্রয়ী চিন্তাই হোক, ইহারা যে আদর্শ রূপ লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহার সহিত স্থির স্তর বিন্যস্ত প্রাচীন

সমাজরূপের আদর্শের কোন যোগ নাই। মধ্যযুগীয় দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারা হইতেও ইহা বিলক্ষণ।

এইরূপে নানা দিক হইতে বিগত প্রায় তিনশত বৎসর ধরিয়া বর্তমান বিশ্বের চিন্তাধারা প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা হইতে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত হইয়া এক নূতন পথ অবলম্বন করিয়াছে। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি সময় হইতে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইংলণ্ডে যুক্তিবাদের যে প্রাবল্য দেখা দেয় তাহাও কোন না কোন ভাবে এই মতটিকেই স্বীকার করিয়াছে।

রোমান্টিসিজ্‌মের একটি বড় লক্ষণ হইল বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধিবিমুখতা। ইহারা কিন্তু বুদ্ধির স্থলাভিষিক্ত করিয়া কোন ধর্ম বিশ্বাসকে আশ্রয় করে নাই। যে সকল দার্শনিক চিন্তা পদ্ধতি জাগতিক এবং অতি জাগতিক বোধের সংযোগ এবং সমন্বয়কে অস্বীকার করে ইহারা সেই সকল চিন্তা পদ্ধতিকে ভ্রান্ত বলিয়া অনুমান করে।

বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধি ও বিচারকে অস্বীকার করিবার কারণ, ইহাদের মতে বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধির সহায়তায় চরম সত্যকে কখনই লাভ করিতে পারা যায় না। সত্যের সামগ্রিক প্রকাশ রূপ বলিতে তাঁহারা জাগতিক এবং অতি জাগতিক বোধের পূর্ণ সংযোগ সমন্বয়ের সত্যকে বুঝিতেন।

ক্লাসিক এবং রোমান্টিক মনোভাবের, মূলগত পার্থক্যকে একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক নিম্নরূপ ভাবে নির্দেশ করিয়াছেন।

'It is at all events a little confusing, for history no less than for theology, to apply the same title to a religion of human insufficiency, which offers redemption at the cost of humility and self-surrender, and to a religion of human sufficiency, which denies the necessity of redemption and offers man limitless self-expansion at no greater cost than the will to affirm his own goodness as part of a good universe ; to a religion in which grace descends to man from a great outward Reality completely independent of his desires and imaginings, and to a religion in which grace is the echo of man's pride ; to a religion which says, "Be it unto me according to thy word" and to a religion which says, with Emerson. "No law can be

sacred to me but that of my own nature." (Religious Trend in English Poetry : H. N. Fair Child)

(৩)

বিশ্বের প্রায় সকল সভ্যতায় চিন্তার একটি ধারা আছে, যাহা প্রাচীনকালে সভ্য মনুষ্য-সমাজ রচিত সামাজিক কাঠামোটিকে আশ্রয় করিয়া তাহার সকল নৈতিক এবং দার্শনিক ভিত্তিকে ক্রমাগত পরিপুষ্টি দান করিতে চায়। তাহাদের মতে ইহাই মনুষ্য সভ্যতার একমাত্র নিয়তি।

আর একটি চিন্তাধারা আছে, যাহা এই সমাজনৈতিক, ধর্মনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক কাঠামোটিকে জীবনের একমাত্র সত্য প্রকাশ বলিয়া মনে করে না; কেবল তাহাই নয়, জীবন ও জগতের স্বাভাবিক বিকাশ ও পরিণতির পথে ইহা যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহাতে তাহারা নিঃসংশয়। মনুষ্য সভ্যতা এবং মনুষ্য সমাজ এই কাঠামোটিকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারিলে জগৎ ও জীবন হইতে বিচিত্র পাপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইবে না। এই জাতীয় চিন্তাধারা তাই দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক কাঠামোটিকে সম্পূর্ণ রূপে ভাঙিয়া ফেলিতে চায়। ইহাদের সমাজ বিরোধিতা এই প্রাণকে প্রসারিত করিবার আকাঙ্ক্ষার ফল। সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে রোমান্সতন্ত্র তাহা প্রসারিত প্রাণের এই বহু বিচিত্র আকাঙ্ক্ষার একটি দিক।

(৪)

রোমান্টিকগণ প্রকৃতির মধ্যে এক সর্বতোব্যাপ্ত চিন্তা বা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে,-এক সৃজন কারী প্রেম। তাহারা এক আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের জগৎ লাভের জন্য উৎসুক। অতীত জগৎ লাভের প্রতি রোমান্টিকদের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। তাহারা মানব জীবনকে আদর্শায়িত করিতে চায়। ভবিষ্যতে সমস্ত সমাজ যে এক আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেম, পরিপূর্ণ কল্যাণ ও শান্তি লাভ করিতে চলিয়াছে রোমান্টিকরা তাহারই স্বপ্নকে কাব্যে রূপায়িত করিয়াছে। রোমান্টিকদের মধ্যে সর্বত্র এক অপ্রাপণীয় জগৎ লাভের ব্যাকুলতা লক্ষ্য করা যায়। ইহারা তাহার নাম দিয়াছে, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, পরিপূর্ণ প্রেম, পরম সত্য. অনন্ত জীবন ইত্যাদি।

(৫)

শেলি প্রকৃতির অন্তরালস্থিত এক আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমকে লাভ করিবার জন্য নিখিল মানব সমাজ ও বিশ্ব হইতে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন।

তাহার ফলে শেলির সকল কবিতার মধ্যেই এক প্রকার নিঃসঙ্গতার বোধ লক্ষ্য করা যায়।

প্রকৃতির অন্তরালে যে সংজ্ঞাতীত অনির্বচনীয় সত্তা আছে, শেলি তাহার সহিত একপ্রকার যোগ অনুভব করিতেন। প্রেমকে তিনি বিশ্বাত্মা রূপে উপলব্ধি করেন। তাহা যেন তাঁহারই অপর আর এক সত্তা। তাহাকে লাভ করিবার জন্য তিনি সমস্ত জীবন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ফিরিয়াছেন, কিন্তু তাহাকে লাভ করিতে পারেন নাই, হয়ত তাহাকে লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়া। সে প্রেম বাস্তব প্রেমের সূত্রে বিধৃত নয়। এই প্রেমকে লাভ করিবার জন্য তিনি মর্ত প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করেন। ফলে তিনি বারংবার স্বপ্নলোক হইতে স্খলিত হইয়া হতাশায় আর্তনাদ করিয়াছেন।

বিশ্বের অন্তরালবর্তী সত্তাকে তিনি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহাকে কখন বলিয়াছেন সৌন্দর্য-চেতনা কখন বলিয়াছেন শক্তি উৎস। এই সৌন্দর্য-ধ্যানের সার্থকতম প্রকাশ ঘটিয়াছে 'Hymn to Intellectual Beauty' কবিতার মধ্যে।

অতি সূক্ষ্ম এবং উন্নত চিন্তার স্পন্দনে স্পন্দিত হইতে হইতে তাঁহার চেতনা আকস্মিক ভাবে ভাবের আবেগে বিশ্ব-সত্তার উন্নততর বোধের লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি এই ভাবনাকে ভাবের লোকে সঞ্চারিত করিয়া দিতেন; প্রকাশ রূপকে দর্শন হইতে কাব্যে রূপান্তরিত করিতেন এবং তাহাকে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত প্রেমের বাণীতে আধ্যাত্মিক শক্তিতে রূপান্তরিত করিয়া দিতেন।

তিনি পরম সত্তাকে চিন্তা রূপে উপলব্ধি করেন;—এই চিন্তা এবং প্রেম সত্তা একই, সচেতন এবং সক্রিয়। চেতনা বিশিষ্ট সক্রিয় প্রেম রূপে উপলব্ধ বিশ্বকে তিনি ঈশ্বর রূপে উপলব্ধি করেন। কল্পনার অত্যুচ্চ আবিষ্ট মুহূর্তে শেলি যে এক পরম সত্তার উপলব্ধি করেন, তাহা আত্মসচেতন প্রেম সত্তা। সংখ্যাতীত নর-নারী নিখিল বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত প্রেমের এক একটি বিচ্ছিন্ন প্রকাশ।

তিনি বিশ্বাস করিতেন, দুঃখভোগ, সর্ববিধ পাপের সহনশীলতার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং অবিচলিত প্রেমবোধের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের জয় একদিন ঘটিবেই, এই আশার ভিতর দিয়া মনুষ্য-সমাজের ধীর বিকাশ ঘটিতেছে।

বর্তমানে অপেক্ষা করা, সহ্য করা ছাড়া মানুষের আর কোন পথ নাই। স্বাধীনতা, বিচার এবং প্রেমের বোধ ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া একদিন

এতদূর সামর্থ লাভ করিবে যে অবস্থায় মানুষ ইহার সহায়তায় পাপকে সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠিতে পারিবে। তিনি নিখিল মনুষ্যত্বকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেন।—একটি সত্তা পাপ মগ্ন। ইহার জন্য সে অসহনীয় দুঃখ ভোগ করিতেছে। আর একটি সত্তা সকল পাপ মুক্ত হইয়াও অখণ্ড মনুষ্যত্বের একটি অংশ বলিয়া মানুষের পাপের জন্য দুঃখ ভোগ করিতেছে। প্রমিথিয়াস এই আদর্শ পুরুষ, বিশ্বের পরিত্রাতা, মানুষকে পাপ মুক্ত করিবার জন্য তিনি পাপের মধ্যে থাকিয়া সকল দুঃখভোগ করিতেছেন।

তিনি আপনার কল্পিত যিশুখ্রীষ্টের ধারণার অনুরূপ করিয়া প্রমিথিয়াস কল্পনা করেন। প্রমিথিয়াসের পথ যিশুর পথ, সহনশীল প্রেমের পথ। তাঁহার জয় প্রেমের জয়। ইহা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে রূপান্তরিত করিবে, স্বাধীনতা দান করিবে, সমগ্র প্রকৃতি জগৎ সৌন্দর্য ও মহিমা লাভ করিবে, মর্তে একটি নূতন স্বর্গ বিরচিত হইবে।

বহির্জগতের অন্তরালে যে একটি অখণ্ড সত্তা আছে, মানবিক বোধের যে একটি অতীত জগৎ তাহাকে কেবল অন্তর দিয়া লাভ করিতে, উপলব্ধি করিতে হয়। ইহার জন্য প্রতীকের সহায়তা তাই অনিবার্য হইয়া উঠে। সকল বৈচিত্রের অন্তরালে যোগ সূত্র স্বরূপ যে এক বিরাজিত তাহাকে কল্পনায় উপলব্ধি করিবার চেষ্টা। যে চিন্তাধারা ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধিকে সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করে, অন্তরের ঐক্য সাধক উপলব্ধিকে একমাত্র সত্য বলিয়া স্বীকার করে তাহাই রোমান্টিক চিন্তাধারা। রোমান্টিক আপনার উপলব্ধিতে সমগ্র বহির্বিশ্বকে রূপান্তরিত করিতে চায়।

যে জগৎকে আমরা চিন্তা করি বা জানি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া দিয়া দিব্য-সত্তা যে একদিন আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে এই বিশ্বাসের ফলেই রোমান্টিক কবিদের এই জাতীয় চেষ্টার প্রকাশ। তখন বাহিরের রূপ এবং অন্তরের জগতের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। তাহা এক পরিপূর্ণ জগৎ। কবির আকাঙ্ক্ষিত জগতের প্রতিরূপের নিঃসংশয় উপলব্ধি। এই মন্তব্য যে-কোন রোমান্টিক কবি সম্পর্কে করা যাইতে পারে।

প্রেম যেখানে চূড়ান্ত পরিণাম লাভ করে সেখানে বৈচিত্র সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যায়। রূপের সম্পূর্ণতায় রূপ বৈচিত্রের বিলুপ্তি।

রোমান্টিকতার একটি বড় বোধ হইল, প্রেমের সহায়তায় জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ। ব্যক্তিমন যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে এবং তাহার মধ্যে অনুপ্রবেশ

করিতে পারে এই মিস্টিক উপলব্ধি তাহারা পোষণ করে। বিশ্বের সকল বৈচিত্রের অন্তরালে যে এক তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় কি উপায়ে?

প্রেম তাহাকে সেই রহস্যই বলিয়া দেয়। যে ঈশ্বরত্ব হইতে মানুষ ভ্রষ্ট হইয়াছে, প্রেম মানুষের মধ্যে সেই ঈশ্বরত্বকে উদ্‌ঘাটিত করে এবং সেই স্বরূপকে ফিরিয়া লাভ করিবার জন্য উৎসুক করিয়া তুলে। সমগ্র মনুষ্য সমাজের মুক্তি-সাধনের ভিতর দিয়া মানুষ আপনার মুক্তি লাভ করিবে।

কল্পনা যে-লোকের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটায় রোমান্টিক কবি তাহার মধ্যে বাস করে। অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার বা কল্পনা হইল যাহা সত্যই আছে, যাহা সত্য এবং অপরিবর্তনীয় তাহার উপস্থাপনা।

সৎ স্বরূপের সহিত যোগ ঘটিয়াছে কি না তাহা বোধ করিতে পারা যায় যখন মিস্টিক বা রোমান্টিকের নিজস্ব সচেতনতা অনুভূতি গম্য রূপ কল্পনা বা প্রতীকাশ্রয়ী কল্পনা রূপে প্রকাশ পায়। কল্পনা প্রকৃত অস্তিত্বকে উপস্থাপিত করিতে পারে।

মিস্টিকরা জীবন ও জগতের অসম্পূর্ণতায় বিশ্বাস করে। এই দিক দিয়া শেলিকে মিস্টিক বলা যায় না। তিনি যে জীবনের সম্পূর্ণতার কথা বলিয়াছেন, তাহাকে একদিন এই জগতেই লাভ করিতে পারা যাইবে। তাহা নিখিল বিশ্ব ও মানবের সম্পূর্ণতা, অন্যদিকে মিস্টিকদের সম্পূর্ণতা একক। তাহারা পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রেমের যে লোকটিকে অপরোক্ষ করে, তাহাকে বাহিরে মর্ত জীবনে কখনই লাভ করিতে পারা যায় না।

শেলি কেবল আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান করেন নাই, এই জীবনে ও জগতে একদিন যে তাহার নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটিবে তাহার বাণীকে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিশ্বের চিরন্তন অসম্পূর্ণতা হইতে শেলি মানুষকে অন্তর্লোকে আহ্বান করিয়া লইয়া যায় না, তাহা এই বিশ্বের স্থায়ী রূপান্তরতায় বিশ্বাস করায়।

সমসাময়িক কালে রোমান্টিকতার একটি ধারা লক্ষ্য করা যায় জার্মানিতে। শ্লেগেল, শিলার প্রভৃতি দার্শনিকদের চিন্তাধারার ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ ঘটে। রোমান্টিক কবি-ধর্ম সম্পর্কে শ্লেগেলের চিন্তাধারার পরিচয় লাভের পূর্বে তাঁহার সাহিত্যাদর্শের সামান্য পরিচয় লাভ প্রয়োজন। এই বিষয়ে শ্লেগেল এবং শিলারের মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে।

শ্লেগেলের মতে সাহিত্যের একটি সার্বজনীন স্বীকৃতি আছে, তাহা ব্যক্তির

ভাবাত্মক প্রেরণার প্রকাশ নয়, তাহাকে আশ্রয় করিয়াও থাকে না। সৌন্দর্যের বিশুদ্ধ বিধি বস্তুতান্ত্রিকতা এবং সার্বজনীনতা, তাহা সুসম্বদ্ধ এবং অপরিবর্তনীয়। এই সকল বিধানের স্বীকৃতির ভিতর দিয়া শিল্প তাহার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য লাভ করে। প্রকৃতিকে অনুকরণ করা নয়, জীবন ও জগৎ শিল্পীর মনে যে প্রভাব বিস্তার করে তাহাকে প্রকাশ করাও শিল্পের লক্ষ্য নয়।

শ্লেগেলের মতে সাহিত্যের এই ক্লাসিক ধর্ম লক্ষ্য করা যয়ে গ্যেটের সাহিত্য-কর্মের মধ্যে। তাঁহার সাহিত্য-কর্মের মধ্যে যে ক্লাসিক ধর্ম আছে, যে সাম্য, ও বস্তু তান্ত্রিকতা তাহা গ্রীক সাহিত্যের অনুরূপ। গ্যেটের কাব্য এইরূপে বিশুদ্ধ শিল্পের এবং বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রকাশ। সাহিত্যে বস্তু তান্ত্রিকতা যে সম্ভব তাহা তাঁহার সাহিত্য-কর্ম নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করে।

তাঁহার মতে রোমান্টিক ধর্মের প্রথম প্রকাশ ঘটে সেক্সপীয়রের সাহিত্যে। সেক্সপীয়রের কোন একটি নাটকের মধ্যে সামগ্রিক ভাবে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে নাই। কেবল সৌন্দর্যের জন্য সৌন্দর্যের প্রকাশ নয়, চরিত্র অথবা দার্শনিক কোন ভাবনার উপায় স্বরূপে তাহাকে প্রকাশ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রাচুর্য অনেকক্ষেত্রে জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ফলে সামগ্রিক ভাবে তাহা অন্তহীন সজ্ঘাতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহার উপস্থাপনা বস্তু তান্ত্রিক নয়, সকল সময় ব্যক্তিগত। সেক্সপীয়রের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটকও আধুনিক গীতি কবিতার দোষ দুষ্ট। রোমিও জুলিয়েটকে আধুনিক গীতিনাট্য বলা যাইতে পারে। রোমিও জুলিয়েট যৌবনের ক্ষণস্থায়ী আনন্দের উপর রোমান্টিক দীর্ঘশ্বাস। এমনকি যে হ্যামলেটের মধ্যে শিল্পকলার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে, তাহার মধ্যে মানবাত্মার পূর্ণ অসঙ্গতির একটি অসম্পূর্ণ চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাকে তাই দার্শনিক ট্র্যাজিডি বলা যাইতে পারে, ইহা সাহিত্যিক ট্র্যাজেডির সম্পূর্ণ বিপরীত। সেক্সপীয়রের সাহিত্য-কর্মের এই যে মূল্যায়ন তাহা একান্তরূপে শ্লেগেলের।

রোমান্টিকতা সম্পর্কে শ্লেগেলের ধারণা এই যে এই জাতীয় শিল্প-কর্ম সাহিত্য ধর্মের অপরিবর্তনীয় কোন বিধি-বন্ধনকে স্বীকার করে না। ইহা সৌন্দর্য অপেক্ষা জীবনকেই সমধিক প্রকাশ করিতে চায়।—মানব জীবনের সমগ্র অভিজ্ঞতা। প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র সৃষ্টি নয়, অন্তহীন বৈচিত্রপূর্ণ-ব্যক্তিত্বকে ইহা প্রকাশ করিতে চায়। প্রকৃতির মধ্যে অন্তহীন বৈচিত্র সত্ত্বেও যে একটি নিগূঢ় যোগ আছে, তাহা যে একান্তরূপে বিচ্ছিন্ন নয় রোমান্টিক কাব্যে এই বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে।

তাঁহার এই আধুনিক কবিতা এইরূপে সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়াছে, কারণ ইহা ব্যক্তি-মানসের ভাবাত্মক বিচিত্র প্রেরণাকে প্রকাশ করে। আধুনিক কাব্যের লক্ষ্য কোন প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র নয়, বিশিষ্ট মানুষ বা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্টকে প্রকাশ করাই ইহার লক্ষ্য। ইহার লক্ষ্য জীবনের পূর্ণতা ও বৈচিত্রকে প্রকাশ করা, গ্রীক কবিতা যে সীমাকে স্বীকার করিয়া সৌন্দর্যের চরমতাকে প্রকাশ করিয়াছে আধুনিক কবিতা সেই সীমাকে স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক।

কাব্যাদর্শ সম্পর্কে শিলারও মোটামুটি এই ধারণা পোষণ করিতেন। তিনিও বিশ্বাস করিতেন, যে সকল অনুভূতি ব্যক্তি ও জাতির জীবনে সাধারণ কাব্য কেবলমাত্র সেই সকল সাধারণ অনুভূতিকে প্রকাশ করিবে। ইহার জন্য শিল্পীকে অন্তত মুহূর্তের জন্য আপনার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সীমার বাহিরে আসিতে হয়। এই সকল গুণের জন্য গ্রীক সাহিত্য আজিও শিল্পাদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।

ইঁহারা উভয়েই বস্তুতান্ত্রিকতার উপর এবং বিষয় বস্তু অপেক্ষা সাহিত্য-রূপের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ইঁহারা প্রাচীন সাহিত্যাদর্শের উৎকর্ষতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাহার ফলে তাঁহারা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রকাশ অপেক্ষা ঐক্যকে অধিক আকাঙ্ক্ষিত বোধ করিতেন।

রোমান্টিক কবিতা সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রূপের পূর্ণতাকে লাভ করিতে চায় না, সুদূরস্থিত এক পূর্ণতার দিকে ইহার চির অভিসার। রোমান্টিক কবিতা সমস্ত জীবনকে আশ্রয় করিয়াছে, তাই তাহার প্রকাশের মধ্যে এমন অপরিমিতি। বস্তু অপেক্ষা বস্তু মনের উপর যে প্রভাব সৃষ্টি করে তাহার উপর আধুনিক কবিতা অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। প্রাচীন কবিগণ প্রকৃতির মধ্যে, জীবন-লব্ধ সত্যের মধ্যে, বর্তমান এবং জীবন্ত বাস্তবতার মধ্যে আমাদের আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান, আধুনিক কবিরা আমাদের ভাবনার জগতে উত্তীর্ণ করিয়া দেন। তাঁহারা যথাযথ মানবধর্মকে নয়, আদর্শ মানবধর্মকে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক।

রোমান্টিক কবিতা চির পরিণামী, ইহার যে বিশ্বজনীনতা তাহা আবেদনের বিশ্ব জননীতা নয়, তাহা বিষয় বস্তুর অন্তহীন বৈচিত্র প্রসূত। তাহার মধ্যে সমগ্র বিশ্বের ছায়া পড়ে, সমসাময়িক কালের সমগ্র ছবি ফুটিয়া উঠে।

কান্ট প্লেটোর মত দুইটি জগতে বিশ্বাস করিতেন,—একটি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য জগৎ,

অন্যটি দেশ-কালের অতীত অতীন্দ্রিয় জগৎ। মানুষের ব্যক্তি-সত্তা দুইটি জগৎ-কেই ব্যাপৃত করিয়া আছে, একটি জাগতিক সত্তা, অন্যটি অতি জাগতিক সত্তা। মানুষের জাগতিক সত্তা ইন্দ্রিয়ানুভূতি, চিন্তা ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা, নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল আবেগ প্রভৃতির মিলিত প্রকাশ। এই সত্তা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি শাসনাধীন।

কোলরিজ যাহাকে কবি কল্পনা বলিয়াছেন, যাহাকে তিনি "the will the reason, the judgment and the understanding" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতি প্রভাবের অতীত সামগ্রী। ইহা পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে পারে।

ইহা হার্টলের দার্শনিক চিন্তা বিরুদ্ধ। হার্টলের চিন্তা পদ্ধতি অনুসারে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন কোন ক্রিয়া নাই আমাদের সমগ্র সত্তাটিই প্রকৃতির বিচিত্র নিগূঢ় প্রেরণার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

জার্মান রোমান্টিক কবিদের মধ্যে একটি বিষয়ে সর্বত্র যে ঐক্য লক্ষ্য করা যায় তাহা হইল প্রকৃতিতন্ত্রের (naturalism) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দ্বৈতবোধ এবং উভয় লোকের দর্শন।

ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কোলরিজই প্রথম ইংরেজি সাহিত্যে জার্মান রোমান্টিকতা প্রবর্তন করেন। তাহার ফলে স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার কাব্যে জার্মান রোমান্টিক কবিদের এই সকল বিশিষ্ট বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে।

রোমান্টিক কবিগণ পরিদৃশ্যমান এই জগতের অন্তরালে এক সীমাহীন ভাব-লোকের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাকে কোন যুক্তি-বিচার বা চিন্তা-পদ্ধতির সহায়তায় উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। ইহার জন্য এক ভিন্নতর চিত্তবৃত্তির প্রয়োজন। ইহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন ইমাজিনেশন। মুখ্যত সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া কল্পনায় তাঁহারা বারংবার এই সীমার জগৎ হইতে এক সীমাহীন লোকে অভিসার করিয়াছেন। সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে মুখ্যত আশ্রয় করিবার জন্য অসীম তাঁহাদের নিকট পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেমরূপে অনুভূত হইয়াছে।

এই দিক দিয়া রোমান্টিক কবিদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। একশ্রেণীর রোমান্টিক কবি আছেন যাঁহারা অতীন্দ্রিয় জগতের উপলব্ধিকেই একমাত্র সত্য বস্তু বলিয়া বোধ করেন। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে ব্লেক সর্বাগ্রগণ্য। আর এক শ্রেণীর রোমান্টিক কবি আছেন, যাঁহারা অতীন্দ্রিয়

জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করিলেও এই জীবন ও জগতের সত্যতাকেও কোন-না-কোন ভাবে স্বীকার করেন। তাঁহাদের কাব্যে এই উভয় লোকের মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য সাধনের বিচিত্র চেষ্টা-রূপ লক্ষ্য করা যায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কীটশের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের মধ্যে আবার কয়েকজন আছেন, যাঁহারা ঐহিক জীবনকে শুধু স্বীকার করেন নাই, অসীম বা পরিপূণ সৌন্দর্য ও প্রেমের উপলব্ধির সহায়তায় ইহাকে যে সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত করা সম্ভব এমনি একপ্রকার দৃঢ় প্রত্যয় বহন করিতেন। শেলীর কাব্যে একদিকে যেমন অত্যুচ্চ প্লেটোনিক সৌন্দর্য ও প্রেমের লোকে অভিসার লক্ষ্য করা যায়, তেমনি তাহারই উপলব্ধির আলোকে তিনি সমগ্র মানব সংসারকে রূপান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জাতীয় একটি চেষ্টা-রূপ বায়রণের মধ্যেও আমরা লক্ষ্য করি।

এই সৌন্দর্য ও প্রেমের লোককে তাঁহারা কোথাও কোথাও সুদূর অতীত-কালে প্রতিষ্ঠিত করিয়া (যে-কাল হয়ত আদৌ কোন কাল ছিল না) তাহাকে লাভ করিবার জন্য ধ্যানে, কল্পনায় বা স্বপ্নে অভিসার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের কাব্যে এই অতীত লোক হইল গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাল। গ্রীক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে মথিত করিয়া তাঁহারা যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেমকে লাভ করিয়াছিলেন, হেলেন তাহারই প্রতীক। গ্রীক সৌন্দর্য-লোকে এই অভিসার লক্ষ্য করা যায় কীটশ, গোটে প্রভৃতির কাব্যে।

রবীন্দ্রনাথের এই সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক হইল, বলিয়াছি, কালিদাসের যুগ। কালিদাসের কালের সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সার-স্বরূপিনী যিনি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাম দিয়াছেন মালবিকা।

রোমান্টিক কবিদের কাব্যে অতি অসহনীয় একপ্রকার নিঃসঙ্গতা বোধ লক্ষ্য করিতে পারা যায়, একপ্রকার পরিব্যাপ্ত বিষাদ ও তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব।

তাঁহাদের জীবনে এই নিঃসঙ্গতা বোধ প্রচলিত কোন ধর্ম বিশ্বাসকে না আশ্রয় করিবার ফল স্বরূপ, অন্তর্দ্বন্দ্বও এই একটি মাত্র কারণ প্রসূত।

তাঁহারা আপন আপন চিত্ত-লোককে উপলব্ধির একমাত্র আশ্রয় স্থল রূপে বোধ করেন। চিত্তের এই মহান একাকীত্বের লোক হইতে আর এক মহান একাকীত্বের লোকে তাঁহাদের নিত্য অভিসার।

জীবন ও জগতের অন্তরালস্থিত চরম অস্তিত্বকে তাঁহারা যে মুহূর্তে উপলব্ধি করিয়াছেন সেই মুহূর্তে এই নিঃসঙ্গতা বিষাদ এবং অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত

হইয়াছে। নিখিল প্রকৃতি জগৎ এবং মানব সংসারের সহিত এক সুমহান মিলন অনুভূতির ভিতর দিয়া বিষাদ এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়াছে। কিন্তু ইহা রোমান্টিক কবিদের জীবনে অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী অবস্থা। আবার তাঁহারা বাস্তব বোধের জগতে নামিয়া আসিয়াছেন, আবার মর্মবিদারণকারী হাহাকারে তাঁহারা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

রোমান্টিক কবিদের কাব্যে তাই একটি সচলতা লক্ষ্য করা যায়। তাহা এক লোক হইতে আর এক লোকে যাত্রা; সীমা হইতে অসীমে, রূপ হইতে ভাবে।

চিরন্তন প্রথা, আশা-বিশ্বাস, ধর্ম্ম ও নীতিবোধ এবং এই সকলকে আশ্রয় করিয়া আছে যে চিরাচরিত সমাজ ব্যবস্থা রোমান্টিক কবিগণ তাহার বাহিরে অন্তহীন সম্ভাবনাপূর্ণ জগৎকে উপলব্ধি করিয়াছেন। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল চিন্তাধারা একমাত্র প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সকল সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছুক।

রোমান্টিক কবিগণ এইরূপে প্রচলিত রীতি-নীতি ও ধর্মবিশ্বাসের বাহিরে সম্পূর্ণ পৃথক এক একটি বোধের জগৎ সৃষ্টি করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন। এই বোধের জগৎ ক্ষুদ্র বৃহৎ যেমনই হোক-না-কেন, তাহার কোন পূর্বাভাস কোথাও লাভ করিতে পারা যাইবে না।

বিশ্ব প্রকৃতি ও নিখিল মানব সংসার তাঁহাদের সম্পূর্ণ সংস্কার মুক্ত চেতনায় ক্রিয়া করিয়া পরস্পরের যোগে যে উপলব্ধির জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই তাঁহাদের নিকট একমাত্র সত্য জগৎ।

রোমান্টিক কবিদের কাব্যে আমরা সর্বপ্রথম সাধারণ মানুষের অন্তর্লোক আবিষ্কারের চেষ্টা দেখি। মানব চেতনার ইহা আর এক অচিন্তনীয় ব্যাপ্তির দিক। নিপীড়িত মনুষ্যত্বের ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণাকে ইঁহারাই সর্বপ্রথম বাণী-রূপ দান করেন।

ইতিপূর্বে আমাদের চেতনা কেবল উচ্চপর্যায়ের পুরুষও নারীর ভাবনা-চিন্তা ও ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেই সঙ্গে বিচ্ছিন্ন এক একটি ভৌগোলিক সীমার বাহিরে নিখিল মানব সংসার সম্পর্কে কোন কৌতূহলই ছিল না।

রোমান্টিক কবিরা কেবল আপন আপন দেশ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ নিপীড়িত মানুষের ব্যথা বেদনাকে রূপ দান করিলেন না, সমগ্র বিশ্বের লাঞ্ছিত

মানুষের জয়গানও ধ্বনিত করিলেন। রোমান্টিক কবিদের কাব্যে বিশ্বমৈত্রী তাই কেবল তত্ত্বরূপে উপলব্ধ নয়, প্রত্যক্ষ জীবনে তাহাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহারা সকল প্রকার আত্মত্যাগ ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সমগ্র পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যে ব্যক্তিগত ভাবনা ও বিশ্বাস প্রাধান্য লাভ করে। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে রুশো তাঁহার আত্ম চরিতের মধ্যে এই বোধটিকে প্রথম স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, যে ভাল ও মন্দ যেমনই হোক-না-কেন, তিনি অন্য সকল মানুষ হইতে নিঃসন্দেহে পৃথক। সমগ্র রোমান্টিক আন্দোলনের পশ্চাতে এই এক মনোভাব ক্রিয়া করিয়াছে।

ব্যক্তিগত ভাবনা ও বিশ্বাসের প্রকাশ বিশ্ব সাহিত্যে ইতিপূর্বে কোথাও ছিল না। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের প্রভাবের ফলে বিশ্বের সকল দেশের সাহিত্যের ন্যায় আমাদের দেশের সাহিত্যেও ইহার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছে।

এখানে একটি বিষয় এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রোমান্টিক ব্যক্তি-তন্ত্র এবং বাস্তববাদী ব্যক্তিতন্ত্র সম্পূর্ণ পৃথক। রোমান্টিক ব্যক্তিতন্ত্র বলিতে বুঝায় ব্যক্তির সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ, বিচিত্র সংস্কার ও নানা আকাঙ্খা সমেত একটি অনন্যসাধারণ মূল্যবোধের আবিষ্কার। অন্যদিকে বাস্তববাদী ব্যক্তিতন্ত্র মানুষ মাত্রেরই এক সাধারণ মূল্যবোধে বিশ্বাসী। এই সাধারণ মূল্যবোধটিকে মানুষ আবিষ্কার করিতে পারে সকল প্রকার সংস্কারমুক্ত পরিশুদ্ধ যুক্তির আলোকে।

"বাহিরের সহিত তাহার অন্তরের যখন সুর মেলে না সামঞ্জস্য যখন সুন্দর ও সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না তখন সেই অন্তর নিবাসীর পীড়ার বেদনায় মানস-প্রকৃতি ব্যথিত হইতে থাকে। * * * সন্ধ্যা সঙ্গীতের মধ্যে যে বিষাদ ও বেদনা ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছে তাহার মূল সত্যটি সেই অন্তরের রহস্যের মধ্যে সমস্ত জীবনের একটি মিল যেখানে আছে সেখানে জীবন কোন মতে পৌঁছিতে পারিতেছিল না। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্য যেমন দুঃস্বপনের মধ্যে লড়াই করিয়া কোন মতে জাগিয়া উঠিতে চায়, ভিতরের সত্তাটি তেমন করিয়াই বাহিরের সমস্ত জটিলতাকে কাটাইয়া নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিতে থাকে—অন্তরের গভীরতর অলক্ষ্য প্রদেশে সেই যুদ্ধের ইতিহাসই অস্পষ্টভাষায় সন্ধ্যাসঙ্গীতে প্রকাশিত হইয়াছে।" (জীবন স্মৃতি)

পূর্ণতালাভের জন্য ব্যক্তি ও বিশ্বকে পরস্পর নির্ভরশীল হইতে হয় এবং তাহারই সহিত ক্রমিক মিলন বোধের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনার ধীর জাগরণ ঘটে। এই সত্য রবীন্দ্রনাথ কবি জীবনের একেবারে আদি হইতে নিঃসংশয় রূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বিস্মিত অভিভূত হইয়া এই বিপুল বিশ্বকে সেই প্রথম দুইচক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখা। বিস্মৃতি-সাগরের নীল জল মথিত করিয়া একটির পর একটি স্মৃতি-প্রতিমা বুদ্‌বুদ ভাসিয়া উঠিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। যেন কাহার অভিশাপে মিলনের সেই স্মরণ চিহ্ন কাল-সমুদ্রের অতলে কোথায় কখন অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। ব্যক্তি ও বিশ্বের মাঝখানে এমনি বিস্মৃতির যবনিকা।

দারুণতম দুঃখ দহনের ভিতর দিয়া একদিন এই অভিশাপ যবনিকা উঠিয়া ব্যবধান ঘুচিয়া যায়। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের তখন মিলন ঘটে।

সমগ্র জীবন ধরিয়া ব্যক্তি সত্তার বিচিত্র সুর জাগাইয়া বাঁধিয়া তুলিতে হয়। তাহার পর একদিন ব্যক্তির সঙ্গীত বিশ্ব-সঙ্গীতের সহিত মিলিত হইয়া এক অখণ্ড সঙ্গীত ঝঙ্কৃত করিয়া তুলে।

বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাতে একদিকে ব্যক্তির ধীর জাগরণ, অন্যদিকে আবার

উহার সহিত মিলাইয়া ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন সুরের মধ্যে সঙ্গীত স্থাপনা, কবির কাব্যে প্রথম হইতে এই দুইটি দিক আমরা প্রত্যক্ষ করি।

সৌন্দর্য বোধ আশ্রয় করিয়া বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দন মানব-চেতনায় ধীরে সঞ্চারিত হইয়া যায়। সন্ধ্যা সঙ্গীতে কবির জীবনে প্রাণের প্রথম উপলব্ধি। এই যে দুঃসহ প্রাণের বেগ, ইহার স্বরূপ কি, ইহার লক্ষ্য কোন্ দিকে, ইহার পরিণাম কোথায় ? এই প্রেরণার দার্শনিক স্বরূপ যাহাই হোক, এই জিজ্ঞাসা জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে এমনি এক প্রকার অধ্যাত্ম প্রত্যয় কবি ওই শৈশব কালেই কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন যে বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন-বোধে কেবল এই বেদনার অবসান ঘটিতে পারে।

আজ কবির অন্তরেও যেমন, বাহিরেও তেমনি সামঞ্জস্যের কোন বোধ নাই, সর্বত্র কেবল এক প্রকার অন্ধ, মূঢ়, জড়প্রবাহ। নিখিল বিশ্ব কবির নিকট আজ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য শূন্য, মিল বিরহিত, ভঙ্গুর বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

"পূর্ণ করি অন্ধকার তোর
তারা সবে ভাসিয়া বেড়ায়,
যুগান্তের প্রশান্ত হৃদয়ে
ভাঙাচোরা জগতের প্রায়।" (সন্ধ্যা)

মনে হয় সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, হারাইয়া যাইতেছে, ফুরাইয়া যাইতেছে, এখানে আশ্রয় করিবার মত কিছু নাই। সেই সঙ্গে জাগে এক অলৌকিক নিঃসহায়তা ও একাকীত্ব বোধ।

"একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো ভুলি
সবে চলে যায়।" (পরিত্যক্ত)

ব্যক্তি চেতনায় এমনি এক গূঢ় মিলন বোধ জাগে। সে যেন কোন্ জন্মান্তরীণ স্মৃতি। মনে হয় এক কালে যেন আমরা তাহার সহিত একাত্ম হইয়া ছিলাম, কেমন করিয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। মিলন লাভের জন্য তাই এমন ব্যাকুলতা। আমরা তাহার জন্য অশ্রুজলে পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছি।

"ওই তারকার মাঝে যেন তার গৃহ ছিল,
হাসিত কাঁদিত ওইখানে।
আর বার ফিরে যেতে চায়
পথ তবু খুঁজিয়া না পায়।" (সন্ধ্যা)

সৌন্দর্য সম্ভোগের ভিতর দিয়া অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটে। প্রাণের এই

উপলব্ধিতে প্রথমে বিশিষ্ট কয়েকটি বোধ একান্ত হইয়া পড়ে। এক প্রকার প্রবল ভাবাতিরেকে সমগ্র চেতনা একমুখীন হইয়া অসহনীয় বন্ধন-বেদনা বোধ করিতে থাকে। মনে হয় অতি সঙ্কীর্ণ এই বোধের আবেষ্টনী হইতে আর বুঝি সে কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এমনি এক প্রকার মানসিক অবস্থা কবিও বোধ করিয়াছিলেন।

"ভূমিপানে চেয়ে চেয়ে, একই গান গেয়ে গেয়ে
দিন যায়, রাত যায়, শীত যায়, গ্রীষ্ম যায়
তবু গান ফুরায় না আর।" (হৃদয়ের গীতধ্বনি)

আবার এই বিশ্ব প্রকৃতির যোগেই ধীরে ধীরে সামঞ্জস্য বোধ গড়িয়া উঠে। এই সম্পর্কে একান্ত কৈশোর হইতে কবির অন্তরে স্থির এক প্রকার অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। ইহা যেন কোন অতি-চেতনা-লব্ধ নিয়তি নির্দেশ। ভাবের ঐকান্তিকতা হইতে মুক্ত হইবার জন্য কবি তাই বিশ্বের মিলন বোধটিকেই নিবিড়তর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"হৃদয়রে আর কিছু শিখিলিনে তুই
প্রকৃতির শত শত রাগিণীর মাঝে
শুধু ওই তান।" (হৃদয়ের প্রতিধ্বনি)

ভাবাতিরেকে হৃদয়ের সামঞ্জস্য যখন ভাঙ্গিয়া পড়ে তখন অসহনীয় অবস্থা হইতে মুক্তি লাভের জন্য মানুষ প্রথমে দুইটি উপায় অন্বেষণ করে,—হয় ব্যক্তিকে লোপ করা, অর্থাৎ হৃদয় নিরুদ্ধ করা নতুবা বিশ্বকে কোন একটা উপায়ে অস্বীকার করা। ইহার কোনটিই সমস্যা সমাধানের পথ নয়। বিরোধে যে সমস্যা জাগে মিলনে তাহার সমাধান হয়। আর কোন পথ নাই। মিলন বোধের রূপ বিচিত্র হইতে পারে, কিন্তু উহাই তাহার একমাত্র নিয়তি। ভাবাতিরেকে যখন হৃদয় ভাঙিয়া পড়িয়াছে কবি তখন ওই হৃদয়কেই একেবারে নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয় নিরুদ্ধ করিয়া সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের সেই আকাক্ষা—

"আজ রাতে রব শুধু চাহিয়া চাঁদের পানে
আর কিছু নয়।" (শান্তি গীত)

ব্যক্তি ও বিশ্বের এই বিরোধটিকে লোপ করিয়া দিতে কবি কখন নিখিল বিশ্বকে আত্মসাৎ করিতে চাহিয়াছেন। একটি ভাব-লোকে বহির্বিশ্বকে আত্মসাৎ করা কোথাও সম্ভব হইলেও তাহা একটি স্বল্পকাল স্থায়ী ভাব-তন্ময় অবস্থা মাত্র।

তাহা পূর্ণ সামঞ্জস্য তত্ত্ব নহে। 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র মধ্যে এই জাতীয় অতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার একটি রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়।

"প্রাণের প্রাণের মাঝে কী করিলে তোমারে গো পাই।" (অসহ্য ভালোবাসা)

প্রাণ যেমন বিচিত্র ভাব জাগাইয়া সর্ববিধ সামঞ্জস্য ভাঙ্গিয়া দেয়, তেমনি বিশ্ব-প্রাণের যোগে অন্তরের মধ্যে আবার ধীরে ধীরে একটি সুষমা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এই আন্তর সুষমার সহিত পরিণামে বিশ্ব-সুষমার মিলন ঘটে।

ব্যক্তি-চেতনা মুক্ত হইলে যে সকল সমস্যার সমাধান ঘটে, ওই মুক্তি লাভের জন্য যে বিশ্বকে আশ্রয় করিতে হয়, বিশ্বের সহিত ব্যক্তির পূর্ণ মিলনে যে মানুষ পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ পায়, জীবনের সর্ববিধ সমস্যার সমাধান যে কেবল ওই পরিণাম লাভে ঘটিতে পারে, এমনি এক প্রকার বোধ যত অসম্পূর্ণ এবং অস্ফুট ভাবে হোক না কেন কবি ওই কৈশোরেই কেমন করিয়া লাভ করিয়াছিলেন!

ব্যক্তি-চেতনা মুক্ত হইয়া যে বিশ্বের সহিত মিলিত হইতে হয় তাহারই স্থির প্রত্যয়।

"বিশ্ব চরাচর ময় উচ্ছ্বসিবে জয় জয়
উল্লাসে পুরিবে চারিধার,"—(সংগ্রাম-সঙ্গীত)

ভাব মুক্ত হইয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার জন্য কবি কখন কখন ভীষণ বিক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

"যত আছে প্রতিধ্বনি বিষম প্রমাদ গণি
একেবারে সমস্বরে
কাঁদিয়া উঠিবে যন্ত্রণায়,—"(দুঃখ-আবাহন)

প্রাণের এই জাগরণের পূর্বে শৈশবে কবি যে সৌন্দর্য সাক্ষাৎ করিতেন, তাহাতে বেদনা বোধ ছিল না বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণতর সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারও নয়।

প্রাণের জাগরণে সকল অসামঞ্জস্য বোধ যেন মুহূর্তে ভাঙিয়া যায়, মনে হয় যেন সৌন্দর্য বোধ পর্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই অসহনীয় বেদনা বোধের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনার ধীর বিকাশ ঘটে। তাহার পর আবার ওই বিশ্ব-প্রাণের সহিত গভীরতর মিলন বোধের ভিতর দিয়াই হৃদয়ে এক পূর্ণতর নূতনতর সামঞ্জস্য বোধ ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতে থাকে।

'আমি হারা' কবিতাটির মধ্যে কবি প্রাণের জাগরণের পূর্বে এবং ওই

জাগরণ মুহূর্তের উপলব্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন। ওই বেদনার সমুদ্র পার হইয়া মানব চেতনা যে শাশ্বত আনন্দ ও সৌন্দর্য-লোকে উত্তীর্ণ হয়, এক্ষেত্রে অবশ্য তাহার কোন পরিচয় থাকিতে পারে না। তাহা অনেক পরের কথা।

বলিয়াছি, শৈশবে প্রকৃতির সহিত কবির একটি অনায়াস সুখের সম্পর্ক ছিল। প্রকৃতি তাহার অপার বিস্ময়, মাধুর্য এবং অফুরন্ত প্রাণ লইয়া কবি-চিত্তকে ভরপুর করিয়া রাখিয়াছিল।

প্রাণের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে কবির সত্তা বৃহৎ বহির্বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ বিছিন্ন হইয়া আসে। এক অন্ধকারের আবেষ্টনী, কবির চেতনা তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আর্তনাদ করিয়া ফিরিয়াছে। বৃহৎ বহির্বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার অতি তীব্র বাসনা, কিন্তু এই আবেষ্টনী হইতে বাহিরে আসিবার পথ কবির নিকট হারাইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মধ্যে কবির সেই নিরুদ্ধ চেতনার কান্না পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। সন্ধ্যাসঙ্গীতের প্রত্যেকটি কবিতার এই একই ভাব। আশ্চর্য কবির স্থির দৃষ্টি। এই অবস্থায় কবির বোধ কিন্তু কিছুমাত্র বিপর্যস্ত হয় নাই; বরং ফিরিয়া ইতিপূর্বের জীবন পর্যায়ের সহিত এখনকার জীবন পর্যায় তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন। 'আমি-হারা' কবিতাটি এই প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ পাঠ করা যাইতে পারে। ইতিপূর্বে প্রকৃতি কোন্ স্বরূপ লইয়া প্রতিভাত হইত তাহার একটি পরিচয় বর্তমান কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে। জীবনস্মৃতির মধ্যে কবি অতি সমৃদ্ধ প্রকাশ রীতিকে আশ্রয় করিয়া ইহার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহার অসার্থক পুনরাবৃত্তি এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

আজ সেই সৌন্দর্য-লোক হইতে কবি-চেতনা স্খলিত হইয়া আসিয়াছে—

"হৃদয়ের অরণ্য আঁধারে।
দুজনে আইনু পথ ভুলি।" (আমি হারা : সন্ধ্যাসঙ্গীত)

এবং "আজি চারিদিকে মোর এ কী অন্ধকার ঘোর,—"
(আমি হারা : সন্ধ্যাসঙ্গীত)

কিংবা "হৃদয়ে যে ছবি ছিল ধূলায় মলিন হল,
আর তাহা নাহি যায় চেনা।" (আমি হারা : সন্ধ্যাসঙ্গীত)

জ্যোৎস্না প্লাবিত মধুর নিশীথিনীর সৌন্দর্য কবিকে দূর হইতে হাতছানি দিয়া পুরানো নাম ধরিয়া ডাকে, কিন্তু কী এক বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া তিনি সেই আহ্বানে এখন আর সাড়া দিতে পারেন না।

"এমন মধুর রজনীতে
একেলা রয়েছি বসিয়া,
যামিনীর হৃদয় হইতে
জোছনা পড়িছে খসিয়া।"
(সুখের বিলাপ ঃ সন্ধ্যাসঙ্গীত)

প্রভাত সঙ্গীতের মূল যে ভাবনা তাহার প্রকাশ ঘটিয়াছে 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' কবিতা হইতে পরবর্তী প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র পূর্বে একটি মাত্র কবিতা আছে, 'আহ্বান সঙ্গীত'। এই কবিতাটি বস্তুত 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' পর্যায়ের। সন্ধ্যাসঙ্গীতের মূল বেদনাই করিতাটির মধ্যে ফিরিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

কবি ইহাও বোধ করিয়াছেন, যে এই রূপময় জগৎ প্রতিভাস স্বরূপে সত্য। কোন এক পরম তত্ত্বের সূত্রে আবদ্ধ হইয়া এই অনন্ত কোটি বিচ্ছিন্ন রূপের আশ্চর্য প্রকাশ, এবং ওই বিচিত্র রূপ তাহাকে আভাসিত করিয়া তুলিতেছে। কবি তাই কোন কালেই এই প্রতিভাসকে আশ্রয় করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই।

"তোমারে যে পূজা করি, তোমারে যে দিই ফুল,
ভালোবাসি বলে যেন কখনো ক'রো না ভুল।
যে জন দেবতা মোর কোথা সে আছে না জানি,
তুমি তো কেবল তার পাষাণ-প্রতিমাখানি"। (পাষাণী)

বহির্বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাতে কবির অন্তর্লোক ধীরে ধীরে ঐশ্বর্য মণ্ডিত হইয়া উঠিতেছে। এই ঐশ্বর্য সাক্ষাৎ করিয়া কবি ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত পুলকিত অন্যমন হইয়া পড়েন। সমুদ্রনিহিত অপার ঐশ্বর্য যেমন ঢেউএ ঢেউএ প্রহত হইতে হইতে বেলা-ভূমিতে বিকীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি কবির চিত্ত-সমুদ্রের অপার সৌন্দর্য বহির্বিশ্বের তটে আছড়াইয়া পড়িয়া একে একে ছড়াইয়া যাইতেছে।

অন্তরের এই জাগরণ যতই সম্পূর্ণ হইতে থাকে, বাহিরের সৌন্দর্য্য-লোক ততই বাড়িয়া যায়। সামঞ্জস্য বোধ যেমন, সৌন্দর্য বোধও তেমনি ব্যক্তি ও বিশ্বের যোগে গড়িয়া উঠে। বস্তুত যাহা সামঞ্জস্য তাহাই সুষমা বা সৌন্দর্য।

ইন্দ্রিয় দ্বারে প্রাণের সেই প্রথম জাগরণ বলিয়া প্রেম-বোধে কেবল প্রবৃত্তির দাহ, ইন্দ্রিয় নিপীড়নের অসহনীয় জ্বালা।

"প্রণয় অমৃত একি ? এযে ঘোর হলাহল—
হৃদয়ের শিরে শিরে—প্রবেশিয়া ধীরে ধীরে
অবশ করেছে দেহ শোনিত করেছে জল।" (হলাহল)

বিচ্ছেদ-আকীর্ণ এই জীবনে স্মৃতি তাই একমাত্র সম্বল। উহারই আলোকে জীবনে পথ চলিতে হয়। সত্যদিক্‌দর্শী প্রেম।

"এই যে ফিরানু মুখ চলিনু পুরবে
আর কিরে এ জীবনে ফিরে আসা হবে।" (দু-দিন)

জীবনে প্রেম এমনি অসহায়। কাহাকেও আমরা চিরকাল বাহু বেষ্টনে ধরিয়া রাখিতে পারি না। পথের বিচিত্র আকর্ষণে কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ি। দূরে নির্জন অবসরে তাহারই ব্যাকুল মিনতি বিজড়িত অসহায় মুখ হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। নিদ্রায় সে বেদনা জাগিয়া উঠিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে থাকে; —যেন একেবারে মর্মস্থল ভেদ করিয়া সেই হাহাকার উঠে; 'তোমাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা নাই'—একান্ত অবোধ অসহায় সেই আকাঙ্ক্ষা।

'শত ফুলদলে গড়া সেই মুখ তার,
স্বপনেতে প্রতি নিশি হৃদয়ে উঠিবে ভাসি
এলানো আকুল কেশে, আকুল নয়নে।

* * *

চমকি উঠিব জাগি শুনি ঘুম ঘোরে,
"যাবে তবে যাবে ?" সেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে।" (দু-দিন)

প্রাণের এই ধীর জাগরণের ভিতর দিয়া মানব-চেতনার বিকাশ ঘটে। প্রাণের জাগরণের ভিতর দিয়া চেতনার সেই ধীর বিকাশ—

"আগে কে জানিত বল কত কী লুকানো ছিল হৃদয়-নিভৃতে,
তোমার নয়ন দিয়া আমার নিজের হিয়া পাইনু দেখিতে।" (উপহার)

সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাণ ব্যক্তিচেতনায় আপনাকে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করে। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের যোগ যত সম্পূর্ণ হয় অন্তরে সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ ততই ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করিতে থাকে। এই ন্দও প্রেমের বোধ 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে'র মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও অন্তরের মধ্যে কোন একটি রূপ তাই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে না, বারবার খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে। এই রূপটিই (একটি ভাবের আকর্ষণে একটি আনন্দের টানে খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ আবর্তিত হইতে হইতে একটি

পূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠে) অধ্যাত্ম সত্তা ; ইহার যোগে বিশ্বের সকল রূপের সহিত কবি প্রাণের মিলন ঘটে। কবির সেই অপর সত্তার বিকাশ এক্ষেত্রে একান্ত অসম্পূর্ণ। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যেও এই রূপ একটা আভাসে ফুটিয়া উঠিতে চাহিয়া আবার ভাঙিয়া পড়িয়াছে।

"যবে এই নদী তীরে বসি তোর পদতলে
তারা সবে চলে আসে,
প্রাণেরে ঘিরিয়া চারি পাশে।
হয় তো একটি হাসি একটি আধেক হাসি
সমুখেতে ভাসিয়া বেড়ায়,
কভু ফোটে, কভু বা মিলায়।" (সন্ধ্যা)

এইকালে কবির অন্তরে যে সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহা একান্ত অসম্পূর্ণ, এতই ভঙ্গুর—

"অনন্ত এ আকাশের কোলে
টল্‌মল্ মেঘের মাঝার
এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর—" (গান আরম্ভ)

এই সৌন্দর্য্য-লোক তো বিশ্বপ্রাণের যোগে সত্য নয়। ইহা কেবল ভাব কল্পনায় গড়িয়া তোলা, তাহাও আবার একান্ত দুর্বল।

যত অসম্পূর্ণ হোক-না-কেন একটা সামঞ্জস্য বোধ কোন-না-কোন রূপে সকল সময় মানব চেতনায় থাকে। প্রাণের আন্দোলনে যে সৌন্দর্য সম্পদ হৃদয়-তটে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহা কুড়াইয়া লইয়া কবি আপনার অন্তরে একটি নিভৃত সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। ওই সৌন্দর্য-ধ্যানে অন্তত মুহূর্তের জন্যও কবি তন্ময় হইয়া যাইতেন। ওইকালে আর প্রাণের বিক্ষোভ অনুভূত হইত না।

"এ আমার প্রেমের আলয়,
এ মোর স্নেহের নিকেতন,
বেছে বেছে কুসুম তুলিয়া
রচিয়াছি কোমল আসন।
* * *
এমনি হয়েছে শান্ত মন
ঘূচেছে দুঃখের কঠোরতা—" (আবার)

এই সামঞ্জস্য বোধ একান্ত অসম্পূর্ণ বলিয়া আবার মুহূর্তে ভাঙিয়া পড়ে।

"আবার আশ্রয় হারা ঘুরে ঘুরে হই সারা
ঝটিকার মেঘখণ্ড সম—" (আবার)

শৈশবে প্রকৃতির সহিত কবির একটি সহজ আনন্দের সম্বন্ধ ছিল। সমগ্র পৃথিবী বিচিত্র জীবনোল্লাসে কবির মনে সাড়া জাগাইয়া তুলিত। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এবং রাত্রির অন্ধকার কবির মনে অতলের রহস্য সঞ্চার করিয়া দিত।—রূপকথার সৌন্দর্য দিয়া গড়িয়া তোলা এক অপূর্ব দেশ।

যৌবনের প্রথম উন্মেষের কালে হৃদয় একান্ত হইয়া বাহিরের সঙ্গে জীবনের সেই সহজ যোগটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। চেতনা তখন আপনার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া ব্যথিত রুগ্ন হৃদয়টিকে আবেষ্টন করিয়া ঘুরিয়া মরিতে থাকে। এই যোগ বিচ্ছিন্ন, অসামঞ্জস্য জনিত বেদনা সন্ধ্যা সঙ্গীতের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

কবি মনের ইহা একটি অত্যন্ত অব্যবস্থার কাল। কবির পনেরো যোল হইতে আরম্ভ করিয়া বাইশ তেইশ বৎসর পর্যন্ত এই অবস্থা একপ্রকার স্থায়ী ছিল। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থার কালে মনোলোকের ভাবনাগুলি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শূন্য হইয়া নানা অদ্ভুত অস্বাভাবিক আকার ধারণ করে। এই সকল ভাবনার উদ্দেশ্য কি, ইহার চরিতার্থতা কোথায়, তাহা কেমন করিয়াই বা সাধন করা যাইতে পারে তাহার সুস্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না বলিয়া তাহা সমগ্র সত্তাকে অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও পীড়িত করে।

বহির্বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাত ও সামঞ্জস্য স্থাপনের ভিতর দিয়া এই ভাবগুলি আপনার সহজ সম্বন্ধ লাভ করে। অন্তর্মুখীন অসুস্থ এই সকল ভাবনা বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ স্থাপনের ভিতর দিয়া ক্রমে মঙ্গলময় আনন্দময় পরিণাম লাভ করে।

মানব চেতনা বিকাশের ক্ষেত্রে ইহা একটি অনিবার্য পর্যায়। এই বেদনালোক পার হইয়া ব্যক্তি যখন বাহিরের জগৎকে ফিরিয়া লাভ করে তখন তাহা আর পূর্বের জগৎ থাকে না, তাহা অনেক বেশি সৌন্দর্য ও মাধুর্য, অনেক গভীর তাৎপর্য মণ্ডিত হইয়া দেখা দেয়।

হৃদয় অরণ্য হইতে বাহিরে আসিয়া কবির বিশ্বের সহিত পুনর্মিলনের সেই আনন্দোচ্ছ্বাসের পরিচয় রহিয়াছে পরবর্তী কাব্য প্রভাত সঙ্গীতের মধ্যে।

প্রভাত সঙ্গীত

'প্রভাত সঙ্গীতে' আসিয়া কবি-চেতনা কতকটা হৃদয়াবেগ মুক্ত হইয়াছে। কবি-চেতনা কেমন করিয়া এই মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইল, এই মুক্তির স্বরূপই বা কি! তাহার পরিচয় লাভের পূর্বে কবিকে এই মুক্তি লাভের জন্য যে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল তাহার কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

হৃদয়াবেগের আবর্তের মধ্যে পড়িয়া একদিকে ব্যক্তির অসহনীয় বন্ধন নিপীড়ন,

"ভূমিতে পড়িয়া আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত—" (আহ্বান সঙ্গীত)

অন্যদিকে নিখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত করিয়া দেশ-কালের উভয় তীর পূর্ণ করিয়া অনন্ত প্রাণ-ধারা সংখ্যাতীত রূপের ঢেউ তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

"অসীম আকাশে, স্বাধীন পরাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে।" (আহ্বান সঙ্গীত)

ব্যক্তির আবেষ্টন মুক্ত হইয়া মানবীয় চেতনা যখন বিশ্ব-চেতনা লাভ করিতে পারে, অর্থাৎ বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দনের সহিত ব্যক্তির প্রাণ-স্পন্দন যখন সম্পূর্ণরূপে মিলিয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্তির আস্বাদ পায়। কবি এই অপরিণত বয়সেও এমন স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় লাভ করিয়াছেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়! ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, যে কবি আপনার সাধন পথ সম্পর্কে প্রথম হইতেই একপ্রকার নিঃসংশয় ছিলেন।

এই পরিণাম লাভ করিলে মানুষ আপনার চেতনাকেই বিশ্বের অনন্ত কোটি রূপের মধ্যে লীলায়িত দেখে। এক জ্যোতি সমুদ্রে এই অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র বুদ্বুদের মত মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার হারাইয়া যাইতেছে। কে যেন অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া দেশ-কালের বক্ষে আগুনের ফুল ঝুরি জ্বালাইয়া দিয়াছে! এই সংখ্যাতীত গ্রহ নক্ষত্র তাহারই এক একটি অগ্নি কণিকা—মহাশূন্যে আলোর কুসুম ফুটাইয়া নিমেষে ঝরিয়া যাইতেছে।

"শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়;" (স্রোত)

এই যে সৃষ্টি-লোক জুড়িয়া অনন্ত প্রাণ-ধারা নিত্যকাল ছুটিয়া চলিয়াছে, ইহার কি কোন উদ্দেশ্য আছে? ব্যক্তি ও বিশ্বের স্বরূপ কি? ব্যক্তি ও বিশ্ব অন্যোন্য নির্ভরশীল হইয়া কোন্ গূঢ় অভিপ্রায় সার্থক করিয়া তুলিতেছে? এই সমস্ত জিজ্ঞাসার কোন উত্তর লাভ না ঘটুক, (তাহা অনেক পরের কথা) কবি অন্তত জীবের নিয়তি সম্পর্কে এই কালেই একপ্রকার নিঃসংশয় হইয়াছেন। সেই পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা—

"জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না" (স্রোত)

আমাদের সকল বেদনার সকল অপরাধের মূলে আছে এই বিচ্ছিন্ন বোধ। এই সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া কবি আপনার সঙ্কীর্ণ ভাব-লোক হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

এক দুর্লভ মুহূর্তে আকস্মিক ভাবে কবি-চেতনা ভাবাবেগ মুক্ত হইয়া কল্পনায় বিশ্ব-বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। বিশ্ব-বিহারের সে পরিচয় রহিয়াছে বিশেষ করিয়া 'নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ' এবং 'প্রভাত উৎসবে'র মধ্যে।

"আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।" (নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ)

মুহূর্তের এই বন্ধন-মুক্তির অসহনীয় আনন্দ-আবেগকে কবি এমনি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা একপ্রকার ভাব-যোগে এবং কল্পনায় বিশ্বকে আলিঙ্গন করা।

"হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি হেথা করিছে কোলাকুলি।

* * *

পরাণ পুরে গেল হরষে হল ভোর
জগতে যারা আছে সবাই প্রাণে মোর।

* * *

জগৎ আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একী গান।" (প্রভাত উৎসব)

যে কবি-কল্পনা 'সন্ধ্যা সঙ্গীতে' দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ হইয়াছিল, 'প্রভাত সঙ্গীতে'

সেই কবি কল্পনা মুক্তিলাভ করিয়া অমন জল-স্থল-অন্তরীক্ষে বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। 'প্রভাত সঙ্গীতে'র মধ্যে কবি কল্পনার প্রথম মুক্ত বিহার।

কোন এক অপার্থিব জগৎ হইতে কবি-চেতনার উপর আলোক আসিয়া পড়িয়া সমস্ত জগৎময় ঠিকরাইয়া পড়িয়াছে। সে আলোকে ধরিত্রী এক দিব্য আভা বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কবির অন্তর ও বহির্জগৎ এক আনন্দের ধারায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। পরিব্যাপ্ত আলোকে ও আনন্দে কবি একটির পর একটি গানের কুসুম ফুটাইয়া ঝরাইয়া দিয়াছেন।

"মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি-ফুলের হাসি—
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো হাসিতে চায়।" (সাধ : প্রভাত সঙ্গীত)

বিচিত্র কল্পনা বিলাস এবং সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবির মানস-লোক কিছুটা সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। 'কড়ি ও কোমলে' কবি অন্তর ও বহির্জগতের মধ্যে একপ্রকার সংযোগ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের এই মিলন অনুভূতিই রবীন্দ্র-কাব্যে গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে।

এই কালে কবির জ্ঞানের বিকাশও অনেকটা ঘটিয়াছে। বিশ্ব-সত্তার যে স্বরূপ কবি কল্পনা করিয়াছেন, তাহার যে আভাস অন্তরে লাভ করিয়াছেন, তাহাকে তিনি সেই প্রথম নানা দার্শনিক চিন্তার সহায়তায় বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই দার্শনিক চিন্তা গুলির তাই কিছু বিচার ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

আমরা প্রতিমুহূর্তে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি, উপলব্ধি করিতেছি তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে না, অন্তরে তাহাদের স্মৃতি রহিয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া আমাদের অন্তরে একটি ভাব-জীবন ধীরে গড়িয়া উঠে। আমাদের অলক্ষ্যে এক অজ্ঞাত নিয়মে এই ভাব-লোক গড়িয়া উঠে। যে গুহাবাসী শিল্পী অন্তরে এই ভাব-লোক গড়িয়া তুলেন তাঁহার স্বরূপ যেমন আমরা জানি না, তেমনি তাঁহার যে গোপন অভিপ্রায়ের ভিতর দিয়া এই ভাব-লোক গড়িয়া উঠে, সেই অভিপ্রায়ও আমাদের অজ্ঞাত।

"স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—" (অনন্ত জীবন)

ভাব বা স্মৃতি-লোকের এই তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি উহারই বিকল্প স্বরূপে আর একটি তত্ত্ব গড়িয়া তুলেন। বিশ্বে যাহা কিছু বিনষ্ট হইতেছে, তাহা সম্পূর্ণ রূপে বিনষ্ট হইতেছে না। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া এক আশ্চর্য উপায়ে আর একটি মহাদেশ গড়িয়া উঠিতেছে। ব্যক্তির সেই ভাব-জীবনটি যেমন, বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে সেই মহাবিশ্বটি তেমনি শাশ্বত কাল ধরিয়া কেবলই গড়িয়া উঠিতেছে। ব্যক্তি ও বিশ্বের এই শাশ্বত সত্তায় কি কোন মিল আছে? মিলনের সেই তত্ত্বটি কি?

"জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ—" (অনন্ত জীবন)

ভাব-লোকের ধীর বিকাশ লক্ষ্য করিয়া কবি তাহারই বিকল্প স্বরূপে অনন্ত জীবনের এমনি এক প্রকার বোধ গড়িয়া তুলিয়াছেন বলিয়া ব্যক্তি ও বিশ্বাত্মা কবির নিকট অমন বিকাশ ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

'অনন্ত মরণ' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই উপলব্ধিটিকেই আর একটি বিশিষ্ট উপায়ে প্রকাশ করিয়াছেন।

"মুহূর্ত কালীন মৃত্যু পরম্পরা নিয়ে মর্ত-জীবন এই যেমন বেড়ে চলেছে প্রবাল দ্বীপের মতো, তেমনি মৃত্যুর পর মৃত্যু আমাকে দিয়ে লোক-লোকান্তরের জাল বিস্তার করে চলবে—।"

ইহলোকে অথবা লোকান্তরে বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীবনের যে বিকাশ ঘটিতেছে, এমনি একপ্রকার বোধ কবি লাভ করিয়াছেন, কিন্তু এই বিকাশের স্বরূপ কি, এই বিকাশের ভিতর দিয়া জীবের কোন্ নিয়তি-রূপ সার্থক হইয়া উঠিতেছে, সে উপলব্ধি কবির জীবনে আজও ঘটে নাই। 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে কবির আর একটি দার্শনিক বোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

সৃষ্টির এই নিত্য প্রবাহ যেন কোন কেন্দ্রস্থলে অবিরাম নিপতিত হইতেছে, আর সেই কেন্দ্রস্থল হইতে তাহারই প্রতিধ্বনি আলো রূপে, ধ্বনি রূপে প্রকাশিত হইতেছে।

কবি ইহা বোধ করিয়াছেন, যে এই খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপের অন্তরালে একটি

পরম কোন তত্ত্ব রহিয়াছে, এই তত্ত্বে অনন্তকোটি রূপ-লোক বিধৃত। বিচ্ছিন্ন এই সৌন্দর্য সেই পরম তত্ত্বের আভাস স্বরূপে সত্য।

"সৌন্দর্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া
একি তোরি ছায়া।" (প্রতিধ্বনি)

ইহাও কবি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, যে মানব অন্তরে যে ব্যাকুলতা তাহা এই বিচিত্র রূপের অন্তরালবর্তী তত্ত্ব লাভের জন্য।

প্রভাত সঙ্গীতের মধ্যে কবি কতকটা আকস্মিক এবং অলৌকিক উপায়ে কেবল আপনার একান্ত সীমিত বোধের জগৎ হইতে বাহির হইয়া বিপুল বিশ্বের মাঝখানে আসিয়া পড়িলেন তাহাই নয়, সেই সঙ্গে সকল রূপের অতীত সত্তাকে নিঃসংশয়ে অপরোক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কবির নিকট বৃহৎ বিশ্ব সেই প্রথম অখণ্ডরূপে অনুভূত হয়। অসীমের যোগে সেই প্রথম অন্তহীন বৈচিত্রপূর্ণ সীমার জগৎ একটি সামগ্রিক রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। এই সাক্ষাৎ-কারের আলৌকিক আনন্দ প্রভাত সঙ্গীতের কতকগুলি কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিতে চাহিয়াছে।

তিনি এই সময়েই প্রথম বোধ করেন অসীমের অনির্বচনীয় আনন্দই দেশকালের মধ্যগত গণনাতীত রূপের ভিতর দিয়া নিয়তই প্রকাশ লাভ করিতেছে। সঙ্গীতকারের অরূপ আনন্দ যেমন সঙ্গীত-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করে, ইহাও কতকটা তেমনি। আবার বিশ্বের রূপের ধারা নিয়ত ছুটিয়া চলিয়াছে সেই অসীম বা অরূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য। সঙ্গীতের রূপও তেমনি সঙ্গীতকারের চিত্তে রূপহীন আনন্দ রূপে ফিরিয়া আসে।

এই যে অসীম নিয়ত আপনাকে সীমারূপে প্রকাশ করিতেছেন, ইহাকে তিনি বলিয়াছেন 'ধ্বনি'। আবার সীমা যেখানে অসীমের মধ্যে বিলীন হইবার জন্য নিত্য উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তাহাকে তিনি বলিয়াছেন 'প্রতিধ্বনি'। অসীমের সীমারূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার এই ব্যাকুলতাই প্রেম। প্রেম তাই একটি নির্দিষ্টতাকে, সুস্পষ্ট আকারকে, একটি নিয়ম শৃঙ্খলাকে লাভ করিতে চায়। ইহাই মঙ্গল, ইহাই সত্য। সীমার অসীমের দিকে অভিসারকে বলে সৌন্দর্য। ইহাকে তাই একটি সুনির্দিষ্টতার মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারা যায় না। সৌন্দর্যবোধ তাই মানব চেতনাকে এমন করিয়া ঘর ছাড়া, উদ্‌ভ্রান্ত, মদির বিহ্বল করিয়া তুলে।

অখণ্ড রূপের এই তত্ত্বটিকে আর একটি দিক হইতে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। ইন্দ্রিয় চেতনা আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে যে বিচিত্র, বিচ্ছিন্ন, খণ্ড সৌন্দর্য সঞ্চিত হইতে থাকে, কোন একটা আবেগ মুহূর্তে ওই সমস্ত খণ্ড সৌন্দর্য এক একটি অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করে।

অন্তরের মধ্যে এই যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য এক একটি দিব্য মুহূর্তে পরিপূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠে, তাহার দার্শনিক স্বরূপ কি? ইহা সেই গূঢ় প্রেরণার মুহূর্ত যে মুহূর্তে উর্দ্ধতর চেতনার অতি চকিত আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়।

ইন্দ্রিয় আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে যেমন বিচিত্র সৌন্দর্য গড়িয়া উঠিতেছে, তেমনি উর্দ্ধ পরিণাম লাভের প্রেরণায় ওই বিচিত্র সৌন্দর্য এক একটি সুষমা মণ্ডিত হইয়া যাইতেছে। অধ্যাত্ম সত্তায় এই দুইটি প্রক্রিয়া যুগপৎ চলিতে থাকে যে পর্যন্ত না মানস-লোকের পূর্ণ জাগরণ ঘটে।

কবি-মানসের পরিণাম ধারা এই দুই দিক হইতে আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে। একদিকে ইন্দ্রিয় চেতনা আশ্রয় করিয়া অন্তরে সৌন্দর্য আহরণ, অন্যদিকে উর্দ্ধতর চেতনার প্রেরণায় আর এক সুষমা মণ্ডিত খণ্ড রূপের সৃষ্টি। কবির সৃষ্ট বিচিত্র খণ্ড-রূপ তাই অরূপের সিম্বল বা প্রতীক হইয়া উঠে।

'অনন্ত জীবন' 'অনন্ত মরণ' ও 'প্রতিধ্বনি' কবিতা তিনটির মধ্যে একটি সাধারণ ভাব লক্ষ্য করা যায়। এই জীবনে যেমন এই জগতে তেমনি কোন কিছু হারাইয়া যাইতেছে না। ব্যক্তির প্রতি মুহূর্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা, ভাবনা-চিন্তা, আনন্দ-বেদনার ভিতর দিয়া অন্তরে একটি স্থায়ী সত্তা ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে, সে সত্তা মৃত্যুঞ্জয়ী, জন্ম জন্মান্তর ব্যাপ্ত; তেমনি বহির্বিশ্বের নিয়ত উঠা-পড়া, ভাঙ্গা-গড়া, সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া বিশ্বাত্মা ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে। বিশ্বের যোগে ব্যক্তি-সত্তার প্রকাশ, তাহার বিচিত্র সৃষ্টি বলিয়া বিশ্বাত্মায় সকল ব্যক্তি-সত্তার সহিত তাহাদের সকল সৃষ্টি-রূপও কোন-না-কোন স্বরূপে রহিয়া যাইতেছে, তাহাদের একান্ত বিনষ্টি ঘটিতেছে না।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, পরবর্তী জীবনে কবির এই উপলব্ধি যেমন গভীরতর ও স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে, তেমনি ইহাকে তিনি নানা রূপে ব্যক্ত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের একটি দিক অর্থাৎ সকলের যোগে সমস্ত কিছুর যে অস্তিত্ব, তাহার নিঃসংশয় উপলব্ধি কবি এই জীবন-পর্যায়েই একপ্রকার লাভ করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে পরিশেষে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি। কবিতাটির নাম 'মহাস্বপ্ন'। এক শাশ্বত চেতনার বক্ষে রূপের বিচিত্র লীলা—

"এক শুধু পরাতন, আর সব নূতন নূতন
এক পুরাতন হৃদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।" (মহাস্বপ্ন)

ইহার মধ্যে

"অপূর্ণ স্বপন সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা তরে পাইতেছে কত না প্রয়াস।" (মহাস্বপ্ন)

বিশ্বের এই সৃজন-প্রলয়-লীলা, বারংবার এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া জীব পূর্ণতা লাভের জন্য সাধনা করিতেছে। জীবের এই নিয়তি সম্পর্কে কবির দৃষ্টি কখন বিচলিত হয় নাই। এই মূল উপলব্ধি আশ্রয় করিয়া কবির জীবনে একটির পর একটি দার্শনিক জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। এই সমস্ত উপলব্ধি শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে।

ছবি ও গান

কবি-চেতনা হৃদয়াবেগ মুক্ত হইয়া উহারই অসহনীয় আনন্দ নিপীড়নে একযোগে সমস্ত কিছু লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় বিশ্বময় বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। কিন্তু এমনি করিয়া সমস্ত কিছু একত্রে লাভ করিবার চেষ্টা করিলে কাহাকেও লাভ করিতে পারা যায় না।

একটি সীমাবদ্ধ রূপ আশ্রয় করিয়া মন প্রথমে ধ্যান তন্ময় হয়, তাহার পর গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উহা পরিণামে সকল রূপের মর্মস্থলে পৌঁছাইয়া যায়, যেখানে এই নিখিল বিসৃষ্টি প্রস্ফুটিত গোলাপের মত একটি চেতনাবৃন্তে বিধৃত হইয়া আছে। ইহাকে বলিয়াছি বিশ্বাত্মা। মানবীয় চেতনা এইরূপে এক একটি বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া পরিণামে তাহার সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। বিশ্বকে লাভ করিবার ইহাই একমাত্র পথ। যে মন রূপ ইহাতে রূপে বিহার করিয়া ফিরে সে মন কখন ওই পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

বিশ্ব পরিণাম লাভ অনেক পরের কথা, ধ্যান তন্ময়তা না থাকিলে কোন রূপ স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। মানবীয় চেতনা যতই ধ্যান তন্ময় হইতে থাকে ততই রূপের গভীরে একটির পর একটি অপরূপ সৌন্দর্য-লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

'ছবি ও গানে'র মধ্যে কবিচেতনা এক একটি রূপ আশ্রয় করিয়া ধ্যান তন্ময় হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টা কবির ওই বয়সে যত অসম্পূর্ণ হোক তাহা বড় কথা নয়, বিচারের কথাও নয়। আমাদের যাহা লক্ষ্য করিতে হইবে তাহা ওই পথ ও প্রয়াসের রূপ। 'ছবি ও গানে'র সৌন্দর্য কল্পনা ভিত্তিহীন অর্থাৎ বাস্তব প্রেরণা শূন্য বলিয়া ছবিগুলি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। বাস্তব প্রেরণা শূন্য বলিয়া রূপ-সৃষ্টির সহিত কবির অন্তরের ধ্যানের মিলন ঘটে নাই।

বাস্তব সৌন্দর্যের সীমা-বেষ্টনীতে অন্তরের ধ্যানই আগুন ধরাইয়া দেয়, এই অগ্নির অসহনীয় উত্তাপে রূপ সীমা হারাইয়া অরূপে বিগলিত হইয়া যায়।

রূপগুলি যেমন বাস্তব ভিত্তিহীন, কবির অন্তরের ভাবনাগুলিও তেমনি জীবনাশ্রয়ী নহে, কল্পনার উত্তাপে একান্ত স্ফীত। জীবনের সহিত জগতের নিবিড় মিলনের অনুভূতি 'ছবি ও গানে' কোথাও সত্য হইয়া উঠে নাই।

সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বপ্ন বিহ্বলতা এবং কল্পনা যোগে বিশ্ব বিহার বলিতে কী বুঝাইতে চাহিয়াছি, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি অংশ পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যাইবে।

একটি কবিতার নাম 'জাগ্রত স্বপ্ন'। জাগ্রত স্বপ্নই বটে। ইহা খাঁটি সৌন্দর্য-ধ্যান কিংবা ওই জাতীয় সৌন্দর্য তন্ময়তা নহে। এক প্রকার মধুর কল্পনা বিলাস মাত্র। খাঁটি সৌন্দর্য-ধ্যানে দেহ-প্রাণ-মনের সকল বৃত্তি একমুখীন হইয়া দীপ্ত শিখায় জ্বলিয়া উঠে।

"চারিদিকে মোর বসন্ত হসিত,
যৌবন-কুসুম প্রাণে বিকশিত,
কুসুমের পরে ফেলিব চরণ,
যৌবন-মাধুরী ভরে—।" (জাগ্রত স্বপ্ন)

'পাগল' ও 'মাতাল' এই দুইটি কবিতায় কবির এই স্বপ্ন বিভোরতার বিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আমি ওই দুইটি কবিতা হইতে দুইটি অংশ কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

"সে যেন গানের মতো প্রাণের মতো শুধু
সৌরভের মত উড়ছে বাতাসেতে,—" (পাগল)

কিংবা

"বুঝিরে চাঁদের কিরণ পান করে ওর ঢুলুঢুলু আঁখি দুটি
কাছে ওর যেয়ো না,
কথাটি শুধায়ো না,
ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে বসে আছে একাকী।" (মাতাল)

ইহা কবির বয়ঃসন্ধিকাল, কৈশোর অতিক্রম করিয়া কবি সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন; সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ তাই ক্ষীণ ভাবে জাগ্রত হইবেই। তবে তাহার বিষক্রিয়ার সহিত কবিকে তখনও সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই। বিষক্রিয়া বলিতে প্রাণ-মনের অতি তীব্র বিক্ষোভের কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছি। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র মধ্যে তাহার পরিচয় একান্ত স্পষ্ট

হইয়া আছে। এক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও প্রেমের সত্য জাগ্রত বোধ বহির্লোকে অমনি কল্পনা আশ্রয় করিয়া চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে।

"বাঁধিবে সে বাহু পাশে চোখে তার স্বপ্ন ভাসে
মুখে তার হাসির মুকুল,
কে জানে বুকের কাছে আঁচল আছে না আছে
পিঠেতে পড়েছে এলো চুল।" (মধ্যাহ্নে)

ইহা যে বাস্তব জীবন-লব্ধ-সত্য প্রেম পিপাসা এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য-প্রেরণা নহে তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

ইহাও লক্ষ্য করা যায় যে সৌন্দর্য-প্রেমের এই স্বপ্ন সঞ্চরণের মধ্যে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কোন-না-কোন স্বরূপে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বারংবার ব্যক্ত হইয়াছে। এই আকাঙ্ক্ষার একটি রূপ নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"নিদ্রার সাগর জলে মহা আঁধারের তলে,
চারিদিকে প্রসারিত একী এ নূতন দেশ,—" (নিশীথ চেতনা)

সকল রূপের অন্তরালে এক অখণ্ড রূপ-লোক রহিয়াছে, জাগতিক রূপের মধ্যে যে তাহারই কিছু আভাস লাভ করা যায়, এমনি এক প্রকার ধারণা এই কালে কবির অন্তরে ছিল।

অতৃপ্তি বোধের নিত্য পীড়া হইতে কবির অন্তরে এমন বোধ জাগিয়াছে। নিম্নে যে কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, সৌন্দর্য-কল্পনা ও ভাব-প্রেরণার দিক হইতে তাহা বোধ করি এই কাব্যের সর্বোৎকৃষ্ট কবিতা।

"কে তুমি গো উষাময়ী, আপন কিরণ দিয়ে
আপনারে করেছ গোপন
রূপের সাগর মাঝে কোথা তুমি ডুবে আছ
একাকিনী লক্ষ্মীর মতন।

* * *

সৌন্দর্য-কোরক টুটে এস গো বাহির হয়ে
অনুপম সৌরভের প্রায়,
আমি তাহে ডুবে যাব সাথে সাথে বহে যাব
উদাসীন বসন্তের বায়।" (আচ্ছন্ন)

মাঝে মাঝে কবির সৌন্দর্য-কল্পনা-বাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিশিষ্ট একটি রূপ

লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া এই মনন, তাহা বাস্তব জীবন লব্ধ নয়। জীবনের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে কবি তখনও আসিতে পারেন নাই। দূর অলিন্দ হইতে অসংলগ্ন ভাবে যে সমস্ত ছবি তাঁহার দৃষ্টি সমক্ষে ভাসিয়া উঠিত, সেগুলি অনেকটা কল্পনায় ভরিয়া তোলা। কিন্তু এই জাতীয় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কল্পনা বিলাস সত্বেও কবির অন্তরের মিলন পিপাসাটি ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তবে কল্পনা মাত্র বলিয়া আসঙ্গ লাভের পিপাসা তীব্র হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাণের ক্ষুধা, বিশ্ব মিলন লাভের গভীর অধ্যাত্ম-প্রেরণা এই জাতীয় কল্পনা-বিলাসে বেশী দিন নিরুদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে না। 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'র মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। 'ছবি ও গান' হইতে কবির চিত্র চিত্রনের সেই বিচিত্র প্রয়াসের কিছু পরিচয় দান করিতেছি।

"ঝিকি মিকি বেলা,
গাছের ছায়া কাঁপে জলে,
সোনার কিরণ করে খেলা।" (দোলা)

সূর্য কিরণ বৃক্ষের ঘন পত্রান্তরাল হইতে তরল কালো জলের বুকে পড়িয়া আলো-ছায়ার বিচিত্র আলপনা আঁকিয়া আঁকিয়া মুছিয়া মুছিয়া খেলা করিতেছে।

ছবি ফুটাইয়া তুলিবার কী প্রাণপণ প্রয়াস। অতি সূক্ষ্ম রেখা টানিবার চেষ্টাটিও লক্ষ্য করিবার মত, কিন্তু ওই প্রত্যেকটি রেখা একটা পরিপূর্ণ রূপের মধ্যে সার্থক হইয়া উঠে নাই। ইহার কারণ কবির অন্তরে অতিস্থির সৌন্দর্য-ধ্যান নাই। বাহিরের রূপের সহিত কবির ধ্যান-রূপটির মিলন ঘটে নাই বলিয়া তাহা ঠিক সৃষ্ট সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। কতকটা যেন ফটোগ্রাফীর মত। উহা সৌন্দর্যের আবিষ্কার নয়।—বাহিরে রূপের আশ্রয়ে যাহা অন্তরের সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারই বটে। ইহার আরও কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

"একটি মেয়ে একেলা
সাঁঝের বেলা
মাঠ দিয়ে চলেছে
চারিদিকে সোনার ধান ফলেছে।
ওর মুখেতে পড়েছে সাঁঝের আভা,
চুলেতে করিছে ঝিকি মিকি।" (একাকিনী)

হেমন্তের সন্ধ্যা আসন্ন। চারিদিকে পরিপক্ক ধানের ক্ষেত। উহার মাঝ দিয়া একাকী একটি তরুণী পথ চলিয়াছে। অস্তমিত সূর্যের শেষ রক্তিম আভা রমনীর মুখে, আলুলিত বিস্রস্ত কেশ পাশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃত পক্ষে ওই সৌন্দর্য্য-বিহ্বলতা এবং কল্পনা বিলাস যখন কিছুটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে তখন এমনি করিয়া দূরস্থিত জগতের এক একটি ছবি আপনিই ফুটিয়া উঠিয়াছে। ছবি গুলি তাই কল্পনার কুয়াসা বিজড়িত হইয়া যথেষ্ট স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু প্রাণের এই গূঢ় আকর্ষণে কবি উহাদের সহিত একাত্মতা বোধ করিয়াছেন। উহাদের দেখিলে তাই তাঁহার হৃদয় অমন স্নেহ বিগলিত হইয়া পড়ে, পরম স্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতে সাধ যায়।

"একা একটি বনফুল ফোটে ফোটে হয়েছে,
কচি কচি পাতার মাঝে মাথা থুয়ে রয়েছে।" (আদরিনী)

এখানেও ওই রূপ ফুটাইয়া তুলিবার সচেতন প্রয়াস।

"আকাশের ধারে ধারে ঘিরে
বসেছে রাঙা মেঘের মেলা,
শ্যামল ঘাসের পরে, সাঁঝে
আলো-আঁধারের মাঝে মাঝে,
ছেলেতে মেয়েতে করে খেলা।" (খেলা)

রৌদ্রোজ্বল নীল আকাশের প্রান্ত ঘিরিয়া চতুর্দিকে মেঘ করিয়াছে। যেন প্রবাল ঘেরা নীলকান্ত মণি। নিম্নে শিশুর কলরব মুখরিত শ্যামল তৃণাবৃত প্রান্তর, উহার উপর আলো ছায়ার বিচিত্র জাল বোনা হইতেছে। এতটুকু বাতাস বহিতেছে না। ঝাউগাছের পাতাটি পর্যন্ত স্থির। প্রস্ফুটিত কামিনীর অতি শিথিল পাঁপড়িটি পর্যন্তও নড়িতেছে না।

এমনি করিয়া দূর হইতে কবি একের পর এক ছবি দেখিয়া চলিয়াছেন,— অস্পষ্ট, কল্পনার বাষ্প ঘেরা, ভাসা ভাসা।

সেই একই রূপ-কল্পনার পরিচয়—

"ওই জানালার কাছে বসে আছে
করতলে রাখি-মাথা।
তার কোলে ফুল রয়েছে
সে যে ভুলে গেছে মালা গাঁথা।" (সুখ স্বপ্ন)

এই রূপ গভীর ধ্যান তন্ময়তার ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠে নাই। - যে ধ্যান

পরিণামে রূপকে ছাড়াইয়া সকল রূপের অতীত লোকে মনকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, বিশ্বের সকল রূপ যে রূপের পদতলে আপনাকে বিলীন করিয়া দিতে চায়, যাহার বিকীর্ণ জ্যোতিতে বিশ্বের সকল রূপ উদ্ভাসিত, সেই জাতীয় রূপ-ধ্যানের কোন পরিচয় অবশ্য এখানে থাকিতে পারে না।

কবি যে সুখকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছেন,

"মধুর আলস,—মধুর আবেশ,
মধুর মুখের হাসিটি
মধুর স্বপনে—প্রাণের মাঝারে
বাজিছে মধুর বাঁশিটি।" (সুখ স্বপ্ন)

তাহাকে একটি রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিলেও সমর্থ হন নাই।—বিশ্ব ও রূপ যেখানে পরস্পর পরস্পরকে সার্থক করিয়া একটি অখণ্ডতা লাভ করে।

নিশীথিনীর মূক বেদনাকে একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা।

"ঘন গাছের পাতার মাঝে, আঁধার পাখি গুটিয়ে পাখা
তারি উপর চাঁদের আলো শুয়েছে,
ছায়াগুলি এলিয়ে দেহ আঁচল খানি পেতে যেন
গাছের তলায় ঘুমিয়ে রয়েছে।
গভীর রাতে বাতাসটি নেই; নিশীথে সরসীর জলে
কাঁপে না বনের কালো ছায়া,
ঘুম যেন ঘোমটা পরা বসে আছে ঝোপে ঝাপে,
পড়ছে বসে কী যেন এক মায়া।
চুপ করে হেলে সে বকুল গাছে,
রমণী একেলা দাঁড়ায়ে আছে।" (বিদায়)

উদ্ধৃতিটির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, সেই নারী-রূপ যেমন সেই বেদনাও তেমনি জীবন ও জগতের যোগে সত্য নহে বলিয়াই কোন একটা স্পষ্ট রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই।

'মধ্যাহ্নে'র পরিব্যাপ্ত আনন্দকে যে রূপ আশ্রয় করিয়া ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে মানবিক প্রেম ও প্রীতির দিকটা একান্ত হইয়া নৈর্ব্যক্তিক মহিমার দিকটিকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া কবি অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে মোহ-লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই বিভোর হইয়া থাকিতে চাহিতেন, তাহা এক এক সময় বাস্তবের রূঢ় স্পর্শে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। বাস্তব সংস্পর্শে

এই জাতীয় অবাস্তব সৌন্দর্য-ধ্যান ধীরে ধীরে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার পর জীবন ও জগতের যোগে ভিন্নতর সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে।

বাস্তবের রূঢ় সংস্পর্শে কবির একান্ত স্পর্শ কাতর মন যেমন বেদনায় আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, তেমনি পর মুহূর্তে ওই সৌন্দর্য-লোকটির মধ্যে আত্ম গোপন করিয়া কবি আপনার প্রাণকে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাস্তব লোক হইতে পলাইয়া কবির সেই আত্ম গোপনের প্রয়াস—

"কেবল রয়েছি বেঁচে স্বপন কুড়ায়ে লয়ে
ভাঙিয়া গড়িয়া।" (নিশীথ-জগৎ)

কারণ

"ভালোবেসে কাছে গেলে দূরে চলে যায় সবে,
ভয়ে কাঁপে প্রাণ।" (নিশীথ-জগৎ)

এই জগতে যেমন সুন্দর আছে তেমনি অসুন্দর আছে, যেমন মঙ্গল আছে, তেমনি অমঙ্গল আছে। ওই সৌন্দর্য-ধ্যান কোনকালেই স্থায়ী হইতে পারে না যতদিন না কবি সকল সুন্দর-অসুন্দর পাপ-পুণ্যের পশ্চাতে সেই পরম মিলন তত্ত্বটি সাক্ষাৎ করিতে পারেন। 'নিশীথ জগৎ' কবিতাটির মধ্যে কবি সুন্দর-অসুন্দরের বহিঃ প্রকাশটি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহার পশ্চাতে পূর্ণ মিলন তত্ত্বটিকে তখনও প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। মানবীয় চেতনায় পাপ-পুণ্যের, সুন্দর-অসুন্দরের পৃথক বোধটি থাকে। উহার সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে এক অখণ্ড চেতনায় সকল বিরোধাভাস মুহূর্তে লুপ্ত হইয়া যায়। বাহিরে অতি জটিল, অতি কুটিল, অতি নির্মম সংসার প্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়া কবি ভীত ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, অন্যদিকে আবার অন্তস্তল হইতে বাঁশরির মিনতি মাখান করুণ আহ্বান ধ্বনি, স্বর্গ-লোকের পারিজাতের গন্ধ ভাসিয়া আসে ; ওখানে যেন প্রাণের সকল পিপাসা মিটে, যেন সব জ্বালা জুড়াইয়া যায়—সকল বিরোধ ওখানে যেন সামঞ্জস্যীভূত। ওই সুরে ওই গন্ধে কবির মন আবার ধীরে ধীরে তন্ময় হইয়া হারাইয়া গিয়াছে।

"কোথায় ফুটেছে ফুল আঁধারের কোন্ তীরে
কোথা কোন্ দেশ।" (নিশীথ-জগৎ)

কিন্তু সেই হৃদয়-লোকটিকে কেমন করিয়া লাভ করিতে হয়, কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া তাহা কবি আজও নিঃসংশয়ে বোধ করিতে পারেন নাই।

"হৃদয়ে অজানা দেশে পাখি গায় ফুল ফোটে
পথ জানি নাই।" (নিশীথ-জগৎ)

কড়ি ও কোমল

ব্যক্তিত্বের প্রসার তো কেবল প্রকৃতির সহিত যোগের ফলেই সম্ভব নয়, তাহাকে বৃহৎ মানব সংসারের সহিতও সেই সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে। কবি-প্রাণের প্রেরণা 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে প্রথম উভয়মুখীন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। তাহার ফলে একদিকে সৌন্দর্যের অন্যদিকে প্রেমের বিচিত্র তত্ত্ব এবং উভয়কে বিজড়িত করিয়া বিচিত্র অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা নানা ভাবে উৎসারিত হইয়াছে।

প্রাণকে গভীর ও ব্যাপক করিয়া অনুভব করিবার বাধা রহিয়াছে আমাদের নিশ্চেতন, সকল সার্থক, মঙ্গলকর প্রয়াস শূন্য, আচার বদ্ধ সংস্কার সর্বস্ব সমাজের মধ্যে। প্রাণের উল্লাস বোধ সত্বেও তাই প্রতিহত প্রেরণার জন্য একপ্রকার বেদনাবোধও সেই সঙ্গে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আপনার কবি-ধর্মটিকে নিঃসংশয় রূপে লাভ করিয়াছেন। কবি-প্রাণের এই জাগরণ যেমন অত্যন্ত দ্রুত, তেমনি অভ্রান্ত। অত্যন্ত দ্রুত বলিলাম, এই কারণে যে 'সন্ধ্যা সঙ্গীত', 'প্রভাত সঙ্গীত', 'ছবি ও গান' হইতে 'কড়ি ও কোমলে'র ভাব পরিণাম গত পার্থক্য অনেক খানি।

কবি-প্রাণের পূর্ণ জাগরণ এবং আপনার কবি-ধর্মের অভ্রান্ত উপলব্ধি বলিতে কী বুঝাইতে চাহিয়াছে, তাহাই সর্বাগ্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবির সমগ্র জীবন ব্যাপী অধ্যাত্ম-সংগ্রামের বীজাবস্থা ইহার মধ্যেই মিলিবে।

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।" (প্রাণ)

একদিকে জীবন ও জগতের দুর্লভ মহিমা ও সৌন্দর্য সাক্ষাৎকার;— আকাশনীলিমার দুকুল বেষ্টিত এই সুন্দরী বসুন্ধরা, উহার বিচ্ছেদ কাতর অশ্রু কলুষিত প্রেম, অন্যদিকে মৃত্যুতে এই সমস্ত কিছু হইতে নিঃশেষে বিদায় লইয়া যাইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে মৃত্যুর এই বোধ, এই বিচ্ছেদ কাতরতা জীবন ও জগতের সৌন্দর্য ও মহিমাকে বিকৃত তো করে নাই, পরন্তু আরও আকাঙ্ক্ষিত, আরও দুর্লভ, সমগ্র চেতনাকে আরও উন্মুখ, সদা জাগ্রত করিয়া দিয়াছে।

একদিকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অবসান স্বীকার করিয়াছেন, (এই স্বীকৃতি না থাকিলে জীবনের এই জাতীয় পিপাসা, অর্থাৎ অশ্রু কলুষিত বিচ্ছেদ কাতর মানবীয় প্রেমের অত্যাশ্চর্য অধীরতাবোধ), অন্যদিকে অবসান স্বীকার করিলে জীবন সান্ত্বনা শূন্য হইয়া পড়ে, কারণ মৃত্যুতে উহা শূন্যময় হইয়া যায়। শূন্যতা বোধে মানুষ সান্ত্বনা পায় না।

এই উভয় প্রেরণার সঙ্ঘাত সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্য ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া তিনি যে জীবন-দর্শন যে অনন্ত জীবনের বোধ গড়িয়া তুলেন, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের জীবন-ধর্ম অর্থাৎ সীমার বোধই একটা বিশিষ্ট উপায়ে চরিতার্থ হইয়াছে।

উহার মধ্যে ব্যক্তি বা সীমার সকল ধর্মই বিদ্যমান, অথচ অনন্ত জীবনের একটা তত্ত্ব যুক্ত থাকায় কবি যত স্বল্পকালের জন্য হোক্-না-কেন মাঝে মাঝে সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু উহা আদৌ অসীমের বোধ নয় বলিয়া প্রাণ সান্ত্বনা লাভ করে নাই, ক্ষণে ক্ষণে সকল তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত করিয়া কবি-প্রাণ আর্তনাদে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

অসীমের দিক হইতে জীবন ও জগৎ প্রত্যক্ষ করিলে উহাদের যে স্বরূপ প্রকাশ পায়, তাহা আর যাই হোক সীমার বোধ নয়। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে এই সীমার দিক হইতে দেখিতে চান। তাহার ফলে তিনি উহার সকল অপূর্ণতা ও ত্রুটির সহিত সকল ধর্মকে মানিয়া লইয়াছেন।

যাঁহারা অসীমের দিক হইতে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিবার ক া বলেন এবং ওই দিক হইতে জীবন ও জগতের সকল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁহাদের মতে জীবনে মুহূর্তের জন্য এই সাক্ষাৎকার ঘটিলে জীবনের এই জাতীয় প্রেরণা, উহার শাশ্বত মূল্য নিরূপণের অনুরূপ বিচিত্র প্রয়াস অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু অসীমের-বোধে জীবনের এই বিশিষ্ট রূপ ও রসটিকে তো আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না রবীন্দ্রনাথের প্রাণ-মন ভুলিয়াছে জীবন ও জগতের বর্তমান স্বরূপের দুর্লভতায়।

কেবলমাত্র প্রাণ তত্ত্বের দিক হইতে জগৎ ও জীবনকে প্রত্যক্ষ করিলে জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। কবির জীবনে এই পর্যায়ে প্রাণের প্রেরণাই মুখ্য, তাই জগৎ ও জীবনের মুখ্যত এই স্বরূপই উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

বিশ্বপ্রাণ লীলায় একদিকে মুহূর্তে যেমন অন্তহীন রূপ সৃষ্টি হইতেছে, তেমনি

অন্যদিকে সংখ্যাতীত রূপ মুহূর্তে বিনষ্ট হইতেছে। একদিকে সৃষ্টির আনন্দ কলধ্বনি, অন্যদিকে বিনষ্টির আর্তি। মানব-জীবন ঘিরিয়াও নিত্যকাল ধরিয়া হরণ-পূরণের এই লীলা চলিতেছে। যে-সকল জাতি এই প্রাণকে একান্ত করিয়া লাভ করিতে ও সঞ্জীবিত করিতে চাহিয়াছে, তাহাদের সৃষ্টি-রূপের মধ্যে আনন্দের গভীরতা যেমন, বেদনার তীব্রতাও তেমনি। আশ্চর্যবোধ হইলেও ট্র্যাজেডির সহিত ঠিক এই কারণে কমেডির সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষেত্রে গ্রীক সাহিত্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

জীবনের এমন গভীর আকাঙ্ক্ষা কবির কাব্যে ইতিপূর্বে এত গভীর ভাবে যেমন কোথাও প্রকাশ পাই নাই, তেমনি জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব বোধের জন্য এমন বাস্তব বেদনাও কবি ইতিপূর্বে কোথাও বোধ করেন নাই।

জীবন ও জগতের যদি এই স্বরূপই হয়, তবে তিনি তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে এই আনন্দ-বেদনাকেই প্রকাশ করিবেন।

"ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত—" (প্রাণ)

এই আনন্দ-বেদনাকে কবি যে তত্ত্ব-দৃষ্টির সহায়তায় একটি নৈর্ব্যক্তিকতা দান করিতে পারিয়াছেন, তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় 'যোগিয়া' প্রভৃতি কবিতার মধ্যেও। এই জগতে কালে কালে কত নর-নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, আবার জগৎ হইতে বিদায় লইয়াছে, আবার নূতন নর-নারী আসিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়াছে। জগৎ-সংসারে তাই একদিকে সৃষ্টির আনন্দের একটি ধারা অন্যদিকে বিনষ্টির বেদনার একটি প্রবাহ চলিয়াছে। যে কোন অস্তিত্বের মুহূর্ত এই দুইয়ের মিলন বোধ জাত। তাহা এক অংশে আনন্দ অপর অংশে বেদনা নহে, তাহা এই উভয়ের মিলনে এক আশ্চর্য অনুভূতি।—তাহা করুণায় কোমল, প্রশান্তিতে গভীর।

ইহাই যদি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণার সত্য স্বরূপ হইয়া থাকে, তবে কবির এই আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কি?

"তুলিব কুসুম আমি অনন্তের কূলে।" (ছোটফুল)

ইহা কি পূর্ববর্তী প্রেরণার সম্পূর্ণ বিপরীত নয়? কবির জীবনে এই উভয় প্রেরণার মিল কোথায়? পূর্ববর্তী প্রেরণাকে যদি পাশ্চাত্ত্য আখ্যা দেওয়া যায় তবে পরবর্তী প্রেরণাকে নিঃসংশয়ে প্রাচ্য আখ্যা দান করা যাইতে পারে। কোন্

অধ্যাত্মবোধাশ্রয়ী কোন্ অখণ্ড তত্ত্ব-দৃষ্টির ফলে কবি এই উভয় প্রেরণার মধ্যে সার্থক সমন্বয় সাধন করিতে সমর্থ হন ? তাহারই পরিচয় দানের চেষ্টা ইতিপূর্ব্বে ভূমিকায় করিয়াছি, পরে প্রসঙ্গ ক্রমে সর্বত্র ইহার উল্লেখ করিব।

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে যে-কোন স্বরূপে, যে কোন পরিণামে অস্বীকার করিতে চান নাই। জীবন ও জগৎ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ সত্য। তেমনি অন্যদিকে অসীম বা অরূপও তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ সত্য। এই উভয়ের মিলনের দৃষ্টিই অখণ্ড দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। বিশ্বের সহিত সঙ্ঘাত ও সংযোগ ব্যতিরেকে মানবিক বোধের সর্বাঙ্গীন বিকাশ অসম্ভব। আবার এই বিকাশের সর্বশেষ সার্থকতা অসীম বা অরূপের সহিত মিলন বোধে।

সীমা বা রূপের আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্র-কাব্যে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে সীমা বা রূপ অসীম বা অরূপের আধার হইয়া উঠিয়াছে;—তাঁহার প্রেমের আশ্রয়, তাঁহার সকল মাধুর্যের আশ্রয়। রূপ বা জীবনকে অস্বীকার করিলে তাহার সহিত, তাহার প্রেম, তাহার সকল মাধুর্য মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া যায়। জীবনকে কোন একটা উপায়ে পরিহার করিয়া জীবনাতীতকে লাভ করিবার চেষ্টায় জীবনের কোন সার্থকতা নাই; জীবনাতীত কেবল জীবনের যোগে সত্য। দুই শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব।

"সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।
পলকের মাঝখানে অনন্ত বিরাজে।" (ক্ষুদ্র অনন্ত)

তাঁহার সম্পর্কে শাস্ত্রে এমন উক্তি করা হইয়াছে, তিনি মহৎ হইতে মহান তিনি ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণকে মিলিত করিবার আকাঙ্ক্ষাই শুধু নয়, উভয়ের যোগে যে দিব্য আনন্দ বোধ জাগে তাহা সমগ্র রবীন্দ্র-কাব্যের পশ্চাৎগত প্রেরণা।

সঙ্গীত শিক্ষার্থীর অন্তরে যেমন একটি পূর্ণ সুর বোধ থাকে এবং সেই সুরের সহিত মিলাইয়া ক্রমে সে সমস্ত বেসুরকে সঙ্গত করিয়া পরিণামে একটি অখণ্ড সঙ্গীত সৃষ্টি করে, তেমনি নিখিল বিশ্বে যে পরিপূর্ণ সঙ্গীত রহিয়াছে তাহার সহিত প্রতিনিয়ত মিল সাধন করিয়া ব্যক্তির ছন্দটিকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হয়।

জীবন ও জগতের অন্তরালে যে একটি পূর্ণ ঐক্য বোধ রহিয়াছে, এমনি

এক প্রকার নিঃসংশয় ধারণা শুধু নয়, কবি এই সত্যও ইতিমধ্যে স্থিরভাবে লাভ করিয়াছেন, যে ওই ঐক্যবোধে জীবনের পিপাসার, সকল বিরোধ-বিক্ষোভের অবসান ঘটে।

মৃত্যুতে এই অপরূপ প্রেম ও মাধুর্য পরিপূর্ণ জগৎ কি একান্ত শূন্য হইয়া যায়? জীবন যদি মৃত্যুতেই একান্ত বিনষ্ট হইয়া যায়, তবে জীবন বিকাশের সার্থকতা কোথায়? এমনি সহস্র জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তকে মথিত করিয়া দিয়াছে।

এই জিজ্ঞাসা জাগিবেই। জীবন-রস-পিপাসা যদি সত্য হয়, তবে এই জিজ্ঞাসার একটা উত্তরও কোন-না-কোন রূপে লাভ করিতেই হইবে।

সর্বাগ্রে এই জাতীয় জিজ্ঞাসাগুলির কিছু পরিচয় দান করিব। সেই সঙ্গে এই সমস্ত জিজ্ঞাসা মথিত করিয়া কবি-চিত্তে কেমন করিয়া সত্য বোধ ধীরে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

জগতে বিচিত্র নর-নারীর সহিত আমরা প্রেম বন্ধনে বাঁধা, তাহাদের জন্য আমাদের ব্যাকুলতার অন্ত নাই। অথচ একথাও সত্য যে মৃত্যুতে তাহাদের অন্তরে আমাদের প্রেমের স্মৃতিমাত্রও থাকিবে না। স্মৃতিলোকে বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস যে কত অসহায় তাহা নিঃসংশয়ে বোধ করিয়াও মন বারাংবার উহাদের স্মৃতি-লোকে স্থান অন্বেষণ করিয়া ফিরে।

এই যে বিশ্বের নর-নারীর অন্তরে বাঁচিয়া থাকিবার এমন সর্বগ্রাসী ক্ষুধা, ইহার কারণ কি? ইহার পশ্চাতে সত্য মূল্য কি কিছুই নাই? চিরন্তন কাল ব্যাপী অনন্ত কোটি নর-নারীর কেবল অর্থহীন অন্তহীন বেদনা বোধ মাত্র?

কবির অন্তরে প্রেম অনুভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই চিরন্তন ব্যথা বিজড়িত, হৃদয়রক্ত-নিষিক্ত প্রশ্নও জাগিয়াছে।

"বারেক যে চলে যায়, তারে তো কেহ না চায়
তবু তার কেন এত মায়া—" (পুরাতন)

যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অন্তরে প্রেম অনুভূত হয় তাহাকে যখন চিরকালের জন্য হারাইয়া ফেলি তখন জগতের সব আলো নিভিয়া যায়, উহার অপরূপ সৌন্দর্য মুহূর্তে কালিমাবৃত হইয়া পড়ে। জীবনের ভার তখন একান্ত অসহনীয় বলিয়া বোধ হয়।

প্রাণের সংস্পর্শে মানুষ আবার এমন ব্যথাকেও একদিন জয় করিয়া উঠে। এমন একান্ত করিয়া পাওয়া ইহাও যেমন সত্য, এমন একান্ত করিয়া হারান, ইহাও তেমনি সত্য।

তবে এই প্রেমের মূল্য কি? অন্তত এইকালে কবি তাহার কোন্ মূল্য নিরূপণ করিয়াছেন? আমি সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি।

"আয়রে কাঁদিয়া লই, শুকাবে দুদিন বই
এ পবিত্র অশ্রু বারি ধারা।" (নূতন)

প্রাণ-ধর্মে এই বিস্মরণটা সত্য। সেক্ষেত্রে এই অন্তহীন বিস্মৃতি পরিপূর্ণ জীবনে দু-দিনের পবিত্র অশ্রুবিন্দু পাতটাই যে প্রেমের একমাত্র সত্য মূল্য হইয়া উঠিবে ইহাই স্বাভাবিক।

প্রাণধর্মে স্মৃতির বেদনা ভার যেমন সত্য, তেমনি ইহার বিস্মরণও সত্য। কিন্তু মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে ততই বুঝিতে পারে যে প্রাণের বোধ মানব জীবনের এক নিম্নতর বোধ। প্রেম ধ্যান-লোকে একনিষ্ঠতা লাভ করিলে স্মৃতি আর বোঝামাত্র থাকে না। মানব জীবনের এবং মানব-প্রেমের এই অসহায় বোধ কবি-চিত্তে ফিরিয়া ফিরিয়া জাগিয়াছে।

"যারে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চলে, সে তো নেই আর।" (ভবিষ্যতের-রঙ্গভূমি)

ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় ওই কালে কবির অন্তরে এই জিজ্ঞাসা কী ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ সৃষ্টি করিয়াছিল।

যতদিন না অনন্ত প্রেম বা প্রাণের তত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটে, ততদিন হারাইয়া যাইবার আশঙ্কা কিছুতেই ঘুচে না।

রবীন্দ্রনাথ যখন অনন্ত প্রাণের এই সত্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তখনই মৃত্যু ভয় ঘুচিয়াছে। তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, যে এই বিচ্ছিন্ন প্রাণ অনন্ত প্রাণের যোগে সৃষ্ট। মৃত্যু একান্ত বিনষ্টি নয় ওই অনন্ত প্রাণেই তাহা বিলীন হয় ভিন্নরূপে আবার তাহার প্রকাশ ঘটে। জন্ম-মৃত্যুর বারংবার এই আসা-যাওয়ার ভিতর দিয়া জীবের কোন্ নিয়তি সার্থক হইয়া উঠিতেছে,—এই জাতীয় কোন জিজ্ঞাসা এখনও কবিব মনে জাগে নাই, উত্তর লাভ আরও অনেক পরের কথা।

কবির প্রোমোপলব্ধি তাঁহার সীমাবদ্ধ চেতনার মত একান্ত সঙ্কীর্ণ একটি লোককে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। এই সীমা-লোকের বাহিরে যে অচিন্তনীয় বিরাট বিশ্ব তাহা কবির সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত, সেই হেতু ভয়ঙ্কর। একান্ত অপরিচিত এই বিশ্বে তাই প্রেমাস্পদকে বাহুবেষ্টনে ধরিয়া রাখিবার এমন প্রাণপণ প্রয়াস, এমন একান্ত ব্যাকুলতা।

"হায়, কোথা যাবে।
অনন্ত অজানা দেশ, নিতান্ত যে একা তুমি।
পথ কোথা পাবে। (কোথায়)

এই একান্ত অপরিচিত লোকে নর-নারী চিত্ত-বৃন্তে প্রেমের শিখা জ্বালাইয়া তাহারই ক্ষীণ আলোকে কোন প্রকারে পথ চিনিয়া চলে। বিয়োগে বা বিচ্ছেদে দীপ-শিখাটি নিভিয়া গেলে দিগন্ত ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আর্তনাদ তুলিয়া তাহারা কোথায় হারাইয়া যায়।

"ভয়ে ভয়ে হাতে হাতে বেঁধে বেঁধে চলি
ছাড়া পেলে কে আর কাহার।" (বিরহীর পত্র)

মৃত্যুতে যখন মানুষ জীব-লোক ছাড়িয়া চলিয়া যায় তখন মর্ত্য-প্রেমের কোন সঞ্চয়, কোথাও কোন একটা স্বরূপে কি থাকিয়া যায় না? পরিচিত সমস্ত কিছুকে কি নিঃশেষে পরিহার করিয়া সেদিন একান্ত এক অপরিচিতের সম্মুখীন হইতে হয়? তবে জীবনের এত প্রেমের এত মাধুর্যের সার্থকতা কোথায়?

"তখন কি মনে রবে দুদিনের খেলা
দরশের পরশের স্মৃতি
* * *
প্রাণ যারে প্রাণের অধিক ভালবাসে
সেও কি রবে না এক কালে।" (বিরহীর পত্র)

ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই একই জিজ্ঞাসা। জীবন যদি মিথ্যা হয়, তবে এত প্রেম কেন, কেন প্রেমে এমন হৃদ্ বিদারণ? ইহার পশ্চাতে কি কোন সত্য নাই? যদি না থাকে তবে জীবনে তাহা যে নিরতিশয় নিষ্ঠুরতা ও বঞ্চনা।

"কেন রে কাঁদায় প্রাণ সবি যদি ছায়া,
* * *
মানব-হৃদয় নিয়ে এত অবহেলা
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা।" (কেন)

এই কালে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন 'বৈতরণী' কবিতাটির মধ্যে তাহার একটি পরিচয় মিলিবে।

মনে হয় বিশ্ব যেন কূল-হারা-বেদনার সমুদ্র নিত্য আন্দোলিত হইতেছে। অগণিত নর-নারী এই সমুদ্রে জীবন-তরী বাহিয়া পশ্চিমাভিমুখে চলিয়াছে। একান্ত অপরিচ্ছিন্ন এই জগৎ, অপরিচিত এই নর-নারী। এখানে কেহ কাহাকে

চেনে না। নর-নারীর প্রেমে যে সঙ্কীর্ণ আলোক রেখাটুকু ফুটিয়া উঠে তাহা মেঘাবৃত রজনীতে বিদ্যুৎ বিকাশের মত অন্ধকারকে আরও নিবিড় করিয়া তুলে।

"মাঝে মাঝে দেখা দেয় বিদ্যুৎ বিকাশ
কেহ কারে নাহি চেনে বসে নত শিরে।" (বৈতরণী)

জীবলোক হইতে বিদায় লইবার কালে প্রিয়জনের বিলাপধ্বনি, তাহার অশ্রু সিক্ত আঁখি পল্লব, প্রেমের সর্বশেষ অর্ঘ্য স্বরূপ পরাইয়া দেওয়া কুসুম মাল্য সমস্তই একে একে ঝরিয়া মুছিয়া যায়। মৃত্যুর ওই লোকে ইহ-জীবনের সকল স্মৃতি ধীরে ধীরে ছায়া হইয়া মিলাইয়া যায়।

মৃত্যু-লোক পার হইয়া মানবাত্মা কি পরিশেষে ধ্রুব কোন লোকে গিয়া পৌছায়,

"অথবা অকূলে শুধু অনন্ত রজনী,
ভেসে চলে কর্ণধার বিহীন তরণী।" (বৈতরণী)

এ পর্যন্ত কবির জীবন-জিজ্ঞাসা গুলিকে একে একে উপস্থাপিত করিলাম; এই জিজ্ঞাসা ক্ষুব্ধ হৃদয়কে শান্ত করিতে কবি এই কালে যে উত্তর লাভ করিয়াছিলেন তাহারও স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। এই উত্তর কবি কোন জ্ঞানানুশীলন অথবা তত্ত্ব আলোচনা করিয়া লাভ করেন নাই। উহা এক প্রকার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার রূপে কবির অন্তরে প্রতিভাত হয়।

বহু বিচিত্র জিজ্ঞাসা মথিত করিয়া ওই সত্যটি ধীরে ধীরে কেমন ফুটিয়া উঠিতেছে! একদিকে কবির ব্যাকুল জিজ্ঞাসা শত ধারায় উৎসারিত হইয়াছে—

"তাই কি? সকলি ছায়া? আসে, থাকে, আর মিলে যায়?
তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই?
যুগ যুগান্তর ধরে ফুল ফুটে, ফুল ঝরে তাই?
প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায়?
এ ফুল চাহে না কেহ? লহে না এ পূজা উপহার?
এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়?
বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে?
বিশ্বের কাঁদিছে প্রাণ, শূন্যে ঝরে অশ্রু বারি ধার?
যুগ যুগান্তের প্রেম কে লইবে, নাহি ত্রিভুবনে?
চরাচর মগ্ন আছে নিশিদিন আশার স্বপনে
বাঁশি শুনি চলিয়াছে, সে কি হায় বৃথা অভিসার।" (চিরদিন)

অন্যদিকে পরিণামে যে উত্তর লাভ করিয়া কবি সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন—

"অসীমে জগতে একি বিপরিত আদান-প্রদান।" (চিরদিন)

দেশ-কালের উর্দ্ধে এক দিব্য-চেতনা চির স্থির হইয়া আছেন, নিম্নে দেশ-কালের মধ্যে নিত্যকাল ধরিয়া সৃষ্টির ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে; এক অপরিবর্তনেয় দিব্য-চেতনাই সত্য, সৃষ্টির আর সমস্ত কিছু অসৎ বা মায়া, মায়াবাদীর এই তত্ত্ব সাক্ষাৎকারকে রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সহিত মানিয়া লইতে পারেন নাই।

দিব্য-চেতনাই যে অপার প্রেমে আপনাকে দেশ-কালের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের অনন্ত কোটি রূপ-বৈচিত্র সেই দিব্য-চেতনারই প্রতিভাস, এই সত্যটিকে কবি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন। অসীম যেখানে প্রেমে সীমার মধ্যে বাঁধা পড়িয়াছেন সেইখানেই সৃষ্টি। বিশ্ব অর্থাৎ সীমা বা রূপ আশ্রয় করিয়া কবি তাই সেই অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে চান।

বিশ্ব-বৈচিত্রের অন্তরালে যে পরম তত্ত্ব, মানবাত্মায় সেই একই তত্ত্ব রহিয়াছে। এক পরম তত্ত্ব জীব ও বিশ্বের মধ্যে অভিব্যক্ত। সেই পরা তত্ত্বের নাম প্রেম।

সৌন্দর্য বা প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব তাহার অসীম প্রাণ স্পন্দ অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দেয়। প্রাণের এই অনুভূতি আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা পরিণামে বিশ্ব-চেতনায় একাকার হইয়া যায়। এই একাকার মুহূর্তে সে সাক্ষাৎ করে যে এক অনাদ্যন্ত প্রাণ-ধারার বিচিত্র স্পন্দনে এই অনন্ত রূপ-লোকের সৃষ্টি। প্রত্যেকটি রূপ বা সীমা অরূপ বা অসীমের যোগে অনন্ত স্বরূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

"সমগ্র অনন্ত ওই নিমেষের মাঝে
একটি বনের প্রান্তে জুঁই হয়ে উঠে।" (ক্ষুদ্র অনন্ত)

জীবন ও জগতের যে সাধারণ শ্রেষ্ঠ অধিষ্ঠান ভূমি, কেবল মাত্র উহা লাভ করিতে পারিলে জীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিতে পারা যায়।

"মনে হয় কী একটি শেষ কথা আছে,
সে কথা হইলে বলা সব বলা হয়।" (শেষ কথা)

এই পরম তত্ত্বের সাক্ষাৎ মানুষ তখনই লাভ করে যখন সে ব্যক্তি-বোধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। জীবনের পূর্ণ পরিণাম যে ব্যক্তি-চেতনার সীমার উর্দ্ধে, অন্তরের মধ্যে যে অহর্নিশ অতৃপ্তি বোধ তাহার মূলে যে এই উর্দ্ধ পরিণাম

লাভের আকাঙ্ক্ষা মূল এই তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ এই কালেই এক প্রকার উপলব্ধি করিয়াছেন।

যেখানে কবি এই সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে চাহিয়াছেন, আমি এক্ষেত্রে তাহারই দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"জাগ্রত বিপুল বিশ্ব লও তুমি হরে
অনন্ত কালের মোর জীবন মরণ।" (পূর্ণ মিলন)

কিংবা

"আমারে কাড়িয়া লও করগো গোপন,
আমারে তোমার মাঝে করগো উদাসী।" (ক্ষুদ্র আমি)

অন্যত্র

"আপন হৃদয়-দীপ আঁধার হেথায়,
ধূলি হতে তুলি এরে দাও জ্বালাইয়া।" (সত্য)

এখানে সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিবার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাহা অহঙ্কার বিসর্জনের সেই জাতীয় অধ্যাত্ম প্রেরণা না হইলেও স্বরূপত এক। অর্থাৎ এই প্রেরণার ভিতর দিয়া মানুষ নিম্নতর চেতনা-লোক অতিক্রম করিয়া ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে। মানস-চেতনা এই সীমাবোধের শেষ প্রান্ত। উহার বিকাশ অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সম্পূর্ণ না হইলে তাহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার প্রশ্ন উঠে না।

কবি-প্রাণের এই জাতীয় প্রেরণার কথা ছাড়িয়া দিলে একথা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলা যায়, যে 'কড়ি ও কোমলে'র মধ্যেও কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক বেশ সঙ্কীর্ণ।

কেবল ইন্দ্রিয়-চেতনায় মানুষের সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ সর্বাধিক সঙ্কীর্ণ। ইন্দ্রিয় বিক্ষোভের ভিতর দিয়া যখন প্রাণ জাগে, তখন এই সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ আরও বিস্তৃত ও গভীর হয়; কিন্তু ইহাও মানুষের চেতনাকে একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া আবর্তিত করিতে থাকে। ইহাতে তাই চিত্তের শান্তি, মনের মুক্তি লাভ ঘটে না। এমনি করিয়া মানস-চেতনায় ধ্যান-লোকে প্রাণের বিক্ষোভ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়, সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ আরও গভীর হইয়া উঠে। কিন্তু মানস-চেতনাও খণ্ডিত চেতনা বলিয়া উহাও সৌন্দর্য ও প্রেমের পূর্ণ পরিণাম নয়। মানস-চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে সৌন্দর্য ও প্রেমের আর সীমা থাকে না।

কবির কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার চেতনার ধীর জাগরণ ও বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বোধটি যেমন বাড়িয়া চলিয়াছে তেমনি সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতিও কেমন গভীর হইতে গভীরতর হইয়া চলিয়াছে তাহাও উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

চেতনার প্রত্যেক স্তরে জীবনের প্রত্যেক পর্বে কবি যেমন এক প্রকার সামঞ্জস্য বোধ করিয়াছেন, তেমনি অন্য দিকে সেই সঙ্গে কবির অন্তরে সৌন্দর্য ও প্রেমের একটি লোক গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে ওই অপূর্ণতা বা সঙ্কীর্ণ সামঞ্জস্য বোধে কবি অতৃপ্তি বোধ করিয়াছেন, ওই সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধও কবিকে ক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছে। তখন কবি সঙ্কীর্ণ সামঞ্জস্য বোধটিকে যেমন, তেমনি সৌন্দর্য ও প্রেমের ওই সঙ্কীর্ণ লোকটিকে প্রাণপণ বলে ভাঙ্গিয়া দিয়া উন্নততর সামঞ্জস্য এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের বিচিত্র ধারাকে তাই মানবাত্মার ধীর জাগরণের সহিত মিলাইয়া পাঠ করাই শ্রেয়।

কড়ি ও কোমলে যে সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক, তাহাতে কবি আজ ক্লান্ত, এই সঙ্কীর্ণ লোক হইতে বাহির হইয়া আসিবার জন্য তাই এমন প্রাণপণ প্রয়াস।

"মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে
দেখিনা এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।" (স্বপ্ন রুদ্ধ)

মানসী

কবির কাব্য পাঠের ভূমিকা স্বরূপ যে সামঞ্জস্যতত্ত্বের উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি, সমগ্র জীবন ধরিয়া কবি যে তত্ত্বটিকে জীবনে ধীরে ফলবান হইতে দেখিয়াছেন, 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' কাব্য পাঠের ভূমিকা স্বরূপ কবির 'জীবনস্মৃতি' হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, সেই অসামঞ্জস্য বোধের পীড়া এবং তাহাকে জয় করিয়া উঠিবার প্রাণপণ প্রয়াসের পরিচয় 'মানসী' কাব্যের মধ্যেও লাভ করা যায়।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে কবির ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বোধের ধীর সম্পূর্ণতাই কেবল ঘটিয়া চলে নাই, তাহা যেমন বহু বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে, তেমনি সেই সকল বহু বিচিত্র বিপরীত বা বিরুদ্ধ ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য কবির আন্তর সত্তায় বিক্ষোভ আরও তীব্র হইয়াছে। এমনিই হয়, ব্যক্তিত্বের বিকাশ যেখানে অসম্পূর্ণ বা অপরিণত সেখানে সামঞ্জস্য সাধন হয়ত সহজ হয়, (কিংবা আদৌ হয়ত সে চেষ্টা করিতে হয় না, সুদীর্ঘ কালের প্রথা ও সংস্কার-রূপে তাহা জীবনে এক প্রকার সহজ বিশ্বাসবোধ জাগ্রত করে) কিন্তু বহু বিচিত্র বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন এবং এইরূপে যে অখণ্ডতা বোধ তাহার ফললাভ যে অনেক বেশি তাহাতে সংশয় নাই।

মানসী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, "মানসীতে যাকে খাড়া করেছি সে মানসেই আছে, সে আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।"

মানসীর মধ্যে আসিয়া আমরা প্রথম লক্ষ্য করি কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক ইন্দ্রিয়-প্রাণের বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে উঠিয়া কতকটা শান্ত পরিণাম লাভ করিয়াছে। ইহা যেন দীর্ঘকালের প্রাণ-সমুদ্র মন্থন শেষে লক্ষ্মীর আবির্ভাব। প্রাণ-মনকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া কোন অপরোক্ষ সাক্ষাৎকাররূপে এই রূপ তাঁহার অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া যায় নাই। তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ, দুঃখ-সুখের বিচিত্র অনুভূতি ধীরে তাঁহার প্রাণকে জাগ্রত করিয়াছে, এইরূপে তাঁহাকে দিয়া প্রাণের সকল বিক্ষোভ বা নিপীড়ন ভোগ করাইয়াছে, এবং এই অসহনীয় অবস্থাকে নিয়ত জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টার

ভিতর দিয়া ধীরে মনের জাগরণ ঘটাইয়া একটি রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই রূপের মধ্যে অসঙ্গতি দূর হইয়া সুষমা যতই ফুটিয়া উঠিতেছে, যতই উহা সুদূর ব্যাপ্ত মহিমা বিজড়িত হইয়া উঠিতেছে, কবির অন্তর ও বহিঃসত্তার মধ্যে ততই যে সামঞ্জস্য সাধিত এবং চেতনার সকল বিকাশ পর্যায়ের মধ্যে আপাত বিরোধ ও সঙ্ঘাত ততই যে দূর হইয়া যাইতেছে তাহা স্পষ্টই অনুমান করিতে পারা যায়।

এই সৌন্দর্য প্রেমের ধ্যান-লোক, এই দিব্য প্রভা বিজড়িত রহস্যময়ী নারী মূর্তিই তাঁহাকে হাতছানি দিয়া দূর হইতে সুদূরে, উর্দ্ধ হইতে সুউর্দ্ধে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহারই সহিত তাঁহার কান্না-হাসির বিচিত্র লীলা। আর এই সমস্ত কিছুকে জড়াইয়া এক অপূর্বতার আস্বাদ, কোন এক সুবর্ণকূলের চকিত আভাস। জীবন-মরণ জন্ম-জন্মান্তর তাহাতে যেন ধন্য হইয়া যায়।

বিশ্ব প্রাণের যোগে ব্যক্তির জীবনে মুহূর্তে মুহূর্তে কত বিচিত্র অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়া আবার ঝরিয়া যাইতেছে, কিন্তু এই সকল অনুভূতির সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে আর একটি সত্তা ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার যে নামই দেওয়া হোক না কেন, তাহা মানুষের স্থায়ী সত্তা। এই স্থায়ী সত্তাটিকে তিনি নানা চেতনা পর্যায়ে নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন। মানসীর মধ্যে আসিয়া তিনি প্রথম আপনার এই অপর সত্তা সম্পর্কে নিঃসংশয় হন। ইহাকেই তিনি বলিয়াছেন, "ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা।" ঈশ্বরীয় প্রতিমা বলিবার অর্থ, এই সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়াই তিনি বারংবার অসীম বা অরূপের চকিত আভাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহার চেতনা মাঝে মাঝে কোন অতল রহস্যের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে। পরবর্তী কাব্য-ধারা আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার এই আন্তর সত্তাটির ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

'মানসী'র মধ্যে কবির সামঞ্জস্য বোধ যেমন আরও গভীর, সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধও তেমনি আরো ব্যাপ্ত ও উদার হইয়াছে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান এবং ধ্যান-লোকে স্বপ্ন সঞ্চরণের বিচিত্র পরিচয় মানসীর মধ্যে রহিয়াছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের এই সম্ভোগ ও লীলা সঙ্ঘটিত হইয়াছে কবির মানস বা ধ্যান-লোকে, তাই উহার যেমন অতি ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, তেমনি কাব্যের 'মানসী' নামকরণ বড় যথার্থ হইয়াছে।

মানসীর মধ্যেই কবির মানস-জাগরণ প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং এইরূপে অন্তরের ধ্যান-লোকটি একান্ত হইয়া উঠিবার ফলে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট জগৎ ও জীবনের

একান্ত সীমার পরিচয় প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। মানস বা ধ্যান-লোকে সৌন্দর্য ও প্রেমের আনন্দ-বেদনা বোধ একপ্রকার অতি বিস্তার লাভ করিয়া করুণ শান্ত শ্রী লাভ করে।

কবি-চেতনা বহিঃ প্রকৃতি এবং মানব সংসারের যোগে ইতিমধ্যে যেমন যথেষ্ট বিকাশ লাভ করিয়াছে, সেই সঙ্গে বহু বিচিত্র বোধও কবির অন্তরে সঞ্চারিত হইয়াছে। 'মানসী' কবির বিকশিত চেতনাশ্রয়ী বহু বিচিত্র বোধের প্রথম সার্থক সমন্বয়, কবির আন্তর সত্তার একটি জৈবিক সমগ্রতা।

মানব সংসার ও বিশ্ব প্রকৃতির যোগে কবির বোধের যেমন বৈচিত্র ঘটিয়াই চলিয়াছে, তেমনি তাহাদের সামঞ্জস্য প্রসূত কবির অখণ্ডতা বোধ, কবির 'মানসী'র ও ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহারই পরিপূর্ণ প্রকাশ রূপটি দেখিতে পাই 'চিত্রা' 'চৈতালি', 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে।

বহিঃ প্রকৃতি এবং মানব সংসারকে আশ্রয় করিয়া মানব চেতনা বিকাশের রহস্যকে কবি আবিষ্কার করিলেও তাহা আদি হইতেই মুখ্যত সৌন্দর্য ও প্রেমাশ্রয়ী। তাহা জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ভাগটিকেই একান্ত করিয়াছে। তাঁহার বহু বিচিত্র বোধের যে ধীর প্রকাশ তাহা প্রধানত সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া। 'মানসী' এই সৌন্দর্য বোধের প্রথম সার্থক প্রকাশ। তাহার যে পরিপূর্ণতা তাহা এই সৌন্দর্য বোধেরই সম্পূর্ণতা।

মানসী কাব্যে কবির বিশ্ব-সত্তা বা অখণ্ড রূপের স্বরূপ তাই বলিয়াছি, বিশ্বের অন্তহীন রূপ বৈচিত্রের কল্পনায় সামঞ্জস্যীভূত প্রকাশ। তাহার সামগ্রিক প্রকাশ রূপটি কোথাও সার্থক হইয়া উঠিয়াছে কি-না, কোথাও এক স্থানে স্পষ্টীকৃত হইয়াছে কি-না তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না।

তবে কবি-চেতনার ওই পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া কবি মনের ধীর বিকাশ এবং সামঞ্জস্য প্রসূত কবির সৌন্দর্য সত্তার ধীর উন্মেষও যে ঘটিয়া চলিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই।

পরবর্তী কাব্য-ধারায় এই জাতীয় সৌন্দর্য বোধের ধীর সম্পূর্ণতা সত্বেও কবির মনে কিন্তু অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়া তো ঘুচে নাই, বরং ক্রমাগত গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। কবির চেতনা-বৃত্ত তাই এই পরিণাম লাভ করিয়াও নিরুদ্ধ হইয়া যায় নাই।

এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়াকে দূর করিবার জন্য তিনি অতি জাগতিক বিচিত্র সত্য এবং তাহারও পূর্বে বিচিত্র আদর্শ প্রেরণা লাভের জন্য ধ্যান নিমগ্ন

হন। তাহাতে কবি-চেতনার পরিধি আর এক দিক দিয়া অত্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু তাহাতে জীবন ও জগৎ প্রায় অস্বীকৃত হইয়াছে।

কবির সাধনা আমরা জানি জগতের সহিত পূর্ণ যোগের ভিতর দিয়া জগতাতীত সত্যকে লাভ করা। জগতের সহিত যোগ বলিতে প্রকৃতি ও মানবের সহিত যোগ বুঝায়। প্রকৃতি ও মানব সংসারে যে অন্তহীন বোধ বৈচিত্র তাহা কেবল সুন্দর নয়, অসুন্দরও, কেবল সৎ নয়, অসৎও, কেবল কল্যাণ নয় অকল্যাণও। বিশ্বের এই অসুন্দর, অসৎ, অকল্যাণ ও ভয়ঙ্করতার সহিত কবি প্রাণের কতটুকু পরিচয় ঘটিয়াছে।

শেষ পর্যায়ের কাব্য-ধারায় জীবন ও জগতের এই দিকটির সহিত যোগ সাধনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া কবি আপনার চেতনা-বৃত্তকে আবার নূতন করিয়া প্রসারিত করিতে চাহিয়াছেন। বিশ্ব অন্তহীন বিরোধাভাসে পরিপূর্ণ, আবার পূর্ণ সামঞ্জস্যভূতও বটে। ইহা যে চিত্রার সামঞ্জস্যীভূত রূপ নয় তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না। তাহার যেটুকু আভাস একেবারে শেষ পর্য্যায়ের কাব্য গুলির মধ্যে ধরা পড়িয়াছে তাহা প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা নির্দেশ করিব।

মানসী কাব্যের বিশ্ব-সত্তা এবং তাহাকে লাভ করিবার কবি-প্রাণের যে আর্তি তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া প্রসঙ্গ ক্রমে এই কয়েকটি দিক উল্লেখ করিতে হইল।

বিশ্বানুভূতি লাভের আকাঙ্ক্ষা যে স্বরূপে ব্যক্ত হোক-না-কেন, কবির অন্তরের মুখ্য প্রেরণা বলিয়া কবির কাব্যেরও ইহা মর্মগত উপলব্ধি।

মানসী কাব্য হইতে সর্বাগ্রে তাহার কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। কবি বোধ করেন তিনি যেন এক কালে এই বিশ্বের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন। তাহার পর ওই অনন্ত প্রাণ-ধারা হইতে কেমন করিয়া, কোন রহস্যের বশে তিনি আজ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন।

সেদিনকার বিশ্বের অচিন্তনীয় বৈচিত্রময় অনুভূতি কবির হৃদয়-তটে স্মৃতির এক একটি স্তর রূপে সঞ্চিত হইয়া আছে। কবি আজ তাই বিশ্ব প্রকৃতির সব কিছুর সহিত নিবিড় একাত্মতা বোধ করেন। কবির অন্তরে তাই মিলন লাভের জন্য এমন ব্যাকুলতা, কিন্তু মিলিত হইবার পথ হারাইয়া গিয়াছে।

কোন্ অরূপ-লোকে এক চেতনা প্রবাহে আমরা যেন একাকার হইয়াছিলাম,

তাহার পর কেমন করিয়া অন্তহীন রূপে রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। সকলের সহিত মিলিত হইতে চাহিতেছি, মাঝখানে রূপের ব্যবধান।

অহল্যাকে সম্বোধন করিয়া বস্তুত কবি আপনার এই অধ্যাত্ম-ব্যাকুলতাকেই ব্যক্ত করিয়াছেন। অহল্যার মত কবিও একদিন বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম হইয়াছিলেন।

"—সেই গূঢ় মাতৃ কক্ষে
সুপ্ত ছিলে এতকাল ধরণীর বক্ষে,
চির রাত্রি সুশীতল বিস্মৃতি-আলয়ে,
যেথায় অনন্ত কাল ঘুমায় নির্ভয়ে
লক্ষ জীবনের ক্লান্তি ধূলির শয্যায়,
নিমেষে নিমেষে যেথা ঝরে পড়ে যায়
দিবসের তাপে শুষ্ক ফুল দগ্ধ তারা,
জীর্ণ কীর্তি শ্রান্ত সুখ দুঃখ দাহ হারা।" (অহল্যার প্রতি)

এখন বিচ্ছিন্ন সত্তায়

"হাসে পরিচিত হাসি নিখিল সংসার
তুমি চেয়ে নির্নিমেষ।—" (অহল্যার প্রতি)

এমন করিয়া মন উদাস হইয়া যায়। অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অতি গোপন কী এক অনুভূতি জাগে, মনে হয় যেন একদিন এই সকলের সহিত আমাদের নিবিড় আত্মিক মিলন ছিল। সে যেন কোন জন্মান্তরীণ স্মৃতি। নহিলে প্রাণ মন এমন করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত মিলন যাচ্ঞা করে কেন?

কিন্তু ইহা কি সেই প্রেরণা যাহার বশে মানুষ সকল রূপের অন্তরালবর্তী এক শাশ্বত চেতনা লাভের জন্য ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সকল দীপ একে একে নিভাইয়া দিয়া ধ্যান মগ্ন হইয়া যায়? বস্তুত ইহা এক জাতীয় রূপ-পিপাসা ছাড়া আর কিছু নয়। জাগ্রত ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন অমন করিয়া বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যকে এক সৌন্দর্য-প্রতিমা তিলোত্তমায় রূপায়িত করিয়া বাহু বেষ্টনে লাভ করিয়া ধন্য হইতে চাহিয়াছে। এই রূপ-পিপাসার সহিত একপ্রকার ঐতিহাসিক বোধ বিজড়িত থাকায় উহা আরও প্রসারতা লাভ করিয়াছে।

বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত রূপকে একটি বিগ্রহের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার, একটি দেহাধার পূর্ণ করিয়া বিশ্ব-রূপামৃত নিঃশেষে পান করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহা সীমা বা রূপেরই এক বিশিষ্ট আকাঙ্ক্ষা।

'মেঘদূত' কবিতাটি বিশ্লেষণ করিলে ইহার স্বরূপ আরও স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্যই হোক, কিংবা বিশিষ্ট কোন কবির কাব্য আশ্রয় করিয়া হোক উভয় ক্ষেত্রেই সেই এক সৌন্দর্য-ধ্যানের পরিচয় লাভ করা যায়।

কালিদাসের মেঘদূত কাব্যের অত্যন্ত সমৃদ্ধ বিচিত্র সৌন্দর্য-লোক রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল মুগ্ধ করিয়াছে। কল্পনায় কবি মেঘদূতের সেই সৌন্দর্য-লোক সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। কবির অন্তরেও যে সেই এক সৌন্দর্য-লোকের ধ্যান।

বিচিত্র খণ্ড রূপের অন্তরালে যে এক অরূপ বা অখণ্ড রূপ-লোক রহিয়াছে, কালিদাসের সৌন্দর্য্য-ধ্যান যেমন, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-ধ্যানও তেমনি পরিণামে সেই অরূপলোকে বিগলিত হইয়াছে।

কবির মন পরিণামে এই অখণ্ড সৌন্দর্য-লোকে সীমাহীন বিস্তার লাভ করিয়াছে, ইহাই কবির মুক্তি। "কবি তব মন্ত্রে আজি মুক্ত হয়ে যায়, রুদ্ধ এই হৃদয়ের বন্ধনের ব্যথা"।

মনে সৌন্দর্যের সীমাবদ্ধ রূপ ধরা পড়ে। মনেরও সীমা ছাড়াইয়া দিব্য-চেতনা লাভ করিতে হয়। মানবীয় চেতনার উর্দ্ধে এই যে অরূপ তত্ত্ব, তাহা অখণ্ড তত্ত্ব বটে, কিন্তু তাহা সীমাবদ্ধ বিচিত্র সৌন্দর্যের সমাহার নহে।

কবির এই অখণ্ড সৌন্দর্যোপলব্ধি মানস-চেতনায় অনুভূত বিচিত্র খণ্ড সৌন্দর্যের মিলিত প্রকাশ মাত্র, তাহা উর্দ্ধতর চেতনা সাক্ষাৎকার নহে। অখণ্ড সৌন্দর্যের তত্ত্ব আসিয়াছে মানস-লোকে অনুভূত খণ্ড সৌন্দর্যের বিকল্প স্বরূপে।

এই অখণ্ড সৌন্দর্যকে কবি ধ্যানে আলিঙ্গন করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই, তাহাকে বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন, উহাকে আবার একটি নারীবিগ্রহ সমাশ্রিত করিয়া দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। আমি কবির সেই জিজ্ঞাসাটিকে এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"ভাবিতেছি অর্দ্ধরাত্রি অনিদ্র-নয়ান,
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন উর্দ্ধে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?
সশরীরে কোন্ নর গেছে সেইখানে,
মানস-সরসী তীরে বিরহ-শয়ানে,

রবিহীন মণি দীপ্ত প্রদোষের দেশে
জগতের নদী গিরি সকলের শেষে।" (মেঘদূত)

অতি মানবীয় চেতনায় যে অরূপের সাক্ষাৎকার ও আসঙ্গ লাভ, সেই দিব্য-চেতনায় নহে, ইহলোকে এই ইন্দ্রিয়-দ্বারে কবি তাঁহাকে সশরীরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। মর্তের কোন একটি নারী বিগ্রহের মধ্যে সেই অখণ্ড সৌন্দর্যকে কি বাহু বেষ্টনে লাভ করিতে পারা যায় না?—এই অধ্যাত্ম-পিপাসা রবীন্দ্র-কাব্যে বিচিত্র তত্ত্ব-পরিণাম লাভ করিয়াছে।

মানস-লোকে সৌন্দর্য যে পরিণাম লাভ করুক না কেন, তাহা আদৌ ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী বলিয়া খণ্ডিত। ইন্দ্রিয় বোধের উপর ইহার ভিত্তি বলিয়া সৌন্দর্যকে বাহিরে সম্ভোগ করিবার অমন আকাঙ্ক্ষা কবি-চিত্তে, কোন-না-কোন স্বরূপে থাকিবেই। কবির মানস সমৃদ্ধির ফলে রূপ-পিপাসা যেমন দুর্নিবার হইয়া উঠিয়াছে, অতৃপ্তির পীড়াও তেমনি অসহনীয় বোধ হইয়াছে। কবি তখন এই অতৃপ্তি দূর করিতে চাহিলেন এক তিলোত্তমার পরিকল্পনা করিয়া। বিশ্বের সকল রূপ তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিয়া এই তিলোত্তমার সৃষ্টি। এক্ষেত্রে বিশ্বাত্মা বলিতে কবি এই তিলোত্তমাটিকে বুঝিয়াছেন।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির বৈচিত্র বিশ্বের প্রাকৃতিক বৈচিত্রের অনুরূপ। আর সেই সকল প্রকৃতি বৈচিত্রের প্রকাশ ঘটিয়াছে কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের মধ্যে। অবশ্য কবি কেবল তাহার মাধুর্যের দিকটিই কাব্যের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত মিশিয়াছে পৌরাণিক ভারতবর্ষের বিচিত্র সৌন্দর্যের স্মৃতি, তাহার মহত্ত্ব ও সাধনার বিচিত্র ধারা। এক কথায় বলা যায় কাব্যটির মধ্যে ভৌগোলিক ভারতবর্ষের এবং সংস্কৃতি-সাধনার ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড অপরূপ মাধুর্যময় প্রকাশ ঘটিয়াছে। এক পরিপূর্ণ সুষমামণ্ডিত জগৎ, তাহার মধ্যে মানুষের মহত্ত্বের বিচিত্র সাধনা এবং প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের এই অখণ্ড ভারতবর্ষকে স্বপ্নে অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনায়ও কি এই দুইটি ধারার পরিচয় আমরা লাভ করি না? একদিকে তিনি যেমন প্রকৃতির অন্তহীন প্রকাশ মাধুরীকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি নিখিল মানবের মনুষ্যত্বের বিচিত্র সাধনাকে উপলব্ধি করিতে উৎসুক ছিলেন।

'মেঘদূত' কাব্য আলোচনার ক্ষেত্রে ইহার অনিবার্য প্রাসঙ্গিকতা নাই।

যাহা লক্ষণীয় তাহা এই যে কালিদাসের কাব্য-জগৎ রবীন্দ্রনাথের কল্পনা সমৃদ্ধ চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া গভীর ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য বিজড়িত হইয়া আর এক নূতন জগতে পরিণত হইয়াছে।

মনে হয় কালিদাসের রূপলোক বিন্যাসের মধ্যে যে বিস্তৃতি, পুনরাবৃত্তি, কোথাও কোথাও যে বেসুর আছে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-ধ্যানের মধ্যে সেই সকল দিক পরিত্যক্ত হইয়া আশ্চর্য সংহতি লাভ করিয়াছে। অথচ আশ্চর্য এই রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্য-সৌধের প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ড কালিদাসের কাব্য-জগৎ হইতে সংগৃহীত।

সৌন্দর্যের প্রকাশ-রূপের মধ্যে তাই কবির রূপ-কল্পনার কোন বৈশিষ্ট আমরা লক্ষ্য করি না। এই জাতীয় কাব্য রচনায় তাহা সম্ভবও নয়। যাহা বৈশিষ্ট তাহা হইল ওই রূপ-লোককে আবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে কবির আশ্চর্য্য সমৃদ্ধ বাসনা-লোক। কালিদাসের কাব্যে সে বাসনা নিঃসন্দেহে ভিন্নতর। কেবলমাত্র এই কারণেই কালিদাসের সকল শব্দ সম্পদ, সকল রূপ-কল্পনা আশ্রয় করিয়াও তাহা এক নূতন সৃষ্টি হইয়া উঠিতে পারিয়াছে।

প্রভাত সঙ্গীতে 'অনন্তজীবন' কবিতাটির মধ্যে ব্যক্তি-আত্মার এবং 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির মধ্যে বিশ্বাত্মার একটি স্বরূপ কল্পনা আছে। মানসীর মধ্যে এই তিলোত্তমা বিশ্বাত্মা রূপে অনুভূত হইয়াছে।

বলিয়াছি, মানস-প্রেরণায় ব্যক্তি-আত্মা বা বিশ্বাত্মার এমনি এক একটি স্বরূপ অনুভূত হয়। পরবর্তী কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই জাতীয় প্রত্যেকটি তত্ত্ব-সৃষ্টি প্রয়াসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব।

বিশ্বের শক্তি স্পন্দন সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়। এমনি করিয়া বিশ্বের যোগে মানুষ একে একে উর্দ্ধতর চেতনা লাভ করিয়া পরিশেষে বিশ্ব-চেতনা লাভ করে।

এখন মানসী হইতে কবির প্রেমবোধের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। প্রাণের অনুভূতিকে কবি আজ মানস বা ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। মানসী কাব্যে কবির ধ্যানৈক প্রেমের পরিচয় লাভ করা যায়।

ধ্যানে প্রেমের যে অসীম সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহাই আপাতত কবির মুক্তি-লোক। প্রেম-লোকে অন্তহীন মানস-অভিসারের ভিতর দিয়া কবির কাব্য সৃষ্টি। যে প্রেমে এই ধ্যান সদা জাগ্রত থাকে না, সে প্রেম

পুরুষকে বিনষ্ট করে। পুরুষ মনোধর্মী, মিস্টিক, পুরুষ ধ্যানী। এই ধ্যানের ভিতর দিয়া সে নিরন্তর সৃষ্টি করিয়া চলে।

আসক্তির বশে পুরুষ যখন নারীকে নিকটে লাভ করিতে চায়, তখন এই ধ্যান-লোকটি ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই কালে পুরুষ সকল সৃষ্টি প্রেরণা নিরুদ্ধ এক প্রকার অসহনীয় বন্ধন নিপীড়ন বোধ করে।

"বাঁশি বেজেছিল, ধরা দিনু যেই
থামিল বাঁশি।" (ভুল ভাঙ্গা)

মানস-অভিসারে আনন্দ-লোকের দ্বার একটির পর একটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। ইহার মধ্যে চরম প্রাপ্তি বলিয়া কিছু নাই, থাকিতে পারে না। এক্ষেত্রে চরম প্রাপ্তির যে-কোন আকাঙ্ক্ষা কবির নিকট অধ্যাত্ম-প্রেরণা বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের রসলোক নিরন্তর সৃষ্টি-প্রেরণা-লোক। নিঃশেষে কোন কিছু লাভ করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহাতে সৃষ্টি-প্রেরণা নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

'পুরুষের উক্তি' কবিতাটির মধ্যে কবি প্রেমের অবিরাম সৃষ্টি-প্রেরণা তত্ত্বটিকে অস্বীকার করিয়াছেন। প্রেমের সীমা-লোকটিকে পুরুষের ধ্যান সহজেই অতিক্রম করিয়া যায়। পুরুষ তখন নারী-প্রেমের সীমা-লোকটিকে পরিহার করিয়া অসীমকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। পর পর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"সৌন্দর্য সম্পদ মাঝে বসি
কে জানিত কাঁদিছে বাসনা।"
"তোমারে ছেড়েও আজ আছে চরাচর"।
"এস থাকি গৃহ কোনে সুখে দুঃখে দুই জনে
দেবতার তরে থাক পুষ্প অর্ঘ্য ভার।" (পুরুষের উক্তি)

নর-নারীর প্রেম একান্ত মিথ্যা নয়। কিন্তু উহার সার্থকতার একটি সীমা আছে। উহাকে তাই একটি বৃহৎ নামে চিহ্নিত করিয়া অসীম তত্ত্বের সহিত একাত্ম করিয়া তুলিবার কোন প্রয়োজন নাই। প্রেম বোধ মানবীয় চেতনার একটি বিশিষ্ট প্রকাশ হইতে পারে; কিন্তু সমগ্র প্রকাশ নয়, শ্রেষ্ঠ প্রকাশও নয়। নর-নারীর বিরহ-মিলনের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া এই জগৎ ও জীবন অনন্ত বিস্তৃত। বিশ্ব লীলা, জীবনের অনন্ত প্রসারকে প্রেমের সীমা-লোকের মধ্যে সঙ্কুচিত করিয়া দেখিলে জীবন ও জগৎ একান্ত খণ্ডিত হইয়া যায়।

ধ্যানে সৌন্দর্য ও প্রেম যত বিস্তার লাভ করুক-না কেন, তাহার আদৌ

ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর বলিয়া সীমা-লোক। ধ্যান-লোকে নিরন্তর সৃষ্টি-প্রেরণা বা রস-প্রেরণার যে তত্ত্বকে কবি আপাতত মুক্তি-লোক বলিয়া বোধ করিয়াছেন, তাহাও বস্তুত সীমার লোক।

সৌন্দর্য ও প্রেমের সীমার বোধ যে-কোন-পরিণামে অসীমতা লাভ করিতে পারে না বলিয়াই কবি উহাকে কখন কখন অধ্যাত্ম-প্রেরণা বিরোধী বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

কবির প্রেম-ধ্যান এবং সৌন্দর্য-লোকে অণ্ডহীন মানস-অভিসার যে কী তাহার পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

"দিবস নিশি ধরে ধ্যান করে তাহারে
নীলিমা পরপার পাব তার দেখা কি ?" (বিরহানন্দ)

ধ্যানে নিঃশেষ কোন প্রাপ্তি বোধ নাই বলিয়া মনে অমন এক প্রকার সংশয় ব্যাকুল জিজ্ঞাসা থাকিয়া যায়।

ধ্যান-লোকে মিস্টিক মিলন সম্ভোগের পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

"কখনো সারারাত ধরি হাত দুখানি
রহি গো বেশ বাসে কেশ পাশে মরিয়া।" (বিরহানন্দ)

ধ্যান-লোকও সীমার লোক বলিয়া মানবীয় চেতনা যে কোন মুহূর্তে নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসিতে পারে এবং আসেও। বস্তুত ওই সীমা ছাড়াইয়া না উঠিলে মানবীয় চেতনা উন্নত স্থায়ী পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

ধ্যান ভঙ্গ হইতে কবির সে কী অসহায় অবস্থা! সৌন্দর্য-মাধুর্যলেশহীন, করুণাশূন্য সে শুধু প্রবৃত্তির দহন জ্বালা। এখানে ধ্যান নাই, সৌন্দর্য সম্ভোগ নাই, উহার আনন্দ প্রেরণায় সৃষ্টি নাই।

"নাই গো দয়ামায়া স্নেহ ছায়া নাহি আর,
সকলি করে ধূ ধূ প্রাণ শুধু শিহরে।" (বিরহানন্দ)

যাহাকে আমরা জীবনাধিক করিয়া ভালবাসি সে যখন চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়, তখন মুহূর্তের মধ্যে জীবন ও জগতের সমস্ত মাধুর্য অন্তর্হিত হয়। অন্তরে বাহিরে কেবল এক প্রকার অতল গহ্বর শূন্যতা বিরাজ করে। আর সেই অতলতার মধ্যে মানব মন নিক্ষিপ্ত হইয়া শূন্য হইতে শূন্যে তলাইয়া যায়।

"সহসা এ জগৎ ছায়াবৎ হয়ে যায়।" (ক্ষণিক মিলন)

এই শূন্যতার আকাশ পূর্ণ করিয়া আবার কোথা হইতে সৌন্দর্যের মেঘ

ভাসিয়া উঠে। বিরহের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া একদিন সুর উৎসারিত হয়। পুরুষের সকল সৃষ্টির সহিত তাই এমন দুঃসহ বেদনা বোধ বিজড়িত হইয়া যায়।

বিরহে প্রাণের শূন্যতা এমনি করিয়া ধ্যানে অমৃতরূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে। এমনি করিয়া বেদনার সমুদ্র পার হইয়া ধ্যানের আনন্দ-তীরে উত্তীর্ণ হওয়াকেই বলে প্রেমের মুক্তি। বিরহে যে প্রেমে প্রাণ শূন্যতায় হারাইয়া যায় সে প্রেম বন্ধন মাত্র।

"যে জন চলিয়াছে তারি পাছে সবে ধায়
নিখিলে যত প্রাণ যত গান ঘিরে তায়।" (ক্ষণিক মিলন)

আসক্তি বিজড়িত প্রেম পুরুষকে ধ্যান লোকে মুক্তি দেয় না, একটি সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে এই কালে কবিকে যে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল মানসীর মধ্যে তাহারও পরিচয় আছে।

প্রেম যেখানে আসক্তি মাত্র সেখানে মানুষ বৃহৎ বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া কেবল প্রেমের পাত্রকেই একান্ত করিয়া তুলিতে চায়। ইহাতে সমগ্র চেতনা অশ্রুমুখীন হইয়া বিশ্বের সকল আলো নিভাইয়া দিয়া ধ্যানে ওই মূর্তি আবেষ্টন করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে চায়। কেবল এক মোহময় প্রবৃত্তি।

"যারে ফেলিয়া এসেছি, মনে করি, তারে
ফিরে দেখে আসি শেষ বার—" (ভৈরবী)

আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে কবি তখন জীবনের মহত্তর প্রেরণা আশ্রয় করিতে চাহিয়াছেন।

"যাব যাঁর বল পেয়ে সংসার পথ তরিয়া
যত মানবের গুরু মহৎ জনের চরণ চিহ্ন ধরিয়া।" (ভৈরবী)

কিন্তু প্রেম বা সৌন্দর্য মোহের আবেষ্টন মুক্ত হওয়া তো সহজ নয়। প্রাণ-মনের সমস্ত শক্তিকে উহা যেন ধীরে ধীরে নিঃশেষ করিয়া দিতে থাকে।

"হায় উঠিতে চাহিছে পরাণ, তবু ও
পারে না তাহারা উঠিতে।" (ভৈরবী)

কড়ি ও কোমলের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে কবি খণ্ড-রূপের অন্তরালে এমন একটি অখণ্ড তত্ত্ব লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যাহাকে লাভ করিলে জীবনের সকল জিজ্ঞাসা ও ব্যাকুলতার অবসান ঘটে।

মানসী রচনাকালে কবির মধ্যে এমনি একটি বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে অমন

নিঃশেষ কোন প্রাপ্তি জীবনে সম্ভব নয়। এই যে বিশ্বাস, যে বিশ্বাস আশ্রয় করিয়া কবি আপাতত সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহার স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। মানসীর কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া আমি কবির এই জাতীয় উপলব্ধির স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করিব।

মানবাত্মা জীবন হইতে জীবনে অনন্ত অভিসার করিয়া চলিয়াছে, তাহাকে বেষ্টন করিয়া কালে কালে রূপ হইতে রূপে অনন্ত রহস্য উদ্বেল হইয়া উঠিতেছে, সেই সমগ্র সত্তাকে তাই একটি জন্মের সীমা-বদ্ধ চেতনায় নিঃশেষে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

মানবাত্মার অনন্ত অভিসার তত্ত্ব, অন্তহীন অভিব্যক্তি তত্ত্ব বিজড়িত হইয়া রবীন্দ্রনাথের নিকট জীবন অন্তহীন বিস্ময় বিজড়িত হইয়া গিয়াছে।

এই অভিসার বা বিকাশ অন্তহীন নয়, ইহার একটি সমাপ্তি আছে। জীবনের এই পূর্ণতার ধ্যান রহিয়াছে 'বিশ্ব-জগতের' মধ্যে 'ঈশ্বরে'র মধ্যে ; যাঁহাকে বিশ্বাত্মা এবং দিব্য-চেতনা বলা যায়। উহা শৃঙ্খলাবদ্ধ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা আশ্রয় না করিবার জন্য কিছুটা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট হইলেও এই তত্ত্ব সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না।

"অতি সযতনে
অতি সঙ্গোপনে
সুখে দুঃখে নিশীথে দিবসে
বিপদে সম্পদে
জীবনে মরণে
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্ব জগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি—" (নিষ্ফল কামনা)

প্রতি মুহূর্তের বিচিত্র অনুভূতি, আনন্দ-বেদনার বিচিত্র দোলা, বিশ্বের বিচিত্র সৌন্দর্য সম্ভোগের ভিতর দিয়া মানুষের যে অক্ষয় সত্তা ধীরে রূপ লাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাহাতে জল-স্থল-আকাশের কোন্ অভিপ্রায় চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে তাহা মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ চেতনার দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারে না।

এই নিখিল বিসৃষ্টি, উহার অনন্ত কোটি প্রাণ আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের কোন এক অভিপ্রায় সৃষ্টির আদি কাল হইতে ধীরে ধীরে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ একদিকে জগৎ ও জীবনের অনন্ত স্বরূপতা বোধ করিয়াছেন,

অন্যদিকে আবার জীবনের সীমাবদ্ধ চেতনাটিকে শাশ্বত নিয়তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। মানবীয় চেতনায় অসীমের কোন উপলব্ধি সম্ভব নয়।

জগৎ ও জীবনের এই আনন্ত্যের বোধ গড়িয়া উঠিয়াছে সীমাবদ্ধ চেতনায়, তাই উহার মধ্যে সর্বত্র রূপের ধর্ম প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহা রূপ হইতে রূপে অন্তহীন কাল ধরিয়া বিহার। অরূপের যোগে নিত্য লীলা। দুই কোন একটি পরিণামে যে এক স্বরূপতা লাভ করে, মানুষ যে সীমার সকল বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে, এই দার্শনিক উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের জীবনে এখনও ঘটে নাই। তাই কবি এমন উক্তি করিয়াছেন,

"আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের। (নিষ্ফল কামনা)

লাভ করিতে না পারা গেলেও জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে এক পরম ঐক্য তত্ত্ব রহিয়াছে, এই জগৎ ও জীবন যে সেই পরম সত্যের প্রতিভাস এই সম্পর্কে কবির মনে কোন সংশয় নাই। প্রতিভাস স্বরূপে ছাড়া আর কোন উপায়ে মানুষ পরম সত্য লাভ করিতে পারে না।

"দেখো ওই ছায়াখানি মেলিয়া নয়ন,
রূপ নাহি ধরা দেয় বৃথা সে প্রয়াস।" (নিষ্ফল প্রয়াস)

কবি এই মানব ভাগ্যকে শাশ্বত নিয়তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন—

"বুঝিবার নহে যাহা চাই তাহা বুঝিবারে"

কিংবা

"এই চির আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।" (মৌন ভাষা)

মানবীয় চেতনায় উর্দ্ধতর সত্যের যতটুকু আভাস আসিয়া পৌঁছায় তাহাতেই মানুষকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। ইহাই মানব ভাগ্য। তাহার শাশ্বত নিয়তি।

জীবন ও মৃত্যুর উভয় তীর পূর্ণ করিয়া চেতনার এই যে এক আশ্চর্য প্রকাশ, ইহার অর্থ কি? ইহা কি কেবল স্বপ্নে সঞ্চরণ করিয়া ফেরা?

কোন্ প্রভাতে আমরা ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিব, কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে? ঘুম ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠিয়া এই জগৎ ও জীবনের তখন কোন্ স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিব? যেমন স্বপ্নে জাগিয়া উঠিবার ব্যর্থ চেষ্টা করি, তেমনি আমাদের হৃদয়-লোকে গুহাহিত এক প্রাণী জাগিয়া উঠিবার জন্য নিষ্ফল মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

প্রেমোপলব্ধিতে নর-নারীর অন্তরে যেন একটি আলোক শিখা জ্বলিয়া উঠে,

উহারই আলোকে এই জীবন ও জগতের কিছুটা অর্থ চকিতে চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়া যায়।

একদিকে জীবনের এই উপলব্ধি—

'মায়া কারায় বিভোর প্রায় সকলি" (শূন্য হৃদয়ের আকাক্ষা)

অন্যদিকে ওই আকাক্ষা—

"দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি আবরণ।" (শূন্য হৃদয়ের আকাক্ষা।

প্রেম যেখানে পরিণামে নর-নারীকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, সেখানে বিচ্ছেদ বা বিয়োগ বেদনা যত গভীর হোক-না-কেন, তাহা জীবনকে একান্ত বিনষ্ট করিয়া দেয় না।

বিচ্ছেদে জীবনের একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত উদ্ভিন্ন হইয়া যায় বলিয়া প্রেমে কবির অন্তরে এত আশঙ্কা জাগিয়া থাকে। নিবিড় আত্মহারা প্রেমোপলব্ধির মধ্যে বারংবার এই আশঙ্কাটাই চকিতে আলোকপাত করিয়া কবির অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত শিহরণ তুলিয়াছে।

প্রেম একটা সীমার মধ্যে ক্রমাগত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতে চায় কোন্ প্রেরণার বশে তাহা আমরা জানি।

"আজিকে শুধু একেলা তুমি
আমার আঁখির-আলো" (আশঙ্কা)

কিংবা

"তোমারে ছেড়ে বিশ্বে মোর
তিলেক নাহি ঠাঁই।" (আশঙ্কা)

এই প্রেম-বন্ধন যদি কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, তবে

"চিহ্নসম কেবল রবে
মৃত্যু রেখা কালো।" (আশঙ্কা)

মানবীয় চেতনা যত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, প্রেম ও সৌন্দর্য বোধ তত বিস্তার লাভ করে। একেবারে আত্মিক চেতনায় মানবীয় যে-কোন বোধ, তাহা যতই উন্নত হোক-না-কেন, আর থাকে না। মানস-লোকের জাগরণটিই এমনই বিরাট ও উদার-প্রশান্ত যাহাতে নিম্নতর চেতনার বিক্ষোভ চাঞ্চল্য প্রায় লুপ্ত হইয়া যায়। মানবীয় চেতনার ঊর্দ্ধতর কোন অনুভূতির কথা নয়, মানস-লোকের ব্যাপ্তি ও প্রশান্তির কথাই কবি এক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন। স্থির আকাশের নিম্নে যেমন মেঘের বিচিত্র লীলা চলে, অথচ আকাশ স্পর্শ

করিতে পারে না, তেমনি মানস-লোকে চেতনা যখন একটি স্থির পরিণাম লাভ করে তখন নিম্নতর চেতনার চকিত বিচিত্র প্রকাশ অন্তরকে আর বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না।

প্রেমের অনুভূতিকে কবি এই স্থির ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে চান। এই আকাঙ্ক্ষাই 'আকাঙ্ক্ষা' কবিতাটির মর্ম কথা।

"দুটি প্রাণ তন্ত্রী হতে পূর্ণ একতানে
উঠে গান অসীমের সিংহাসন পানে।" (আকাঙ্ক্ষা)

স্থির ধ্যানে প্রেমে এক প্রকার মুক্তি ঘটে। নর-নারীর জীবনে তাহা আর বন্ধন স্বরূপ হয় না। উভয়ে উভয়কে তখন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখে। নর-নারীর প্রেম ওই পরিণাম লাভ করিয়া অসীমের জন্য ধ্যান নিমগ্ন হয়। জীবনের এই ব্যাপ্তি যে মানস-লোকে তাহা 'অসীমের সিংহাসন পানে' এই উক্তিটি হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথ এইভাবে নানা পথ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছাইয়াছেন। তাহার পর এই সীমার বোধটিকে জীবের চিরন্তন নিয়তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন।

প্রেমকে মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবার কবির এই যে সংগ্রাম ও আকাঙ্ক্ষা তাহা এইকালে কোথাও যে সার্থক হয় নাই তাহা নহে।

মানস-লোকে প্রেম যে কী ব্যাপ্তি লাভ করে এবং এই অসীম ব্যাপ্ত লোকের মধ্যে নর-নারীর হৃদয় কিরূপ ধ্যান নিমগ্ন হইয়া যায় তাহার পরিচয় 'ধ্যান' কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"নিত্য তোমায় চিত্ত ভরিয়া
স্মরণ করি,
বিশ্ব বিহীন বিজনে বসিয়া
বরণ করি।" (ধ্যান)

ধ্যানে সমগ্র চেতনা যখন অন্তর্মুখীন হইয়া উঠে, তখন বাহিরের সমস্ত কিছু দৃষ্টি সমক্ষ হইতে দূরে সরিয়া যায়, অন্তরে বাহিরে তখন কেবল এক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার স্রোত বহিয়া চলে। তাহার পর ওই অন্ধকার সমুদ্র মথিত করিয়া উভয়ের অন্তরে উভয়ের দিব্যমূর্তি ভাসিয়া উঠে। ধ্যানে এই যে মিলন তাহাতে আর বিচ্ছেদ নাই বিয়োগ নাই।

নারী-হৃদয়ের ঐশ্বর্যকে পুরুষ কখন নিঃশেষ করিয়া লাভ করিতে পারে না।

"নাই সীমা আগে পাছে, যত চাও তত আছে,
যতই আসিবে কাছে তত পাবে মোরে।" (আমার সুখ)

জীবনে প্রেম একপ্রকার মিস্টিক অনুভূতি। ইহা এক দৈব মুহূর্তে নর-নারীর জীবনে অকস্মাৎ অনুভূত হয়।

"সহসা কী শুভক্ষণে অসীম হৃদয় রাশি
দৈবে পড়ে চোখে—" (আমার সুখ)

যাহার জীবনে সে আস্বাদ নাই, সে প্রেমের এই অনন্ত স্বরূপতা বোধ করিতে পারে না। এই অনুভূতি যে কী, তাহাকে তাই বুঝাইতে পারা যাইবে কোন্ উপায়ে? হৃদয়ের ঐশ্বর্য একমাত্র প্রেমের আলোকে ধরা পড়ে। যেখানে তাহা নাই, সেখানে প্রেম যাচ্ঞার মত নর-নারীর এমন অসম্মাননা আর কিছু নাই।

ধ্যান-লোকে প্রেমের এই প্রাপ্তির পর প্রত্যক্ষ মিলন-বিচ্ছেদ একান্ত গৌণ হইয়া যায়। অন্তরে অসীম সৌন্দর্য ও প্রেমের লোকে নর-নারী চিরকালের জন্য ধ্যানমগ্ন হইয়া যায়। বহির্জীবনে আর যে কোন প্রাপ্তি তখন একান্ত তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়।

"শুধু স্বপ্ন, শুধু স্মৃতি, তাই নিয়ে থাকি নিতি" (আমার সুখ)

'বিদায়' কবিতাটির মধ্যে এই নিত্য করুণ প্রশান্ত মানস আসঙ্গ লাভের পরিচয়।

"সম্মুখে তোমারি নয়ন জেগে আছে
আসন্ন আঁধার মাঝে অস্তাচল কাছে
স্থির ধ্রুব তারা সম—" (বিদায়)

দিনের পরে দিন চলিয়া যায়। ওই প্রেমের স্মৃতি সকল বেদনা-বিক্ষোভের ঊর্দ্ধে ধ্রুব তারকার মত দিনে দিনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি জানি না, তাহার পর এই অতুলনীয় প্রেমের সম্পদ বক্ষে লইয়া অজ্ঞাত জীবন পথ বাহিয়া একদিন মৃত্যুর মধ্যে চিরান্ধকার লোকে কোথায় হারাইয়া যাইব!

সকল প্রয়োজন, সকল বিস্মৃতির ঊর্দ্ধে ধ্রুব তারকার মত স্থির সেই অশ্রুস্নিগ্ধ মাধুর্যময় প্রেমের ধ্যান-লোক।

"সে অমর অশ্রুবিন্দু সন্ধ্যা তারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি 'পরে—" (বিদায়)

সারাদিন নানা প্রয়োজনে আমরা ব্যাপৃত থাকি। তাহার পর যখন প্রয়োজন ফুরায়, যখন বিশ্রাম রাত্রি ঘনাইয়া আসে তখন মনের মধ্যে পশ্চাতে ফেলিয়া

আসা প্রেমের স্মৃতি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। অন্তর মথিত করিয়া বেদনা জাগে,—অলৌকিক আনন্দ আস্বাদের মত আকাঙ্ক্ষিত সে বেদনা। সারারাত ঘুমের ঘোরে আমরা অশ্রুপাত করিয়া চলি। ভোরের শীতল বায়ু স্পর্শে ঘুম ভাঙ্গিয়া মনে হয় যেন কোন আনন্দ-লোক হইতে স্খলিত হইয়া গিয়াছি।

বিচ্ছেদে অন্তহীন ব্যথা-সমুদ্রের ঊর্দ্ধে প্রেমের স্মৃতি ধ্রুব তারকার মত স্থির আনন্দ-কিরণ বিকীর্ণ করে।

মানসীর মধ্যে কবির প্রেম মুখ্যত প্রেমের স্মৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে। তাহার জন্য সে প্রেম কিন্তু সান্ত্বনাহীন অপার হাহাকার বিজড়িত হইয়া হৃদয় মন্থন-কারী একান্ত বিক্ষোভকে জাগাইয়া তোলে না। বিরহে সে বেদনা এক আশ্চর্য পরিব্যাপ্তি লাভ করিয়া করুণ-শান্ত মহিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর সেই শান্ত অশ্রুসজল অন্তরের উপর দিয়া লঘু মেঘখণ্ডের মত ভাবনার স্রোত ধীরে ধীরে বহিয়া গিয়াছে।

এক চিরনিস্তব্ধতা, শান্ত মৌনতা হইতে অন্তহীন রূপ নিয়ত উৎসারিত হইতেছে। চিত্তের গভীরতম লোক হইতে আত্মার আলোক আপনাকে স্বতই বিকীর্ণ করিতেছে, তাহা আবার চিরন্তন কোন এক তত্ত্বভূমিতে প্রতিহত হইয়া নিত্য নূতন রূপে, রঙে, ভাবনায় চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রূপসৃষ্টির এই তত্ত্বভূমিকে বলা হয় মায়া যাহা অনির্বচনীয়। বিশ্ব সৃষ্টির এই রহস্যের প্রকাশ দেখি কবির সকল সৃষ্টিকর্মের মধ্যে, বিশেষ করিয়া তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে।

কবির প্রেমানুভূতির বিচিত্র পরিচয় লাভ করিতে বসিয়া একটি বিশিষ্ট প্রেমের কবিতা এবং তদাশ্রয়ী কবির বিশিষ্ট একটি তত্ত্বানুভূতির কিছু পরিচয় লাভ প্রয়োজন। কারণ এই তত্ত্বটি পরবর্তী কালে কবির দার্শনিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। কবিতাটির নাম 'অনন্ত প্রেম'। আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাহার দুই চারিটি পংক্তি সর্বাগ্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি
শত রূপে শতবার
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।" (অনন্ত প্রেম)

বিশ্বের প্রাণ-ধারা ও সৌন্দর্যানুভূতি আশ্রয় করিয়া নর-নারীর অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দিয়া প্রাণ-লোকের, প্রাণ-লোক হইতে মানস-লোকের পূর্ণ জাগরণ ঘটায় এবং এইরূপে পরিণামে মানস-চেতনাকে ছাড়াইয়া যাইতে প্রেরণা

দান করে। এই চেতনা বিকাশে ব্যক্তির তাই কোন বিশিষ্ট মূল্য থাকিতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ এইখানে একটু বিশিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়াছেন। বিশ্বের এই বিকাশ তত্ত্বে তিনি বিশেষের একটি সত্য মূল্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া আমার অন্তরে প্রেম উপজাত হইয়াছে, সেই যে 'তুমি' এবং এই যে 'আমি' ইহার শাশ্বত একটি লীলা তত্ত্ব কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নিখিল বিশ্বের বিকাশ ধারায় বিশিষ্ট 'তুমি' এবং বিশিষ্ট 'আমি' যে জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া লীলা করিয়া চলিয়াছে, এমনি এক প্রকার বোধ কবি লাভ করেন।

রবীন্দ্রনাথের এই 'তুমি' ইন্দ্রিয় চেতনায় একটি বিশিষ্ট বিগ্রহ মাত্র, প্রাণ-চেতনায় প্রাণ-তত্ত্ব, মানস বা ধ্যান-লোকে মানসী।—তাহারই অতুলনীয় রূপ-রাশি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। তদূর্দ্ধ চেতনায় এই তুমি কবির জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতা লোক হইতে লোকান্তরে রূপ হইতে রূপে কবিকে গড়িয়া তুলিতেছেন। জীবনের এই ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া জীবন-দেবতার এক বিশেষ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতেছে। ইহার উর্দ্ধতর চেতনায় এই 'তুমি' বিশ্ব-চেতনা বা ঈশ্বর।—সর্ব জীবের সাধারণ সত্তা রূপে ইনি সকল জীবের নিখিল-বিসৃষ্টির নিয়তি গড়িয়া তুলিতেছেন। আরও উর্দ্ধে এই তুমি ব্রহ্ম ; যিনি অরূপ, অসীম, চির স্থির শাশ্বত এক অস্তিত্ব মাত্র।

সমগ্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই 'তুমি' কখন নারী বিগ্রহ, কখন প্রাণ, কখন মন, কখন জীবন-দেবতা কখন বিশ্বদেবতা বা ঈশ্বর, কখন বা ব্রহ্ম।

প্রেমের অনুভূতি মানুষের জন্মজন্মান্তরকে যে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে যে মানুষের সীমাহীন ব্যাকুলতার প্রকাশ, সকল উচ্চ-আশা ও মহত্ত্বের গান যে প্রেমকে ঘিরিয়া প্রকাশলাভ করে, প্রেম যে বর্ণনাতীত অন্তহীন ভাবনা মানব হৃদয়ে সঞ্চারিত করিয়া দেয় ; এমন ভাবের কথা বারংবার প্রকাশলাভ করিলেও তাহাকে অতিক্রম করিয়াও যে জীবনের সীমাহীন প্রসার, সেই অভিসারে প্রেমের বন্ধনকে ছিন্ন করিয়া করিয়া, তাহার সকল সঞ্চয় ভারকে পথপ্রান্তে লঘু করিয়া দিতে দিতে যে অগ্রসর হইতে হয় এই বোধও সেইসঙ্গে জাগ্রত হইয়াছে। তাঁহার "নিষ্ফল কামনা" কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণে পড়িতে পারে। বলাকার পর্যায় হইতে কবির জীবনে এই বোধটি একান্ত হইয়া উঠে। প্রেমের এই আত্মসচেতন ভাবের সঙ্গে মিশিয়াছে কবির অত্যুচ্চ নৈতিক বোধ।

"অপবিত্র ও কর পরশ
সঙ্গে ওর হৃদয় নহিলে।
মনে কি করেছ বঁধূ, ও হাসি এতই মধু
প্রেম না দিলেও চলে, শুধু হাসি দিলে।" (নারীর উক্তি)

প্রেম আত্মিক মিলন অনুভূতির প্রকাশ। এই প্রকাশকেই নরনারী বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে নানারূপে আস্বাদ করিয়া ধন্য হয়। প্রেমবিহীন ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার ভার বহন করিবার ক্ষমতা মহত্তম শক্তির অধিকারী পুরুষেরও নাই। ইন্দ্রিয় সম্ভোগ সেই দাহ যাহাকে প্রেম নিত্য অমৃত সিঞ্চিত করিয়া নির্বাপিত করে। এই অমৃতের নিত্য আস্বাদ বঞ্চিত যে ইন্দ্রিয় সম্ভোগ তাহাতে পুরুষের পৌরুষ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। প্রেমের কবিতায় এই নৈতিক বোধটি সর্বাগ্রে প্রত্যক্ষ করিতে হয়। তাহার পর ইন্দ্রিয় লীলা বিলাস থাকা বা না থাকা কবির ব্যক্তিগত সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

মানসী কাব্য হইতে প্রেমের সার্থক প্রকাশ রূপে দুই একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি। সার্থক প্রকাশ নিঃসন্দেহে কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

"দেখিবে তাহলে
আমার সে বিদায়ের শেষ চেয়ে-দেখা
এইখানে রেখে গেছে জ্যোতির্ময় রেখা।
সে অমর অশ্রু বিন্দু সন্ধ্যা তারকার
বিষণ্ণ আকার ধরি উদিবে তোমার
নিদ্রাতুর আঁখি-'পরে ; সারা রাত্রি ধরে
তোমার সে জনহীন বিশ্রাম-শিয়রে
একাকী জাগিয়া রবে। হয়তো স্বপনে
ধীরে ধীরে এনে দেবে তোমার স্মরণে—
জীবনের প্রভাতের দু-একটি কথা।" (বিদায়)

বিচ্ছেদে বা বিয়োগে প্রেম তো হারায় না। তাহা অন্তরের মধ্যে ধ্রুব তারকার মত অচঞ্চল মূর্তি পরিগ্রহ করে। উহারই ভিতর দিয়া আবিষ্ট মুহূর্তে অসীমের বিচিত্র আভাস ধ্যান-নেত্রে ফুটিয়া উঠে। সেখানে অন্তহীন রূপ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে, মাঝখানে কল্প-কল্পান্তরের ব্যবধান। আমরা জানি অথবা না জানি সে প্রেম ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্ত গতিকে নিয়মিত করে নিগূঢ় প্রেরণা রূপে। কবিতাটির মধ্যে যাহা লক্ষ্য করিবার তাহা

হইল ইহার অন্তর্গত আশ্চর্য শান্ত মহিমা, যাহা জীবনের সকল সুখদুঃখের চলমানতার অতীত। কবিতাটি অশ্রুবিন্দুর মত নিডোল, শিরীষ-কেশর প্রান্তস্থিত শিশির বিন্দুর মত স্থির আবেগে কম্পমান।

কিংবা 'সন্ধ্যায়' কবিতার এই কয়েকটি পংক্তি—

"আমি শুধু চেয়ে থাকি অশ্রুহীন শ্রান্ত-আঁখি
পড়ে থাকে পৃথিবীর 'পরে
খুলে দাও কেশভার, ঘন স্নিগ্ধ অন্ধকার
মোরে ঢেকে দিক স্তরে স্তরে।
রাখো এ কপালে মম নিদ্রার আবেশ-সম
হিমস্নিগ্ধ করতল খানি।
বাক্যহীন স্নেহভরে অবশ দেহের 'পরে
অঞ্চলের প্রান্ত দাও টানি।
তারপরে পলে পলে করুণার অশ্রুজলে
ভরে যাক নয়ন পল্লব।" (সন্ধ্যায়)

ইহার সহিত নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। একটি উক্তি পুরুষের অন্যটি নারীর।

"আমি কুন্তল দিব খুলে।
অঞ্চল মাঝে ঢাকিব তোমায়
নিশীথ নিবিড় চুলে।
দুটি বাহুপাশে বাঁধি নত মুখখানি
বক্ষে লইব তুলে।
সেথা নিভৃত নিলয় সুখে
আপনার মনে বলে যেয়ো কথা
মিলন মুদিত বুকে,
আমি নয়ন মুদিয়া শুনিব কেবল
চাহিব না মুখে মুখে।" (ভালকরে বলে যাও)

উদ্ধৃত অংশ দুইটির মধ্যে পুরুষ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, আকাশের মত পরিব্যাপ্ত নীল মহিমায় অচঞ্চল। তাহারই নিম্নে মেঘের আলোক বুকে তুলিয়া আনমনে রঙের রূপের বিচিত্র লীলা। ইহাই সৃষ্টির তত্ত্ব। নারী সেই অন্তহীন বিষাদের

তত্ব, যে বিষাদ জ্যোতি বক্ষে সীমার রেখা টানিয়া টানিয়া নিয়ত অগণিত রূপ ফুটাইয়া ঝরাইয়া দিতেছে।

মানসীর মধ্যে এই জাতীয় যে কয়েকটি প্রেমের কবিতা সার্থক হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্যাসানের আতিরেক কোথাও নেই, তাহা রূপ-কল্পনায় সমৃদ্ধও নয়, ভাষার অতি ঔজ্জ্বল্য ও বাকভঙ্গির চমকও তাহার মধ্যে নাই। তাহা একান্ত সহজ ও সরল। তাহার মাধুর্য শান্ত করুণ শ্রীর মধ্যে।

বাংলাদেশের প্রকৃতি যেমন স্নিগ্ধ শ্যাম, দাক্ষিণ্যের ভারে আনত, যেমন কল্যাণরূপিনী, তাহার মধ্যে যেমন বিশেষ কোন অগোচরতা ও রহস্য নাই, বাংলাদেশের নারী এবং তাহার প্রেমের প্রকাশও তেমনি। মানসীর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে এই বৈশিষ্টই নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রসঙ্গত 'অপেক্ষা' কবিতাটিরও উল্লেখ প্রয়োজন। কবিতাটির মধ্যে কবির দূরস্থিত প্রিয়ার প্রতি যে মানস অভিসার এবং প্রিয়ার সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে নানাভাবে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিবার যে ব্যাকুলতা, সৌন্দর্যকে ঘিরিয়া পরিণামে কবির যে ধ্যান তন্ময়তা, যাহার সার্থক প্রকাশ রূপ দেখি কল্পনার "স্বপ্ন" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে তাহা এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবিতাটির মধ্যে যে ত্রুটি সর্বাধিক রূপে দৃষ্টিগোচর হয় তাহা হইল ইহার অতি বিস্তারিত বর্ণনা। সংহতির অভাবের জন্য প্রেয়সীর মূর্তি স্থির সৌন্দর্যে সুস্পষ্টরূপে কোথাও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। মূর্তিটি সচল, অস্থির এবং নানা অবস্থার ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কবির ধ্যান নিবিড়তা লাভ করে নাই। তবে পরবর্তীকালের কাব্যধারার ভিতর দিয়া যে সৌন্দর্য-ধ্যানের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার প্রারম্ভিক প্রকাশ রূপে "অপেক্ষা" কবিতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা আছে।

মানসীর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে প্রথম হইতেই এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে যাহা তাঁহার পরবর্তীকালের রচিত সকল প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে কম-বেশী লক্ষ্য করা যায়।

ছিন্নপত্রের একস্থলে কবি বলিয়াছেন, তিনি যখন গল্প রচনা করেন তখন চতুস্পার্শ্বের প্রকৃতি তাহার আলোছায়া তাহার বিচিত্র ধ্বনি, বিচিত্র সৌরভ লইয়া কাহিনীর তন্তুতে তন্তুতে সূক্ষ্ম জাল বুনিয়া চলে। সে রচনা যেমন তাঁহার তেমনি প্রকৃতিরও।

এ মন্তব্য তাঁহার সকল রচনার মত প্রেমের উপলব্ধির ক্ষেত্রেও সত্য।

প্রেমের মূল ভাবকে আশ্রয় করিয়া মানব হৃদয়ের যে বহু বিচিত্র সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাঁহার উপর প্রকৃতি আপনার নিগূঢ় সকল মাধুর্য বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছে। তাহার উপর আঁকা পড়িয়াছে আলোছায়ার বিচিত্র আলপনা।

তাহার সুরে বিজড়িত রহিয়াছে প্রকৃতির বিচিত্র ধ্বনি। কোকিলের কুহু তান, কপোতের ক্লান্ত স্বর, নদীর জলকলতান. পত্রের মর্মর ধ্বনি, সবকিছু বিজড়িত হইয়া তাহাকে অগাধ, অসীম পরিব্যাপ্তি দান করিয়াছে, একপ্রকার অন্তহীন আবেগ, চির অতৃপ্তির এক অপরিজ্ঞাত বেদনা।

প্রকৃতির বিচিত্র সৌরভ তাহার ভিতর হইতে যেন বাহির হইয়াছে। সে প্রেমকে প্রশান্ত গম্ভীর করিয়া তুলিয়াছে নক্ষত্রক্ষচিত রাত্রির আকাশ। তাহাকে করুণ কোমল, বিধুর করিয়া তুলিয়াছে আষাঢ়ে জলভারাক্রান্ত মেঘের শ্যামছায়া; কখন তাহা আসন্ন সন্ধ্যার কনকবর্ণে অশ্রু ছলছল।

বিস্তীর্ণ বালুচরের একপ্রান্তে ক্ষীণ প্রবহমানা গঙ্গা; তাহার ওপারে বনের মাথার উপরে মেঘ ঘনাইয়া আসে, নদীবক্ষে তাহারই স্নিগ্ধ ছায়া নামে। মনে হয় উন্মুখ ধরিত্রী এমনি এক দুর্লভ মুহূর্তে তাহার গভীরতম বাণীটিকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারে। জীবনের সকল ভাবকে তখন বুঝি একজনের কাছে নামাইয়া দেওয়া সম্ভব। শ্রাবণ অপরাহ্ণে ফোটা যুঁই ফুলের গন্ধে বাতাসের বুকে অলৌকিক বেদনা, প্রস্ফুটিত চাঁপাগাছের ফাঁক দিয়া দেখা যায় দূর আকাশের নিঃসঙ্গ তারাকে। সেই অলৌকিক বেদনা, সেই নিঃসঙ্গতা তাহার প্রেমবোধে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

প্রেমের অন্তর্দৃষ্টি যে জীবন ও জগতের সকল রহস্য ভেদ করিতে এবং সকল মাধুর্যকে উদ্‌ঘাটিত করিতে পারে কবির মধ্যে একদিন এই জাতীয় স্থির উপলব্ধি ছিল।

"দিবে সে খুলি এ ঘোর ধূলি—
আবরণ।
"তাহার হাতে আঁখির পাতে
জগত-জাগা জাগরণ।
সে হাসিখানি আনিবে টানি
সবার হাসি,

গড়িবে গেহ, জাগাবে স্নেহ
জীবন রাশি।
প্রকৃতি বধূ চাহিবে মধু,
পরিবে নব আভরণ।" (শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা

কবি শীঘ্রই ইহার সামর্থ্যের সীমা বোধ করিতে পারেন। কবির এই স্বপ্ন ভঙ্গের পরিচয় রহিয়াছে "নিঃস্ফল কামনা", "পুরুষের উক্তি", "মৌন ভাষা" প্রভৃতি কবিতার মধ্যে জীবন ও জগতের অনন্ত রহস্যের একটি প্রান্তভাগ মাত্রকে প্রেম আপনার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে পারে। যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রেম উপলব্ধ হয় তাহার অন্তহীন জন্মজন্মান্তর ব্যাপ্ত জীবন প্রসারের কতটুকুই বা আমরা জানি। প্রেম এমনি তুচ্ছ এবং এতই ক্ষণিক! তাহার অচিন্তনীয় বিরাট ভাগটি চিরকাল আমাদের বোধের সীমার বাহিরে থাকিয়া যায়।

জীবন ও জগতের এই চিরন্তন নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াই কবি প্রেমের পূর্ণ মূল্য দানের জন্য প্রস্তুত।

প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরের অন্তরে যে বোধের জগৎ গড়িয়া উঠে তাহাই আমাদের জগত। তাহার বাহিরে আর যাহা কিছু তাহা চির অপরিজ্ঞাত। তাহারই আলোকে জীবন ও জগতের মহাগ্রন্থের দুই একটি লিপি আমরা পাঠ করি। তাহার পর মৃত্যুতে কোন চির অন্ধকার লোকে হারাইয়া যাই। কবিচিত্তে ইহার জন্য কোন ক্ষোভ নাই; বরং এই বোধদৃষ্টি প্রেমকে আশ্চর্য করুণ শান্ত শ্রীমণ্ডিত করিয়াছে।

"তোমার সাহস আছে, আমার সাহস নাই।
এই যে শঙ্কিত আলো অন্ধকারে জ্বলে ভালো,
কে বলিতে পারে বলো যাহা চাও একি তাই।
তবে ইহা থাক্ দূরে কল্পনার স্বপ্নপুরে,
যার যাহা মনে লয় তাই মনে করে যাই—
এই চির আবরণ খুলে ফেলে কাজ নাই।" (মৌনভাষা)

প্রেমানুভূতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবিকে যেমন প্রবৃত্তির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল, তেমনই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে। মানব-জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি বস্তুত পৃথক নয়। ইন্দ্রিয়-লোকে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অনুভূতি যেমন একান্ত সঙ্কীর্ণ, তেমনি অসহনীয়

বিক্ষোভ সৃষ্টিকারী। প্রাণ-চেতনা হইতে ধীরে ধীরে মানস-চেতনায় ওই প্রেম যত গভীরতা লাভ করে, প্রবৃত্তির সহিত ওই দ্বন্দ্বটাও তত হ্রাস পয়। আমরা এ পর্যন্ত তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করিলাম।

প্রাণের স্তর হইতে সৌন্দর্যানুভূতিকে মানস-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে কবিকে যে কী দুর্বার সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল 'মানসী' হইতে এখন তাহার কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। প্রারম্ভে 'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতাটির আশ্রয় লইতেছি। কবিতাটির মধ্যে এই সংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আছে। ইন্দ্রিয় চেতনাশ্রয়ী কবির সেই সৌন্দর্যবোধ—

"ইন্দ্রিয় দিয়ে তোমার মূর্তি
পশেছে জীবন মূলে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

ইন্দ্রিয় চেতনায় অনুভূত কবির এই সৌন্দর্যানুভূতি কবির জীবনে কী বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

কবি যেন অন্তহীন অতল গহ্বর নিয়ত বিক্ষুব্ধ সৌন্দর্য-সাগরে ভাসিয়া চলিয়াছেন, তাই স্থির কোন একটি লোক লাভের জন্য এমন অধীরতা। 'সোনার তরী'র মধ্যে কবির সৌন্দর্য-লোক যেমন আরও সমৃদ্ধ হইয়াছে তেমনি সকল রূপের অতীত এক শাশ্বত চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা আরও তীব্র হইয়াছে।

মানস-লোকে চেতনার সমুন্নতির সঙ্গে নিম্নতর চেতনা সকল অধিকতর সামর্থ লাভ করে। সেইজন্য মানস-লোকে ইন্দ্রিয়-প্রাণের পিপাসা. সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি আশ্চর্য প্রসারতা লাভ করে।

আবার মানস-লোকে উর্দ্ধতর-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা সর্বাধিক তীব্রতা লাভ করে। তখন এই মানস-বিহার পরিহার করিতে হয়। তখন বিশিষ্ট কোন রূপ আশ্রয় করিয়া মন ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন হইয়া যায়।

সৌন্দর্য-লোকে কবির সেই উদ্বেল ভাসমান অবস্থা—

"আকাশ আমারে আকুলিয়া ধরে,
ফুল মোরে ঘিরে বসে,
কেমনে না জানি জ্যোৎস্না প্রবাহ
সর্ব শরীরে পশে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিশ্বের সৌন্দর্য সহস্র ধারায় কবিচিত্তে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে। কে যেন সকল

ইন্দ্রিয় দ্বারে সৌন্দর্যের অগ্নি শিখা জ্বালাইয়া দিয়াছে, তাহারই অসহনীয় উত্তাপে কবি-প্রাণ দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। সেই দগ্ধ চিত্তের হাহাকার কবিতাটির মর্ম মূলে ধ্বনিত হইয়াছে। কবি তাই এই সৌন্দর্যানুভূতিকে প্রাণ-লোক হইতে চিরস্থির ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রেও কবির এই একই প্রয়াস আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

"শান্তি রূপিনী এ মূরতি তব
অতি অপূর্ব সাজে
অনল রেখায় ফুটিয়া উঠিবে
অনন্ত নিশি মাঝে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

সৃষ্টি-প্রেরণা ইন্দ্রিয় বা প্রাণের প্রেরণা নয় তাহা ধ্যান বা মানস-লোকের সামগ্রী। ধ্যানে বস্তুর পূর্ণ স্বরূপের প্রকাশ ঘটে। নিম্নতর চেতনায় রূপ বিকৃত, অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট হইয়া ধরা পড়ে। শিল্পী অন্তরের স্থির ধ্যান-লোকটিকে বাহিরে নানা ভাবে রূপায়িত করেন।

"চৌদিকে তব নূতন জগৎ
আপনি সৃজিত হবে।" (সুরদাসের প্রার্থনা)

বিচিত্র সৌন্দর্যের অন্তরালে যে এক পরম সৌন্দর্যের স্থিরলোক, কবি এখন সেই লোকটিকে লাভ করিতে চান। সেই একের সন্ধান লাভ ঘটিলে কবি বুঝিবেন এই বৈচিত্র যেমন সত্য, তেমনি একও সত্য। এই একের সন্ধান লাভ জীবনে যতদিন না ঘটে, ততদিন এই বিচিত্র বোধ জীবনে অসহায় বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। দুইয়ের যোগে যে সাক্ষাৎকার, তাহাই পূর্ণ সাক্ষাৎকার।

মানস-লোকে সৌন্দর্যবোধ অসামান্য ব্যাপ্তি লাভ করে। অন্তর্লোকে যেমন একটি স্থির সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে, তেমনি উহারই যোগে বহির্বিশ্বের সৌন্দর্যও অপার হইয়া উঠে।

"সৃষ্টি ব্যাপিয়া রয়েছ তবুও
আপন অন্তঃপুরে।" (আত্মসমর্পণ)

মানস-লোকের এই স্থির সৌন্দর্য-লোকটিকেই কবি বিচিত্র ভাব-ভাবনার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন।

কবির আকাঙ্ক্ষা অন্তরের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোকটিকে বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে প্রত্যক্ষ করিবার। অথচ তাহাকে বাহিরে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

ওই ধ্যানের সামগ্রীকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে তাহা একান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়ে। কবি জানেন সৌন্দর্য কেবল ধ্যান-লোকের সামগ্রী।

"শুধু ফুটন্ত ফুল মাঝে
দেবী, তোমার চরণ সাজে।"

একদিকে ধ্যানের অন্তহীন রূপলোক, অন্যদিকে বাস্তব-জীবনের রূঢ়তা ও মালিন্য। এই দুইয়ের মাঝে হয়ত কোন মিল আছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাহা কবির অজ্ঞাত। দিব্য-চেতনা ও বিসৃষ্টি, অরূপ ও রূপের মধ্যে যেমন, তেমনি দেহ ও আত্মা, ধ্যানের সৌন্দর্য ও প্রেম, আদর্শ-লোক এবং বাস্তব মালিন্য ও তুচ্ছতার মধ্যে কবি সমস্ত জীবন ধরিয়া সামঞ্জস্য সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। এই তত্ত্ব জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া তিনি পরবর্তী জীবনে একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মানসীর মধ্যে এমন দুই একটি নিসর্গ কবিতা আছে, যেগুলির মধ্যে কবি আপনার জীবনে প্রকৃতি প্রভাবের গভীরতার কথা ব্যক্ত করিয়াছেন।

মানব-জীবনে যেমন একটি ঊর্দ্ধাভিমুখী প্রেরণা আছে, তেমনি একটি নিম্নাভিমুখী প্রেরণা আছে, যাহার ফলে সে প্রতিনিয়ত নিম্নতর চেতনার দিকে, ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। বিশ্ব-প্রকৃতি মানব-জীবনের সকল নিম্নাভিমুখী প্রবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত ঊর্দ্ধাভিমুখী করিয়া উন্নততর চেতনা-লোকে আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা এবং কাব্য-সাধনা রবীন্দ্রনাথের কাছে পৃথক ছিল না। প্রকৃতির সহিত মানব-জীবনের নিবিড় যোগের কথা তাই তিনি নানা ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ বিষয়ে সর্বাধিক চিন্তাপূর্ণ এবং বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে 'শান্তিনিকেতনে', 'তপোবন' প্রবন্ধটির মধ্যে।

প্রকৃতিকে স্বীকার করিবার জন্য ভারতীয় সাধনধারা এবং সংস্কৃতি ইউরোপীয় সাধনধারা ও সংস্কৃতি হইতে কতকটা বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

প্রকৃতির মাঝখানে মানুষের প্রবৃত্তি যে-কোন সময়ে খুব বেশি উদ্দামতা লাভ করিতে পারে না, পরন্তু উহাকে ব্যাপকতর লোকে ছড়াইয়া দিয়া শান্ত করিয়া দেয়। প্রকৃতি মানব-জীবনকে যে-কোন বিশিষ্ট ভাবাতিরেক হইতে রক্ষা করিয়া যে সামঞ্জস্য দান করিতে পারে, তাহা তিনি এই দেশীয় সাহিত্য বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্য বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন।

অন্যদিকে প্রকৃতি হইতে মানব-জীবন যেখানে দূরে সরিয়া আসিয়াছে,

সেখানে এক-একটি বিশিষ্ট প্রবৃত্তির ভয়ঙ্কর বিক্ষোভ লক্ষ্য করা যায়। সেক্ষপীয়রের নাটকগুলির মধ্যে প্রবৃত্তির এই আশ্চর্য উদ্দামতার পরিচয় লাভ করা যায়।

জগৎ ও জীবনের বিচিত্র অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের মধ্যে 'কুহুধ্বনি' যেন নিত্য কাল ধরিয়া একটি পরিপূর্ণ সুষমার জগৎ গড়িয়া তুলিতেছে।

"জটিল সে ঝঙ্কনায় বাঁধিয়া তুলিতে চায়
সৌন্দর্যের সরল সঙ্গীতে।" (কুহুধ্বনি)

জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে একটি পূর্ণ সুষমা-লোক রহিয়াছে কুহুধ্বনি যেন আমাদের চেতনায় সেই পূর্ণতার আভাস দান করে। ওই ধ্বনির ছিদ্র পথ দিয়া আমাদের বিক্ষুব্ধ অন্তরে কোন সীমাহীন সমুদ্র-কূলের বাতাস আসিয়া পৌছায়। বাস্তব-জীবনের সকল দাহ মুহূর্তে জুড়াইয়া যায়।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশের জন্য অনিবার্যরূপে যে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিতে হয়, এইরূপে বহির্বিশ্বের সহিত চেতনার ক্রম প্রসারিত মিলন বোধের ভিতর দিয়া ব্যক্তিসত্তার যে ধীর চরিতার্থতা এই সম্পর্কে কবি এইকালেই যে একপ্রকার নিঃসংশয় হন তাহার পরিচয় লাভ করা যায় বিশেষ করিয়া "প্রকৃতির প্রতি" কবিতাটির মধ্যে।

প্রকৃতিজগৎ সীমাহীন ব্যাপ্ত, অনন্ত বৈচিত্রপূর্ণ এক চিররহস্যময় প্রকাশ। বর্ণ, গন্ধ ও ধ্বনির ভিতর দিয়া ইহা মানব অন্তরে নিয়ত বিচিত্র ভাবনা সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। সেই বোধে, সেই ভাবনায় মানব-হৃদয় নিয়ত ব্যাকুল। অথচ সেই সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে কী নির্মম ঔদাসীন্য। তাহাকে সম্পূর্ণ করিয়া জানিয়া নিঃশেষে লাভ করবার কোন উপায় নাই।

যে প্রকৃতিকে ঘিরিয়া এত সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাহাকে মনে হয় যেন নিশ্চেতন। যেন দেশ-কাল পরিপূর্ণ করিয়া জড়ের প্রবাহ বলিয়া চলিয়াছে, সে প্রবাহে সংখ্যাতীত রূপের বুদ্‌বুদ ভাসিয়া উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে।

প্রকৃতিকে নিশ্চেতন, নির্মম উদাসীন জানিয়াও অন্তরকে তো নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায় না। অনিবার্য প্রেরণায় তাহা বহির্বিশ্বের সহিত সংযোগ কামনা করে। তাহাতেই বোধ করিতে পারা যায় আমরা প্রকৃতির স্বরূপ বুঝি বা না বুঝি, প্রকৃতি আমাদের অন্তরে যে সুখ-দুঃখের বিচিত্র রাগিণী বাজাইয়া তুলিতেছে তাহার অর্থ আমরা না বুঝিতে পারিলেও জীবনের ইহাই যে

একমাত্র নিয়তি এবং ইহার ভিতর দিয়া জীবন যে-কোন এক অজ্ঞাত উপায়ে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে তাহা বোধ করিতে পারা যায়।

মানুষের বোধের সীমা যতই প্রসারিত হোক না কেন তাহার বাহিরে প্রকৃতির এক সীমাহীন জগত সকল সময় রহিয়া যায়। মানবিক বিচিত্র-বোধের সঙ্গে তাই অজ্ঞাত জগতকে ঘিরিয়া আমাদের অন্তরে সকল সময় এক ভীতির বোধ জাগিয়া থাকে। প্রকৃতি নানা ছলে আমাদের চেতনাকে আকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ করিয়া মুহূর্তে কী গভীর রহস্যে আবার দূরতম লোকে দাঁড়াইয়া মৃদু হাস্য করিতে থাকে।

প্রকৃতি এক অজ্ঞাত জগত বলিয়াই তাহাকে ঘিরিয়া এত সৌন্দর্য ও মাধুর্য। প্রকৃতিকে নিঃশেষে লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়াই মানব অন্তরে এত প্রেম, প্রেমকে আবেষ্টন করিয়া এত কান্না হাসি। সকল কালের দূরবর্তী সত্তা বলিয়াই সকল কালের মানুষের এত নিকটের সামগ্রী।

কবিতাটির মধ্যে প্রকৃতির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন রূপের পরিচয় দান করা হইয়াছে। তাহার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাহা প্রকৃতির কেবল মধুর রূপের ধ্যান নয়। সেই সঙ্গে তিনি তাহার কঠোর, ভয়ঙ্কর রূপেরও ধ্যান করিয়াছেন। তবে এই সকল রূপের ধ্যান যেমন সুসম্পূর্ণ রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, তেমনি এই সকল সৌন্দর্য ধ্যানের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন কোন যোগের সূত্রও লক্ষ্য করিতে পারা যায় না ;—যে সূত্রে বিধৃত হইয়া এই সকল রূপ এক অখণ্ড রূপের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে।

প্রকৃতির এই উভয় রূপকে আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনায় যে এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তাহা "নিষ্ঠুর সৃষ্টি", "সিন্ধুতরঙ্গ" প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিলে স্পষ্টই অনুমান করা যায়।

কবি শীঘ্রই এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠিলেন এক বিশিষ্ট উপায়ে। যে বোধ দৃষ্টির সহায়তায় তিনি এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠেন তাহা কবির জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়। যখন এই জাতীয় সাধনার অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে তিনি সচেতন হন, তখন নূতন করিয়া সাধনা সুরু করিবার কাল কবির জীবনে বহু পূর্বেই অতীত হইয়া গিয়াছে। আমরা গ্রন্থ মধ্যে ইহারই একটি পূর্বাপর পরিচয় দান করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

সেই সাধনার বৈশিষ্ট্য হইল প্রকৃতির কেবল মাধুর্যের ভাগটুকুকে আশ্রয় করিয়া এইরূপে আপনারই সৌন্দর্য-ধ্যান দ্বারা বহির্বিশ্বে এক সৌন্দর্য-

লোক সৃষ্টি করিয়া বহিঃ ও অন্তর্বিশ্বে নিয়ত চলাচলকে নির্বিরোধ করিয়া তোলা।

তাহারই পরমাশ্চর্য্য প্রকাশ দেখি ইহার ঠিক পরবর্তী কাব্যগ্রন্থে। এই অন্তর্দ্বন্দ্বকে কেবল সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়া উঠা নয়, সেই সঙ্গে আপনার সাধন বৈশিষ্টটি সম্পর্কে কেবল নিঃসংশয় হওয়াই নয়, এই অত্যল্প কালের মধ্যে তাহার পরিপূর্ণ প্রকাশ রূপটিকে ফুটাইয়া তোলা! ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়!

প্রকৃতির সৌন্দর্য আস্বাদের ভিতর দিয়া কবি চেতনা ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতির সহিত কি ভাবে সম্পূর্ণরূপে একাত্ম হইয়া যাইত, ব্যক্তির পৃথক অস্তিত্ববোধ পর্যন্ত থাকিত না নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে "ছিন্নপত্রের" বিচিত্র উপলব্ধির পূর্বাভাস।

"কোমল সায়হ্নে লেখা বিষণ্ণ উদার
প্রান্তরের প্রান্ত-আম্রবনে,
বৈশাখের নীলধারা বিমল বাহিনী
ক্ষীণ গঙ্গা সৈকত শয়নে,
শিরোপরি সপ্ত ঋষি যুগ-যুগান্তের
ইতিহাসে নিবিষ্ট-নয়ান,
নিদ্রাহীন পূর্ণচন্দ্র নিস্তব্ধ নিশীথে
নিদ্রার সমুদ্রে ভাসমান—
নিত্য নিশ্বসিত বায়ু, উন্মেষিত উষা,
কনকে শ্যামলে সম্মিলন,
দূরদূরান্তরশায়ী মধ্যাহ্ন উদাস,
বনচ্ছায়া নিবিড় গহন,
যতদূর নেত্র যায় শস্যশীর্ষ রাশি
ধরার অঞ্চলতল ভরি—
জগতের মর্ম হতে মোর মর্মস্থলে
আসিতেছে জীবন লহরী।
বচন-অতীত ভাবে ভরিছে হৃদয়,
নয়নে উঠিছে অশ্রুজল,
বিরহ বিষাদ মোর গলিয়া ঝরিয়া
ভিজায় বিশ্বের বক্ষঃস্থল।

প্রশান্ত গভীর এই প্রকৃতির মাঝে
আমার জীবন হয় হারা,
মিশে যায় মহাপ্রাণ সাগরের বুকে
ধূলি ম্লান পাপতাপ হারা।" (জীবন মধ্যাহ্ন)

নিঃসন্দেহে এই প্রকৃতি বর্ণনা সুসংহত হইয়া অরূপের রূপ মাধুরী লাভ করিতে পারে নাই। তবে কবি চেতনার সহিত প্রকৃতির যোগের রহস্যটি এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। প্রকৃতির সহিত কবিচেতনার ভিতর দিয়া কবিহৃদয়ে যে অন্তহীন ভাব-ভাবনা সঞ্চারিত হয় এবং একমাত্র এই ভাব-ভাবনাই যে কবির কাব্যের বিষয়বস্তু, কবি ইহাকেই যে কাব্যে রূপদান করিয়াছেন এই বোধটি তাঁহার পরবর্তী কাব্যধারার ভিতর দিয়া ধীরে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়াছে।

মানসীর মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবির যে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচয় লাভ করা যায় পরিশেষে তাহারই সামান্য উল্লেখ করিতেছি।

জগৎ ও জীবনের অন্তরালে যে পূর্ণ ঐক্যতত্ত্ব, তাহার সহিত মানবীয় চেতনা যতদিন না যোগযুক্ত অবস্থা লাভ করে ততদিন এই সংশয় ব্যাকুল জিজ্ঞাসা থাকিবেই। এই সাক্ষাৎকার না থাকিলে জগৎকে এক চেতনা শূন্য জড় প্রবাহ মাত্র বলিয়া মনে হয়; এই প্রবাহে চেতনা-পূর্ণ মানব হৃদয় অসহায়ভাবে দলিত হইতেছে। মনে হয় মানব-হৃদয় ও জড়-জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী, বিরুদ্ধ স্বভাব। একটির সহিত অপরটির স্বরূপ ও ধর্মগত এতটুকু মিল নাই। একটির মধ্যে চেতনার সীমাহীন প্রসার, আশ্চর্য অনুভূতি, অপরূপ সৌন্দর্য ও সুষমা, দিব্য-জীবনের আভাস, অন্যটির মধ্যে ইহাদের কিছুমাত্র প্রকাশ নাই—প্রাণের অনুভূতি নাই, চেতনার বিকাশ তো আরও পরের কথা।

মনুষ্য-চেতনার ধর্ম এতদূর বিপরীত যে তাহাকে মর্তের কোন পরিণা বলিয়া মনে হয় না। তাহা যেন কোন্ নন্দনের তটতরু হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে।

এই জাতীয় বিচিত্র জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ উভয়ের মিলন তত্ত্বটিকে চিরকাল অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন।

"হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানব-হৃদয়
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে?" (নিষ্ঠুর সৃষ্টি

এই নিখিল বিশ্বকে তখন কোন এক অস্তিত্বের উপর মায়ার প্রকাশ বলিয়া

মনে হয়। ইহার মধ্যে কোথাও নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। ইহা এক অর্থহীন সৃষ্টি-প্রবাহ মাত্র।

"সত্য আছে স্তব্ধ ছবি
যেমন উষার রবি,
নিম্নে তারি ভাঙে গড়ে মিথ্যা যত কুহক-কল্পনা।"

এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের পরিচয় অধ্যাত্ম-সাধনায় আছে। সেখানে মানবীয় চেতনা ওই স্থির এককে লাভ করিয়া বৈচিত্রকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া বোধ করে। এই একের উপলব্ধি গভীরতর হইলে বুঝা যায় যে ওই একই এমন অনন্ত রূপ-বৈচিত্র লাভ করিয়াছে। রূপ-সৃষ্টি তখন আর কুহক কল্পনা বলিয়া বোধ হয় না।

একদিকে অন্তহীন প্রেম ব্যাকুলতা, প্রেমে অবিরাম সৃষ্টি, অন্যদিকে নির্মম বিনষ্টি। এই উভয়ের মধ্যে মিল কোথায়? সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া নিখিল বিশ্বের কোন্ অভিপ্রায় সার্থক হইয়া উঠিতেছে?

"এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।
* * *
পাশাপাশি এক ঠাঁই দয়া আছে দয়া নাই
বিষম সংশয়।" (সিন্ধু তরঙ্গ)

যাহাকে সমস্ত অন্তর দিয়া আমরা ভালবাসি, সে যখন এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যায়, তখন আমাদের মর্মের সমস্ত গ্রন্থি মুহূর্তে শিথিল হইয়া পড়ে। যে আমাদের প্রেমে এত সত্য ছিল, যাহাকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের জীবনের সকল আনন্দ-বেদনা রূপ পাইত, মৃত্যুতে সে জীবনকে এমন অর্থহীন করিয়া দিয়া কোথায় যায়? কে ইহার উত্তর দিবে? ইহা সৃষ্টির আদিমতম প্রশ্ন।

"কাল ছিল প্রাণ জুড়ে, আজ কাছে নাই—
নিতান্ত সামান্য একি নাথ?"

পরম একের যোগেই জগৎ জীবনের সমস্ত কিছু অর্থান্বিত হইয়া যায়। সেই পরম একক লাভ করিবার জন্য কবির এমন ব্যাকুলতা।

"কত দেখা শোনা করে আনাগোনা
চারিদিকে অবিরত,

শুধু তারি মাঝে একটি কে আছে
তারি তরে ব্যথা কত।" (মায়া)

আজ কবির নিকট জগৎ ও জীবনের সকল স্বরূপ অজ্ঞাত। এই অনন্ত গ্রহ তারকার মাঝখানে এই আশ্চর্য পৃথিবীতে, ততোধিক আশ্চর্য মানবীয় চেতনার প্রকাশ। মানব-প্রেমের এই যে বিস্ময়কর অধীরতা ও মুগ্ধতা, বিরহে শূন্য প্রাণের যে কাতরতা—ইহার অর্থ কি? জীবনে কোন্ গূঢ় উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া মানুষ মৃত্যুতে আবার হারাইয়া যায়? কোন দিব্য-চেতনায় কোথাও কি এই জীবনের অভিপ্রায় নিহিত আছে?

"আমি কেঁদেছি হেসেছি ভালো যে বেসেছি
এসেছি যেতেছি সরে
কী জানি কিসের ঘোরে।" (উচ্ছৃঙ্খল)

সোনার তরী

'সোনার তরী'র মধ্যে বিশ্বের সহিত কবি-প্রাণের যোগ যেমন গভীরতর হইয়াছে, তেমনি মানুষকে তিনি আরও নিকট হইতে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এইরূপে একদিকে জগৎ অন্যদিকে জীবনের যোগে বিশ্ব-প্রাণের সহিত কবি-প্রাণের যোগ আরও গভীর, আরও সত্য হইয়া উঠিয়াছে। 'সোনার তরী'র মূল প্রেরণার পরিচয় দান করিতে গিয়া ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত এই দিকটির উল্লেখ করিয়াছেন।

একদিকে বিশ্ব প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য—

"পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্যামশ্রী, এপারে বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ জনহীনতা, মাঝখানে পদ্মার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে দ্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানা বর্ণের তুলি।"

অন্যদিকে সুখ-দুঃখ-ক্ষুব্ধ মানব জীবনের বিচিত্র প্রয়াস—

"অহরহ সুখ দুঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবন ধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁছচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।"

আর এই দুইয়ের যোগে বিশ্ব-প্রাণের সহিত কবি-প্রাণের যোগ গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল।

"আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা, বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব লোকের মধ্যে নিত্য সচল অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা।"

সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি কবির জীবনে যত গভীর যত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বসত্তার সহিত কবির যোগ তত গভীর, উভয়ের সামঞ্জস্য তত সম্পূর্ণ হইয়াছে; কিংবা বলা যায়, বিশ্ব-সত্তার সহিত ব্যক্তি-সত্তার যোগ যত গভীর যত সত্য হইয়াছে, সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি তত গভীর হইয়াছে। চেতনা বিকাশে ব্যক্তি ও বিশ্ব পরস্পর নির্ভরশীল। সৌন্দর্য ও প্রেম বিচ্ছিন্ন সত্তার সেতুবন্ধন স্বরূপ। উভয়ের যোগে সৃষ্ট এক আশ্চর্য প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথের মুক্তি তত্ত্বে জগৎ ও জীবন পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া যে পূর্ণতার সাধনা তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট শূন্যতার সাধনা মাত্র। উহাতে কেবল বঞ্চনাই লাভ করিতে হয়। তাঁহার এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে 'পরশ পাথর' এবং 'আকাশের চাঁদ' কবিতার মধ্যে। জগৎ ও জীবন বিবিক্ত কোন পরম তত্ত্বোপলব্ধি, যাহা লাভ করিলে জগৎ ও জীবনের সকল রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, এমন কোন দার্শনিক মনোভাবকে রবীন্দ্রনাথ এইকালে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন। বস্তুত অমর্ত ও মর্ত-চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব কবির জীবনে কোনকালেই ঘুচে নাই।

নিখিল বিশ্ব যে-পরম সত্যের প্রতিভাস স্বরূপ, মর্তের রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে তাহারই আভাস আসিয়া পৌঁছায়; কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

রূপ বৈচিত্রের অন্তরালে যে এক, অখণ্ড সত্তা, তাহা লাভ করিতে হইলে বৈচিত্রকে স্বীকার করিতে হয়। এই বৈচিত্রই ক্ষণে ক্ষণে ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার মিলন ঘটায়। সীমা বা রূপ এইরূপে মুহূর্তে অসীম বা অরূপের আভাস দান করে। 'পরশ পাথরে'র সন্ন্যাসী এই সত্যটি উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

এইকালে তাঁহার অন্তরে এমনি একপ্রকার স্থির বিশ্বাস গড়িয়া উঠে যে সীমা বা রূপের বোধ আশ্রয় করিয়া অমর্ত-চেতনার যে আভাস জাগে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। ওই আভাসমাত্র রূপে তাহাকে লাভ করিতে হয়। মনের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার যে সাধনা তাহাতে এই কালে তাঁহার সংশয় ছিল। এইকালে কবির এমনি একপ্রকার বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে মনের সীমা অতিক্রম করিবার চেষ্টা মনুষ্য প্রকৃতি বিরোধী, তাহা মানুষের চেষ্টার অসাধ্য।

'মানসী'র মধ্যে এমনি একপ্রকার বিশ্বাসবোধ প্রথম গড়িয়া উঠে। আমি প্রসঙ্গত তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই বিশ্বাসই 'সোনার তরী'র মধ্যে আরও গভীর হইয়া আপনার অনুকূল করিয়া জীবন ও জগতের একটি দার্শনিক-রূপ গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দার্শনিক যুক্তিকে এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর যে অতি চেতনালোক, তাহা লাভ করিলে হয়ত মানুষ সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়; জীবনকে বিশ্বের সমস্ত কিছু হইতে বিচ্ছিন্ন

করিয়া সমগ্র ইন্দ্রিয়-দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুদীর্ঘ জীবন ব্যাপী নিরন্তর ধ্যানের ভিতর দিয়া হয়ত চকিতের জন্য তাহার আভাস লাভ করা যায়; কিন্তু জগৎ ও জীবনকে অস্বীকার করিয়া যে সাধনা, যে সাধনায় জাগতিক এবং মানবীয় সকল বোধকে লোপ করিয়া দিতে হয়, তাহাতে মানুষের কি প্রয়োজন? মানুষের জীবনে সে ফল লাভের মূল্য কতটুকু?

জগৎ ও জীবন পূর্ণ করিয়া এই যে অপার সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা, যাহা মানুষের চেতনাকে মুহূর্তে এই প্রাত্যহিক জগতের উর্দ্ধে বা গভীরে অন্তহীন রহস্য নিকেতনে পৌঁছাইয়া দেয়, সন্ন্যাসী ইহ-জীবনে তাহা কিছুমাত্র বোধ করিয়া গেল না।

একদিকে অমর্ত-চেতনা, যাহাকে লাভ করিলে দেশ-কালের পরিসীমায় মর্তচেতনা লুপ্ত হইয়া যায়, অন্যদিকে মানবীয় চেতনা। এইকালে রবীন্দ্রনাথ দুইটি চেতনাকে স্পষ্ট দ্বিধাগ্রস্ত বলিয়া বোধ করিয়াছেন।

মানস-চেতনার সসীম প্রকাশটিকে (উহার উন্নততর পরিণাম থাকিতে পারে কিন্তু উহাকে ছাড়াইয়া অর্থাৎ সীমার বোধ উত্তীর্ণ হইয়া নয়) জীবের একমাত্র নিয়তি বা স্বরূপ বলিয়া বোধ করিবার ফলে, রবীন্দ্রনাথ রূপের বোধটিকে অনিবার্য রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

মানবীয় চেতনালোক হইতে লোকান্তরে জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ক্রমাগত বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে। রূপ বা সীমার এই বিকাশ ঘটিতেছে অরূপ বা অসীমের যোগে। উভয়ের যোগে, চকিত আভাস লাভের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা গভীরতর ও ব্যাপকতর হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কোন একটা পরিণামে যে এই মানবীয় চেতনা আনন্ত স্বরূপতা লাভ করিতে পারে, তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে অরূপের যোগে রূপের অন্তহীন লীলাকে জীবের একমাত্র নিয়তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

অন্যদিকে আর একটি সাধনা আছে, যেক্ষেত্রে মানুষ মানবীয় চেতনা বা সীমার সকল ধর্মকে আদৌ পরিহার করিয়া অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া মানুষ ওই অসীমকে লাভ করিবার জন্য ধ্যানমগ্ন হয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে এই জাতীয় সাধনায় অরূপকে কোন কালে লাভ করিতে পারা যায় না, কারণ মানুষ সীমার সকল ধর্ম ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না, অথচ

সীমা-লোক বা মানবীয় চেতনা আশ্রয় করিয়া অরূপের যে আভাস লাভ করিতে পারা যাইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

একদিকে রূপকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া অরূপ-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে রূপ আশ্রয় করিয়া উহারই যোগে অরূপের আভাস লাভ;—রবীন্দ্রনাথ এই শেষ পন্থাটিকে আশ্রয় করিয়াছেন।

একদিকে কেবল অরূপ, অন্যদিকে কেবল রূপ (যে স্বরূপেই হোক-না-কেন) ইহাদের কোন একটি পূর্ণতার সাধনা নয়। পূর্ণতার সাধনায় রূপ ও অরূপ সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত।

অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে হইবে সীমা বা রূপকে আশ্রয় করিয়া। সীমা বা রূপকে আদৌ পরিহার করিলে, সেইসঙ্গে অসীম বা অরূপকে পরিহার করা হয়। আমরা যাহা কিছু লাভ করিতে পারি তাহা সীমা বা রূপকে আশ্রয় করিয়া।

"কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।" (পরশ পাথর)

এই রূপের সাগর মন্থন করিয়া অরূপ বা অপরূপকে লাভ করিতে হয়, সৌন্দর্য-লক্ষ্মীর প্রকাশ ঘটে। পুরাণ কাহিনীটির মধ্যে যেন মানব জীবনের এই পরম সত্যটি উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

অজ্ঞাত ভাবে হইলেও প্রকৃতি তাহার রূপকে নিয়ত মানব অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে।—যে রূপের বোধ আশ্রয় করিয়া চকিতে সম্পূর্ণতার আস্বাদ নামিয়া জন্ম জন্মান্তরকে ধন্য করিয়া দেয়।

মানুষ যখন এই সত্য সম্পর্কে নিঃসংশয় হয় তখন হয়ত দুর্লভ জীবন অবসিত হইতে চলিয়াছে, তখন হয়ত জীবনকে আবার নূতন করিয়া ফিরিয়া লাভ করিবার উপায় থাকে না। সন্ন্যাসী অবশ্য কোন পরিণামে এই সত্য বোধ সম্পর্কে সচেতন হয় নাই; ভ্রান্তি হইতে ভ্রান্তিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একদিন তাহার জীবন অবসিত হইয়া যাইবে।

'আকাশের চাঁদ' কবিতাটির মধ্যে মানুষ যখন জীবনের দুর্লভতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছে, যখন বোধ করিয়াছে জগৎ কি আশ্চর্য সুন্দর, সেখানে তুচ্ছতা বলিয়া কিছু নাই, তখন তাহার জীবন-সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। অশ্রুসজল দৃষ্টির সম্মুখে সমস্ত কিছু ঝাপসা, একাকার হইয়া গিয়াছে। মানুষের এই বেদনার কী পার আছে!

রবীন্দ্রনাথের মূল দার্শনিক বোধের পরিচয় আমরা দান করিয়াছি। জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া পরম সত্য লাভের যে সাধনা তাহাকে তিনি শূন্যতার সাধনা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি এবং অন্যদিকে নিখিল মানব-সংসার, এই উভয়ের যোগে ব্যক্তিত্বের ধীর প্রসার। কোন একটি পরিণামে এই ব্যক্তিত্বের সম্পূর্ণতা লাভ ঘটিলে তবে যে আমরা ইহার অতীত সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারি তাহা নয়। সত্তার ধীর বিকাশের মধ্যেই আছে উপলব্ধির আনন্দ। কেবল তাহাই নয়, সৌন্দর্য ও প্রেমবোধ প্রতি মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে সেই আনন্দের আস্বাদ দেয়, যাহা সকল সীমার বোধকে অতিক্রম করিয়া যায়। জীবন ও জগতের সহিত যোগকে অস্বীকার করিলে পরম আনন্দ বা সত্যের সহিত যোগ সেই সঙ্গে অস্বীকৃত হইয়া যায়।

সীমা না থাকিলে আমরা অসীমকে উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। সীমা যদি কেবলমাত্র সীমাই হইত, তাহা হইলে অসীমও অনুপলব্ধ থাকিয়া যাইত। সীমা নিত্য সরিয়া সরিয়া পরিবর্তিত হইয়া বিদীর্ণ হইয়া অসীমের অপ্রমেয়তাকে প্রকাশ করিতেছে। সীমা একটি ব্যবহারিক সংজ্ঞা মাত্র। তাই সমগ্র প্রকাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন এক তত্ত্ববোধের ক্ষেত্রে অসীমের আনন্দকে আস্বাদ করিবার কোন উপায় নাই।

কবিতাটির মধ্যে দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনের যে পৌরাণিক কাহিনীটি ব্যক্ত করা হইয়াছে, এক্ষেত্রে তাহার তাৎপর্যটি বোধহয় এই, যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য বা লক্ষ্মীকে লাভ করিবার জন্য নিখিল চরাচর জুড়িয়া তপস্যা চলিতেছে। তাহাকে লাভ করিবার জন্য দিকে দিকে ক্রন্দন। সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মর্মস্থলে তাহারই জন্য অতৃপ্তি। সেই পরিপূর্ণতা তো অতীতে কোথাও ছিল না। এই তাপে তপ্ত হইয়া নিখিল বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ধীর প্রকাশ ঘটিতেছে।

দার্শনিক প্রত্যয় যাহাই হোক-না-কেন, কবিতা দুইটির মধ্যে বিশেষ করিয়া 'পরশ পাথরে'র ভাববস্তু অনেক গভীর ও ব্যাপক। তাহা হইল ইহার ট্র্যাজিক অনুভূতি। ব্যক্তির বিশিষ্ট ট্র্যাজিক রূপটিই কী কম বিস্ময়ের! তাহার পর সমগ্র জীবনের কী নিদারুণ ব্যর্থতা! শূন্যতাবোধের এমন হাহাকার রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে আর কোথাও ফুটিয়া উঠিয়াছে কিনা সন্দেহ।

সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি বিশ্ব-প্রাণের যোগে সৃষ্ট। এই যোগ যত সম্পূর্ণ হইয়াছে কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ তত উন্নত হইয়াছে। কবির চেতনা

বিশ্ব-চেতনা হইতে যখন দূরে সরিয়া গিয়াছে তখন তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানলোকটিও মুহূর্তে বিশুষ্ক বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কবি তখন চেতনাকে বেদনায় নিপীড়িত করিয়া বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ যোগ স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছেন। কবির সত্তা কোথাও বিশ্ব-সত্তা হইতে যথেষ্ট দূরে সরিয়া আসিয়াছে, কোথাও বা আরও কিছুটা নিকটবর্তী হইয়াছে।

কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-লোক বিশ্ব-প্রাণের যোগে সৃষ্ট। ওই যোগ যত সম্পূর্ণ হইয়াছে, কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান তত সমৃদ্ধ হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের প্রাণধারা হইতে কবি যখন দূরে সরিয়া আসিয়াছেন, অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তা যখন একান্ত হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে, তখন ওই সৌন্দর্যও কেবলই ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এই উপলব্ধি মুহূর্তে কবি সচেষ্ট হইয়াছেন বিশ্ব-প্রাণের সহিত আপন প্রাণের সংযোগ স্থাপন করিতে।

'দেউল' ও 'ঝুলন' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি যেমন সৌন্দর্য ও প্রেমের অসম্পূর্ণতা বোধ করিয়াছেন, তেমনি ওই সৌন্দর্য-লোকটিকে পূর্ণতর করিয়া তুলিতে তিনি বিশ্ব-প্রাণের সংযোগ কামনা করিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া কেবল ব্যক্তি-সত্তায় অন্তরের সৌন্দর্য-ধ্যানকে কোন প্রকারেই সঞ্জীবিত করিয়া রাখিতে পারা যায় না।

"অতল স্বপ্ন সাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।" (ঝুলন)

এই সৌন্দর্য-ধ্যানকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে কবি তাই বিশ্ব-প্রাণের সহিত আপন প্রাণের যোগ সাধন করিতে চাহিয়াছেন।

"ভীষণ রঙ্গে ভব তরঙ্গে
ভাসাই ভেলা।" (ঝুলন)

'ভব তরঙ্গ', নিখিল বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দন। পরিণামে বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির প্রাণ জাগ্রত হইয়াছে।

"নিঠুর নিবিড় বন্ধন সুখে
হৃদয় নাচে—" (ঝুলন)

এই একই ভাব কিছু বিশিষ্টতার সহিত 'দেউল' কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির মানস-জাগরণ যত সম্পূর্ণ হইতেছে, বিশ্ব-চেতনা

লাভের জন্য গূঢ় প্রেরণা কবির অন্তরে তত গভীর করিয়া অনুভূত হইয়াছে। বিশ্ব-প্রাণ-ধারা এইরূপে মানস-চেতনার পূর্ণ জাগরণ ঘটাইয়া ক্রমে ঊর্দ্ধ পরিণাম লাভের জন্য অন্তরে অসহনীয় বেগ সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

মানসী কাব্যে 'অহল্যার প্রতি' কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সহিত মিলাইয়া তুলনামূলকভাবে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, এইকালে কবির মানস-জাগরণ যেমন আরও সম্পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি এই একই কারনে বিশ্ব-চেতনার সহিত গূঢ় মিলন অনুভূতি আরও দুর্বার এবং এইরূপে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভের প্রেরণা অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। আমি এক্ষেত্রে 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীন ভাবে ছিনু এই বিরাট জঠরে
অজ্ঞাত ভুবন-ভ্রূণ মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে ; সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,—
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃ হৃদয়ের অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়।" (সমুদ্রের প্রতি)

এই অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দ নক্ষত্রে নক্ষত্রে গ্রহে-উপগ্রহে, বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে, অনন্ত কোটি জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এক প্রাণ স্পন্দনে সমস্ত কিছু বিধৃত। প্রাণ বা শক্তির এক-একটি বিশিষ্ট ছন্দের ভিতর দিয়া এক-একটি রূপ-বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার সকল রূপ, সকল ছন্দ, এক আদি ছন্দে সামঞ্জস্যীভূত।

অনন্ত জ্যোতিষ্কলোকে যে প্রাণ চাঞ্চল্য—

"গ্রহ মণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চির চঞ্চল—" (বিশ্ব-নৃত্য)

সেই এক প্রাণ স্পন্দন বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে—

"দুলিয়া দুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্র শির নাগিনী।

* * *

ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে,
অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে
মর্মরে দিন যামিনী।" (বিশ্ব-নৃত্য)

প্রাণীলোকের মধ্যে তাহারই প্রকাশ—

"পশু বিহঙ্গ কীট পতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে—" (বিশ্ব-নৃত্য)

জড়, প্রাণ, মন এবং তদূর্দ্ধ চেতন জগৎ সমূহের মধ্যে প্রাণ সাধারণ ধর্ম। এক প্রাণ-স্পন্দে সকল লোক বিধৃত।

জীবন ঘিরিয়া যে অপার রহস্য তাহার সন্ধান মানুষ যুগ যুগান্তরের সাধনার ভিতর দিয়া কতটুকুই বা লাভ করিয়াছে। এক অন্তহীন প্রাণের শাসনে প্রাণের প্রকাশ। এই প্রাণের উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রাণের প্রকাশের উপর মানুষের যেমন হাত ছিল না, তাহার বিনষ্টিতেও তেমনি মানুষের কোন হাত নাই। মানুষ এমনি অসহায়!

"মহান-মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।" (বিশ্ব-নৃত্য)

ব্যক্তিপ্রাণ বিশ্ব-প্রাণকে যত বেশি লাভ করিতে পারে ততই তাহার মধ্যে সৃষ্টি প্রেরণা গভীরভাবে অনুভূত হয়। 'দেউল' 'ঝুলন' ইত্যাদি কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ করিয়াছি। কবি বিশ্ব-প্রাণের গভীর হইতে গভীরে নিমজ্জিত হইতেছেন, যেখানে তাহা ব্যাহত হইয়াছে সেখানে সৃষ্টিপ্রেরণাও নিরুদ্ধ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মানব-তত্ত্ব এই বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিশ্ব-প্রাণের যোগে কেবল ব্যক্তি-প্রাণের মুক্তি নয়; সকল প্রাণের মধ্যে এক শাশ্বত প্রাণের প্রকাশ বলিয়া অথবা নিখিল প্রাণের যোগে সকল প্রাণের প্রকাশ বলিয়া বিশ্ব-প্রাণের অনুভূতির গভীরতা এবং প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে মানুষে মানুষে আত্মীয়তাবোধও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যের উপর সামগ্রিক দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, যে কবির মধ্যে সামঞ্জস্যবোধ (অর্থাৎ বিশ্ব-প্রাণ ও মনের সহিত ব্যক্তি-প্রাণ ও মনের যোগ) যতই গভীর হইতেছে, ততই কবির সৃষ্টি-প্রেরণা যেমন, তেমনি আন্তর্জাতীয়তা বা বিশ্ব-মানববোধ বাড়িয়া চলিয়াছে।

মূল যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-মানববোধ গড়িয়া উঠিয়াছে, সে তত্ত্বে জাতীয়তাবোধ কোনকালেই খুব প্রবল হইয়া উঠিতে পারে না। বেশী পূর্বের কথা নয় 'মানসী'র মধ্যেই কবির বিশ্ব-মানববোধ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সেই বোধই 'সোনার তরী'র মধ্যে গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে।

"জগৎ মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দিবে এদের নাচায়ে।" (বিশ্ব-নৃত্য)

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কেবল কবিই নন, বিশ্বের অনন্ত কোটি নর-নারী মিলন-মুক্তি লাভ করিবে। বিশ্ব-প্রাণের যোগে আজ কবি যেমন, তেমনি বিশ্বের অগণিত নর নারী যে সৃষ্টি প্রেরণা লাভ করিবে তাহাতে বিশ্বে যে নব রূপ, যে নূতন ছন্দের প্রকাশ ঘটিবে তাহার কোন পরিচয় আজিকার মানুষের নাই। তাই কবি ব্যক্তি-চেতনা মুক্ত হইয়া বিশ্ব-চেতনা লাভের জন্য নর-নারীকে আহ্বান করিয়াছেন।

"উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্য
বিস্মৃত হয়ে আপনা।" (বিশ্ব-নৃত্য)

'পুরস্কার' কবিতাটির মধ্যে বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দ এবং তাহার সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগের যে পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দান করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত অনন্ত প্রাণের এই নিত্য স্পন্দকে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ছন্দ আখ্যা দান করিয়াছেন।

সঙ্গীতের এই তত্ত্ব হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে কবি এই বিশ্ব স্পন্দকে নিরাধার নিরলম্ব এক অন্ধ শক্তির লীলারূপে প্রত্যক্ষ করেন নাই। বিশ্বের এই শক্তি স্পন্দ যদি এক অখণ্ড রাগিণী হইয়াই থাকে, তবে তাহারও পশ্চাতে, তাহার আধার স্বরূপ কোন এক দিব্য-চেতনা নিশ্চয়ই রহিয়াছেন, এই বিশ্ব-স্পন্দন যাঁহার আনন্দেচ্ছার প্রকাশ।

"যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া
বিশ্ব তন্ত্রী হতে।" (পুরস্কার)

ব্যক্তি-প্রাণ-স্পন্দ সেই অনন্ত প্রাণ-স্পন্দের একটি ক্ষুদ্র বিচি বিভঙ্গ মাত্র।

"যে রাগিণী চির জন্ম ধরিয়া
চিত্ত কুহরে উঠে কুহরিয়া—" (পুরস্কার)

দেশ-কালব্যাপী প্রাণ-ধারার বক্ষে অনন্ত কোটি প্রাণ বুদ্বুদের মত মুহূর্তে মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিয়া আবার প্রাণেই লয় পাইতেছে।

"কে আছে কোথায়, কে আসে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়।" (পুরস্কার)

এই আনন্তের আভাস যে মুহূর্তের জন্য লাভ করিয়াছে, সে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। সীমার এই সকল মূল্যবোধ তখন মিথ্যা হইয়া যায়।

"যে জন শুনেছে সে অনাদি ধ্বনি
ভাসায়ে দিয়াছে হৃদয় তরণী
জানে না আপনা জানে না ধরণী।" (পুরস্কার)

যে আদি প্রাণ-তত্ত্বে বিশ্বের সকল মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-অসুন্দর বিধৃত হইয়া আছে, সেই আদি প্রাণ-ধারায় কবি আপনার প্রাণ ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন।

মঙ্গল-অমঙ্গল, পাপ-পুণ্য, সুন্দর-অসুন্দরের দ্বৈতবোধ মনুষ্য-চেতনার সামগ্রী। বিশ্ব-চেতনায় দ্বৈতবোধ থাকে না।

বিশ্ব-চেতনায় মানবীয় সকল চেতনা, সেই হেতু মানুষের সকল বেদনাবোধ এতদূর ব্যাপ্তি লাভ করে, যে পরিণামে বেদনার এই স্বরূপ আর থাকে না। তাহা লৌকিক আনন্দে রূপান্তরিত হইয়া যায় না। তাহা এমন এক অপরূপ পরিণাম, যাহা লৌকিক আনন্দ নহে, বেদনাও নহে। তাহা অসহনীয় সুখোচ্ছ্বাসের মত বোধ হয়।

"সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে
ভরে আসে আঁখি জল।" (পুরস্কার)

কবির সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার সংযোগ তত্ত্বটির উল্লেখ করিয়াছিলাম। কবির জীবনে বিশ্ব-চেতনাবোধ যত গভীর হইয়াছে, সৃষ্টি-প্রেরণাও তত অফুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরস্কার কবিতাটির মধ্যে সে পরিচয়ও লাভ করা যায়।

দেশ-কাল পূর্ণ করিয়া প্রাণের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই বক্ষে অনন্ত গ্রহ-নক্ষত্রের সংখ্যাতীত তরঙ্গ জাগিয়া আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

"স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশ হারা।" (পুরস্কার)

গ্রহ-নক্ষত্রের এক-একটি বিচ্ছিন্ন সুরের ভিতর দিয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীত সৃষ্টি হইতেছে। এই অনাদ্যন্ত অখণ্ড সঙ্গীত সৃষ্টির আবার উদ্দেশ্য কি? সকল সৃষ্টির আনন্দের মত এই সৃষ্টির আনন্দও অহেতুক।

অন্যদিকে ব্যক্তি-চেতনায় তাহারই নিগূঢ় যোগ। এই যোগেই কবির কাব্য সৃষ্টি।

"সেথা হতে টানি লব গীতধারা
ছোট এই বাঁশরীতে।" (পুরস্কার)

সকল সৃষ্টি-প্রেরণার মধ্যে এই একই যোগের তত্ত্ব নিহিত। এই সম্পর্কে অনেক পরবর্ত্তী কালে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করিয়াছিলেন, আমি এই প্রসঙ্গে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি:

"আলোক তরঙ্গ, উত্তাপ তরঙ্গ, ধ্বনি তরঙ্গ, স্নায়ু তরঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রকার তরঙ্গের মধ্যে এইরূপ একটি আত্মীয়তার বন্ধন আছে। আমাদের চেতনাও একটা তরঙ্গিত কম্পিত অবস্থা। এইজন্য বিশ্বসংসারের বিচিত্র কম্পনের সহিত তাহার যোগ আছে। ধ্বনি আসিয়া তাহার স্নায়ু দোলায় দোল দিয়া যায়, আলোক রশ্মি আসিয়া তাহার স্নায়ু তন্ত্রীতে অলৌকিক অঙ্গুলি আঘাত করে। তাহার চির কম্পিত স্নায়ু জাল তাহাকে জগতের সমুদয় স্পন্দনের ছন্দে নানা সূত্রে বাঁধিয়া জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে।

কেবল সঙ্গীত কেন, সন্ধ্যাকাশের সূর্যাস্তচ্ছটাও কতবার আমার অন্তরের মধ্যে অনন্ত বিশ্ব-জগতের হৃৎস্পন্দন সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছে; যে একটি অনির্বচনীয় বৃহৎ সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়াছে তাহার সহিত আমার প্রতিদিনের সুখ-দুঃখের কোন যোগ নাই, তাহা বিশ্বেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নিখিল চরাচরের সামগান। কেবল সঙ্গীত এবং সূর্যাস্ত কেন, যখন কোন প্রেম আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে বিচলিত করিয়া তোলে, তখন তাহাও আমাদিগকে সংসারের ক্ষুদ্র বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্তরের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। তাহা একটা বৃহৎ উপাসনার আকার ধারণ করে, দেশকালের শিলামূল বিদীর্ণ করিয়া উৎসের মতো অনন্তের দিকে উৎসারিত হইতে থাকে।

* * * বিশ্বের কম্পন সৌন্দর্য যোগে যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তখন আমরা সমস্ত জগতের সহিত একতালে পা ফেলিতে থাকি, নিখিলের প্রত্যেক কম্পমান পরমাণুর সহিত এক দলে মিশিয়া অনিবার্য আবেগে অনন্তের দিকে ধাবিত হই।

* * * অনন্ত আকাশ জুড়িয়া চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তালে তালে নৃত্য করিয়া চলিয়াছে। তাহার বিশ্বব্যাপী মহাসঙ্গীতটি যেন কানে শোনা যায় না, চোখে দেখা যায়।" (গদ্য ও পদ্য : পঞ্চভূত)

'বসুন্ধরা' কবিতাটির মধ্যে বিশ্ব-প্রাণ-প্রবাহের সহিত মিলিত হইবার এই ব্যাকুলতার পরিচয় যে অংশে রহিয়াছে, এই প্রসঙ্গে কেবল তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। কবি-প্রাণের যে অপর একটি বিশিষ্ট প্রেরণার পরিচয় ইহারা মধ্যে আছে, তাহা অন্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব।

"ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই
দিগ্বিদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসন্তের আনন্দের মতো।" (বসুন্ধরা)

বিশ্ব-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষার ভারে কবি-চিত্ত মাঝে মাঝে ভাঙিয়া পড়িতে চাহিয়াছে।

"আমারে ফিরায়ে লহ
সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ
অঙ্কুরিছে মুকুলিছে সঞ্চারিছে প্রাণ
শতেক সহস্র রূপে।" (বসুন্ধরা)

জীবন ও জগৎকে কেবল শক্তি-স্পন্দ রূপে দেখা সম্পূর্ণ দেখা নয়। ইহার একটি স্থির আধার নিশ্চয় আছে। মানবীয় চেতনা এই স্পন্দন-সীমা অনুবিদ্ধ করিয়া স্থির চেতনা-লোক লাভ করিতে পারে। ওই পরিণাম লাভ করিলে মনুষ্য-চেতনা একদিকে যেমন পরম স্থৈর্য লাভ করে, তেমনি অন্যদিকে উহারই যোগে তাহার সৃষ্টি-প্রেরণা অশেষ হইয়া উঠে।

জগৎ ও জীবনের সকল অর্থ যে ওই পরিণাম লাভ করিলে মিলিতে পারে, এমনি একপ্রকার বোধও কবির অন্তরে ছিল। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে যে বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসার সহিত বিজড়িত হইয়া কবির অন্তরে এই অধ্যাত্ম পরিণাম লাভের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

ব্যক্তির বোধের সীমার বাহিরে আসিয়া বিশ্বের সর্বত্র আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিবার যে উল্লাস প্রভাত সঙ্গীতে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র মধ্যে প্রথম দেখি তাহাই আরো গভীর ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে মানসীতে 'অহল্যার প্রতি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। অনুভূতির এই তীব্রতার জন্য 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে'র

রূপের অস্পষ্টতা 'অহল্যার প্রতি' কবিতার মধ্যে অনেকটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তৎসত্ত্বেও বলা যায় 'অহল্যার প্রতি' কবিতার মধ্যে বিচ্ছিন্ন রূপের ধ্যান কোথাও স্পষ্ট রেখা-বন্ধনে বর্ণাঢ্য হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই। সোনার তরীর 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি যে রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহা যেমন অন্তহীন বৈচিত্র পূর্ণ তেমনি সেই প্রত্যেকটি রূপ-কল্পনা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই সকল বৈচিত্র পূর্ণ বিরুদ্ধ রূপ কবির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার টানে আবর্তিত হইতে হইতে পরিণামে একটি অলৌকিক সুষমার জগৎ গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে কি-না অবশ্য সে বিচার আমরা করিতে পারি।

কবিতাটির তাত্ত্বিক বোধের দিক আমরা আলোচনা করিয়াছি। কবিতাটির আনন্দ উৎস কিন্তু অগণিত বৈচিত্রপূর্ণ চিত্র-রূপ সাক্ষাৎকারের মধ্যে; আর এই চিত্র প্রবাহের ভিতর দিয়া গভীরতর যে অপর এক সৌন্দর্য-লোক প্রতি মূহূর্তে আভাসিত হইয়াছে তাহাকে অপরোক্ষ করিবার মধ্যে।

সীমার বোধটিকে জীবের একমাত্র স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়া কবি ব্যক্তি জীবনের যে নিয়তি-রূপ গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু উহা জীবনের নিয়তি নয় বলিয়াই সকল তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিয়া কবির অন্তর বারংবার উর্দ্ধ পরিণাম লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। কেবল বুদ্ধি ও হৃদয়বোধ দিয়া জগৎ ও জীবনের স্পন্দন রূপটি ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথও জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে জীবনের সকল পিপাসা মিটে না, অনেক উত্তর নিরুত্তর রহিয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসা এক্ষেত্রে তাই কোন উত্তর লাভ করিতে পারে নাই।

কখন তিনি সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা, উর্দ্ধ পরিণাম লাভের সকল প্রেরণা নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া একমাত্র রূপের জগৎটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আমরা সে পরিচয়ও পাইয়াছি। সোনার তরীর মধ্যে কবির এই বিশিষ্ট প্রেরণার দিকটিও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

ইহা অরূপের যোগে রূপ আস্বাদের পিপাসাও নয়। ইহা জীবন বা রূপের নিঃশেষ সমাপ্তি স্বীকার করিয়া লইয়াই তাহাকে হৃদয়ের রক্ত রাগে, অনুরাগে রঞ্জিত করিয়া দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথের এমনি একপ্রকার আশঙ্কা ছিল, যে অরূপের আকাঙ্ক্ষায় কিংবা অরূপকে লাভ করিলে রূপ লুপ্ত হইয়া যায়।

বৌদ্ধ-দর্শন সীমার বোধটিকে জীবের শাশ্বত নিয়তি, তাহার একমাত্র স্বরূপ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে বলিয়া জীবন ও জগতের এই স্পন্দ-রূপটি সে ক্ষেত্রে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। সীমাকে জীবের স্বরূপ বলিয়া মানিলে অসীম শূন্য হইয়া উঠিবেই। বস্তুত অসীম বা অরূপ ওই সীমা বা রূপকেই পূর্ণ মহিমা দান করে, উহার পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করে। বস্তুত ওই রূপই অসীমতা বা অরূপতা লাভ করে। ভেদ দৃষ্টিতে হয় জগৎ ও জীবন একমাত্র সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নতুবা মিথ্যা বা মায়া হইয়া উঠে। অভেদ দৃষ্টিতে রূপ অরূপে, চেতনা বিশ্ব-চেতনায় পরিণাম লাভ করে। পৃথক বোধ থাকে না বলিয়া রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীম, সৃষ্টি ও বিনষ্টির সকল জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

সোনার তরীর সৌন্দর্য-তত্ত্ব মূলক কয়েকটি কবিতার পরিচয় লাভের পূর্বে একটি বিষয় আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মানস-লোকে রূপের বোধ যতই গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করুক-না-কেন, তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয় বোধের উপর বলিয়া সীমাধর্মী। সীমা বোধে মানব মনের তৃপ্তি নাই। কবি অতৃপ্তির জ্বালা বক্ষে লইয়া রূপ হইতে রূপে বিশ্বময় বিহার করিয়া ফিরিয়াছেন।—রূপের পর রূপ কেবলই যোজনা করিয়াছেন।

কবি-চেতনা যেমন রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরিয়াছে, তেমনি বিশ্বময় ব্যাপ্ত রূপকে কোন একটি নারী-বিগ্রহের মধ্যে সমাশ্রিত করিয়া সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছে। বিশ্ব-চেতনা বলিতে কবি যে অখণ্ড রূপ-তত্ত্বটি বুঝিতেন তাহা বস্তুত মানব-চেতনায় সীমারূপের বিকল্প স্বরূপে গড়িয়া তোলা। অখণ্ড ও রূপ পরস্পর বিরোধী তত্ত্ব। তাহা ওই তিলোত্তমার ধ্যান। বিশ্বের সকল খণ্ড সৌন্দর্য দিয়া তাহার রূপ সৃষ্টি।

মানসীর 'মেঘদূত', 'অহল্যার প্রতি' কবিতা দুইটি আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে কবি বিশ্বাত্মা বলিয়া যাহার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রূপ বা সীমা-লোকই। তাহা বিশ্বের সকল বিচ্ছিন্ন রূপ দিয়া গড়িয়া তোলা। বিশ্বের যোগে কবির মন-লোকের যেমন বিকাশ ঘটিতেছে, তেমনি বিশ্বের অন্তরালবর্তী সৌন্দর্য-লোক, বিশ্ব-মনও ক্রমিক বিকাশ লাভ করিতেছে। নানা চেতনা পর্য্যায়ে এই অপর সত্তাকে তিনি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার নানা স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সোনার তরীর মধ্যে কবি-মনের পূর্ণ বিকাশ যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি

বিশ্ব-মনের পূর্ণ রূপটিও ধরা পড়িয়াছে। 'মানস সুন্দরী'র মধ্যে ইহারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সত্তাটিই চিত্রায় 'উর্বশী', 'বিজয়িনী' প্রভৃতি কবিতায় একটু ভিন্ন রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, এই মানসী বা মানস-প্রতিমা বা মানস-সুন্দরী প্রভৃতির মধ্যে 'তুমি' রূপে অভিহিত যে অপর সত্তা তাহা আর একটু উন্নততর চেতনা-পর্যায়ে জীবন-দেবতা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই জীবন-দেবতা পর্যন্ত কবির মনোধর্মাশ্রয়ী রূপের বিচিত্র তত্ত্ব বিস্তারিত। ইহার উর্দ্ধে ব্যক্তি-আত্মা বা বিশ্বাত্মা। এই তত্ত্ব-লোকে ব্যক্তি ও বিশ্বে আর পৃথক বোধ থাকে না। দার্শনিক জিজ্ঞাসায় এমন কি এই লোকেও রূপের অবশেষ থাকে। অজ্ঞানতার সর্বশেষ আবরণ! একমাত্র ব্রহ্মই অসীম বা অরূপ, অজ্ঞানতার সকল আবরণ মুক্ত।

কবির সৌন্দর্য-তত্ত্ব সম্পর্কে এই যে মন্তব্য করিলাম কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা স্পষ্টতর করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। প্রারম্ভে 'মানস-সুন্দরী'র কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"শুধু নীরবে ভুঞ্জন
এই সন্ধ্যা-কিরণের সুবর্ণ মদিরা,
যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা
লাবণ্য প্রবাহ ভরে ভরি নাহি উঠে,
যতক্ষণ মহানন্দে নাহি যায় টুটে
চেতনা বেদনা বন্ধ—" (মানস সুন্দরী)

কবির সৌন্দর্য-ধ্যান গভীরতা লাভ করিতে করিতে এই রূপ একটি অবস্থায় মুহূর্তের জন্য মানবীয় চেতনার সীমা ছাড়াইয়া যায়। ইহা কবি-চেতনার অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী একটি অবস্থা মাত্র। কবির সৌন্দর্য-ধ্যানের ইহাই সর্বোত্তম পরিণাম।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণের প্রকাশ বলিয়া শৈশবে একান্ত অপরিচিত এই বিপুল বিশ্বকে ভালো করিয়া চিনিবার পূর্বেই বিশ্বানুভবের বা বিশ্বাত্মভাবের একটি অতি ক্ষীণ আভাস মানুষের অন্তরে থাকে, তাহার পর বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগ যতই বাড়িতে থাকে ততই এই পৃথিবী পরিচিত হইয়া উঠে। বিশ্ব-চেতনায় পরিণাম লাভে বিশ্ব এবং ব্যক্তি চেতনা একাকার হইয়া যায়। তখন দুইয়ের বোধটা কোন স্বরূপে থাকে না বলিয়া লীলার এই তত্ত্বটি আর থাকে না।

'সন্ধ্যা সঙ্গীত' হইতে 'সোনার তরী' পর্যন্ত কবি-চেতনার ধীর জাগরণের সহিত সৌন্দর্য ও প্রেমের ধীর বিকাশ, এবং বিশ্ব-চেতনার সহিত ক্রমিক সামঞ্জস্য লাভের যে ইঙ্গিত করিয়াছি, সেই সমগ্র পরিণামের এক অপরূপ রূপময় পরিচয় কবি 'মানস-সুন্দরী'র মধ্যে দান করিয়াছেন। শৈশবে ও কৈশোরে এই নিখিল বিশ্ব সম্পূর্ণ অপরিচিত হইলেও অন্তর্লোকে উহার জন্য এক আশ্চর্য অতি নিগূঢ় আকর্ষণ বোধ থাকে। এই বিরাট বিশ্ব তখন বিস্ময় ও ভীতি উদ্রেক করিলেও অন্তরের মধ্যে এক আশ্চর্য নির্ভরতা দান করে।

মহাশূন্যে অনন্তকোটি জ্যোতিষ্ক-লোকের কক্ষাবর্তন, আর মর্তে প্রকৃতির কঠোরে-কোমলে, ভয়ালে-সুন্দরে আদি অন্তহীন এক বিস্ময়কর প্রকাশ। তাহার মধ্যে কতটুকু এই মানব শিশু। অথচ মাতৃ-ক্রোড়ের মত নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় তাহার দিন কাটিয়া যায়। এই নির্ভরতা সে কোথা হইতে কেমন করিয়া লাভ করে?

যৌবনে জাগ্রত প্রাণ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। চেতনার এই ধীর বিকাশ ঘটে বিশ্বের সহিত যোগের ভিতর দিয়া। বিপরীত দিক হইতেও একথা সত্য, অর্থাৎ বিশ্বের সহিত মিলন যত গভীর হয় মানবীয় চেতনা তত বিকাশ লাভ করে। এই মিলনের ভিতর দিয়া বিশ্ব ক্রমাগত অপরূপ হইয়া উঠিতে থাকে।

বিশ্বের সহিত কবির মিলন আজ শৈশবের মত কেবল ইন্দ্রিয় বা প্রাণ-চেতনায় নয়, সে মিলন স্থাপিত হইয়াছে মানস-লোকে।

শৈশবের সেই অপরিচয়ের ভীতি আর নাই, আজ বিশ্বের যোগে কবির অন্তর্লোকে সৌন্দর্য ও প্রেম একেবারে সীমাহীন হইয়া পড়িয়াছে।

"ছিলে খেলার সঙ্গিনী
এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী,
জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।" (মানস সুন্দরী)

চেতনা বিকাশের একটি বিশিষ্ট পরিণামের পর হইতে কবির মনে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগিতে সুরু করিয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সোনার তরীর মধ্যে কবির মানস-জাগরণ যেমন সম্পূর্ণ হইয়াছে, তেমনি বিচিত্র অধ্যাত্ম ব্যাকুল জিজ্ঞাসা জাগ্রত হইয়া কবিকে চিরকালের জন্য অশ্রুমুখীন নিদ্রাবিহীন করিয়া দিয়াছে।

এই যে বেদনা ইহার স্বরূপ কি? কোন্ ভাষায় এই অলৌকিক বেদনাকে

সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিতে পারা যায়? কিসের জন্য এই অতৃপ্তি? কী লাভ করিলে অন্তরের এই অতৃপ্তি ঘুচে? এই যে রূপ হইতে রূপে অন্তহীন বিহার ইহার কি কোন স্থির পরিণাম আছে? এই রূপ-লোকের অন্তরালে কি স্থায়ী কোন চেতনা-লোক আছে? এই রূপ-জগৎ অনুবিদ্ধ করিয়া উহার সীমা অতিক্রম করিয়া মানবীয় চেতনা কি কখন উহা লাভ করিতে পারে? অন্তরের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন কোন দূর সমুদ্রকূল হইতে অস্ফুট ধ্বনি ভাসিয়া আসে,—সকরুণ মিনতি বিজড়িত। সেই সুরে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনা হইয়া পড়ে। এই আহ্বান কোথা হইতে আসে?

"এই যে বেদনা
এর কোন ভাষা আছে? এই যে বাসনা
এর কোন তৃপ্তি আছে? এই যে উদার
সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার
ভাসায়েছ সুন্দর তরণী, দশ দিশি
অস্ফুট কল্লোল ধ্বনি চির দিবানিশি
কী কথা বলিছে কিছু নারি বুঝিবারে,
এর কোনো কূল আছে? (মানস সুন্দরী)

কবির মন রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। কবি তাই একটি ধ্রুব-লোক লাভ করিতে চাহিয়াছেন; ইহা সেই বিশ্ব-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা, যেখানে সকল রূপ-বৈচিত্র্য পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে। বিশ্ব-চেতনায় মানবীয় চেতনার অসীম বিস্তার। চেতনার সেই সীমাহীন ব্যাপ্ত পরিণাম লাভে মানুষের সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার অবসান ঘটে।

"শুধু ভুলে গিয়ে বাণী
কাঁপিব সঙ্গীত ভরে।" (মানস সুন্দরী)

একদিকে বিশ্ব-প্রাণের মধ্যে ব্যক্তি-প্রাণকে একাকার করিয়া দিবার জন্য সকল সীমার বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে আবার ওই বিশ্ব-সৌন্দর্যকে একটি রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইবার সুতীব্র ব্যাকুলতা। অসীম বা অরূপকে ইন্দ্রিয়দ্বারে সীমারূপে প্রত্যক্ষ করিবার এই আকাঙ্ক্ষা হইতে কবির 'অখণ্ড রূপ'-তত্ত্বের স্বরূপ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

যে 'তুমি'র খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত—

"এখন ভাসিছ তুমি

অনন্তের মাঝে ; স্বর্গ হতে মর্ত ভূমি
করিছ বিহার ;—" (মানস সুন্দরী)

তাহাকে আবার তিনি একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছেন,

"সেই তুমি
মূর্তিতে দিবে কি ধরা। এই মর্তভূমি
পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ?
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শূন্যে জলে স্থলে
সর্ব ঠাঁই হতে সর্বময়ী আপনারে
করিয়া হরণ, ধরণীর এক ধারে
ধরিবে কি একখানি মধুর মুরতি।" (মানস সুন্দরী)

কিংবা

"কখনো কি বক্ষ ভরি
নিবিড় বন্ধনে তোমারে, হৃদয়েশ্বরী,
পারিব বাঁধিতে। পরশে পরশে দোঁহে
করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে
দেহের দুয়ারে ?" (মানস সুন্দরী)

এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের আধার স্বরূপা নারী-মূর্তিকে তিনি গৃহের মধ্যে কল্যাণময়ী বধূ রূপে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এই নারীর মধ্যে তাই রূপের সম্পূর্ণতা, কল্যাণের সম্পূর্ণতাও ঘটিয়াছে। বস্তুত আদর্শ নারীর মধ্যে তিনি আদর্শ রূপ ও কল্যাণকে একত্রে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

"জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক-পাবে বিচ্ছেদ বিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার সুর
সর্ব দেহে মনে ? জীবনের প্রতি সুখে
পড়িবে তোমার শুভ্র-হাসি, প্রতি দুখে
পড়িবে তোমার অশ্রু জল। প্রতি কাজে
রবে তব শুভ হস্ত-দুটি। গৃহ মাঝে
জাগায়ে রাখিবে সদা সুমঙ্গল জ্যোতি।" (মানস সুন্দরী)

সকল সম্পর্ক-বন্ধন মুক্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত রূপকে পুরুষ যেমন একটি নারী বিগ্রহের মধ্যে লাভ করিতে চায়, তেমনি বিশ্ব-সংসার পরিব্যাপ্ত স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকেও একটি নারীর মধ্যে লাভ করিয়া ধন্য হইতে চায়। পুরুষের অন্তরে এই উভয় জাতীয় পিপাসা আছে, কোন একটিকে পরিহার করিলে তাহার অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার নিরসন ঘটে না।

পরবর্তী কাব্য-গ্রন্থ চিত্রায় এই উভয় জাতীয় প্রেরণাকে তিনি যেমন পৃথক পৃথক ভাবে রূপায়িত করিয়াছেন, একদিকে 'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী' অন্যদিকে 'স্বর্গ হইতে বিদায়', তেমনি উভয়কে একত্রে লাভ করিবার জন্য সদা উৎসুক ও অতন্দ্রিত হইয়াছেন। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার অন্তর্গত 'বিশ্ব-প্রিয়ার' মধ্যে এই উভয় প্রেরণার সীমাহীন ব্যাপ্তি যেমন, তেমনি পরিপূর্ণ মিলন ঘটিয়াছে। এই 'বিশ্ব-প্রিয়া'রই অসম্পূর্ণ প্রকাশ 'মানস-সুন্দরী'।

মানসী কাব্যের মধ্যে যাঁহাকে তিনি 'ঈশ্বরের অসম্পূর্ণ প্রতিমা' বলিয়াছেন, মানস-সুন্দরীর ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রিয়ার মধ্যে তাহার পূর্ণ পরিণাম ঘটিয়াছে। ইহাই কবির ঈশ্বরীয় তত্ত্ব বা বিশ্ব-চেতনা। তাঁহার মধ্যে নিখিল বিশ্বের সকল রূপ, সকল প্রেম, সকল ভাব ও সকল সুর সমাশ্রিত।

এই অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার একটি দার্শনিক কারণও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। পরবর্তী চিত্রা কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইহার বিস্তারিত পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। এক্ষেত্রে তাহার সামান্য উল্লেখ করা যাইতে পারে।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া কেবল মানবীয় চেতনার ধীর বিকাশ ঘটিতেছে না, দেহ-রূপেরও ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতেছে। এইভাবে মর্ত-লোকে একদিন দেব প্রতিম রূপের প্রকাশ ঘটিবে। মর্তের নর-নারী কেবল ভাবের জগতেই নয়, দেব-রূপেও দেব-সম হইয়া উঠিবে। এই মানব-সংসার হইবে দেব-ভূমি। স্বর্গের পরিকল্পনা একদিন এই জগতে সার্থক হইবে। সত্যযুগ তো অতীতে কোথাও ছিল না, তাহা আছে ভবিষ্যতে। মানব-সংসার তাহাকেই ধীরে লাভ করিতেছে। এমনি একটি স্থির বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল।

এই বিশ্ব-সংসারকে তিনি প্রেমে রূপায়িত করিয়াছেন। রূপের আকাঙ্ক্ষা প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। এই রূপ ভাবে আবার বিলীন হইয়া যায়। অনন্ত শূন্যে আবার তিনি প্রেমের মন্ত্র জপ করিতে বসেন। সে মন্ত্রে শূন্য-লোক-পূর্ণ করিয়া আবার রূপ ফুটিয়া উঠে,—দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় শতদল। এমনি অন্তহীন কাল ধরিয়া তাঁহার ভাব ও রূপের লীলা চলিতেছে।

"এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে সৃজনে
জ্বলিছে নিবিছে যেন খদ্যোতের জ্যোতি,
কখনো বা ভাবময়, কখনো মূরতি।" (মানস সুন্দরী)

মানব জীবনের এই একই লীলা। তাহার প্রেমের আকর্ষণে বিশ্বের সকল রূপ একটি নারী-রূপের মধ্যে অলৌকিক ভাবে আকার পরিগ্রহ করে; কিংবা আকার-বদ্ধ রূপ বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে কেমন করিয়া কোন্ রহস্যের বশে বিকীর্ণ হইয়া যায়।

'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতাটির মধ্যেও কবির এই রূপাভিসারের পরিচয় লাভ করা যায়। এইকালে কবির অন্তরে যে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগে কেবল তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

এই যে বিবশ আত্মকর্তৃত্ব শূন্য হইয়া রূপ হইতে রূপে চেতনার নিত্য সঞ্চরণ, জীবনে ইহার ফল লাভ কি? কবির নিকট আজ তাহা অজ্ঞাত হইলেও এই রূপ-পিপাসার একটা দার্শনিক কারণ নিশ্চয়ই আছে।

"কী আছে হোথায় চলেছি কিসের
অন্বেষণে?" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

এই রূপ-বিহারে আজ কবি ক্লান্ত, তাই একটা স্থির কোন চেতনা-লোক লাভ করিবার জন্য এমন ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা। পরিণামে এই স্থির চেতনা-লোকে কি কবি পৌঁছাইয়া যাইবেন?

এখন এক অন্তহীন সৌন্দর্য-সাগরে অসহায় হইয়া কেবল ভাসিয়া যাওয়া—

"সংশয়ময় ঘন নীল নীর
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর।
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

তাই স্থির কোন চেতনা-লোক লাভের অনিবার্য কামনায় কবি-চিত্ত আর্তনাদ তুলিয়াছে।

"কোথা আছ ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

অথচ জীবের নিয়তি সম্পর্কেও কবি সচেতন। অর্থাৎ মানুষ যে-কোন পরিণামে ওই শাশ্বত চেতনা লাভ করিতে পারে না।

"কহিবে না কথা দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।" (নিরুদ্দেশ যাত্রা)

'শৈশব সন্ধ্যায়' আর একটি সৌন্দর্য-লোক ভিন্ন পরিবেশে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সেই সৌন্দর্যের সহিত বিজড়িত হইয়া কী গভীর বিষাদ, জল-স্থল-নভোতল পরিব্যাপ্ত করিয়া কী গভীর শ্রান্তি ও অবসন্নতা। দেখিতে দেখিতে কবি-চিত্তে জাগিয়াছে অলৌকিক নিঃসঙ্গতা বোধ। আর এই বোধে নিপীড়িত হইয়া কবি-চেতনা মানব-সংসার ঘিরিয়া যে বিচিত্র স্নেহ-প্রেম-প্রীতির বন্ধন তাহারই জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করিয়াছে।

এক-একটি রূপের ছিদ্রপথ দিয়া কেন যে এক-একটি বিশিষ্ট ভাবনা অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায় তাহার কারণ আমরা জানি না।

কবির সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় শৈশব সন্ধ্যার বিচিত্র স্মৃতি। সেই স্মৃতি-লোক জানা-অজানার বিচিত্র অশরীরী ভাবনা দিয়া গড়িয়া তোলা। রূপ-কথার কত খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ, শৈশবে পঠিত সম্ভব অসম্ভব কত বিচিত্র উপকথা, গাথা, প্রদীপ নিভ নিভ সন্ধ্যায় কল্পনায় গড়িয়া তোলা অপ্রাকৃত কত রূপ-লোক,—এই সমস্ত কিছু সেই স্মৃতি-লোকে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক শিশুর জীবনে এমনি এক একটি বোধের জগৎ আছে। সমষ্টিগত ভাবে বিশ্বের সকল শিশুর ভাব রাজ্যের একটি সম্মিলিত প্রকাশ রূপ আমরা কল্পনা করিতে পারি। কবি কল্পনায় আপনার ব্যক্তি জীবন লব্ধ শৈশব স্মৃতিকে অতিক্রম করিয়া সকল কালের সকল দেশের মানব শিশুর চিরন্তন মনো জগতে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। সে জগৎ কী অচিন্তনীয় বিরাট, বিপুল!

এক-একটি বিশিষ্ট রূপকে দেশ কাল নিরবচ্ছিন্ন এক-একটি নিঃসীম ভাবনার সহিত বিজড়িত করিয়া তাহাকে আশ্চর্য ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিবার মধ্যে কবি প্রেরণার যে বৈশিষ্ট্য তাহা কবির কাব্যে পূর্বাপর সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

নর নারীর প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট উপলব্ধি তাহা সোনার তরীর মধ্যে এক প্রকার সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। পরবর্তীকালে ইহারই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

যে একটি মাত্র কবিতায় প্রেমানুভূতির প্রথম প্রকাশ হইতে চূড়ান্ত অধ্যাত্ম

পরিণাম পর্যন্ত প্রত্যেকটি পর্যায়ের পরিচয় কবি অপূর্ব কুশলতার সহিত দান করিয়াছেন আমি সর্বাগ্রে সেই কবিতাটির উল্লেখ করিব।

নর নারীর জীবনে প্রেমের সাধারণ যে প্রকাশ তাহা সাংসারিক ও সামাজিক প্রয়োজনবোধের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কলসীর জলে সমুদ্রের সেই সীমাহীন বিস্তার সেই নিয়ত অন্তহীন ব্যাকুলতা, সেই অপার রহস্যময়তার লেশ মাত্র পরিচয় নাই। বাতাস লাগিয়া কলসীর জলে যে ছল্ ছল্ শব্দ উঠে তাহাতে বুঝি সমুদ্রের সেই আদিম ব্যাকুলতার আভাস থাকে। যে শুনিতে জানে সে বুঝি শুনিতে পায়। একান্ত বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যে সীবাবদ্ধ যে প্রেম, তাহার মধ্যেই মাঝে মাঝে অনন্তের ক্ষীণ আভাস আসিয়া পৌঁছায়, মুগ্ধ নর-নারী তাহা শুনিতে পায় না।

অতলের এই কান্না তাহার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায় না। বাস্তব জীবনের সহস্র প্রয়োজন, সহস্র তুচ্ছতার ভিতর দিয়া তাহার দিন কেমন করিয়া একভাবে কাটিয়া যায়। এ প্রেমে হৃদয়ের চঞ্চলতা লোপ পায় না।

"তলতল ছলছল কাঁদিবে গভীর জল
ওই দুটি সুকোমল চরণ ঘিরে।"

অতলের এই কান্না তাহার প্রাণে আসিয়া পৌঁছায় না। বাস্তব জীবনের সহস্র প্রয়োজন সহস্র তুচ্ছতার ভিতর দিয়া তাহার দিন কেমন করিয়া একভাবে কাটিয়া যায়। এ প্রেমে হৃদয়ের চঞ্চলতা লোপ পায় না ;

"নূপুর ঝিনিকিঝিনি কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে।"

এই চঞ্চল প্রেম কিছু গভীর হইলে নর-নারী ক্ষণে ক্ষণে উন্মনা হইয়া পড়ে। কোন কাজে আর মন বসে না। এতদিনের সকল প্রয়োজন নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। উহা হৃদয়ের এমন একপ্রকার অভাব বোধ যাহাকে জাগতিক কোন কিছুর দ্বারা পূর্ণ করিতে পারা যায় না। জীবনের বিচিত্র প্রয়াস, কর্ম চাঞ্চল্য মিথ্যা বলিয়া মনে হয়। অন্তরের মধ্যে একটি নিভৃত-লোক গড়িয়া উঠে। উহারই ধ্যানে নর-নারী ক্ষণে ক্ষণে তটস্থ হইয়া পড়ে।

"দুটি কালো আঁখি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া
অঞ্চল খসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।"

এই উপলব্ধি আরও গভীরতা লাভ করিয়া নর-নারীর জীবনে কোথাও দিব্যোন্মাদ অবস্থার সৃষ্টি করে। সমগ্র দেহ-প্রাণ-মন শত শিখায় জ্বলিয়া

উঠিয়া নর-নারীর জীবনে এক অপার জ্বালা-হর্ষের সঞ্চার করে। "ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হাসে।"

এই পরিণাম লাভেও জাগতিক চেতনা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়া যায় না। তীরে বসন পরিহার করিয়া জলে স্নান করিতে নামিলে জল লজ্জা ঢাকিয়া দেয় বটে, কিন্তু মন হইতে তো লজ্জা যায় না। স্নান শেষে তটে উঠিয়া আবার বসনে ভূষণে দেহ আবরিত করিতে হয়। অর্থাৎ এই অধ্যাত্ম পরিণামেও যেমন জাগতিক বোধ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয় না, তেমনি ওই অবস্থা হইতে নর-নারী স্বাভাবিক বোধে স্খলিত হইতে পারে।

এই অনুভূতি যখন চূড়ান্ত পরিণাম লাভ করে, তখন মানবীয় চেতনা দেশ-কালের ঊর্দ্ধতর অনন্ত সত্তায় একাকার হইয়া হারাইয়া যায়।

"স্নিগ্ধ, শান্ত সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর
মৃত্যু সম নীল নীর স্থির বিরাজে।"

জাগতিক প্রেমই ক্রমাগত গভীরতা লাভ করিতে করিতে পরিশোধিত হইয়া চূড়ান্ত অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করে। জাগতিক প্রেম এবং ঈশ্বরীয় ভক্তির মধ্যে যে পার্থক্য তাহা প্রকৃতিগত নহে, পরিণাম গত। মানব প্রেম বিশ্বমুখীনতা লাভ করিলে ভক্তি-স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। বিশ্ব-মুখীন এই প্রেম বা ভক্তি যখন নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হয় তখন নর-নারী যাহা পায় তাহাই মুক্তি।

কিন্তু বৈষ্ণব-সাধনা জাগতিক প্রেম এবং ঈশ্বরীয় ভক্তিকে সম্পূর্ণ পৃথক করিয়া দিয়াছে। শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলা-ক্ষেত্র এই মর্ত-জগৎ নহে, তাহা সম্পূর্ণ অলৌকিক এক দিব্য-জগৎ, তাহা বৃন্দাবন-ধাম।

'পঞ্চ ভূতে'র মধ্যে একস্থলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন, "যাহাকে আমরা ভালোবাসি কেবল তাহারই মধ্যে আমরা অনন্তের পরিচয় পাই। এমনকি জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য সম্ভোগ। ইহা হইতে মনে পড়িল, সমস্ত বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে এই গভীর তত্ত্বটি নিহিত আছে।"

বস্তুত প্রেম সাধন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে বিশিষ্ট উপলব্ধি এই জাতীয় উক্তির মধ্যে তাহারই পরিচয় লাভ করা যায়। বৈষ্ণব-সাধনাও এই জগৎ ও জীবনকে মায়া বলিয়া পরিহার করিয়াছে। বৃন্দাবন ধাম তো ইহলোকই নহে।

এই বিশিষ্ট সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলে নর-নারী সূক্ষ্ম, সিদ্ধ-দেহে ওই অলৌকিক জগৎ বৃন্দাবন ধামে গমন করে। অবশ্য জীবাত্মা ওই লোকে গিয়াও

ঈশ্বরীয় নিত্য প্রেমের পঞ্চাঙ্গিক লীলায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। আপন আপন সাধন অনুগ রস-লীলাটিকে তাঁহারা নিত্যকাল ধরিয়া প্রত্যক্ষ করেন। ইহাই বৈষ্ণব-দর্শন, বৈষ্ণব-সাধনা। ইহাতে দিব্য ও জাগতিক দুইটি সত্তার স্বরূপত পার্থক্যকে স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে।

আমরা এই ভাবে চেতনাকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক এই দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে চেতনার এমন একান্ত বিভেদ অসম্ভব। বস্তুত একেরই এই বিচিত্র পরিণাম।

মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে এই জগৎ ও জীবন তত সুন্দর হইয়া উঠিতে থাকে। সীমা ও অসীম একই চেতনার প্রসার বলিয়া ভূমামুখীন এই প্রেমই নর-নারীর জীবনকে এমন রসসিক্ত, মর্ত-ভূমিকে এমন সৌন্দর্য মণ্ডিত করিয়া দেয়।

মানবীয় চেতনা যত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, এই জগৎ ও জীবন তত সুন্দর হইয়া উঠে। পরিণামে এই জগৎ ও জীবনই ভূমা বা অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। মানবীয় চেতনায় দুইয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক সত্তা অমন ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে।

"হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু আঁখি পড়েছিল মনে।"

* * *

এত প্রেম কথা,
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুখ, কার
আঁখি হতে।" (বৈষ্ণব কবিতা)

প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব উপলব্ধি এবং দর্শনের পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নের কয়েকটি পংক্তির মধ্যে—

"এই প্রেম গীতিহার
গাঁথা হয় নর নারী মিলন মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধূর গলায়।" (বৈষ্ণব কবিতা)

অসীমের জন্য ব্যাকুলতাকে মানব অনুভূতির ভিতর দিয়াই প্রকাশ করিতে হয়। অসীম বা ভূমা সম্পর্কে আমাদের যে উপলব্ধি তাহাও মানবিক বোধের

মাধ্যমে। অসীম বা ভূমা মানবীয় চেতনার উন্নততর পরিণাম। মানবীয় চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়া যে ভূমা লাভের সাধনা তাহা শূণ্যতার সাধনা। মানবীয় অনুভূতিই কোথাও অসীমের জন্য ব্যাকুলতারূপে প্রকাশ পায়, কোথাও বা সীমা-লোক আবেষ্টন করিয়া ধন্য হইতে চায়। তাই জাগ্রত চেতনায় মানুষ সীমার মধ্যে অন্তহীন সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সন্ধান পায়।

নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া পুরুষের অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটে। অধ্যাত্ম জাগরণ কি, না অসীমের জন্য বিরহ। নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে যে ধ্যানলোক গড়িয়া উঠে, তাহাতে অসীমের আভাস পড়িয়া আর এক অপরূপতা লাভ করে। ইহাই জড়-রূপের অধ্যাত্মীকরণ।

নারীর এই রাজ রাজেশ্বরী, ষড়ৈশ্বর্যময়ী প্রকাশ বাহিরে কোথাও নাই, আছে পুরুষের ধ্যান-লোকে। পুরুষের ধ্যান-রূপের মধ্যে আপনার সম্পূর্ণ রূপটি খুঁজিয়া পায় না বলিয়া নারীর হৃদয় অমন করুণ-কোমল, অমন সদা অশ্রুমুখী হইয়া থাকে। বেদনার একটি শ্যাম-ছায়া তাহাকে আবেষ্টন করিয়া থাকে। অন্তহীন ধ্যানের সমুদ্র পার হইয়া সে কেমন করিয়া পুরুষকে লাভ করিবে। পুরুষের ধ্যান-লোক নারীর অগম্য। তাই পুরুষের বক্ষ লগ্ন হইয়াও তাহার অশ্রুপাতের শেষ নাই।

পুরুষের ধ্যান-লোক নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও তাহা ঠিক বাস্তব বিগ্রহ নয়, তাহার রূপান্তরীকরণ ঘটে।

"এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রাণী
এ তবু তোমার রাজধানী।" (দুর্বোধ)

এই নিঃসীম ধ্যান-লোকে পুরুষের মন নিত্য কাল অভিসার করিয়া চলে। এইরূপে ধ্যানের ভিতর দিয়া অরূপ-লোকের কত যে কী আভাস আসিয়া পৌছায় তাহার স্বরূপ পুরুষ নিজে বুঝিতে পারে না, নারীকে বুঝাইবে কি! সে সঙ্গীতে সে কেবল আত্মহারা হইয়া পড়ে।

"গভীর হৃদয় মাঝে নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সঙ্গীতে।" (দুর্বোধ)

পুরুষের প্রেমকে নারী যদি নিঃশেষে বুঝিয়া লইতে না পারে, তাহাতে ক্ষতি কি? পুরুষের এই অন্তহীন প্রেমকে নারী আপনার মত নিত্য নূতন করিয়া উপলব্ধি করিতে পারে। এই নিত্য নূতন উপলব্ধির ভিতর দিয়া নারীর প্রেম সদা জাগ্রত ও উন্মুখ হইয়া থাকে।

"চিরকাল চোখে চোখে নূতন নূতনালোকে
পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।" (দুর্বোধ)

পুরুষের ধ্যানের মধ্যে নারীর যে সৌন্দর্যের প্রকাশ, তাহাকে বাস্তব নারীর মধ্যে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নারীও তাহা জানে। তাই সে আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া অগোচরতা ও দূরত্বের আভাস সৃষ্টি করে। এই ব্যবধানকে পুরুষ আপনার সৌন্দর্য-ধ্যান দ্বারা ক্রমাগত ভরাইয়া তুলে।

এক্ষেত্রে নারী আপনার এই সৌন্দর্য ও সামর্থ সম্পর্কে কেবল সচেতন নয়, সে ওই প্রেমকেই জাগ্রত করিতে চায় নাই। তাই সে পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

পুরুষ আপনার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলে নারী তাই আত্মগোপন করে, কারণ সে জানে বাস্তব মিলনে তাহার সৌন্দর্য-ধ্যান ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অপূর্ণতাবোধের পীড়া তাহাকে একদিন নারীর নিকট হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইবে। সেদিন নারী আপনার জীবনের এতবড় বঞ্চনা ও শূণ্যতাকে আর কোন কিছু দিয়া তো পূর্ণ করিতে পারিবে না।

"মনের কথা রেখেছি মনে যতনে
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই রতনে।"

পুরুষের প্রেম-পিপাসা বাস্তবে তাই চরিতার্থ হইতে পারে না। তাহার ধ্যান-লোকে নারীর যে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি, বাস্তব নারীর মধ্যে তাহার ক্ষীণতম আভাসও বুঝি নাই। নারী তাই অমন পুরুষের প্রেম প্রত্যাখ্যান করে।

প্রেমে বিশ্ব-প্রাণের সহিত প্রাণ যুক্ত হইয়া যায়। প্রেমে তাই প্রাণ বিসর্জন সহজ হইয়া উঠে। প্রেমের ধ্যানে পুরুষ প্রাণ বিসর্জন দেয়। পুরুষের প্রেমকে নারী যদি অন্তরে বরণ করিয়া লয়, তবে তাহারও অন্তরে প্রাণের প্রকাশ ঘটে বলিয়া সেই সঙ্গে অপার দুঃখকেও বরণ করিয়া লইতে হয়। এখানে নারী সে দুঃখ ভার বহন করিতে চাহে নাই। প্রাণ দিয়া প্রাণের মূল্য পরিশোধ করিতে হয়।

"এ ঋণ যদি শুধিতে চাই,
কী আছে হেন, কোথায় পাই,
জনম তরে বিকাতে হবে আপনা।"

পুরুষের প্রেম আদিতে নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া জাগ্রত হইলেও পরিণামে আনন্ত্যের পিপাসায় পর্যবসিত হয়—তাহারও পূর্বে ধ্যানের ওই লীলা বিলাস তো আছেই। নারী সেই আকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া পূর্ণ করিবে?

"যে সুর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে
উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে।"

এই সমস্ত উক্তি এমন একজন নারীর যে আপনার অন্তরে প্রেম জাগ্রত করিতে চাহে নাই। তাহার "নিবায়ে দীপ জীবন-নিশি যাপনা"। এই দীপ নারীর অন্তরের প্রেম। উহা নিভাইয়া দেওয়ার অর্থ যে কী তাহা বোধ হয় আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

নারী পুরুষের এই স্বরূপ জানে, তাই আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া অমন অগোচরতার সৃষ্টি করে। এই অগোচরতাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া পুরুষের সৌন্দর্য-ধ্যান অটুট থাকে। এই যে আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া আড়াল রচনার চেষ্টা, ইহা নারী প্রাণের গরজে শিক্ষা করিয়াছে। নহিলে পুরুষের সহিত যে তাহার মিলন হয় না। কত দীর্ঘকাল হইতে নারী এমন আচরণ করিয়া আসিতেছে উহা আজ তাই প্রাণের আবেগের মত অনিবার্য। প্রাণ থাকিতে নারী লজ্জা পরিহার করিতে পারে না।

নারীর সৌন্দর্য পুরুষের ধ্যান-লোকে। বাস্তবে তাহাকে তাই লাভ করিবার কোন উপায় নাই। যে পুরুষ নারীর আবরণ ও অগোচরতা লোপ করিয়া দিতে চায়, সে যেমন নিজের সর্বনাশ করে তেমনি নারীরও। নারীর অন্তরাল ঘুচাইয়া দিলে পুরুষের সৌন্দর্য-ধ্যান বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া পুরুষ স্বধর্মচ্যুত হয়। অন্যদিকে নারী আপনার আবরণ লুপ্ত করিয়া দিলে পুরুষের পিপাসা চরিতার্থ হয় না বলিয়া লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত হয়।

পুরুষের চিত্তে নারীর যে অপার সৌন্দর্য প্রতিভাত হয় তাহা ধ্যানের সৃষ্টি। তাহাকে তাই বাস্তবে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নারীকে পুরুষের একান্ত নিকটে থাকিতে হয় বলিয়া নারীকে বাধ্য হইয়া আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া অমন অগোচরতা সৃষ্টি করিতে হয়, তাহা না হইলে পুরুষের সৌন্দর্য-ধ্যান তাহার সৃজন প্রতিভা অধিক দিন জাগ্রত থাকে না। এই ভাবটিই 'নারীর উক্তি'র মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে।

"সে টুকুতে ভর করি
এমন মাধুরী ধরি
তোমা পানে আছি আমি ফুটিয়া।" (লজ্জা)

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে এই কালে দুইটি বিরুদ্ধ চেতনার প্রবল দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। একদিকে দেশকালের উর্দ্ধতর অমর্ত-চেতনা, অন্যদিকে দেশ-কালের অন্তর্গত

মর্ত-চেতনা। দেশ-কালের উর্দ্ধে মানুষ যখন দিব্য-চেতনা লাভ করে, তখন দেশ-কালের চেতনা লুপ্ত হয়। দেশ-কালের চেতনাকে তাই বলা হইয়াছে মায়া। রবীন্দ্রনাথের যে অধ্যাত্ম দ্বন্দ্ব, তাহা এই মুক্তির সহিত মায়ার, পূর্ণতার সহিত অপূর্ণতার।

মুক্তি বা দিব্য-চেতনা-লোক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে ধারণা তাহারই প্রকাশ—

"সৃজনের পর প্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে
কভু দৈব বশে
দূরতম জ্যোতিষ্কের ক্ষীণতম পদধ্বনি
তিল নাহি পশে।" (প্রতীক্ষা)

উপনিষদে বলা হইয়াছে—

"এই স্বর্গের উর্দ্ধে, সকলের উর্দ্ধে, সমস্ত কিছুর উর্দ্ধে, যাহার উর্দ্ধে আর কিছু নাই, সেই উর্দ্ধতম লোকে যে আলোক জ্বলিতেছে, সেই এক আলোক এই পুরুষের অন্তরে।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

কিংবা

"আত্মা সেতু, এই লোক-সমূহকে বিচ্ছিন্ন করিবার (ব্যবধান-) সীমা। দিবারাত্রি, জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি-দুষ্কৃতি, এই সেতু পার হইতে পারে না। ব্রহ্ম-লোক পাপ মুক্ত বলিয়া সকল পাপ এখান হইতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

মৃত্যুর পর মানবাত্মা কি পৃথিবীর কোন স্মৃতি বহন করিয়া লইয়া যায় না?—কোন স্নেহ, কোন প্রীতি, কোন শোভা? মর্তের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াই কি মানুষকে ওই মুক্তি-লোক লাভ করিতে হয়?

"ক্রমে সে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড় খানি
তৃণ পত্রে গাঁথা,
এ আনন্দ সূর্যালোক, এই স্নেহ গেহ,
এই পুষ্প পাতা" (প্রতীক্ষা)

মর্ত ও অমর্তের মধ্যে যদি কোন যোগ না থাকে মুক্তি ও বন্ধন যদি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ তত্ত্ব হয়, তবে জগৎ ও জীবন আশ্রয় করিয়া এমন সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা শুধু মিথ্যা বা স্বপ্ন সঞ্চরণ মাত্র। যদি তাহাই হয় তবে এই বন্ধন ছিন্ন করিবার পূর্বে কবি এই জীবনকে পরিপূর্ণ রূপে ভালবাসিয়া লইবেন। দুইয়ের

মধ্যে কোন নিগূঢ় যোগ আছে কি-না সে সত্য সন্ধান রবীন্দ্রনাথ আপাতত করিতে চান নাই। মৃত্যুকে স্বীকার করিয়া জীবনের অমন নিঃশেষ অবসানকে নিয়তি বা মানব-ভাগ্যের অনতিক্রমণীয় লীলা বলিয়া মানিয়া লইয়াই কবি উহাকে ভালোবাসিতে চাহিয়াছেন।

এই জাতীয় অধ্যাত্ম দ্বন্দ্বে জীবনে দুইটি বিপরীত প্রতিক্রিয়া জাগিতে পারে। একটির বশে মানুষ জগৎ-জীবনকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া সম্পূর্ণ রূপে অস্বীকার করিয়া বসে, অন্যদিকে মানুষ জীবনের অবসান স্বীকার করিয়া লইয়া জগৎ ও জীবনকে আকুল আগ্রহে নিকটে টানিয়া লয়। ওই নিঃশেষ অবসানের বোধ মানব প্রেমকে দুর্বার করিয়া তুলে। বলা বাহুল্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে শেষোক্ত প্রেরণাটি জয়ী হইয়াছে। মর্ত ও অমর্ত চেতনার মধ্যে যোগ আছে নিশ্চয়ই। উভয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া সেই মিলন তত্ত্বটির সন্ধান লাভের মধ্যেই জ্ঞান যোগের সার্থকতা।

উভয়ের মধ্যে সংযোগ কোথায়. সংযোগের স্বরূপ কি, সেই রহস্য কোন ধর্ম ও দর্শন আজ পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করিতে পারে নাই। রাধাকৃষ্ণণের সেই স্পষ্টোক্তি স্মরণে পড়িতেছে, জগতের যে-কোন ধর্ম ও দর্শন যদি সত্য ও সাহসী হয় তাহা হইলে একথা স্বীকার করিবে যে দিব্য-চেতনা কেমন করিয়া বিসৃষ্টি রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে অর্থাৎ অসীম কেমন সীমা-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় না। বস্তুতঃ জগতের সকল ধর্ম ও দর্শন এই অসামর্থ্য মানব জ্ঞানের এই সীমাকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া লইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্র আমাদের এই পর্যন্ত বলে যে এক কোন-একটা-উপায়ে বহু রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই কোন-একটা-উপায়কে বলে মায়া।

রবীন্দ্রনাথ সমস্ত জীবন ধরিয়া এই সংযোগ-সূত্রের সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। সকল জীবন্ত ধর্ম ও দর্শনের মত তিনিও এই ব্যর্থতা ও অসামর্থ্যকে পরিণামে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই আকাঙ্ক্ষার বশেই রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া মর্ত-চেতনার স্বরূপ বিচার করিয়াছেন। মর্ত্য-চেতনাই কবির সকল অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার ভিত্তি স্বরূপ। এই বোধটিকে কবি কখনও কোন কারণে বিচলিত হইতে দেন নাই।

মর্ত চেতনার এই চূড়ান্ত স্বীকৃতির ভিতর দিয়াই কবি একটি সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সংগ্রামের একটি রূপ নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে—

"এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথ্বি পরে
মুহূর্তের খেলা,
এই সব মুখোমুখি এই সব দেখা শোনা
ক্ষণিকের মেলা,
প্রাণপণ ভালোবাসা সেও যদি হয় শুধু
মিথ্যার বন্ধন,
পরশে খসিয়া পড়ে তারপর দণ্ড দুই
অরণ্যে ক্রন্দন,
তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু সীমা শূণ্য
মহা পরিণাম,
যত আশা যত প্রেম, তোমার তিমিরে লভে
অনন্ত বিশ্রাম,
তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এখনি দিয়ো না ভেঙ্গে
এ খেলার পুরী,
ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার দুদিন হতে
করিয়ো না চুরি।" (প্রতীক্ষা)

শূণ্যতার ভিতর হইতে তো কোন কিছু সৃষ্ট হইতে পারে না। এক সৎ স্বরূপ হইতে এই নিখিল বিশ্বের প্রকাশ। তাই এই জগৎ ও জীবনও সত্য। একটিকে স্বীকার করিলে তাই অন্যটি অস্বীকৃত হইয়া যায় না। এক্ষেত্রে দুটি চেতনা স্পষ্ট বিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। একটি যেন অপরটির কোন পরিণাম নয়, একটির সহিত অপরটির যেন কোন সংযোগ নাই।

সীমার বোধ লইয়া সমস্যাটি সমাধান করিতে চাহিলে একটিকে সত্য আর একটিকে মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে। রূপ যখন সত্য, তখন অরূপ মিথ্যা, আবার অরূপ যখন সত্য তখন রূপ মিথ্যা হইয়া পড়ে। ইহা সীমা বোধের যুক্তি।

বস্তুত এই সমস্ত তত্ত্ব আমরা আমাদের জাগতিক বোধ দ্বারা গড়িয়া তুলি। অরূপের বোধে রূপ মিথ্যা হইয়া যায় না, উহার অর্থের কেবল পরিবর্তন ঘটে। মানবীয় চেতনা লুপ্ত হয় না, উহা ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে, জগৎ ও জীবনের এক ভিন্ন স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়।

একের সহিত একের এই যে মিলন, এই যে প্রাণপণ ভালবাসা, 'যত

'আশা', 'যত প্রেম' কোন কিছুই মিথ্যা হইয়া যায় না, তবে উহার এই স্বরূপটি আর থাকে না।

জীবনের অলঙ্ঘ্য নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইয়া জীবন ও জগৎকে পরিপূর্ণ রূপে ভালোবাসিবার এই আকাঙ্ক্ষা কেবল এই কবিতাটির মধ্যে নয় অন্যত্রও নানা ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। মৃত্যুতে এই জগৎ ও জীবনের সকল বন্ধন কি ছিন্ন হইয়া যায়?

"ছেড়ে দিবে তুমি
আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি,
যুগ যুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন
সহসা কি ছিঁড়ে যাবে? (বসুন্ধরার প্রতি)

কিংবা

"ঘরে ঘরে
কত শত নর নারী চিরকাল ধরে
পাতিবে সংসার খেলা, তাহাদের প্রেমে
কিছু কি রব না আমি?" (বসুন্ধরা)

ইহাই যদি নিয়তি হয় তবে তাহার পূর্বে কবি এই জগৎ ও জীবনের প্রীতি-প্রেম-সুধা আকণ্ঠ পান করিয়া লইবেন। একদিন জগৎ হইতে নিঃশেষে বিদায় লইতে হইবে, এই বোধটি অন্তরের অন্তরে আছে বলিয়াই কবির প্রেম অমন দুর্বার হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

"যুগে যুগে জন্মে জন্মে স্তন দিয়ে মুখে
মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ ক্ষুধা,
শত লক্ষ আনন্দের স্তন্য রস সুধা
নিঃশেষে নিবিড় স্নেহে করাইয়া পান।" (বসুন্ধরার প্রতি)

দেশ-কালের মধ্যে মর্ত-প্রেমের এই স্বরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

"ম্লান মুখ, অশ্রু আঁখি,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে টুটিছে গরব
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ কণ্ঠে কয়
'যেতে নাহি দিব,।" (যেতে নাহি দিব)

মুহূর্তে কত প্রেম, কত প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, তবু অনন্ত প্রেমের অথবা

অনন্ত প্রাণের ধারা বিনষ্ট হইতেছে না। মুহূর্তে নূতন প্রেম, নূতন প্রাণ জাগিয়া সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে মানব-হৃদয় সান্ত্বনা পায় না। নূতন প্রেম, নূতন প্রাণ, নিত্যকাল ধরিয়া মনুষ্য-সমাজকে পরিপূর্ণ চির নবীন করিয়া রাখিয়াছে একথা সত্য, কিন্তু মানুষের সান্ত্বনা তো এখানে নাই। যে প্রেম ঝরিয়া গেল, ব্যক্তি গত ভাবে মানুষ তাহাকেই যে লাভ করিতে চায়। এই বিশিষ্ট রূপ ছাড়া আর কোন রূপে তাহার প্রাণের ক্ষুধা মেটে না।

প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টি-বিনষ্টির কোন তত্ত্বই পূর্ণ সাক্ষাৎকারের তত্ত্ব নয়। যে তত্ত্বে এই দুই বিধৃত, সৃষ্টি-বিনষ্টি যেখানে সমার্থক, সেইখানে চেতনার পূর্ণ প্রসারে মানুষের সত্য সাক্ষাৎকার। মর্ত্য-চেতনায় কবি মানব-জীবনের এই স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সীমার বোধে একদিকে সৃষ্টি, অন্যদিকে বিনষ্টির এই দ্বন্দ্বটাই একমাত্র সত্য হইয়া উঠে।

শরতের কূলে কূলে ভরা গঙ্গা খরস্রোতে বহিয়া চলিয়াছে। দুই তীরে যতদূর দৃষ্টি যায় শস্যভারে আনত শস্য ক্ষেত্র। আকাশ প্রান্তে লঘু একখণ্ড শুভ্র মেঘ। ধরণীর প্রান্ত হইতে আকাশের সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত উজ্জল নীলিমার বিস্তার। ভূলোক ও দ্যুলোক পরিব্যাপ্ত করিয়া কোন এক মহাশিল্পীর সৃষ্টির এক অপরূপ চিত্র।

এই অতুল সৌন্দর্যের কিছুই তো থাকে না; আর মানব সংসার ঘিরিয়া এত স্নেহ-প্রেম-প্রীতি তাহাও তো মুহূর্তে মুহূর্তে বুদ্বুদের মত হারাইয়া যাইতেছে। সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে এমনি কত প্রেম গড়িয়া উঠিয়াছে, আবার হারাইয়া গিয়াছে। সকল ভবিষ্যৎ কাল জুড়িয়া এমনি লীলা চলিবে।

শরতের রৌদ্রকরোজ্জল দিবসের মাঝখানে আজ এই যে চলমান দুর্লভ মাধুরী তাহার উপর সেই চিরন্তন আশাহত বেদনা যেন একটি অচঞ্চল ম্লান ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

"চঞ্চল স্রোতের নীরে
পড়ে আছে একখানি অচঞ্চল ছায়া
অশ্রু বৃষ্টি বাষ্প ভরা কোন্ মেঘের সে মায়া।"

(যেতে নাহি দিব)

এই বেদনার তত্ত্বই তো মায়া, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অরূপ দেশ কালের

বক্ষে অন্তহীন রূপ নিয়ত ফুটাইয়া তুলিতেছেন। ইহার স্বরূপ মানুষ কোন দিন হয়ত ব্যাখ্যা করিতে পারিবে না।

এই এক বেদনা আছে মানুষের মনে। এই বেদনায় জাগে গান, রচিত হয় কাব্য, শিল্পীর রূপ সৃষ্টির আর বিরাম থাকে না।

ইহা সৃষ্টির বেদনা বলিয়া কবিতাটির মধ্যে কোথাও বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিত হয় নাই; বরং ইহারই স্পর্শে রূপ তাহার দুর্লভতম মাধুর্যকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

মৃত্যু আকীর্ণ সংসারে কবি কিন্তু প্রেমকেই চিরজীবী বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সে প্রেমের বক্ষে মৃত্যুর বুদ্বুদ নিয়ত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। নিয়ত মৃত্যুর ভিতর দিয়া সেই প্রেমই নানারূপে প্রোজ্জল হইয়া উঠিয়াছে।

কবিতাটির ফল শ্রুতি হইল নিখিল বিশ্বসৃষ্টির নিয়ত ভাঙ্গা গড়ার ভিতর দিয়া একটি স্থির রূপকে ফুটাইয়া তোলা। তাহা কবির চারি বৎসরের নির্বাক কন্যাটির মত প্রেম অভিমানী, অশ্রু সজল।

> "বসুন্ধরা বসিয়া আছেন এলোচুলে
> দূরব্যাপী শস্যক্ষেত্রে জাহ্নবীর কূলে
> একখানি রৌদ্র স্ফীত হিরণ্য অঞ্চল
> বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়ন যুগল
> দূর নীলাম্বরে মগ্ন; মুখে নাহি বাণী।" (যেতে নাহি দিব)

রবীন্দ্রনাথ যে সাধনা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা পরিপূর্ণ জীবনের অথবা মনুষ্যত্বের সাধনা। যে সাধনা জীবনকে অস্বীকার করে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে কোন কালেই সমর্থন করেন নাই। জগৎ ও জীবনকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার না করিলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ ঘটে না। "হোক খেলা এ খেলায় যোগ দিতে হবে," কারণ, "কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা।" ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিমত।

কিন্তু পরিপূর্ণ জীবনও তো মৃত্যুতে বিনষ্ট হইয়া যায়। সে ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, যে জীবনের যদি এই পরিণাম হয়, তবে তাহাকে মানিয়া লইয়াও বলা যায় যে ক্ষণিকের মধ্যে জীবনের যে অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়, জীবনে যে আনন্দের আস্বাদ ঘটে তাহার তুলনা নাই।

জীবন ও জগৎকে একান্তরূপে পরিহার করিয়া যাহাকে লাভ করিতে হয়,

তাহার মূল্য আর যাহাই হোক, তাহা জীবনের ফল লাভ নহে। লক্ষ্য করিতে পারা যায়, মন ও বুদ্ধির সহায়তায় জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে যত প্রকার তত্ত্ব আশ্রয় করা সম্ভব কবি তাহাই করিতেছেন।

জীবন-সাগর মথিত করিয়া কাহারও ভাগ্যে অমৃত উঠে, কাহারও ভাগ্যে বা বিষ। জীবনের স্বরূপ এই। অন্তহীন প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে অগণিত সৃষ্টি ভাসিয়া, আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, হাসি ও ক্রন্দনের অবিচ্ছিন্ন মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া। সৃষ্টির এই লীলা অস্বীকার করিয়া একক মুক্তি সন্ধানে লাভ কি? জীবনের নিয়তি-লীলাকে কবি মানিয়া লইয়াছেন।

"জানি আমি সুখে দুঃখে হাসি ও ক্রন্দনে
পরিপূর্ণ এ জীবন।"

কবি মর্ত্য জীবনের সকল বন্ধন সকল অসম্পূর্ণতা মানিয়া লইয়াছেন।

"চাহিনা ছিঁড়িতে একা বিশ্ব ব্যাপী ডোর,
লক্ষ কোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।" (গতি)

কিংবা

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি সমাধিতে।" (মুক্তি)

জীবনের এই নিয়তি রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া মায়াবাদীরা ইহার ঊর্দ্ধে উঠিতে চাহিয়াছেন। এই সৃষ্টি ধারা চিরন্তন। মানুষ সাধনা করিয়া কেবল একক মুক্তি লাভ করিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ একক মুক্তিকে তত্ত্বত স্বীকার করেন নাই। তাঁহার সে উক্তি আমি ইতিপূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি।

মর্ত্য ও অমর্ত্য-লোকের মধ্যে যে যোগ রহিয়াছে, সেই মিলন রহস্যটি সকল অধ্যাত্মবাদীদের মত রবীন্দ্রনাথও উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়াছেন। এক্ষেত্রে মায়াবাদীদের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রেরণা কবির জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে।

মর্ত্য-চেতনাকে কবি যে-কোন-পরিণামে বিচলিত হইতে দেন নাই। মর্ত্য-চেতনাকে সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করিয়া তাহাকে ভিত্তি করিয়া কবির চেতনা উর্ধ্বগামী হইয়াছে। এই কালে কবির জীবন-জিজ্ঞাসা যে পরিণাম লাভ করে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি পাঠ করিলে কতকটা বুঝিতে পারা যায়।

কবিও জানেন যে মর্ত্যে জীবনের সব ক্ষুধা মেটে না। মানব অন্তরে অসীম বা পূর্ণতার জন্য আকাঙ্ক্ষা তো এই অপূর্ণতা বোধ হইতেই জাগে। তবু কবি

এই জগৎ ও জীবনের প্রতি কৃতজ্ঞ। যে-কোন ফল লাভের আশায় এই জগৎ ও জীবনকে তিনি পরিহার করিবেন না।

"সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক।" (অক্ষমা)

কিংবা

"মানব-আত্মার গর্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্নিগ্ধ শ্যাম মাতৃমুখ পানে,
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলি মাটি তোর।" (আত্ম-সমর্পণ)

মর্ত্য ও অমর্ত্য-চেতনাকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া তুলিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের যে পিপাসা চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, এবং এইরূপে যে বিশিষ্ট জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, আমি তাহার স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছি।

জীবনে এই পৃথক বোধ সত্য নয়। এই জীবন সাক্ষাৎকার ও জীবন-রস পিপাসা একটি অপূর্ণ অনুভূতি আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই পিপাসাও সত্য অধ্যাত্ম-পিপাসা। ইহাও পূর্ণতা লাভের প্রেরণা জাত। এই প্রেরণার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনের, এই নিখিল বিস্বষ্টির ক্রমিক বিরাটতর রূপ প্রত্যক্ষ করিয়া চলিয়াছেন। এই পিপাসাই পরিণামে রূপ ও অরূপ, সীমা ও অসীমের সকল পার্থক্য লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

প্রারম্ভের 'সোনারতরী' কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাব উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির অন্তরে অফুরন্ত সৃষ্টি-প্রেরণা অনুভূত হয়। প্রাণের বক্ষে কত মুহূর্তে কত সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া আবার প্রাণেই বিলীন হইতেছে। এই সৃষ্টি ও বিনষ্টির মধ্যে তো আসক্তির কোন চিহ্ন নাই। অন্তহীন প্রাণ-লীলায় কী নির্মম নিরাসক্তি।

আসক্তি কেবল মানুষের মধ্যে। তাহার সৃষ্টির মধ্যে তাই আসক্তি বিজড়িত থাকে। সেই আসক্তি কি, না আমার সৃষ্টির মধ্য দিয়া আমিও (এই দেহ-প্রাণ-মন লইয়া, এই নাম-রূপে!) বাঁচিয়া থাকিব।

বিশ্ব-প্রাণের প্রেরণাই আমি বা ব্যক্তি-চেতনা আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি-রূপে অভিব্যক্ত হয়। বাঁশির সীমার পীড়নে বাতাস সুরে কাঁদিয়া উঠে। কিন্তু সুরের মধ্যে বাঁশির সীমার কোন পরিচয় নাই। বাঁশি যদি বাতাসকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি না দিত তবে সুর জাগিত না।

ব্যক্তি বা আমি চেতনা হইতেছে এই সীমা, উহাকে আশ্রয় করিয়া প্রাণ অমন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ পায়। কিন্তু এই সৃষ্টির মধ্যে আমির কোন পরিচয় বিজড়িত করিয়া দিতে পারা যায় না। সৃষ্টির কোন্ প্রভাত কাল হইতে অনন্ত কোটি 'আমি'র চেতনা আশ্রয় করিয়া কত সৃষ্টি হইয়াছে, আজও হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও হইবে, এবং সমস্ত সৃষ্টি-ধারাকে ক্রমাগত পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবে; কিন্তু ওই ধারায় 'আমি'র কোন চিহ্ন নাই। একথা সত্য, তাই জীবের মর্মভেদী হাহাকারও চিরন্তন; কারণ তাহার আসক্তির তো কোন সান্ত্বনা নাই।

শ্রাবণের বর্ষণ ভারাক্রান্ত প্রভাত। সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা। কূলে কূলে ভরা পদ্মা কুটিল আবর্ত তুলিয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। নদী তীরের শস্য ক্ষেত্র জলমগ্ন। পরপারে ছায়াচ্ছন্ন গ্রাম মেঘান্তরালে দূর হইতে কেবল একটি মসী কৃষ্ণ রেখার মত বোধ হয়।

মাঝে মাঝে দেখা যায় দুই একটি নৌকা বর্ষার স্রোতে অনুকূল বাতাসে পাল তুলিয়া বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। দূর হইতে শোনা যায় নৌকার ঘায়ে ভাঙ্গিয়া পড়া ছোট ছোট ঢেউ-এর ছল ছল শব্দ।

ইতিমধ্যে কখন মেঘ সরিয়া গিয়া রৌদ্রজ্বল নীল আকাশ ফুটিয়া উঠে। আকাশের প্রান্ত ঘিরিয়া খণ্ড খণ্ড মেঘের আনাগোনা। নিম্নে আলো ছায়ার বিচিত্র লীলা।

কেন জানি না, এমনি এক একটি বর্ষা প্রভাতে মনের মধ্যে জাগে নানা অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা। চিরকালের পরিচিত জগৎ তখন অপরিচয়ের বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়।

একটি অখণ্ড রূপ-লোক, তাহাকে ঘিরিয়া কবি-চিত্তের অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা ও অপার বিস্ময় বোধ, আর তাহার সহিত ব্যঞ্জিত হইয়া আসিয়াছে অপার্থিব সৌন্দর্য ও ভাবনা-লোকের সীমাহীন প্রসার। কবিতাটির ইহাই মুখ্য দিক। তাহার পর ব্যঞ্জনা ক্রমে পাঠক চিত্তে যে নব নব সৌন্দর্য ও মাধুর্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহা পাঠকের ব্যক্তিগত বোধের জগৎ।

চিত্রা

আমারা কাব্য আলোচনার প্রারম্ভ হইতে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সত্তার ধীর জাগরণের পরিচয় দানের সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। চিত্রার মধ্যে এবং ইতিপূর্বেও কবির জীবনে জাগতিক বোধের সীমা অতিক্রম করিয়া অমর্ত্য-চেতনায় সীমাহীন প্রসার লাভ করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। রূপাভিসারের অনিবার্য যে পরিণাম অর্থাৎ অতৃপ্তি, তাহার ভিতর দিয়া কবি-চিত্তে অমর্ত্য-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছে। পরবর্তীকালে কবি সচেতন ভাবে এই চেষ্টা করিয়াছেন। 'খেয়া' হইতে 'গীতিমাল্য' পর্যন্ত কবি-জীবনের যে পর্যায় তাহাতে এই চেষ্টাটিই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

এক চেতনা পরিণাম-ছন্দে পর্বে পর্বে মন প্রাণ ও জড়রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বস্তুত জড়ের মধ্যে সুপ্ত পূর্ণ চেতনা আপনার মুক্ত স্বরূপ ফিরিয়া লাভ করিতে চায়, এই আকাঙ্ক্ষা-প্রেরণায় জড়ের মধ্যে ক্রমিক উন্নততর পরিণামে প্রাণ ও মনের প্রকাশ। এই প্রেরণার ভিতর দিয়া চেতনা একদিন মানস-লোকের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া আপনার পূর্ণ স্বরূপ ফিরিয়া লাভ করিবে।

চিত্রা কাব্যের ভূমিকার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই তত্ত্বটির এক প্রকার আভাস দানের চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ইতিমধ্যে তিনি সৃষ্টির স্বরূপ এবং জীবের নিয়তি সম্পর্কে একপ্রকার নিঃসংশয় হইয়াছেন। সেই অংশটি এইরূপ :

"মানুষের আত্মিক সৃষ্টি কেন, প্রাকৃতিক সৃষ্টিতেও আদিকাল থেকে মূল আদর্শের সঙ্গে বাহ্য প্রকাশের সাঙ্ঘাতিক দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেছে। আঙ্গারিক যুগের শ্রীহীন গাছগুলো কেন টিকতে পারল না। আজ পরবর্তী গাছ গুলিতে সমস্ত পৃথিবীকে দিয়েছে শোভা। কোন শিল্পী রচনার সূত্রপাতে প্রথম ব্যর্থ হয়েছিল, মাথা নেড়েছিল, হাতের কাজ নিষ্ঠুর ভাবে মুছতে মুছতে সংস্কার সাধন করেছে একথাই যখন ভাবি তখন সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে দুই সত্তার মিলন চেষ্টা স্পষ্ট দেখতে পাই। সেই কী নিষ্ঠুর ভাবে নিজেকে জয় যুক্ত করতে চায় মানুষের ইতিহাসে বারবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।"

আদর্শ আমাদের প্রেরণা যত উন্নত হয়, আমাদের অন্তর্লোক তত সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে। বিপরীত দিক হইতে বলা যায়, আমাদের অন্তর্লোক যতই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতে থাকে, আমাদের আদর্শ প্রেরণা তত উন্নত হয়। আবার অন্তর্লোক এবং আদর্শ প্রেরণা দুইই সমৃদ্ধি লাভ করে উন্নততর চেতনার প্রেরণায়। দিব্য-চেতনা, ভাব-লোক বা অন্তর্জগৎ এবং আদর্শ-প্রেরণাকে ক্রমিক পরিণাম বা বিপরিণাম রূপে দেখা সম্ভব। দিব্য-চেতনার যোগে ভাব-লোক বা অন্তর্জগৎ এবং এই রূপে আদর্শ প্রেরণা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে সেই সঙ্গে বাস্তব জগৎ ও জীবন অর্থাৎ বহির্লোক তত সুন্দর হইয়া উঠিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ভাব-লোক বা অন্তর্জগৎকে একটি সত্তা এবং বহির্জগৎকে অপর সত্তারূপে এবং এই রূপে জীবনের বিকাশকে যুগ্ম সত্তার লীলা রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বিকাশ ধারার পূর্ণ পরিণামে দিব্য-চেতনা, ভাব বা অন্তর্জগৎ এবং বহিঃসত্তার মধ্যে কোন পার্থক্য থাকিবে না। তখন এই সকল সত্তার মধ্যে একটি অনায়াস এবং সচেতন যোগ স্থাপিত হইবে। বর্তমানে এমনি একপ্রকার যোগ যে আছে তাহা অনুভব করা যায়, কিন্তু ওই দিব্য-চেতনাকে আমরা সচেতন হইয়া লাভ করিতে পারি না। তাই কোন চেতনার উপর আমাদের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণ নাই।

ব্যাখ্যা স্বরূপে উপরে যে মন্তব্য করিয়াছি উহাকেই একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক পদ্ধতি-বদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছি। তাহাতে রবীন্দ্রনাথের এই যুগ্ম-তত্ত্বটির স্বরূপ উপলব্ধি করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে।

পূর্ণ চেতনায় কোন দ্বৈত বোধ নাই, দ্বৈতবোধ দেশ-কালের সীমার মধ্যে। দ্বৈতবোধের মধ্যে একটি ধ্রুব-তত্ত্ব আর একটি গতিতত্ত্ব। (ইহাকে কেহ বলিয়াছেন 'শক্তি', কেহ বলিয়াছেন 'মায়া', কেহ বা অন্য কিছু। কেহ এই দুইটি তত্ত্বের মধ্যে এক পূর্ণ সত্তার দুইটি রূপ প্রত্যক্ষ করেন, কেহ ইহাদের পৃথক স্বরূপ নির্দেশ করেন।)

দেশ-কালের সীমার মধ্যে চেতনার নানা ক্রম পরিণাম আছে, মন হইতে জড়-লোক পর্য্যন্ত। প্রত্যেক চেতনা পর্যায়ে আবার দুইটি তত্ত্বের যুগল প্রকাশ। একটি ধ্রুব, আর একটি পরিবর্তনশীল। ধ্রুব তত্ত্বটি চেতনার সকল ঊর্ধ্ব বা নিম্ন পর্যায়ে বিদ্যমান, এমন কি দেশ-কালের ঊর্ধ্বে দিব্য-চেতনালোকেও। চেতনার যে ক্রম ঊর্ধ্ব বা নিম্ন পরিণাম আমরা বোধ করি তাহা কেবল গতি তত্ত্বের দিক হইতে। ধ্রুব তত্ত্বের সহিত এই তত্ত্বটি জড়িত বলিয়া একই চেতনা ভিন্ন চেতনা-

রূপে অনুভূত হয়। এই গতি তত্ত্বটি স্থূল হইতে স্থূলতর হইয়া ধ্রুব বা পূর্ণ তত্ত্বকে যতই আচ্ছন্ন করে ততই উহা চেতনার ক্রম নিম্ন পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। বিপরীত দিক হইতে বলা যায়, এই গতি তত্ত্বটি যতই সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে ততই চেতনার ঊর্ধ্বতর পরিণাম বোধ জাগে। দেশ-কালের সীমার ঊর্ধ্বে এই গতি তত্ত্বটি আর থাকে না, কিংবা কেবল বীজাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

চেতনার সকল পর্বে এই যে যুগ্ম তত্ত্বের উল্লেখ করিলাম, প্রত্যেক পর্যায়ের গতির দিক হইতে এই ধ্রুব তত্ত্ব সেই অনুপাতে অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে।

এমনি করিয়া ধীরে মায়া-(অদ্বৈতবাদীদের শব্দটি ব্যবহার করিলে) মুক্তির ভিতর দিয়া চেতনা ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করে। এই উন্নততর চেতনা লাভে চেতনা আর এক অসম্পূর্ণতা ও পূর্ণতার আর এক আভাস লাভ করে। এমনি করিয়া সৃষ্টির ক্রম বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে।

পূর্ণতা লাভের জন্য বিশ্ব-প্রকৃতির এই যে ধীর বিবর্তন, 'সন্ধ্যা' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাহার একটি সুন্দর পরিচয় দান করিয়াছেন। কবিতাটির কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

"ধীরে যেন উঠে ভেসে
ম্লানচ্ছবি ধরণীর নয়ন নিমেষ
কত যুগ যুগান্তের অতীত আভাস
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন মনে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তারপরে প্রজ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তারপরে স্নিগ্ধ শ্যাম অন্নপূর্ণা লয়ে
জীব ধাত্রী জননীর কাজ বক্ষে লয়ে
লক্ষ কোটি জীব, কত দুঃখ কত ক্লেশ,
কত যুদ্ধ কত মৃত্যু, নাহি তার শেষ।" (সন্ধ্যা)

মানস-লোকে পৌঁছাইয়া এবং ওই চেতনাশ্রয়ী সৃষ্টি-প্রেরণায় বিশ্বের বিবর্তন আজও শেষ হইয়া যায় নাই। এই বিবর্তনের শেষ কোথায়, কোথায় তাহার পথ চলার অবসান মানুষ তাহা জানে না।

উন্নতর চেতনা লাভের এক একটি পর্যায়ে সৃষ্টির এক একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেছে। মানস-চেতনায় সৃষ্টির আজ যে স্বরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভে সৃষ্টির আর এক স্বরূপ ফুটিয়া উঠিবে। সেই

পূর্ণ চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া মানুষ এই জগৎ ও জীবনকে দিব্য-জগৎ ও জীবনে রূপান্তরিত করিবে। বর্তমানে মনুষ্য-সমাজে তাহার বুঝি ক্ষীণতম প্রকাশও নাই। একদিকে বাস্তব জীবনে এমনি অপূর্ণতা ও অসামর্থ্য, মনুষ্যত্বের এমনি লাঞ্ছনা ;—

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।"

(এবার ফিরাও মোরে)

এই রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু-ক্ষুধা-হতাশা পরিপূর্ণ জীবনে দিব্য-জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা তখনই সার্থক হইবে, যখন মানুষ আপনার সীমাবোধ অতিক্রম করিয়া দিব্য-চেতনার উপর সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করিবে।

একদিকে শোক-ব্যাধি-জরা-মরণ-হতাশা, জীবনের সংখ্যাতীত দীনতা ও হীনতা, অন্যদিকে অনন্ত আনন্দ ও অমৃত, অভ্রান্তি ও অসংশয়। অধ্যাত্মবাদীদের মধ্যে তাই কোন-না-কোন-রূপে একপ্রকার জীবন বিমুখতা লক্ষিত হয়। তাঁহাদের বিশ্বাস মর্ত্য-লোকে অমর-লোকের আভাস লাভের চেষ্টা দুশ্চেষ্টা মাত্র, দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত করা তো দূরের কথা।

রবীন্দ্রনাথ এই উভয় লোকের সংযোগ স্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন মুক্ত দৃষ্টির সহায়তায় এই জগৎ ও জীবনকে এমনকি উহার স্থূল আধার পর্যন্তকে দিব্য-আধারে রূপান্তরিত করা সম্ভব।

সৃষ্টির মধ্যে এই ধীর পরিণাম ঘটিয়া চলিয়াছে। মানুষ সাধনা এবং সচেতন চেষ্টার ভিতর দিয়া এই অনিবার্য পরিণামকে দ্রুততর করিয়া তুলিতেছে।

সীমাবদ্ধ চেতনায় মানুষের সংস্কার সাধনের যে-কোন-চেষ্টা ত্রুটি শূন্য হইতে পারে না। মানবীয় চেতনায় জীব-সমস্যার পূর্ণ সমাধান তাই একপ্রকার অসম্ভব।

রবীন্দ্র-কাব্য সমালোচকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন, যে কবি বাস্তব দীনতা লক্ষ্য করিয়া আবার অত্যুচ্চ ভাব-কল্পনায় ডুবিয়া গিয়াছেন। বাস্তব জীবনকে তিনি কোন প্রকারেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটির মূল ভাব প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিলে তাঁহারা কখনই এইরূপ মন্তব্য করিতেন না।

অবশ্য এক্ষেত্রেও মর্ত্য ও অমর্ত্য-চেতনা স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু

উভয়ের মধ্যে যে অনিবার্য যোগ আছে এবং উন্নততর চেতনালোকে জীবনের পূর্ণ ছন্দ ও সুষমা যে ফুটিয়া উঠিবে, এই সম্পর্কে কবির নিঃসংশয় অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। কবি তাই সমগ্র জীবন ধরিয়া এই উভয় চেতনার যোগের রহস্যটিকে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যাঁহারা কোন-না-কোন প্রকার সংস্কার সাধন করিয়াছেন এবং এইরূপে বিকাশের ধারাটিকে ক্রমাগত পরিপুষ্ট করিয়া চলিয়াছেন, এই প্রেরণাকে সকলের উপর জয়ী করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহাদের সকলের মধ্যে এই এক পূর্ণতার অনুপ্রেরণা।

"যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন
নির্যাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি।" (এবার ফিরাও মোরে)

এই মরণ ভয় জর্জরিত জীবনকে দিব্য-জীবনে রূপান্তরিত করিবার জন্য কবি তাই মুক্ত-চেতনার অনন্ত প্রেরণা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। ইহা পূর্বোক্ত সমালোচকবর্গের অভিমত অনুসারে জীবনের অস্বীকৃতি নয়।

"মহাবিশ্ব জীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুব তারা।"

(এবার ফিরাও মোরে)

পরিপূর্ণতা লক্ষ্য হইলেও অনেকের ধারণা এই যে মানুষকে প্রথমে জাগতিক বোধকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিয়া দিব্য চেতনাশ্রয়ী হইতে হইবে। তাহা হইলে মানুষ আপনার অভ্রান্ত জ্ঞান ও কর্মপ্রেরণা লইয়া জগৎ ও জীবনের রূপান্তর সাধনে সমর্থ হইবে। তাঁহারা মানবিক বোধাশ্রয়ী অর্থাৎ মন ও বুদ্ধি প্রসূত সকল কর্মপ্রেরণাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ও মানবিক প্রেরণা তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ পৃথক।

মানবিক বোধকে সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ করিয়া প্রথমে অধ্যাত্মবোধাশ্রয়ী হইতে হইবে তাহার পর জাগতিক কর্মে আত্মনিয়োগ, রবীন্দ্রনাথ ইহাতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

মানব সংসারে দুইটি প্রেরণাই যুগপৎ ক্রিয়া করিতেছে—একটি আধ্যাত্মিক, অন্যটি মন ও বুদ্ধি আশ্রয়ী। দুইটি প্রেরণাই উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া একটি পরিণামে অলৌকিক উপায়ে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবে। সেইখানে জগতে ফুটিয়া উঠিবে

নিরূপমা সৌন্দর্য প্রতিমা'র পরিপূর্ণ প্রকাশ। তাই যুগ যুগান্তরশায়ী যে মানব যাত্রীর বন্দনাগান তিনি করিয়াছেন তাহাতে কেবল অধ্যাত্ম সাধকরাই নাই, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধকরা বিচিত্র স্রষ্টা ও মৃত্যুঞ্জয়ী বীররাও আছেন। এই উভয়-মুখী প্রেরণার ভিতর দিয়া মানুষের বোধের জগৎ ক্রমাগত প্রসারিত হইয়া চলিয়াছে। জীবনে ও জগতে সৌন্দর্যের ধীর প্রসার।

ব্যক্তি ও বিশ্বের অন্তরালে একটি পূর্ণতার আদর্শ আছে। মানুষ এই পূর্ণতাভিখীন হইয়া উহাকে ক্রমাগত লাভ করিতে করিতে চলিয়াছে। সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে তাহারই আভাস দানের চেষ্টা। এই চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষ ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে।

যাহাকে সে প্রকাশ করিয়াছে, তাহা ওই আদর্শের অনুপ্রেরণায় সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকাশের মধ্যে মানুষ অপূর্ণতা বোধ করে। মানুষের সৃষ্টির মধ্যে তাই একদিকে পূর্ণতার আভাস লাভের আনন্দ-প্রেরণা, অন্যদিকে অসম্পূর্ণতা ও ব্যর্থতা-বোধের পীড়া।

চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শও ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে। বস্তুত পূর্ণতার আদর্শ ধ্রুব, শাশ্বত, উন্নততর চেতনা লাভের ভিতর দিয়া মানুষ উহার অধিকতর আভাস লাভ করিয়া চলে।

কোন একটা বিশেষ পর্যায়ে বিশিষ্ট মুহূর্তে ধ্যানের রূপের সহিত বাস্তব রূপের হয়ত মিলন ঘটে,—সার্থক রূপায়ণে এই মিলন ঘটেও। সৃষ্টির আনন্দ তো এই মিলন সাক্ষাৎকারে। তাহার পর মানুষ ওই পর্যায় ছাড়াইয়া উঠে, তাহার আদর্শ আরও উন্নত আরও উদার ও বিস্তৃত হয়। মানুষকে তাই বর্তমান সৃষ্টিকে নির্মম ভাবে দলিত করিয়া ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার ইতিহাস ইহারই পরিচয় দান করে।

যেখানে মানুষ অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে রূপায়িত করিতে সমর্থ হইয়াছে, সেখানে মানুষের বৃহত্তর সত্তার প্রকাশ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে মানুষ আপনার সৃষ্টিকেও ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য, যে আদর্শকে সে বাহিরে রূপায়িত করিতে পারিল না তাহাকেই বারংবার লাভ করিবার জন্য সাধনায় রত সেখানে মানুষের প্রকাশ যে আরও বড় ইহাও সত্য।

"যা কিছু আমার আছে আপনার শ্রেষ্ঠ ধন
দিতেছি চরণে আনি

অকৃতকার্য, অকথিত বাণী, অগীত গান,
বিফল বাসনা রাশি।"

কবি তাই আপনার শ্রেষ্ঠ ধন বলিতে 'অকৃতকার্য', 'অকথিত বাণী', 'অগীত গান', 'বিফল বাসনা রাশি'কে বুঝাইয়াছেন। অর্থাৎ কবি আপনার সেই উন্নততর সত্তার কথাই বলিতে চাহিয়াছেন, যাহাকে তিনি ভাষায় রূপায়িত করিতে পারেন নাই। কবি যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, যে কাজ করিয়াছেন, যে কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহার যে সকল আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে চরিতার্থ হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা তাঁহার জীবনে যে কাজ সফল হয় নাই, যে বাণী অনুচ্চারিত, যে সঙ্গীত অগীত, যে বাসনা অচরিতার্থ তাহা অনেক বড় ; কারণ অলব্ধ ও অপ্রকাশের মধ্যে অনন্ত সম্ভাবনা। মানুষের উহা অসীমের দিক।

পূর্ণতার এই প্রেরণা অমোঘ বলিয়া মানবীয় চেতনাকে উহা ক্রমাগত ঊর্ধ্বতর লোকে আকর্ষণ করে। এই প্রেরণায় যদি মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয় বিশিষ্ট আধারটি ভাঙ্গিয়াও যায়, তবুও উহা ক্ষণকালের জন্য আপনাকে নিরুদ্ধ করে না। সাধকবর্গের জীবনেই শুধু নয়, সকল শ্রেণীর স্রষ্টার জীবনে ইহার কত-না পরিচয় লাভ করা যায়। এই প্রয়াসে তাঁহাদের দেহাধার জীর্ণ, শতধা হইয়া গিয়াছে, তবুও তাঁহারা বিশ্রাম মানেন নাই।

"মনে যে গানের আছিল আভাস
যে তান সাধিতে করেছিনু আশ
সহিল না সেই কঠিন প্রয়াস
ছিঁড়িল তার।"

এমনি করিয়া সৃষ্টির ভিতর দিয়া কবি ক্রমাগত সৃষ্টিকে ছাড়াইয়া ছাড়াইয়া উঠিতেছেন, ক্রমাগত ওই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

বিশ্ব ব্যক্তি-চেতনা আশ্রয় করিয়া ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভের সাধনা করিতেছে। সংখ্যাতীত মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়া বিশ্ব-প্রাণের যোগে অবিরাম সৃষ্টি করিতেছে, আবার হারাইয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে, এবং ভবিষ্যতে অনন্ত কাল ধরিয়া এই সৃষ্টি হইতে থাকিবে। এই সৃষ্টি-ক্রিয়ার ভিতর দিয়া জীব ও জগৎ ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হইতেছে। এই সাধনায় তাই বিশিষ্ট কোন ব্যক্তির উহার আসক্তি ও নাম-রূপের কোন মূল্য নাই।

কবির জীবন আশ্রয় করিয়া তাঁহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া সেই বিশ্ব-চেতনা কোন এক নিগূঢ় অভিপ্রায় সার্থক করিয়া তুলিতেছে। সেখানে সৃষ্টি-কার্যের চতুর্দিকে নাম-রূপ খোদাই করিয়া আমার বলিয়া চিহ্নিত করিবার প্রয়াস যেমন করুণ, তেমনি নিষ্ফল। বিশ্ব-প্রাণের যোগে যাহা সৃষ্ট তাহা বিশ্ব-প্রাণকে অনাসক্ত ভাবে ফিরাইয়া দিয়া মুক্তি লাভ করিতে হয়।

"বলেছি যে কথা করেছি যে কাজ
আমার সে নয় সবার সে আজ,
ফিরিছে ভ্রমিয়া সংসার মাঝ
বিবিধ সাজে।"

চিত্রার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যাঁহাকে জীবন দেবতা, অন্তর্যামী, চিত্রা প্রভৃতি নামে অভিহিত করিয়াছেন, এখন তাহার স্বরূপ কতকটা বুঝিতে পারা যাইবে। কবির এই জীবন-দেবতার স্বরূপ কি? জীবন-দেবতার স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা আমরা ভূমিকায় করিয়াছি।

এখন কবির জীবন-দেবতা পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা আলোচনা করা যাইতে পারে। এক দিব্য-চেতনাই দেশ-কালের সীমার মধ্যে অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

"জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে
তুমি বিচিত্র রূপিণী।" (চিত্রা)

দেশ-কালের মধ্যে যিনি রূপে রূপে বহু রূপে বিরাজমান, দেশ-কালের ঊর্ধ্বে তিনিই আবার নির্বিশেষ এক।

"নাহি কাল দেশ, তুমি অনিমেষ মূরতি
তুমি অপচল দামিনী।" (চিত্রা)

অন্তরে ধ্যান-লোকেই নির্বিশেষ দিব্য-চেতনার সহিত মিলন ঘটে। এখানে 'ভক্ত' কবির ধ্যান-লোক। ধ্যান-লোকে দিব্য-চেতনার প্রেরণা সর্বাধিক অনুভূত হয় বলিয়া সৃষ্টি-প্রেরণা আর বিরাম মানে না, একেবারে সহস্র ধারায় উৎসারিত হইয়া পড়িতে চায়।

সৃষ্টি-প্রেরণার পশ্চাতে ঊর্ধ্বতর চেতনার লীলা থাকে বলিয়া নিম্নতর চেতনায় তাহার কোন অর্থ ই প্রতীত হয় না।

মানুষের সচেতন মন ঊর্ধ্বতর অনন্ত জ্যোতি প্রবাহের একটি বিন্দুমাত্র। আমাদের বুদ্ধি অনন্ত চেতনা-সমুদ্রের একটি চঞ্চল বীচিবিক্ষেপ। কবির ধ্যান-

লোক অত্যন্ত সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে বলিয়া উর্ধ্বতর চেতনা-লোক হইতে অফুরন্ত সৃষ্টি-ধারার বন্যা নিম্নে নামিয়া আসিতেছে।

সীমাবদ্ধ, একান্ত খণ্ডিত বোধ দিয়া মানুষ উহার কোন স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থায়ী ভাবে উর্ধ্বতর চেতনা-লোক লাভ করিলে এই সৃষ্টি-প্রেরণার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মানুষ তখন এই সৃষ্টি-প্রেরণার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করে বলিয়া উহা আর অবশ প্রেরণা মাত্র থাকে না। তখন মানুষ জীবন আশ্রয় করিয়াও সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে সৃষ্টি করিয়া চলে।

"এ যে সঙ্গীত কোথা হতে উঠে,
এ যে লাবণ্য কোথা হতে ফুটে,
এ যে ক্রন্দন কোথা হতে টুটে
অন্তর বিদারণ।"

কবি যে ক্ষেত্রে বলিতেছেন—

"আমার অর্থ তোমার তত্ত্ব
বলে দাও মোরে অয়ি।"

সে ক্ষেত্রে 'তুমি' হইতেছে সেই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক, যে-লোকে নির্বিশেষ দিব্য-চেতনা বিশেষ পরিণাম লাভ করিয়াছে। আর 'আমি', দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট মানবিক চেতনা।

দিব্য-চেতনা অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া, ধ্যান-লোক আবার মন ও বুদ্ধি (দেহ-প্রাণ-মন) আশ্রয় করিয়া এই যে লীলা করিতেছে, মৃত্যুতে তো এই লীলার অবসান ঘটে। জাগতিক চেতনা মুক্ত উর্ধ্বতর সত্তা বা বাসনা-লোকের সেই পরিচয়ই বা কিরূপ ? দেহান্তর গ্রহণের পূর্বে উহা কোন্ স্বরূপে অবস্থান করে ? কেমন করিয়া উহা আবার নূতন দেহ পরিগ্রহ করে ? এই 'আমি'র (দেহ-প্রাণ-মন) সহিত সেই 'আমি'র যোগ কোথায় ?

"হবে যবে তব লীলা অবসান
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্য পুর ?" (অন্তর্যামী)

অনন্তের কোন্ উদ্দেশ্য সার্থক হইয়া উঠিতেছে, তাহা জাগতিক চেতনায় বুঝিবার কোন উপায় নাই। তাই কবির অন্তরে এমন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে।

"জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার।" (অন্তর্যামী)

অন্তর্যামী কবির বাসনা লোক। অন্তর্যামী বা বাসনা-লোক আবার দিব্য-চেতনার উপর আশ্রিত। উহাই সেই পরম দেবতা। দেহ-প্রাণ-মন ও বাসনা-লোক অর্থাৎ 'আমি' এবং 'তুমি' এই উভয়ের যোগে মানুষ জীবন ও জগতের অনন্ত রহস্যের ক্ষীণতম আভাস লাভ করে।

প্রত্যেকটি চেতনা-লোক এক দিব্য-চেতনার পরিণাম বা পর্যায় মাত্র, এই সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন বোধ কবির মধ্যে আজও গড়িয়া উঠে নাই। এই কারণেও যেমন, তেমনি অন্যদিকে সৃষ্টির ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভের তত্ত্বটিও একটি পরিপূর্ণ দার্শনিক বোধরূপে কবির জীবনে তখনও উপলব্ধ হয় নাই বলিয়াও জীবনে এই প্রেরণার স্বরূপ তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই বিচ্ছিন্ন ভাবে এমন জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। কিন্তু এই জাতীয় উপলব্ধি এবং জিজ্ঞাসার ভিতর দিয়া কবির দার্শনিক বোধটি যে পরিপূর্ণ রূপ লইয়া প্রায় ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে তাহা সহজেই লক্ষ্য করা যায়।

"আমি হতে তুমি বাহিরে আসিবে
ফিরিতে হবে না খুঁজি।" (অন্তর্যামী)

যে অধ্যাত্ম-সত্তা দেহ-প্রাণ-মন আশ্রয় করিয়া আপনাকে সক্রিয় করে, তাহা বিশিষ্ট বলিয়া যত সূক্ষ্ম হোক-না-কেন, রূপ শূন্য নহে। সেই অধ্যাত্ম-সত্তা জন্ম হইতে জন্মান্তরে বিচিত্র বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছে। সেই অধ্যাত্ম-সত্তারও স্বরূপ আমরা জানি না, অথচ উহারই যোগে আমাদের সকল অস্তিত্ব সর্ববিধ প্রকাশ। তাহার সহিত মানুষ নিত্য যুক্ত, তাহা মানুষের পরম প্রকাশ। নিবিড় অনুভূতির ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্তে মানুষ তাহার আভাস লাভ করে, কিন্তু তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারিতেছে না।

"জনমে জনমে রহ তবে রহ
নিত্য মিলনে নিত্য বিরহ
জীবনে জাগাও প্রিয়ে।" (অন্তর্যামী)

জীবের ঊর্ধ্ব পরিণাম তত্ত্ব বুঝিলে মৃত্যুর স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যায়। মনুষ্য চেতনা আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির যে ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভের সাধনা, তাহা তো এক জীবনে একটি বিগ্রহে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া সে আবার নূতন বিগ্রহ গড়িয়া তুলে, অবশ্য পূর্ব জীবনের সাধন-

ফলটিকে সেই সঙ্গে লইয়া আসে। এইরূপে জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া সে তাহার সাধনাকে ধীরে সার্থক করিয়া তুলিতেছে।

অধ্যাত্ম-সত্তায় দিব্য-চেতনার যতটুকু আভাস আসিয়া পৌঁছায়, যতটুকু প্রেরণা লাভ করিতে পারা যায় কবি তাহাতেই পরিতৃপ্ত। ইহাকে কবি একটি বিশিষ্ট দর্শন-রূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'জীবন দেবতা' কবিতাটির মধ্যে এই যুগ্ম লীলার আরও কিছু পরিচয় লাভ করা যায়। এই জীবন দেবতা যে কবির অধ্যাত্ম-সত্তা ; দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট 'আমি' যে এই অধ্যাত্ম-সত্তার লীলাভূমি কবির সেই এক উপলব্ধির পরিচয় এক্ষেত্রেও লাভ করিতে পারা যায়।

"ওহে অন্তরতম,
মিটেছে কি তব সকল তিয়াষ
আসি অন্তরে মম।"

এই জীবনে এই দেহরূপে লীলার যদি আজ অবসান ঘটে তবে এই অধ্যাত্ম-চেতনা আবার নবরূপ ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে। অধ্যাত্ম-সত্তায় আত্মার সৃষ্টি-প্রেরণা অসীম। রূপের সীমা আছে, তাই বিনষ্টি আছে। তাই অসীমের সহিত লীলার জন্য নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতে হয়। জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া এই লীলা চলিতেছে এবং চলিতে থাকিবে।

"ভেঙ্গে দাও তবে আজিকার সভা
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা"। (জীবন দেবতা)

এই 'নব রূপ' 'নব শোভা' 'নূতন বিবাহ' 'নবীন জীবনে'র অর্থ কি তাহা উল্লেখ করিয়াছি।

অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকে চেতনা যতই প্রসার লাভ করুক তাহা সীমার লোক বলিয়া মানুষ কিছুতেই পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। সকল জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটে. সংশয় লোপ পায়, সেই সঙ্গে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ ঘটে সীমার বোধ ছাড়াইয়া গেলে। লীলা-তত্ত্বটিকে স্বীকার করিয়াও কবি-চিত্তে তাই অমন উৎকণ্ঠা, অমন নিত্য অপরিতৃপ্তি।

কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের পশ্চাতে এই উন্নততর চেতনা লাভের প্রয়াস, উহারই গূঢ় প্রেরণা। এই আকাঙ্ক্ষা, এই প্রাবেগকে রবীন্দ্রনাথ কত রূপে ফুলাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অপরূপতার এতটুকু আভাস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কী প্রাণপণ প্রয়াস।

অন্তহীন সে প্রেরণা, আর কবির অবিরাম প্রাণপণ প্রয়াস উহাকে রূপ-লোকে ধরিয়া রাখিবার। অসীমের প্রেরণা অন্তহীন হইলে কী হইবে, মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ। মনে হয় হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন ছিন্ন হইয়া যাইবে, মনে হয় এই দেহাধার বুঝি শতধা হইয়া যাইবে।

আজ আর রূপের জগতে অরূপের আভাস ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা নয়, এই প্রেরণা সহস্র স্রোত-ধারায় কবির সকল রূপের ধ্যান ডুবাইয়া অরূপে একাকার হইবার জন্য ছুটিয়া চলিয়াছে।

অধ্যাত্ম প্রেরণা যখন চরমে গিয়া পৌছায়, তখন উহা সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া রূপের সকল তত্ত্বকে পুড়াইয়া দিয়া অরূপের জন্য লেলিহান হইয়া উঠে।

কবি তাই রূপের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া ওই দিব্য-চেতনা-লোক লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন।

"আজি ছিন্ন করে ফেলো ওই
চিরস্থির আচ্ছাদন অনন্ত অম্বর।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

কিংবা

"ফাটুক হৃদয়
ভূমানন্দে ব্যাপ্ত হয়ে যাক শূন্যময়
গানের তানের মতো।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

ইহার আরও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়—

"কোন মর্ত্য দেখে নাই
যে দিব্য মূরতি, আমারে দেখাও তাই
এ বিশ্রব্ধ রজনীতে নিস্তব্ধ বিরলে।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

বিশ্ব-চেতনা সম্পর্কে কবির যে বোধ—

"সেথায় বিরাজে
একটি কুসুম শয্যা, রত্ন দীপালোকে
একাকিনী বসি আছে নিদ্রাহীন চোখে
বিশ্ব সোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা।"

বিশ্বের অগণিত রূপ, তাহার বিচিত্র বর্ণ, গন্ধ, ধ্বনি আমাদের চিত্তে এই সমস্তকে আশ্রয় করিয়া আবার অলৌকিক ভাবে এই সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছে যে এক পরিপূর্ণ অখণ্ড সৌন্দর্য-সত্তা তাহারই বিচিত্র আভাস দান করে।

সৌন্দর্য-সত্তা মাত্রেই অন্তরের মধ্যে যে ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করে তাহা ওই পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য। সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সত্তাকে কবি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

"অসীম সুন্দর,
ত্রিলোক নন্দন মূর্তি।"
"তরুণী লক্ষ্মী"
"দিব্য মুরতি"
"বিশ্ব সোহাগিনী লক্ষ্মী, জ্যোতির্ময়ী বালা"।

সৌন্দর্য-সত্তা মাত্রেই কবির অন্তরে যে অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা সঞ্চারিত করিয়া দেয়, কবি তাহাকেই কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। সে ব্যাকুলতা যেমন, সে রূপ সৃষ্টিও তেমনি অনিঃশেষ। আবার এই নিরন্তর সৃষ্টি প্রেরণার জন্যই কবির অন্তরে সেই ব্যাকুলতা ক্রমাগতই বাড়িয়া গিয়াছে।

"আমি যে কাতর
অনন্ত তৃষায়, আমি নিত্য নিদ্রাহীন,
সদা উৎকণ্ঠিত, আমি চির রাত্রি দিন
আনিতেছি অর্ঘ্য ভার অন্তর মন্দিরে
অজ্ঞাত দেবতা লাগি—বাসনার তীরে
এক বসে গড়িতেছি কত যে প্রতিমা
আপন হৃদয় ভেঙে, নাহি তার সীমা।" (জ্যোৎস্না রাত্রে)

কবির স্থির বিশ্বাস পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য-সত্তাটিকে মুহূর্তের জন্যও অপরোক্ষ করিলে এই অতৃপ্তির অবসান ঘটে চিরকালের জন্য।

কবির সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার উত্তাপে জ্যোৎস্না প্লাবিত নদী এবং তাহার উভয় তীরের বিচিত্র সৌন্দর্য একটি অখণ্ড রূপে বিগলিত হইয়াছে কি-না, এবং এই সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপের দর্পণে সকল রূপাতীতের অখণ্ড মাধুরীর ছায়া নানারূপে পড়িয়া আমাদের চিত্তে তাহার একটি সামগ্রিক ধারণা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছে কি-না তাহা অবশ্য বিচার্য। আমাদের মনে হয় 'জ্যোৎস্না রাত্রে' কবিতাটির মধ্যে কবির রূপাতীতের আর্তি প্রবল হইয়া রূপের ধ্যানকে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেয় নাই।

মানসীর 'মেঘদূত' এবং সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী' ইত্যাদি কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে কবির অখণ্ড সৌন্দর্য বোধ এবং তজ্জাত পিপাসার দার্শনিক

স্বরূপ বিচার করিয়াছিলাম। সেই একই বোধের পরিচয় এক্ষেত্রেও লাভ করিতে পারা যায়।

সেই বিচারে আমরা এই নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, কবির অন্তরে খণ্ড সৌন্দর্যের জন্য যে পিপাসা অথচ খণ্ড সৌন্দর্য বলিয়া যে অতৃপ্তি, সেই অতৃপ্তির ভিতর দিয়া খণ্ড সৌন্দর্যের বিকল্প স্বরূপে কবি এমনি একটি অখণ্ড সৌন্দর্যের তত্ত্ব গড়িয়া তুলেন।

অখণ্ড সৌন্দর্য বোধের পশ্চাৎ প্রেরণা যে বিশ্ব-চেতনায় পরম ব্যাপ্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রসূত তাহাতে কোন সংশয় নাই। তবে বিশ্ব-চেতনার স্বরূপ বুঝাইতে তিনি অখণ্ড সৌন্দর্যের যে তত্ত্ব গড়িয়া তুলেন, বস্তুত তাহা খণ্ড সৌন্দর্য বোধের একটি রস পরিণাম ছাড়া আর কিছু নয়।

বিশ্ব-চেতনা জীবনে যতদিন না সত্য হইয়া উঠে, ততদিন উহার স্বরূপ সম্পর্কে এমনি একটি বোধ আমাদের থাকে। মন ও বুদ্ধির সহায়তায় গড়িয়া তোলা বোধ বলিয়া রূপের ধর্মই কোন-না-কোন রূপে প্রকাশ হইয়া পড়ে। চিত্রায় এই জাতীয় অখণ্ড সৌন্দর্য বোধের ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিয়াছে।

বিশ্ব-চেতনা সম্পর্কে কবির যে ধারণা, কবির অন্তরে তাহার যে ধ্যান, তাহা বিচার্য হইলেও আমাদের এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া কবির রূপের বোধটিকে ছাড়াইয়া উঠিবার বিচিত্র চেষ্টার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ মানবীয় চেতনাকে মোটামুটি দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। একটি তাহার জীব-সত্তা, অপরটি তাহার অধ্যাত্ম-সত্তা। অধ্যাত্ম-সত্তার ভিতর দিয়াই মানুষ ঊর্ধ্বতর চেতনার আভাস, তাহার চকিত স্পর্শ লাভ করে। অন্তরের পথ তাহার অসীমের পথ। বাহিরের সকল দীপ নিভাইয়া দিয়া অন্তরের অন্ধকার লোকে তাহাকে অভিসার করিতে হয়, বিশ্বাসের দীপ হস্তে লইয়া। এই পথেই তাহার মুক্তি, তাহার আনন্দ, তাহার সৃষ্টি।

একদিকে মানুষের জীব-সত্তার প্রকাশ,

> "পরপারে
> তব রাজ্য কর্ম যশ ধন জন ভারে
> অসীম বিস্তৃত।"

অন্যদিকে তাহার আধ্যাত্ম লোক। ইহা কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছে, এই পরিণামে বিশ্ব-চেতনা কোন্ স্বরূপে প্রকাশ পায়, তাহার সূক্ষ্ম বিচার তুলিয়া

লাভ নাই। ইহা যে অন্তর্জগৎ মানুষের ধ্যান-লোক এক্ষেত্রে মোটামুটি ইহাই বুঝিলে চলিবে।

"এ পারে নির্জন তীরে
একাকী উঠেছে ঊর্ধ্বে উচ্চ গিরি শিরে
রঞ্জিত মেঘের মাঝে তুষার ধবল
তোমার প্রাসাদ সৌধ, অনিন্দ্য নির্মল
চন্দ্রকান্ত মণিময়।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা এবং এইরূপে তাঁহার সকল সৃষ্টি-কর্মের একমাত্র প্রেরণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

"অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যা শিরোদেশে
সারা সুপ্ত নিশি, সুর নর স্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রী-অঙ্গ পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি সে প্রদীপ খানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধ তৈল আনি।"

যে নিষ্কম্প দীপ-শিখার কথা কবি উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা যে কবির ধ্যান-লোক, তাহা বুঝিয়া লইতে কষ্ট হয় না। এই ধ্যান-লোকে অমর্ত্য-চেতনার সহিত কবির নিত্য মিলন। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'সুর নর স্বপ্নাতীত নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ এই "শ্রীঅঙ্গের"র কিছু আভাস লাভ করিয়াছেন।

এই প্রদীপ জ্বালাইয়া ধরিবার অর্থই হইল ধ্যান-লোকে নিত্য অবস্থান করা। ধ্যান-লোকে অসীমের সহিত যোগ ও লীলার আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা। 'গন্ধ তৈল' কবির সৌন্দর্য-ধ্যান। মানুষের একটি দিক আছে সীমার। সেখানে মানুষ অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যাপৃত, খ্যাতি প্রতিষ্ঠা প্রতিপত্তি লাভের জন্য দুঃসাধ্য সাধনে রত। সেখানে সে রাজ্য প্রসার করিতেছে, দেশ দেশান্তরে বাণিজ্যতরী ভাসাইতেছে, বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে।

এই প্রয়াসের ভিতর দিয়াই তো নব নব বন্দর, নগর, রাষ্ট্র গড়িয়া উঠিতেছে, বিজ্ঞানের কত বিস্ময়কর উদ্ভাবনা। জল-স্থল-অন্তরীক্ষে তাহার বিচিত্র অভিযান। মানব সভ্যতায় ইহার একটি ক্রম প্রসারতার দিক আছে।

মানুষের আর একটি দিক আছে অসীমের। ইহা তাহার ভাব জগৎ; এখানে মানুষ কল্পনা করে, সৌন্দর্য স্বপ্নে বিভোর হয়, প্রেমে উদ্‌ভ্রান্ত হয়। এই সৌন্দর্য ও প্রেমকে আশ্রয় করিয়া মানব মন বারংবার এমন একটা কিছুকে আস্বাদ করে যাহা সকল সীমার বোধকে অতিক্রম করিয়া যায়।

এই অপরিমিতির বোধ, একান্ত নিষ্প্রয়োজনের বোধকেই যুগে যুগে স্রষ্টারা বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। মানব সভ্যতায় ইহারও একটি ক্রম বিকাশের দিক আছে।

দেবীর রাজ্য এই উভয় লোককে আশ্রয় করিয়া। এই উভয় লোকের যুগপৎ প্রসারের ভিতর দিয়া একটি পরিণামে উভয়ে উভয়কে অস্বীকার করিয়া একটি অখণ্ডতায় বিগলিত হইয়া যাইবে।

'আবেদন' কবিতাটির মধ্যে কবি যে একটি সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া তুলিয়াছেন, দেবীর যে 'তুষার ধবল প্রাসাদ সৌধ', এবং তাহার মধ্যস্থলবর্তিনী করিয়া সৌন্দর্যের সারভূতা দেবীর যে বহু বিচিত্র লীলা বিলাস,—তাহা এতদূর সমৃদ্ধ, অসামান্য ব্যাপ্তি সত্বেও এথনি সংহত, মূর্ত্য; ধ্বনিতে, বর্ণে, মাধুর্যে এমন প্রাণস্পর্শী, সেই সঙ্গে এমনি লঘু ও স্পর্শকাতর, মনে হয় যেন এক দিব্য স্বপ্ন! যে-কোন মুহূর্তে তাহা কোন্ শূন্যতায় হারাইয়া যাইবে!

জীবনভোর আমরা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে যে সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে যে সৌন্দর্যের আভাস ফুটিয়া উঠে, সেই সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য-লোক কবি-কল্পনার যাদুদণ্ড সঞ্চালনে একটি সামগ্রিক রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে সৌন্দর্য-লোক তো আমাদের নয় কবির, যাঁহার মধ্যে সৌন্দর্য-কল্পনা লোকত্তর মহিমা লাভ করিয়াছে।

কবির এই সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টির অনুরূপ অসামান্য দক্ষতার পরিচয় লাভ করা যায় 'বিজয়িনী' কবিতার মধ্যে। সৌন্দর্য-লোককে আমরা বিশ্লেষণ করিব কোন উপায়ে। তাহার সামগ্রিক রূপটিকে কেবল বারংবার আস্বাদ করিতে হয়। রূপ সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণ আত্ম বিগলনের ফলে সে আস্বাদ সম্ভব। আর এই সমস্ত কিছুর জন্য প্রয়োজন পাঠকের কল্পনা সমৃদ্ধ মন। এই সৌন্দর্য-ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় কবি কত চকিত মুহূর্তে অমর্ত্য-লোকের আভাস লাভ করিয়াছেন।

কবির সেই ধ্যান-লোক—

"এ যে দুজনের দেশ
নিখিলের সব শেষ

মিলনের রসাবেশ
অনন্ত ভবন।”

এই সৌন্দর্য-ধ্যান-নিমগ্ন হইয়া কবি যে বাস্তব দুঃখ, ব্যথা-বেদনা বিস্মৃত হইতেন আমরা সে পরিচয় লাভ করিয়াছি।

“নীরবে লইব প্রাণে তোমার হৃদয় হতে
নীরব বেদনা।”

এই সৌন্দর্য-ধ্যান-তন্ময় অবস্থায় কবি যেখানে পরিপূর্ণরূপে আত্ম বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, মানবীয় চেতনা যেখানে সম্পূর্ণ রূপে স্তম্ভিত হইয়া যায় সেই-খানেই কবির সৌন্দর্য-ধ্যানের চরম পরিণাম।

“প্রদীপ নিবায়ে দিব
বক্ষে মাথা তুলি নিব—”

একদিকে দেশ-কালের ঊর্ধ্বে অমর্ত্য-লোকের অনন্ত প্রসার,

“অনশ্বরা অনাসক্তা চির একাকিনী
আপন সৌন্দর্য-ধ্যানে দিবস যামিনী
তপস্যা মগনা।”

অন্যদিকে দেশ কালের মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়া ক্রমাগত বিবর্তিত হইয়া চালিয়াছে।

“মহাকাল পদতলে
মুগ্ধ নেত্রে ঊর্ধ্বমুখে রাত্রি দিন বলে
‘কথা কও, কথা কও, কথা কও প্রিয়ে’।”

মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসাকে রবীন্দ্রনাথ দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক জাতীয় সৌন্দর্য-বোধ পুরুষকে একটি মঙ্গলময় পরিণাম দান করে। ইহা পুরুষের প্রেম। পুরুষের অপর সৌন্দর্য-পিপাসায় পরিতৃপ্তি ঘটে না, ইহা পুরুষের সৌন্দর্য মোহ।

সৌন্দর্য নারীর হোক অথবা প্রকৃতির হোক আমরা তাহা প্রত্যক্ষ করি বিচিত্র প্রয়োজন বোধ, সংস্কার বোধের সহিত অন্বিত করিয়া। ফলে তাহার সমগ্র প্রকাশ আমাদের বোধের অন্তরায় হইয়া যায়। সৌন্দর্য-সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ রূপটি ধরা পড়ে সকল সীমার বোধ, সংস্কার বোধের বাহিরে আসিতে পারিলে।

সৌন্দর্য-সত্তার পরিপূর্ণ প্রকাশ বলিতে তাই সেই সৌন্দর্যকে বোঝায় যেখানে রূপ (from) বড় হইয়াও প্রতিনিয়ত রূপের সীমাকে অতিক্রম করিয়া

যায়। তাহা সকল রূপাতীত এ্যাব্‌সট্রাক্ট সৌন্দর্যের ধ্যান নয়। প্রকাশময় সৌন্দর্যের অসীম রহস্যের তত্বই উর্বশী। বিশিষ্ট, বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যবোধের ক্ষেত্রে একথা যেমন সত্য, তেমনি নিখিল বিশ্বের অখণ্ড প্রকাশ-রূপ সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

মাতা, কন্যা, বধূ অথবা সুন্দরী রূপসীর ধ্যান রূপেরই (from) ধ্যান, তবে মানবিক বিচিত্র প্রয়োজন ও সংস্কার বোধের দ্বারা নারীর এই প্রত্যেকটি প্রকাশরূপ একান্ত সীমিত। প্রকৃত সৌন্দর্যের স্বরূপ ব্যাখ্যা মানবিক বোধ দ্বারা আমরা করিতেই পারি না।—অথচ মানবিক বোধকে আমাদের আশ্রয় করিতেই হয়, আর কোন উপায় নাই।

উর্বশীর সৌন্দর্যকে ফুটিয়া তুলিতে কবি তাই নিষেধাত্মক পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন। নারীর যে সৌন্দর্য আমাদের হৃদয়ে একটি স্থায়ী সংস্কার রূপে বিরাজ করে তাহা নারীর কল্যাণী মূর্তি। এই মূর্তি-ধ্যানের পশ্চাতে রহিয়াছে সহস্র বৎসরের ঐতিহ্যলব্ধ সংস্কার।

আসন্ন সন্ধ্যায় যখন আকাশ প্রান্ত অস্ত সূর্যের শেষ স্বর্ণাভা বিজড়িত হইয়া থাকে তখন সে নারী প্রিয়জনের কল্যাণ কামনায় গ্রহ প্রান্তে দীপ জ্বালাইয়া দেয়।—তাহা ধ্যানের দীপ। জল-স্থল-অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রকৃতির মাঝখানেও একটি ধ্যানের আসন পাতা। মূর্ত কল্যাণ স্বরূপিণী বধূবেশিনী নারীর একটি রূপ মাত্র কয়েকটি শব্দে কবি জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

প্রথা ও ঐতিহ্যলব্ধ সৌন্দর্যের এই বিচিত্র সংস্কারের আবেষ্টনী হইতে বাহির হইতে পারিলে সৌন্দর্যের আর এক প্রকাশ ধরা পড়ে। ভাষা তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। মানব-চেতনা সম্পূর্ণ নিমগ্ন হইয়াও তাহার তল খুঁজিয়া পায় না। তাহা এক নিঃসীম বোধের জগৎ। তাহা 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা', 'অকুণ্ঠিতা'। 'অবগুণ্ঠন' এবং 'কুণ্ঠা' সীমা ও জাগতিক বোধ ব্যঞ্জক।

সে সৌন্দর্যের আদি নাই, অন্ত নাই। তাহার আরম্ভ নাই, অবসান নাই। পার্থিব সৌন্দর্য-বোধের সংস্কারের ক্ষেত্রে আরম্ভ ও অবসানের বোধ বিজড়িত। আরম্ভ ও অবসান বিহীন সৌন্দর্য মানবিক বোধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত সামগ্রী।

মানবিক বোধাতীত সেই অলৌকিক প্রকাশ রূপকে কবি একটি বিশিষ্ট পৌরাণিক সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত বিজড়িত করিয়াছেন, তাহার চিররহস্যময়তার দিকটিকে পরিস্ফুট করিবার জন্য। সেই আদিম বসন্ত তো কোন কালে ছিল

না। এই জাতীয় সৌন্দর্য-বোধকে ঘিরিয়া মানব মনে যে অপার বিস্ময় তাহাকে মানুষ যুগে যুগে বিচিত্র রূপ কল্পনার সহায়তায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লক্ষ্মীর আবির্ভাবের এই পৌরাণিক পরিকল্পনা এই বিচিত্র রূপ কল্পনার প্রাচীনতম, বোধহয় সার্থকতম নিদর্শন।

এ পর্যন্ত কবি মোটামুটি রূপের তিনটি দিক ফুটাইয়া তুলিলেন—মাতার, বধূর এবং সুন্দরী রূপসী নারীর। আর একটি রূপের চিত্র তিনি ইহার ঠিক পরের স্তবকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা কন্যার রূপ।

কন্যার সৌন্দর্যের মধ্যে যে একটি ধীর বিকাশ আছে, অবোধ ক্রীড়ার সহিত বিজড়িত হইয়া তাহার যে একটি অসহায় বোধ আছে, সৌন্দর্য-বোধের সহিত বিজড়িত করিয়া সেই সকল স্মৃতিকে তিনি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। নির্জন ঘর, বিচিত্র ক্রীড়া পুত্তলি, মাতৃক্রোড়, মায়ের মুখ, পালঙ্ক, ঘুম পাড়ানি গান, এমনি আরও কত কি, সেই সৌন্দর্যের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

নারীকে ঘিরিয়া আমাদের যে সৌন্দর্য সাক্ষাৎকার তাহাকে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। উর্বশীর সৌন্দর্য এই সকল সৌন্দর্য-সংস্কারের অতীত।

সে সৌন্দর্য কামনায় যুগে যুগে পুরুষ চিত্ত নিয়ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘর ছাড়া হইয়া গিয়াছে। সৌন্দর্য আকারে বাঁধা পড়িয়াও পড়ে না বলিয়া আমাদের চেতনাকে এমন নিয়ত উৎসুক, উন্মুখ করিয়া রাখে। সৌন্দর্যের মর্মগত সেই উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগকে কবি কতকগুলি চিত্র রূপের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বিশ্বের প্রত্যেকটি সৌন্দর্য সামগ্রীর উপর তাহারই ছায়া বিকীর্ণ, যেন তাহারই দ্রুত পদ সঞ্চারের নূপুর নিক্কণ। সর্বত্রই তাহার আবির্ভাব, অথচ কোথাও তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। তাহা এই মুহূর্তে নিকটতম কোন সত্তায় আবির্ভূত হইয়া পরমুহূর্তে সুদূরতম কোন সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া মৃদু হাস্য করিতে থাকে।

এই বোধটিকেই কবি আরো বিস্তারিত করিয়াছেন। সিন্ধুবক্ষে তরঙ্গদলের নিয়ত ছন্দময় উঠা ও নামার মধ্যে, শস্যভারে আনত দিগন্ত বিস্তৃত শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে, তাহারই সৌন্দর্য বিকীর্ণ। মুহূর্তে মুহূর্তে তাহা ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। দিগন্তে যেন অকস্মাৎ তাহারই মেখলার আভাস ফুটিয়া উঠে। সে সাক্ষাৎকারে সমস্ত হৃদয় যেন ফাটিয়া বাহির হইতে চায়।

কিন্তু তাহা মুহূর্তকাল মাত্র। তাহার পরে কোথায় কোন রহস্য বশে সমস্ত কিছু অন্তর্হিত হইয়া যায়, এক চিরন্তন প্রহেলিকা। অন্তরে তাহা কেবল অপ্রাপণীয়ের চির হাহাকার সঞ্চারিত করিয়া দেয়।

যুগে যুগে সকল সৌন্দর্য সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অন্তরের এই চির হাহাকার বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তাহাকে আভাসে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য স্রষ্টার হৃদয়রক্ত শোষণকারী নিরলস কী প্রাণপণ প্রয়াস। ধ্যানে তাহারই বিচিত্র আভাস আমরা লাভ করি। স্বপ্নে অশ্রু জলে আমরা তাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরি।

ফিরিয়া ফিরিয়া কবির জীবনে সেই একই জিজ্ঞাসা। নিখিল বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্য-সত্তার মধ্যে যাহার আভাস আমরা লাভ করি, স্বপ্নে ক্ষণে ক্ষণে যাহার বিদ্যুৎ চকিত প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হই, সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সত্তাকে শরীরী রূপে কোথাও লাভ করিতে পারা যায় না! নিখিল বিশ্বের সেই পরিপূর্ণ সুষমাটিই বা কী রূপ! সেই পূর্ণ বিকশিত শতদল, যাহার উপর সেই পূর্ণ শ্রী আপনার অতি লঘুভার পদ যুগল ন্যস্ত করিয়া আছে।

হয়ত তাহাকে এইরূপে এক ঠাঁই কোথাও লাভ করিতে পারা যায় না। সেইজন্য বিশ্বের সৌন্দর্য-সত্তা মাত্রেই মানব অন্তরে এমন অতৃপ্তি সঞ্চারিত করিয়া দেয়, তাহাকে এমন নিয়ত অশ্রুমুখীন করিয়া রাখে।

দেশ-কালের ঊর্ধ্বে দিব্য-চেতনা এবং দেশ-কালের মধ্যে মানবীয় বা মর্ত্য-চেতনার মধ্যে পরম কোন যোগের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ এই কালে না লাভ করিতে পারিলেও উভয়ের মধ্যে যে কোন যোগ রহিয়াছে এই সম্পর্কে তাঁহার স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল।

একদিকে দেশ-কালের সীমার মধ্যে বিভক্ত সৌন্দর্য-লোক যাহার সহিত মানব দেহ-দশা বিজড়িত, অন্যদিকে দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর সৌন্দর্য-লোক, উভয়ের মধ্যে যোগের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ উর্বশীর মধ্যে দান করিতে চাহিলেও দুইটি চেতনা বস্তুত বিচ্ছিন্ন ও বিরোধী হইয়া উঠিয়াছে।

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর অনন্ত সৌন্দর্য-লোকটিকে রবীন্দ্রনাথ আবার দেশ-কালের সীমার মধ্যে একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া বাহু বন্ধনে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এখানেও সেই উভয় পিপাসার দ্বন্দ্ব।

"অতল অকূল হতে সিক্ত কেশে উঠিবে আবার?"

মানবীয় চেতনায় যে-কোন বোধে এই উভয়মুখীনতা থাকে। একটির

প্রেরণায় তাহার সৌন্দর্য-ধ্যান চূড়ান্ত ব্যাপ্তি লাভ করিয়া পরিণামে রূপের অতীত লোকে অরূপে ঝাঁপ দিয়া পড়ে; অপর প্রেরণা নিম্নাভিমুখী হইয়া ইন্দ্রিয়-প্রাণকে অসামান্য সামর্থ্য দান করিয়া ওই রূপ বা বিগ্রহ-পিপাসাকে চূড়ান্ত পরিণাম দান করে।

সৌন্দর্য-বোধের এই যে দ্বন্দ্ব—

"ডান হাতে সুধা পাত্র, বিষভাণ্ড লয়ে বামকরে।" (উর্বশী)

তাহা মানবীয় চেতনার সামগ্রী। অমর্ত্য চেতনায় এই দ্বন্দ্ব থাকে না, কারণ রূপের ধর্ম তখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়।

তখন সৌন্দর্যের যে বোধ তাহা 'বিষ'ও নয়, 'সুধা'ও নয়। তাহা ব্যাখ্যাতীত এক অনুভূতি, তাহা চেতনার অনন্ত প্রসার, তাহা পরম অস্তিত্বের জ্যোতি বিস্তার, তাহা অবিক্ষুব্ধ শান্তি।

প্রকৃতি অথবা নারীকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনায় এই যে প্রেম ও সৌন্দর্য মোহের প্রকাশ ঘটে এমন দুই পৃথক সত্তার অস্তিত্ব নারী বা প্রকৃতির মধ্যে নাই। বস্তুত এক প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন চেতনা-লোকে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হয়।

'রাত্রে ও প্রভাতে'র মধ্যে নারীকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ আপনারই দুইটি সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছে। নারীর এই উভয় সত্তার প্রকাশ নিশ্চয়ই কোন এক চেতনা-বৃন্তে বিধৃত। এই চেতনা-বৃন্তের পরিচয় না থাকিলে দুইটি চেতনা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। 'রাত্রে ও প্রভাতে'র মধ্যে তাহাই হইয়াছে।

রাত্রে যে নারীর প্রেয়সী মূর্তি—

"কালি মধুযামিনীতে জ্যোৎস্নানিশীথে
কুঞ্জ কাননে সুখে
ফেনিলোচ্ছল যৌবনসুরা
ধরেছি তোমার মুখে।" (রাত্রে ও প্রভাতে)

প্রভাতে সেই নারীর আর এক প্রকাশ—মূর্তিময়ী কল্যাণ ও ভক্তি।

"একি মঙ্গলময়ী মূরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা।" (রাত্রে ও প্রভাতে)

যে সৌন্দর্য-ধ্যানে কাম ও প্রেমের বিষামৃত লীলা, রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য-সাধনা ঠিক সেই জাতীয় নহে। যে সৌন্দর্য-ধ্যানে কাম সম্পূর্ণ রূপে বিবর্জিত, যাহাতে ইন্দ্রিয় নিপীড়নের ক্ষীণতম আভাস নাই, সেই সৌন্দর্য-ধ্যানই রবীন্দ্র-

কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। কবির সৌন্দর্য-সাধনা যে অন্তত ওই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই।

'বিজয়িনী'র সৌন্দর্য-ধ্যানই রবীন্দ্রনাথের খাঁটি সৌন্দর্য-প্রেরণা।

এই সৌন্দর্য-দেবীর পদতলে মদন তাঁহার ত্রিভুবনজয়ী ফুলশর সংন্যস্ত করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ কাদম্বরীকে একটি চিত্রশালা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুত গাঢ় তুলিকায় চিত্রিত করা এমন রূপ, রূপের এমন অবিরাম প্রবাহ বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ। সেই সকল রূপের প্রবাহ যেন অচ্ছোদ সরোবরে আসিয়া মিলিত হইয়া তাহাকে রূপের চরমোৎকর্ষ দান করিয়াছে।

মহাকবি অচ্ছোদ সরোবরের নিম্নরূপ বর্ণনা দান করিয়াছেন।

"ত্রিলোক লক্ষ্মীর মণিময় দর্পনের মত, পৃথিবী দেবীর ভূগর্ভস্থ স্ফটিকময় গৃহের মত, * * বিগলিত দিক সকলের ক্ষরণের মত, বিগলিত আকাশের অবতার গ্রহণের মত, তরুলতা সমন্বিত কৈলাস পর্বতের মত, দ্রবীভূত হিমাচলের মত, বিগলিত চন্দ্রমার মত, একস্থানে নিপতিত বিগলিত শরৎ-কালের মেঘমালার মত ইত্যাদি।"

জগতে যাহা কিছু দর্শনীয়, যাহা কিছু সুন্দর, মনোহর এবং আনন্দজনক, অচ্ছোদ সরোবরকে সেই সমস্ত কিছুর চরমোৎকর্ষ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

'অচ্ছোদ সরসী' বলিতে তাই মুহূর্তে সেই সকল রূপের স্মৃতি উদ্বেল হইয়া উঠে।

সেই সকল সৌন্দর্যের সারভূতা যে সৌন্দর্য-প্রতিমা তাহাকে চিত্রিত করিবার পূর্বে কবি কতকগুলি আশ্চর্য কলাকুশলতার পরিচয় দান করিয়াছেন।

রমনীর মূর্তি আকণ্ঠ জল মগ্ন। বসন্তে আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত মদির বিহ্বলতা। চতুর্দিকে যে মৃদু চাঞ্চল্য, তাহাতে পরিপূর্ণ শ্রী ফুটিয়া উঠিতে পারে না।

তীরে সোপান 'পরে রমণীর সুনীল বসন, মেখলা, নূপুর, নিচোল, দর্পণ, চন্দন কুঙ্কুম সজ্জিত স্বর্ণপাত্র, শ্বেত করবীর মালা, কত-না খণ্ড বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য, এবং এই সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া রমনীর সৌন্দর্যের বিচিত্র আভাস। এইরূপে কবি ধীরে পাঠকের চিত্তকে একান্ত উন্মুখ করিয়া তাহাকে আরো কতকটা তটস্থ করিয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করিবার মত মন এখনও প্রস্তুত নয়।

রমণীর অসামান্য রূপ-লাবণ্যের আরো কতকটা গোচর হইয়াছে। রমণী এমন সরসীর প্রান্ত দেশে বকুলের ঘনছায়ার নিম্নে শ্বেত শিলাতটে আবক্ষ জলে ডুবাইয়া বসিয়া আছে। কূলে কূলে-ভরা নীল জলের স্থির বিস্তার, তাহাতে রমণীর ছায়া পড়িয়াছে। দর্পণের মত স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া রমণীর বিচিত্র সৌন্দর্যের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। রমণী আপনার শ্বেত বাহুযুগল দিয়া শুভ্র রাজহংসীর সুকোমল ডানা দুইটি আবেষ্টন করিয়া, দীর্ঘ গ্রীবা স্কন্ধের উপর রাখিয়া নানা স্নেহের কথা বলিতেছে।

কোলরিজ একস্থলে নারীবক্ষের শ্বাস-প্রশ্বাসজাত ঈষৎ উন্নত অবনত অবস্থার সৌন্দর্যকে স্রেতস্বিনীর উপর স্থির ভাসমান শ্বেত রাজহংস যুগলের ঈষৎ উঠা ও নামার সৌন্দর্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। শ্বেত রাজহংস সকল দেশের সাহিত্যে নারীর বিশিষ্ট অঙ্গের সৌন্দর্যের প্রতীক স্বরূপ। রমণীর নগ্ন বক্ষকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে শ্বেত রাজহংসী।

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রকাশের অবসর এখনও আসে নাই। পাঠকের চিত্ত আরও উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চিত্তে প্রশান্তি আরো নিবিড় হইয়া ঘনাইয়া উঠিয়াছে। তাহার সৌন্দর্য-বোধকে আরো সূক্ষ্ম, আরো স্পর্শকাতর করিয়া তুলিতে কবি চতুর্দিকের যে অপরূপ সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে তাই বারংবার সঙ্গীতের উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন।

বস্তুর ভার সঙ্গীতের মধ্যে সবচেয়ে কম। সঙ্গীতের সৌন্দর্য উপভোগ করিতে তাই সূক্ষ্মতম ইন্দ্রিয়ের সহায়তা প্রয়োজন। কোথাও তাহা আদৌ ইন্দ্রিয়বোধের সকল সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজিত।

কবি তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য রূপায়নে বিচিত্র ধ্বনির সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। সে সৌন্দর্য গড়িয়া উঠিয়াছে বসন্ত দিনের বিচিত্র স্পন্দন ও কম্পনের দ্বারা। পত্রের মর্মর ধ্বনি, কোকিলের অশ্রান্ত কূজন, বনে বনান্তরে তাহার প্রতিধ্বনি, নির্ঝরিনীর কলধ্বনি, রাজহংসদলের পক্ষধ্বনি, সমস্ত মিলিত হইয়া ভূলোক দ্যুলোক পরিপূর্ণ করিয়া একটি দিব্য সঙ্গীত নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে। চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত এক অলৌকিক সৌন্দর্যময়, সুখময়, দীপ্তিময়, নিবিড় বেদনা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের জন্ম লাভের মুহূর্ত আসন্ন। নিখিল বিশ্ব-লোক তাহাকে লাভ করিবার জন্য একান্ত অধীর উৎসুক। কবি তাহাকেই ব্যঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছেন।

"বহু বন গন্ধ বহে
অকস্মাৎ শ্রান্ত বায়ু উত্তপ্ত আগ্রহে
লুটায়ে পড়িতেছিল সুদীর্ঘ নিশ্বাসে
মুগ্ধ সরসীর বক্ষে স্নিগ্ধ বাহু পাশে।" (বিজয়িনী)

ইহার পর কবি সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য প্রতিমাকে আমাদের দৃষ্টি সমক্ষে সম্পূর্ণ নিরাভরণ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। পাঠকের বহু দীর্ঘ প্রত্যাশিত আকাঙ্খার চরম ধন।

বিশ্ব সাহিত্যে চিত্রে ও স্থাপত্যে যেখানে যত অতুল সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, 'বিজয়িনী' সেই সকল শ্রেষ্ঠ রূপ রচনার যে অন্যতম তাহাতে সংশয় নাই।

বিশ্বের সৌন্দর্য তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করিয়া আমরা ধ্যানে যাহার অপরূপ রূপ সৃষ্টি করি, বাস্তবে তাহাকে কোথাও প্রত্যক্ষ করিতে পারি না। বাস্তবে তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আদর্শ ও বাস্তবের মধ্যে এতখানি ব্যবধান।

প্রেমে সেই দুর্লভ রূপের যদি কোথাও প্রকাশ ঘটেও তাহাকে চিরকাল বাহু বেষ্টনে বাঁধিয়া রাখিতে পারি না। ধ্যানের সামগ্রী হারাইয়া যায়, ধ্যান বিশুষ্ক হইয়া উঠে; আর্তনাদে আমরাও কোথায় হারাইয়া যাই। ইহাই মানব ভাগ্য, সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের এই অসহায় পরিণাম!

এখন কবির সৌন্দর্য-তত্ত্বমূলক উপলব্ধিকে সামগ্রিক ভাবে বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন।

মানবীয় চেতনার যে-কোন পরিণামে সৌন্দর্য্যের যে বোধ, তাহার আদৌ ভিত্তি ইন্দ্রিয়বোধের উপর।

এই কালে কবির মনের বিকাশ সম্পূর্ণ হইয়াছে। এই পরিণামে সৌন্দর্যবোধ যত উর্ধ্বে উঠিতে পারে, যতদূর প্রসারতা লাভ করিতে পারে তাঁহার সৌন্দর্য-ধ্যান তত উর্ধ্বে উঠিয়াছে। এই সৌন্দর্য-ধ্যান কোথাও চকিতের জন্য অমর্ত্য-চেতনার আভাস লাভ করিয়াছে। মানবীয় চেতনায় সৌন্দর্য-বোধ যে পরিণাম লাভ করুক-না-কেন, তাহা সীমার বোধ বলিয়া কবির অন্তরে ওই অতৃপ্তি কিছুতেই ঘুচিতেছে না।

এই অপরিতৃপ্তি দূর করিবার জন্য কবি সৌন্দর্য-বোধকে তখন দুইটি ভাগে

বিভক্ত করিয়াছেন। একটি মানুষকে মঙ্গলময় পরিণাম দান করে, অপরটি তাহার বক্ষে নিত্য অতৃপ্তির অগ্নিশিখা জ্বালাইয়া দেয়।

মঙ্গলময় যে অখণ্ড সৌন্দর্যের ধ্যান কবি করিয়াছেন, তাহা যে মানবীয় চেতনায় খণ্ড সৌন্দর্য-পিপাসার একটি বিশিষ্ট পরিণাম ছাড়া আর কিছু নয়, তাহা ওই সীমাবোধ হইতে নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

কবি অপর যে সৌন্দর্য-পিপাসার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিম্নতর চেতনার প্রসার। এই চেতনালোকে সীমা-বোধ একান্ত হইয়া উঠিবার ফলে চিত্তের বিক্ষোভ তীব্র হইয়া উঠে।

তাহা হইলে দেখিতে পাইতেছি, একটি সৌন্দর্য কবির ধ্যান-লোকের সামগ্রী, অপর সৌন্দর্য-বোধ নিম্নতর চেতনাশ্রয়ী। এই উভয় সৌন্দর্যই মূলত রূপাশ্রয়ী।

বাহিরে যে সীমাবদ্ধ সৌন্দর্য কবি নিত্য প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই সমস্ত সৌন্দর্য অন্তরে তিল তিল করিয়া সঞ্চিত হইয়া অমন মানসী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে।

অখণ্ড, মঙ্গল পরিণামী সৌন্দর্য-বোধ বলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের উর্ধ্বতর অমর্ত্য-চেতনা-লোকটিকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। দেশ-কালের অন্তর্গত মানবীয় চেতনায় যে সৌন্দর্য-বোধ তাহাকে তিনি অন্তহীন খণ্ড সৌন্দর্যের বোধ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। দেশ-কালের উর্ধ্বে যিনি অরূপ, তিনিই আবার দেশ-কালের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত।

মানবীয় চেতনার উর্ধ্বে সৌন্দর্যের (সীমার) কোন বোধই থাকিতে পারে না। যেখানে সৌন্দর্যের সীমা-বোধ আছে, সেখানে অমন 'বিষ' বা 'সুধার', অমন 'ভাল' বা 'মন্দের' বোধ জাগে। যেখানে সীমার বোধ বিগলিত হইয়া যায় সেখানে 'বিষ' ও 'সুধা'র দ্বন্দ্ব বোধের কোন প্রশ্নই উঠে না।

'বিজয়িনী'র মধ্যে কবির কাম মুক্ত যে সৌন্দর্য-ধ্যান তাহা কবির ধ্যান-লোকের সামগ্রী, তাহার ভিত্তি ইন্দ্রিয়-বোধের উপর। তবে ধ্যান-লোকে ইন্দ্রিয়ের নিপীড়ন অত্যন্ত ক্ষীণ ভাবে অনুভূত হয়, অথবা সুপ্ত ভাবে থাকে। কবির সৌন্দর্য-ধ্যান এই কালে অমনি একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে।

বিশ্ব প্রকৃতির বিচিত্র রূপ এবং নরনারীর বিচিত্র সৌন্দর্যের মধ্যে যাহার আভাস মাত্র লাভ করা যায়, সেই সকল সৌন্দর্যের প্রকাশকে একত্রে এক ঠাঁই একটি নারী-রূপের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিবার সেই আকাঙ্ক্ষা। ইহা তাই অসীম বা অরূপের কোন আকাঙ্ক্ষা নয়। যে রূপের মধ্যে সকল সম্পূর্ণতা ঘটিয়াছে, সেই রূপকে প্রত্যক্ষ করিবার বাসনা।

এই রূপকে লাভ করিবার জন্য যুগে যুগে মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছে, যুগে যুগে শিল্পী তাহার শিল্পের ভিতর দিয়া ইহারই আভাস ফুটাইয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছে; সে চেষ্টায় তাহার দেহাধার জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সাহিত্যে ও শিল্পে এই পূর্ণ রূপের কত না ধ্যান।

ব্যর্থতায় মানুষ স্বর্গ-লোক কল্পনা করিয়াছে। যাহাকে বাস্তবে সে লাভ করিতে পারিতেছে না, মর্ত্যে ক্ষণে ক্ষণে যাহার চকিত আভাস মাত্র লাভ করা যায়, তাহাকে স্বর্গ-লোকে বুঝি চিরস্থায়ী রূপে লাভ করিতে পারা যায়।

উর্বশী ও বিজয়িনীর মধ্যে সেই রূপের ধ্যান। এই রূপ তাই দেহাশ্রয়ী। ইহা নারী সৌন্দর্যই, যে নারীর মধ্যে এই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা।

রূপের এই জাতীয় পিপাসা কি কেবল ইন্দ্রিয়-বোধ প্রসূত? ইহার পশ্চাতে কি সত্যকারের কোন গভীর অধ্যাত্ম প্রেরণা নাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন রূপ দেহাশ্রয়ী হইলেও তাহাকে সম্পূর্ণ বাসনা মুক্ত করিয়া দেখা সম্ভব। বস্তুত এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে একটি গভীর অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা আছে।

অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া এই শ্রীহীন বিশ্ব, বিশ্বের তরুলতা, প্রাণী, মনুষ্য-সমাজ আজ অপূর্ব শ্রী লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-স্রষ্টার এই শিল্পায়ন আজও শেষ হইয়া যায় নাই। তাঁহার নির্মম, নিরাসক্ত এই বিশ্ব-রচনার লেখা ও মোছার ভিতর দিয়া নর-নারীর মধ্যে পূর্ণ রূপ ফুটিয়া উঠিবে।

সে স্বর্গে যাহাকে কল্পনায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে, মর্ত্যে ধ্যানের মধ্যে যাহাকে লাভ করিয়াছে, তাহাকে একদিন এই মর্ত্যেই বিগ্রহ রূপে লাভ করিবে। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া কেবল ভাবের ধীর সম্পূর্ণতা নয়, রূপেরও ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিয়া চলিয়াছে। একদিন এই মর্ত্যে পূর্ণ ভাব ও পূর্ণ রূপের মিলন ঘটিবে।

অসীমের অন্তরে যে পূর্ণতার ধ্যান রহিয়াছে, যাহাকে তিনি বিশ্ব রচনার ভিতর দিয়া ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাহা একদিন সম্পূর্ণ সার্থক হইবে।

মানসী কাব্যের 'অহল্যার প্রতি', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে যে পূর্ণতার ধ্যান, সেই ধ্যান সোনার তরী কাব্যের 'মানস সুন্দরী'র মধ্যে রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা যে অ্যাবস্ট্রাক্ট কোন তত্ত্ব নয়, অসীম বা অরূপ কোন তত্ত্ব নয়, তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহা তিলোত্তমার ধ্যান। নারী দেহাশ্রয়ী রূপের চরমোৎকর্ষের ধ্যান।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, যে কবির মনের বিকাশ যতই সম্পূর্ণ হইতেছে, অন্তরে রূপের ধ্যান ততই সম্পূর্ণ হইতেছে। অন্তরে সৌন্দর্যও প্রেমের ধ্যান-

লোক গড়িয়া উঠে বহির্বিশ্বের যোগে। চেতনা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সহিত যোগ যতই গভীরভাবে অনুভূত হইতে থাকে, ততই আবার বহির্বিশ্বের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সুষমা ফুটিয়া উঠিতে থাকে। সুষমাই সৌন্দর্য। এই সৌন্দর্য-লোকের ধীর সম্পূর্ণতা একযোগে ব্যক্তি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তায় ঘটিয়া চলে। বিশ্বের সহিত ব্যক্তির যোগ যতই গভীর হইতেছে, ব্যক্তি ও বিশ্ব-সত্তায় সৌন্দর্য যতই সম্পূর্ণতা লাভ করিতেছে, উহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ততই তীব্র হইতেছে। এই সকল ক্রিয়া যুগপৎ চলিতে থাকে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় বিশেষ করিয়া মধ্যযুগে (পৌরাণিক) জীবনের এই অখণ্ড দৃষ্টি ক্ষুণ্ণ হয়। জীবন ও জগৎ একদিকে মায়া বা মিথ্যা হইয়া উঠে, অন্যদিকে কেবলমাত্র অসীম বা অরূপ সত্য হইয়া উঠে। ফলে বিশ্বের যোগে জীবনের ধীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্য যে সদা জাগ্রত চেষ্টা তাহাও অস্বীকৃত হইয়া যায়। কারণ মানবিক সত্তায় ইন্দ্রিয় হইতে মন পর্যন্ত সমগ্র চেতনা-বৃত্তিই অবিদ্যা বা মায়া। এই সকল বৃত্তির অনুশীলন মোক্ষলাভের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নয় বলিয়া জগৎও সেই সঙ্গে অস্বীকৃত হইয়া যায়। কারণ একমাত্র বহির্বিশ্বের যোগে এই সকল বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা, ইহাতে অসীম ও সীমার সকল বোধ পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। তাই এই জাতীয় রূপ-জিজ্ঞাসা ও রূপ-সৃষ্টি তাঁহার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাঁহার সমগ্র সত্তা, ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন মথিত করিয়া এই পরিপূর্ণ রূপের প্রকাশ ঘটিয়াছে।—তাহার যে-নামই দেওয়া যাক-না-কেন।

পূর্ণ রূপ লাভের এই আকাঙ্ক্ষা পাশ্চাত্ত্য শিল্পে, বিশেষ করিয়া গ্রীক শিল্পে লক্ষ্য করা যায়। ইহা সম্ভব হইয়াছে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের পূর্ণ বিকাশ ও স্বীকৃতির ফলে। তাহার সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সাধনার সকল দিক ইহারই পরিচয় বহন করিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ এই মনের সীমা-লোককে ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন, রূপের সহিত অরূপের, সীমার সহিত অসীমের সংযোগ সাধনের জন্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাধনা এখানে আসিয়া যেমন মিলিত হইয়াছে, তেমনি একটি সামগ্রিক জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে।

গ্রীক জীবন-সাধনার মত পূর্ণ জীবন-সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষেও যে সত্য ছিল তাহা রবীন্দ্রনাথ নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। সেইজন্য

অরূপ বা অসীমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে রূপের আকাঙ্ক্ষাও অনিবার্যরূপে আসিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের ঊষা, রাত্রি, প্রভাত প্রভৃতির বন্দনা বা সূক্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঊষা সূক্তগুলির মধ্যে নিখিল পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্যকে একটি নারী-বিগ্রহাশ্রয়ী করিয়া সাক্ষাৎ করিবার প্রয়াসটিই সবিশেষ লক্ষণীয়। আর এই নিত্য চঞ্চলা পলাতকা সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে বাহুবেষ্টনে লাভ করিবার জন্য জ্যোতির্ময় পুরুষ আদিত্য দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। নিখিল মানব-হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষা সেই পুরুষের আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

যেন কাহার আগমনের জন্য পরিব্যাপ্ত অন্ধকারের স্তরে স্তরে এক নিঃসাড় সমারোহ চলিতে থাকে। আকাশের পূর্বদিকে একেবারে শেষ প্রান্তে একটি ক্ষীণ স্বর্ণসূত্রের মত রেখা অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহার কিছুক্ষণের মধ্যে রক্তিম গোলাপের মত একটি চাপা দ্যুতি জাগিয়া উঠিয়া পূর্বদিককে ধীরে আরক্তিম করিয়া তুলে। তাহার পর সেই স্বর্ণময় আভা ছড়াইয়া পড়ে সর্বত্র, প্রান্ত হইতে প্রান্তভাগে। ধরিত্রী ও আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ করিয়া এ কোন্ বিস্মিত রূপের আবির্ভাব। অজস্র বারিপাতের মত, বন্ধনমুক্ত জলধারার মত, সহস্র সহস্র নিক্ষিপ্ত তীরের মত আলোর প্লাবন নিম্নে নামিয়া আসিতে থাকে। তমসার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া এক একটি সৃষ্টি-রূপ ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইতে থাকে।

কুলায় কুলায় পাখিদের পক্ষ বিধূনন শব্দ, থাকিয়া থাকিয়া কূজন জাগিয়া উঠিতেছে। ওই তো দুই একটি করিয়া পাখি কুলা ত্যাগ করিয়া যাইতেছে।

ধীরে ধীরে চতুর্দিকে প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতেছে। গৃহে গৃহে আহুতির জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে; সম্মিলিত কণ্ঠে ছন্দে ও সুরে উষার বন্দনা গান সুরু হইয়াছে,—সৃষ্টির চিরবিস্মিত রূপের পদতলে বিস্মিত মানব-হৃদয়ের প্রণতি। সেই প্রণামের সহিত প্রণাম মিলাইয়া চেতন অচেতন বিসৃষ্টির সমস্ত কিছুই নীরবে প্রণাম করিতে থাকে।

সৃষ্টির প্রথম প্রভাতটি কি এমনি ছিল? তাঁহার ধ্যানের ভিতর দিয়া এমনি করিয়া কি প্রথম এক একটি রূপ-লোক এক একটি পাপড়ি মেলিয়া প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আজিকার ঊষা কি অতীতের সকল ঊষার ন্যায় সৃষ্টি মুহূর্তটিকে ইঙ্গিতময় করিয়া তুলে? ভবিষ্যতে অনন্তকাল ধরিয়া ঊষা কি এমনি করিয়া নিত্যদিন তাহাকে ইঙ্গিতময় করিয়া তুলবে? কোন্ বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে প্রথম ঊষা উদ্ভাসিত হইয়াছিল?

স্বর্গের দুহিতা ঊষা, সূর্য পত্নী। মাধুর্য ও ঐশ্বর্যময়ী পতি অনুগতা পত্নী ঊষা। স্বামীর অন্তরে আনন্দ সঞ্চার করিবার জন্য সে যেন ঈষৎ হাস্যে আপনার পীনোন্নত শুভ্র স্তন যুগল অনাবৃত করিয়াছে। ঊষা স্নান নিরতা সন্নতাঙ্গী রূপসী তরুণীর ন্যায়। যেন মাতা কর্তৃক পতির সম্মুখে প্রেরিতা ব্রীড়াবনতা অলঙ্কৃতা বালিকা বধূ। প্রভাতের মাতা ঊষা। রাত্রি তাহার মিত্র বা ভগ্নী। তাহার পিতা স্বর্গ, তাহার মাতা ধরিত্রী। উভয়ের ক্রোড়ে কুমারী ঊষা সমাসীনা। ঊষা জীব-ধাত্রী জননী।

তাহার বর্ণ শ্বেত। তাহার আলুলায়িত কেশপাশ স্বর্ণ বর্ণের। তাহার বেশ বাস ঈষৎ রক্তিম।

সে সূর্যের পথ, দেবগণের পথ ধরিয়া আকাশমার্গে পূর্ব হইতে পশ্চিমে গমন করে। তাহার অপ্রতিহত, বিরাট সুবর্ণ রঞ্জিত রথ কপিশ বর্ণের বৃষ বা অশ্ব চালিত। রথের চূড়ায় শ্বেত পতাকা উড়িতেছে।

ঊষা কেবল মাধুর্যময়ী ও ঐশ্বর্যময়ী নয়, শক্তিময়ীও। প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যদল যেমন শত্রুদল বিপর্যস্ত করে, ঊষা তেমনি বিরূপা তমসার বক্ষ বিদীর্ণ করে। তাহার আবির্ভাবে শত্রুদল ভীতত্রস্ত হইয়া দূরে পলায়ন করে। সকল জীবের চেতনা সঞ্চারকারিণী, সকল শুভ কর্মের প্রেরণাদাত্রী।

মূর্তিময়ী সত্য, মহতের মহত্ব, প্রজ্ঞাবানের প্রজ্ঞা, দেবগণের দেবত্ব, যশস্বীর যশ।

মহাকাল স্বরূপিণী ঊষা। নিম্নে অন্তহীন কাল ধরিয়া জীব-লোক আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

মধ্যযুগীয় সকল প্রকার প্রবণতা সত্ত্বেও এই রূপের প্রতি দৃষ্টি একান্তরূপে কোথাও আচ্ছন্ন হয় নাই।

ভুবনেশ্বর, খাজুরাহো, অজন্তা ও ইলোরা প্রভৃতির প্রস্তর ও চিত্রশিল্পের নায়িকা ও নটি প্রভৃতি ধর্ম বিবিক্ত মূর্তিগুলির মধ্যে যে আশ্চর্য রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে যে একটি সমগ্র জাতির সৌন্দর্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহা বলা চলে। এ্যাফ্রোডিটি ও ভেনাসের মধ্যে যে সৌন্দর্য-ধ্যান যুগে যুগে দেশে দেশে রূপায়িত হইয়াছে, তাহার সহিত ঊষা, নায়িকা ও নটি প্রভৃতি মূর্তি এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিজয়িনী' প্রভৃতি মূর্তির মধ্যে স্বধর্মের কোন পার্থক্য নাই।

প্রকৃত জীবন-পিপাসা মধ্যযুগে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য জয়যুক্ত হইলেও

মধ্য-যুগের জীবন-সাধনায় এই দৃষ্টি যে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইয়া যায়, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

'উর্বশী' ও 'বিজয়িনী'র মধ্যে একই অনুপ্রেরণার প্রকাশ ঘটিলেও সার্থকতার দিক হইতে দুইটি কবিতার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

যে রূপ বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, মানব-চিত্তে যে রূপের অনিবার্য আকর্ষণ, যুগ হইতে যুগে, পুরুষ হইতে পুরুষানুক্রমে যাহা সকল সম্পর্ক বন্ধন, প্রয়োজনবোধ, সীমার সকল বোধের বাহিরে, যাহা নিছক মাধুর্য, যাহা মানুষকে উদাসীন উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া সকল কাজ ভুলাইয়া সমাজ ও সংসারের বাহিরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, যাহার প্রথম সৃষ্টি হয় নাই, তাই ধীর বিকাশ বা সম্পূর্ণতা নাই, তাই যাহার বিনষ্টি নাই, যাহা আদৌ সম্পূর্ণ, বিশ্বের সকল রূপ যে সম্পূর্ণতাকে আভাসে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবার বেদনায় বিষাদ বিজড়িত; যাহাকে তিনি বিশ্বের কোন একস্থানে একটি নারী-রূপের মধ্যে কায়বদ্ধ দেখিবার জন্য উন্মুখ, সেই রূপটির সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে বিজয়িনীর মধ্যে।

যে ধ্যান বা অধ্যাত্ম-সত্তার সহিত উর্ধ্বতর চেতনার যোগ ঘটে, সেই অধ্যাত্ম সত্তা বা ধ্যান-লোক,

"সমস্ত জগৎ
বাহিরে দাঁড়ায়ে আছে, নাহি পায় পথ
সে অন্তর অন্তঃপুরে।" (প্রেমের অভিষেক)

অধ্যাত্ম-লোকে উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না, কারণ যে ধীর পরিণামের ফলে মানুষের অন্তরে অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ ঘটে, সেই পরিণাম ওইখানে আসিয়া থামিয়া যাইতে চাহে না। ওই লোকটিকেও অতিক্রম করিয়া যাইবার প্রবল প্রেরণা অন্তরে প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়।

"নিত্য শুনা যায়
তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন আগ্রহের
উৎকণ্ঠিত তান।" (প্রেমের অভিষেক)

বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দ সৌন্দর্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়া মানব অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটায়। প্রাণের এই জাগরণের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ওই ধ্যান-লোকটি গড়িয়া উঠে। প্রেমের অভিষেক নামকরণের সার্থকতা এইখানে।

"হাত ধরে মোরে তুমি
লয়ে গেছ সৌন্দর্যের সে নন্দন ভূমি
অমৃত আলয়ে।" (প্রেমের অভিষেক)

এই অধ্যাত্ম জাগরণ ঘটিলে মন যে অপূর্ব আনন্দে নিত্য নিমগ্ন থাকে রবীন্দ্রনাথ তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

"নিত্য মোরে আছে ঢাকি
মন তব অভিনব লাবণ্য-বসনে।" (প্রেমের অভিষেক)

অধ্যাত্ম চেতনার জাগরণে যে অন্তহীন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের লোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, কবিরা তাহারই ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহাদের সৃষ্টির মধ্যে এই সৌন্দর্য ও প্রেমের লোকটিকে রূপায়িত করিবার সদা জাগ্রত প্রয়াস।

"নিভৃত সভায়
আমাদের চৌদিকে ঘিরি সদা গান গায়
বিশ্বের কবিরা মিলি।" (প্রেমের অভিষেক)

যে-কোন ফল লাভের জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের সীমা অতিক্রম করিতে অর্থাৎ মানবীর চেতনা পরিহার করিতে চান নাই। রবীন্দ্রনাথের সাধনা দেশ-কালের মধ্যগত সাধনা। এই সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল লাভ আসক্তি বিজড়িত মানব প্রেম এবং তজ্জাত করুণা। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনায় একমাত্র মানবীয় চেতনাকে স্বীকার করিয়াছেন। সেই কারণে তাঁহার প্রেমে মোহ আছে, আসক্তি আছে, উৎকণ্ঠাও আছে। দেশ-কালের সীমার উর্ধ্বে মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া গেলে এই মোহ, উৎকণ্ঠা ও বেদনা বোধ থাকে না।

"শোকহীন
হৃদিহীন স্বর্গভূমি, উদাসীন
চেয়ে আছে।"

মর্ত্যের সেই উৎকণ্ঠা বিজড়িত মানব প্রেম। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছেন।

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত
মর্ত্যে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেম ধারা।"

দেশ-কালের সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হোক-না-কেন, তাহার বিচার না তুলিয়াও বলা যায় যে তাহা মানবীয় চেতনায় অনুভূত স্বরূপ বোধ হইতে ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ মর্ত্য-জীবনের এই স্খলন পতন ত্রুটি, এই আসক্তি ও মোহ, জ্ঞান

ও অজ্ঞান, সত্য ও অসত্য, পাপ ও পুণ্যের অপরূপ মিলিত প্রকাশটিকেই পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন।

মানবীয় চেতনার ঊর্ধ্বতর পরিণামে জীবনের কোন্ দুর্লভ স্বরূপের প্রকাশ ঘটে তাহা আমরা জানি না। রবীন্দ্রনাথ মানুষের বর্তমান স্বরূপের মধ্যেই এক আশ্চর্য দুর্লভতার সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা জাগতিক সকল বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে চাহে নাই, উহাকে অন্তহীন প্রসারতা দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ উন্নততর পরিণাম বলিতে ভিন্নতর কোন ধর্ম বা স্বরূপতা বুঝিতেন না, বুঝিতেন এই চেতনারই প্রসার।

এই প্রসারতার ফলে মানব প্রেমই তাঁহার কাব্যে এক আশ্চর্য রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; যাহাকে প্রথম দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অভাবিত বলিয়া বোধ হয়।

মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে এই জগৎ ও জীবন তত দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়, সৌন্দর্য ও প্রেম তত নিঃসীম হইয়া পড়ে। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন আমরা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করি-না-কেন, তাহা কোন কালেই মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া যায় না।

মানবীয় চেতনা যে পরিণাম লাভ করিলে মানবীয় প্রেম ও সৌন্দর্য-বোধের সর্বোত্তম প্রকাশ ঘটে, রবীন্দ্রনাথের চেতনা এক্ষেত্রে সেই পরিণাম লাভ করিয়াছে। ইহা সীমা ও অসীমের মিলন ভূমি, প্রান্ত-লোক। রবীন্দ্রনাথ এই প্রান্ত-লোক ছাড়াইয়া উঠিতে চান নাই। ছাড়াইয়া উঠিলে এই স্বরূপটি যে হারাইয়া যায়।

মানব-বোধের যে অসম্পূর্ণতা মানিয়া লইয়া রবীন্দ্রনাথ উহার দুর্লভতায় মুগ্ধ হইয়াছেন, উহা সীমা-ধর্মী বলিয়া এবং মানব-বোধের উপর মানুষের কোন কর্তৃত্ব নাই বলিয়া উহা আবার নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের লোকটিকে বিক্ষুব্ধ করিয়া দেয়। অজ্ঞানতা, মোহ ও আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। এই জন্যই অধ্যাত্মবাদীরা এমন একটি পরিণাম অন্বেষণ করিয়াছেন, যে পরিণাম লাভের পর মানবীয় চেতনা আর নিম্নতর চেতনা-লোকে নামিয়া আসে না।

রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে এই জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তাহা মুখ্যত সত্ত্ববোধ জাত দৃষ্টি। মানবীয় চেতনার উহা সর্বোচ্চ ভাগ। ওই বোধে অমর্ত্য-চেতনার যেমন আভাস আসিয়া পৌছায় তেমনি মানবীয় প্রেম ও সৌন্দর্য-বোধের অপরূপ রূপ ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের আশঙ্কা ছিল এই বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে এই মোহ মুগ্ধ প্রেম-তৃষিত জীবনের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যাইবে না।

মোহ মুগ্ধ মানব প্রেমের ললাটে কবি আঁকিয়া দিয়াছেন মহিমার শ্বেত চন্দন তিলক। এই প্রেম তো মিথ্যা নয়, পরন্তু এই অধীর বিচ্ছেদ কাতর অশ্রু কলুষিত প্রেমে স্বর্গ-লোক এমন কি মুক্তিও অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া যায়।

মানব-প্রেমের এই অনুভূতির লোকেও অসীমের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগে। (কারণ মানবীয় যে-কোন বোধ যে ওই পরিণাম লাভ করিতে চায়) তবে এই প্রেমের মধ্যে অসীমের যতটুকু আভাস লাভ করিতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ কেবল তাহাই লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

"মাঝে মাঝে এই স্বর্গ হইবে স্মরণ
দূর স্বপ্ন সম।"

এই 'স্মরণ' হইল সেই প্রেরণা, যাহা প্রতি মুহূর্তে মানুষকে মানবীয় চেতনার ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিতে চাহিতেছে। মায়ার আলিঙ্গন পাশে, সৌন্দর্য ও প্রেম মোহে আবার ওই স্মরণ বা প্রেরণা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

"মৃদু সোহাগ চুম্বনে
সচকিত জাগি উঠি গাঢ় আলিঙ্গনে
লতাইবে বক্ষে মোর।"

মানবীয় চেতনার এই স্বরূপের কথা বলিয়াছি। উহা একান্ত অসৎ নয়, আবার সৎ নয়, সম্পূর্ণ অজ্ঞান নয়, আবার পূর্ণ জ্ঞান নয়, সম্পূর্ণ মিথ্যা নয় তবে পূর্ণ সত্যও নয়,—উভয়ের মিলিত এক আশ্চর্য প্রকাশ। মর্ত্য-লোকে অজ্ঞানতা, আসক্তি, মোহ, অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির মধ্যে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের যতটুকু প্রকাশ ঘটে রবীন্দ্রনাথ তাহাতেই পরিতৃপ্ত।

'দিন শেষে' কবিতাটির মধ্যেও কবির এই একই আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ।

"ভালো নাহি লাগে আর
আসা-যাওয়া বার বার
বহুদূর দুরাশার প্রয়াসে।" (দিন শেষে)

ধরিত্রীর উপর বিনম্র আঁখি পল্লবের মত সন্ধ্যা অতি ধীরে নামিয়া আসিতেছে। বাতাস পড়িয়া আসিতে বহুদূর বিস্তৃত নিস্তরঙ্গ জল অপার সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে। পাতায় পাতায় আর সাড়া জাগিতেছে না। পাখীর বিচিত্র কাকলী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নির্জন গ্রামপথ ধরিয়া কেবল একাকী

তরুণী ভরা ঘট কক্ষে লইয়া গৃহে ফিরিতেছে। বেদনার মত অতি মৃদু জল ছল্ ছল্ এবং কাঁকন বাজিয়া উঠিবার শব্দ থাকিয়া থাকিয়া শোনা যাইতেছে। অস্তমিত সূর্যের শেষ রশ্মি মেঘ প্রান্তে এখনও রক্তিম আভায় বিজড়িত হইয়া আছে। দূরে দেবালয়ে দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে। কোন্ দূর অনির্দেশ্য অজ্ঞাত-লোকে-চলিয়া-যাওয়া দীর্ঘ সঙ্কীর্ণ পথ বিছাইয়া বকুল ঝরিয়া পড়িতেছে। নিত্য দিনের এই একান্ত পরিচিত সৌন্দর্য-লোক। কবি ইহারই মধ্যে বাস করিতে চান। আর

"যেখানে পথের বাঁকে গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।"

এই 'ভরা ঘটে'র অর্থ হইল, নারীর হৃদয়ের পরিপূর্ণ প্রেম-সুধা। এই সৌন্দর্য ও প্রেমের লোকে কবি প্রয়াস-ক্লান্ত জীবনের শেষ কয়েকটা দিন কাটাইয়া দিতে চান।

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর চেতনা-লোকে মানবীয় চেতনা যে পরিণাম লাভ করুক-না-কেন, তাহাতে জগৎ ও জীবনের বিশিষ্ট চেতনাটি তো লুপ্ত হইয়া যায়। মানবীয় এই চেতনাটিই রবীন্দ্রনাথের সর্বাধিক কাম্য। এইজন্য জগৎ ও জীবনের প্রতি গভীর মমতা রবীন্দ্র-কাব্যে সকল পর্য্যায়ে লক্ষ্য করা যায়। কেবল ইহাই নহে, এই মানবীয় চেতনাশ্রয়ী হইয়া থাকিবার ফলে কবির জীবনে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার নিরসন কোন কালে হয় নাই।

আসক্তি লোপ পাইতে পারে তখনই, যখন মানুষ সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠে। যেখানে সীমার বোধ আছে, সেখানে আসক্তিও আছে। জীবনের সীমায় থাকিয়া কেবলমাত্র জীবন আশ্রয় করিয়া জীবনের পূর্ণ পরিচয় লাভ একপ্রকার অসম্ভব।

জগৎ ও জীবনের সীমা বা দেশকালের পরিবৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ওই মমতা বা করুণা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। সীমাবদ্ধ জ্ঞান এবং মোহবিজড়িত মানব প্রেমই রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।

মৃত্যুতে এই জীবনের কোন স্মৃতি কি কবি কোন স্বরূপে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন না? জীবন ও জগতের সহিত সেদিন সকল সম্পর্ক কি নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। মৃত্যুতে কবির বিদেহ চেতনা এই জগৎ ও জীবনকে যদি কোন স্বরূপে লাভ করিতে পারেনও তবে এই স্বরূপে তো নয়। মানব প্রেমে এই দেহাধারটির মূল্য যে সর্বাধিক। উহাকে আশ্রয় করিয়া তো

সকল প্রেমের লীলা। মৃত্যুতে এই আধারটি তো ভাঙ্গিয়া যায়। আর এক রূপ, যাহাকে আশ্রয় করিয়া 'আমার' অন্তরে প্রেম উপজাত হইয়াছিল, আর তাহার প্রেমের প্রকাশ স্বরূপ তুচ্ছাতিতুচ্ছ সহস্র স্মৃতি-বিজড়িত কত-না-সামগ্রী, আর মর্ত্য প্রেমের লীলাস্থলী স্বরূপ এই সুন্দরী ধরণী। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কোন গভীর তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নয়। মৃত্যুর পটভূমিকায় জীবনের প্রেম ও মাধুর্য শিশিরসিক্ত শিরীষ কেশরের মত অশ্রু কোমল হইয়া উঠিয়াছে। কোন তত্ত্ব-প্রেরণা বা অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নয়, জীবনের নিয়তিকে মানব প্রেম যে প্রেরণায় জয় করিয়া উঠিতে চায়। তাহাই কবিতাটির ভাব প্রেরণা—

"শুধু এক ভিক্ষা আছে, যেদিন আসিবে কাছে
জীবনের পথশেষে নয়ন আকুল
সেদিন স্নেহের সাথে তুলে দিও এই হাতে
সেই চাঁপা, সেই বেল ফুল।" (স্নেহ স্মৃতি)

এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইবার পূর্বে কবি এই জীবনের প্রীতি ও সৌন্দর্যের অর্ঘ্য লাভ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু তাহার পরেই কবি-চিত্ত হাহাকার করিয়া উঠিয়াছে। জীবনের কোন দানকে তো মৃত্যুতে বহিয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই। এই বেদনা সংশয়ের সান্ত্বনা কোথায়।

"কে জানে সকল স্মৃতি জীবনের সব প্রীতি
জীবনের অবসানে হবে কি উন্মূল
জানিনে গো এই হাতে নিয়ে যাব কিনা সাথে
সেই চাঁপা, সেই বেল ফুল।" (স্নেহ স্মৃতি)

জীবন অতীতে জীবনের কোন অর্থ কবি অন্বেষণ করিতে চান নাই। জীবনের অন্তহীন রহস্যকে কবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, মৃত্যুতে যে এই জগতের সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, জীবনের কোন চিহ্ন যে একদিন এই জগতে কোন প্রকারে কোন স্বরূপেই থাকিবে না এই সত্যকেও কবি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

"অনন্তের মাঝখানে পরস্পরে আর
দেখা নাহি যায়।" (নববর্ষে)

সেখানে পরিশেষে কবি এই সান্ত্বনাই লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

"একদিন প্রিয় মুখ যত
ভালো করে দেখে লই, আয়।" (নববর্ষে)

হায় এমনি করিয়া কি সাধ মেটে, এমনি করিয়া কি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারা যায় ?

দেশ-কালের সীমাকে একমাত্র বলিয়া মানিয়া লইলেও রবীন্দ্রনাথকে একথা স্বীকার করিতে হইয়াছে, যে দেশ-কালের সীমার সত্যতা তাহার ঊর্ধ্বে অনন্ত ও অসীমকে স্বীকার করিয়া। মৃত্যুতেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যায় যে অনন্ত ও অসীমের পটভূমিকায় জীবন ও জগৎ সত্য। জীবনের সকল সত্য ও মূল্যবোধ তাই আপেক্ষিক। আমাদের বর্তমান জীবন অনন্তের আদি অন্তহীন গূঢ় গোপন উদ্দেশ্যের একটি পর্য্যায় মাত্র। তাই কোন একটা বিশেষ পর্যায়ে পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। মৃত্যু প্রত্যক্ষ করিয়া কবি-চিত্ত হইতে তাই বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা একেবারে শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে।

"কেন এই আনাগোনা
কেন মিছে দেখাশোনা
দু দিনের তরে,
কেন বুকভরা আশা,
কেন এত ভালোবাসা।" (মৃত্যুর পরে)

এই বোধ রবীন্দ্রনাথের অন্তরে নিঃসংশয়ে জাগিয়াছে যে জীবন অসীমের একটি পর্যায় মাত্র। মানবীয় চেতনা জীবনকে যেমন করিয়া জড়াইয়া ধরিতে চাউক-না-কেন আসক্তি ও বেদনাবোধ যত প্রবল হোক-না-কেন, অনন্ত ও অসীমকে স্বীকার করিতেই হইবে। মৃত্যু সে স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়।

"পলেক বিচ্ছেদে হায়
অমনি তো বুঝা যায়
সে যে অনন্তের।" (মৃত্যুর পরে)

অনন্তকে স্বীকার করিলেই তো জীবনের আসক্তি ঘুচে না। তাই অমন আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। আসক্তি লোপ পায় তখনই, যখন মানুষ অনন্তকে কেবল স্বীকার করে না অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। তাহা না হইলে জীবনের অনন্ত স্বরূপতা বলিতে জন্ম-জন্মান্তরে রূপ হইতে রূপে বিহার করা বুঝায়। তাই কবির অশান্ত চিত্ত ওই রূপটিকেই ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছে।

"ওই দূর দূরান্তরে
অজ্ঞাত ভুবন'পরে
কভু কোনখানে,
আর কি গো দেখা হবে,
আর কি সে কথা কবে,
কেহ নাহি জানে।" (মৃত্যুর পরে)

চৈতালি

চৈতালির একেবারে প্রারম্ভে ছয়টি পংক্তি আছে। কাব্য আলোচনার প্রারম্ভে তাহার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"তুমি যদি বক্ষোমাঝে থাক নিরবধি
তোমার আনন্দ মূর্তি নিত্য হেরে যদি
এ মুগ্ধ নয়ন মোর—"

চিত্রায় কবির ধ্যান-লোকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। চৈতালির মধ্যে কবির সেই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক আরও উন্নত পরিণাম লাভ করিয়াছে। এই সমৃদ্ধ সুপরিণত ধ্যান-লোকটিকে কবি চৈতালির মধ্যে নানাভাবে রূপায়িত করিয়াছেন।

এই কাব্যে কবির ধ্যান-লোক কোথাও কোথাও এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে যাহাকে মানস-সীমার অন্তর্ভুক্ত চেতনা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায় না।

জীবন-দেবতা যে জীব-সত্তার অন্তর্ভুক্ত চেতনা উহা যে ঈশ্বরের স্থলাভিষিক্ত নয় তাহা রবীন্দ্রনাথ চিত্রার ভূমিকায় স্পষ্ট করিয়াইউল্লেখ করিয়াছেন। চৈতালির ধ্যান-লোক জীবন-দেবতারও উন্নততর পরিণাম অথচ উহা বিশ্ব-চেতনা বা ঈশ্বরও নয়।

রবীন্দ্রনাথ মানস ও বিশ্বসত্তার মধ্যবর্তী বিচিত্র চেতনা-পর্যায়ে বিচরণ করিয়াছেন, কোথাও জীব-সত্তার একান্ত নিকটে কোথাও বা বিশ্বসত্তার। এই বিচিত্র পর্যায়ের চেতনাকে রবীন্দ্রনাথ এক 'তুমি' রূপে সম্বোধন করিয়াছেন, নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন।

এই সুপরিণত ধ্যান-লোকটিকেই কবি 'আনন্দ-মূর্তি', 'পরাণবল্লভ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার অন্তরে কত দুর্লভ মুহূর্তে অসীমের স্পর্শ আসিয়া পৌছাইয়াছে।

সাধারণ মানুষের জীবনে এই ধ্যান বা অধ্যাত্ম-লোকটি একপ্রকার সুপ্ত থাকে। তাহাদের জীবন প্রকৃতপক্ষে কতকগুলি আনন্দ-বেদনার সমষ্টি মাত্র।

জাগতিক আনন্দ-বেদনার ঊর্ধ্বে যাঁহাদের অন্তরে ধ্যান-লোকের প্রকাশ ঘটে তাঁহারাই অমরতা লাভ করেন। এই অধ্যাত্ম-সত্তা বা ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাদের অন্তর অসীমের প্রসাদ লাভ করে। অমরতার স্পর্শ লাভ করিয়া তাঁহারাও অমর হইয়া যান।

কবি যদি ঐ ধ্যান-লোকে নিমগ্ন থাকিতে পারেন, যদি তাহার ভিতর দিয়া প্রার্থিত মুহূর্তে অরূপ বা অসীমের আভাস লাভ করিতে পান, তবে জন্ম মৃত্যুর প্রাপ্তি ও বিনষ্টির কোন ভয় তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিবে না। ইহারই উপলব্ধির ভিতর দিয়া কবি আপনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় লাভ করিবেন, যে পরিচয় সকল জন্ম, সকল মৃত্যুকে ছাড়াইয়া অসীমে পরিব্যাপ্ত। জীবনে ভয় নাই, কারণ অসীমের সহিত তাঁহার সীমা নিত্য যুক্ত। 'মৃত্যু' বা বিনষ্টিতে ভয় নাই, কারণ অরূপের যোগে তাহার প্রকাশ, অরূপের মধ্যে তাহার বিলয়, আবার ভিন্নরূপে তাহার আবির্ভাব।

এই ধ্যান-লোক অমন পরিপূর্ণ, সুপরিণত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া উহাকে ছাড়াইয়া উঠিবার একটি প্রবল প্রেরণা রবীন্দ্রবাথ বোধ করিয়াছেন। সর্বস্ব সমর্পণের এই দুর্নিবার প্রেরণার মধ্যে কোন রহস্য নিহিত রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

"আজি মোর দ্রাক্ষা কুঞ্জবনে
গুচ্ছ গুচ্ছ ধরিয়াছে ফল।"

এই ফলগুলি যে কবির সৌন্দর্য-ধ্যান তাহা আমরা জানি, কিন্তু কাহাকে তিনি এই সমস্ত ফল অর্ঘ্য-রূপে উৎসর্গ করিতে চাহিয়াছেন?

যেখানে তিনি বলিতেছেন—

"তব ওষ্ঠে দশন দংশনে
টুটে যাক পূর্ণ ফলগুলি।" (উৎসর্গ)

সেখানে এই 'তুমি' কে? ইহারই স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছি।

ঊর্ধ্বতর চেতনার সহিত মিলন যত গভীর করিয়া অনুভূত হইয়াছে, কবির সৌন্দর্য্য-ধ্যান তত সমৃদ্ধ হইয়াছে। অন্যদিক দিয়া বলা যায়, ওই সৌন্দর্য্য-ধ্যান যত সমৃদ্ধ হইয়াছে অনন্তের প্রেরণা কবির অন্তরে অত অধিক পরিমাণে অনুভূত হইয়াছে। এই সৌন্দর্য্য-ধ্যানের সকল ফলকে কবি তাই অনন্তের পদতলে সমর্পণ করিয়াছেন। যাহা কিছু অনন্তের প্রেরণা জাত, তাহা অনন্তে বিলীন হইয়া ধন্য হইয়া যাইবে।

সৌন্দর্য্য-ধ্যান যেখানে কেবল সৌন্দর্য্য-ধ্যান মাত্রেরই রহিয়া যায়, সেখানে মানব মনের মুক্তি ঘটে না। সেই রূপ-ধ্যান সেখানে বন্ধন স্বরূপ। রূপ কেবল নিঃসীম পিপাসার উদ্রেক করে। রূপের ভিতর দিয়া অন্তরে যখন অসীমের প্রসাদ আসিয়া পৌছায়, পূর্ণ ফলগুলি যখন টুটিয়া যায়, রূপ যখন অরূপে বিগলিত হয়, তখনই রূপ মানুষকে মুক্তি দেয়।

বিশ্বের সবকিছু দিয়াও আমরা অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করিতে পারি না। ইহাতেই বুঝতে পারি, যে আমাদের নিশ্চয়ই এমন কোন সত্তা আছে, যাহা বিশ্বোত্তীর্ণ, যাহা সকল সীম অতিক্রম করিয়া অসীমে পরিব্যাপ্ত। উহাকে না লাভ করিতে পারিলে আমরা শান্তি পাই না, আমাদের অন্তরের শূন্যতা অপূর্ণ রহিয়া যায়।

এই শূন্যতা পূর্ণ করিতে আমরা বিশ্বে অন্বেষণ তৎপর হই। সব পাওয়া যখন ফুরাইয়া যায়, তখন ওই শূন্যতা বোধেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করি। তখন অন্তর্জগতে আর এক আলোক জ্বলিয়া উঠে, যে আলোকে অন্তরের পথ উদ্ভাসিত হইয়া যায়। মানুষ তখন সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া সব পরিহার করিয়া একাকী অন্তর্লোকে পথ চিনিয়া চলে।

"যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহ কোন।" (আশার সীমা)

সকল প্রয়োজনের উর্ধ্বে মানুষের আর এক সত্তা আছে, সেই সত্তায় অন্তরের সহিত তাহার নিত্য যোগ। সাহিত্য মানুষের এই সত্তাটির পরিচয় দান করে মানুষের বাইরের পরিচয়যতবড়ই হোক-না-কেন, সাহিত্যে তাহাএকান্তই গৌণ। খাঁটি সাহিত্য মানুষের সীমাবদ্ধ জীবনের পরিচয় দান করে না। সীমার দিক হইতে মানুষ সহস্র প্রয়োজনে আবদ্ধ জাগতিক জীব মাত্র। সে প্রকৃতির দাস, প্রকৃতি পরিচালিত। যে সত্তার ভিতর দিয়া মানুষ অনন্য বা অসীমের স্পর্শ লাভ করে, তাহা তাহার অসীমের দিক। মানুষ এই সত্তাটিকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছে, তাহার সাহিত্য, শিল্প, জ্ঞান, বিজ্ঞান ততই সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। মানুষের মধ্যে যেখানে শ্রেয়ের প্রকাশ, সেখানে তাহার স্নেহ ও মাধুর্য, সেখানে সে প্রেমে আত্ম ত্যাগ করে, নিম্নতর সকল প্রবৃত্তিকে জয় করিয়া উঠিতে সংগ্রাম করে, সেখানে তাহার সাহিত্য।

'ঋতু সংহার' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোকের মধ্যে বিরাজিত দেখিয়াছেন সেই সৌন্দর্য-লোকের মধ্যে তিনিও

অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সৌন্দর্য-ধ্যানে 'ত্রিভুবন, একখানি অন্তঃপুর বাসর ভবনে' পরিণত হইয়া যায়। জীব-জীবনের সকল দুঃখ দুর্দশা ও মালিন্যের পরপারবর্তী এই লোক।

এই সুন্দরী ধরণী, ঊর্ধ্বে নীলিমাময় শূন্যলোকের অপার বিস্তার, দাক্ষিণ্য ভারাবনত ষড় ঋতুর আবর্তন, দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপ্ত আলোর প্রস্রবণ রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকেও সীমাহীন সৌন্দর্য মাধুর্য ঢালিয়া দিয়াছে।

চেতনা যে পরিণাম লাভ করিলে, যে দৃষ্টিতে জগৎ ও জীবনের অপার সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত হইয়া যায় রবীন্দ্রনাথ কেবল সেই পরিণাম, সেই দৃষ্টি লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

যে সাধনা পাপ-পুণ্য, সুন্দর-অসুন্দর, মঙ্গল-অমঙ্গল, সকল দ্বন্দ্ববোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া একই চেতনাকে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দেখে, যে সাধনা এই উভয় স্বরূপকে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য বলিয়া বোধ করে, যে সাধনায় সকল বিরোধাভাস আশ্চর্য উপায়ে সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়, রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টি সেই সাধন ফল নহে। ইহা এক জাতীয় বিশিষ্ট সাধনা যাহাতে জীবনের অসুন্দর ভাগ আদৌ আচ্ছন্ন হইয়া যায়। জীবনের কেবল এক দিক একান্ত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠে।

মনের সহায়তায় যেখানে জীবনের সমস্যা সমাধান করিতে হয়, সেখানে জগৎ ও জীবনের অখণ্ডতাকে দ্বিধা করিয়া যে-কোন-একটিকে স্বীকার করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কোন্ দিক আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা আমরা জানি। ইহাতে অপূর্ণতা থাকিলেও তাঁহার সৃষ্টি একদিক দিয়া আশ্চর্য সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইহাতে জীবনের এক বিশিষ্ট পিপাসা অন্তহীন হইয়া আপনাকে পরিতৃপ্ত করিতে চাহিয়াছে।—তাহা মর্ত্যের সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

ইহা জীবনের পূর্ণতার সাধনা নহে বলিয়া এই লোকের মধ্যে থাকিয়াও কবির অন্তরে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ হয় নাই।

'মানসী', 'নারী', 'প্রিয়া', 'ধ্যান', 'প্রেয়সী', 'কালিদাসের প্রতি', 'মানস-লোক', 'কাব্য' এবং 'প্রার্থনা' ও 'শুশ্রূষা' প্রভৃতি প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে কবির এই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা'র মধ্য দিয়া ক্রম পরিণাম লাভ করিয়া 'চৈতালি'র মধ্যে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

নারীর সৌন্দর্য পুরুষ চিত্তে প্রাণের উদ্বোধন ঘটায়। জাগ্রত প্রাণের

ভিতর দিয়া পুরুষের অন্তরে ধীরে একটি অধ্যাত্ম-লোক গড়িয়া উঠে। এই অধ্যাত্ম-লোকটি আশ্রয় করিয়া তাহার সৌন্দর্য কল্পনা একেবারে অন্তহীন হইয়া পড়ে। এই অন্তহীন সৌন্দর্য-লোকে পুরুষের অভিসার।

পুরুষ নারীকে এই ধ্যান-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করে। বাস্তব নারীর সৌন্দর্য ও প্রেমের সকল অপূর্ণতা পুরুষ আপনার ধ্যান দ্বারা পূর্ণ করিয়া লয়। পুরুষ চিরকাল ইহাই করিয়াছে।

নারীও আপনাকে পুরুষের সৌন্দর্য-ধ্যানের অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সৌন্দর্য-ধ্যান জাগ্রত করিয়া রাখিতে নারী বিচিত্র বিলাস-বিভ্রম, অগোচরতা এবং অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা না হইলে বাস্তবের নিত্য সংস্পর্শে যে সৌন্দর্য-ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়।

"পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তর হতে।" (মানসী)

পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লোকের জন্য পুরুষের অন্তরে নিত্য ক্ষুধা। মর্ত্যের নারীর অপূর্ণ সৌন্দর্যকে অন্তরের প্রতিচ্ছবি রূপে গড়িয়া তুলিতে পুরুষের কত না প্রয়াস। ইহা পুরুষের স্থূল বাসনার পূজা নহে। পুরুষের সৌন্দর্য-ধ্যান, তাহার সৃষ্টি-প্রতিভা, মানবীকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতে চায়। এই একই ভাব সামান্য ভিন্ন স্বরূপে পরপর কয়েকটি কবিতার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

'মানসী'র মধ্যে পুরুষের সৌন্দর্য-ধ্যানে বাস্তব নারীর মূল্য কিছুটা স্বীকৃত হইলেও 'নারী'র মধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত হইয়াছে! যেন পুরুষের ধ্যান-লোক ছাড়া নারীর বাস্তব যে-কোন প্রকাশের কোন সত্য মূল্য নাই। নারী শুধু প্রতীক মাত্র। নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া পুরুষের ধ্যান-লোকের প্রকাশ। তাহার পর সেই সৌন্দর্য-ধ্যানে নারীর বাস্তব পরিচয় ক্রমে গৌণ হইয়া যায়।

"তুমি এ মনের সৃষ্টি তাই মনোমাঝে
এমন সহজে তব প্রতিমা বিরাজে।"

ওই ধ্যান-লোকে নারী রূপে যাহার প্রকাশ, তাহা তাহার সম্পূর্ণ ধ্যানের সৃষ্টি। বাহিরে তাহার কোন পরিচয় নাই।

নারীর সৌন্দর্য পুরুষের ধ্যানের সামগ্রী, তাই যে-কোন সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত উহা একাকার হইয়া যায়।

"মানসী রূপিণী তাই দিশে দিশে
সকল সৌন্দর্য সাথে যাও মিলে মিশে।"

ধ্যানে পুরুষের সৌন্দর্য-লোক সীমাহীন হইয়া উঠে। পুরুষ বহির্জগতের সব কিছু বিসর্জন দিয়া এই অসীম সৌন্দর্য-ধ্যানে ডুবিয়া যায়।

"তারপরে মন গড়া দেবতারে, মন
ইহকাল পরকাল করে সমর্পণ।"

সৌন্দর্য-ধ্যান হোক, অথবা যে-কোন আদর্শ-প্রেরণা হোক তাহা অধ্যাত্ম স্বরূপ। অধ্যাত্ম-স্বরূপ বলিতে এমন একটি বিশেষ মানস-গঠনের কথা বুঝায়, যাহাকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে উর্ধ্বতর চেতনার আভাস নানা স্বরূপে আসিয়া পৌঁছায়। যে-কোন স্বরূপে হোক, এই নিঃসংশয় উপলব্ধি ঘটে বলিয়া মানুষ আপনার সৌন্দর্য-লক্ষ্মী, অথবা কোন আদর্শ প্রেরণায় প্রাণ দেয়, উহারই জন্য যে-কোন প্রলোভনকে সে অবহেলায় জয় করিয়া উঠে।

আদর্শ বা সৌন্দর্য-প্রেরণা মনগড়া সামগ্রী হইলে মানুষ এমন আশ্চর্য বিশ্বাস লাভ করিতে পারিত না। এই বিশ্বাসের বলে তাঁহারা এমনকি সমগ্র জগতের প্রতিকূলতা করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না। ইহার জন্য নিষ্ঠুরতম নির্যাতনকে হাসি মুখে বরণ করিয়া লয়।

ধ্যান বা আদর্শের স্বরূপ বিচার আমরা দুই দিক হইতে করিতে পারি। সীমার দিক হইতে সৌন্দর্য-ধ্যান, যে-কোন আদর্শ প্রেরণা, বস্তুরই পরিণাম বলিয়া বোধ হয়। অসীমের দিক হইতে বোধ হয় অসীমই নিম্নতর চেতনা-লোকে লীলায়িত হইবার জন্য আমাদের প্রকৃতি ও মানস-গঠন অনুযায়ী একটি আদর্শ-লোক গড়িয়া তুলে। বস্তুত এক অনন্ত স্বরূপই উভয় প্রেরণা রূপে অনুভূত হয়। মানুষ যখন আদর্শের জন্য প্রাণ দেয়, তখনই বুঝিতে পারা যায় যে উহা কোন-একটা স্বরূপে অনন্তের আভাস লাভ করিয়াছে। কেবল মন-গড়া তত্ত্বে মানুষ এমন বিশ্বাসবোধ লাভ করে না; মৃত্যুটা বড় কথা নয়, তাহার অমন আত্মত্যাগ, সর্বস্ব বিসর্জন, অমন নিঃশঙ্কতা। কেবল ইহাই নহে, মন গড়া তত্ত্বে মানুষ কখন তাহার প্রতি-মুহূর্তের জীবনকে উহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিত না। মানস-সৃষ্ট কোন তত্ত্ব এইরূপে সমগ্র জীবনকে ধারণ করিতে পারে না।

নারীর বিশিষ্ট রূপ বিশ্ব-সৌন্দর্যের গোপন লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। অর্থাৎ প্রেমে যে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, উহাকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা মুহূর্তে মুহূর্তে বিশ্ব-চেতনার আভাস লাভ করে।

অন্তরে ধ্যান-লোকের প্রকাশ যতদিন না ঘটে ততদিন বিশ্বের অপরূপ

রূপও ধরা পড়ে না। নারীর সৌন্দর্য পুরুষের অন্তরে ওই ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে।

"তুমি এলে আগে আগে দীপ লয়ে করে
তব পাছে পাছে বিশ্ব পশিল অন্তরে।" (প্রিয়া)

বস্তুত প্রেমে এই রূপ বা বিগ্রহ-তত্ত্বটিকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই।

এই সৌন্দর্য-ধ্যান-তন্ময় মুহূর্তে বহির্বিশ্ব ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া যায়। পুরুষ দেহ-বোধ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। এক অনন্ত প্রসারিত জ্যোতি সমুদ্রে ধ্যানের পদ্মটি পূর্ণ বিকশিত হইয়া ভাসিতে থাকে। আর এক চেতনায় পুরুষ ওই দিব্য রূপ প্রত্যক্ষ করে। মনে হয়

"যেন এ জগৎ নাহি, নাহি কিছু আর,
যেন শুধু আছে এক মহা পারাপার।
যেন তারি মাঝখানে পূর্ণ বিকশিয়া
একমাত্র পদ্ম তুমি রয়েছ ভাসিয়া।'

এই সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে অমর্ত্য-লোকের আভাস লাভ করে, অথবা অমর্ত্য-লোক ধ্যান আশ্রয় করিয়া আপনাকে পুরুষের চিত্তগোচর করে।

"নিত্যকাল মহাপ্রেমে বসি বিশ্বভূপ
তোমা মাঝে হেরিছেন আত্ম প্রতিরূপ।" (ধ্যান)

যখন ওই জাগ্রত অধ্যাত্ম সত্তার ভিতর দিয়া অনন্তের আনন্দ আস্বাদ জীবনে নামে তখন জগৎ ও জীবনের অপরূপ সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মের ধ্যান-স্বরূপ। বিশ্ব-বিকাশের পর্যায়ের পর পর্যায়ে তাঁহারই ধ্যান একটির পর একটি দল মেলিয়া চলিয়াছে।

ব্রহ্ম সৎ স্বরূপ। এই বিসৃষ্টি তাঁহার ধ্যান। উহা কখন বীজ রূপে সুপ্ত, আবার কখন বিকশিত পদ্মের মত পূর্ণ বিকশিত। অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া এই সুপ্তি ও জাগরণের লীলা চলিতেছে।

এই ধ্যানে তিনি আপনাকে আপনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আপনাকে আপনি দ্বিধা করিয়া লীলা করিতেছেন। মানুষের ধ্যানেরও এই এক স্বরূপ। মানুষ যে ব্রহ্মের বিন্দুরূপে পূর্ণ প্রকাশ।

কবিরা জীবনের মালিন্য ও দুঃখ বোধের ঊর্ধ্বে এই সৌন্দর্য-ধ্যানে ডুবিয়া

থাকেন। এই সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া অনন্তের সহিত তাঁহারা নিত্য যোগযুক্ত।

সাহিত্যে মানুষের এই অপর সত্তার এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনারও অতীত অনন্ত স্বরূপের যদি প্রকাশ ঘটে তবে সেই সাহিত্য অমর।

কালিদাস এই সৌন্দর্য-ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার কাব্য তাঁহার এই সৌন্দর্য-ধ্যানের প্রকাশ। তাঁহার কালের ঐশ্বর্য্য প্রতাপ বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার ধ্যান-লোক, তাঁহার কাব্য অমর হইয়া আছে। কালিদাস যদি তাঁহার কাব্যে জীবনের বিচিত্র পীড়া রূপায়িত করিতেন, তবে তাঁহার কাব্য কোন্ সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইত ?

> "আজ মনে হয়
> ছিলে তুমি চিরদিন চিরানন্দময়
> অলকার অধিবাসী।"

এই অলকা কবির অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক। এই ধ্যান আশ্রয় করিয়া কবি প্রেম ও সৌন্দর্য লীলা সাক্ষাৎ করিতেন। জগৎ পরিপূরিত সৌন্দর্য ও প্রেম লীলা সাক্ষাৎকারে কবির চিত্ত যে বিস্ময় বিস্ফারিত হইয়া যাইত, সেই বিস্মিত মুহূর্তে কবির কাব্য সৃষ্টি। "তুমি সেই ক্ষণে গাহিতে বন্দনা গান।" এই লীলা সাক্ষাৎকারের ফল লাভ আর কিছু নয় ওই সৌন্দর্যের প্রসাদ লাভ, গৌরীর কর্ণের বর্হ। তাহা জাগতিক কোন ফল লাভ নহে।

মানস-লোক কবিতাটির মধ্যে এই একই ভাব-প্রেরণার প্রকাশ। কবি যে সৌন্দর্য-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন, সেখানে রোগ, শোক, জরা নাই, মৃত্যু নাই, মানুষের নিত্য ক্ষুব্ধ ঐশ্বর্য প্রতাপ সেই লোকটিকে স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না।

চিরস্থির আকাশের নিম্নে খণ্ড খণ্ড কত মেঘ ভাসিয়া চলে। তাহার কত রূপ কত চঞ্চলতা। আকাশের কোথাও তো তাহার চিহ্ন মাত্র থাকে না।

দিব্য-চেতনা-লোকে যে মিলন সেখানে বিশেষের কোন রস প্রেরণা নাই। বিশেষের অনুভূতি লোকে মন সর্ববৃহৎ মিলন ভূমি। এই মানস-লোক রবীন্দ্রনাথের কাব্য-লোক। যেখানে কবি বলিতেছেন, আজিও মানস-ধামে করিছ বসতি, সেখানে কবি সর্বদেশ সর্বকাল পরিব্যাপ্ত এই মানস-লোকের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

জীব-জীবনের সকল দশা কালিদাসকেও যে ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহাতে সংশয় নাই, তবে সেই জীব-দশার বিষয়কে তিনি কাব্যের বিষয় করেন

নাই। তিনি জানিতেন জীবনের এই পরিচয় স্থায়ী নয়, তাই সত্যও নয়। মানুষের ইহা সীমার দিক, তাহার ক্ষুদ্রতার দিক। যে পরিচয়ে সে বৃহৎ, যে পরিচয় সূত্রে সে অসীমের সহিত যুক্ত সাহিত্য সেই পরিচয় দান করিয়া অমরতা লাভ করে।

জীব-জীবনের সকল দশার উর্ধ্বে মানুষের শাশ্বত অধ্যাত্ম-বোধের দিকে কালিদাসের স্থির-দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কালিদাসের কাব্যে এই স্থির অধ্যাত্ম-দৃষ্টির প্রকাশ। সাধারণ মানুষের জীবনে এই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি বিচলিত হইয়া যায়। কালিদাসের কাব্য মানুষের অচঞ্চল ধ্যান-লোকের পরিচয় বহন করিয়া আছে।

"তার কোন ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দিনের কোন চিহ্ন নাই।" (কাব্য)

জীবনের সহস্র বঞ্চনা, দারুণতম ক্ষতির মধ্যবর্তী হইয়াও যদি এই ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারেন তবে কবি ধন্য বোধ করিবেন। এই সৌন্দর্য-লোক হইতে ভ্রষ্ট হইবার মত বঞ্চনা মানুষের জীবনে আর কিছু নাই। তাই মানুষ উহাকে লাভ করিতে চাহিয়া, উহাকে আশ্রয় করিয়া সর্বাধিক লাঞ্ছনা ও দুঃখ ভোগ বরণ করে। এই অধ্যাত্ম-লোকটিকে লাভ করিয়াই কবি আজ নিঃশঙ্ক বোধ করিতেছেন।

আমি 'চৈতালি' কাব্যকে কবির মানস বা ধ্যান-লোকের কাব্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। এ পর্যন্ত যে কয়েকটি কবিতার পরিচয় দান করিলাম তাহাতে আশা করি এই অভিমত সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যাইবে।

কবি এতদিন ধ্যান-লোকে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, এবার সেই ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিয়া সুপরিণত সৌন্দর্য ও প্রেমের যে ফসল ফলাইয়াছেন 'চৈতালি'র মধ্যে কবি তাহাকে অঞ্জলি ভরিয়া দান করিয়াছেন। 'চৈতালি' নামকরণের সার্থকতা এইখানে।

সমস্ত কিছু হইতে মুক্ত করিয়া দেশ-কালের সীমাহীন প্রসারের মাঝখানে একটি জীবনের ধীর বিকাশ ও তাহার বিনষ্টির সাক্ষাৎকার যে কী অপার বিস্ময় সৃষ্টি করে তাহা আমরা জানি না।—যেন মৃত্যুর কৃষ্ণ-নীল নিস্তরঙ্গ সায়রের বুকে কমল-কলিকার মত একটির পর একটি সৌন্দর্য-দল বিকশিত করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য ও মাধুর্য ভরে টলমল করিতে থাকে। তাহার পর আবার একে একে সমস্ত দল ঝরাইয়া দিয়া কোথায় হারাইয়া যায়। সেই পরিপূর্ণ মাধুর্যের লেশ-মাত্র কোথাও আর দৃষ্ট হয় না।

যাহা কিছু একান্ত পরিচিত বলিয়া বোধ হয়; যাহা একান্ত সাধারণ, যাহার

মধ্যে বিস্ময়ের লেশমাত্র নাই, সাহিত্যে তাহাই কোন্ যাদু স্পর্শে একান্ত নূতন, অপার বিস্ময় রস পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ইহা কবির সেই বোধ জাত, যে বোধ লাভ করিলে অনন্ত দেশ-কালের মাঝখানে একটি জীবনের প্রকাশকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া অখণ্ড রূপে সাক্ষাৎ করা যায়। 'সামান্য লোক' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই ভাবটিকে প্রকাশ করিয়াছেন।

মৃত্যুর চেতনা বক্ষে লইয়া জীবন সাক্ষাৎকারের অর্থ আর কিছু নয়, অনন্ত বা অসীমের পরিপ্রেক্ষিতে জীবন সাক্ষাৎ করা, অসীমের যোগে সীমার লীলা-রস সম্ভোগ করা। এই সাক্ষাৎকারে কবির চিত্ত বিস্ময় বিস্ফারিত।

"যাহা কিছু হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয়,
সকলি দুর্লভ বলে আজি মনে হয়।"

মৃত্যু জীবনের ক্ষণস্থায়ী বোধ জাগ্রত করে। এই উপলব্ধিতে তাই আমাদের সমগ্র সত্তা (সাধারণ অবস্থায় ইহা স্তিমিত, আচ্ছন্ন থাকে) ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন উন্মুখ হইয়া উঠে। এমনি করিয়া নিদারুণ বিয়োগ-বিচ্ছেদের অগ্নি-দাহে আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করিতে হয়। তখন প্রাত্যহিক জীবন ও জগতের অপরূপ সৌন্দর্য-মাধুর্য আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে।

জীবন তো এক বিচ্ছিন্ন সত্তা মাত্র নয়, তাহার একদিকে অনন্ত অতীত এবং অপর দিকে অনন্ত ভবিষ্যৎ এই উভয় দিকের সহিত যুক্ত হইয়া তাহার অসীম পরিচয়। এই মর্ত্য-জীবন সেই অসীম সত্তার ক্ষীণতম প্রকাশ। জীবন এমনি মহাবিস্ময়ের। কেবল কি তাই। জীবনের এই ক্ষণস্থায়ী বিকাশেরও কতটুকু আভাস আমরা লাভ করি। একটি মানুষের কাছে আর একটি মানুষ অনন্ত বিস্ময় লইয়া প্রতিভাত হয়।

"পরম আত্মীয় বলে যারে মনে মানি
তারে আমি কতদিন কতটুকু জানি।"

এই অনন্ত বিশ্বে মৃত্যুর পরপারবর্তী অনন্ত জগতে এই প্রিয়জন হারাইয়া গেলে তাহাকে আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। জীবন সাক্ষাৎকারের পশ্চাতে এমনি চির অপরিচিত অনন্ত রহস্যময়তার প্রেরণা আছে বলিয়াই জীবন এত সুন্দর, এমনি সুদুর্লভ। ওই অতি তীব্র পিপাসায় জীবনের ঐশ্বর্য অফুরন্ত হইয়া ধরা পড়ে।

ক্ষণিকতা বোধ যেমন জীবনের ঐশ্বর্যকে সীমাহীন করিয়া দেয়, তেমনি এই

বোধই আবার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনা জাগ্রত করিয়া সান্ত্বনাহীন বিক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ করিয়া দেয়। জীবনের এই স্বরূপ।

"এ ক্ষণ মিলনে তবে ওগো মনোহর,
তোমারে হেরিনু কেন এমন সুন্দর।" (কাব্য)

বলিয়াছি, জীবনের অতীত ভবিষ্যতের কোন তত্ত্ব কোন স্বরূপেই রবীন্দ্রনাথ বুঝিতে চাহেন নাই। জীবন ঘিরিয়া অন্তহীন রহস্যকে তিনি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অন্তরে এই রহস্যকে যত গভীর ভাবে অনুভব করিয়াছেন. জীবন ও জগৎ তাহারই পটভূমিকায় তত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের মহাবিস্ময়রসের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সাধনা বলিয়া তত্ত্বকে আর যে-কোন ফল লাভের জন্য তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। এই প্রেরণায় জীবন ও জগতের যে সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে মানুষ কোনদিন তাহাকে নিঃশেষ করিয়া দিতে পারিবে না।

জীবনের উর্ধ্বে যাঁহারা উঠিতে চান (ইহা রবীন্দ্রনাথের অভিমত) তাঁহাদের নিকট জীবনের অনন্ত স্বরূপতা ধরা পড়ে নাই। জীবনকে নিঃশেষে লাভ করিতে পারিলে তো জীবনের অতীত সত্তা লাভের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু জীবনকে যে অমন করিয়া শেষ করিয়া দিবার কোন উপায় নাই।

যে তত্ত্বে জীবনকে অনন্ত সৌন্দর্য-বিস্ময় বিজড়িত বলিয়া বোধ হয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য-সাধনার মর্মমূলে এই তত্ত্ব রহিয়াছে, একথা বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না।

নীল আকাশের মধ্যস্থলে সেই শ্যামলা ধরণী। আকাশ ও মর্ত্য-লোকের মহাশূন্য লোক পূর্ণ করিয়া আলোর বন্যা নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। এই সৌন্দর্য রহস্যের কি অন্ত আছে! আর তাহার কূল-হারা মহাসমুদ্রের প্রসারিত নীল জলের কী অপার মহিমা।—শত তরঙ্গের বাহু তুলিয়া তটে তটে আছড়াইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া কাঁদিয়া গুমরাইয়া মরিয়া যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া কোন্ মহা বেদনা ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রে-নক্ষত্রে আলোর স্পন্দন, সুরের সুরধুনী দিকহারা হইয়া শূন্য হইতে শূন্যে নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে। মহাশূন্যে সংখ্যাতীত গ্রহ-লোকের কক্ষাবর্তনের মধ্যে যে নৃত্য স্পন্দ, তাহার মহান রূপের কতটুকু প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এই রূপের সীমা কি মন কখন লাভ করিতে পারে!

"এ জগতে কভু তার অন্ত যদি জানি
চিরদিনে কভু তাহে শ্রান্ত যদি মানি

তোমার অতল মাঝে ডুবিব তখন,
যেথায় রতন আছে অথবা মরণ।" (তত্ত্ব ও সৌন্দর্য)

কিংবা

"যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।" (তত্ত্বজ্ঞানহীন)

'যাত্রী' কবিতাটির মধ্যে জীবনের এই অনন্ত স্বরূপতার পরিচয়ই কেবল নয়, কিংবা আনন্ত্যের বোধে জীবন সাক্ষাৎকারও নয়; অসীমের বোধ যদি অন্তরে থাকে তবে যে-কোন ঐকান্তিকতা হইতে জীবনকে যে তুলিয়া ধরিতে পারা যায় কবি সেই ভাবটি বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। ক্ষণ যেমন সত্য, তেমনি সত্য অনন্ত। একমাত্র ক্ষণকে স্বীকার করিয়া অনন্তকে অস্বীকার করিলে ক্ষণিকের অপরূপ সৌন্দর্য দৃষ্টিগোচর হয় না। কেবল তাহাই নহে, তাহা ক্রমে একান্ত হইয়া জীবনকে বিনষ্ট করিয়া দেয়।

জীবনের উর্ধ্বলোকে জীবনের সকল স্মৃতিই যে হারাইয়া যায় এই বিশ্বাস বোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। এই বিশ্বাস বোধ ছিল বলিয়া জীবনকে তিনি এমন নিবিড় করিয়া ভালবাসিতে পারিয়াছিলেন। আর এই আসক্তি বিজড়িত প্রেমে জীবনের সৌন্দর্য অফুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের এমন প্রেম, প্রেমে এমন উৎকণ্ঠা ও অধীরতা যে জীবন শেষে বিলুপ্ত হইয়া যায়, এই ভাবনা রবীন্দ্রনাথের অন্তরকে চিরকাল ব্যথা মথিত করিয়াছে। এই বেদনার কী শেষ আছে। মৃত্যুতে—

"কোথায় পশিবে সেথা কলরব তার
মিলাইবে যুগ যুগ স্বপনের মতো।" (যাত্রী)

এই আনন্ত্যের বোধ কিন্তু রূপাতীত কোন বোধ নয়। জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া জীবন রূপ হইতে রূপে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। রবীন্দ্রনাথ অনন্ত স্বরূপ বলিতে এই জন্ম জন্মান্তরের কথাটিই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই অনন্ত যাত্রার বোধটি যদি অন্তরে থাকে, তাহা হইলে কোন একটি বেদনা, কোন একটি স্খলন, দারুণতম অপরাধও একান্ত হইয়া জীবনকে বিনষ্ট করিয়া দেয় না। তখন এই বোধ থাকে যে সকল ব্যথা-বেদনা, বঞ্চনা, সকল

স্খলন অপরাধের চেয়েও এই জীবন অনেক বড়। ইহারা একটি জীবনে যতবড় হইয়া দেখা দিক, অনন্ত জীবন যাত্রায় তাহাদের স্মৃতিমাত্রও একদিন থাকিবে না।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কবিতাটির নাম মৃত্যু মাধুরী। মাধুর্য মৃত্যুর নয়। মৃত্যুর বোধ জীবনকে সেই অনন্তের পটভূমিকায় সাক্ষাৎ করিবার ক্ষমতা দান করে বলিয়া জীবন এমন মাধুর্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। মৃত্যু বোধ জীবনকে অসীমের সহিত মিলিত করিয়া দেখিতে সহায়তা করে।

"মনে হয়, যেন তব মিলন বিহনে
অতিশয় ক্ষুদ্র আমি এ বিশ্ব ভুবনে।" (মৃত্যুমাধুরী)

অসীমের সহিত মিলাইয়া জীবনের সব কিছুকে আমরা সাক্ষাৎ করিতে পারি না, তাহার কারণ ভীতিবোধ। ভীতিবোধ কিসের জন্য, না আমরা ভাবি যে এই সীমা হারাইয়া যাইবে। অনন্তের বোধ সীমাকে লুপ্ত করিয়া দেয় না তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্দেশ করে।

'চৈতালি'র মধ্যে দেখি একদিকে কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানের সম্পূর্ণতা, এবং উহারই সীমা বোধে জীবন ও জগতের বিশিষ্ট রূপ সাক্ষাৎকার, পরিণামে উহাকে একটি দার্শনিক সত্যরূপে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা।

বিশ্বের সহিত মিলন অনুভূতির পরিচয়ও চৈতালির মধ্যে লাভ করা যায়।

"আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে,
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থানে
বহুকাল পরে।"

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর চেতনা বিচিত্র পরিণাম স্বরূপে বহুবিচিত্র রূপ লাভ করিয়াছে। তাই মানবীয় চেতনার স্বরূপ যাহাই হোক-না-কেন, তাহা দিব্য-চেতনা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক নহে। পার্থক্য পরিণাম গত, প্রকৃতিগত নহে। মানবীয় চেতনা একটি পরিণামে দিব্য চেতনায় রূপান্তরিত হইয়া যায়।

অদ্বৈতবাদীদের নিকট কেবল মাত্র দেশ কালের ঊর্ধ্বতর চেতনা সত্য। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে বলিয়াছেন, যে-সাধনা জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করে, মনুষ্য-চেতনাকে যে-সাধনা স্বীকৃতি দান করে না, সে সাধনা জীবনে কেবল শূন্য পরিণাম আনয়ন করে। মানুষের মুক্তি বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া অনন্তে পরম ব্যাপ্তি লাভ করিবার মধ্যে।

'পুণ্যের হিসাব' কবিতাটির মধ্যে কবি বৈরাগ্যের অর্থাৎ জীবনকে অস্বীকার করিবার চেষ্টার মধ্যে কতবড় বঞ্চনা রহিয়াছে তাহা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তিনি আপনার জীবনের উপলব্ধ সত্যটিকেও প্রকাশ করিয়াছেন। "যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা।" অর্থাৎ যে-কোন উন্নত বোধ ও আদর্শ বা ভাব-প্রেরণা আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা একটা পরিণামে অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে।

'বৈরাগ্য' কবিতাটির মধ্যে এই একই ভাব। এই উপলব্ধিটিই সত্য যে অনন্ত প্রেম মানবীয় প্রেমের মধ্যেও অভিব্যক্ত। মানবীয় প্রেমের মধ্যে অনন্ত প্রেম স্বরূপের সাক্ষাৎকারই পূর্ণ দৃষ্টি। বৈরাগ্যে এই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে ক্ষেত্রে বলিতেছেন—

"ভালোমন্দ দুঃখ সুখ অন্ধকার আলো
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।" (ধরাতলে)

সে ক্ষেত্রে জীবনের এই প্রেমে, জগতের এই স্বরূপে সকল পরিণাম অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। পরিণাম স্বরূপে হোক, অথবা একমাত্র স্বরূপে হোক রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগৎকে যে পূর্ণ স্বীকৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

দেশ-কালের মধ্যে মানবীয় চেতনার অভিব্যক্তি বা বিকাশ যতদূর হোক-না-কেন, তাহা প্রকৃতি তাড়িত। মানুষ পরিপূর্ণ রূপে আত্ম-চৈতন্য স্থিত হইতে পারে না বলিয়া আত্মকর্তৃত্ব শূন্য। মানবীয় চেতনার বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত বলিয়া কতকটা অন্ধকার-লোক।

"অন্ধকারে অভিসার কোন পথ পানে
কার তরে পান্থ তাহা আপনি না জানে।" (প্রেম)

কোন অনাদিকাল হইতে আমরা চলিতে চলিতে আসিয়াছি। কত জন্ম কত জন্মান্তর কত রূপ-লোকের পর রূপ-লোক অতিক্রম করিয়া শুধু চলিয়াছি। সে চলা আজও শেষ হইয়া যায় নাই। মৃত্যুতে আবার কোন নূতন রূপে নূতন জগতে আমাদের পথ চলা সুরু হইবে। এই অবিরাম পথ চলার উদ্দেশ্য কি? এই চলার ভিতর দিয়া আমরা কি লাভ করিতেছি? এই পথ চলার কোথাও কি শেষ আছে? পথ চলার শেষে আমরা কাহার সহিত মিলিত হইব?

যে চেতনা এই প্রকৃতি-তাড়িত-লোকে মানুষকে ঊর্ধ্বগামী করিয়া তুলে, নিশ্চিৎ লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করে তাহাই প্রেম। নিম্নাভিমুখী চেতনার

ক্রম সঙ্কোচন যেমন সত্য, তেমনি সত্য ঊর্ধ্বাভিমুখী শক্তির ক্রমবিকাশ। প্রেম এই ঊর্ধ্বাভিমুখী শক্তির একটি পর্যায়ের প্রকাশ।

প্রেমের সাধনা দেশ-কালের মধ্যগত সাধনা বলিয়া ইহাতে জীবন ও জগতের পূর্ণ সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। জীবন ও জগতের পূর্ণ সত্য উপলব্ধি হয় তখনই, যখন মানুষ মানবীয় চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। প্রেম এমনি করিয়া অনন্ত-মুখীন হইয়া ভক্তিতে পরিণত হয়। ভক্তি অবার পরিণামে দিব্য-চেতনায় একাকার হইয়া যায়। ইহাই পূর্ণ স্বরূপ লাভ।

আমাদের চেতনা কেবল একটি সীমা-লোককে উদ্ভাসিত করিতে পারে। এই সীমার বহির্ভূত নিখিল বিশ্বের কোন অস্তিত্বই আমাদের কাছে সত্য নহে।

"অন্ধকারে আর সবে আসে যায় কাছে
জানিতে পারিনে তাহা আছে কিনা আছে।" (প্রেম)

নিখিল বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে দুইটি ধারা রহিয়াছে। একটি রাত্রি, আর একটি দিন। একটির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব যেন আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আনে, আর একটির মধ্যে সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি যেন আপনাকে প্রসারিত করে, যেন সৌন্দর্য-শতদল একটির পর একটি দল মেলিয়া দেয়। মানুষের জীবনেও এ একথা সত্য, অর্থাৎ তাহার মধ্যে যেমনি একটি বিস্তারের দিক আছে, তেমনি একটি সঙ্কোচনেরও দিক আছে। একটি প্রেরণায় তাহার সমগ্র বৃত্তি বহির্মুখীন হইয়া পড়ে, অন্য প্রেরণায় তাহার সমগ্র বহির্মুখী প্রেরণা অন্তর্মুখীন হয়। একটি তাহার কর্মের, অপরটি তাহার ধ্যানের দিক। মানুষের জীবনে এই দুই দিকই সত্য। ইহাদের কোন একটি সত্তায় সে সম্পূর্ণ নয়।

নিখিল বিশ্বের এই তত্ত্ব প্রেমের মধ্যেও অভিব্যক্ত। একটি তাহার ধ্যানের দিক, নিভৃত একের দিক, অপরটি বিশ্ব যোগের দিক। জীবন ও জগতের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা রহিয়াছে। একই তত্ত্বে জীবন ও জগৎ বিধৃত।

যখন অন্ধকার ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসে, যখন জল-স্থল-অন্তরীক্ষের উপর কৃষ্ণ যবনিকা বিস্তৃত হইয়া সমগ্র বৈচিত্র্য বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তখন নর-নারীর অন্তরে প্রেমের একটি নিভৃত ধ্যান-লোক গড়িয়া ওঠে। একটি প্রেমের পশ্চাতে সমগ্র বিশ্ব জগতের গূঢ় উদ্দেশ্য এমনি করিয়া সাধিত হয়।

একটি প্রেমের পশ্চাতে সমগ্র বিশ্বের এমনি একপ্রকার নিগূঢ় উদ্দেশ্যের যোগ থাকে বলিয়া প্রেমোপলব্ধির মুহূর্তে বিশ্ব-বীণায় যেন কম্পন জাগে। প্রেমে

মানবীয় চেতনার ছন্দের সহিত নিখিল বিশ্ব-চেতনার ছন্দ এক হইয়া মিলিয়া যায়।

"সেই ক্ষণে বাতায়নে নীরব নির্জন
আমাদের দুজনের প্রথম চুম্বন।"

তাহার পর প্রভাত আসে। তখন এই ধ্যান-লোকটি উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। বিশ্ব-প্রকৃতি আপনাকে দিগ্বিদিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। নর-নারীর জীবনে তখন বিদায়ের লগ্নটি ঘনাইয়া আসে। তখন চেতনার বহির্মুখীনতা, কর্ম, জীব-জীবনের প্রয়াস।

"মহারবে সিংহদ্বার খুলে বিশ্ব পুরে,
অশ্রুজল মুছে ফেলি চলি গেনু দূরে।" (শেষ চুম্বন)

এমনি নানাভাবে রবীন্দ্রনাথ জীবন ও জগতের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মানবীয় চেতনাশ্রয়ী বলিয়া জীবনের স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ যেমন করিয়াই উপলব্ধি করুন-না-কেন তাহাতে সংশয় থাকিয়া যাইবে। 'চৈতালি'র মধ্যেও কবির সেই সংশয় বিজড়িত অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার পরিচয় রহিয়াছে। সেই চির পুরাতন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা—

"আমার ক্ষণিক প্রাণ কে এনেছে যাচি
কোথা মোরে যেতে হবে, কেন আমি আছি।" (অজ্ঞাত বিশ্ব)

মৃত্যুর সকল রহস্য মুছিয়া দিয়া রবীন্দ্রনাথ জীবনের পরিণামকে কত-না মধুর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, যেন তাহার মধ্যে ভয়ঙ্করতা, রহস্যময়তা বলিয়া কিছুই নাই। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই অজ্ঞাত বোধ চিরকাল রহিয়াই গিয়াছিল।

"আজি সে অনন্ত বিশ্বে আছে কোন্‌খানে
তাই ভাবিতেছি বসি সজল নয়নে।" (স্মৃতি)

যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু শোক ভুলিতেন, সেই একই তত্ত্বের পরিচয় 'বিষয়' কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

একটি বিশেষ প্রাণ মৃত্যুতে অনন্ত প্রাণের সহিত মিশিয়া যায়। আর সেই অনন্ত প্রাণ-ধারা হইতে সংখ্যাতীত নিত্য নূতন রূপের সৃষ্টি হয়। অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রাণ-রূপে সেই বিশেষ প্রাণও রহিয়াছে।

ইহা হয়ত সত্য। কিন্তু এই উপলব্ধিতে প্রাণের ক্ষুধা মেটে না। মানুষের

হাহাকার যে ওই বিশেষ রূপটির জন্য। মৃত্যুতে আর যে-কোন পরিণামে ওই রূপটিকে তো আর কোন প্রকারে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যাইবে না।

সেই তত্ত্ব সাক্ষাৎকার—

"যেন তার আঁখি দুটি নব নীল ভাসে
ফুটিয়া উঠিছে আসি অসীম আকাশে।" (বিলয়)

প্রাণের যে ক্ষুধায় এই তত্ত্ব ভাঙ্গিয়া পড়ে—

"শুধু তোর কণ্ঠস্বর এ প্রভাত বায়ে
অনন্ত জগৎ মাঝে গিয়েছে হারায়ে।" (বিলয়)

একটি কণ্ঠস্বর অনন্ত কণ্ঠস্বরের সহিত হয়ত মিশিয়া রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের প্রেম যে ওই বিশেষ কণ্ঠস্বরটি শুনিতে চায়। প্রেমের এই রূপ-তৃষ্ণা কোন তত্ত্ব কোন দর্শন বুঝি পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।

ধ্যান-লোকটিকে বহির্বিশ্ব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত করিবার বিচিত্র চেষ্টা এবং বারংবার ব্যর্থতার যে পরিচয় আমরা এই কাব্যে লাভ করিয়াছি, সেই অধ্যাত্ম সংগ্রামের স্বরূপ বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

ধ্যান-লোকে, সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ যত ব্যাপ্তি লাভ করুক-না-কেন, তাহা দেশ-কালের পরিসীমার অন্তর্গত বলিয়া সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। আবার সীমার বোধে মানুষের অতৃপ্তি বোধ থাকিবেই।

ধ্যান-লোকের সৌন্দর্যও মূলত ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী। তাই কবি যখনই ধ্যান-লোকটিকে বহিঃসৌন্দর্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তখনই ওই ধ্যান-লোকটিও ধীরে ধীরে বিশুষ্ক হইয়া পড়িয়াছে। বারংবার চেষ্টার পর কবি পরিণামে তাহা পরিহার করিয়াছেন।

এই চেষ্টার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ কোন্ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন? ধ্যান-লোকে থাকিয়াও কবি যে অতৃপ্তি বোধ করিতেন, সেই অতৃপ্তি বোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি মর্ত্যের বন্ধন অমন করিয়া ছিন্ন করিতে চাহিতেন। কবির অন্তরে এমনি একপ্রকার বোধ ছিল যে মর্ত্যের বন্ধন ছিন্ন করিলে ধ্যান-লোকটি একপ্রকার মুক্ত-লোকে পরিণত হইয়া যাইবে।

ধ্যান-লোকে সীমার পীড়াবোধ থাকিলেও তাহা সৌন্দর্য-বোধের এমন একটি পরিণাম যেখানে রূপের পীড়া একান্ত ন্যূন হইয়া পড়ে। আবার অন্যদিকে অমর্ত্য-চেতনার আভাস মানবীয় চেতনার এই পর্যায়ে সর্বাধিক লাভ করা যায়। কবি যে ধ্যান-লোকটিকে মুক্তি-লোক স্বরূপে আশ্রয় করেন, ইহাই তাহার স্বরূপ।

মানবীয় চেতনা সীমাবদ্ধ বলিয়া নিখিল বিশ্ব এই ব্যক্তি-চেতনায় যতটুকু ধরা পড়ে ততটুকুই আমাদের পরিচিত লোক, তাহার বাহিরের আর সমস্ত কিছু আমাদের অনুভব অগম্য বলিয়া অপরিচিত, অজ্ঞেয়, রহস্যাবৃত।

কবি মানবীয় চেতনাশ্রয়ী বলিয়া তাঁহার জীবন ও জগতের চতুর্দিকে অমন চির রহস্য স্তব্ধ হইয়া আছে। ইহা না স্বীকার করিয়া উপায় নাই।

অসীম রহস্যকে স্বীকার করিয়া লইয়া জীবন ও জগতের যে রূপ সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে, কয়েকটি কবিতায় আমরা তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি।

বিশিষ্ট এই কয়েকটি কবিতার মধ্যে কবি যে রস-তত্ত্ব বা সৌন্দর্য-তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার মধ্যেও সীমাবদ্ধ সৌন্দর্যের পীড়া বোধ জয় করিয়া তুলিবার অজ্ঞাত চেষ্টা ছিল। সেই তত্ত্বগুলি আমি একে একে উপস্থাপিত করিয়াছি। ওই সমস্ত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার পশ্চাতে কোন্ সমস্যা সমাধানের চেষ্টা ছিল, এক্ষেত্রে তাহাই বুঝিলে চলিবে।

জীবনের সমস্যা সমাধানের এমনি সহস্র প্রয়াসের পরিচয় কবির কাব্যে লাভ করিতে পারা যায়। এই অধ্যাত্ম প্রেরণার স্বরূপ বুঝিলে অজ্ঞেয়তা বোধের সহিত বিজড়িত হইয়া কবির বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা এবং রূপ বা বিগ্রহের জন্য অমন হাহাকার অমন সান্ত্বনা শূন্য বিক্ষোভের স্বরূপটিও বুঝিতে পারা যাইবে।

কল্পনা

চৈতালির মধ্যে কবির মানস-ধর্মের তজ্জাত বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছি, কল্পনার মধ্যে তাহারই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

উর্ধ্বতর প্রেরণা লাভের জন্য কবির অন্তরে যে গূঢ়তর প্রেরণা ছিল, তাহা কোথাও একান্ত হইয়া কবিকে আকর্ষণ করিয়া ওই লোকে অনেকদূর পর্যন্ত আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে।

উর্ধ্বতর চেতনালোকে যাত্রা বলিতে যে ঠিক কি বুঝায় তাহা আমাদের পক্ষে বুঝিয়া লইবার কোন উপায় নাই। কারণ ঐ লোকের গতি-প্রকৃতি, উহার সকল ধর্ম আমাদের মানস-ধর্মের আমাদের বোধ ও বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত বলা যাইতে পারে।

যে কালে জাগতিক চেতনার দীপ নিভিয়া গিয়াছে অথচ অমর্ত্য-লোকের অম্লান জ্যোতি অন্তশ্চেতনায় তখনও উদ্ভাসিত হয় নাই এই পর্যায়ের একটি পরিচয় লাভ করা যায় 'দুঃসময়' কবিতাটির মধ্যে। জীবন পরিবর্তনের পর্যায় যে কী দুঃসহ বেদনার তাহার কোন বোধই আমাদের নাই। এই বোধের জগৎকে পরিহার করা যে কতখানি, তাহা যে অন্তরকে কতদূর শূন্যময় করিয়া তুলে তাহার কোন পরিমাপ আমাদের জীবনে নাই। আমাদের জীবনে সে প্রেম কোথায়, যে প্রেমে এই জগৎ ও জীবন দুর্লভ বলিয়া বোধ হয়, যে প্রেম মৃত্যুকেও জয় করিয়া উঠিতে চায়। আবার সেই অমর্ত্যের গূঢ়তর পিপাসার স্বরূপ কি যাহা এমন দুর্লভ জীবন ও জগৎকে এমন বেদনায়ও পরিহার করিয়া যায়। আমাদের জীবনে সেই সত্য প্রেম বা আসক্তি নাই, সে বৈরাগ্যও তাই অনুভূত হয় না। বস্তুত উভয়েরই পশ্চাতে ক্রিয়া করে এক আদি প্রাণের প্রেরণা। আমাদের জীবনে সেই আদি প্রাণের প্রেরণা ক্ষীণ বলিয়া আসক্তি যেমন, অনাসক্তিও তেমনি ক্ষীণভাবে অনুভূত হয়।

মর্ত্য-প্রেম সত্য ও সম্পূর্ণ না হইলে অমর্ত্যের পিপাসা সত্য করিয়া জাগে না। এই পিপাসা আবার ওই প্রেমকে জয় করিয়া উঠে। সাধারণ মানুষের জীবনে মর্ত্য-প্রেমের প্রকাশ যেমন, অমর্ত্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষাও তেমনি অত্যন্ত ক্ষীণ।

জাগতিক সৌন্দর্য ও প্রেমবোধ যতদূর সমৃদ্ধি ও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইতিপূর্বেই তাহা ঘটিয়াছে। এই পরিণামেও অন্তরের শূন্যতা বোধ অপূর্ণ রহিয়া যাইতে তিনি এই সমস্ত কিছু ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য অমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন। যাঁহারা ওই পরিণাম লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা জগতে একান্ত মুষ্টিমেয়, অধিকাংশই গত শক্তি হইয়া আবার সীমা-লোকে ফিরিয়া আসেন। অবশ্য এই অধিকাংশের সংখ্যাও নিতান্ত সামান্য।

"যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে,
সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া,—"

ইহা সেই মুহূর্তের পরিচয় যে মুহূর্তে মন ও বুদ্ধির দীপ নিভিয়া যায়। ইহাকেই কবি সব সঙ্গীতের নীরবতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রূপের বৈচিত্র্যবোধ থাকে মানস-লোকে, এই চেতনা ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টার মুহূর্তে সকল বৈচিত্র্যের উপর যেন এক ঘন-কৃষ্ণ যবনিকা টানা হইয়া যায়।

এই অন্ধকার লোকে মানবীয় চেতনা পরম আশ্রয় লাভের নিঃসংশয় বিশ্বাস বক্ষে লইয়া উর্ধ্বগামী হয়,—এক প্রকার অন্ধ আবেগের মত। ইহাকেই বলে ভক্তি। এই ভক্তির ভিতর দিয়া অন্তরের অন্ধকার-লোকে অনুসন্ধান চলিতে থাকে। কোথায় সেই পূর্ণ সৌন্দর্য-লোক, মানুষের সকল সৌন্দর্য-পিপাসা যেখানে চরিতার্থ হইয়া যায়? সেই পরম আশ্রয়-লোক, যেখানে চেতনার পরম পরিণতি, পূর্ণ বিশ্রাম?

"কোথা রে সে তীর ফুলপল্লবপুঞ্জিত,
কোথা রে সে নীড়, কোথা আশ্রয় শাখা।"

এই সর্বব্যাপ্ত অন্ধকার লোকে চেতনা উর্ধ্বগামী হয় কেমন করিয়া? পথের ইঙ্গিত সে কেমন করিয়া লাভ করে? এই অন্ধকার লোকে মানুষ যে বিচিত্র নির্দেশ বা ইঙ্গিত লাভ করে তাহার স্বরূপ ওই সাধনায় প্রবৃত্ত না হইলে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তেমনি অধ্যাত্ম ইঙ্গিতকে কবি এমনি একটি রূপকের সহায়তায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

দূর দিগন্তে বন শীর্ষের কৃষ্ণ রেখার উর্ধ্বে অবসন্ন ম্লান হাসির মত জাগিয়া উঠা একখণ্ড চাঁদ। যেন কত যুগ যুগান্ত ধরিয়া অকূল অন্ধকার সাগর পার হইয়া উঠিয়াছে। উর্দ্ধ চেতনা লোকে ক্লান্ত ওই দীর্ঘ অভিসার এবং মাঝে মাঝে অবসন্ন চেতনায় প্রত্যয়ের বিদ্যুৎ স্ফুরণ,—তাহারই ব্যঞ্জনা।

"সবে দেখা দিল অকূল তিমির সন্তরি
দূর দিগন্তে ক্ষীণ শশাঙ্ক বাঁকা।"

বহিশ্চেতনা যখন স্তম্ভিত হইয়া যায় তখন অন্তঃস্থিত চেতনা আপনা আপনি ধীর পরিণাম লাভ করিয়া চলে। চিত্তের গভীরতম লোক চকিতে যেন কার সকরুণ আহ্বান ধ্বনি সমুত্থিত হইতে থাকে।

"বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।"

যে স্বরূপেই হোক-না-কেন একদিন কবি মোহ ও আসক্তি বিজড়িত মর্ত্যের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকেই জীবনে পরম সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, আজ অমর্ত্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা সত্য হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কিছু আরোপিত সকল মূল্যের সহিত কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া মর্ত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিতে, সকল আসক্তি জয় করিয়া উঠিতে হয়। ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভ করিতে কবিকে যে আসক্তির সহিত প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল তাহা নিশ্চিৎ। এই সংগ্রাম এবং তজ্জাত বেদনার আভাস—

"ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহ-বন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।"

চেতনা যখন ঊর্ধ্বগামী হয়, তখন নিম্নতর লোকের অনুভূতি লোপ পায়; উহা তাই তখন মিথ্যা হইয়া উঠে। এমনি করিয়া চেতনা যতই ঊর্ধ্বতর লোক লাভ করিতে থাকে, ততই নিম্নতর চেতনার জগৎ মিথ্যা হইয়া উঠে।

"পাখি উড়ে যাবে সাগরের পার,
সুখময় নীড় পড়ে রবে তার।" (বিদায়)

কবি যখন মুহূর্তের জন্য অমর্ত্য-লোকের আভাস লাভ করিয়াছেন, তখন আমিত্বের সকল মূল্যবোধ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঊর্ধ্বতর চেতনায় ব্যক্তি আপনাকেই অনন্ত ব্যাপ্ত দেখে। বিশ্বে আপনাকে লীলায়িত দেখিলে জাগতিক সীমা বোধ, এই 'নীড়' বা 'আমি'র মূল্য বোধ আর থাকে না। শক্তির অপ্রমেয় লীলার দিক হইতে মর্ত্যের এই সুখ দুঃখ পূর্ণ জীবন, তাহার বহুবিচিত্র প্রয়াস কত তুচ্ছ!

"বিশ্ব জগৎ আমারে মাগিলে
কে মোর আত্মপর।" (বিদায়)

আমরা ইতিপূর্বে কবির দিব্য-চেতনা লাভের পরিচয় লাভ করিয়াছি।

ইহার স্বরূপ বিচার করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম, যে উহা প্রকৃত দিব্য-চেতনা নহে, মনের এক বিশিষ্ট ভাব পরিণাম। উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির মধ্যে যে লোকে কবি ওই মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা যে প্রকৃত দিব্য-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাতে সংশয় নাই।

ইতিপূর্বে মিলন বোধের প্রত্যেক স্থলে রূপের বোধ এতটুকু আচ্ছন্ন হয় নাই। এই একমাত্র ধর্ম হইতে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়, যে ইহা মানস-লোকেরই এক বিশিষ্ট পরিণাম। দিব্য-চেতনায় রূপের বোধ থাকে না।

কল্পনার মধ্যে 'বিদায়' নামে আরও একটি কবিতা আছে। কবিতা দুইটির মধ্যে কেবল নাম সাম্য নয়, ভাব সাম্যও লক্ষিত হয়।

মর্ত্য ও অমর্ত্য-লোকের মধ্যে একটি অলৌকিক অন্ধকারের পর্যায় আছে। 'দুঃসময়' কবিতাটির মধ্যে কবি তাহারই পরিচয় দান করিয়াছেন।

এই মানস-অভিসার প্রায় সমাপ্ত হইতে চলিয়াছে। কবি সেই জ্যোতির্লোকের উপান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই উভয় লোকের সংযোগ সীমার উপর দাঁড়াইয়া তিনি একদিকে মর্ত্য এবং অন্যদিকে দিব্য-চেতনা এই উভয় লোকের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় বর্তমান কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের নিকট মর্ত্য ও অমর্ত্য-চেতনা সম্পূর্ণ পৃথক নয়, একটি অপরটির অনিবার্য স্বাভাবিক পরিণাম। যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার মধ্যে এই পরিণামের স্বরূপ নির্দেশের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

"মৃত্যু নয়, ধ্বংস নয়,
নহে বিচ্ছেদের ভয়—
শুধু সমাপন।
শুধু সুখ হতে স্মৃতি,
শুধু ব্যথা হতে গীতি,
তরী হতে তীর,
খেলা হতে খেলা শ্রান্তি,
বাসনা হইতে শান্তি,
নভ হতে নীড়।" (বিদায়)

আমাদের কোন কর্ম, কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-ভাবনা নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায় না। ওই সমস্ত কিছু সূক্ষ্ম ভাবরূপে অন্তরে থাকিয়া যায়। প্রাণের

সকল অনুভূতি এই রূপে ধ্যানে ভাব স্বরূপতা লাভ করে। প্রত্যক্ষ আনন্দবোধ ধ্যানে ভাব-সম্ভোগে পরিণত হয়। প্রত্যক্ষ বেদনা ওই লোকে অলৌকিক বেদনায় রূপান্তরিত হয়। নিম্নতর চেতনার বিচিত্র বাসনা বিক্ষোভ ধ্যান-লোকে শান্ত হইয়া যায়।

সৃষ্টি প্রত্যক্ষ আনন্দ বা বেদনা বোধ জাত নহে। প্রাণের বিক্ষোভ হইতেও সৃষ্টি হয় না। প্রত্যক্ষ আনন্দ-বেদনা, বাসনা-বিক্ষোভকে মানুষ যখন ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে তখনই মানুষ সৃষ্টি-প্রেরণা বোধ করে। সৃষ্টির জন্য যে সামগ্রিক, অনাসক্ত দৃষ্টি প্রয়োজন তাহা নিম্নতর চেতনা-লোকে লাভ করা অসম্ভব।

যদি আমাদের সকল কর্ম, সকল বাসনা ধ্যান-লোকে ভাবরূপে বিরাজ করে, তবে একথাও সেই সঙ্গে সত্য হইয়া উঠে যে মৃত্যুতে আমাদের সমগ্র সত্তা সূক্ষ্মতর কোন ভাবরূপে বিরাজ করে। এমনি করিয়া জন্ম হইতে জন্মান্তরে ভিন্ন ভিন্ন রূপ আশ্রয় করিয়া মানুষ লীলা করিয়া চলে; এক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, সাধনা সবকিছু অন্য জীবনে বহিয়া লইয়া যায়।

প্রাণ-লোক হইতে ধ্যানে যেমন একটি ধীর পরিণাম আছে, ধ্যান-লোক হইতে বাসনা-লোকে তেমনি একটি ধীর পরিণাম আছে। এই বাসনা-লোক জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যে সেতু রচনা করে। দিব্য-চেতনা কি এই বাসনা-লোকের সূক্ষ্মতর উন্নততর কোন পরিণাম?

ধ্যান-লোক বা তাহার ঊর্ধ্বতর সূক্ষ্ম বাসনা-লোক যে-কোন স্বরূপে রূপ-লোক বলিয়াই জন্ম হইতে জন্মান্তরে রূপ পরিগ্রহ করে। দিব্য-চেতনা রূপের যে-কোন বোধ বহির্ভূত চেতনা, উহা বাসনা-লোকের সূক্ষ্মতর পরিণাম নহে। বাসনা-লোকের সহিত দিব্য-চেতনার একটা মিল কোন-না-কোন স্বরূপে আছেই। তবে উহা একটির উন্নততর বা নিম্নতর পরিণাম নহে। ইহা মায়াবাদীদের মত। উভয়ের সম্পর্কে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে অরূপ বা অসীম কোন একটি উপায়ে রূপে রূপে অনন্ত বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে।

ঊর্ধ্বাভিসারের পরিচয় 'অসময়' কবিতাটির মধ্যেও লাভ করা যায়। যে পথ আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনাকে ঊর্ধ্বাভিসার করিতে হয়, তাহা অন্তরের পথ বলিয়া তাহার যে-কোন পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। আমরা পথ অন্বেষণ করি বুদ্ধির আলোকে। এখানে সেই আলোক নিভিয়া যায়।

এই লোকে যাঁহারা পথ চলেন, তাঁহারা এমন কতকগুলি নিঃসংশয় নির্দেশ

লাভ করেন, যাহার ফলে ওই যাত্রা সম্পর্কে তাঁহাদের আর দ্বিধা থাকে না। ইহা তো বুদ্ধিলব্ধ তত্ত্ব নহে, যোগের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার, মানুষের ভাবে বা ভাষায় তাই ইহাকে বুঝিয়া লইবার কোন উপায় নাই।

চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে একটি ইঙ্গিত ভাসিয়া উঠে, কবি সেই ইঙ্গিত লক্ষ্য করিয়া পথ চলেন। ওই ইঙ্গিত স্থলে পৌছাইয়া কবির বোধ হয় বুঝি তাঁহার অভীষ্ট লাভ ঘটিয়াছে, কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁহার দৃষ্টিসমক্ষে আর এক পথ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, যাত্রার আর একটি ইঙ্গিত। অসীম এই যাত্রা পথ।

"ফুরালো কি পথ, এসেছি পুরীর কাছে কি?" (অসময়)

কবি বারংবার পরিণাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হন, বারংবার তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া যায়।

"ওই কি প্রদীপ দেখা যায় পুরমন্দিরে? (অসময়)

মর্ত্য-লোক অতিক্রম করিয়া কবির এই যে ক্রমিক ঊর্ধ্বাভিসার, তাহার জন্য কবিকে কি আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিতে সংগ্রাম করিতে হয় নাই।

বস্তুত কবি যে জীবন ও জগৎকে তাহার সৌন্দর্য ও প্রেমকে ঊর্ধ্বস্থিত সকল চেতনার লীলাভূমি বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এক্ষেত্রে ওই ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়া কবি এই জীবন ও জগতের সৌন্দর্য ও প্রেমকে অস্বীকার করিয়াছেন। উহা এমনি অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা হইয়া উঠিয়াছে।

"বিদায়ের কালে দিতে গেনু কারে সান্ত্বনা,
যাত্রীরা হোথা গেল খেয়াতরী বাহিয়া।" (অসময়)

'দুঃসময়', 'বিদায়' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আমরা কবি-চেতনার ঊর্ধ্বাভিসার লক্ষ্য করিয়াছি।

কবির যে অধ্যাত্ম বা ধ্যানের জগৎ অমর্ত্যের চেতনা স্পর্শে প্রায় বিগলিত হইয়া যাইতেছিল, সেই অধ্যাত্ম জগতের এবং ওই ভাবাবস্থার একটি অস্পষ্ট আভাস নিম্নের পংক্তি কয়েকটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

"গাঢ় সে তিমির তলে চক্ষু কোথা ডুবে চলে
নাহি পায় সীমা।" (অশেষ)

ধ্যানে অন্ধকার লোক বিদীর্ণ করিয়া তখনও জ্যোতির কুসুম ফুটিয়া উঠে নাই। হয়ত আসন্ন প্রভাতের একটা নিঃসাড় অয়োজন অন্ধকারের বক্ষে নিঃশব্দে চলিতেছিল।

তখন একটি অতি প্রবল নিম্নাভিমুখী ইচ্ছা-শক্তির আকর্ষণে তিনি ধ্যানাসন পরিহার করিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন।

"রহিল রহিল তবে আমার আপন সবে
আমার নিরালা।

* * *

রাত্রি মোর, শান্তি মোর, রহিল স্বপ্নের ঘোর
সুস্নিগ্ধ নির্বাণ—।" (অশেষ)

'দুঃসময়' 'বিদায়', 'অসময়', 'অশেষ' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি-জীবনের স্পষ্ট দুইটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। এই দুইটি পর্যায়কে আমি দুইটি চেতনার (ঊর্ধ্বতর ও নিম্নতর) সঙ্ঘাত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছি। নিম্নতর চেতনা পর্যায়কে অতিক্রম করিয়া কবি তাহার ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এই দুইটি পর্যায়ের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ নির্দেশেরও চেষ্টা করিয়াছি। কবি স্বয়ং এই দুইটি পর্যায়ের কতকটা ভিন্ন স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন। তাহা সৌন্দর্য ও প্রেমের মাধুর্য-লোক হইতে বাস্তব জগৎ ও জীবনের শক্তির বিচিত্র নিরাভরণ প্রকাশ-লোকে উত্তরণ।

'আমার ধর্ম' প্রবন্ধে 'অশেষ' ও 'বর্ষশেষ' কবিতা-প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন—

"এর ('এবার ফিরাও মোরে' রচনার) পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাত-প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সঙ্ঘাত যে কেবল আরামের কেবল মাধুর্যের তা নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছায় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়। * * * এ আহ্বান এ তো শক্তিকেই আহ্বান; কর্মক্ষেত্রেই এর ডাক, রস সম্ভোগের কুঞ্জ কাননে নয়।

এমনি করে ক্রমে ক্রমে জীবনের মধ্যে ধর্মকে স্পষ্ট করে স্বীকার করবার অবস্থা এসে পৌঁছল। যতই এটা এগিয়ে চলল ততই পূর্ব জীবনের সঙ্গে আসন্ন জীবনের একটা বিচ্ছেদ দেখা দিতে লাগল। অনন্ত আকাশে বিশ্ব প্রকৃতির যে শান্তিময় মাধুর্য আসনটা পাতা ছিল সেটাকে হঠাৎ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে বিরোধ বিক্ষুব্ধ মানব-লোকে রুদ্র বেশে কে দেখা দিল? এখন থেকে দ্বন্দ্বের দুঃখ বিপ্লবের আলোড়ন। সেই নূতন বোধের অভ্যুদয় যে কী রকম ঝড়ের বেশে দেখা দিয়েছিল, এই সময়কার 'বর্ষশেষ' কবিতার মধ্যে সেই কথাটি আছে।" (সবুজ পত্র। আশ্বিন ও কার্তিক ১৩২৫)।

একদিকে ব্যক্তি-সত্তা 'আছি', আর অন্যদিকে বিশ্ব-সত্তা 'আছে'। এই উভয়ের সহিত মিলন যতই গভীর, এইরূপে দুইটি সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য যতই সাধিত হইতে থাকে; অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার বিকাশ, ব্যক্তি-চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে সৃষ্টি-প্রেরণা ততই গভীর ভাবে অনুভূত হয়। বিশ্ব-সত্তাকে অখণ্ড সঙ্গীত, বাণী, রূপ বা আকার, ভাব বা শক্তির স্পন্দন রূপে বোধ করা যায়। কবি বিশ্ব-সত্তাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছেন, কবির সৃষ্টির মধ্যে এই প্রত্যেকটি দিকের প্রকাশই শুধু নয়, ওই সকল প্রকাশ আবার ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সঙ্গীত বা ছন্দ, বাণী, রূপ বা আকার, ভাব-ভাবনা শক্তি স্পন্দন আবার অলৌকিক ভাবে অখণ্ডতা লাভ করিতেছে। যে রহস্যে নিখিল বিশ্বে বিরোধ নাই, সেই রহস্যে কবির সৃষ্টির মধ্যে সকল বিরোধের অবসান ঘটিয়াছে।

এই বিশ্ব-সত্তার বোধ কবি-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে এক একটি বিশিষ্ট দিক আশ্রয় করিয়া একান্ত রূপে প্রকাশ লাভ করিলেও অন্যান্য দিকগুলিরও অনিবার্য রূপে প্রকাশ ঘটিয়াছে। কারণ বিশ্ব-সত্তায় কোন বোধের মধ্যে একান্ত বিচ্ছেদ নাই।

এক্ষেত্রে তাই কবি-জীবনের দুইটি পর্যায়কে নিম্নতর হইতে ঊর্ধ্বতর চেতনায় বিশ্ব-সত্তার গভীর হইতে গভীরতর লোকে নিমজ্জন বা উত্তরণ বলিয়া বোধ করিলে তবেই সামগ্রিক ভাবে কবির কাব্য বিচার করা সম্ভব হইবে।

আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি, যে অমর্ত্য-চেতনা লাভের জন্য কবি যতই, যতরূপে চেষ্টা করুন-না-কেন, তিনি জাগতিক বোধকে কোনরূপে বিচলিত হইতে দেন নাই। অমর্ত্য-চেতনা লাভের সাধনায় যখনই মর্ত্য-চেতনা কিছুমাত্র বিচলিত হইতে চলিয়াছে, তখনই তিনি ওই পথ পরিহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্যের একেবারে আদি হইতে একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়, অমর্ত্য-চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কোনদিন ক্ষীণতম ভাবেও সংশয় জাগে নাই।

রবীন্দ্র-মানসে একদিকে এই অমর্ত্য-চেতনা সম্পর্কে নিঃসংশয় বোধ, অন্যদিকে জগৎ ও জীবনের পূর্ণ স্বীকৃতি,—এই উভয় ধারা একত্রে মিলিত হইয়া আছে। উভয়ের মধ্যে যে একটি মিলন তত্ত্ব আছে, এই সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। এই বিশ্বাসও কোন মুহূর্তে বিচলিত হয় নাই। এই মিলন তত্ত্বে স্থির বিশ্বাস রাখিয়া (রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহাই ভক্তি স্বরূপতা

লাভ করিয়াছে) রবীন্দ্রনাথ জীবনও জগৎকে সম্পূর্ণ রূপে মানিয়া লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন—

"জানি হে, যবে প্রভাত হবে, তোমার কৃপা-তরণী
লইবে মোরে ভব-সাগর-কিনারে।" (পরিণাম)

জীবন ও জগতের উর্ধ্বতর চেতনায় তাঁহার বিশ্বাস ছিল, কিন্তু উহার স্বরূপ সাক্ষাৎকারের কোন অনুসন্ধিৎসা তাঁহার ছিল না। এই দিক দিয়া তিনি ছিলেন ভক্তিবাদী প্রেমিক। দুইয়ের বোধ না থাকিলে যে প্রেম হয় না। তাই তিনি এমন করিয়া দুইয়ের বিরোধটিকে জাগাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রেমের পরিণাম যেখানে সেখানে এই দুই একটি রস-তত্ত্বে বিধৃত। এই রসের মিলন ভূমি না থাকিলে আবার প্রেম হয় না।

মর্ত্য এবং অমর্ত্য-চেতনার মধ্যে এই মিলনকে রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বত স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তৎ-স্বরূপতা লাভের সাধনাকে তিনি আপনার জীবনে গ্রহণ করেন নাই।

উর্ধ্বতর চেতনা লাভের জন্য কবির এই প্রয়াসের কথা ছাড়িয়া দিলে, প্রধানত যে লোকে তিনি নিমগ্ন থাকিতেন তাহা ধ্যান বা মানস-লোক। এই এক অধ্যাত্ম-সত্তা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ করিয়াছে। কবির সমগ্র কাব্য-জগৎ যে ঐক্য তত্ত্বে বিধৃত তাহা মানস বা ধ্যান-তত্ত্ব। তাহার রূপান্তরের গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার কোন উপায় আমাদের নাই ; কারণ অধ্যাত্ম-লোকের রূপান্তর লাভের মূলে যে চেতনার লীলা, তাহা দেশ-কালের উর্ধ্বতর চেতনা। এক অধ্যাত্ম সত্তার ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ কাব্য-রূপের মধ্যেও বারংবার পার্থক্য ঘটাইয়াছে।

কবির মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে ধ্যান ছিল, এ পর্যন্ত তাহার নানা রূপের পরিচয় লাভ করিয়াছি। কবি আপনার ধ্যান-লোকের অন্তহীন মাধুর্যে নিমগ্ন থাকিতেন। কখন কখন উহা চূড়ান্ত সমৃদ্ধি লাভ করিয়া কবির নিকট বিচ্ছিন্ন সত্তা রূপে অনুভূত হইয়াছে।

উহাকে বাহু বেষ্টনে লাভ করিবার জন্য তিনি স্বপ্নে তন্দ্রাবিজড়িত বিস্ফারিত নেত্রে ছুটিয়া চলিয়াছেন। সেই অপরূপ লাবণ্যময়ী রহস্য ভরা মূর্তি তাঁহাকে হাতছানি দিয়া বাস্তব জগৎ হইতে কতবার দূরে টানিয়া লইয়া গিয়াছে।

ইহা একজাতীয় বিশিষ্ট জীবন-সাধনা। এখানে সাধক আপনার ধ্যান-লোকটিকে সমগ্র সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনাকেই দ্বিধা করিয়া ভাব

বিনিময় করেন। ওই অনিন্দ্য মূর্তি এবং মানস-লোক পরস্পর সংলগ্ন হইয়া একটি শাশ্বত লীলার জগৎ সৃষ্টি করে। : কাল-প্রবাহ এ লীলা-লোক বেষ্টন করিয়া ভাঙ্গনের কলোচ্ছ্বাস তুলিয়া ছুটিয়া চলে, উহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

"ছায়ার মতন মিলায় ধরণী,
কূল নাহি পায় আশার তরণী,
মানস-প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায়
আকাশে।" (কাল্পনিক)

সীমাহীন মানস-আকাশে ওই মূর্তি আসন্ন সন্ধ্যায় অস্পষ্ট হইয়া উঠা একখণ্ড মেঘের মত। উহার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই, কিন্তু উহার সহিত মিলিত হইতে পারি না, উহা কত দূরের কোন্ দূর কালের সামগ্রী। মানুষের একদিকে দেহের বন্ধন, অন্য দিকে সৌন্দর্য ধ্যানে কী অপার মুক্তি!

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা,
মম শূন্য গগন বিহারী।" (মানস-প্রতিমা)

এই সৌন্দর্য-লোক কবির মনের সৃষ্টি। একদিকে এই আদর্শ-প্রেরণা, অন্য দিকে তাহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার প্রাণপণ প্রয়াস। এই প্রয়াসের ভিতর দিয়া ওই সৌন্দর্য্য ও আদর্শ-লোক ক্রমাগত উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে, কবির কাব্য-রূপও উহাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে চাহিয়া ক্রমাগত অপরূপ হইয়া উঠিতেছে।

"আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।" (মানস-প্রতিমা)

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বা সৌন্দর্য-সত্তা যে অসীমের জন্য বিরহ বোধ করিত তাহা তাঁহার নিকট অখণ্ড সত্তা রূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের প্রথম হইতে যে একটি সুস্পষ্ট পরিণাম ধারা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, সেই ধারাকে কবির প্রাণ-লোক হইতে ধ্যান বা মানস-লোকের ধীর জাগরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহাকেই আবার একদিক দিয়া ক্রমিক সামঞ্জস্য বা সৌন্দর্য-বোধের ধীর বিকাশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি। মুখ্যত সৌন্দর্য-বোধ আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনা ধীর বিকাশ লাভ করিয়াছে বলিয়া উহা আবার সৌন্দর্য-লোকেরই ধীর পরিণাম।

মানসীর 'অপেক্ষা' 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতা, সোনার তরীর 'মানস সুন্দরী' প্রভৃতি কবিতা, চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার 'নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা' তত্ত্ব ;—এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া এই এক সৌন্দর্য ধ্যানের বিচিত্র রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়। কোথাও ইহা সৌন্দর্য-ধ্যান মাত্রেই রহিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ইহা আরও ঊর্ধ্বতর লোকে বিগলিত হইয়া গিয়াছে।

কবির এই সৌন্দর্য-ধ্যানের একটি সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'স্বপ্ন' কবিতাটির মধ্যে। ইহা সৌন্দর্য ও প্রেমের এক অপরূপ সম্ভোগ লীলা। কবির সৌন্দর্য-ধ্যান তাহার ধীর তন্ময়তার নানা রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

জন্মান্তরীণ সৌন্দর্য-লোক বলিয়া উল্লেখ করিবার পশ্চাতে কবির আকাঙ্ক্ষা ছিল ইহাকে সর্ব দেশ-কালের সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত একাকার করিয়া দিবার।

সৌন্দর্য-প্রেমের একটি পূর্ণতার আদর্শ কোথাও আছে। সৃষ্টির আদিকাল হইতে শিল্প-কলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির ভিতর দিয়া মানুষ উহাকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিতেছে।

ব্যক্তি-চেতনার ক্রমবিকাশের দিক হইতেও ইহা সত্য। অর্থাৎ 'আমি'র একটি বিশেষ সত্তা জন্ম জন্মান্তর ধরিয়া সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া রূপ সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। আর এই রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে।

পূর্ব জন্মে সকল আনন্দ-বেদনা দিয়া, হৃদয় নিঙড়াইয়া যে ধ্যান মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছিলাম তাহা আমাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ, আমাদের সকল সৃষ্টি যাহার রূপ-ধ্যান, ইহজন্মে তাহার সহিত আর কি মিলিত হইতে পারি না ?—ভাবে, স্বপ্নে বা ধ্যানে, কোন একটা উপায়ে ? ইহজন্মের সৌন্দর্য-ধ্যানের সহিত তাহার কোন যোগ কোন স্বরূপে কি থাকে না ? ইহজন্মে কি তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায় ?

অখণ্ড সৌন্দর্য-লোক এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্য সমাজের সৌন্দর্য-ধ্যানের একটি ক্রমবিকাশ যেমন আছে, তেমনি একটি বিকাশ ব্যক্তি জীবনেও ঘটিয়া চলিতেছে। সকল সৌন্দর্য-ধ্যানের পশ্চাতে এক আদর্শ প্রেরণা আছে বলিয়া সকল যুগের রূপ সৃষ্টির মধ্যে তাই একপ্রকার আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়।

এই মূল উপলব্ধিটিকে রবীন্দ্রনাথ নানা দার্শনিক বোধের সহিত নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সমস্ত ব্যাখ্যা পরিহার করিয়া বলা যায়, যে কবি তাঁহার সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকটিকে আরও দূর কালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়া উহাকে আরও রহস্য নিবিড় আরও মায়াময়ী আরও অপ্রাপণীয় করিয়া তুলিয়াছেন। ইহা তাই কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান এবং তাহারই ধীর তন্ময় পরিণামই বটে।

এই সৌন্দর্য-ধ্যানে কবি-চিত্ত ধীরে ধীরে কেমন তন্ময় হইয়া উঠিতেছে। পরিণামে ওই সৌন্দর্য-সত্তার সহিত কবি-সত্তা একাকার হইয়া গিয়াছে। এই-রূপে সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবির চেতনা উন্নততর চেতনা স্পর্শে ধীরে ধীরে আবিষ্ট হইয়া পড়ে।

"নাহি জানি কখন কী ছলে
সুকোমল হাতখানি লুকাইল আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায় প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো, মুখখানি তার
নতবৃন্তপদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে, ব্যাকুল উদাস
নিঃশব্দে মিলিল আসি নিশ্বাসে নিশ্বাস।
রজনীর অন্ধকার
উজ্জয়িনী করি দিল লুপ্ত একাকার।" (স্বপ্ন)

কবি-চেতনা পরিণামে কেমন সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। 'রজনীর অন্ধকার' সেই আবিষ্ট মুহূর্তের পরিচয় বহন করে। তখন রূপের আর কোন বোধ থাকে না, উজ্জয়িনী অর্থাৎ রূপ-লোক অন্ধকারে একাকার হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ইন্দ্রিয়-লোকে প্রেমের প্রথম জাগরণ হইতে মানস-লোকে তাহার অতি প্রশান্ত করুণ গম্ভীর পরিণাম পর্যন্ত প্রেমের এই সমগ্র প্রকাশটিকে রবীন্দ্রনাথ 'মদন ভস্মের পূর্বে' এবং 'মদন ভস্মের পরে' কবিতা দুইটির মধ্যে রূপায়িত করিয়াছেন। দুইটি বিচ্ছিন্ন কবিতা হইলেও একটি ভাবের আদি ও অন্ত পরিণাম।

প্রেমের সেই প্রথম অনুভূতি। অন্তরের মধ্যে কেমন যেন এক অজানা পুলকের সঞ্চার। গোপনে দুয়ার রুদ্ধ করিয়া ওই বোধটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সাক্ষাৎ করিবার মধ্যে সে কী রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল। তাহার আকাঙ্ক্ষার সীমা নাই,

কিন্তু গোপনতা ভাঙ্গিয়া গেলে কোথা হইতে বিশ্বগ্রাসী লজ্জা আসিয়া তাহাকে অধোনমিত করিয়া দেয়। তাহা যেমন আকাঙ্খিত তেমনি লজ্জার।

"পঞ্চশর গোপনে লয়ে কৌতূহলে উলসি
পরখ ছলে খেলিত যুবতী।" (মদন ভস্মের পূর্বে)

প্রেমের এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বেদনা বোধ সঞ্চারিত হইয়া যায়। এই বেদনার সহিত বিজড়িত হইয়া অপর এক বিরহ জাগে। এই বেদনার পথ বাহিয়া নর-নারী ইহলোক হইতে আর কোন লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়।

"যমুনা কূলে মনের ভুলে ভাসায়ে দিয়ে গাগরি
রহিত চাহি আকুল নয়নে।" (মদন ভস্মের পূর্বে)

তখনও প্রেমের অগ্নি-শিখায় হৃদয় পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় নাই। তাহার পর ওই প্রেম মানস বা ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া চিত্ত-চিতার ভস্ম চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিয়াছে।

নিখিল বিশ্বের অন্তরালবর্তী অনন্ত বেদনা প্রবাহের প্রাণ-কেন্দ্রে যেন ব্যক্তি-প্রাণ যুক্ত হইয়া যায়। এই অনন্ত বেদনার ধারা প্রতি মুহূর্তে হৃদয়-তটে আছড়াইয়া পড়িয়া যে সুর জাগাইয়া তুলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া নর-নারীর মন কোন্ সীমাশূন্য লোকে প্রয়াণ করে তাহার নির্দেশ কে দান করিবে।

"ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে উঠে নিশ্বাসি,
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।" (মদন ভস্মের পর)

তুষার স্তূপের উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া প্রথমে তাহা দীপ্তিতে ঝলমল করে, মুহূর্তে শত বর্ণালীর প্রকাশ ঘটে। তাহার পর উহা ধীরে ধীরে বিগলিত হইয়া ধারায় ধারায় নামিয়া আসিয়া করুণ কল্লোল জাগাইয়া তুলিয়া কোন্ সাগর-বল্লভের পানে ছুটিয়া চলে।

পুরুষের প্রেমে নারী ধন্য হইতে চায়। নারীর সার্থকতম প্রকাশ যে পুরুষের প্রেম মহিমায়। পুরুষের সকল অধ্যাত্ম-পিপাসা চরিতার্থ করিবার প্রয়াসের ভিতর দিয়া নারীর রাজ রাজেশ্বরী রাজেন্দ্রাণীর প্রকাশ ঘটে। শিবের ক্ষুধিত প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্যই দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তি। পুরুষের প্রার্থনা আছে বলিয়া নারীর ঐশ্বর্য্য। পুরুষের তৃষিত প্রার্থনা বঞ্চিত নারী বন্ধ্যা। পুরুষের প্রেম লাভের জন্য তাই নারীর অমন ব্যাকুলতা।

"মোর উতলা হৃদয় তিলেক পারি নি ঢাকিতে,
সখা, তুমি রাখ ঢাকি, তুমি কর মোরে করুণা।" (মার্জনা)

এই প্রর্থনায় নারীর প্রেম যদি লাঞ্ছিত হয় তবে তাহার বেদনার আর সীমা থাকে না। হৃদয়-বৃন্তে প্রেমের অনির্বাণ শিখা আর আলোক দান না করিয়া দেহ-প্রাণ-মনকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া দেয়। যদি তাহাই ঘটে, অর্থাৎ পুরুষ যদি নারীর প্রেমকে জীবনে স্বীকার না করিতে পারে, তবে সে ওই প্রেমকে যেন পরিহাস না করে। প্রেম যে নর-নারীর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। মর্ত্যে প্রেমে ঈশ্বরীয় বোধের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ

প্রেমে তো অভিযোগ চলে না। প্রেম এমনি অসহায়। প্রত্যাখ্যানকেই তাই নীরবে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। প্রত্যাশিত প্রেমের বেদনা ভারে হৃদয় যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে তবে তাহারও একটা সান্ত্বনা কোন-না-কোন রূপে লাভ করা যায়। কিন্তু সকল গৌরব লুটাইয়া দিয়া পুরুষের কৃপা কটাক্ষ যাচ্ঞায় নারীর ইহকাল পরকাল দুই-ই যায়।

"আমি সম্বরি বাস ফিরে যাব দ্রুত চরণে"

নারীর এই প্রেমকে পুরুষ যদি অন্তরে বরণ করিয়া লয়, তবে তাহা পুরুষের সকল অধ্যাত্ম পিপাসার পরিতৃপ্তি ঘটাইতে পারে। নারীর প্রেমে এমন নিঃসীমতা আছে যাহাকে পুরুষ কোনদিন নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না। পুরুষের হৃদয়-লোকে নারী প্রেম এমনই অন্তহীন ধ্যানের লোক উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

"যবে রাণীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,—"

প্রেমে নারীর যেমন শ্রেষ্ঠ স্বরূপের প্রকাশ ঘটে, তেমনি প্রেমের মধ্য দিয়া পুরুষের জীবনে সকল অধ্যাত্ম সম্পদ লাভ ঘটে বলিয়া তাহা পুরুষের জীবনকেও ধন্য করিয়া দেয়।

নারী প্রেমে পুরুষের অন্তরে যে অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, তাহাতে অনন্তের ছায়াপাত হয়। নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া এইরূপে পুরুষ-চিত্তে অমর্ত্য-লোকের আভাস আসিয়া পৌছায়। যে পুরুষের পৌরুষ যত অধিক তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম জাগরণ তত সম্পূর্ণ হয়, অন্তরে তত অধিক পরিমাণে ঊর্ধ্বতর চেতনার ঢল নামে।

নারী-বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া এইরূপে মহামায়ার লীলা সাক্ষাৎকার ঘটে বলিয়া নারীকে মহামায়ার অংশ বলা হয়। যে মহাশক্তির প্রতিভাস স্বরূপ এই নিখিল বিশ্ব, সাধনার ভিতর দিয়া তাহাকে যেমন প্রত্যক্ষ করা যায়, তেমনি নারী-

প্রেম (নারী সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতির সংহত প্রকাশ বলিয়া) আশ্রয় করিয়াও সে মহাশক্তির স্ফুরণ ঘটে। এই জাতীয় সাধনায় নারী তাই শক্তির প্রতীক। নারীর প্রেমে পুরুষের গূঢ়তম চৈতন্য-লোকের জাগরণ ঘটে। আর সেই লেলিহান অগ্নি-শিখায় অমর্ত্য-লোকের ক্ষণে ক্ষণে ছায়াপাত ঘটিয়া যায়।

প্রেমে নর নারীর মিলন পথে যদি এমন কোন বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়, যাহাকে উভয়ের মিলিত চেষ্টাতেও অপসারিত করা সম্ভব নয়, তখন ওই চৈতন্যের অসহনীয় প্রকাশে সমস্ত দেহ মন-প্রাণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত শুষ্ক দারুখণ্ডের মত মুহূর্তে জ্বলিয়া উঠিয়া ছাই হইয়া যায়।

অধ্যাত্ম-চেতনায় নারী-বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া পুরুষের এই যে দিব্য-রূপ-সাক্ষাৎকার তাহার কোন পরিচয় নারীর ওই কয়েকটি রেখা-বন্ধনে কোথাও মিলিতে পারে না। পুরুষের অধ্যাত্ম-সত্তা নারী আপনার এই দিব্য-রূপ সাক্ষাৎ করিয়া তাই এমন বিস্ময় স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। 'চার-অধ্যায়ে'র এলা ও অতীনের উক্তি স্মরণে পড়িতেছে।

"এলা—জানিনে আমার এমন কি শক্তি ছিল।

"অতীন—তুমি কি করে জানবে? তোমাদের শক্তি তোমাদের নিজের নয়; মহামায়ার"।

নারীর এই বিস্ময় স্তম্ভিত জিজ্ঞাসার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে 'প্রণয়-প্রশ্ন' কবিতাটির মধ্যে।

"কালো কেশপাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
জীবনমরণ-বাঁধন বাহুতে মোর বাঁধা রে,
ভুবন মিলায় মোর অঞ্চলখানিতে,
বিশ্ব-নীরব মোর কণ্ঠের বাণীতে,
মোর সুকুমার ললাট ফলকে
লেখা অসীমের তত্ত্ব,
হে আমার চিরভক্ত,
এ কি সত্য?" (প্রণয় প্রশ্ন)

পুরুষের প্রেম সৌন্দর্য-স্বপ্ন মাত্র। এই সৌন্দর্য-ধ্যানটিকে সে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চায় একটি বিগ্রহের মধ্যে। নারী একথা জানে। জানে বলিয়া সে আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া মায়ার আবরণ টানে। ওই মায়াকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া পুরুষ সৌন্দর্য-জাল বুনিয়া চলে। ইহাই পুরুষের সৃষ্টি।

পুরুষের প্রেম একটি আইডিয়া মাত্র। নারী আপনার মাধুর্যে প্রেমে পুরুষের আইডিয়াকে বাস্তবের সহিত যুক্ত করিয়া রাখে।

'ভ্রষ্ট লগ্ন' কবিতাটির মধ্যে পুরুষ যে কালে প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে তাহা প্রভাত কাল। দিনের প্রখর আলোকে নারী পুরুষের চক্ষে মায়ার অঞ্জন মাখাইয়া দিতে পারে না। তখন তাহার প্রসাধনও সম্পূর্ণ হয় নাই। পুরুষের স্বপ্ন লোক বাস্তব সংস্পর্শে যে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। নারী তাই পুরুষের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারে নাই। এমনি করিয়া পুরুষের বারংবার পিপাসিত প্রার্থনা সে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

তাহার পর দিন শেষে চতুর্দিক ঘিরিয়া অন্ধকার নামিয়াছে। নির্জন গৃহে নিষ্কম্প দীপ-শিখার ক্ষীণ আলোকে, ধূপের ধোঁয়ায়, অগুরুর গন্ধে বাতাস কেমন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। চতুর্দিকের পরিবেশ কেমন মায়াময়। এই আবেষ্টনীর মধ্যে নারী পুরুষের প্রেমের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দিবার জন্য 'দূর্বা শ্যামল অঞ্চল বক্ষে টানিয়া' উৎসুক প্রতিক্ষারতা।

কিন্তু সেই পুরুষকে তো আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। ব্যর্থ প্রেমের ভার বহিয়া নারীকে সমস্ত জীবন প্রতীক্ষায় কাটাইয়া দিতে হয়।

তাহা ছাড়া পুরুষ যে কালে নারীর প্রেম যাচ্ঞা করিয়াছে, সে কালে নারীর অন্তরে প্রেমের অনুভূতি জাগে নাই। তখনি পুরুষের প্রেম পূর্ণ করিয়া দিবার মত কোন অধ্যাত্ম সম্পদ তাহার ছিল না। অন্তরের এই ঐশ্বর্য দীনতার জন্য সে পুরুষের প্রেম প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারে নাই। একান্ত প্রার্থিত যে তাহাকে বরণ করিয়া লইতে নারীর তাই সঙ্কোচ ও সাধ্বসের সীমা ছিল না। পরে নারী প্রেমের ঐশ্বর্যে মহিমময়ী হইয়া সেই সঙ্কোচ পরিহার করিয়াছে। নারী আপনার সামর্থ্য সম্পর্কে আজ সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু প্রেমের লগ্ন জীবনে একবারই আসে। সেই লগ্ন ভ্রষ্ট হইয়া গেলে তাহাকে আর ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না। নারীর জীবন তাহার পর হইতে অন্তহীন প্রতীক্ষায় পরিণত হয়। সে বেদনার বুঝি পার নাই।

"রয়েছি বিজন রাজপথপানে চাহি,
বাতায়ন তলে রয়েছি ধূলায় নামি—
ত্রিযামা যামিনী একা বসে গান গাহি,
'হতাশ পথিক, সে যে আমি, সেই আমি।" (ভ্রষ্ট লগ্ন)

মুখ্যত সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ঊর্ধ্বতর

চেতনার আভাস লাভ করিতেন বলিয়া দিব্য-চেতনা উহারই একপ্রকার সীমাহীন প্রসার রূপে অনুভূত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবন ও কাব্য-সাধনায় ইহা সত্য হইলেও এক সৎ স্বরূপ যে ধ্যান-লোকে নানা স্বরূপে উপলব্ধ হয় এই সম্পর্কে তিনি নিঃসংশয় ছিলেন। উপলব্ধির স্বরূপ সাধকের বিশিষ্ট মানস-গঠন, প্রকৃতি ও সংস্কারের উপর নির্ভর করে।

জীবনের সকল আদর্শ-প্রেরণার পশ্চাতে যে এক আদি চেতনা ক্রিয়া করে, ইহা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা ইতিপূর্বে সে পরিচয় লাভ করিয়াছি। সেই সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে কবির বিশিষ্ট সাধনা অর্থাৎ সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-লোকটি অলক্ষ্যে মুখ্য হইয়া দিব্য-চেতনাকে নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা রূপে উপলব্ধি করিয়াছে। বিশ্ব-সত্তা বলিতে রবীন্দ্রনাথ যে এই অখণ্ড সৌন্দর্য-তত্ত্বটিকে বুঝিতেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। পূর্ণ মনুষ্যত্বে সকল প্রেরণাই সত্য, কিন্তু তাহার একটি বিশেষের দিক আছে।

এই সৎ স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথের নিকট কোথাও অচিন্তনীয় শক্তির প্রবাহরূপে অনুভূত হইয়াছে। সেই সঙ্গে জীবন ও জগতের সকল পর্যায়, এই সমস্ত কিছু শক্তির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। কল্পনার মধ্যে অন্তত দুইটি কবিতায় ইহার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

যে শক্তি জীবনের সকল 'দুঃখ সুখের' সকল 'তাপ পরিতাপ', কর্ম লজ্জা ভয়ে'র অর্থাৎ মানবিক সকল বোধ মুক্ত—

"শুধু তাহা সদ্যঃস্নাত ঋজু শুভ্র মুক্ত জীবনের
জয়ধ্বনিময়।" (বর্ষশেষ)

সেই এক শক্তি বিশ্বে সংখ্যাতীত রূপ বৈচিত্র্যের মধ্যে সকল বোধের মধ্যে প্রকাশমান।

বিশ্ব-শক্তির যোগে ব্যক্তি-চেতনার প্রকাশ, তাই উহারই যোগে ব্যক্তি-চেতনার ধীর প্রসার ঘটে। পরিণামে ব্যক্তি ও বিশ্ব একাকার হইয়া যায়। ব্যক্তির সীমাবদ্ধ শক্তি বিশ্বের যোগে ধীর বিকাশ লাভ করিয়া পরিণামে সীমাহীন হইয়া পড়ে। কবি জীবনে সেই সীমাহীন শক্তির পূর্ণ প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিতে চান।

"তোমার ইঙ্গিতে যেন ঘন গূঢ় ভ্রূকুটির তলে
বিদ্যুতে প্রকাশে,
তোমার সঙ্গীত যেন গগনের শত ছিদ্রমুখে
বায়ু গর্জে আসে।" (বর্ষশেষ)

কবির অন্তরে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে ধ্যান-লোক ছিল, যে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া তিনি বাস্তব জীবনের ব্যথা-বেদনা, রূঢ়তা, মালিন্য, বঞ্চনা ও তুচ্ছতা বিস্মৃত হইতেন সেই ধ্যান-লোকটিই আজ শক্তির আধারে পরিণত হইয়াছে।

আজ সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান নিমগ্ন হইয়া নয়, শক্তির পরুষ স্পর্শে তাঁহার অন্তরের সকল অতৃপ্তি দূরীভূত হইয়া যাইবে। সৌন্দর্য তত্ত্ব নয়, আজ অপ্রমেয় বীর্য কবির অন্তরে ধ্যানের পরিব্যাপ্ত পরম গম্ভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা দান করিবে।

"তোমার বর্ষণ যেন পিপাসারে তীব্র তীক্ষ্ণ বেগে
বিদ্ধ করি হানে—
তোমার প্রশান্তি যেন সুপ্ত শ্যাম ব্যাপ্ত সুগম্ভীর
স্তব্ধ রাত্রি আনে।" (বর্ষশেষ)

একদিন কবি সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া সেই পরম তত্ত্বের আভাস লাভ করিতেন, কিংবা ওই অখণ্ড সৌন্দর্য-তত্ত্ব সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া কবির অন্তরে অনুভূত হইত।

"এবার আসনি তুমি বসন্তের আবেশ হিল্লোলে
পুষ্পদল চুমি,—" (বর্ষশেষ)

'এবার আসনি' এই স্বীকৃতির মধ্যেই ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠে যে পূর্বে ওই স্বরূপে তিনি কবির সম্মুখে আবির্ভূত হইতেন।

দেশ-কালের উভয় তট পূর্ণ করিয়া শক্তির অবিরাম প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। এই সংখ্যাতীত সৃষ্টি, অনন্ত লোক সেই স্রোতে বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। শক্তির এই অনাদ্যন্ত লীলাটিকে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

"যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথ প্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তের।" (বর্ষশেষ)

এই অনন্ত শক্তিকে কবি নিম্নতর চেতনা-লোকে প্লাবিত হইতে দেখিতে চাহিতেছেন, কারণ উহার স্পর্শে নিম্নতর সকল চেতনা বা বোধ রূপান্তরিত হইয়া যাইবে।

“উদার উদাস কণ্ঠ যাক্ ছুটে দক্ষিণে ও বামে
যাক্ নদী পার হয়ে, যাক্ চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।” (বৈশাখ)

সৌন্দর্য-তত্ত্বকে কবি একদিন ব্যক্তিগত সাধনার অঙ্গ স্বরূপেই শুধু নয়, সমগ্র মানব-জীবনে এই সাধনাকে সত্য করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এক্ষেত্রে কবি পূর্ণ জীবন সাধনার অঙ্গ স্বরূপে সৌন্দর্য-তত্ত্বের পরিবর্তে শক্তি-তত্ত্ব আশ্রয় করিতেছেন। একদিকে ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতা অন্যদিকে ‘বর্ষশেষ’, ‘বৈশাখ’ প্রভৃতি কবিতা। সামগ্রিক জীবনকে দুইটি তত্ত্বের দিক হইতে দেখিবার চেষ্টা। একটি অখণ্ড সৌন্দর্য-তত্ত্বের দিক হইতে, অন্যটি শক্তি-তত্ত্বের দিক হইতে।

“তোমার গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চল
দাও পাতি নভস্তলে, বিশাল বৈরাগ্যে আবরিয়া
জরা মৃত্যু, ক্ষুধা তৃষ্ণা, লক্ষকোটি নরনারী-হিয়া
চিন্তায় বিকল! (বৈশাখ)

জীবনের সমস্যা এক, অর্থাৎ “জরা মৃত্যু, ক্ষুধা তৃষ্ণা ও চিন্তায় বিকল লক্ষ-কোটি নর-নারীকে মুক্তি দেওয়া, এক দিব্য-সমাজে, দিব্য-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা। ইহার জন্য সমাধানের পথও এক, অর্থাৎ জাগতিক বোধ ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম বোধে প্রতিষ্ঠা লাভ। মানুষের সকল উন্নততর প্রয়াস, সকল আদর্শ প্রেরণাকে রবীন্দ্রনাথ ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভের সাধনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সৎ স্বরূপ যেখানে অখণ্ড সৌন্দর্য-তত্ত্ব রূপে অনুভূত হইয়াছে, সেখানে উহার যে-কোন প্রকাশ, উহাকে লাভ করিবার যে-কোন সাধনা, সৌন্দর্যের প্রকাশ ও সৌন্দর্য-সাধনা হইয়া উঠিয়াছে, যেখানে উহা শক্তি-তত্ত্ব রূপে অনুভূত হইয়াছে, সেখানে জীবনে ও জগতে উহার সকল প্রকাশ শক্তির প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে।

ঈশানের ঘন কৃষ্ণ পুঞ্জিত মেঘ সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দুর্বার বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। গ্রাম প্রান্তের বেণু বনে তাহারই নীল ছায়া পড়িয়াছে। তাহারই সঙ্গে বর্ষার ফলকের মত দীর্ঘ ধারায় বর্ষণ।

শ্রাবণের মেঘের মত বদ্ধ অবিরাম বর্ষণ ইহা নহে।একটি ভয়ঙ্কর প্রকাশ রূপ অন্ধ বেগে প্রান্তরের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। সেই মত্ত বেগ চতুর্দিকে ভয় ও ত্রাস সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। ধূসর পাংশুল বর্ণের মাঠের উপর দিয়া তাহারই আগে আগে আগে ধেনুদল সঙ্গে লইয়া চাষী ছুটিয়া আসিতেছে। দূর হইতে দেখা যায় নদীবক্ষে ভাসমান নৌকাগুলি দ্রুত তীরে আসিয়া পাল নামাইয়া দিতেছে। পশ্চিমে বিচ্ছিন্ন মেঘের ভিতর দিয়া অপরাহ্নের পিঙ্গল আলোক বাহির হইয়া আসিতেছে। যেন সেই বিরাট সত্তার রোষ কটাক্ষ। শূন্যলোক বিদীর্ণ করিয়া বারংবার বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে। পক্ষিকুলের মধ্যে আতঙ্কের সাড়া। উৎকণ্ঠায় মুহুর্মুহু চিৎকার করিতে করিতে তাহারা ঝাঁকে ঝাঁকে চতুর্দিকে উড়িয়া পালাইতেছে।

চতুর্দিক ব্যাপ্ত করিয়া আচ্ছন্ন করিয়া সমস্ত গগন পূর্ণ করিয়া ঘন ঘোর পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রূপে তাঁহার বিরাট আবির্ভাব। সমস্ত প্রত্যাশিত, পরিচিত জগৎকে মুহূর্তে আচ্ছন্ন করিয়া দিগ দিগন্ত ব্যাপ্ত তাঁহার মহিমময় ভয়ঙ্কর রূপের প্রকাশ। বিদ্যুৎ চমকে তাঁহারই নির্মম ইঙ্গিত। গগনের শত ছিদ্র মুখে বায়ুর গর্জনে তাঁহারই সঙ্গীত। তাঁহারই অকৃপণ বর্ষণে সকল পিপাসার অবসান। পরিব্যাপ্ত সুগম্ভীর কৃষ্ণরাত্রির মত তাঁহার অগাধ শান্তি।

সৃষ্টির মধ্যে যে শক্তি নিয়ত নির্মম ভাবে প্রাচীনকে বিনষ্ট করিয়া নিত্য নব সৃষ্টিকে সম্ভাবিত করিয়া তুলিতেছে, ইহা তাহারই একটি প্রকাশ রূপ। এই মহান ভাবের সহিত বিজড়িত হইয়া কবির চিত্তে জাগিয়াছে বিজয়ী বীর বেশে কুমার কার্তিকেয়ের রূপ। কুমারের যুদ্ধযাত্রা চিরকালের অপরাধের বিরুদ্ধে কল্যাণের অভিযানের রূপক।

আপন অন্তরে কবি এই শক্তিকেই সঞ্চারিত করিয়া দিবার জন্য সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন। নিত্যদিনের গ্লানি ও তুচ্ছতা পূর্ণ, স্বার্থ লব্ধ একান্ত সীমিত জীবনের বাহিরে যে উদার উন্মুক্ত জীবনের প্রসার তাহারই মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য কবি সেই শক্তিকেই অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহিয়াছেন।

সমুদ্যত মহৎ ভয় মহাত্রাসের উদ্দাম বেগের যে রূপটি কবি কয়েকটি রূপ কল্পনার সহায়তায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহাতে রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে চতুর্দিক ধ্বনিত করিয়া গর্বিত নির্ভীক বিজয়ী রাজের চিত্রটি কতকটা সার্থক হইলেও অন্য দুইটি চিত্ররূপ সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

রুদ্রের যে নৃত্যে নিখিল বিশ্বের সৃজন ও প্রলয়, মহাকাশে পরিব্যাপ্ত উন্মাদিনী কাল বৈশাখীর ঝঞ্ঝার মঞ্জির বাঁধিয়া যে নৃত্য, যে আনন্দ ও আতঙ্ক, যে উল্লাস ও ক্রন্দন বিজড়িত, দশদিক প্রকম্পিত অলৌকিক মহা অট্টহাস্যধ্বনি, তাহার কতটুকু প্রকাশ ঘটিয়াছে নিম্নের উদ্ধৃতি দুইটির মধ্যে !

"ছন্দে ছন্দে পদে পদে অঞ্চলের আবর্ত আঘাতে
উড়ে হোক ক্ষয়
ধূলি সম তৃণ সম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয় ।"

কিংবা

"জীর্ণ পুষ্পদল যথা ধ্বংস ভ্রংশ করি চতুর্দিকে
বাহিরায় ফল,
পুরাতন পর্ণপুট দীর্ণ করি বিকীর্ণ করিয়া
অপূর্ব আকারে—"

এই প্রসঙ্গে শেলির 'Ode to the West Wind' হইতে তিনটি চিত্ররূপ পর পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তাহাতে একদিকে কবি-কল্পনার আশ্চর্য সমুন্নতি ও প্রসারতা এবং অন্যদিকে তাহাকে মূর্ত্য করিয়া তুলিতে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

প্রথম

"Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion,
Loose clouds like earth's decaying leaves are shed,
Shook from the tangle boughs of Heaven and Ocean,
Angels of rain and lightning."

দ্বিতীয়

"—there are spread
On the blue surface of thine airy surge,
Like the bright hair uplifted from the head
Of some fierce Maenad, even from the dim verge
Of the horizon to the zenith's height
The locks of the approaching storm."

তৃতীয়

"Thou
For whose path the Atlantic's level powers

Cleave themselves into chasms, while far below
The sea-blooms and the oozy woods which wear
The sapless foliage of the ocean, know
Thy voice, and suddenly grow grey with fear
And tremble and despoil themselves"

এই সঙ্গে প্রাচীনতম সাহিত্যের নিদর্শন ঋগ্বেদ হইতে মরুতের সূক্তগুলির বিচ্ছিন্ন কয়েকটি অংশ একত্র করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উপমার সূক্ষ্মতা হয়ত লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে না, আধুনিক গীতি কবিতার যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ, কিন্তু তাহার যে মহিমা, অবাধ অপ্রতিহত গতি, ভয়াল রূপ, আবার সেই সঙ্গে অপার করুণা, অজস্র দাক্ষিণ্যের যে সামগ্রিক চিত্রটি অঙ্কিত করা হইয়াছে তাহার তুলনা বিশ্ব সাহিত্যেও দুর্লভ। ইহাও অনস্বীকার্য যে, উপমার সূক্ষ্মতা এই ভয়াল সুন্দরের, নিষ্করুণ-করুণার, কঠিন-কোমলের সামগ্রিক রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার পক্ষে আদৌ অনুকূল নয়। কবি-কল্পনার সমুন্নতি, চিত্রধর্মিতা আমাদের আধুনিক চিত্তে বিস্ময় উদ্রেক করে।

"তাহারা তাহাদের যাত্রাপথের সম্মুখে জলভারাক্রান্ত মেঘকে তাড়না করে। মরুৎ যে পথ দিয়া গমন করে সে পথকে নিনাদ পূর্ণ করে, সকলে তাহাদের শব্দ শুনিতে পায়। গাভী যেমন করিয়া তাহার বৎসকে ডাকে, বিদ্যুৎ তেমনিভাবে গর্জন করিয়া উঠে এবং তাহার জন্য মরুৎ জলধারাকে বর্ষণ করিয়া দেয়। জলভারাক্রান্ত মেঘের দ্বারা তাহারা দিবাভাগের উপর অন্ধকার পরিব্যাপ্ত করিয়া দেয় এবং তাহার পর পৃথিবীকে অজেয় করাইয়া তুলে। দিক্‌মুখীন মরুৎগণ তোমরা অচল সমস্ত কিছুকে ভগ্ন কর, যাহা গুরুভার তাহাকে বিকীর্ণ কর, তাহার পর অরণ্যের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লও এবং পর্বতমালাকে কলুষিত কর। তাহারা পর্বতমালাকে কম্পিত করে, অরণ্য বৃক্ষগুলিকে দূরে নিক্ষেপ করে, দিব্য মরুৎগণ তোমাদের সন্তান সন্ততিদের সহিত স্বেচ্ছামত ধাবিত হও। বিপুল প্রজ্ঞাবান, জ্যোতির্ময়, পর্বতের ন্যায় সুদৃঢ় এবং দ্রুতগতিশীল, তোমরা মাতঙ্গের ন্যায় যখন তোমাদের লোহিত বর্ণের অশ্বতে শক্তি সঞ্চার কর, তখন বনভূমি দলিত হয়। মরুৎগণ তোমরা (আকাশের) নির্দিষ্ট পথে পক্ষিকূলের ন্যায় বিচরণ করিয়া যখন অন্তরীক্ষের নিকটতম স্থান হইতে সঞ্চরমান মেঘদল সংগ্রহ কর, তখন তাহারা তোমাদের রথের সহিত সংঘর্ষে জল বর্ষণ করে, তাই তোমরা তোমাদের উপাসকদের উপর মধুবর্ণের

ধারা বর্ষণ কর। সৎ কর্মের জন্য যখন তাহারা মেঘদলকে মিলিত করে, তখন তাহাদের প্রচণ্ড গতি চাঞ্চল্যে ধরিত্রী প্রোষিত ভর্তৃকার ন্যায় কম্পান্বিতা হয়; ক্রীড়ারত, অস্থির, উজ্জ্বল অস্ত্রে শস্ত্রে ভূষিত এবং স্থির পর্বতকে অস্থির করিয়া তাহারা তাহাদের নিহিত শক্তিকে প্রকাশ করে। মেঘ বিকীর্ণকারীর সঙ্গিনী, রোদসি, বিস্রস্ত কেশ কলাপের দ্বারা এবং আপনার প্রভুগণের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তাহাদের সঙ্গিনী হইবার জন্য প্রেম যাচ্ঞা করে। উজ্জ্বল আকৃতি বিশিষ্টা সে চঞ্চল মরুৎগণের রথে আরোহণ করিয়াছে, সূর্য যেমন করিয়া অশ্বিনীদের রথে আরোহণ করে এবং সূর্যের গতি বিশিষ্টা হইয়া এখানে আগমন করে। মরুৎ (যখন তোমরা আগমন কর, তখন) বিরাট বিশ্বের সীমা থাকে না। যে স্থান হইতে তোমরা আগমন কর তাহার আরম্ভ কোথায়; তোমরা ঘন বাষ্পকে লঘু তৃণের মত বিকীর্ণ কর, এবং বস্ত্রের দ্বারা জলভারাক্রান্ত উজ্জ্বল মেঘকে নিম্নে তাড়ন কর। যখন তাহারা মেঘের গর্জন ঘোষিত করে তখন বজ্রের দ্বারা নদীগুলি বাধিত হয়; কিন্তু যখন মরুৎ মর্ত্যের উপর বারি বর্ষণ করে তখন সৌদামিনী অন্তরীক্ষে হাসিতে থাকে। মরুৎগণ, তোমরা বিচরণ করিলে অবারিত জ্যোতির স্বর্গ আন্দোলিত হয়, উজ্জ্বল জলকে চঞ্চল কর; যখন তোমরা তোমাদের শক্তিকে মিলিত কর, উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হও এবং যখন নিম্নে জল প্রেরণ করিতে চাও তখন গম্ভীর নির্ঘোষ করিতে থাক।

পর্বত বিপুল ও উন্নত হইলেও তোমাদের গর্জনে ভীতত্রস্ত হয় এবং তরবারি ভূষিত মরুৎগণ তোমরা যখন ক্রীড়া কর, তখন অন্তরীক্ষের শীর্ষদেশ কম্পিত হইতে থাকে; তোমরা একত্রে জলের মত দ্রুতগতিতে ধাবিত হও। এখনও অপ্রকাশিত মরুৎগণ, আপন দলবলকে সজ্জিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ হংসদলের ন্যায় অবতরণ কর। তোমাদের আগমনে, তোমাদের বিপুল শক্তি ধারণ করিবার জন্য পর্বত প্রতিরুদ্ধ হয়, নদীমালা দমিত হয়। সূর্যের পরিভ্রমণের জন্য তাহারা তাহাদের শক্তি দিয়া জ্যোতিপথ উন্মুক্ত করিয়াছে, তাহারা জ্যোতির দ্বারা বিশ্বকে পরিব্যাপ্ত করিয়াছে। মরুৎগণ ঊষার দ্বারা মহিমান্বিত হও, বহুদূর হইতে যখন তোমরা উন্মুক্ত সজল অন্তরীক্ষে আগমন কর, তখন স্বর্গলোকের অধিবাসীদের ন্যায় মর্ত্যবাসীরা ভয়ে আর্তনাদ করিতে থাকে। মরুৎগণ, তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়া আকাশ অন্তরীক্ষকে পরিহার করিয়া ঊর্ধ্বে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে।"

মানব জীবনের গভীরতম দুঃখ, সান্ত্বনাহীন ক্ষোভ এই যে তাহাকে একদিন

স্নেহ-প্রীতি পরিপূর্ণ মর্ত্য-লোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইতে হয় যাহাদের প্রাণের অধিক ভালবাসিয়া এই জীবন ও জগৎ অপরূপ, পরম দুর্লভ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, একে একে তাহারাই বা কোথায় হারাইয়া যায় আমরাই বা কোথায়।

একটি সম্পূর্ণ জীবনের বিনাশ তো শুধু নয়, এই জীবনের কত দুর্লভতম পর্যায়, কত আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত আমরা পার হইয়া আসি, উহাদিগকে চিরকালের জন্য ধরিয়া রাখিতে পারি না। তাহার সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ, তাহার পরিপূর্ণ যৌবন, যাহা এই সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে একপ্রকার সীমাহীন ব্যাপ্তি দান দরে, তাহার জীবন-গ্রন্থের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। মহাকাল জীবন-গ্রন্থের এক-একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া কাল-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিতেছেন, উহারা স্রোতে মুহূর্তের জন্য আবির্ভূত হইয়া হারাইয়া যাইতেছে।

'বসন্ত' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই মর্মান্তিক ব্যাকুলতার একটি সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়াছেন।

দেশ-কালের বুকে অসীম প্রাণ-ধারায় কত প্রাণ জাগিতেছে, আবার ওই প্রাণধারায় একাকার হইয়া যাইতেছে। তাহাদের অপরিতৃপ্ত আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ সমস্ত কিছু ওই প্রাণ-লোকে একাকার হইয়া যাইতেছে। তাই প্রাণের উপলব্ধির মধ্যে মানুষ অনন্ত বেদনার নিপীড়ন বোধ করে। শাশ্বত প্রাণ তত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ এই রূপে শাশ্বত একটি স্মৃতি বা বেদনা তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। প্রাণের নিত্য নূতন প্রকাশে অতীত সকল স্মৃতি ও বেদনাও নিত্য নূতন রূপে প্রকাশ পায়। এই স্মৃতি বা বেদনা তত্ত্বকে বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্বের সহিত যেমন বিজড়িত করা সম্ভব, তেমনি ব্যক্তি তত্ত্বের সহিত উহাকে বিজড়িত করা সম্ভব, অর্থাৎ মৃত্যুতে এই জীবনের সকল স্মৃতি রহিয়া যায়। পরজন্মে নূতন প্রাণ-রূপ পরিগ্রহ করিয়া এই স্মৃতিই আবার ফিরিয়া আসে। নূতন অনুভূতির সহিত অতীত কত-না জীবনের স্মৃতি জাগ্রত হইয়া চিত্তকে তাই ব্যাকুল করিয়া তুলে। জন্ম জন্মান্তরের ভিতর দিয়া এই স্মৃতি-লোকটি পরিপুষ্ট হইয়া চলিয়াছে। মানব জীবনের সেই চিরন্তন হাহাকার বিজড়িত জিজ্ঞাসা—

"আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা,
তোমার কুসুমগুলি হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা ?" (বসন্ত)

প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের বিনাশ নাই বলিয়া মানব-জীবনের পরম অনুভূতির এই কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্তও অবিনশ্বর। প্রাণের সহিত বিজড়িত হইয়া সেই অনুভূতিও যুগে যুগে প্রকাশ লাভ করিবে। রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে প্রাণ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া জীবনের সর্বশেষ জিজ্ঞাসার উত্তর অনুসন্ধান করিয়াছেন।

"ব্যর্থ জীবনের সেই কয়খানি পরম অধ্যায়,
ওগো মধুমাস
তোমার কুসুমগন্ধে বর্ষে বর্ষে শূন্যে জলে স্থলে
হইবে প্রকাশ।" (বসন্ত)

একথা হয়ত সত্য, জীবনের হাহাকার তো এইজন্য নয়। প্রাণ এই বিশেষ রূপাধারের বিশেষ অনুভূতিটিকে লাভ করিতে চায়। মৃত্যুতে ওই বিশেষ রূপটি যেমন, উপলব্ধির ওই বিশেষ প্রকাশটিকেও তেমনি ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

যে তত্ত্ব লাভ করিলে জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে, প্রাণের নিত্য ব্যাকুলতার নিরসন হয়, তাহা লাভ করিতে হয় প্রাণের উর্ধ্বে এমনকি মনের সীমাকেও ছাড়াইয়া উঠিয়া। 'বর্ষশেষ' কবিতাটির মধ্যে কবির যে আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, কবির জীবনে সে আকাঙ্ক্ষা কোথাও কোথাও চরিতার্থ হইয়াছে।

"জল স্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামি
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।" (অনবচ্ছিন্ন আমি)

কল্পনা কাব্যে দেশাত্মবোধক অনেকগুলি কবিতা আছে। কবিতাগুলি আলোচনা করিবার পূর্বে ইহার একটু ধারানুসারিতা প্রয়োজন।

মানসী কাব্যের মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে যেগুলির ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের একটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হইতেই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

নির্বিচার দেশের প্রতি শ্রদ্ধাকে জাগ্রত করিয়া তুলিবার চেষ্টাকে যদি দেশাত্মবোধ আখ্যা দান করা যায়, তবে মানসীর এই শ্রেণীর কবিতাগুলিকে ঠিক দেশাত্মবোধক কবিতা বলা যায় না।

প্রত্যেক জাতির পৃথক ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করিবার মত যে উন্নত উদার মনোবৃত্তির প্রয়োজন আমাদের মধ্যে সেই মনোবৃত্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে যদি এমন কোন দিক থাকে যাহা পর

জাতির ধর্ম সাধনা সম্পর্কে অসহিষ্ণু করিয়া তুলে, তাহার মর্মগত চিরন্তন সত্যকে উপলব্ধি করিতে বাধা দেয়, তবে আমাদের ধর্ম সাধনার সেই দিকগুলিকে অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।

ভারতীয় ধর্মের একটি চিরন্তন সত্যকে আবিষ্কার করিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। ধর্মাচরণকে মানুষে মানুষে আপেক্ষিক করিয়া তুলিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া বিচিত্র কুসংস্কার ও অপরাধকে লালন করিবার যে চেষ্টা আমাদের ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। এই মনোভাব সমগ্র মানব সমাজের বিকাশধর্মের বিরোধী। সমাজের স্থিতিশীল রূপটিকে আশ্রয় করিয়া রাখিবার ইহা একটি গোপন প্রয়াস মাত্র। ধর্ম প্রচারের মধ্যে মূল এই ধারণাটিকে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই দেশীয় বিচিত্র কুপ্রথার বিরুদ্ধে তিনি নিয়ত নিষ্ঠুর সংগ্রাম করিয়াছেন। 'নব দম্পতীর প্রেমালাপ' তাহারই একটি নিদর্শন।

ইংরেজি শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে যে প্রথম একপ্রকার দেশাত্মবোধ দেখা দেয় রবীন্দ্রনাথ তাহার স্বরূপ বিচার করিয়াছেন 'বঙ্গবীর' কবিতার মধ্যে। আমরা ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাস প্রভৃতি পাঠের ভিতর দিয়া আর যাহা পাই না কেন, তাহার মধ্যে দেশের পরিচয় কোথাও নাই। অতীত ভারতের ঐতিহ্য হইতে যে কারণেই হোক আমাদের বর্তমান সমাজ বহুদূরে সরিয়া আসিয়াছে। একপ্রকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় অতীত ভারতের ঐতিহ্যের গর্বে বিভোর না হইয়া বর্তমান সমাজকে তাহার ত্রুটি ও দুর্বলতা সমেত স্বীকার করিয়া তাহাকে সর্বাঙ্গীন সমৃদ্ধশালী সমাজে পরিণত করিতে হইবে। ইহার জন্য বিচ্ছিন্ন যোগ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায় কোন ফল হইবে না। সহস্র বৎসরের নিশ্চেষ্টতার কালে সমগ্র বিশ্বে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে, আজ সেই পরিবর্তিত বিচিত্র সংস্কৃতি চতুর্দিক হইতে নানাভাবে আমাদের সমাজের উপর আঘাত রূপে আসিয়া পড়িতেছে। তাহারই বহু বিচিত্র জটিল আন্দোলন ও আলোড়নের ভিতর দিয়া এক নূতন সমাজ জন্মলাভ করিবে। আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রাচীন ঐতিহ্যের গর্ব যে কতদূর হাস্যকর তাহা বঙ্গবীর কবিতার প্রত্যেক ছত্রের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

আমাদের দেশাত্মবোধের মধ্যে দেশের প্রধান অংশই ছিল অস্বীকৃত। দেশ বলিতে আমরা বুঝিতাম মুষ্টিমেয় কয়েকজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষকে।

দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টা বলিতে আমরা শাসকবর্গের কাছে আবেদন পত্র পেশ করা বুঝিতাম।

দেশ বলিতে রবীন্দ্রনাথ দেশের বিপুল জনসাধারণকে বুঝিতেন। তাহাদের সহিত সর্বাঙ্গীন মিলন বোধের ভিতর দিয়া আমরা দেশকে আমাদের মধ্যে ফিরিয়া লাভ করিব। ইংরেজের হাত দিয়া দেশকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। উপায় যদি থাকেও তাহাতে শাসনাধিকার ইংরেজ মনোবৃত্তি সম্পন্ন আর একদল লোকের হাতে আসিয়া পড়িবে মাত্র। স্বরূপগত পার্থক্য কিছুই ঘটিবে না।

দেশকে উদ্ধার করিবার অর্থ হইল দেশের প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের বোধটিকে জাগ্রত করিয়া তোলা। তাহার জন্য সুদীর্ঘ কালের নীরব অনবরত আত্মত্যাগ প্রয়োজন। ইহা ওজস্বিনী বক্তৃতার সুলভ পদ্ধতি নয়। বিশ্বের যে সকল জাতি বর্তমানে সমৃদ্ধির উচ্চ শিখরে উঠিয়াছে সেই সকল ক্ষেত্রেই আছে জাতির সুদীর্ঘ কালের নিয়ত কঠোর প্রয়াস, দুশ্চর সাধনা। বড় কোন কিছুকে লাভ করিবার সুলভ পদ্ধতি নাই।

বৃহৎ মানব সংসারের মাঝখানে যেখানে দুঃখের হোমানল জ্বলিতেছে সেখানে জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিবার যে তীব্র ব্যাকুলতা তিনি নিয়ত বোধ করিতেন তাহার পরিচয় লাভ করা যায় 'দুরন্ত আশা' কবিতাটির মধ্যে।

এই কর্মের বেগ বাহিরের সমাজ হইতে তাহার অন্তরে আসিয়া পৌছায় নাই। সে সমাজ ছিল বিচিত্র আচার পালিত, নিশ্চেষ্ট। এই পূর্ণতার আদর্শ এবং আদর্শমুখীন অফুরন্ত কর্মশক্তি কবি আপনার অন্তরে ঈশ্বরীয় করুণা রূপে লাভ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষগণের আদর্শ ও কর্ম প্রেরণা এমনি অভ্রান্ত, অপরিমিত হইয়াই থাকে।

চিত্রার 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটি ঠিক এই অর্থে দেশাত্মমূলক কবিতা নয়। এদেশের যে অধিকাংশ মানুষ দুঃখ-দুর্দশা বিজড়িত, অজ্ঞানও অশিক্ষার মধ্যে নিমগ্ন মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিচিত্র ত্রাসে ত্রস্ত তাঁহার দৃষ্টি তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও তিনি জানিতেন এই শ্রেণীর লাঞ্ছিত মনুষ্যত্ব সকল দেশেই কম বেশি আছে। বর্তমান কবিতায় সেই সকল দেশের লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের কথাই আছে। ইহাদের পূর্ণ মনুষ্যত্বে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে উপায় তাহা সকল দেশেই এক। যুগে যুগে বিচিত্র

সাধনার ভিতর দিয়া সকল দেশ যে লক্ষ্যাভিমুখীন হইয়া চলিয়াছে তাহার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নাই। সকল জাতির অধ্যাত্ম-ধর্ম-দর্শন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র সাধন-ধারা সেই এক লক্ষ্যাভিমুখীন হইয়া চলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ইহার পর হইতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তাবোধ দুইটি সুস্পষ্ট ধারায় পাশাপাশি বহিয়া গিয়াছে লক্ষ্য করা যায়।

'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতার মধ্যে কবি যে দেশকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সে দেশের একদিকে আছে স্নিগ্ধ শ্যামল প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য, আর অন্যদিকে আছে সেই অগণিত জনসাধারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যাহারা দুঃখ-সুখের একান্ত সঙ্কীর্ণ এক সীমার মধ্যে নীরবে নিয়ত কাজ করিয়া যাইতেছে, যাহারা প্রকৃতির মাঝখানে মাটির একান্ত নিকটে জন্মিয়া আবার মাটিতেই বিলীন হইয়া যায়।

আমরা এই মাকেই কি গৃহে গৃহে প্রত্যক্ষ করি না, যিনি সেবা, আত্মত্যাগ, বিচিত্র দুঃখ ভোগ এবং নিয়ত কর্মের বিনিময়ে হত মনুষ্যত্ব পুত্রের নিকট হইতে বিচিত্র লাঞ্ছনা ও অসম্মান লাভ করিয়া থাকেন। মায়ের তাহাতে কোন অভিমান নাই। তিনি পুত্রের মধ্যে প্রাণ ও মনুষ্যত্ব সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য ঈশ্বরের নিকট কেবল অশ্রুজলে প্রার্থনা করেন।

বঙ্গমাতার এই মূর্তি কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—

"রয়েছ মা, ভুলি।
তোমার শ্রী অঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্য ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাট শোভা সীমন্ত রতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।"

মাতৃমূর্তির ধ্যানের মধ্যে এমন একটি করুণ শান্ত শ্রী পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, কবি প্রাণের এমন একটি অকৃত্রিম স্বতোৎসারিত ভক্তি, যে তাহা আমাদের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশকে পর্যন্ত স্পর্শ করে। আমাদের গৃহাভ্যন্তরের মাতার প্রকাশ-রূপটিই সমগ্র দেশের উপর আপনার বিরাট ছায়া বিস্তার করিয়া দেশ-মাতৃকায় রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিরকাল কবির প্রাণ-মনকে ভুলাইয়াছে। সেই সকল সৌন্দর্য-স্মৃতি দিয়া তিনি মাতৃমূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাহা

বাস্তব মালিণ্য মুক্ত এক জ্যোতির্ময় রূপ সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট বাস্তব প্রকৃতির সৌন্দর্যের সহিত এমন ভাবে বিজড়িত যে কোন এক অরূপতত্ত্বে বা অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক বোধের মধ্যে হারাইয়া যায় নাই। আমরা কবির 'শরৎ' কবিতার কথা বলিতেছি।

যুগ যুগ বঞ্চিত মনুষ্যত্বের মধ্যে যে দেশ সুপ্ত হইয়া আছে, দেশকে যে একমাত্র তাহার মধ্যেই আমাদের ফিরিয়া লাভ করিতে হইবে। দেশ যে আর কোথাও নাই, তাহাকে লাভ করিবার আর যে কোন উপায়ও নাই, তাহা কবি ফিরিয়া ফিরিয়া নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। 'মাতার আহ্বান', 'সে আমার জননীরে' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবির এই ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়াছে।

'ভারতলক্ষ্মী' কবিতাটির মধ্যে কবি ভৌগোলিক ভারতবর্ষের প্রকৃতি মাধুর্য ও মহিমার কথা যেমন বলিয়াছেন. তেমনি তিনি তাহার বিচিত্র ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প সাধনার সমুন্নতির কথাও বলিয়াছেন। ইহার অত্যন্ত সংহত, প্রকাশভঙ্গী, শব্দ সঞ্চয়নে ও বিন্যাসে আশ্চর্য দক্ষতা কবিতাটিকে নিঃসন্দেহে বিশ্বের প্রথম পর্যায়ের দেশাত্মমূলক কবিতার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

এই যে মাতৃমূর্তির অনুধ্যান তাহা 'বঙ্গলক্ষ্মী' হউন অথবা 'ভারতলক্ষ্মী' হউন তাঁহার সহিত তিনি পৌরাণিক মাতৃ-সাধনা প্রসূত বিচিত্র অধ্যাত্মিক সত্যকে কোথাও বিজড়িত করিবার চেষ্টা করেন নাই। মিস্টিসিজ্‌ম্ বলিতে যাহা বুঝায় এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে তাহার কোন প্রকাশ নাই। তাহার দেশাত্মবোধের রূপ যুক্তি ও বিচারবোধের সীমাকে কোথাও অতিক্রম করিয়া যায় নাই। সেই জাতীয় প্রেরণাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছেন।

নৈবেদ্যের মধ্যে কতকগুলি কবিতা আছে যেগুলি ঠিক দেশাত্মবোধক কবিতা নয়। কবিতাগুলির ভিতর দিয়া তিনি ভারতবর্ষের চিরন্তন আধ্যাত্মিক প্রকৃতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছেন।

এই দিক দিয়া উৎসর্গের ষোল সংখ্যক কবিতাটির একটি নিহিত গভীর তাৎপর্য আছে।

বিশ্বের সর্বত্র অন্যান্য সকল সাধনার সহিত ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার একটি দিক আছে। সেই সকল ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার একটি সামগ্রিক রূপ লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবির নিকট বিশ্বাত্মা ও স্বদেশাত্মা এক হইয়া গিয়াছে। স্বদেশ কবির অনুভূতির গভীরতায় বিশ্বে পরিণত হইয়াছে।

কবির আন্তর্জাতীয়তা বোধ সম্পর্কে আমাদের অনেকের একটি ভ্রান্ত ধারণা আছে; তাহা এই যে, তিনি আন্তর্জাতীয়তা বলিতে সকল দেশ ও সকল জাতির সংস্কৃতির উত্তম ভাগগুলির একটি সামগ্রিক প্রকাশরূপ বুঝিতেন। বস্তুত তাহা যে সত্য নয়, তাহার যে মূল রহিয়াছে দেশাত্মবোধের মধ্যে তাহা এই জাতীয় কবিতা পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন।

"হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
ললাট তোমার নীল নভতল
বিমল আলোকে চির উজ্জ্বল
নীরব আশিস সম হিমাচল
তব বরাভয় কর,
সাগর তোমার পরশি চরণ
পদধূলি সদা করিছে হরণ,
জাহ্নবী তব হার আভরণ
দুলিছে বক্ষ'পর।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছ ওগো বিশ্ব দেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে।"

এই প্রসঙ্গে উৎসর্গের সংযোজন অংশে বারো এবং তেরো সংখ্যক কবিতা দুইটিও পাঠ করা যাইতে পারে।

গীতাঞ্জলির একশত ছয় সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে কবি ভারতীয় সংস্কৃতির যে বিশ্বজনীন রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহার ভিতর দিয়া ঈশ্বরের যে একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় চরিতার্থ হইয়া চলিয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষ একদিন বিশ্বের সকল জাতির সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আপনার মধ্যে স্থান দান করিতে পারে। আবার তাহা বিশ্বের বহু বিচিত্র জাতির সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কিছু-না-কিছু আপনার মূল সাধন ধারার সহিত সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ

করিয়া লইয়াছে। কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপী ভারত-ইতিহাসের মূল এই দুইটি ধারা। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ হইলেও ভারতবর্ষ এইরূপে বিশ্ব সভ্যতার প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। এইরূপে রবীন্দ্রনাথের নিকট জাতীয়তা আন্তর্জাতীয়তায় পরিণত হইয়াছে।

তাহার পর গীতাঞ্জলির একশত আট সংখ্যক কবিতাটি। কবিতাটির মধ্যে তাঁহার ইতিপূর্বে অনুভূত একটি মূল ভাবের সার্থক প্রকাশ ঘটিয়াছে। দেশকে যে আপনার মধ্যে খুঁজিয়া লাভ করিতে হইবে এবং তাহা লাভ করিতে পারা যাইবে একমাত্র এই দেশীয় সমাজের মধ্যে একটি পূর্ণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার দ্বারা এবং তাহা না হইলে দেশ যে ধীরে ধীরে হীনবল হইয়া একদিন চরম বিনষ্টির সম্মুখীন হইবে এই সম্পর্কে কবির মনে কোন সংশয় ছিল না।

এই প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলির একশত সাত এবং একশত উনিশ সংখ্যক কবিতা দুইটি পাঠ করা যাইতে পারে। কবিতা দুইটি ঠিক দেশাত্মবোধক কবিতা না হইলেও তাঁহার দেশাত্মবোধের পশ্চাতে যে পূর্ণ জীবনের উপলব্ধি, যে সামগ্রিক জীবন-দর্শন ক্রিয়া করিয়াছে তাহার একটি পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

পরিশেষে 'আরোগ্যের' দুইটি কবিতা আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

দশ সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে যে দেশবন্দনা আছে তাহা সম্পূর্ণ মানবিক। যে মনুষ্য সমাজ নীরবে নিয়ত কেবল বিচিত্র সৃষ্টিকর্মে নিরত, যাহাদের দুঃখ, দারিদ্র্য ও লাঞ্ছনার উপর দেশের সকল শ্রী ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত সেই অতি বিপুল অবহেলিত মনুষ্য সমাজের মধ্যে তিনি ঈশ্বরের চিন্ময় রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহারই প্রতি আপনার শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়াছেন।

আরোগ্যের চার সংখ্যক কবিতাটি অত্যন্ত কুণ্ঠার সহিত উল্লেখ করিতেছি, কারণ কবিতাটি পাঠক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। এই জাতীয় অনেকগুলি কবিতা গ্রন্থটির মধ্যে আছে। তাহাদের মূল ভাব-প্রেরণা একই।

ভৌগোলিক ও মানবিক ভারতবর্ষের যে রূপটিকে তিনি এখানে ধ্যান করিয়াছেন তাহা তাঁহার ইতিপূর্বের স্বদেশাত্মার ধ্যান হইতে যে পৃথক তাহা স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র ভূখণ্ডকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে একদিকে পদ্মা এবং অন্যদিকে গঙ্গা। এই উভয় নদীর তীর ধরিয়া যুগে যুগে ভারতবর্ষে কত

নগর, কত রাজ্য, কত যুদ্ধ, কত বিপর্যয় না ঘটিয়াছে, ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার কত বিচিত্র স্মৃতি এই দুইটি নদীর কলধারায় বিজড়িত হইয়া আছে। কবি এই দুইটি নদীকে আশ্রয় করিয়া ভারতবর্ষীয় এই সংস্কৃতির সেই বিপুল বৈচিত্র্যপূর্ণ দিকটিকে কিন্তু আদৌ উদ্ঘাটিত করেন নাই।

এই দুইটি নদী ভারতের যে সংখ্যাতীত গ্রামকে গাঁথিয়া গাঁথিয়া চলিয়াছে, নদী দুইটির সহিত বিজড়িত হইয়া সেই অগণিত গ্রাম জীবনের যে কর্ম-ধারা, একান্ত তুচ্ছ, সাধারণ, কবি তাহারই একটি সামগ্রিক বিরাট রূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

ইহাই ছিল রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ধ্যানের ভারতবর্ষ।

ক্ষণিকা

কল্পনা আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা কবির মানস-লোকের বহু বিচিত্র বিলাস এবং উহারও উন্নততর পরিণাম লাভের নানা প্রয়াসের পরিচয় লাভ করিয়াছি। সেই অত্যুচ্চ ভাব-লোক হইতে কবি ক্ষণিকায় একান্ত প্রাণ-লোকে এমনকি আরও নিম্নতর লোকে নামিয়া আসিয়াছেন। জীবনের সর্ববিধ নিয়তি নিয়মের মূলে যে হৃদয়, কবি একেবারে সেই হৃদয়কেই উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হৃদয়বোধকে এইরূপে সাময়িক ভাবে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারা যায়, বিশেষ করিয়া সেই প্রয়াস যদি হয় সচেতন ভাবে লীলা-রস আস্বাদের জন্য। কবি তাহাই করিয়াছেন।

হৃদয়বোধ এবং উহার সহিত বিজড়িত জীবের সকল দশা ও নিয়তি-নিয়মকে অস্বীকার করিয়া কবি এই কালে একটি জীবন-দর্শনও গড়িয়া তুলিয়াছেন। চেতনার যে-কোন পর্যায়ে তদাশ্রয়ী একটি বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার থাকে। এই সাক্ষাৎকারই জীবন-দর্শন। এই দর্শন-ভূমির উপর দাঁড়াইয়া মানুষ সমগ্র জীবন ও জগতের মূল্য নিরূপণ ও স্বরূপ নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করে।

হৃদয় নিরুদ্ধ অবস্থায় কবি দীর্ঘকাল থাকিতে পারেন নাই। ধীরে ধীরে প্রাণ-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, সেইসঙ্গে অন্তহীন বেদনা-প্রবাহ কবির হৃদয়-তটে আছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বেদনার সমুদ্র পার হইয়া কবি আবার সীমাহীন ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

মানস-লোকে প্রাণের বিক্ষোভ জয় করিয়া উঠিবার সার্থক চেষ্টা কবির জীবনে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার অর্থ হৃদয় নিরুদ্ধ করা নয়, নিয়ন্ত্রণ করা ; এবং এই নিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়া পরিণামে উহার উর্ধ্বে উঠিয়া যাওয়া।

ক্ষণিকার মধ্যে কবি হৃদয় নিরুদ্ধ করিয়া জীবনের সকল সমস্যাকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন, যেন এমন করিয়া জীবনের সকল সমস্যার সমাধান লাভ ঘটে।

জীবনের এই যে বিশিষ্ট সাক্ষাৎকার তাহা অত্যুচ্চ ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া নয়, (সুসমালোচক অজিত চক্রবর্তীর প্রচেষ্টার কথা পাঠকবর্গের স্মরণে পড়িবে। ক্ষণিকার মূল ভাবপ্রেরণা সম্পর্কে তাঁহার অভিমতকে আমি কেন যে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছি, তাহার বিস্তারিত পরিচয় এই আলোচনার মধ্যে লাভ

করিতে পারা যাইবে।) পরন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত; অর্থাৎ সকল রস পরিণাম শূন্য, সার্থকতা হীন, হৃদয় নিরুদ্ধ সাক্ষাৎকার।

আমি ক্ষণিকা হইতে সর্বাগ্রে দুই একটি কবিতার উল্লেখ করিব তাহাতে কবির এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের পশ্চাৎ প্রেরণা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

"ব্যথা পাছে না পাও তুমি
লুকিয়ে রাখি তাই
নিজের ব্যথাটাই।" (ভীরুতা)

'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যে কবি-প্রাণের সেই অফুরন্ত উৎসারণা এবং বিশ্ব-প্রাণধারার সহিত মিলন লাভের বিচিত্র প্রয়াস প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আজ কবি সেই প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিতে চান নাই; কারণ যৌবনের যে পূর্ণ বিকশিত, সামর্থ্য যুক্ত ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ওই আবেগ নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং উহার অসহনীয় আনন্দ-বেদনার বিষামৃত লীলা আস্বাদ করিতে পারা যায়, কবির সেই যৌবন প্রায় অবসিত হইতে চলিয়াছে। সেই পূর্ণ প্রাণের প্রকাশে তাঁহার দেহ আজ জীর্ণ তরীর মত শতধা হইয়া কোন্ অতলে তলাইয়া যাইবে।

অবসিত যৌবনে প্রাণ-ধারা যখন বিশুষ্ক হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য যখন কমিয়া আসে, তখন প্রকৃতির মধ্য হইতেই প্রাণের লীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার একটা আহ্বান আসে।

মানুষকে তখন ধ্যান-লোকটিকেই একান্ত করিয়া আশ্রয় করিতে হয়। এই ধ্যান-লোকটিকেও ছাড়াইয়া মানুষ এমন এক উর্ধ্বতর পরিণাম লাভ করে, যাহার উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার আদৌ ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী নয়। প্রকৃতির ভিতর দিয়া মানুষ এমনি করিয়া প্রকৃতিকে জয় করিয়া উঠে। ধ্যান-লোকটিকেও ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা না করিলে ধ্যান-লোকটিও ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয়ী বলিয়া ইন্দ্রিয় যতই শিথিল হইতে থাকে ওই ধ্যান-লোকটি ততই শ্রীহীন হইয়া পড়ে। পরিণত জীবনে অধ্যাত্ম শূন্যতা বোধ এমনি করিয়া জাগে।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ ওই পরিণামমুখীন হইয়া চলিয়াছিলেন। উহারই সাময়িক প্রতিক্রিয়ার ফলে রবীন্দ্রনাথ এমন নিম্নতর চেতনা-লোকে অকস্মাৎ নামিয়া আসিয়াছেন। সেই সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ সীমা ও 'ক্ষণ'-বোধ জীবনের একমাত্র ধর্ম বলিয়া বোধ হইয়াছে। কারণ চেতনা যে স্বরূপ সাক্ষাৎ

করে, বুদ্ধি তাহাকে আশ্রয় করিয়া একটি সামগ্রিক দর্শন গড়িয়া তুলে। বুদ্ধির এই কাজ।

যৌবনে প্রাণের দুর্বার প্রেরণায় কবি প্রাণ-সমুদ্রে পাড়ি জমাইয়া ছিলেন।

"সিন্ধু পানে গেছিস ভেসে
অকূল কালো নীরে
ছিন্ন রশারশি।" (পরামর্শ)

যৌবনের প্রান্ত সীমায় সেই শক্তি আজ প্রায় নিঃশেষিত হইতে চলিয়াছে।

"এখন কি আর আছে সে বল ?
বুকের তলা তোর
ভরে উঠছে জলে।" (পরামর্শ)

হৃদয় আসক্তি বোধ করে সত্য, কিন্তু যৌবনের প্রবল প্রাণ-শক্তি আবার ওই আসক্তি জয় করিয়া উঠে। এমনি করিয়া প্রাণের প্রবল আবেগে সে যেমন তীব্র আসক্তি বোধ করে, তেমনি আবার প্রাণের বেগেই আসক্তির সামগ্রীকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। এমনি করিয়া তাহার লীলা চলে।

অবসিত যৌবনে আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। বারংবার রূপকে জড়াইয়া আকাঙ্ক্ষার ভারে মানুষ ভাঙ্গিয়া পড়ে, বারংবার তাহার জীর্ণ হৃদয়-পঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া রক্ত-ধারা অশ্রু-ধারা রূপে বাহির হইয়া আসে। বুকের তলা যে অশ্রুজলে ভরিয়া উঠে তাহা সেচিয়া সে আর জীবন-তরী বাহিতে পারে না। প্রাণের আন্দোলনে উহা একদিন তলাইয়া যায়। তাই কবি প্রাণ-লোক হইতে সরিয়া আসিয়াছেন।

"এবার তবে ক্ষান্ত হ রে
ওরে শ্রান্ত তরী
রাখ্ রে আনাগোনা।" (পরামর্শ)

কবি আজ তাই প্রাণ সমুদ্রে নামিয়া বক্ষ পাতিয়া উহার তরঙ্গাঘাত সহ্য করিতে চাহেন নাই, তীরে উহার অতি মৃদু স্পর্শ লাভ করিতে চাহিয়াছেন। প্রাণের যে-কোন আবেগকে কবি আজ গভীরভাবে অনুভব করিতে অসমর্থ। কবি আজ প্রাণ-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ দোলায় দুলিতে নয়, তীরে তাহারই অতি মৃদু আন্দোলন বোধ করিতে, অতি ভীষণ কল্লোল গর্জনে জাগিয়া উঠিয়া বসিতে নয়, তাহার মৃদু ছল্ ছল্ একটানা শব্দে ঘুমাইয়া পড়িতে চাহিয়াছেন।

"ঘটের ঘায়ে যেটুকু ঢেউ
উঠে তটের জলে
তারি আঘাত সহি।" (পরামর্শ)

বিশ্বের প্রাণ-লীলা হইতে কবি আজ অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার এবং প্রাণ-লোকের মাঝখানে এক স্রোতধারার ব্যবধান।

ওই লোকে সংখ্যাতীত নর-নারী জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রয়োজনে ব্যাপৃত। ভালো লাগা মন্দ লাগার ঢেউ তুলিয়া ওখানে কত আবর্ত রচিত হইতেছে। এই তট-সীমায় দাঁড়াইয়া তাহার অতি অস্পষ্ট আভাসমাত্র লাভ করা যায়।

ওখানে

"সকাল-সন্ধেবেলা
ঘাটে বধূর মেলা,
ছেলের দলে ঘাটের জলে
ভাসে ভাসায় ভেলা।" (দুই তীরে)

ওখানে যাইতে সাধ যায়, ওই মোহ ও আসক্তি বিজড়িত সৌন্দর্য ও প্রেম-লোকে, কিন্তু উহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

কারণ

"তোমার আমার মাঝখানেতে
একটি বহে নদী,—" (দুই তীরে)

জীবন ও জগতের একই স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রকাশ ঘটায়। প্রাণ-লোকে এই জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রতিভাত হয়, ওই লোক হইতে নির্বাসিত হইলে তাহার আর এক অর্থ প্রকাশ পায়।

"তুমি তাহার গানে
বোঝ একটা মানে,
আমার কূলে আর এক অর্থ
ঠেকে আমার কানে।" (দুই তীরে)

আষাঢ়ে আকাশ পরিব্যাপ্ত বর্ষণ ভারাক্রান্ত মেঘের অপরূপ শ্যামশ্রী দেখিয়া হৃদয় শত ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া ফাটিয়া পড়িতে চায়। সেই সকল ভাবনা-বেদনাকে প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ ব্যাকুল হইয়া উঠে। নিত্য দিনের প্রয়োজন-সীমিত জীবনের সকল নিয়ম বিপর্যস্ত হইয়া যায়। জীবনের এই সকল

প্রয়াস মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। মনে হয়, সার্থকতার অন্য কোন জগৎ কোথাও আছে, যাহাকে লাভ করিবার পথ আমরা জানি না।

একদিকে সমগ্র প্রকৃতি কবির প্রাণ জাগ্রত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে, অন্যদিকে কবি গৃহের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিয়া দুই হস্তে হৃদয় নিপীড়িত করিতেছেন। এই সর্বনাশা প্রাণের জাগরণ তিনি কোন প্রকারেই ঘটিতে দিবেন না। অথচ উহাই যে কবির পরম আকাঙ্ক্ষিত। তাই কবি বারংবার চোখ মেলিয়া বর্ষার অপরূপ রূপ চকিতে চকিতে দেখিয়া লইতেছেন। এমনি করিয়া কবির প্রাণ কবির মনকে ভুলাইয়াছে। একটি সচেতন, আর একটি অবচেতন প্রেরণা।

"ওগো, আজ তোরা যাস নে, ঘরের
বাহিরে।" (আষাঢ়)

এই নিষেধটি সমগ্র কবিতাটির মূল ভাব-প্রেরণা। ইহা প্রাণকে প্রাণপণ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস মাত্র।

প্রাণ-মন নিরুদ্ধ করিয়া জীবনের যে লীলা সাক্ষাৎকার তাহার স্বরূপ কি? একটা তত্ত্ব কবি নিশ্চয়ই এই কালে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তাহার যে পরিচয় এই কাব্য মধ্যে রহিয়াছে তাহা উল্লেখ করিব। তাহার পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানবীয় চেতনার যে কয়েকটি পর্যায় নির্দেশ করিয়াছি কবি সেই প্রত্যেক পর্যায়ে অবস্থানকালে এক একটি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন। চেতনা বিকাশের তারতম্য হেতু তত্ত্বগুলির মধ্যেও পার্থক্য ঘটিয়াছে।

সমগ্র কাব্য সৃষ্টির পশ্চাতে কবি-চেতনার ধীর বিকাশ, তাহার পর প্রত্যেকটি পর্যায়ে সচেতনভাবে অবস্থান করিয়া উহাদের প্রত্যেকের লীলা-রস আস্বাদের প্রেরণাটিকে যদি মূল ভিত্তিস্বরূপ আশ্রয় করা যায় তবে কেন একটি মাত্র তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া পড়িবার আশঙ্কা থাকে না।

ক্ষণকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া কবি জীবনের সকল অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসা ও ব্যাকুলতা নিরুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন, কারণ কবি স্বয়ং সে সম্পর্কে সচেতন। এই চেতনাশ্রয়ী হইয়া কবি সাময়িক একটি লীলা-রস সম্ভোগ করিতে চাহিয়াছেন।

"আজকে শুধু এক বেলারই তরে,
আমরা দোঁহে অমর, দোঁহে অমর।" (যুগল)

ক্ষণ যে স্থায়ী চেতনা বৃন্তে বিধৃত তাহা প্রাণ। প্রাণের বিকাশ না ঘটিলে এই প্রাণ-তত্ত্বটি অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যায়। কিন্তু এই লোকেও জীবনের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর মিলে না। প্রাণ যে গভীরতর, বিস্তৃততর তত্ত্ব লোক আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে তাহা মন। মানস-লোকেও মানুষের ব্যাকুলতা শান্ত হয় না। মানুষ ইহারও অসম্পূর্ণতা বোধ করে। ইহারও ঊর্ধ্বতর কোন ভাব-ভূমি লাভের জন্য সে যুগে যুগে কোন অতলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছে। পরিণামে সে যে পরম ভিত্তির সন্ধান লাভ করিয়াছে তাঁহার নামে বিভিন্নতা থাকিলেও তাহা তত্ত্বত অভিন্ন।

প্রাণ নিরুদ্ধ দৃষ্টিতে অমনি মুহূর্তকে একমাত্র সত্য বলিয়া বোধ হয়। কোন ক্ষণের সহিত যেন কোন ক্ষণের যোগ নাই, যাহা হারাইয়া যাইতেছে তাহা একান্তই হারাইয়া যাইতেছে। জীবন ও জগৎ কতকগুলি মুহূর্তের সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে কোন সংযোগ সূত্র নাই। মুহূর্তের অচিন্ত্যনীয় দ্রুত অবসান একটা সমগ্রতার বোধ জাগ্রত করে মাত্র। প্রাণের অর্থাৎ সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া হৃদয় রক্ত নিষিক্ত করিয়া তিনি একদিন কত ধ্যান-মূর্তি গড়িয়া তুলিতেন। এই ধ্যান-মূর্তিই ছিল কবির কাব্য-লোক।

"অশ্রু গাঁথিয়া রচিয়াছি কত মালিকা
রাঙ্গিয়াছি তাহা, হৃদয় শোনিত-
বরণে।" (উদাসীন)

প্রাণের এই উপলব্ধিকে কবি আজ নিরুদ্ধ করিয়া দিতে চাহিয়াছেন। অথচ সৌন্দর্য ও প্রেম সাধনায় প্রাণের বেদনা পরিহার করিবার কোন উপায় নাই। এই বেদনা সমুদ্র মন্থন করিয়া মানস-লোকে ধীরে ধীরে সৌন্দর্য ও প্রেম ধ্যান-মূর্তি পরিগ্রহ করে। বেদনা-সমুদ্রের মাঝখানে তাহা আনন্দ-শতদল। বেদনা স্বীকার না করিলে আনন্দ পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না। দুঃখ ভোগ যেখানে দুঃখভোগ মাত্র সেখানে জীবনের অধ্যাত্ম ফল লাভ কিছু নাই।

পূর্ণতার সাধনায় দুঃখভোগকে জীবনে বরণ করিয়া লইতে হয়। এই আনন্দ পরিণাম যদি না থাকিত তাহা হইলে দুঃখভোগ বা ত্যাগ তো নিরতিশয় বঞ্চনা হইয়া উঠিত। ইহা কেবল আত্মহত্যা, এক জাতীয় প্রমত্ততা। মানুষ ইহাতে উন্মাদ হইয়া যায়। ইহা জীবনের বিকৃতি।

সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে প্রাণ-লোক হইতে হয় ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ

করিয়া দিতে হয়, নতুবা উহাকে পরিহার করিতে হয়। প্রাণের অহর্নিশ বিষ জ্বালা মানুষ দীর্ঘকাল বহন করিতে পারে না।

"বুকভাঙ্গা বোঝা নেব না রে আর তুলিয়া,
ভুলিবার যাহা একেবারে যাব ভুলিয়া—" (উদাসীন)

তাহার পর যখন এই জাতীয় পংক্তি পাঠ করি তখন সংশয় জাগে ঃ

"দূরে দূরে আজ ভ্রমিতেছি আমি,
মন নাহি মোর কিছুতে—
তাই ত্রিভুবন ফিরিছে আমারি পিছুতে।" (উদাসীন)

শাস্ত্রের সেই তত্ত্বোপলব্ধির কথা মনে পড়িয়া যায়।

"আপূর্যমানমাচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্ বৎ।
তদ্ বৎ কামা যং প্রবিশ্রন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কাম কামী।"

যে লোকে অধিষ্ঠিত হইলে এই শান্তি লাভ করা যায়, তাহা মনেরও ঊর্ধ্বতর লোক।

রবীন্দ্রনাথের এই সাক্ষাৎকার ওই জাতীয় হইতে কোন আপত্তি নাই, কোথাও কোথাও এই পরিচয়ও আছে, তবে এক্ষেত্রে সমগ্র কাব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমি ইহাকে ঠিক বিপরীত প্রেরণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। ইহা সেই তত্ত্ব বিমুক্ত রস-পরিণামহীন, সর্ব-জিজ্ঞাসা-নিরুদ্ধ সৌন্দর্য সাক্ষাৎকার। অর্থাৎ প্রাণের বিষ জ্বালা ভুলিতে কবি প্রাণের ঊর্ধ্বতর চেতনা মানস-লোকে নয়, (ইহাঁরও ঊর্ধ্বতর পরিণাম তো আরও দূরের কথা) নিম্নে ইন্দ্রিয়-চেতনা-লোকে নামিয়া আসিয়াছেন।

নির্বিশেষ পরিণাম ঘটে বিশেষকে আশ্রয় করিয়া। সাধনার এই স্বরূপ। বিশেষকে আশ্রয় না করিলে নির্বিশেষ রস তত্ত্বে পৌঁছান যায় না। বিশেষকে পরিহার করিয়া এইরূপে একযোগে অনেককে লাভ করিতে পারা যায়। কিন্তু মানস-লোকে ধ্যান-তন্ময়তা লাভের পক্ষে এই জাতীয় প্রেরণা ঘোর বিঘ্নকর।

আসক্তি ও বেদনা প্রাণের ধর্ম বলিরা কবি বারংবার আসক্তির ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, আবার একটি না একটি তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া উহাকে জয় করিয়া উঠিয়াছেন। এখানে যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি আসক্তি ও বেদনা জয়ের চেষ্টা করিয়াছেন তাহা ঊর্ধ্বতর কোন চেতনা আশ্রয় করিয়া নয়।

"ফুরায় যা দে রে ফুরাতে।
ছিন্ন মালার ভ্রষ্ট কুসুম
ফিরে যাসনে কো কুড়াতে।" (উদ্বোধন)

কিংবা

"ওরে থাক থাক কাঁদনি
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে
নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।" (উদ্বোধন)

আরও

"শুধু অকারণ পুলকে
নদী জলে পড়া আলোর মতন
ছুটে বা ঝলকে ঝলকে।" (উদ্বোধন)

এই ক্ষণিকতা বোধ এক্ষেত্রে একটি তত্ত্ব-স্বরূপতা লাভ করিয়াছে। ক্ষণ যেখানে জীবন ও জগতের একমাত্র সত্য স্বরূপ সেখানে বেদনার প্রশ্ন উঠে না।

সৌন্দর্য ও প্রেমের সাধনায় বিশেষকে আশ্রয় করিয়া নির্বিশেষ পরিণাম লাভ করিতে হয়, আর কোন পথ নাই। কোন বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় না করিয়া নিরুদ্ধ হৃদয়ে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে লীলা আস্বাদ তাহাতে জীবনের কোন অধ্যাত্ম ফল লাভ নাই।

সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে আদৌ স্বীকার না করিয়া জীবনের ভিন্নতর সাধনাও আছে। তবে তাহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়।

নিম্নের উক্তির মধ্যে সত্য আছে, কিন্তু এই চেতনা পর্যায়ে নয়।

"যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।" (বোঝাপড়া)

প্রাণ-লোকে যে রূপকে মানুষ একান্ত করিয়া আশ্রয় করে, সেই রূপই ক্রমে ধ্যান-লোক উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়। ধ্যানে ওই রূপ আর বন্ধন স্বরূপ থাকে না। তাহা শিখারূপে জ্বলিয়া উঠিয়া বিশ্ব-সৌন্দর্যকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে। রূপ পরিহার করিলে আলো জ্বলে না। রূপ হইল প্রদীপ। প্রদীপ আশ্রয় করিয়াই শিখা জ্বলে।

প্রাণ-মনকে ঘুম পাড়াইয়া যে সৌন্দর্য ও প্রেম আস্বাদ, আদৌ যদি তাহা

সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ হয়, কাব্য হইতে তাহার পিছু পরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি।

রূপ ও প্রেমকে মানুষ আশ্রয় করে প্রাণের পরিণামে অধ্যাত্ম-লোকের জাগরণ ঘটাইবার জন্য। কিন্তু রূপ এখানে কেবল মাত্র রূপ সম্ভোগ।

"চাইনে রে মন চাই নে।
মুখের মধ্যে যেটুকু পাই
যে হাসি আর যে কথাটাই
যে কলা আর যে ছলনাই
তাই নে রে মন, তাই নে।" (অচেনা)

প্রাণের স্তরে প্রেমের অসহনীয় বিষজ্বালা সহ্য করিবার মত শক্তি কবি-প্রাণের আর নাই, অথচ তাহার অমৃতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু প্রাণের বিষ আকণ্ঠ পান না করিলে ধ্যানে অমৃত লাভ করিতে পারা যায় না।

এই চেতনা-লোকে প্রেমের যে অনুভূতি, তাহার পরিচয় নিম্নের উক্তিটির মধ্যেও লাভ করিতে পারা যাইবে। এ প্রেমে প্রাণ নাই, মন তো নাই-ই।

"দোঁহার মুখে দোঁহে চেয়ে
নাই হৃদয়ের খোঁজাখুঁজি। (সোজাসুজি)

মানুষের একটি সত্তা বাহিরের আর একটি সত্তা অন্তরের। একটি তাহার জীব-সত্তা অপরটি অধ্যাত্ম-সত্তা। এই অধ্যাত্ম-সত্তায় অনন্তের সহিত তাহার মিলন। জীব-সত্তায় কত সংখ্যাতীত অনুভূতি জীবনে আসে, তাহার কোন চিহ্নই পরবর্তী জীবনে থাকে না।

সাধারণ মানুষের জীবনে এই বাইরের জীবনটাই সত্য। অধ্যাত্ম-সত্তার কোন বিকাশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। এই সমস্ত মানুষ বিচিত্র বোধ বক্ষে লইয়া বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যায়। ক্ষণিকায় কবির সৌন্দর্য ও প্রেম-লীলা এই বাইরের জীবনে।

"যে দুয়ারটা বন্ধ থাকে
বন্ধ থাকতে দিয়ো।
আপনি যাহা এসে পড়ে
তাহাই হেসে নিয়ো।" (অসাবধান)

প্রেমে প্রাণের যে অসহনীয় প্রকাশ ঘটে তাহা সহ্য করিবার মত শক্তি আজ কবির দেহে-প্রাণে নাই। আজ অবসিত যৌবনে প্রেম নয়, তাহার অতি ক্ষীণ একপ্রকার আভাস মাত্র লাভ করিয়া কবি ধন্য হইতে চান।

"শান্ত তীরে তীরে তোমায়
বাইব ধীরে ধীরে।" (স্বপ্নশেষ)

প্রাণ-সমুদ্রে ডুব দিয়া প্রাণের তরঙ্গাঘাত সহ্য করা নয়, দূরে সরিয়া আসিয়া তটপ্রান্তের নিশ্চিন্ত সৌন্দর্য সাক্ষাৎ করা।

এই মর্ত্য-লোকে আমরা যাহার সহিত মিলিত হই, তাহার সীমাহীন অন্তর্লোকের কতটুকু পরিচয় আমরা জানি। তাহার অতিদূর ক্ষীণ আভাসমাত্র লাভ করিয়া আমাদের পরিতৃপ্ত হইতে হয়। এই জীবনে ওইটুকুই আমাদের প্রাপ্য। তাহার অধিক আকাঙ্ক্ষা করিতে গেলে বঞ্চনাই হাতে ঠেকে।

নর-নারী আপন আপন হৃদয়-বৃন্তে প্রেমের শিখা জ্বালাইয়া তাহারই স্বপ্নালোকে অনন্ত রহস্যপূর্ণ অজ্ঞাত লোকে পথ চিনিয়া চলিয়াছে। ওই দীপ-শিখা যে সংকীর্ণ অংশটুকু আলোকিত করে তাহাই তাহার পরিচিত জগৎ। তাহার বাইরের অসীম জগতের কোন অস্তিত্ব তাহার নিকট নাই। ওই দীপ-শিখার অতি চকিত একটি কিরণ রেখা হয়ত আমাদের হৃদয়ে মুহূর্তে আসিয়া পড়ে। এই সকল নর-নারী সৃষ্টির কোন প্রথম প্রভাতে যাত্রা শুরু করিয়াছিল, জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া তাহাদের এই যাত্রার কোথায় অবসান ঘটিবে কে জানে।

আমাদের হৃদয়-পটে তাহাদের কত ক্ষীণ অস্পষ্ট রেখাপাত ঘটিয়া যায়। তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া তো আমরা লাভ করিতে পারি না। দৃষ্টি-বহির্ভূত-লোকে জীবনের কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিয়া তাহারা কোথায় চলিয়া যায়, কে জানে। এ জীবনে কিছু দিনের জন্য একত্রে শুধু পথচলা তরী বাওয়া। তাহার পর স্মৃতি মন্থন করিয়া দিনের পর দিন কাটিয়া যায়। স্বপ্নে মৃত্যুর অন্ধকার-লোক পার হইয়া তাহাদের অশ্রুজলে অন্বেষণ করিয়া ফিরি—জাগরণে নিদ্রায়।

"তুমিও গো ক্ষণেক-তরে
বসবে আমার তরী 'পরে,
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে
মান্‌বে না মোর মানা—" (যাত্রী)

যে লোকে কবি নারীকে আহ্বান করিতেছেন, তাহা বহিশ্চেতনার লোক। এই লোকে অনেককে স্থান দান করা যায়। কিন্তু অধ্যাত্ম-লোকে অনেকের স্থান নাই। সেখানে একটি প্রতিমা ঘিরিয়া মন নিত্য আরতি করিয়া চলে।

অধ্যাত্ম-লোকেও পরিচিত নর-নারীর অনন্ত সত্তার, তাহার অনন্ত অভিসারের কোন পরিচয় আমরা জানিতে পারি না।

"কোথা তোমার স্থান?
কোন্ গোলাতে রাখতে যাবে
একটি আঁটি ধান?" (যাত্রী)

মর্ত্যের প্রেমে অন্তরে যে অধ্যাত্ম-সম্পদ গড়িয়া উঠে তাহাই একটি আঁটি ধান। এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বুকে করিয়া নর-নারী এই জীবন ছাড়িয়া কোন্ অজ্ঞাত লোকে অভিসার করে, কোথায় তাহার পরম পরিণাম তাহা আমরা জানি না। তাহাদের ওই বাহিরের পরিচয়ও যখন আমাদের জীবনে থাকে না তখন স্মৃতি-লোকে তাহাদের অন্বেষণ করিয়া ফিরি। জীবনে সে শূন্যতারও পরিমাপ নাই।

ইহা ঠিক প্রেম নহে; সৌন্দর্য-ধ্যানও নহে। জীবনে এই জাতীয় অনুভূতির মূল্য কতটুকু। মানস-লোকের এমন কি প্রাণ-লোকেরও বাইরে এই চেতনার বিচিত্র বিলাস

"অতি দূরের দেখাদেখি
অতি ক্ষণেক-তরে।" (ক্ষণেক দেখা)

এই ক্ষণিকতা বোধের জন্যই আজ কবির অন্তর শূন্যময়।

"যেমন ঢাকা ছিলে তুমি
তেমনি রইলে ঢাকা,
তোমার কাছে যেমন ছিনু
তেমনি রইনু ফাঁকা!" (ক্ষণেক দেখা)

আমার অনন্ত সত্তার কোন পরিচয় তুমি জান না, তোমার অনন্ত সত্তার, তোমার অসীম সৌন্দর্য ও প্রেমের কোন আস্বাদ আমার জীবনে নাই। তবু আমার স্মৃতি তোমার সহস্র কর্মের মাঝখানে হয়ত তোমাকে মুহূর্তের জন্য অন্যমনা করিয়া তুলিবে। হয়ত কোন দিন আমার কর্ম ভারাতুর পীড়িত জীবনে তোমার স্মৃতি মুহূর্তের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আমার বেদনা সঞ্চিত গুরু ভারকে কিছুক্ষণের জন্য সহনীয় করিয়া তুলিবে। আমার অন্তরের বেদনা-কৃষ্ণ মেঘের প্রান্তে তোমার মাধুর্য অস্তমিত সূর্যের আভায় রাঙ্গা স্বর্ণ-রেখার মত।

এই যে কারো স্মৃতি ভাসিয়া উঠিলে আমরা অন্যমনা হইয়া পড়ি, একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস অলক্ষ্যে বাহির হইয়া আসে, জীবনে ইহার মূল্য কতটুকু।

যে দুটি বোন ঘাটের পথে জল আনিতে গিয়া সলজ্জ হাস্য ভরে একে অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে, তাহাদের অন্তরে তো প্রেম জাগ্রত হয় নাই, ক্ষীণভাবেই হোক না কেন, তবে এই বোধকে আমরা কি বলিব। অথচ এই অনুভূতি যত ক্ষণকালের জন্য হোক তাহাদের হৃদয়ে একটি মাধুর্যের ক্ষীণ ধারা বহাইয়া দিয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে ঈশান কোনে অকস্মাৎ ঘন কালো মেঘ উঠে। নিম্নে তমাল বনের সহিত তাহাদের রঙ্গ মিলিয়া যায়। চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া কালো কোমল ছায়া নামে। নির্জন প্রান্তরে এই অপরূপ মুহূর্তে একটি শ্যামাঙ্গিনী কিশোরীর সাক্ষাৎকার। সেও অমনি পরিপূর্ণ শ্যামল মেঘের মত মাধুর্যে ভারাবনত। ঝড়ের মুখের মেঘের মত অমনি চঞ্চল, উদ্‌ভ্রান্ত। মুহূর্তের জন্য দেখা দিয়া কোথায় চলিয়া যায়।

'আলের ধারে দাঁড়িয়েছিলেম একা,
মাঠের মাঝে আর ছিল না কেউ।
আমার পানে দেখলে কিনা চেয়ে
আমিই জানি আর জানে সে মেয়ে।" (কৃষ্ণকলি)

ইহা কি প্রেম, না সৌন্দর্য-ধ্যান? যত মুহূর্তের জন্য হোক, একটা খুসির ধারা অন্তরকে প্রভাত-কিরণ-দীপ্ত শিশির কণার মত অপরূপ মায়াময় মাধুর্য পরিপূর্ণ করিয়া তুলে। এই ক্ষণও তো মিথ্যা নয়। আকাশ শাশ্বত স্থির। মেঘ কোথা হইতে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া আবির্ভূত হয়, আবার কোথায় ভাসিয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ মেঘের অস্তিত্ব থাকে ততক্ষণ তো মেঘকে মিথ্যা বলিতে পারি না। মানুষের প্রাণে যে বিচিত্র অনুভূতি মুহূর্তে মুহূর্তে আবির্ভূত হইয়া লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, তাহাও সত্য।

"এমনি করে শ্রাবণ-রজনীতে
হঠাৎ খুশি ঘনিয়ে আসে চিতে।" (কৃষ্ণকলি)

এই প্রসঙ্গে পরিশেষে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিব। কবিতাটির নাম 'ভর্ৎসনা'। কবিতাটির মধ্যে কবির এই মনোভাবটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

কবি আজ প্রাণ-লোকে নয়, তাহার বহিঃঅঙ্গনের এক প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। জীবনে কবি আজ কেবল ওইটুকুর প্রয়োজন বোধ করিয়াছেন।

"আমি আমার পথে যেতে
তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে
দাঁড়িয়েছি এই দণ্ডদুয়ের তরে।" (ভর্ৎসনা)

'তোমার ঘরে' নহে, 'তোমার ঘরের দ্বারের বাহিরেতে' দণ্ড দুয়ের জন্য কবি স্থান লাভ করিতে চাহিয়াছেন।—অর্থাৎ আজ কবি সৌন্দর্য ও প্রেমকে হৃদয়ে আহ্বান করেন নাই, করিয়াছেন হৃদয়-নিরুদ্ধ কোন বহিশ্চেতনা-লোকে।

নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম, এক কথায় প্রাণের কোন সম্পদ আজ কবির আকাঙ্ক্ষিত নয়।

"আমি তোমার ফুল্ল পুষ্প বনে
তুলি নাই তো যূথীর একটি দল।
আমি তোমার ফলের শাখা হতে
ক্ষুধাভরে ছিঁড়ি নাই তো ফল।" (ভর্ৎসনা)

বাস্তব জীবনে কবি যখনই বঞ্চনা লাভ করিয়াছেন, মর্মন্তুদ-বেদনার ভারে যখনই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন, তুচ্ছতায় দীনতায় যখন অন্তর ভরিয়া ধিক্কার জাগিয়াছে, তখন অন্তরের ধ্যান-লোকে ডুবিয়া গিয়া এই সমস্ত কিছু হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। সেদিন নারী-প্রেম ও সৌন্দর্য-ধ্যান এক পরম মাধুর্য-লোকে কবিকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। আজও কবির জীবনে দারুণতম দুঃখ, ব্যথা-বেদনা আছে, কিন্তু প্রাণ-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া ধ্যানের আনন্দ-লোকে উত্তীর্ণ হইবার সে আকাঙ্ক্ষা নাই। নারীর নিকট কবির আজ যে সামান্যতম আকাঙ্ক্ষা তাহা প্রাণের বাহির লোকেই চরিতার্থ হইতে পারে।

'আষাঢ়' কবিতাটির মধ্যে কবি একদিন প্রাণপণ বলে হৃদয় নিরুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা সার্থক হয় নাই। কবির সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া প্রাণধারা উৎসারিত হইয়াছে। তাহার পর বেদনার সমুদ্র মথিত করিয়া পরিণামে ধ্যান-লোকটিও ভাসিয়া উঠিয়াছে। নববর্ষার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবির সেই প্রাণ উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। সেই সঙ্গে বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত কবি আপনায় প্রাণের যোগ অনুভব করিয়াছেন।

"নব তৃণদলে ঘনবনছায়ে
হরষ আমার দিয়েছি বিছায়ে,
পুলকিত নীপনিকুঞ্জে আজি
বিকশিত প্রাণ জেগেছে।" (নববর্ষা)

প্রাণের অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে কবি-চিত্তে অফুরন্ত ভাব ও ভাবনা জাগ্রত হইয়াছে। সেই সকল ভাব-ভাবনা মুক্ত-পক্ষ বিহঙ্গমের মত অনন্ত শূন্যে উধাও হইয়া চলিয়াছে, কোন্ আলোক তীর্থের পানে কে জানে। কবি হৃদয়ের এই অসীম ব্যাকুলতা, পরিব্যাপ্ত আনন্দ-বেদনার এমন অসহনীয় প্রকাশ এই কাব্যে ইতিপূর্বে ঘটে নাই।

"শত বরণের ভাব-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করেছে বিকাশ,—" (নববর্ষা)

প্রাণ-লোকে কবি আবার একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন। এই তত্ত্ব বুদ্ধি দ্বারা গড়িয়া তোলা নয়, ওই চেতনালোকে অনিবার্য রূপে এই সাক্ষাৎকার ঘটে। এই জাতীয় তত্ত্বের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। আমি এই প্রসঙ্গে দুই একটি কবিতা উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে এই তত্ত্বটির স্বরূপ আর একবার বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

"ইচ্ছে করে কোন মতেই সান্ত্বনা আর মান্‌ব না রে,
এমন সময় নতুন আঁখি তাকায় আমার গৃহদ্বারে—।" (অনবসর)

যাহাকে আশ্রয় করিয়া আমাদের অন্তরে প্রেম অনুভূত হয় সেই মূর্তিটি যখন হারাইয়া যায় তখন আমাদের হৃদয় শূন্যতায় ভরিয়া উঠে। প্রাণের জাগরণ যত অধিক, শূন্যতা বোধও তত অতলস্পর্শী হইয়া উঠে। যেখানে ধ্যানে এই পরিণাম ঘটে না সেখানে নর-নারী শূন্যতার অতল গহ্বরে তলাইয়া যায়।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধ্যান-লোকের দ্বারা নয়, নূতন প্রাণস্পর্শে প্রাণের শূন্যতা ভরিয়া উঠে। প্রকৃতির মধ্যে অনন্ত প্রাণ-ধারা নর-নারীর চিত্তকে অধিককাল শূন্য থাকিতে দেয় না। প্রাণ জাগ্রত করিয়া তুলিতে প্রকৃতির মধ্যে সদা জাগ্রত অতি নিপুণ ষড়যন্ত্র চলিতেছে।

প্রাণ-ধর্মকে নর-নারী স্বীকার করে পরিণামে প্রাণকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য। নিত্য নূতন প্রাণের প্রকাশে, উহার জন্য নিত্য নূতন আধার পরিবর্তনে মানবীয় চেতনা উর্ধ্ব পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

প্রাণের শূন্যতা ধ্যানে পূর্ণতা লাভ করিলে অন্তরে আবার যে বোধ ফিরিয়া আসে তাহা আনন্দ নহে, বেদনাও নহে, উভয়ের অতীত এক শান্ত পরিণাম।

যে বোধ আশ্রয় করিয়া কবি এখানে প্রাণের শূন্যতা ভরিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে মানুষকে সাধনা করিতে হয় না। এই তত্ত্বের

মূল কথা হইল ভিন্ন রূপ ভিন্ন আধারের ভিতর দিয়া একই প্রাণের (প্রেমের) নিত্য নবীন প্রকাশ। বিশিষ্ট রূপের জন্য হাহাকার তুলিয়া লাভ কি, নূতন রূপে নূতন করিয়া তাহাকেই ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ কর। সকল রূপের ভিতর দিয়া এক আদি প্রাণ অনুভূত হয়।

"এবারো সেই প্রাচীন তত্ত্ব
ফুটল নূতন চোখের কোণে।" (অতিবাদ)

সেই প্রাচীন তত্ত্বটির কথাই উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলাম। ইহা সেই প্রাণ-তত্ত্ব। অন্তরে প্রাণের প্রকাশ ঘটাইতে চান কবি। রূপে বা আধারে পার্থক্য যতই থাক, প্রাণের বোধ সকল ক্ষেত্রে এক। প্রাণের সাধনা যেখানে একমাত্র সত্য সাধনা, সেখানে আধার পরিবর্তনে কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিস্মৃতি যদি জীবনে সত্য হয় তবে 'ক্ষমার' প্রশ্ন উঠে কেন? সুন্দরীর পক্ষেও এই বিস্মরণ সত্য। সুন্দরীর স্মৃতি-লোকে চিরন্তন হইয়া থাকিবার এই ব্যাকুলতাই বা কেন।

জীবনে অধ্যাত্ম-পরিণাম লাভ লক্ষ্য বলিয়া প্রেমে আধার পরিবর্তন একপ্রকার অসম্ভব; প্রেম যেখানে আধার পরিবর্তন করে সেখানে নর-নারীর কোন অধ্যাত্ম পরিণাম নাই।

ইহার পরে কবি আজ কোন্ কথা বলিতেছেন

"ছুটি দাও এ দাসে।
সকল কথা বন্ধ করে
বসি পায়ের পাশে।" (অপটু)

আজ অঙ্গ ঘিরিয়া ক্লান্তি নামে কেন? ওই চেতনা-লোক পরিহার করিয়া কবি কেন একটি নিভৃত-লোক অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন? এই নিভৃত-লোক অবশ্য কবির ধ্যান-লোক। কবি আজ প্রাণের লোক পরিহার করিয়া অন্তরে ধ্যান-লোক অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। প্রাণের বহির্লোকে একপ্রকার লীলা হয়ত করা যায়, কিন্তু তাহাতে দীর্ঘকাল নিমগ্ন থাকা একপ্রকার অসম্ভব! প্রাণ ও মনের ক্ষুধার দুরন্ত নিপীড়নকে দীর্ঘকাল নিরুদ্ধ করিয়া রাখা মনুষ্য সাধ্যাতীত। বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে, যাঁহার প্রাণ ও মন এতদূর সমৃদ্ধ।

কোন বিশেষ প্রাণ বিশ্ব পরিব্যাপ্ত প্রাণ-সমুদ্রে হারাইয়া গেলে আমরা বলি মৃত্যু। অন্য কোন রূপ আশ্রয় করিয়া আবার যে প্রাণের প্রকাশ ঘটে তাহাতে বিশ্ব-প্রাণের যোগে সেই বিশেষ প্রাণ আমাদের নিকট ফিরিয়া আসে। কিন্তু

প্রেম যে বিশেষ রূপটিকে ফিরিয়া লাভ করিতে চায়। কোন তত্ত্ব তাই ওই রূপ-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পারে না। মানুষের সান্ত্বনা শূন্য হাহাকার একটি বিশেষ রূপের সহিত বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথ প্রাণের এই জাতীয় পিপাসাকেও অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাণের যে-কোন অনুভূতির মধ্যে সেই বিশেষ প্রাণও অনুভূত হয়, মৃত্যু নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসা মাত্র। তবু এই বিদায়টিকেও কবি জীবনে একান্ত মিথ্যা বলিয়া অস্বীকার করেন নাই। ক্ষণিকের এই অন্তর্ধানটিও তো সত্য।

"ভ্রম ক্রমে ক্ষণেক-তরে
এনো গো জল আঁখির' পরে
আকুল স্বরে যখন কব
সময় হল যাবার।" (বিদায় রীতি)

মৃত্যুর পূর্বে মানুষের প্রীতিস্পর্শ লাভের সেই চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা। মর্ত্যের আসক্তি বিজড়িত ক্ষণস্থায়ী অসহায় প্রেম, এই প্রেম যে কত বার জীবনে অপূর্বতার আস্বাদ দান করিয়াছে, মৃত্যুর পূর্বে মর্ত্য-প্রেমের এই অমৃত আকণ্ঠ পান করিয়া এই জীর্ণ দেহাধারটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। জীবনের এই নিয়তি।

অথচ ইতিপূর্বে কবি এই অশ্রুপাতকে পরিহাস করিয়াছিলেন, তাহাকে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা তো দূরের কথা—প্রাণের বহির্লোকে কবি একদিন জীব-জীবনের সকল নিয়তি-নিয়মকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছিলেন। এমনি করিয়া উহা আবার জয়ী হইতে চাহিয়াছে।

হৃদয়বোধ নিরুদ্ধ করিয়া সৌন্দর্য ও প্রেম আস্বাদের পশ্চাতে রহিয়াছে জীব-জীবনের নিয়তিকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা। সৌন্দর্য ও প্রেমের সহিত অনিবার্য রূপে যে বেদনার প্রকাশ ঘটে তাহাকেই নিয়তি বলিয়াছি। জীবনের এই দশা আশ্রয় করিয়া মানুষের সকল নীতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বেদনা জয় করিতে পারা যায়, হয় প্রাণের উর্ধ্বে ধ্যান-লোকে উঠিয়া অথবা হৃদয় নিরুদ্ধ করিয়া, কিংবা হত্যা করিয়া। কবি কোন্ পথ আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সে চেষ্টা যে সার্থক হয় নাই, অর্থাৎ কবি-চিত্তে যে বেদনা সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে তাহা নিম্নের কয়েকটি পংক্তির মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়ঃ

"আজকে আঁধরে রাতে
আমার গোলাপ গেছে, কেবল
আছে বুকের ব্যথা,—" (স্থায়ী-অস্থায়ী)

এই বেদনা বোধের ভিতর দিয়া বিগত প্রেম ধ্যান-লোকে আর এক আনন্দ-মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ফিরিয়া আসে। এখানেও বেদনা থাকে, কিন্তু এই ব্যথার দোলনে আনন্দ-শতদল একটির পর একটি করিয়া দল মেলিতে থাকে।

কবি এই রূপে ধীরে ধীরে আর একটি নূতনতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। জীবন ও জগৎ যে স্বরূপে, যে অর্থান্বিত হইয়া কবির নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা সেই সঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

"এখন এল অন্য সুরে
অন্য গানের পালা," (বিলম্বিত)

কবির হৃদয়-নিরুদ্ধ সৌন্দর্য ও প্রেম লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার সহিত তুলনামূলকভাবে এই পর্যায়ের সৌন্দর্য ও প্রেমের কবিতাগুলি আলোচনা করিলে পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে। প্রাণের জাগরণ ঘটিলেও ধ্যান-লোকটি এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। এই পর্যায়ে কবি সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি করিলেও বিশ্বপ্লুত সেই ধ্যান-তন্ময়তা এখনও দেখা দেয় নাই।

পথের উভয় পার্শ্বে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কত দুর্লভ সৌন্দর্য দেখিয়া কবির স্মৃতি-লোক উদ্বেল হইয়া উঠে। অন্যমনা হইয়া কবির আঁখিপাতা বুঝি ভারি হইয়া আসে। ইতিপূর্বে এই বেদনা-লোক বা স্মৃতি-লোকটিকে কবি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

"কয়েক দিন সে ফাগুন-মাসে
বহু আগে
চলেছিলেম এই পথে সেই
মনে জাগে।" (পথে)

জন্মান্তর কবিতাটির মধ্যে কবি আপনার অন্তরের সৌন্দর্য-লোকটিকে বাস্তবে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এ সৌন্দর্য-ধ্যানের পরিচয় পাওয়া যাইবে 'কূলে' কবিতাটির মধ্যেও। এই সৌন্দর্য-ধ্যানের স্বরূপ বিচার না করিয়াও বলা যায় সৌন্দর্য-পিপাসার এই পরিচয় ইতিপূর্বে ওই ক্ষণতত্ত্বের মধ্যে কোথাও ছিল না।

প্রেম বা সৌন্দর্য সম্ভোগের একটি ধীর পরিণাম লাভের সুন্দর ব্যঞ্জনা ফুটিয়া

উঠিয়াছে 'এক গাঁয়ে' কবিতাটির মধ্যে। একদিকে সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রারম্ভিক অবস্থা, অন্যদিকে তাহার ধ্যান-তন্ময় অধ্যাত্ম পরিণাম।

"তাদের বনে ঝরে শ্রাবণ-ধারা
আমার বনে কদম ফুটে উঠে।" (এক গাঁয়ে)

নিম্নে যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে কবি-প্রাণের জাগরণই কেবল নয়, ধ্যান-লোকটিও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। একটি রূপের মধ্যে তাই বিশ্ব-রূপ উদ্ভাসিত হইয়াছে। রূপ এইরূপে বিশ্বযোগে অপরূপ হইয়া উঠে।

"তোমার দুখানি কালো আঁখি'পরে
শ্যাম আষাঢ়ের ছায়াখানি পড়ে,
ঘন কালো তব কুঞ্চিত কেশে
যূথীর মালা।
তোমারি ললাটে নববরষার
বরণ ডালা।" (অবিনয়)

এমনি করিয়া কবি পরিণামে অধ্যাত্ম-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। এই পর্যায়ের কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান-রূপের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবি পরিণামে অসীম বা অরূপের স্পর্শলাভ করিতেন এবং তাহারই দিব্য স্পর্শে তাহার অন্তর সোনায় পরিণত হইয়াছে। কবির কাব্যে সেই স্বর্ণ রেণুর সন্ধান লাভ করা যায়। ধ্যানের প্রগাঢ়তায় এবং তন্ময়তায় কবি রূপের সীমাটিকে প্রায় অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন।

"নব নব পবনভরে
যাব দ্বীপে দ্বীপান্তরে,
নেব তরী পূর্ণ করে
অপূর্ব ধন যত।" (বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ)

অধ্যাত্ম-লোকের গভীর হইতে গভীরে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে কবি চলিয়াছেন। আর সেই অধ্যাত্মোপলব্ধির অপূর্ব ধনকে কবি কাব্য-পুটে সাজাইয়া দিয়াছেন।

সংসারের নিকট হইতে মানুষ যাহা লাভ করে, পরিণামে সংসার তাহার শেষ মূল্য পর্যন্ত আদায় করিয়া লয়। জীবনে এই পরিপূর্ণ করিয়া পাওয়া এবং

নিঃশেষ করিয়া হারানোর ভিতর দিয়া অন্তরে যে অধ্যাত্ম-সত্তা গড়িয়া উঠে মৃত্যুতে তাহাই মানুষের একমাত্র পাথেয়। আর সমস্ত কিছুকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়। আর সকল রূপের আলো সেদিন নিভিয়া যায়। কেবল অধ্যাত্ম-সম্পদটি ধ্রুব তারকার মত জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া মানবাত্মার যাত্রাপথ প্রোজ্জল করিয়া তুলে। বহির্জীবনের বঞ্চনা, লাভ-ক্ষতি মানুষের জীবনে তাই কিছু নয়, যদি তাহার ভিতর দিয়া অন্তরের ধ্যান-লোকটি গড়িয়া উঠে।

"তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়িয়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখী-সম এলে মোর বুকে—" (কৃতার্থ)

প্রাণের সম্পদকে কবি অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু জীবনে তাহাই পরম সম্পদ নয়। ইহার ভিতর দিয়া একদিন অধ্যাত্ম-সত্তার বিকাশ ঘটে। অধ্যাত্ম-সত্তায় অসীমের সহিত মানুষের যোগ। এই সত্তায় জন্ম-মৃত্যুর সীমানা একাকার হইয়া যায়। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, মিলন-বিরহের ভিতর দিয়া মানুষের অধ্যাত্ম সত্তা সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। ইহ-জীবনের এই সার্থকতা। এই জীবনের আর সমস্ত কিছু মিথ্যা বা মায়া। এই অধ্যাত্ম-সত্তার ভিতর দিয়া মানুষ পরিণামে অমৃতের আস্বাদ পায়, মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে।

"যদি চরণ পড়ে থাকে কোন একটি বারে
যা রে সোনার জন্ম নিয়ে সোনার মৃত্যু-পারে।" (যৌবন বিদায়)

সৌন্দর্য ও প্রেমকে কবি যৌবনে এমনি করিয়া আশ্রয় করিয়াছিলেন। আজ অতিক্রান্ত যৌবনে কবি মানব জীবনে উহার মূল্য কতখানি তাহার একটি হিসাব করিতে চাহিয়াছেন 'শেষ হিসাব' কবিতাটির মধ্যে।

ইহাতে যদি কেবল শূন্যতাই হাতে ঠেকে, জীবন একান্ত বঞ্চনা বলিয়া বোধ হয় তবু সামগ্রিক জীবনের মূল্য তাহাতে কিছুমাত্র হ্রাস পায় না। মর্ত্য জীবন অসীম পরিব্যাপ্ত জীবনের একটি সামান্য পর্যায় মাত্র। অনন্ত জীবন যাত্রার পথে ইহ-জীবনের বঞ্চনা যত বড় হোক না কেন, একদিন তাহা বিস্মৃতির তলে লীন হইয়া যাইবে। সৌন্দর্য ও প্রেমের মোহে নর-নারীর একান্ত সীমাবদ্ধ জীবনে জীবন ও জগতের অসীমতা বোধটি থাকে না।

"জনশূন্য বিশাল ভবে
একলা এসে দাঁড়াও তবে,

তোমার বিশ্ব উদার রবে
হাজার সুরে তোমায় ডাকে।" (শেষ হিসাব)

মানুষের সার্থকতা তাহার অধ্যাত্ম সত্তায়। মর্ত্য জীবন হইতে মুখ না ফিরাইয়া লইলে অন্তরের ধ্যান গড়িয়া উঠে না।

"তুমি একা জগৎ-মাঝে
প্রাণের মাঝে আরেক একা।" (শেষ হিসাব)

জীবনের সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া অন্তরের মধ্যে আর এক পূর্ণতার প্রকাশ ঘটে। মানুষের ইহ-জীবনের ইহাই মহত্তম প্রাপ্তি। পরম দুঃখের ভিতর দিয়া মানুষকে এই সম্পদ লাভ করিতে হয়।

সৌন্দর্য-ধ্যান যখন কবি-চিত্তকে তন্ময় করিয়া তুলিয়াছে, তখন রূপ বিগলিত হইয়া আর এক সৌন্দর্যের মধ্যে লীন হইয়া গিয়াছে।

'মেঘ মুক্ত' কবিতাটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় বাহিরের সৌন্দর্য ধীরে ধীরে কবির ধ্যান-লোকে আর এক সৌন্দর্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে। এই সৌন্দর্য-ধ্যানের লোকটিকে তো কবি নানাভাবে তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। পুরাতন প্রাণের কথাটিকে নিত্য নূতন করিয়া বলিয়াছেন। তাহার পর ওই ধ্যান-লোকে কবি সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। সৌন্দর্য-ধ্যানের সেই ধীর তন্ময়তা।

"কলস পাকড়ি আঁকড়িয়া বুকে
ভরা জলে তোরা ভেসে যাবি সুখে,
তিমির নিবিড় ঘন ঘোর ঘুমে
স্বপন প্রায়।"

ধ্যানে মানবীয় চেতনা যে অমর্ত্যের আভাস লাভ করে, যে আকস্মিক জ্যোতি প্লাবনে মর্ত্য ও অমর্ত্যের উভয় তীর প্লাবিত হইয়া যায় তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণ অসম্ভব। চেতনা দিব্য-ভাবরূপে যেখানে মর্ত্য বা রূপের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, সেই অলৌকিক পরিবর্তনের পর্যায় যে কী তাহা আমরা জানি না।

প্রাণের বহির্লোকে কবি যে লীলারস আস্বাদ করিতে চাহিয়াছিলেন, সেই লীলার পরিচয়, সেই ক্ষণিকা তত্ত্ব আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। ওই লোকে জীবন ও জগতের যে স্বরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়।

"সেদিন দেখেছি খনে খনে তুমি
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে বনতল
নুয়ে নুয়ে যেত ফুল দল।" (আবির্ভাব)

পরিপূর্ণতার একটা প্রকাশ যেমন অন্তরে আছে, তেমনি বাহিরেও আছে। বহির্বিশ্বের সহিত মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে ততই বিশ্বের মধ্যে যেমন তেমনি আপনার মধ্যে এই অখণ্ডতার বোধ বাড়িয়া যাইতে থাকে। উন্নততর চেতনালোক লাভ করিতে সেই এক বিশ্ব ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

একদিকে বহির্বিশ্বে

"আজি আসিয়াছ ভুবন ভরিয়া
গগনে ছড়ায়ে এলোচুল,
চরণে জড়ায়ে বনফুল।" (আবির্ভাব)

অন্যদিকে অন্তর্লোকে তাঁহার প্রকাশ:

"আকুল করেছ শ্যাম সমরোহে
হৃদয়-সাগর উপকূল।" (আবির্ভাব)

জগৎ ও জীবনের ক্ষণ-তত্ত্বে কবি বড় নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঊর্ধ্বতর প্রেরণার দুর্নিবার প্রাবল্যে সকল বন্ধন কোথায় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কবি স্বয়ং বিস্মিত।

"কে জানিত সেই ক্ষণিকা মুরতি
দূরে করি দিবে বরষণ,
মিলাবে চপল দরশন?" (আবির্ভাব)

মর্ত্যের প্রেম এখন কেমন অপরিম্লান অচঞ্চল অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করিয়াছে। কবি সেই ধ্যান-লোকের পরিচয় দিয়াছেন:

"অচলা শ্রী তোমায় ঘেরি
চির বিরাজ করে।" (কল্যাণী)

যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের অন্তরে প্রেম জাগে, তাহার অনন্ত স্বরূপের কতটুকু পরিচয় মানুষ জানে। তাহার অনন্ত অভিসারের পথে আকস্মিক কয়েক মুহূর্তের একত্র পথ চলার যে স্মৃতি রহিয়া যায় সেই স্মৃতিই নিত্য তাহার হৃদয়কে আনন্দ নিমগ্ন করিয়া রাখে।

কত লোক হইতে লোকান্তরের ভিতর দিয়া কত রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার

অনন্ত অভিসার। সেই অনন্ত কোটি রূপ বিবর্তনের কোন পরিচয় মানুষ জানে না। মানুষের প্রেমে তাহার একটি মাত্র রূপ ধ্যান-লোকে অমর হইয়া থাকে।

প্রাণের বিক্ষোভের ঊর্ধ্বে মানুষ পরিণামে ধ্যানে চির অম্লান সৌন্দর্য ও প্রেমের লোকটি লাভ করিয়া ধন্য হয়।

"তোমার প্রীতি ছিন্ন জীবন
গেঁথে গেঁথে আনে।" (কল্যাণী)

যে লোক আশ্রয় করিয়া মানুষ অসীমের স্পর্শলাভ করে তাহাই অধ্যাত্ম-লোক। এই অধ্যাত্ম-লোকে কবি অসীমের যে প্রেরণা অনুভব করিতেন, তাহা তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণাও বটে।

"আমার কাব্যকুঞ্জ বনে
কত অধীর সমীরণে
কত যে ফুল কত আকুল
মুকুল খসে পড়ে—" (কল্যাণী)

সেই ধ্যান-লোক এবং প্রগাঢ় ধ্যান তন্ময় মুহূর্তে কেমন করিয়া অন্তরে অসীমের ছায়াপাত ঘটে তাহারই পরিচয়।

"সবাই ঘুমালে জনহীন রাতে
একা আসি তব দুয়ারে।" (অন্তরতম)

তাহারপর

"চকিতে তোমার ছায়া দেখি যদি
ফিরে আসি তবে গরবে। (অন্তরতম)

এইরূপে কবি ধীরে ধীরে মর্ত্যের প্রাণ-লীলার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন।

"পথে যত দিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা।
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।" (সমাপ্তি)

বহির্লোকের বহুবিচিত্র রূপ ধ্যান-লোকে একটি রস-বিগ্রহে পরিণত হয়।

'ক্ষণিকা'র এই অধ্যাত্ম জাগরণ একান্ত আকস্মিকভাবে কবির একপ্রকার অজ্ঞাতেই ঘটিয়া গিয়াছে। নিয়তির অমোঘ নিয়মের বশে 'ক্ষণ'-চেতনার লোক

হইতে শাশ্বত অধ্যাত্ম-লোকে অধিষ্ঠিত হইয়া যাইতে কবি স্বয়ং বিস্মিত হইয়া গিয়াছেন।

"অবাক রহিনু আপন প্রাণের
নূতন গানের রবে।" (সমাপ্তি)

কিন্তু জীবনের প্রতি গভীর আসক্তিকে তো সহজে মুছিয়া দেওয়া যায় না, কবির পক্ষে তাহা আরও কষ্টকর। জীবনকে অমন করিয়া ভালবাসিতে কবির মত আর কে পারিয়াছে। আরও পরিণত বয়সে অধ্যাত্ম-পিপাসা যত গভীর হইয়াছে, জীবনের প্রতি মমতা তত তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। কবির সে এক অত্যাশ্চর্য মানসিক দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের পরিমাপ করিবে কে?

"চিহ্ন কি আছে শ্রান্ত নয়নে
অশ্রু জলের রেখা।" (সমাপ্তি)

নৈবেদ্য

মানব সত্তার চরমতম অস্তিত্বকে ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি করিবার আকাঙ্ক্ষা অস্তিত্ববাদীদের (Existentialists) মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তি-সত্তা বলিতে Kierkegaard সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন কোন সত্তা বুঝিতেন না। ব্যক্তি-সত্তা বলিতে তিনি ভগবদ্ বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সহিত যোগের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণরূপে রূপান্তরিত সত্তাকে বুঝিতেন। তাঁহারা যে নিঃসঙ্গতার কথা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের দৃষ্টি সমক্ষে নিয়ত বাসের কথা বুঝায়। তাঁহারা বলেন, আমরা অন্য মানুষের উপলব্ধির মধ্যে বাস করিতে পারি এবং এইরূপে বোধের প্রসারতা ঘটাইতে পারি, কিন্তু মৃত্যু সম্পর্কে অন্য কোন মানুষের উপলব্ধি লাভ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আমাদের নিজেদের মৃত্যু সম্পর্কে উপলব্ধি লাভ করিতেও আমরা সম্পূর্ণ অসমর্থ। মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষকে যে ভয়ঙ্কর একাকীত্ব বোধ করিতে হয়, তাহার চিন্তা অস্তিত্ববাদীদের এক বিশিষ্ট লক্ষণ।

ব্যক্তির চরম সত্তার উপলব্ধি, কেবল ব্যক্তিগত ভাবে আপনার জন্য নয়, তাহা সকল মানুষের জন্য। যে চরম অস্তিত্ব হইতে ব্যক্তির উদ্ভব, তাহাকেই ফিরিয়া লাভ করিবার ভিতর দিয়া আমরা আত্ম ও পর, সীমা ও অসীম, কাল

ও কালাতীতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করি। এইরূপে ব্যক্তি-সত্তা লাভ বিশ্ব-সত্তা লাভ; নিখিল বিশ্বের প্রাণ-লোকের সহিত ব্যক্তির প্রাণ-লোকের সংযোগ সাধন।

অস্তিত্ববাদীদের বিচিত্র বিরুদ্ধ চিন্তা-ধারার মধ্যে যে একটি মূল ঐক্য লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইল বস্তুতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত উদ্বেগের ঊর্ধ্বে মুক্তির আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য।

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে বিশেষ করিয়া রেনেসাঁর যুগ হইতে যে বস্তুতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় অস্তিত্ববাদ প্রধানত তাহাকেই প্রতিবাদ করিতে চাহিয়াছে।

মনকে যতই প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ করা যাক না কেন, তাহা আদৌ সীমার বোধ বলিয়া উহার সহায়তায় অসীমের উপলব্ধি অসম্ভব। মানুষ কেবল এই চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে।

মন ও বুদ্ধির সহায়তায় জগৎ ও জীবনের স্বরূপ কিংবা অর্থ নিরূপণের যে চেষ্টা তাহা অহং বা আমিত্বের বোধ দ্বারা তাহারই বিচিত্র সংস্কার এবং বাসনার অনুকূল করিয়া গড়িয়া তোলা একটি খণ্ডিত ধারণা মাত্র।

সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী প্রয়াসের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন যে, মানবীয় চেতনায় জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ লাভ ঘটে না। নৈবেদ্যের মধ্যে তাই কবির মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া উঠিবার অমন প্রাণপণ প্রয়াস।

"আমি যত দীপ জ্বালি শুধু তার
জ্বালা আর শুধু কালি,—"

মানবীয় চেতনাকে ভিত্তি করিয়া তাহাকেই একমাত্র সত্য-ধৃতি বলিয়া মানিয়া লইয়া জীবন ও জগতের যে স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়াস তাহা এমনি ব্যর্থ হইয়া যায়। অমর্ত্য-লোক হইতে যখন আলোক নামে তখন আর সংশয় থাকে না।

রুদ্ধ গৃহের অন্ধকার দূর করিতে আমরা প্রদীপ জ্বালি। উহারই ক্ষীণ আলোকে, আভাসে, প্রত্যয়ে আমাদের দিন একভাবে কাটিয়া যায়। মনের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে বুদ্ধি ও কল্পনার আলো জ্বালাইয়া আমরা জীবনের অর্থ নিরূপণ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করি। সে চেষ্টা অমন করিয়া ব্যর্থ হইয়া যায়।

রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিলে অবারিত আলোর ধারা নামিয়া আসিয়া মুহূর্তে সমস্ত কিছুকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলে, তেমনি আর কিছু নয়, মানবীয় চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হইবে, তাহা হইলে মানবীয় চেতনার সকল প্রয়াস স্তম্ভিত হইয়া অনন্ত সত্যের প্রকাশ আপনিই ঘটিবে।

মন ও বুদ্ধির সহায়তায় অসীম বা অরূপের স্বরূপ উপলব্ধি অসম্ভব। ওই লোকে অধিষ্ঠিত হইলে যে সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, যে পূর্ণ জ্ঞানে সমগ্র চেতনা উদ্ভাসিত হইয়া যায়, দেহ-প্রাণ-মনে যে অলৌকিক আনন্দের শিহরণ জাগে, তাহা মানুষ যদি মুহূর্তের জন্য আভাস স্বরূপেও লাভ করে, তাহা হইলে তাহার এই বুদ্ধিজাত প্রয়াস, এই সকল জ্ঞান, সৌন্দর্য ও প্রেমের এই বিচিত্র আনন্দতত্ত্ব একান্ত তুচ্ছ হইয়া উঠে। অনন্ত জ্যোতির প্লাবনে উহারা জীর্ণ পত্রের মত কোথায় ভাসিয়া যায়।

মনুষ্যবুদ্ধি বহু শাখাযুক্ত। এই জীবন ও জগৎ লইয়া উহা তাই অনন্ত তত্ত্ব গড়িয়া তুলিতে সমর্থ। মানুষ বুদ্ধি ও বোধের সহায়তায় সৃষ্টির আদিকাল হইতে বিচিত্র তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও এইরূপে গড়িয়া তুলিবে। সীমাশ্রয়ী এই সকল তত্ত্বের আদি নাই, অন্ত নাই। এই প্রত্যেকটি তত্ত্বের মধ্যে সত্য কিছু-না-কিছু থাকে, (মানবীয় চেতনার ইহাই স্বরূপ) কিন্তু পূর্ণ সত্যের প্রকাশ ইহাদের মধ্যে নাই।

রাত্রির অন্ধকারে আমরা দীপ জ্বালি, আকাশে নক্ষত্র শ্রেণী শোভা পায়, খদ্যোৎ আলোর মায়া রচনা করে, আলেয়া প্রহেলিকা সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে জ্যোতির্ময় সূর্যের প্রকাশ কতটুকু। সূর্যোদয়ে ওই সমস্ত কিছু মিথ্যা হইয়া যায়। সীমা ও অসীম, মানবীয় ও ঈশ্বরীয় চেতনা তেমনি ভাস্বর সূর্যের পার্শ্বে দীপ-শিখা। সীমার বোধ ছাড়াইয়া কবি তাই অসীমের বোধে আপনার চেতনাকে উদ্ভাসিত করিতে চাহিয়াছেন ঃ

“পরশ মণির প্রদীপ তোমার
অচপল তার জ্যোতি,
সোনা করে দিক পলকে আমার
সব কলঙ্ক কালো।”

শাস্ত্রে তাই একথা উল্লেখ করা হইয়াছে।—

“জীবিতাবস্থায়ই যখন বুদ্ধির বন্ধন সমূহ বিনষ্ট হয় তখন মর মানুষ অমর হয়। এইটুকু মাত্র সকল বেদান্তের উপদেশ।” (কঠোপনিষৎ)

জীবন ও জগৎকে দুইটি চেতনায় প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি মানবীয় চেতনায়, অপরটি দিব্য-চেতনায় একটি সীমার দিক হইতে অপরটি ভূমা বা অসীমের দিক হইতে।

আমরা আমাদের বোধের দ্বারা এবং এই বোধের সহিত অন্বিত করিয়া জীবন ও জগৎকে উপলব্ধি করি। মানবীয় বোধ খণ্ডিত বলিয়া ওই উপলব্ধিও খণ্ডিত। এই আমির বোধ দ্বারা গড়িয়া তোলা সীমার অতীত লোকের অস্তিত্ব আমাদের চেতনায় থাকিতে পারে না। আমার 'আমি'র এই জগৎ হইতে যখন কিছু স্খলিত হইয়া যায়, অর্থাৎ যাহা আমাদের বোধের অতীত হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে একান্ত বিনষ্টি বা শূন্যতা ছাড়া আর কিছু আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমার চেতনায় যাহার অস্তিত্ব, আমার চেতনার বহির্লোকে তাহার কোন অস্তিত্ব নাই।

তাই আমির চেতনায় সীমার বোধে এই অনস্তিত্বের অসহনীয় বেদনা আমাদের প্রতি মুহূর্তে লাভ করিতে হয়। মানুষের এই শোকে সান্ত্বনা নাই। সেখানে সমস্ত কিছু মুহূর্তে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; বুকে যাহাকে জড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছি, তাহা হৃদয় শূন্য করিয়া পর মুহূর্তে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। চক্ষু মুছিয়া আবার আশায় বুক বাঁধিয়া আর কাহাকে জড়াইয়া ধরিতেছি। সেও একদিন হৃদয়ে দারুণতম শেল বিদ্ধ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। মানব জীবন লইয়া এই এক রক্ত মোক্ষণকারী নিষ্ঠুরতম লীলা চলিতেছে। জীব-জীবনের এই নিয়তি সাক্ষাৎকার:

"নদীতটসম কেবলি বৃথাই
প্রবাহ আঁকড়ি রাখিবারে চাই,
একে একে বুকে আঘাত করিয়া
ঢেউগুলি কোথা যায়।"

মর্ত্য-চেতনার সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে দিব্য-চেতনা-লোকে মানুষ জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকেই অনন্ত স্বরূপ বলিয়া বোধ করে। যাহা অনন্ত স্বরূপ, অনন্তের প্রকাশ সে কোথায় হারাইয়া যাইবে! অনন্তের বাহিরে তো কিছু থাকিতে পারে না:

"যাহা যায় আর যাহা থাকে
সব যদি দিই স'পিয়া তোমাকে

তবে নাহি ক্ষয়, সবি জেগে রয়
তব মহা মহিমায়।"

অনুরূপ উপলব্ধির পরিচয়—

"যাঁহাতে কেহ অপর কিছু দেখে না, অপর কিছু শুনে না, অপর কিছু জানে না, তিনিই ভূমা ; আর যাহাতে অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে—তাহাই অল্প। যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত ; আর যাহা অল্প তাহা মর। "হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?" "স্বমহিমায়, অথবা মহিমায়ও নয়।"

(ছান্দোগোপনিষৎ)

অন্যত্র কবি বলিতেছেন ঃ

"বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু, তাই
বিশ্বজোড়া সে লিপির অর্থ বুঝি নাই।"

"বিপরীত মুখে তারে পড়েছিনু" বলিতে এই জাগতিক চেতনায় 'আমি' বা সীমা-বোধের মধ্য দিয়া জগৎ ও জীবনের অর্থ অন্বেষণের চেষ্টার কথাই কবি বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন।

কবি তাই সীমার সকল বোধ ছাড়াইয়া উঠিবার জন্য উন্মুখ। আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তবে অসীমের পথে যাত্রা করিতে হয়। এই দুঃসহ বেদনার কী পার আছে! ইহাতে হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রী যেন ছিন্ন হইয়া যায়। আর একটি বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ একদিন এমন বেদনাকেও জয় করিয়া উঠে। এই বোধ একটি বিশেষ মনোভাব, অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে 'আমার' পরিপ্রেক্ষিতে নয়, 'তোমার' পরিপ্রেক্ষিতে দেখা। এই দেহ-প্রাণ-মন তোমার লীলার আধার, তোমার কর্মের আয়ুধ। আমার জীবনে তোমার সকল দান তোমার কোন নিগূঢ় ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহা চরিতার্থ হইলে তুমি কোন একটা স্বরূপে তাহাদের তোমার মধ্যে আবার সংহত করিয়া লইবে।

এই মনোভাবটিকে নিয়ত চর্চা করিয়া চিন্তা এবং জীবনকে একাত্ম করিয়া তুলিতে হয়। পরিণামে আমিত্ব বোধের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বন্ধন ও আসক্তির সকল বেদনা দূর হইয়া যায়। এই মনোভাব ব্যতিরিক্ত আসক্তি জয়ের যে চেষ্টা তাহাতে আস্তিক্যের কোন দিক নাই বলিয়া ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। উহা তাই জীবনে ঘোর শূন্যতা সৃষ্টি করে। ইহা আনন্দের সাধনা নয়। এই আনন্দের অভাবে মানুষের দেহ-প্রাণ-মন জীর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে ঃ

"তীর সাথে হেরো শত ডোরে
বাঁধা আছে মোর তরীখান।
রশি খুলে দেবে কবে মোরে,
ভাসিতে পারিলে বাঁচে প্রাণ।"

ইতিপূর্বে জীবন ও জগতের যে স্বরূপ প্রতিভাত হইয়াছিল, কবি তাহার নানা পরিচয় তাহার কাব্য মধ্যে দান করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কবি অপূর্ণতার পীড়া বোধ করিয়াছেন। পরিপূর্ণতা কোথায় যেন রহিয়াছে, তাহারই কতকগুলি আভাস ও ইঙ্গিত লইয়া সেই পূর্ণ রূপটিকে ফুটাইয়া তুলিবার ইহা শুধু ব্যর্থ চেষ্টা।

দিব্য-চেতনা সাক্ষাৎকারে কবির কাব্য সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টির আধারে পরিণত হইবে, ইহা কবি বিশ্বাস করিতেন ঃ

"তারা শুনাক এবার
সমুদ্রতীরের তান, অজ্ঞাত রাজার
অগম্য রাজ্যের যত অপরূপ কথা
সীমাশূন্য নির্জনের অপূর্ব বারতা।"

সীমার দিক হইতে জীবন ও জগৎকে সাক্ষাৎ করা যায়, জীবনে ইহার একটি বিশিষ্ট রস-প্রেরণা আছে, এই রস মানুষের একটি বিশিষ্ট পিপাসা চরিতার্থ করিয়া থাকে। জীবন ও জগৎকে আবার অসীমের দিক হইতে দেখা যায়। এই সাক্ষাৎকারের একটি বিশিষ্ট রস প্রেরণা আছে। উহা মানুষের আর এক পিপাসা চরিতার্থ করে।

এতকাল কবি সীমার দিক হইতে জীবন ও জগতের বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এখন অসীমের দিক হইতে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুল।

অসীম আদৌ সীমা বোধের বিস্তার নয় বলিয়া, অসীমকে লাভ করিতে মানবীয় সকল বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। ইন্দ্রিয় আমাদের সকল উপলব্ধির আশ্রয়। ইন্দ্রিয়ের বিচিত্র বোধকে আমরা এক একটি ভাব-সূত্রে গ্রথিত করিয়া মানস-লোকে নানা তত্ত্ব গড়িয়া তুলি।

অসীমে অধিষ্ঠিত হইতে তাই ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বার নিরুদ্ধ করিয়া দিতে হয়। ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে চেতনার যে ক্ষীণ দীপ জ্বালাইয়া আমরা এই বিশ্ব-রূপ দর্শন করি, সেই সকল দীপ একে একে নিভাইয়া দিতে হয়। তাহার পর অন্তরে

ভাব-লোকে যে বিচিত্র রূপ-লোক ইতিপূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকেও ধীরে ধীরে মুছিয়া দিতে হয়।

"বর্ণে বর্ণে সুরঞ্জিত বিশ্বচিত্রখানি
ধীরে ধীরে মৃদু হস্তে লও তুমি টানি
সর্বাঙ্গ হৃদয় হতে, দীপ্ত-দীপাবলি
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে দ্বারে ছিল যা উজ্জ্বলি
দাও নিবাইয়া।"

কেবল অন্তরের পথে ধ্যান-লোকের ভিতর দিয়া দিব্য-চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে হয়। বাহিরে আর কোন স্বরূপে তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। নৈবেদ্যের মধ্যে ইহার যে স্বীকৃতি আছে তাহার পরিচয় লাভ করিতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"সেথায় সকলি স্থির নির্বাক
ভাষা পরাস্ত মানি।"

"যখন সূর্য ও চন্দ্র অস্তমিত, অগ্নি নির্বাপিত, যখন বাক্ নিরুদ্ধ তখন এখানে মানুষ কোন আলোক পায়?" তিনি বললেন, 'তখন বস্তুত আত্মা আলোক হয় * * * ইত্যাদি।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

যে পরিণাম লাভ করিলে অমর্ত্য-চেতনার আভাস লাভ করা যায়, সে পরিণামে জাগতিক সকল বোধ স্তম্ভিত হইয়া যায়। মানবীয় যে-কোন চেতনা আশ্রয় করিয়া সে পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না।

অবিক্ষুব্ধ চিত্তের এই অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোকের বিচিত্র পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি; নৈবেদ্যের মধ্যেও তাহার পরিচয় মিলিবে।

"স্থির যোগাসনে চির অনন্দ
তাহার নাহিক নাশ।"

ইহা মানুষের সেই অধ্যাত্ম সত্তা, ধ্যান-লোক। বহির্জগতে মানুষ নানা ভাবে বিক্ষুব্ধ, নানা চিন্তা ও ভাবনার তরঙ্গে নিয়ত আন্দোলিত। এখানে মানুষের ক্ষতি ও নিন্দা, মৃত্যু ও বিচ্ছেদ, হতাশা ও ব্যর্থতা; কিন্তু ধ্যান-লোক অচঞ্চল। ইহা ঊর্ধ্বতর শাশ্বত চেতনার সহিত যুক্ত। মানুষ সকল পাওয়া ও হারাণো, সকল লাভ ও ক্ষতির ঊর্ধ্বে এই লোক। মৃত্যুতে আর সব বিনষ্ট হইয়া যায়, ধ্যান-লোকের বিনাশ ঘটে না:

"তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু
কোথা বিচ্ছেদ নাই।"

মানুষ যখন দিব্য-চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করে এবং ঐ চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া জীবন ও জগৎ প্রত্যক্ষ করে তখন সমস্ত কিছু অসীম বা অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। তখন বিনষ্টি, মৃত্যু বা বিচ্ছেদ এবং তজ্জাত দুঃখ কেবল একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ বলিয়া বোধ হয়। আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনায় অসীম সত্তার সীমাবদ্ধ রূপ চোখে পড়ে, বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠে।

একদিকে এই সৃষ্ট জগৎ, অন্যদিকে মানবীয় চেতনার ঊর্ধ্বে দিব্য চেতনা-লোক, সেখানে দেশ-কালের বোধ বিশুষ্ক পুষ্প দলের মত কোন শূন্যে ঝরিয়া হারাইয়া যায়। এক প্রান্তে জাগতিক সত্তা, অন্য প্রান্তে দিব্য সত্তা; এই দুই সত্তা কোন্ সূত্রে বিধৃত, সমগ্র জ্ঞান যোগ এই একটি মাত্র প্রশ্নের উত্তর সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছে।

জীবনকে পরিপূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎসত্ত্বেও তিনি অন্তরে বারংবার এমন একটি প্রেরণা বোধ করিয়াছিলেন যাহাকে মানবীয় চেতনার দ্বারা ব্যাখ্যা করা একপ্রকার অসম্ভব।

ঊর্ধ্বতর চেতনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অন্তরে কোন কালে মুহূর্তের জন্য সংশয় জাগে নাই। এই উভয় সত্তার গূঢ় মিলন-তত্ত্ব লাভ করিতে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া চেষ্টা করিয়াছেন। নৈবেদ্যের মধ্যে মানবীয় চেতনা আশ্রয় করিয়া কবি কোন্ তত্ত্ব গড়িয়া তুলিয়াছেন, কোন্ উপায়ে মানবীয় চেতনার সহিত উহার একপ্রকার সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা আমরা লক্ষ্য করিব।

বলিয়াছি, মানস-চেতনায় কবি ক্ষণে ক্ষণে দিব্য-চেতনার চকিত স্পর্শ লাভ করিতেন। দিব্য স্বরূপে অবস্থান করা নয় মানস-লোকে তাহার চকিত আভাস লাভ করাই এক্ষেত্রে কবির পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহাতে যে জগৎ ও জীবনের পূর্ণ স্বরূপের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় না, সকল সমস্যাই যে অমীমাংসিত রহিয়া যায় তাহা আমরা জানি। এই কারণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কবির জীবনে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা রহিয়া গিয়াছিল। জীবন ও জগতের দুর্লভ মাধুর্যে কবি চিরকাল মুগ্ধ, বিস্মিত, ধন্যবোধ করিলেও উহা তাঁহার নিকট অনন্ত রহস্যাবৃত রহিয়া যায়। ধ্যানের নিবিড় তন্ময় মুহূর্তে

কবি যেখানে দিব্য চেতনার আভাস লাভ করিয়াছেন, সেই খানেই কবির কাব্য সাধনার সিদ্ধি। কবির স্মৃতি-লোকে দিব্য আনন্দ আস্বাদের যে কয়েকটি মুহূর্ত সঞ্চিত রহিয়াছে, সেই মুহূর্তগুলিই কবির পরম সম্পদ হইয়া উঠিয়াছে ঃ

"কত মুহূর্তের পরে
অসীমের চিহ্ন লিখে গেছ।"

ওই আনন্দের পথ বাহিয়া যে অসীম কবির অন্তরে আপনার স্পর্শ দান করিয়াছেন, ধ্যান বা মানস-লোকে আনন্দের স্মৃতিগুলি রহিয়া যায়। এই প্রত্যেকটি দুর্লভ মুহূর্তে মানুষ আপনাকে সর্বাধিক গভীর করিয়া অনুভব করে। মানুষের আর কোন অনুভূতি এত তীব্র, এত গভীরভাবে অনুভূত হয় না বলিয়া তাহাদের সব স্মৃতি মুছিয়া যায়। এই আনন্দ মুহূর্তগুলি জীবনের শ্রেষ্ঠ স্মৃতি, মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ ভাগ। ইহা মানুষের অসীম বা অনন্তের দিক। এই পথ দিয়া যে সে ক্ষণে ক্ষণে অসীম বা অরূপের স্পর্শ লাভ করে। মানুষের আর সব দিক তো সীমার দিক, মৃত্যুর দিক। কেবল সৌন্দর্য-ধ্যানই নয়, নর-নারীর প্রেমের বোধও কবিকে ক্ষণে ক্ষণে এই অধ্যাত্ম পরিণাম দান করিয়াছে।

"সকল প্রেমের স্নেহের মাঝারে
আসন সঁপিব হৃদয় রাজারে
অসীম তোমার ভুবনে রহিয়া
রবে মম ভবনে—"

মানবীয় চেতনা, ওই চেতনাশ্রয়ী বিচিত্র বোধের স্বরূপ যেমনই হোক-না-কেন, উহা দিব্যসত্তার স্বরূপ ও ধর্ম হইতে যত পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হোক, একথা সত্য যে মানবীয় কোন বোধই একান্ত মিথ্যা নয়, এই সকল বোধ, এই সমস্ত কিছু দিব্য চেতনারই পরিণাম।

অধ্যাত্ম-সত্তায় পার্থিব সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান পরিণামে পরম তত্ত্বের যতটুকু আভাস দান করে কবি তাহাতেই তৃপ্ত। জগৎ ও জীবন এই অর্থে কবির অমৃত পাত্র। ওই পাত্র ভরিয়া তিনি আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া অমৃত পান করিয়াছেন। অধ্যাত্ম-সত্তা বা ধ্যান-লোক কবির অমৃত পাত্র। আবার জাগতিক প্রীতি ও সৌন্দর্য কবির ওই ধ্যান-লোকটি গড়িয়া তুলিয়াছে। মানবীয় চেতনা ছাড়াইয়া কবির নিকট অসীমের চেতনা শূন্যময় হইয়া পড়ে। কেবল এই চেতনার যোগে অসীমের চেতনা কবির নিকট সত্য। আবার অসীমের যোগেই কবির মানস-সত্য। এই দুই কবির নিকট শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব।

"যত প্রেম আছে সব প্রেম মোরে
তোমা পানে রবে টানিতে।"

কিংবা

"সেই মোর মুগ্ধ মন
বীণাসম তব অঙ্কে করিনু অর্পণ—
তার শত মোহ তন্ত্রে করিয়া আঘাত
বিচিত্র সঙ্গীত তব জাগাও, হে নাথ।"

মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধন ফল লাভ, দিব্য-চেতনার চকিত সাক্ষাৎকার লাভ করাও নয়, সেই শ্রেষ্ঠ ফল লাভ হইল ভক্তি। ভক্তি কি, না মানবীয় সকল চেতনা ও অনুভূতিকে ঈশ্বরমুখীন করিয়া দেওয়া, এবং এই বোধ লইয়া জীবন অতিবাহিত করা। মর্ত্য জীবনে ইহার অধিক ফল লাভ আর কিছু নাই। সত্য এই একমাত্র নিরন্তর প্রার্থনা, 'আমার মর্ত্য জীবনের সকল অনুভূতি যেন তোমার অনুভূতি লাভে সহায়তা করে। আমার অনন্ত বোধ তোমার মন্দিরের দিকে যাত্রা করিবার অনন্ত পথ।' বস্তুতঃ, যে-কোন অনুভূতিই থাকুক না কেন, তাহার পশ্চাতে যদি স্বার্থ বা 'আমি'র প্রেরণা না থাকে তাহা হইলে তাহা পরিণামে মুক্তি দেয়।

কবির একটি সুপরিচিত কবিতার উল্লেখ করিব, তাহাতে জীবন ও জীবনাতীত উভয় পিপাসাকে কবি কোন্ তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

জগৎ ও জীবনের অপার সৌন্দর্য ও প্রেম কবির অন্তরে ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলিতেছে, এই ধ্যান আশ্রয় করিয়া কবি-চেতনা আবার মুহূর্তে মুহূর্তে অনন্তের অমৃত আস্বাদ করিতেছে:

"এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়।"

আসক্তি ও মোহ বিজড়িত প্রেম যেখানে অধ্যাত্ম পরিণাম লাভ করে রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহাই ভক্তি, এই অধ্যাত্ম পরিণাম যেখানে অনন্তের চকিত আস্বাদ দান করে রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহাই মুক্তি।

মানবীয় বিচিত্র অনুভূতি আশ্রয় করিয়া পরিণামে অনন্তের স্পর্শ লাভ, ইহাই

পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র সাধনা হইয়া উঠিয়াছে। দিব্য-চেতনাধিষ্ঠিত হওয়া নয়, মানবীয় চেতনায় অনন্তের পিপাসা জাগ্রত করা, মানবীয় সকল অনুভূতিকে অনন্তমুখীন করিয়া দেওয়া ইহাই রবীন্দ্রনাথের সাধনা। অনন্তের জন্য যে প্রেরণা মানুষ কোন-না-কোন রূপে বোধ করে সেই প্রেরণাকে সঞ্জীবিত এবং তীব্রতর করিয়া তুলিবার সাধনা রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সাধনা।

"খেলা-মাঝে শুনিতে পেয়েছি থেকে থেকে
যে চরণধ্বনি—আজ শুনি তাই বাজে
জগৎসঙ্গীত-সাথে চন্দ্রসূর্য-মাঝে।"

এক অনন্ত স্বরূপ বিশ্বসৃষ্টির নানা রূপের মধ্যে চন্দ্র সূর্য তারকায় উদ্ভাসিত। এক আনন্দ জীবনের সকল অনুভূতির মধ্যে লীলায়িত। এক ছন্দ অনন্ত লোক পূর্ণ করিয়া জীবন-বীণায় নানা সুরে ধ্বনিত হইতেছে।

যে স্বরূপে হোক জগৎ ও জীবনকে রবীন্দ্রনাথ পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন; এবং যে-কোন পরিণাম লাভের জন্য তিনি মানবীয় চেতনাকে পরিহার করিতে ইচ্ছুক নন।

মানবীয় চেতনায় জীবন ও জগতের যে স্বরূপ প্রতিভাত হয় তাহা যদি অপূর্ণ ও অজ্ঞানতাও হয়, তবু এই মোহ অজ্ঞানতা জাত যে রস-পিপাসা রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই সমস্ত জীবন ধরিয়া চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন। মাননীয় চেতনার ঊর্ধ্বে উঠিবার অতি প্রবল প্রেরণা কবি মাঝে মাঝে বোধ করিলেও এবং ওই প্রেরণার সহিত জীবন ও জগতের একপ্রকার তত্ত্বাশ্রয়ী সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা লক্ষিত হইলেও কবি এই জীবনও জগৎকেই পরিপূর্ণরূপে স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে প্রবৃত্ত হইয়া পাঠকবর্গকে এই উভয় চেতনা সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। এই উভয় চেতনার মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের জন্য কবি সমগ্র জীবনভোর যে সংগ্রাম করিয়াছেন তাহার স্বরূপও বুঝিয়া লইতে হইবে। রবীন্দ্র-কাব্য-প্রবাহের বিচিত্র ধারা এই এক সাগর-সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

একদিকে অজ্ঞানতা ও মোহ বিজড়িত মর্ত্য-প্রেম পিপাসা, অন্যদিকে অমর্ত্য চেতনা লাভের জন্য খাঁটি অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা ;—এই উভয় প্রেরণাই কবির নিকট সত্য। কবির হৃদয়ে এই উভয় প্রেরণা কাল বৈশাখীর ভয়াবহ ঘূর্ণি তুলিয়াছে। আর অতি স্থির দৃষ্টিতে তিনি উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

জীবনাবেগ যেখানে সত্য সেখানে উভয় প্রেরণার দ্বন্দ্ব থাকিবেই, কিন্তু সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটিকে তাঁহারা পরিণামে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়াছেন। এই সংগ্রামটি তাই দীর্ঘ স্থায়ী হইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথের জীবনে প্রাণের আবেগ যেমন অত্যন্ত প্রবল, তেমনি তাহা উভয় প্রেরণার পশ্চাতে ক্রিয়া করিয়া সংঘাতকে যেমন ভয়ংকর করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরিচয় ভারতীয় জীবন সাধনায় একান্ত দুর্লভ।

একদিকে চিরন্তন স্থির চেতনা-লোক, অন্যদিকে দেশ-কালের মধ্যে তাহারই সংখ্যাতীত বিচিত্র প্রকাশ-চাঞ্চল্য। অরূপ কেমন করিয়া কোন্ রহস্যের বশে রূপে রূপে বহুধা হইলেন, তাহা জানিতে না পারা গেলেও এই দুইয়ের মধ্যে কোথাও যে মিল আছে, দুই যে সম্পূর্ণ বিপ্রকৃতিক নয়, একান্ত বিচ্ছিন্ন নয়, এই অধ্যাত্ম প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথের ছিল।

সীমা ও অসীম শাশ্বত যুগ্ম তত্ত্ব। কোন একটিকে অস্বীকার করিয়া আর একটিকে একান্তরূপে লাভ করিবার চেষ্টা করিলে জীবনে পূর্ণতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। অসীম বা অরূপকে লাভ করিতে হয় সীমা বা রূপের ভিতর দিয়া। জাগতিক সৌন্দর্য ও মানবিক প্রেমের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় সৌন্দর্য ও প্রেমে উত্তীর্ণ হইতে হয়। আর কোন পথ নাই। জাগতিক সৌন্দর্য ও মানবিক প্রেমকে অস্বীকার করিলে, জীবনে তাহার প্রকাশকে রুদ্ধ করিলে ঈশ্বরীয় প্রেম ও মাধুর্যের সহিত সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সাধনা পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা। নিম্নতর সকল চেতনা ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের পূর্ণ বিকাশ ঘটিলে তবেই দিব্য-চেতনা লাভে মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করে। নহিলে জীবনে তাহার কোন ফল লাভ ঘটে না।

সকল চেতনা বিকাশের জন্য ব্যক্তিকে অনিবার্যরূপে বিশ্বকে আশ্রয় করিতে হয়, বিশ্বের সৌন্দর্য-মাধুর্য ও প্রেম। এমনি করিয়া একটি চেতনা বিকাশের ভিতর দিয়া, অর্থাৎ বিশ্বের সহিত ধীর মিলন বোধের ভিতর দিয়া মানুষ পরিণামে ঈশ্বরীয় সত্তার সহিত মিলিত হয়।

ঈশ্বরীয় সত্তার উপলব্ধি কোন একটি স্থানে কোন একটি পরিণামে একান্ত হইয়া নাই। জীবনের সকল পর্যায়ে সকল রূপে তাঁহার সহিত মানুষের মিলন ঘটে:

"চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখ শোক,

যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপতিস যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।"

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর শাশ্বত অনন্ত চেতনাকে যদি গৃহের অন্তঃপুর বলা যায়, তবে অনন্ত সৃষ্টি-লোক যেন তাহার অঙ্গন। প্রাঙ্গণে সমস্ত দিনের ক্রীড়া সমাপ্ত করিয়া মানব শিশু গৃহের অভ্যন্তরে বিশ্রাম লাভ করিতে যায়। অসীম ও সীমা যেন একটি গৃহের অন্তঃপুর ও প্রাঙ্গণ। জীব এই ঊর্ধ্ব পরিণাম, এই ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভ করিয়া চির বিশ্রাম লাভ করে। রূপ-লোক হইতে রূপ-লোকে জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাহার ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভের পর্যায়, অরূপে তাহার চির অবসান।

"খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিতমনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।"

এই উপলব্ধিটিকেই কবি আর এক ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মানবীয় সীমার বোধে এক সত্তার যে স্বরূপের প্রকাশ ঘটে তাহার ঊর্ধ্বতর চেতনায় সেই এক সত্তার আর এক স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়। সীমা যেন ত্রিপার্শ্ব কাঁচ খণ্ড, উহার উপর নিপতিত দিব্য-আলোক-রশ্মি ভাবের বহু বর্ণে বিচ্ছুরিত হইয়া যায়। ওই কাঁচখণ্ড সরাইয়া লইলে, কোন একটা উপায়ে সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে দিব্য-চেতনার শুভ্র নিরঞ্জন রূপ প্রকাশ পায়।

মানবীয় চেতনার বিচিত্র লীলা, তাহার অন্তহীন মাধুর্য ও প্রেম তো একান্ত মিথ্যা নয়। এই সমস্ত কিছু তাঁহারই বিশিষ্ট প্রকাশ।

"—নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতি ক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধে গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।"

আর অন্যদিকে কেবল স্থির চেতনার অপার বিস্তার। সেখানে—

"দিন নাই রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই—নাই নাই নাই বাণী।"

"যেখানে এইরূপ দ্বৈত বোধ আছে সেখানে একে অন্যকে আঘ্রাণ করিতে

পারে, একে অন্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, একে অন্যকে শ্রবণ করিতে পারে, একে অন্যের সহিত কথা বলিতে পারে, সেখানে একে অন্যের চিন্তা করিতে পারে, একে অন্যকে উপলব্ধি করিতে পারে। যেখানে সমস্ত কিছু আত্মময় হইয়া যায়, সেখানে কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে প্রত্যক্ষ করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহার সহিত কথা বলিবে, কে কাহার কথা চিন্তা করিবে, কে কাহাকে উপলব্ধি করিবে। যাহার দ্বারা সমুদয় জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে কাহার দ্বারা জানিতে পারা যাইবে? কাহার দ্বারা জ্ঞাতকে জ্ঞাত হওয়া যায়।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

জীব-জীবনের সকল কর্মকে ঈশ্বরের নিয়োজিত কর্ম স্বরূপে নিরাসক্ত ভাবে সমাধা করাই শ্রেয়। সকল প্রয়াস সকল কর্মের মধ্যে যেন একটি নিরাসক্ত মন থাকে। এই নিরাসক্ত মন যেন সেই উর্ধ্বতর চেতনার সহিত নিয়ত যুক্ত থাকে।

"মোর সব কাজে মোর সব অবসরে
সে দুয়ারে রবে তোমারি প্রবেশ তরে।"

এমনি একটি নিশ্চিন্ত বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল যে, নানা পরিণামের ভিতর দিয়া একদিন তিনি সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারিবেন।

জলের গভীরে যেখানে আলোর ক্ষীণতম আভাস নাই, সেখানে যে কমল-কলিকাটি রহিয়াছে, সে কোন্ প্রেরণার বশে উর্ধ্বমুখী হইয়া ক্রমাগত দিনের পর দিন, রাতের পর রাত নিরন্ধ্র অন্ধকারের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পথ চলে? এই আশ্বাস সে কোথা হইতে লাভ করিল, যে একদিন সে আলোক-তীর্থে পৌঁছাইয়া যাইবে? তাহার পর সেই জ্যোতি সমুদ্রে স্নান করিয়া একটির পর একটি দল মেলিয়া পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-মাধুর্যে কমল জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিবে? এই অন্ধ আবেগই রবীন্দ্রনাথের জীবনে ভক্তি স্বরূপতা লাভ করিয়াছে।

জীবন হইতে জীবনে, লোক হইতে লোকে তাঁহার জীবন-তরী বহিয়া চলিয়াছে। যেন এক নিরবচ্ছিন্ন তীর্থযাত্রা। এক তীর্থ হইতে আর এক তীর্থে তিনি কেবলই চলিয়াছেন। দেবতার সাক্ষাৎ লাভের জন্য প্রস্তুতি, উৎকণ্ঠা, পরিশেষে দেবতার সাক্ষাৎলাভ ও মিলনে চরিতার্থতা; তাহার পর আবার নূতন তীর্থ লক্ষ্য করিয়া পথ চলার শুরু।

কোন্ লোকের তীর হইতে পাড়ি দিয়া নিস্তরঙ্গ, নীলিম আকাশ-সমুদ্র পার হইয়া তাঁহার জীবন-তরী এখানে এই মর্ত্যের ঘাটে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে তাহা

তাঁহার স্মরণে পড়ে না। তবে এই মর্ত্যলোক যে সেই এক পরম দেবতার আবাস স্থল, মন্দির ইহাতে তাঁহার কোন সংশয় নাই।

মানব সংসারে যে নিয়ত প্রয়াস তাহা তো সেই পরম দেবতারই বিচিত্র পূজারতি। এই প্রয়াস তো তাই মিথ্যা নয়, নিরর্থকও নয়, ইহার ভিতর দিয়া মানুষ আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, পরিণামে ঈশ্বরীয় বোধকে জীবনে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য। জীব-জীবনের বিচিত্র লীলাকে যখন এই ফল লাভের দিক হইতে সম্পূর্ণ করিয়া দেখি তখন জীবন পরিপূর্ণ অর্থ লইয়া প্রতিভাত হয়।

রবীন্দ্রনাথের অন্তরে উর্ধ্বতর চেতনা লাভের জন্য একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই চেতনা লাভের জন্য কান্না মাঝে মাঝে সকল তত্ত্ব ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

"ইহা জানি, কিছুই না জানিয়া অজ্ঞাতে
নিখিলের চিত্তস্রোত ধাইছে তোমাতে।"

'আমি'র বোধ যেখানে একান্ত হইয়া অসীমের বোধকে আচ্ছন্ন করিয়া দেয়, অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে যখন কেবল 'আমি' বা সীমার দিক হইতে দেখি, তখন মনে হয় মৃত্যুতে সমস্ত কিছু হারাইয়া যায়, অনস্তিত্ব হইয়া পড়ে।

মৃত্যুর চিন্তায় মুহূর্তে তাই আমরা বিহ্বল হইয়া পড়ি। জীবনের এমন অপরূপ প্রকাশ, এত সত্য, এত নিবিড় যাহার অনুভূতি, তাহা মুহূর্তে শূন্যময় হইয়া যায়। এত প্রেম, এত মাধুর্য, এই অনন্ত কোটি রূপ লোক, জল স্থল অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া এই যে আলোকের, শত বর্ণের, আনন্দের, অমৃতের প্রস্রবণ বহিয়া চলিয়াছে, এই সমস্ত কিছু মিথ্যা হইয়া যায়। জীবনের এই অমোঘ নিয়তি জানিয়াও আমরা তাই ব্যর্থ আসক্তিতে এই জগৎ ও জীবনকে প্রাণপণ বলে দুই বাহু দিয়া আঁকড়াইয়া ধরি, যদিও জানি সমুদ্রের প্রবল স্রোতের টানে ঐ আসক্তির বন্ধন বালুতটে তৃণ গুচ্ছের অবলম্বনের মত মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যায়।

"মৃত্যুও অজ্ঞাত মোর। আজি তার তরে
ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া কাঁপিতেছি ডরে।"

আমার বর্তমান চেতনা গড়িয়া উঠিয়াছে কোন অজ্ঞাত চেতনার ইচ্ছায়। এই মর্ত্য-লোকে যেমন আমার আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তেমনি অবসানও ঘটিবে তাঁহারই ইচ্ছায়। যাহা আমার ইচ্ছায় গড়িয়া উঠে নাই, তাহাকে আমার বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিবার এই ব্যর্থ চেষ্টা কেন। যিনি এই জীবনকে গড়িয়া

তুলিয়া এই জীবন ও জগৎকে ভাল লাগাইয়াছেন, মৃত্যুতে আমার জীবন আশ্রয় করিয়া তাঁহার ইচ্ছাই আর কোন রূপে সার্থক হইবে। এই তত্ব আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ মৃত্যু ভয় জয় করিয়া উঠিয়াছেন।

"মৃত্যুর প্রভাতে
সেই অচেনার মুখ হেরিবি আবার
মুহূর্তে চেনার মতো।"

এই জীবনে কোন দুঃখ-শোক, কোন তুচ্ছতা-ক্ষুদ্রতা মানুষকে লেশমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না যদি অন্তরের মধ্যে মানুষ উর্দ্ধতর সত্তার সহিত নিয়ত যোগ যুক্ত হইয়া থাকে। ইহাকেই বলে যোগ যুক্ত কর্ম ঃ

"সংসারে মোরে রাখিয়াছ যেই ঘরে
সেই ঘরে রব সকল দুঃখ ভুলিয়া।
করুণা করিয়া নিশিদিন নিজকরে
রেখে দিয়ো তার একটি দুয়ার খুলিয়া।

* * *

সে দুয়ার খুলি আসিবে এ ঘরে,
আমি বাহিরিব সে দুয়ার খানি খুলিয়া।"

নৈবেদ্যের মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে, যাহার মধ্যে কবি বিস্ষ্টির প্রাণ-ধারার সহিত আপন প্রাণের পূর্ণ মিলন বোধ করিয়াছেন।

মর্ত্যের অণুপরমাণু হইতে মহাশূন্যে অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্র পর্যন্ত সমস্ত কিছুই অচিন্তনীয় বেগে আবর্তিত হইতেছে, স্পন্দিত হইতেছে। তাহারই মাঝখানে একটি মানবিক সত্তা! তাহার আবির্ভাব ও বিলয় কত ক্ষণিক! তবু কোন রহস্যের বশে এই অপরিচিত ভয়ংকর বিশ্ব-লোক তাহার কাছে মাতৃ-ক্রোড়ের পরম শান্তি, নিশ্চিন্ত নির্ভরতা দান করে। বিশ্বে প্রাণের যে অন্তহীন লীলা চলিয়াছে সেই এক প্রাণই যে আমার চেতনায় 'আমি' রূপে প্রকাশিত মানুষ কোন একটি উপায়ে যখন ইহা বোধ করিতে পারে, তখন অনিশ্চিতের ভয় থাকে না। সকল প্রাণের যোগে চির অস্তিত্বের অনুভূতি-মুহূর্তে এই জগৎ ও জীবনকে পরম সুন্দর, একান্ত আপনার করিয়া তুলে। রবীন্দ্রনাথ সেই উপলব্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন ঃ

"রূপহীন জ্ঞানাতীত ভীষণ শকতি
ধরেছে আমার কাছে জননী মুরতি।"

একদিকে দিব্য-চেতনা-লোক, অন্যদিকে অনন্ত রূপ-লোক। একটি আত্মস্থিত চির স্তব্ধতার দিক, অপরটি চির চঞ্চল, নিয়ত পরিবর্তনশীল। এই উভয় চেতনার মধ্যে যোগ কোথাও রহিয়াছে। সেই পূর্ণ মিলনভূমি লাভ করিলে এই বোধ প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে, যে এক দিব্য-সত্তাই আপনাকে রূপে রূপে অনন্ত বৈচিত্র্য দান করিয়াছেন। তখন জীব একপ্রান্তে অসীমে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্য প্রান্তে অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আপনাকেই লীলায়িত হইতে দেখে।

"তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্য কাল ধ'রে
অণু পরমাণুদের নৃত্যকলোরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।"

একদিকে দিব্য-চেতনার অচঞ্চল লোক, ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ 'তোমার আসন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যদিকে নিয়ত চঞ্চল সৃষ্টি-লোক।

রবীন্দ্রনাথ মিলন বোধ করিয়াছেন এই সৃষ্টি-লোকে বিশ্ব-সত্তায়। প্রাণের যে আবেগে অন্তহীন সৃষ্টির বন্যা নিত্যকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে, সেই অন্তহীন প্রাণধারার সহিত কবি আপনার প্রাণের পূর্ণ যোগ উপলব্ধি করিয়াছেন।

অনন্ত প্রাণ-ধারার সহিত প্রাণের পূর্ণ যোগের পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যেও লাভ করিতে পারা যাইবে। কবির অন্তরে যে প্রাণ-স্পন্দন ঃ

"সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্‌বিজয়ে ;
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ;—"

বিশ্ব-প্রাণের যোগেই এমন অপার বিস্ময় বোধ জাগে। সৃষ্ট জগৎ মাত্রেই, তাহা যত ক্ষুদ্র হোক-না-কেন, অনন্ত প্রাণের সহিত যুক্ত বলিয়া বিশ্ব-সত্তা লাভে অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে। কবি আপনার দেহ-প্রাণ-মনে সমগ্র বিশ্ব-তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া অমন বিস্ময় বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন ঃ

"দেহে আর মনে প্রাণে হয়ে একাকার
একী অপরূপ লীলা এ অঙ্গে আমার।"

পূর্ণতা লাভের জন্য একদিকে তিনি যেমন ঈশ্বরের নিকট নিঃশেষে আত্ম সমর্পণ করিতে চাহিয়াছেন এবং এইরূপে একের পর এক বন্ধন মোচন করিয়া চলিয়াছেন, তেমনি অন্যদিকে সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম জীবনে জাতি যে বিচিত্র বন্ধন

সৃষ্টি করিয়া আপনাকে পাকে পাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে, সেই সকল বন্ধন মোচনের জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু একটি পরিণাম পর্যন্ত পৌছাইয়া বোধ করেন যে, মুক্তি সকলের সহিত যুক্ত হইয়া। সকলের মুক্তির সহিত একের মুক্তি জড়াইয়া রহিয়াছে। তাই জাতির সকল প্রকার অপরাধ ক্ষালনের জন্য তিনি নিরলস চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

তিনি সেই মনুষ্যত্ব আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, যে মনুষ্যত্ব ঈশ্বরীয় বোধকে একমাত্র সত্যবোধরূপে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শাসনকে একমাত্র অমোঘ শাসন রূপে মানিয়া লইয়া পার্থিব সকল ভয়কে জয় করিয়া উঠিয়াছে।—জ্ঞানে, প্রেমে, কর্মে পূর্ণ বিকশিত মনুষ্যত্ব।

তিনি সেই সমাজ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন যে সমাজে নিষ্প্রাণ কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-নিষেধ, বিচিত্র সংস্কার পদে পদে মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে প্রবল অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় না।

সেই দেশকে তিনি প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন, যে দেশ মনুষ্যত্বের চিরন্তন শ্রেষ্ঠ আদর্শের সজীব অনুপ্রেরণায় এক অখণ্ডত্ব লাভ করিয়াছে, এবং নব নব সৃষ্টি কার্য ও বিচিত্র কর্ম প্রয়াসের ভিতর দিয়া সেই আদর্শকেই ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছে।

একমাত্র এই মানুষ, এই সমাজ ও দেশ বিশ্বের সকল দেশের সহিত মিলিত হইয়া বিশ্ব মানবের কর্তব্যভার মস্তকে তুলিয়া লইতে পারে। ৪৫ সংখ্যক কবিতা হইতে ৯৬ সংখ্যক কবিতা পর্য্যন্ত ৫২টি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যে কবির এই মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছে।

স্মরণ

'স্মরণের' মধ্যে কবি জাগতিক বোধে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আসক্তি ও মোহ বিজড়িত প্রেমের এই তুর্লভ রূপের প্রকাশ ঘটে কেবল সীমা-বদ্ধ চেতনায়। প্রাণের যে পিপাসা ওই রূপ গড়িয়া তুলিয়া চরিতার্থতা অন্বেষণ করে, উধ্বর্তর চেতনায় এই পিপাসা আর থাকে না। মানবীয় চেতনায় প্রেমে দ্বৈত বোধ থাকে। তাহার উধ্বের্ দ্বৈতের সকল লীলা এক পরম রস সমতায় অবাসান লাভ করে।

মানস-চেতনায় কেবল খণ্ড বা সীমার বোধ। এই সীমা বোধ আছে বলিয়া মানুষের প্রেমে মোহ আছে, বেদনা বোধ আছে। রবীন্দ্রনাথ এই মোহ ও আসক্তি বিজড়িত মানব প্রেমের বিশিষ্ট রস আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন।

মনুষ্য-চেতনা একটি বিগ্রহ আশ্রয় করিয়া একান্ত তাহারই মধ্যে চরিতার্থতা অন্বেষণ করে। এই বন্ধন স্বীকার করিয়াই তাহার প্রাণের বিকাশ ঘটে। সেইজন্য ওই সীমারূপ হারাইয়া গেলে প্রাণের সকল প্রেরণা মুহূর্তে নিরুদ্ধ হইয়া যায়।

প্রাণের প্রকাশ ,উহারই অসহনীয় জ্বালা-হর্ষের ভিতর দিয়া যখন অধ্যাত্ম-সত্তা গড়িয়া উঠে, তখন রূপ আর বন্ধন সৃষ্টি করে না। জড়-রূপ এইরূপে ভাব-রূপে মুক্তি লাভ করে। এই ভাব-রূপের সহিত তখন মানুষের ভাবের যোগে বিচিত্র লীলা চলে।

বিচ্ছেদ ও বিয়োগ প্রাণ-চেতনায় সত্তার পরিপূর্ণ অনস্তিত্ব বোধ জাগ্রত করে। অবশ্য প্রাণ-লোকেও জড়-রূপ কতকটা মুক্তি লাভ করে বলিয়া প্রাণের বিচিত্র বোধে দেহ-রূপটিই বিজড়িত থাকিয়া একপ্রকার লীলার আভাস দান করে।

অধ্যাত্ম-লোকে জড়-রূপ সম্পূর্ণ ভাবময় পরিণাম লাভ করে। ইহাতে দেহ-রূপটি হারাইয়া গেলে নর-নারী তাহারই ভাব-রূপের সহিত ভাব-লোকে শাশ্বত মিলন লাভ করিতে পারে। বিগ্রহের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, পাওয়া ও হারানো তখন একান্ত গৌণ হইয়া যায়।

ভাবরূপ ও অধ্যাত্ম-সত্তার স্বরূপ যেমনই হোক-না-কেন তাহা স-সীম লোক। অধ্যাত্ম সত্তায় তাই জড়ের চিন্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিলেও বেদনা বোধ সম্পূর্ণ রূপে

লুপ্ত হয় না। বেদনা বোধ সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া উঠা যায় সীমা বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে কবি সীমার লোক পার হইয়া দিব্য-চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইতে চাহিয়াছিলেন। ইহার স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দিব্য-চেতনার চকিত যে আভাস রবীন্দ্রনাথ লাভ করিয়াছিলেন তাহাকে তিনি সূর্যকিরণচ্ছটার সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'স্মরণে'র একেবারে প্রারম্ভের কবিতাটির মধ্যে কবির যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা 'করুণ আঁধার'-লোক লাভের জন্য।

"প্রভাতজগৎ হতে মোরে ছিঁড়ি
করুণ আঁধারে লহো মোরে ঘিরি।"

এই প্রভাত জগৎ ও করুণ আঁধারের স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে সমগ্র 'স্মরণে'র ভাব-প্রেরণা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভের জন্য 'উদাস হিয়া' পরিহার করিয়া কবি 'স্নেহ-বাহু-ডোরে' বাঁধা পড়িতে চাহিয়াছেন, মোহ বিজড়িত মানব প্রেমের বিশিষ্ট রস আস্বাদের জন্য। বহির্জগৎকে যতটুকু আমরা আত্মসাৎ করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের জগৎ। তাহার বাহিরের সীমাহীন লোক আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। জগৎ ও জীবন তাই এমন রহস্যমণ্ডিত, দুর্জ্ঞেয় বলিয়া বোধ হয়। মৃত্যুতে এই পরিচিত সীমার জগৎ ছাড়িয়া আমরা কোথায় যাইব কে জানে। তারায় তারায় গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে মানবাত্মা যে জ্যোতিপথ ধরিয়া অভিসার করে তাহা একান্ত দুর্নিরীক্ষ। মৃত্যু আসিয়া—

"নিয়ে যাবে মোরে গৃহ হতে কোন্ গৃহহীন
গ্রহতারকার দেশে।"

তারপর কবি এমনি করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন।

"মোছো আঁখিজল, আরেক অতিথি আসিবার
এখনো রয়েছে বাকি।"

জীবনে প্রেম ও মাধুর্যের লীলা সত্য, কিন্তু তাহা জীবনের সম্পূর্ণ প্রকাশ নয়। এই লীলার পরিধি ছাড়াইয়া মনুষ্য-সত্তা অনন্ত বিস্তৃত। মাধুর্যে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। আকস্মিক অতি নিষ্ঠুর আঘাতে এই মাধুর্য-লোকটি ভাঙ্গিয়া পড়িলে মানুষ অসীমকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে যে আরেক অতিথির আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই অসীম-লোক হইতে পারে আবার ধ্যান-লোকও হইতে পারে।

মৃত্যুতে দেহ-রূপটি হারাইয়া গেলে হৃদয় মুহূর্তে শূন্যময় হইয়া পড়ে। তাহার পর শূন্যতার অন্ধকার লোক বিদীর্ণ করিয়া যখন অধ্যাত্ম-সত্তার আবির্ভাব ঘটে, তখন মানুষ ওই লোকে তাহারই ভাব-বিগ্রহ গড়িয়া তুলিয়া আপনার প্রেম-পিপাসা স্বপ্নে চরিতার্থ করে। অধ্যাত্ম-লোকে ওই রূপ ধ্রুব তারকার মত অন্ধকার হৃদয়-আকাশে স্থির স্নিগ্ধ কিরণ সম্পাত করে। বেদনার অন্ধকার-লোক পার হইয়া কবি এই ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

ধ্যান-লোকে এই যে ভাব-রূপের নিত্য লীলা, অধ্যাত্ম সাধনায় কোথাও ইহাকেই চরম রস পরিণাম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই 'মুক্তি সাধন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

মৃত্যুতে সেই চিরন্তন বিস্ময় স্তম্ভিত জিজ্ঞাসা—

"মঙ্গল মূরতি সেই চির পরিচিত
অগণ্য তারার মাঝে কোথা অন্তর্হিত!"

সত্তার এমন যে অস্তিত্ব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন পরিপূর্ণ, এমন নিবিড়, মৃত্যুতে তাহা সম্পূর্ণ অনস্তিত্ব হইয়া যায়? তাহার পরেই মানব জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা বুক ফাটিয়া বাহির হইয়াছে। ইতিপূর্বে কোথাও কোথাও কবিকে এই জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, পরেও হইতে হইবে।

দিব্য-চেতনা-লোকে সর্ব রস সমতায় পূর্ণ সামঞ্জস্য তত্ত্বে যদি মিলন লাভ ঘটেও তবু মোহ বিজড়িত এই প্রেমের যে বিশিষ্ট রস তাহাকে তো আস্বাদ করা যাইবে না। মর্ত্যে যে রূপ আশ্রয় করিয়া মানুষের সকল প্রেম ও প্রীতি চরিতার্থ হয়, সেই বিশিষ্ট রূপকে তো ওই অমর্ত্য-লোকে লইয়া যাইবার কোন উপায় নাই। মর্ত্য জীবনের এই বিশিষ্ট লীলাকে আর কোন উপায়ে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের এই যে জিজ্ঞাসা, "গেলে যদি একেবারে গেলে রিক্ত হাতে?" —ইহার ভিতর দিয়া নিজেরই এক গভীর গোপন আকাঙ্ক্ষা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছে।—অমর্ত্য-লোকে কোন একটা উপায়ে মর্ত্যের স্নেহ প্রেমকে হৃদয়ের একান্তে চির জাগরূক রাখিয়া তাহাকে যেন তিনি নিত্য অশ্রুসিক্ত করিতে পারেন।

মৃত্যুর ভিতর দিয়া কবি পরিশেষে এমন একটি লোক লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে দুইটি আত্মার চির মিলন, চির বিশ্রাম, যেখানে বিচ্ছেদ নাই, বিয়োগ নাই। রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনায় তাহা যে অধ্যাত্ম লোক, তাহা বলিয়াছি। দিব্য-চেতনা-লোকে যে-কোন স্বরূপে রূপের অস্তিত্ব থাকে না।

বহির্জগতে ততটুকুই আমাদের নিকট সত্য, যতটুকুকে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনার জালে আবদ্ধ করিতে পারি। এই চেতনা-বন্ধ হইতে যাহা কিছু স্খলিত হইয়া যায়, তাহা আমাদের নিকট অনস্তিত্ব বা শূন্য বলিয়া বোধ হয়। জীবন ও জগৎকে সীমার দিক হইতে না দেখিয়া অসীমের দিক হইতে দেখিলে আর হারানোর ভয় থাকে না।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে একাধিক কবিতায় কবির এই উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিয়াছি। এখানেও তাহার পরিচয় মিলিবে।

"আমার ঘরেতে নাথ, এইটুকু স্থান
সেথা হতে যা হারায় মেলে না সন্ধান।"

জীবন ও জগতের এই রূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। এই জগৎ নিয়ত পরিবর্তনশীল সীমাহীন শক্তি স্পন্দন মাত্র। এই স্পন্দনে প্রতি মুহূর্তে কত রূপ ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, একে অন্যের সহিত একাকার হইয়া আবার সংখ্যাতীত নূতন রূপ পরিগ্রহ করিতেছে।

এই স্পন্দিত জগৎ যেমনই হোক, তাহা নিরাধার বা নিরলম্ব নয়। ইহার একটি অধিষ্ঠান ভূমি নিশ্চয়ই আছে। মানবীয় চেতনা যখন এই স্পন্দিত জগৎ অনুবিদ্ধ করিয়া ওই শাশ্বত স্থির চেতন-লোক লাভ করে, তখন দেখে জীবনের কোন কিছুই মৃত্যুতে বিনষ্ট হইয়া যায় না।

"কোনো মুখ, কোনো সুখ, আশাতৃষা কোনো
যেথা হতে হারাইতে পারে না কখনো—"

মানুষ যাহাকে ভালবাসে, তাহার অনন্ত স্বরূপের কতটুকু পরিচয় সে জানে। তাহার খণ্ডিত চেতনায় একটি জীবনের অনন্ত ব্যাপ্ত সত্তার অতি সামান্য একটি অংশের প্রকাশ ঘটে। প্রেমের বোধ যতই গভীর হয়, অধ্যাত্ম বোধ গভীর হইতে গভীরতর লোকে যতই ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে, জীবন-বোধের পরিধি ততই বাড়িয়া যায়।

মানুষ তাহার সমগ্র সত্তার কতটুকু পরিচয় জানে। সে বহির্বিশ্বে যে বিচিত্র কর্ম, বাসনা ও সংস্কারের জাল বুনিয়া চলে সেই জালটাই তাহার আমির পরিচয়

বহন করে। মানুষের এই একমাত্র পরিচয়। মানুষ একটি মানুষের এই বহিঃ সত্তারটিরই পরিচয় লাভ করিতে পারে; ওই কর্ম-জালের সীমার বাহিরে মানুষের যে অসীম সত্তা তাহার কোন পরিচয় মানুষ জানে না। প্রিয়জন বিয়োগে ওই জড় দেহ, সেই সঙ্গে কর্মের বিচিত্র বন্ধন লুপ্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনার সহিত অন্বিত হইয়া মানুষের যে সীমা-রূপ, মৃত্যুতে এই সীমারূপটি হারাইয়া যায়। এই সীমারূপটি হারাইয়া গেলে তাহার অসীম সত্তার প্রকাশ ঘটে। তখন এই বোধ জাগে আমার সীমিত চেতনার সহিত অন্বিত হইয়া আমার প্রিয়জনের একমাত্র প্রকাশ নয়, অসীমের যোগে তাহার এক অনন্ত স্বরূপ আছে, যাহার কোন পরিচয় আমরা জানি না। মৃত্যুতে সেই অনন্তে তাহার অবস্থিতি।

"আজি যবে চলি গেলে খুলিয়া দুয়ার
পরিপূর্ণ রূপ খানি দেখালে তোমার।"

ভাব বিগ্রহের সহিত ভাবের যোগে কেবল লীলা নহে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেমের এই বোধ আরও গভীরতা লাভ করিয়াছে। সেখানে এই ভাব-বিগ্রহ পর্যন্ত বিগলিত হইয়া গিয়াছে।

"এসেছ একান্ত কাছে ছাড়ি দেশকাল
হৃদয়ে মিশায়ে গেছ ভাঙ্গি অন্তরাল।"

মৃত্যুতে ওই আধারটি যখন হারাইয়া যায়, তখন আমাদের শোক সান্ত্বনা শূন্য হইয়া পড়ে। বহিঃশ্চেতনাকে অন্তর্মুখীণ করিয়া মানুষ যতই অধ্যাত্ম-লোকের গভীর হইতে গভীরে ডুবিয়া যাইতে থাকে ততই আপনার সমগ্র সত্তার যেমন, তেমনি আপনার প্রিয়জনের পূর্ণ স্বরূপটিকে প্রত্যক্ষ করিতে থাকে। অধ্যাত্ম উপলব্ধির এমন একটি পরিণাম আছে, যেখানে দুইয়ের বোধ আর থাকে না।

মনুষ্য-চেতনায় শোক অনপনেয় হইয়া উঠে। যে পরিণাম লাভ করিলে আর শোক অনুভূত হয় না, তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন।

"আজি এ হৃদয়ে সর্ব ভাবনার নীচে
তোমার আমার বাণী একত্রে মিলিছে।"

'সর্ব ভাবনার নীচে' বলিতে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাত্ম-চেতনার ওই পরিণামটিকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন। বেদনা-সমুদ্রের বুকে অধ্যাত্ম-লোকে প্রিয়জনের ভাব-রূপ

যেন কমল-কলিকার মত জাগিয়া থাকে। তাহার পর ওই বিদ্যুন্ময় কমল কোরক একটির পর একটি মাধুর্যের দল মেলিতে থাকে।

"মৃত্যুর নেপথ্য হতে আরবার এলে তুমি ফিরে
নূতন বধূর সাজে হৃদয়ের বিবাহ মন্দিরে
নিঃশব্দ চরণপাতে।"

একদিকে মর্ত্য-চেতনা বা সীমার জগৎ, অন্যদিকে অমর্ত্য-চেতনা বা অসীম-লোক। এই উভয় লোকের প্রান্ত ভূমিটি অধ্যাত্ম জগৎ। অধ্যাত্ম-লোকের এক কোটিতে অসীম অন্য কোটিতে সীমা। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগৎ যে এই অধ্যাত্ম জগৎ তাহাই বিশেষ করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

মোহ বিজড়িত মর্ত্য-প্রেম-পিপাসা রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে কত গভীর, তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 'অপূর্বের মোহে মুগ্ধ ছিনু' এই উপলব্ধি কবির জীবনে যত বড় সত্য ততবড় সত্য উর্ধ্বতর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষা, সেই সঙ্গে মর্ত্যের সকল বন্ধন ছিন্ন করিবার প্রাণপণ প্রয়াস। অধ্যাত্ম সত্তায় রবীন্দ্রনাথ এই দুই কোটিকে মিলিত করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম-সত্তা মনুষ্য চেতনার সেই প্রান্তভূমি, যে তট-ভূমিকে দিব্য চেতনার অনন্ত জ্যোতি প্রবাহ ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করিয়া যাইতেছে, অথচ উহার বাঁধ ভাঙ্গিয়া মানবীয় সত্তাকে সম্পূর্ণ রূপে প্লাবিত করিয়া দিতেছে না।

মানবীয় বিচিত্র বোধকে অধ্যাত্ম-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া উহারই আশ্রয়ে অসীমের চকিত স্পর্শ লাভ, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধি।

"জন্মমরণের মাঝখানে
নিস্তব্ধ রয়েছ দাঁড়াইয়া।"

'জন্ম মরণে'র মধ্যবর্তী যে স্থির ভাব-ভূমি, যাহার এক প্রান্তে অমর্ত্য-চেতনা, অন্য প্রান্তে মর্ত্য-চেতনা,—সেই অধ্যাত্ম-লোকে রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রেমকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যাহাদের সহিত আমাদের নিবিড় অনুভূতির যোগ, যাহাদের আমরা ভাল-বাসি, তাহাদের কোন প্রকারে আমরা হারাইতে চাহি না, এই কারণে যে তাহাদের আশ্রয় করিয়া আমাদের অস্তিত্ব বোধ।

প্রেমের সকল স্মৃতি-সম্পদকে আমরা ধ্যান বা মানস-লোকে সঞ্চয় করিয়া রাখি। মৃত্যুতে এই ধ্যান লোকটিও বিনষ্ট হইয়া রায়। এইখানে মানুষের অন্তরে আর এক জিজ্ঞাসা জাগে। অধ্যাত্ম-লোকের উর্ধ্বে, মানবীয় চেতনারও

পরপারে চিরস্থির এমন কি কোন ভাব-লোক নাই, সেখানে সমস্ত কিছু সঞ্চিত হইয়া থাকে, যেখানে কোন কিছু কোন কালেই হারাইয়া যায় না? সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় কবি-চিত্ত আর্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে।

"তাদের যেমন তব রেখেছিল স্নেহ,
তোমারে তেমনি আজ রাখেনি কি কেহ?"

জাগতিক সকল বন্ধন মুক্ত উর্ধ্বতর চেতনা লাভের সেই প্রেরণা নয়, উহারই আলোকে কবির মর্ত্য-প্রেম প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। মর্ত্য-প্রেম কবির জীবনে এত গভীর, এত সত্য, যে অমর্ত্য-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষার সহিত বিজড়িত হইয়া মর্ত্য-প্রেমের পিপাসাই নানা উপায়ে চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে।

আমাদের স্নেহ ও প্রীতি যাহার কল্যাণ কামনায় সদা উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, দৃষ্টি-বহির্ভূত হইলে যাহার জন্য ভয়ে হৃদয় কাঁপিয়া উঠিত, দূরে গেলে মন যাহার নিকট পড়িয়া থাকিত, মৃত্যুতে আর কেহ যদি তাহাকে তেমনি করিয়া স্নেহচ্ছায়ায় আশ্রয় দান করে, আমাদের মন যদি কোন একটি উপায়ে সে সম্পর্কে নিঃসংশয় হয় তবে বুঝি হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিতে পারে।

প্রিয়জন বিয়োগে হৃদয় যখন শূন্যময় হইয়া যায়, সকল তত্ত্ব, সকল সান্ত্বনা যখন নিরর্থক হইয়া পড়ে, কেবল মাত্র তাহাকেই লাভ করিবার জন্য হৃদয় হাহাকার করিয়া ফিরে, তাহার সকল স্মৃতি অন্তরে জাগ্রত করিয়া স্মৃতির চিতা জ্বালাইয়া মানুষ যখন তাহার মধ্যে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া বসিয়া থাকে, সেই কালের সেই অসহনীয় হৃদয় বোধের প্রকাশ।

"কত তব রাত্রিদিন কত সাধ মোরে ঘিরে আছে,
তাদের ক্রন্দন শুনি ফিরে ফিরে ফিরিতেছে কাছে।"

বেদনার সমুদ্র পার হইয়া কবি আবার ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

যে চেতনা-লোকে রবীন্দ্রনাথ পরম মিলন আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহা যে অমর্ত্য কোন লোক, অসীম বা অরূপ নহে, পরন্তু তাহা যে অধ্যাত্ম-লোক নিম্নের উক্তিটির মধ্যেও তাহার নিঃসংশয় পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"যেথা মোর পূজাগৃহ নিভৃত মন্দিরে
সেখানে নীরবে এসো দ্বার খুলি ধীরে—"

ইহা সেই অধ্যাত্ম-লোক, 'পূজা গৃহ নিভৃত মন্দির'; অসীম এই মন্দিরের

দেব-বিগ্রহ। অর্থাৎ এই লোকে মানুষ ক্ষণে ক্ষণে অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হয়।

এই অধ্যাত্ম-লোকটিই কবির আকাঙ্ক্ষিত। মানুষের সকল প্রয়াস ক্ষুব্ধ বাসনার ঊর্ধ্বে যে একটি স্থির ধ্যান-লোক আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই অধ্যাত্ম-লোক বলিয়াছেন। এই লোকে ধ্যান নিমগ্ন হইয়া কবি বাস্তব জীবনের সর্বাধিক দুঃখ দুর্দশার নিপীড়ন হইতে মুক্তি লাভ করিতেন। ইহার নানা পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। কখনও সৌন্দর্য বোধ, কখনও বা প্রেম বোধ আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ওই লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেন।

অধ্যাত্ম-চেতনা-লোকে যে ঐক্য বোধ বা অখণ্ড রস পরিণাম—

"বহুবাক্যব্যাকুলতা ডুবায় যা একখানি গানে
বেদনার সুধারসে—সেই প্রেম হতে মোরে প্রিয়া,
রেখো না বঞ্চিত করি।"

ধ্যান-লোকে তিমির বিদীর্ণ করিয়া বিদ্যুচ্চমকের মত দিব্য জ্যোতির্ময় লোকের আভাস ফুটিয়া উঠে! তাহারই আনন্দ প্রেরণায় কবি সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্ট করিয়াছেন। এই রূপ-সৃষ্টি কবির কাব্য-সৃষ্টি। কবির কাব্য জগৎ এই অর্থে অরূপের রূপক।

"আমার দিনান্ত-মাঝে কঙ্কণের কনক কিরণ
নিদ্রার আঁধারপটে আঁকি দিবে সোনার স্বপন।"

মানুষের জীবনে একদিকে নিভৃত ধ্যান-লোক, অন্য দিকে বহুবিচিত্র কর্ম প্রেরণা। দিবসের বহু বৈচিত্র্যের উপর রাত্রি যেমন ধীরে একাকারত্বের কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দেয়, তেমনি মানুষও বিচিত্র কর্ম প্রয়াসের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সমগ্র বহির্মুখী প্রবৃত্তিকে আপনার মধ্যে সংহত করিবে। বহির্মুখ বিচিত্র প্রবৃত্তি সংযত করিয়া মানুষ অন্তরের মধ্যে যে ভাব-লোক গড়িয়া তুলে তাহাকে আমরা অধ্যাত্ম বা ধ্যান-লোক বলিতে পারি। দুটিকে একযোগে লাভ করিয়া তাহারও ঊর্দ্ধতর চেতনার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিবার সাধনাই পূর্ণতার সাধনা। সাধারণ মনুষ্য জীবনে অধ্যাত্ম-সত্তার কোন প্রকাশ নাই।

তাহা হইলে মানুষের জীবন একান্ত অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ধ্যানের দিকটিই মানুষের অসীম সত্তার দিক। বিচিত্র প্রয়াস-ক্ষুব্ধ মানুষের জীবন একান্ত খণ্ডিত, কেবল সীমা বোধেই পর্যবসিত।

বিরহে নিভৃত ধ্যান-লোকে ভাব বিগ্রহটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে

অশ্রুজলে নিত্য অভিষিক্ত করিতে হয়, মর্ত্য-জীবনে প্রেমের ইহাই পরা প্রাপ্তি।

"এবার তুমি তোমার পূজা সাঙ্গ করি চলিলে
সঁপিয়া মনপ্রাণ,
এখন হতে আমার পূজা লহো গো আঁখি সলিলে
আমার স্তবগান।"

ভাব-লোকে যে পরিণামে দুইটি সত্তা অখণ্ড একটি বোধে একাকার হইয়া যায়, তাহার পরিচয় ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। নিম্নে উদ্ধৃত পংক্তি কয়েকটির মধ্যে সে পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"তুমি করিতেছ ভোগ মোর মনে থাকি
আমার তারায় তব মুগ্ধ দৃষ্টি আঁকি।"

'স্মরণে'র মধ্যে আর একটি ধারার কয়েকটি কবিতা আছে, পরিশেষে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি।

অনন্ত প্রাণ-প্রবাহে কত রূপ সৃষ্টি হইতেছে। প্রাণের আন্দোলনে ওই সকল রূপ একটির পর একটি দল মেলিয়া পর্ণতা লাভ করিতেছে, আবার ঝরিয়া পড়িতেছে। প্রাণ প্রবাহে তাহার চিহ্ন মাত্র আর থাকে না। প্রাণের এই এক চিরন্তন লীলা। মৃত্যুতে একটি বিশেষ প্রাণ বিনষ্ট হয়, আর সেই শূন্যতা মুহূর্তে পূর্ণ করিয়া ভিন্ন রূপের আবির্ভাব ঘটে। এই তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত শোক ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সেখানে নিত্য প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, আবার নিত্য নূতন প্রাণ আসিয়া সেই সকল শূন্যতা পূর্ণ করিয়া দিতেছে। যে সমস্ত প্রাণ হারাইয়া যাইতেছে তাহার বিচিত্র ভাব-ভাবনা যেন অনন্ত-প্রাণ-ধারার সহিত বিজড়িত হইয়া থাকে। বিপুলা ধরণী নিত্য নবীনা হইয়াও তাই বক্ষে অনন্ত শোক ভার বহন করিতেছেন।

"দ্যুলোকে ভূলোকে বাঁধি এক দল
তোমরা করিবে যবে কোলাহল,
হাসিতে হাসিতে মরণের দ্বারে
বারে বারে দিবে নাড়া—"

অসীম সৃষ্টি-লোক জুড়িয়া এই যে প্রাণের প্রকাশ, ইহা অন্ধ-শক্তির লীলা নহে, ইহার পশ্চাতে যে একটি সজ্ঞান অভিপ্রায় সক্রিয়, সে অধ্যাত্ম-বিশ্বাস কবির আছে। যে স্থির পরিণাম লাভের জন্য প্রাণের এই নিত্য চঞ্চলতা তাহাকে

কবি এক্ষেত্রে 'স্বর্ণ কূল' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা ইহাকে অধ্যাত্ম-লোক বলিয়াছি।

"সম্মুখে অনন্ত লোক
যেতে হবে যেথা হোক
অকূল আকুল শোক দুলে রে,
ধায় কোন্ দূর স্বর্ণকূলে রে।"

বিশেষ একটি প্রাণ যদি বিনষ্ট হয়, তবে অনন্ত শোক বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিয়া লাভ কি?—ওই 'অকূল আকুল শোকের' সমুদ্র পার হইয়া অসীম অধ্যাত্ম-লোকে উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

"আঁকড়ি থেকো না অন্ধ ধরণী,
খুলে দে খুলে দে বন্ধ তরণী।"

উৎসর্গ

সীমার জগৎকে যতই একান্ত করিয়া মানিয়া লই না কেন, উহাকে যেমন করিয়া ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করি না কেন, অন্তরে এমন এক আবেগ আমরা প্রতিনিয়ত বোধ করি, যাহা সকল প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া যাইতে চায়। তাহা এমন এক উপলব্ধি যাহাকে মানুষ সমগ্র বিশ্বের সংশয় ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও অবিশ্বাস করিতে পারে না। অথচ বহির্জগতের সহিত তাহার ধর্মের মিল এতটুকু নাই।

"এত আঁধার মাঝে তোমার
এতই অসংশয়।
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়।"

অজ্ঞাত জ্যোতির্ময় লোক হইতে এই আলোক দূতী কেমন করিয়া মানব চিত্তে নামিয়া আসে? যেমন করিয়া আসুক সেই জ্যোতি রেখা কবির অধ্যাত্ম-লোকের একটি প্রান্তকে নিকষে সোনার রেখার মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। সমুদ্রের কালো জল যেমন প্রভাত সূর্যের কিরণ স্পর্শে গলিত

স্বর্গের মত সুদূর দিগন্তে স্থির আকাশ তটে আছড়াইয়া পড়িয়া তল্‌তল্‌ ছল্‌ছল্‌ করিতে থাকে, ইহা যেন কতকটা তেমনি।

যে গোপন পথ বাহিয়া অনন্তের প্রেরণা অন্তরে আসিয়া পৌঁছায় তাহা যে সম্পূর্ণ অন্তরের পথ, বাহিরে তাই তাহার কোন পরিচয়, কোন পরিমাপ নাই।

"হঠাৎ তোমার কুলার 'পরে
কেমন করে প্রবেশ করে
আকাশ হতে আঁধার-পথে
আলোর বার্তাবহ।"

বস্তু জীবনের সকল প্রাপ্তির মধ্যবর্তী হইয়াও মনের মধ্যে অজানিত এক শূন্যতা বোধ জাগে। বাহিরে উপকরণের পর উপকরণ বাড়াইয়া এই শূন্যতাকে কোন প্রকারে ভরাইয়া তুলিতে পারা যায় না। শূন্যতার এই অসহনীয় বোধ হইতে মুক্ত হইবার জন্যই মানুষ অধ্যাত্ম জগতের, অসীমের সন্ধানে ছুটিয়াছে।

মানুষের এই পিপাসার স্বরূপ বুঝাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধের মধ্যে যে রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উৎসর্গের একটি কবিতার মধ্যে কবি মানব মনের এই গোপন প্রেরণার স্বরূপ বুঝাইতে এই এক রূপকের আশ্রয় লইয়াছেন। কেবল এক্ষেত্রে নয়, এই উপমা কবির পরবর্তী রচনার মধ্যে একাধিক স্থলে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া 'পূরবী'র 'কাঁকন জোড়া এনে দিলাম যবে' কবিতাটি স্মরণে পড়িতে পারে।

"আমাদের অন্তর প্রকৃতির মধ্যে একটি নারী রয়েছেন। আমরা তার কাছে আমাদের সমুদয় সঞ্চয় এনে দিই। আমরা ধন এনে বলি নাও। খ্যাতি এনে বলি এই তুমি জমিয়ে রাখো। আমাদের পুরুষ সমস্ত জীবন প্রাণপণ পরিশ্রম করে কতদিক থেকে কত কী যে আনছে তার ঠিক নেই—স্ত্রীটিকে বলছে এই নিয়ে তুমি ঘর ফাঁদো, বেশ গুছিয়ে ঘরকন্না করো, এই নিয়ে তুমি সুখে থাকো। আমাদের অন্তরের তপস্বিনী এখনও স্পষ্ট করে বলতে পারছে না যে, এসবে আমার কোন ফল হবে না, সে মনে করছে হয়তো আমি যা চাচ্ছি তা বুঝি এইই। কিন্তু তবু সব দিয়েও সব পেলুম বলে তার মন মানছে না। সে ভাবছে হয়ত পাওয়ার পরিণামটি আরও বাড়াতে হবে টাকা আরও চাই, খ্যাতি আরও দরকার, ক্ষমতা আরও না হলে চলছে না। কিন্তু কিছুতেই আর ওর শেষ হয় না। বস্তুতঃ সে যে অমৃতই চায় এবং এই

উপকরণগুলো যে অমৃত নয় এটি একদিন তাকে বুঝতে হবে। একদিন এক মুহূর্তে সমস্ত জীবনের স্তূপাকার সঞ্চয়কে একপাশে আবর্জনার মত ঠেলে দিয়ে তাকে বলে উঠতেই হবে 'যে নাহং নামৃতাস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্'।"

"সে কহিল, 'আমি যারে চাই তারে
পলকে যদি গো পাই দেখিবারে,
পুলকে তখনি লব তারে চিনি
চাহি তার মুখ পানে।"

আমরা তাহার স্বরূপ জানি না। তবে জীবনে মুহূর্তের জন্যও তাহার উপলব্ধি ঘটিলে জীবনের সকল অভাব, সকল শূন্যতা যে পূর্ণ হইয়া যাইবে, সকল অতৃপ্তির যে অবসান ঘটিবে, মনের মধ্যে এই সম্পর্কেও কেমন করিয়া একপ্রকার নিঃসংশয় বোধ থাকে। তাহা সমগ্র সত্তা দিয়া সমগ্র সত্তার উপলব্ধি। তাহা জীবনের আংশিক কোন চরিতার্থতা নয়, তাই তাহাতে সংশয় কোথাও থাকে না।

একদিকে মানুষ জীবন ও জগৎকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া মানবীয় চেতনার ঊর্ধ্বতর সকল প্রেরণাকে অস্বীকার করে। অন্যদিকে অধ্যাত্মবাদিগণ দিব্য-সত্তাকে একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া জীবনকে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। একদিকে জাগতিক বোধ, অন্যদিকে জাগতিক চেতনার ঊর্ধ্বতর বোধ। এই বিরোধ কি একান্ত সত্য? দুইয়ের মাঝে কোথাও কি কোন যোগ নাই? এক বৃহত্তর সামছন্দে এই দুই লোককে কি স্পন্দিত করিতে পারা যায় না?

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া এই দুইয়ের এক অধিষ্ঠান ভূমি অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার ধারা এই পরম জিজ্ঞাসার সাগর সঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। কবির বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ যেমন আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে, তেমনি সমন্বয়ের কোন তত্ত্ব তিনি পরিণামে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহারও স্বরূপ উপলব্ধি প্রয়োজন।

মানুষের অন্তরে যে নিত্য অতৃপ্তিবোধ, তাহা ওই ঊর্ধ্বতর চেতনা, আপনার পূর্ণ স্বরূপ লাভের আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। মানবীয় চেতনায় এই নিত্য আবেগ অনুভূতির কোন কারণ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না, পারা অসম্ভব।

কুঁড়ির বুকে যে অন্ধ আবেগ, যে অসহনীয় বেদনার নিপীড়ন, তাহার কোন স্বরূপ ওই কালে সে বুঝিতে পারে না। পারে তখন যখন সে তাহার দলগুলিকে সূর্যকিরণে সম্পূর্ণরূপে মেলিয়া ধরিতে পারে, অর্থাৎ যখন সে আপনার পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে।

মানব জীবন সম্পর্কেও একথা সত্য। একমাত্র দিব্য-চেতনা লাভের পর এই নিত্য অতৃপ্তিবোধের স্বরূপ আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহার পূর্বে নহে।

ইংরেজ কবি ব্রুকের সহিত রবীন্দ্রনাথের আলোচনা স্মরণে পড়িতেছে। সেক্ষেত্রে ব্রুক এই তত্ত্বটিকেই পরিস্ফুট করিতে চাহিয়াছিলেন। জন্ম হইতে জন্মান্তরে রূপ-লোকের ভিতর দিয়া মানুষ কোন্ পরিণাম, কোন্ সার্থকতা লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহার কোন স্বরূপ এই বিকাশ পর্যায়ে সে লাভ করিতে পারে না। ইহার অর্থ মানুষ তখনই বোধ করিতে পারে যখন জীবন পরিক্রমা সম্পূর্ণ হয়, অর্থাৎ বিকাশ (ইহার স্বরূপ যেমনই হোক) সম্পূর্ণতা লাভ করে।

"যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সে দিন বুঝিবি—
জনম ব্যর্থ যাবে না।"

বিশ্বের অন্তহীন রূপ-সৃষ্টির মধ্যে আমার সত্তাও একটি সৃষ্টি। বিশ্বের সকল রূপের অন্তরালে যে চেতনা, সেই একই চেতনা আমার মধ্যেও লীলায়িত। এই চেতনার যোগে বিশ্বের সকল রূপের সহিত আমি যুক্ত। অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া বিশ্বের সকল ভাঙ্গা-গড়া, সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া দিব্য-চেতনার যে অভিপ্রায় ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে, আমার ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া আমার সকল কর্ম সকল ভাব-ভাবনার ভিতর দিয়া সেই একই অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিতেছে। সমস্ত বিস্সৃষ্টির সহিত মিলিত করিয়া ব্যক্তির এই নিয়তি রূপটিকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন মন অপার বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। তখন আর অনস্তিত্বের ভয় থাকে না। এই বিস্ময় রস প্রেরণাই মহত্তম প্রেরণা। এই প্রেরণায় একদিকে ব্যক্তির অস্তিত্ব যেমন স্বীকৃত তেমনি বিশ্বের অস্তিত্বও স্বীকৃত। আবার ব্যক্তি ও বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া এক পরম অস্তিত্বের লীলা চলিতেছে।

মানুষের সমগ্র সত্তাকে মোটামুটি দুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, একটি তাহার জীব-সত্তা, অন্যটি তাহার অধ্যাত্ম-সত্তা। জীব-সত্তা মানুষের সীমার দিক।

যে সত্তায় সে অসীমের প্রেরণা বোধ করে, সকল সীমাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে চায়, তাহাই তাহার অধ্যাত্ম-সত্তা।

সেই ধ্যান-লোক বা অধ্যাত্ম-সত্তা যে কী, কেমন করিয়া ধ্যান-লোকে অনন্তের ক্ষণে ক্ষণে চকিত স্পর্শ আসিয়া পৌঁছায় তাহার পরিচয় লাভ করিতে এক্ষেত্রে এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি। অন্তরে ধ্যান-লোকের ভিতর দিয়া অসীমের স্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষা—

"মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে নিভৃত
স্বপনে।"

মানুষের একটি দিক আছে অসীম। একদিকে সে সংসারে সহস্র তুচ্ছ প্রয়োজনে আবদ্ধ অন্যদিকে সে সীমাহীন লোকে স্বপ্ন সঞ্চরণ করিয়া ফিরে, সে স্বপ্নচারী। এই সীমাহীন জগৎকে সে ক্রমাগত লাভ করিয়া চলিয়াছে। ইহা মানুষের সকল মনুষ্যত্বের, সকল মহত্ত্বের ও মাধুর্যের দিক। অমর্ত্য-চেতনাকে কবি এক্ষেত্রে 'আশার অতীত', 'পরশ চকিত' এবং 'স্বপন বিহারী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

অধ্যাত্ম-লোকের নিঃসীম উদার আকাশ-পটে ঊর্ধ্বতর চেতনার মুহূর্তে মুহূর্তে বিদ্যুদ্দীপ্ত সেই প্রকাশের পরিচয় কবি দান করিতেছেন।

"খনে খনে তুমি উঁকি মারি চাও,
খনে খনে যাও ছলি।"

আমাদের এই বহির্জীবন ও জগৎ যে অনন্ত স্বরূপের একটি প্রতিভাস মাত্র তাহা আমরা জানি না। ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিলে এই প্রত্যক্ষ জগতের অন্তরালে আর একটি সীমাহীন জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া যায়। মানুষ ওই ধ্যান-লোকের যতই গভীর গহনে প্রবেশ করে, ততই বিস্তৃততর জগৎ একের পর এক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। অধ্যাত্ম-লোকের পর লোক অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে মানুষের অভিসার।

এই সম্পর্কে Sri James Jeans তাহার 'Physics and Philosophy' গ্রন্থে আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ হইতে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"We may picture the world of reality as a deep flowing stream; the world of appearance is its surface, below which

we cannot see. Events deep down in the stream throw up bubbles an eddies on the surface of the stream. There are the transfers of energy and radiation of our common life, which affect our senses and so activate our minds; below these lie deep waters which we can only know by inference."

অধ্যাত্ম-সত্তায় উন্নততর লোকের যে আভাস নামে তাহার অতি সমৃদ্ধ সৌন্দর্যে, অলৌকিক আনন্দ আস্বাদে নিম্নতর চেতনা-লোক সমূহ কিছুকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া যাইতে পারে। ওই অবস্থায় অন্তরে প্রতিভাসিত অলৌকিক আনন্দ স্বরূপকে বাহিরে লাভ করিবার অবস্থা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। আকস্মিক চেতনা স্ফুরণে এই দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঘটে।

ঊর্ধ্ব'তর চেতনা যখন আকস্মিক ভাবে সমস্ত আবরণ বিদীর্ণ করিয়া মানবীয় চেতনায় বন্যার মত নামিয়া আসে, তখন তাহার অলৌকিক আনন্দ-লোক, অপরূপ সৌন্দর্য-লোক লাভের জন্য মানুষ এই জগৎকে অস্বীকার করিয়া বসে।

"পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তরীমৃগ সমম্।"

বহির্বিশ্বের সহিত যোগে অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে চেতনার সমুন্নতির সঙ্গে, বহির্বিশ্বের সহিত যোগের প্রসারতা ও গভীরতার সঙ্গে তাহা এতদূর সমৃদ্ধি এমনি স্পষ্টতা লাভ করিতে পারে, যাহাকে একটা পরিণামে কবি চেতনা বাহিরে কায়-বদ্ধ দেখিতে এবং আপনার বাহুবেষ্টনের মধ্যে লাভ করিতে চায়। ইহার নানা পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। 'চিত্রা', 'চৈতালি' প্রভৃতি কাব্যের কথা বিশেষ করিয়া স্মরণে পড়িতে পারে। কবি-চিত্তের সেই একই প্রেরণার পরিচয় এক্ষেত্রেও লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে। আমার মনের মধ্যে যে 'নিরুপমা সৌন্দর্য প্রতিমা'র প্রতিষ্ঠা তাহারই অতুলনীয় রূপের চকিত আভাস যেন পরিচিত সকল রূপের মধ্যে মুহূর্তে বিলসিত হইয়া আবার হারাইয়া যায়। তাহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া যাই, কিন্তু সেখান হইতে সে আবার দূরে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। তাহার ছিন্ন মুক্তাহারের এক একটি মুক্তা যেমন শ্যামল তৃণে শষ্পে শিশির বিন্দুরূপে চতুর্দিকে ছড়াইয়া, নীলাকাশ ব্যাপ্ত তেমনি হাস্যোজ্জ্বল দুইটি উদার নয়ন।

"বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম
ফিরে মরীচিকা সম।
বাহু মিলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।"

এই অধ্যাত্ম-লোক আশ্রয় করিয়া কবি যে উন্নততর চেতনা লাভে সমর্থ হইতেন তাহারও পরিচয় আছে।

"কী মায়ামন্ত্রে বন্ধনদুঃখ নাশিয়া
খাঁচার কোনেতে প্রভাত পশিত হাসিয়া
ঘনমসী-আঁকা লোহার শলাকা সোনার সুধায় মাখি।
নিখিল বিশ্ব পাইতাম প্রাণে আমরা খাঁচার পাখি।"

যেখানে দিব্য-চেতনা কেবলমাত্র আভাস লব্ধ, কেবলমাত্র চকিতে বিলসিত, সেখানে অন্তরে তাহার প্রেরণা স্থির ও স্থায়ী হয় না। মানুষ যতদিন না ওই চেতনার সহিত নিত্য যোগ যুক্ত হইয়া থাকিতে সমর্থ হয় ততদিন উহার উপর তাহার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

যখন কবি সকল অধ্যাত্ম প্রেরণা শূন্য এবং সেই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার-লোকের মধ্যবর্তী হইয়া ঊর্ধ্বমুখে ক্ষীণতম জ্যোতির আভাস লাভের জন্য অসহনীয় বোধ করিতেন, সেই মুহূর্তের পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আজি পিঞ্জর ভুলাবার কিছু নাহি রে
কার সন্ধান করি অন্তরে বাহিরে।
মরীচিকা লয়ে জুড়াব নয়ন আপনারে দিব ফাঁকি
সে আলোটুকুও হারায়েছি আজি আমরা খাঁচার পাখি।"

জাতীয় পরাধীনতার জন্য তিনি অন্তরের মধ্যে যে স্থায়ী একটি গভীর বেদনা বহন করিতেন তাহা সহজেই অনুমেয়। এই আত্মাবমাননা হইতে মনকে মুক্ত করিবার জন্য তিনি আপনার অন্তরে একটি ভাব-লোক সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া বাস্তব দশাকে সাময়িকভাবে জয় করিয়া উঠিতেন। কিন্তু মনুষ্যত্ব লাঞ্ছনার বিচিত্র দৃষ্টান্তে তিনি বারংবার বিচলিত হইয়া ওই ভাব-লোক হইতে স্খলিত হইয়া আসিতেন, এবং সেই সান্ত্বনাহীন অবস্থায় কবি-চিত্ত ভয়ঙ্কর বিক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িত।

কোন কোন দিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘ নামে। বর্ষণ ভারাক্রান্ত কালো মেঘের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বারংবার বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতে থাকে। তাহার ঘন গম্ভীর গর্জন দিক হইতে দিগন্তরে ধ্বনিত হইয়া যায়। বলাকার দল পদ্মপত্রের মালা দোলাইয়া দেখিতে দেখিতে দিক প্রান্তে উধাও হইয়া যায়। এই সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবির অন্তর-আকাশ ঘিরিয়া আর এক মেঘ ঘনাইয়া আসে। সেখানে আর এক দামিনীর চকিত বিদারণ, আর এক জাতীয় বলাকার পক্ষ বিধূনন শব্দ,—এ কোন্ জগৎ! কবির কাব্যে সেই সূক্ষ্মতর অধ্যাত্মজগতের পরিচয় আমরা লাভ করি। এই অধ্যাত্ম জগৎ আশ্রয় করিয়া কবির অন্তরে আরও গভীর, পূর্ণতর অধ্যাত্ম লোকের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

"ওগো তোমার দরশ লাগি
ওগো তোমার পরশ মাগি
গুমরে মোর হিয়া।
রহি রহি পরাণ ব্যেপে
আগুন রেখা কেঁপে কেঁপে
যায় যে ঝলকিয়া।
আমার চিত্ত আকাশ জুড়ে
বলাকা দল যাচ্ছে উড়ে
জানিনে কোন্ দূর সমুদ্র পারে।"

এই অধ্যাত্ম জগৎ লাভ করিয়া মানবীয় চেতনা গহন হইতে গহনতর লোকে ব্যাপক হইতে ব্যাপকতর চেতনার জগতে ঊর্ধ্বগামী হইয়া চলিয়াছে। এই অভিযাত্রার একটি পরিণামে 'আমি'র বন্ধন টুটিয়া যায়। ওই বন্ধন বিলোপের মুহূর্তে পরম জ্যোতিঃ সমুদ্রে মানবীয় চেতনা পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ করে। কবি সেই পরিণাম লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত ঃ

"তোমার সাথে যাব অকূল-প'রি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।"

মানবীয় চেতনা 'সকল বাঁধন-বাধা-খোলা' সকল সীমাবোধ ছাড়াইয়া উঠিলে পূর্ণ পরিণাম লাভ করে।

সীমাবোধ আশ্রয় করিয়া জগৎ ও জীবনের একটা স্বরূপ সাক্ষাৎকারে আমরা একপ্রকার পরিতৃপ্ত। তাহার পর অসীম অধ্যাত্ম-লোকে যখন

আমাদের চেতনা অভিসার করে তখন অপরিচয়ের একটি ভীতি যেমন মনে জাগে তেমনি নূতনতর উপলব্ধির নিবিড় আনন্দও অনুভূত হইতে থাকে। অন্যদিকে আমাদের নিম্নতর সত্তা, জাগতিক বিচিত্র বন্ধন ও বোধ ('তাঁর পিতা', 'তাঁর মাতা') এই অভিসারকে পরিপূর্ণ বিনষ্টি বলিয়া বোধ করে, কারণ ওই লোকের কোন উপলব্ধি তাহার নাই।

অধ্যাত্ম এই উপলব্ধিকে কবি যে রূপক আশ্রয়ে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার রূপক-ধর্ম কাব্যের এক আশ্চর্য উৎকর্ষ নির্দেশ করে:

"শুনি শ্মশান বাসীর কলকল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছল ছল
তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তাঁর পুলকিত তনু জর জর
তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর,
খেপা বরেরে করিতে বরণ,
তাঁর পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো মরণ, হে মোর মরণ।"

যিনি অসীম বা অরূপ, তিনিই আবার রূপের জগতে আপনাকে বহুধা করিয়াছেন। এক স্থির সত্তার বক্ষে অনন্ত রূপ-লোকে নিত্য জাগরণ ও বিলয়। দুইয়ের যোগে এই মিলিত সাক্ষাৎকারই পূর্ণ সাক্ষাৎকার।

রূপ জগতের চির চঞ্চলতার দিকটিকেই একমাত্র সত্য রূপে দেখা যেমন পূর্ণ দৃষ্টি নয়, তেমনি যে সাক্ষাৎকার কেবল সৎ স্বরূপকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া আর সব কিছুকেই স্বপ্ন, বিভ্রম বলিয়া অস্বীকার করিয়া বসে, সে সাক্ষাৎকারও অপূর্ণ:

"স্থির আছে শুধু একটি বিন্দু
ঘূর্ণির মাঝখানে
সেইখান হতে স্বর্ণ কমল
উঠেছে শূন্য পানে।"

এই রূপে দুইটি আপাত পৃথক বোধ জাগে। একটি মানবীয় চেতনা, সীমার জগৎ, অপরটি মানবীয় চেতনার অতীত অসীম লোক। দুইটি চেতনা বস্তুত পৃথক নয়। সৃষ্টি জড়, প্রাণ ও মন (সীমার জগৎ) অতিক্রম করিয়া আরোহ ক্রমে দিব্য-চেতনায় (অসীমে) পরিণাম লাভ করিতেছে। দিব্য-চেতনা (অসীম) আবার সম্ভূতির ছন্দে অবরোহ ক্রমে মন-প্রাণ-জড় (সীমা) রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন। এই চলাচলের বিরাম নাই।

জগতের অন্তহীন ভাঙ্গা-গড়া, উঠা-নামাকে আশ্রয় করিয়াই এই অখণ্ডতার পূর্ণ রূপ নিয়ত ফুটিয়া আছে, চিরস্থির, চির জ্যোতির্ময়। যাহারা নিখিল বিশ্বকে সমগ্রতার দিক হইতে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, তাঁহাদের নিকট জগতের এই পূর্ণ সুষমাটি ধরা পড়ে। সৃষ্টি বা বিনষ্টি কোন একটি দিক হইতে জগৎকে দেখিলে জগৎকে খণ্ড করিয়া দেখা হয়। সে দৃষ্টিতে জগতের সত্য রূপটি ফুটিয়া উঠে না :

> "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
> রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
> অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ
> সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।"

"ব্রহ্মের দুইটি রূপ আছে, মূর্ত ও অমূর্ত, মৃত্যু ও অমৃত, স্থির ও চঞ্চল, তথ ও সত্য।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ)

মানুষ আপনাকে বিশ্ব সত্তা হইতে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। মানুষের বোধ সকল সময় খণ্ডিত। ইন্দ্রিয় লব্ধ সীমাবদ্ধ বা খণ্ডিত রূপকে মন একটি ভাব-রূপ দান করে। তাই মানস-লোকে কোন অখণ্ডের বোধ করিতে গেলে ওই ভাব-রূপ গুলি ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া যায়। মানবীয় চেতনা সকল সীমা অতিক্রম করিয়া তবেই বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ মিলন বোধ করে। এ মিলন বিচ্ছিন্ন রূপের সমাহার নয়, কিংবা বৈচিত্র শূন্য একটি অখণ্ড সত্তামাত্রের উপলব্ধিও নয়।

সকল রূপের অন্তরালে যে অবিচ্ছিন্ন প্রাণ, সেই প্রাণের যোগে আপনার সত্তার অস্তিত্ব, এই বোধ যেমন জাগে, তেমনি সকল রূপের মধ্যে মানুষ প্রাণ-রূপে আপনার অবিচ্ছিন্ন অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। এই সাক্ষাৎকারে রূপের অনন্ত বৈচিত্র্য যেমন থাকে, তেমনি সকল রূপের অন্তরালে যে নির্বিশেষ প্রাণ তাহা অস্বীকৃত হইয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনে ভাব ও রূপ, সীমা ও অসীম পূর্ণ

সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। ইহাদের যোগের রহস্য ভেদ করিতে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে বলিয়াছেন 'মায়ার মন্ত্র', দার্শনিকগণ ইহাকে বলিয়াছেন, অনির্বচনীয়; এবং মানুষের উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইহা সত্য।

বিশ্বের আকারহীন অব্যক্ত ভাবনা-স্রোত মানব অন্তরে রূপলাভ করিবার জন্য নিয়ত আঘাত করিয়া ফিরিতেছে। মানব-চেতনা যত উন্নত হয়, মানুষ যতই তাহার ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, ভাবনা-বেদনাকে ছাড়াইয়া উঠিয়া বিশ্বের সহিত আপনার চেতনাকে যুক্ত করিতে পারে, ততই বিশ্বের অন্তহীন ভাব-ভাবনা তাহার অন্তরে স্পন্দিত হইয়া যায়। মানুষ তখন এই সকল অব্যক্ত আকার পিয়াসী ভাবনাকে ভাষায় ছন্দে বহুবিধ সৃষ্টি-রূপে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে। এই সকল আকার বদ্ধ ভাব-ভাবনা আবার আপনার সীমাহীন অস্তিত্বের মধ্যে আপনার বিলয় সন্ধান করিয়া ফিরে। এই সকল রূপ যখন কালে জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন সেইসঙ্গে ওই সকল ভাব-ভাবনার একান্ত রূপে বিনষ্টি ঘটে না। তাহারা বিশ্বের অব্যক্ত ভাবনা-স্রোতে হারাইয়া যায় মাত্র। আবার কোন মানব-চেতনা আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়।

ব্যক্তি ও বিশ্বের সম্পর্কে যেমন একথা সত্য। বিশ্ব ও ঈশ্বরের মধ্যেও এ কথা তেমনি সত্যি। ঈশ্বর তাঁহার অন্তরের ধ্যানকে দেশ-কালের মধ্যে প্রস্ফুটিত গোলাপের মত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই বিশ্বসৃষ্টি আবার তাঁহার ধ্যানের মধ্যে সংহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। এমনি করিয়া সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার ধ্যান একবার রূপ লাভ করিতেছে, আবার রূপ-হারা-ধ্যানের মধ্যে বিলীন হইতেছে; সৃষ্টির এই স্বরূপ ঃ

> "আছি আর আছে,
> অন্তহীন আদি প্রহেলিকা, কার কাছে
> শুধাইব অর্থ এর!"

আমাদের ইন্দ্রিয় ও প্রাণ-চেতনার সহিত মন ও বুদ্ধিবৃত্তির স্পষ্ট যেন একটি বিরোধিতা আছে। দুইয়ের মন্থনে জীবনে যে বিষ উঠে তাহার সীমা নাই। এই অসঙ্গতির মধ্যে কেমন করিয়া সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারা যায়, সকল বিচ্ছিন্ন সুরকে কেমন করিয়া একটি সংগীতে ঝংকৃত করিয়া তুলিতে পারা যায়, ইহাই মানুষের একমাত্র এষণা। অন্তর্জীবনের মধ্যেই তো কেবল সামঞ্জস্য বা সৌষম্য সাধন নয়, বিপুল বহির্বিশ্বের সহিতও তাহাকে সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে

হয়। ততদিন পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। তাই নিদ্রাহারা হইয়া মানুষ লক্ষ দিকে তাহার জিজ্ঞাসাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছে,—পথ কোথায় ?

মানুষ যখন বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ মিলন বোধ করে, তখন সমগ্র জীবনের মধ্যে একটি পূর্ণ সঙ্গতির সুর ঝংকৃত হইয়া যায়। একটির সহায়তায় আর একটিকে তাই সদা সতর্ক হইয়া শাসন করিতে হয় না। নৈতিক বোধের উদ্ভব এই সতর্কতা হইতে। সেখানে মনের সহিত প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের একটি তীব্র সংঘাত সকল সময় জাগ্রত রহিয়াছে। মানবীয় চেতনায় এই বিরোধ সত্য বলিয়া মানুষ তাই অমন নীতিতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। পূর্ণ জীবনে দেহ-প্রাণ-মন ও উন্নততর চেতন-জগৎ বিধৃত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসায় এই কারণে নৈতিকবোধ কোন ক্ষেত্রেই তীব্র হইয়া উঠে নাই। রবীন্দ্রনাথ সকল সময় মানবীয় সত্তায় সঙ্গতির পূর্ণ সুর ঝংকৃত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার জন্য সর্বত্রই তিনি মানুষকে উন্নততর উপলব্ধির লোকে আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিশ্ব-প্রাণ-ধারা প্রতিনিয়ত আপনাকে মানব-অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে সৌন্দর্য ও প্রেম বোধকে আশ্রয় করিয়া। ব্যক্তি-প্রাণ যত অধিক পরিমাণে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত হয় ব্যক্তির নিকট বিশ্বের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য তত গভীর ভাবে অনুভূত হয়।

এমন পরিণাম আছে যখন ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তার সহিত সম্পূর্ণরূপে একাকার হইয়া যায়। তখন ব্যক্তি-চেতনা, ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্বের সকল চেতনা সকল প্রাণের মধ্যে আপনাকে লীলায়িত হইতে দেখে। আপনার সীমাহীন অস্তিত্ববোধে মানুষ তখন মুক্তির আস্বাদ পায়।

বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির ধীর জাগরণ ঘটে। বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন বোধে ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ প্রকাশ।

বিশ্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়া যে সাধনা তাহাতে ব্যক্তির বিকাশ যেমন স্বাভাবিকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়, তেমনি তাহার পূর্ণ পরিণাম ক্রমে যে আনন্দের আস্বাদ, তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়।

জীবের এই একমাত্র নিয়তি বলিয়া বহির্বিশ্বের সমস্ত কিছু, প্রতি ধূলি-কণা হইতে মহাশূন্যে অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত মানুষকে এমন নিয়ত আহ্বান করে।

বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের বিকাশ, তাহাকে

আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির একের পর এক উন্নততর চেতনা পর্যায় লাভ, সেই সঙ্গে সৌন্দর্যও প্রেমবোধের উন্নততর পরিণাম। চেতনার পূর্ণ বিকাশে, অর্থাৎ ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ যোগে সৌন্দর্য ও প্রেমের সীমাহীন প্রসার ;—রবীন্দ্র-কাব্যে পূর্বাপর এই একটি ধারার পরিচয় চিহ্নিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি :

"তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।"

কবি আপনার সাধন ফল সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়াছেন :

"হই যদি মাটি, হই যদি জল,
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল,
জীব-সাথে যদি ফিরি ধরাতল
কিছুতেই নাই ভাবনা।
যেথা যাব সেথা অসীম বাঁধনে
অন্তবিহীন আপনা।"

এই বিশ্বের সহিত যোগের ভিতর দিয়া স্বাভাবিক পরিণামে মানুষ মুক্তির আস্বাদ পায়। বিশ্বকে পরিহার করিয়া মুক্তিলাভের যে সাধনা তাহা শূন্যতার সাধনা মাত্র। তাহাতে কেবল বঞ্চনাই লাভ করিতে হয় :

"যেথা আছি আমি আছি তাঁরি দ্বারে
নাহি জানি ত্রাণ কেন বল কারে।
আছে তাঁরি পারে তাঁরি পারাবারে
বিপুল ভুবন তরণী।"

মনুষ্য-চেতনায় প্রতিভাসিত জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপই সত্য। কারণ, জীবন ও জগৎকে আশ্রয় করিয়া পরম সত্যের যে উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইতে চায় তাহা মানবীয় চেতনায় উপলব্ধি করা অসম্ভব।

"আলোকে আসিয়া এরা লীলা করে যায়
আঁধারেতে চলে যায় বাহিরে।"

সত্য শুধু এই সীমাহীন দেশ-কাল পরিপূর্ণ করিয়া সৃষ্টি (আসা) ও বিনষ্টির (যাওয়া) অবিরাম অনাদ্যন্ত লীলা। এই জীবনের অপরূপ প্রকাশের যেমন, তেমনি অপ্রকাশের কোথাও কোন অর্থ নাই।

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া এই আবির্ভাব ও অন্তর্ধান, তাহার সহিত একাত্ম হইয়া ব্যক্তি-জীবনের অস্তিত্বের অর্থ উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে পরিণাম লাভ করিলে, রবীন্দ্রনাথ তাহারও পরিচয় দান করিয়াছেন:

"নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়াবি যখন,—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।"

অধ্যাত্মবোধের প্রথম লক্ষ্য বা প্রকাশ সমগ্র বিশ্ব হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক বোধের মধ্যে, 'নেমে এসে দূরে এসে দাঁড়ান'র মধ্যে। উহার পূর্ণ পরিণাম ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য বা মিলনবোধের মধ্যে। প্রথমে ব্যক্তিত্ববোধ জাগ্রত করা, তাহার পর বিশ্বের সহিত মিলনবোধ করা। বিশ্বের সহিত মিলনবোধে ব্যক্তিত্বের বিনাশ নয়, পূর্ণ প্রসার। পূর্ণ মিলনবোধে ব্যক্তি-তত্ত্ব বিশ্ব-তত্ত্ব লাভ করে। ক্ষুদ্রতর ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়া বৃহত্তর ব্যক্তিত্বকে ক্রমাগত লাভ করিয়া চলা।

এখানে 'তুমি' সম্বোধন হইতে লক্ষ্য করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ জীবন ও মৃত্যু, সৃষ্টি ও বিনষ্টির অন্তরালে স্থির একটি চেতনা সম্পর্কে সচেতন।—আরও সচেতন যে এই বিসৃষ্টি তাঁহারই এক বিশিষ্ট প্রকাশ; কিন্তু এই চেতনা সমগ্র দেশ-কাল জুড়িয়া যে অন্তহীন রূপ-লোক সৃষ্টি করিয়া বিনষ্ট করিতেছে, তাহা যে কেন, তাহার ভিতর দিয়া ঊর্ধ্বতর চেতনার কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হইতেছে তাহা তাঁহার অজ্ঞাত:

"ডান হাত হতে বাম হাতে লও,
বাম হাত হতে ডানে।
নিজ ধন তুমি নিজেই হরিয়া
কী যে কর কেবা জানে।"

সমুদ্রের বুকে যেমন ঢেউয়ের নিত্য ওঠা ও নামা তেমনি শাশ্বত নিঃশব্দ

চৈতন্যের বক্ষে প্রাণের এই নিত্য জাগরণও বিলয়ের লীলা। মানবীয় চেতনায় কেবল সীমাবোধের ভিতর দিয়া যখন জগৎ ও জীবনকে সাক্ষাৎ করি, তখন মৃত্যুকে সম্পূর্ণ বিনষ্টি বলিয়া বোধ হয় ; কারণ যাহা কিছু আমাদের চেতনার বাহিরে তাহাই আমাদের নিকট অনস্তিত্ব।

সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে বোধ করা যায় যে, এক পরম অধিষ্ঠান ভূমির উপর সকল রূপের সকল সীমার সকল চেতনার প্রতিষ্ঠান। জীবন ও জগৎকে যখন আনন্ত্যের দিক হইতে দেখি তখন সকল সমস্যার অবসান ঘটে ঃ

"আছে সেই আলো, আছে সেই গান,
আছে সেই ভালোবাসা।
এইমতো চলে চিরকাল গো
শুধু যাওয়া, শুধু আসা।"

রূপের জগৎ রবীন্দ্রনাথের নিকট প্রতিভাস স্বরূপে সত্য। যে সাক্ষি-চৈতন্যের বক্ষে অনন্ত এই রূপ-লীলা, তাহার সহিত মিলাইয়া না দেখিলে আমাদের সাক্ষাৎকার অপূর্ণ রহিয়া যায়।

যে তত্ত্ব বা ভাব-ভূমির উপর অধিষ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্রনাথ এই চিরন্তনতা বোধ করিয়াছেন, তাহা যে পূর্ণ তত্ত্ব দৃষ্টি নয় তাহাতে কোন সংশয় নাই। এই চিরন্তন বোধ মন ও বুদ্ধি দিয়া লাভ করা সম্ভব। সেখানে দেখি একটি বিশেষ আনন্দ-রূপ নষ্ট হয়, তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া অন্য আনন্দ-রূপের প্রকাশ ঘটে। মানব সংসার পূর্ণ করিয়া যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া সংখ্যাতীত নর-নারীর আনন্দ-বেদনার লীলা নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া চলিয়াছে, কোথাও ছেদ নাই।

নিখিল বিসৃষ্টি জুড়িয়া ইহা যদি একই স্বরূপের ফিরিয়া আসাও হয়, তবু এই সাক্ষাৎকারে মানুষের অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা শান্ত হইতে পারে না। সে যে এই সমগ্র বিসৃষ্টির নিত্য সৃজন প্রলয়ের অর্থ লাভ করিতে চায়। চিরকাল ধরিয়া 'যাওয়া' ও 'আসা'কে মানুষ শুধু অকারণ বলিয়া মানিয়া লইতে পারে না।

আমাদের এই জগৎটিতো একমাত্র রূপের জগৎ নয়, ইহার ঊর্ধ্বে কত সূক্ষ্ম জগৎ, অপূর্ব সম্পদ ও সৌন্দর্যান্বিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। এই জগতের যেমন, তেমনি অন্যান্য সূক্ষ্ম জগতের পৃথক পৃথক ভাবে একত্রে সকল জগতের তিনি সাক্ষী স্বরূপে অধিষ্ঠিত। সকল রূপ-লোক আশ্রয় করিয়া তাঁহারই

আনন্দ বিচ্ছুরিত, এই সমস্ত জগতের একমাত্র সম্ভোগ কর্তা সেই পরম শাশ্বত সৎ স্বরূপ।

এই রূপ জগতের অন্তরালে ওই যে সকল সূক্ষ্ম চেতন-জগৎ রহিয়াছে, তাহাদের একে একে অতিক্রম করিয়া ওই চিরস্থির অনির্বাণ জ্যোতির্লোকটিকে লাভ করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ওই অধ্যাত্ম-লোকে যেমন যাত্রা শুরু করিয়াছেন, তেমনি ওই সমস্ত জগতের অলৌকিক অনুভূতিকে মর্ত্য-জগতের সীমাবদ্ধ রূপ এবং ভাষায় প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যে মর্ত্য-রূপ তাহা কেবল আধার রূপে সত্য, তাহা ভুলিয়া অর্থাৎ ওই রূপের আভাসে কবির অধ্যাত্ম অনুভূতির যে জগৎ তাহা উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইয়া যদি ওই রূপটিকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মানিয়া তাহাকেই বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে বসি, তবে তাহার ভিতর দিয়া আর যে প্রাপ্তিই ঘটুক, তাহাতে কবির অধ্যাত্ম-লোকের কোন পরিচয় মিলিবে না।

কবি স্বয়ং সে কথা বুঝাইয়াছেন। কেবল এক্ষেত্রেই নয়, ইতিপূর্বে যেমন আমরা ইহার পরিচয় পাইয়াছি, তেমনি পরবর্তী কাব্য গ্রন্থসমূহে ইহার পরিচয় বারংবার লাভ করিব :

"যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।"

জগৎ সে প্রতিভাস স্বরূপে সত্য, এই জগতের অন্তরালে যে সূক্ষ্ম অলৌকিক সৌন্দর্য-সমৃদ্ধলোক রহিয়াছে তাহার পরিচয় আমরা লাভ করি তখনই, যখন ওই সৌন্দর্য সাক্ষাৎ করিবার মত অধ্যাত্ম-চেতনার ক্রমিক বিকাশ ঘটে।

কবির কাব্য পাঠের ভিতর দিয়া বিস্মিত অলৌকিক সৌন্দর্য অনুধ্যানের ভিতর দিয়া মুহূর্তের জন্য অধ্যাত্ম-চেতনার জাগরণ ঘটে। সেই জাগরণ মুহূর্তে আমাদের দৃষ্টি সমক্ষের সমস্ত দৃশ্যপট যেন পরিবর্তিত হইয়া যায়। অভাবিত সৌন্দর্যের মুখোমুখি দাঁড়াইয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই,—এই কি আমাদের চির পরিচিত জগৎ!

"বাঁশি লই আমি তুলিয়া।
তারা ক্ষণতরে পথের উপরে
বোঝা ফেলে বসে ভুলিয়া।"

এই জগতের ঊর্ধ্বে কত অনির্বচনীয় রূপ-লোক রহিয়াছে। এই সমস্ত জগৎ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন, এক অখণ্ড সৎ স্বরূপ। তাঁহারই আনন্দে পরিপূর্ণ সুষমায় বিরাজিত এই গণনাতীত জগৎ। মানবীয় চেতনায় ওই ঊর্ধ্বতর জগৎ সমূহের সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। এই চেতনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া যেমন বিশ্ব-সত্তার সহিত একাত্মতা বোধ করিতে পারা যায়, তেমনি ক্রমাগত ঊর্ধ্বে উত্তরণের ফলে যে সূক্ষ্মতর জগৎ সমূহের একের পর এক সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারা যায়, তাহাদের সহিত এমনি পূর্ণ যোগের উপলব্ধি সম্ভব।

বিশ্ব-সত্তার সহিত মিলন লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রেরণায় কবির বিচিত্র কাব্য সৃষ্টি। ওই সূক্ষ্মতর লোকান্তর সমূহের সাক্ষাৎকারে এবং তাহাদের সহিত একাগ্রতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় এই মর্ত্যভূমিকে অস্বীকার করিবার ঐকান্তিকতা কোথাও কোথাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

পূর্ণ সামঞ্জস্য তত্ত্বে এই জগতের সহিত ঊর্ধ্বতর সকল জগৎ সমাশ্রিত। কেবল তাহাই নহে, ঊর্ধ্বতর সকল চেতনার অধিষ্ঠান ভূমি এই মর্ত্য-লোক। তাহারই পূর্ণ ছন্দে এই মর্ত্যকে রূপায়িত করিতে হইবে।

কবির চেতনা যত ঊর্ধ্বতর লোক লাভ করুক-না-কেন, ওই চেতনার আশ্রয় স্থল রূপে তিনি এই মর্ত্য-ভূমিকেই আশ্রয় করিয়াছেন। ক্রমিক উন্নততর চেতনা লাভে মর্ত্যের সাক্ষাৎকারটিই ক্রমাগত অপরূপ হইয়া উঠিতেছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র চেতনার অধিষ্ঠান ভূমি এই মর্ত্য-লোক। আমির চেতনা মুক্ত হইয়া কবি যতই বিশ্বৎচেতনার সহিত একাত্মতা বোধ করিতেছেন কবির কাব্য-প্রেরণাও ততই বাধা-বন্ধ-হারা হইয়া উঠিতেছে।

পরিশেষে আর একটি কবিতার উল্লেখ করিয়া আমি এই প্রসঙ্গ শেষ করিব।

এই জগৎ পরিহার করিবার পূর্বে কবি এই মর্ত্য-ভূমির শেষ স্পর্শ লাভ করিতে চান। মানবীয় চেতনাশ্রয়ী জগৎ ও জীবনের এই সাক্ষাৎকারও সত্য, তাহা চূড়ান্ত সত্য না হইতে পারে। এই আসক্তি ও অজ্ঞানতা বিজড়িত জীবনের প্রতি একটি গভীর মমতা কবির অন্তরে সকল সময় রহিয়া যায়। অমর্ত্য-লোক সাক্ষাৎকারে জীবন ও জগতের যে রূপ প্রতিভাত হোক, যে অর্থ আভাসিত

হইয়া উঠুক, একথা তো সত্য যে, এই আসক্তি ও মোহ বিজড়িত মানব প্রেমের স্বরূপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

নারী মর্ত্য-প্রেমের বিগ্রহ স্বরূপিণী। তাই কবি আসন্ন বিদায় মুহূর্তে নারীকে সন্নিকটে আহ্বান করিয়াছেন :

"এবারের মতো দিন হল গত
এল বিদায়ের বেলা।
তুমি এস এস নারী,
আনো গো অশ্রুবারি।"

নারী-প্রেম যে আমাদের চিত্তে অধ্যাত্ম-লোকের জাগরণ ঘটায় একথা রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন। তবে নারী-প্রেমের সীমা এই পর্যন্ত। মানবীয় চেতনা এই অধ্যাত্ম সীমা অতিক্রম করিয়া কোন্ অসীম লোকে ঊর্ধ্ব-গামী হইয়া যায়। প্রেমের বেদনার সীমা অতিক্রম করিয়া ব্যথিত বক্ষ অবারিত করিয়া 'হৃদয়ের গোপন কক্ষ,' অর্থাৎ ধ্যান বা অধ্যাত্ম-লোক অতিক্রম করিয়া আনন্দময় উত্তর-ধামে চেতনার অভিসার। মর্ত্য-প্রেমের প্রয়োজন পরিণামে মর্ত্যকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য :

"অবারিত করি ব্যথিত বক্ষ
খোলো হৃদয়ের গোপন কক্ষ,
এলো-কেশপাশে শুভ্র-বসনে
জ্বালাও পূজার বাতি।

খেয়া

রবীন্দ্রনাথ আপনার পরিপূর্ণ জীবনকে পরিণতির দিক হইতে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন।

প্রথমে ব্যক্তির সহিত বিশ্বপ্রকৃতির যোগ। এই যোগ অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ এখানে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নাই, দুই বিরুদ্ধ অভিপ্রায়ের মধ্যে সংঘাত নাই। এই যোগ তাই নিরবচ্ছিন্ন শক্তির।

কিন্তু এই প্রকার নির্বিরোধ মিলনে মানব চিত্তের পরিতৃপ্তি ঘটিতেই পারে না। আমাদের চিত্ত যে বৃহৎ মিলন আকাঙ্ক্ষা করে তাহা দ্বন্দ্ব বিরোধ অবসানে

লাভ করা। ব্যক্তির পরিপূর্ণতা ঘটে একদিকে বিশ্ব প্রকৃতি অন্যদিকে নিখিল মানব সংসারের সহিত ক্রমিক গভীরতর, ব্যাপকতর মিলনবোধের ভিতর দিয়া।

বৃহৎ মানব সংসারের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষাই শুধু নয়, তাহার মাঝখানে নামিয়া আসিয়া কবি প্রথম তাহার সকল দুঃখ-বেদনাকে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছেন 'সোনার তরী' রচনাকালে। সোনার তরীর 'বিশ্বনৃত্য' 'পুরস্কার' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে ইহার নিঃসংশয় প্রকাশ। যে মহান পুরুষ নিখিল মানব সংসারকে দুঃখ-বিপদ, উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া একটি মঙ্গলময় দকে পরিচালিত করিতেছেন ইহা সেই মহান পুরুষের সহিত মিলিত হইবার আকাঙ্ক্ষা। এখান হইতে কবির জীবনে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি সুখের অবসান।

দুঃখ ও বেদনা ভোগই তো জীবনের লক্ষ্য নয়, ইহার ভিতর দিয়া একটি মঙ্গলময় পরিণাম লাভ করা। সকল দুঃখ-বঞ্চনা, আঘাত-সংঘাতের ভিতর দিয়া সেই এক মঙ্গলময়ের প্রকাশকে উপলব্ধি করাই জীবনের সর্বশেষ উপলব্ধি। 'চিত্রা' কাব্যে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্যে কবি যাহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন, মানব সংসারে তাঁহার নিয়ত প্রকাশ ঘটিতেছে নির্মম দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া।

পরবর্তী কাব্যধারার ভিতর দিয়া কবির এই বোধটিই ক্রমাগত গভীর হইয়া উঠিয়াছে। কবি সে কথা বলিয়াছেন ঃ

"এর পর থেকে বিরাট চিত্তের সঙ্গে মানব চিত্তের ঘাত প্রতিঘাতের কথা ক্ষণে ক্ষণে আমার কবিতার মধ্যে দেখা দিতে লাগল। দুইয়ের এই সঙ্ঘাত যে কেবল আরামের, কেবল মাধুর্যের তা' নয়। অশেষের দিক থেকে যে আহ্বান এসে পৌঁছায় সে তো বাঁশির ললিত সুরে নয়।" (আত্মপরিচয়)

একথা তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন ঃ

"তারপরে আমার রচনায় বারবার এই ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে—জীবনে এই দুঃখ বিপদ-বিরোধ মৃত্যুর বেশে অসীমের আবির্ভাব।" (আত্মপরিচয়)

একপ্রকার শান্তি আছে যাহাকে লাভ করা যায় সংসারের সকল দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাতকে একান্তে পরিহার করিয়া। তাহা স্বপ্নের শান্তি। তাহা তাই বৃহৎ বঞ্চনা। আর একপ্রকার শান্তি আছে সংসারের সকল বিরূপতা ও বিরোধিতার

মাঝখানে সর্বত্র মঙ্গলময়ের প্রকাশকে উপলব্ধি করিবার মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ সেই মঙ্গলকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন যিনি সংসারের মধ্যে রুদ্ররূপে প্রকাশমান।

তিনি সেই কথাই বলিয়াছেন ঃ

"শারদোৎসব থেকে আরম্ভ করে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, যখন বিশেষ করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই, প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা ঐ একই।"

সেই ধুয়াটা কি, না দুঃখ, বিপদ, বিরোধ-সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া অসীমের নিত্য প্রকাশের উপলব্ধি।

নিরন্তর দুঃখ ভোগের, আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়া নিখিল বিশ্ব প্রকৃতি এবং মানব সংসার অন্তহীনসৌন্দর্য সম্পদকে নিত্য উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে। দুঃখ ভোগই তাই শেষ কথা নয়। এই ব্যথা ভোগের উপর বিশ্বের সকল সৌন্দর্য ও আনন্দের প্রতিষ্ঠা। মূল এই উপলব্ধির প্রকাশ দেখিতে পাই শারদোৎসব, অচলায়তন, ফাল্গুনী প্রভৃতি প্রত্যেকটি নাটকের মধ্যে।

আঘাত সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া সেই এক মঙ্গলময় অমৃত তীর্থে উত্তরণ, মানুষ মাত্রের জীবনের এই শেষ কথা। এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি সুদীর্ঘ অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"ইহুদী পুরাণে আছে—মানুষ একদিন অমৃতলোকে বাস করত। সে লোক স্বর্গলোক। সেখানে দুঃখ নেই, মৃত্যু নেই। কিন্তু যে স্বর্গকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, মন্দের সঙ্ঘাত দিয়ে, না জয় করতে পেরেছি সে স্বর্গ তো জ্ঞানের স্বর্গ নয়—তাকে স্বর্গ বলে জানিই নে।

* * * * তাই সেই অচেতন স্বর্গলোকে জ্ঞান এলো। সেই জ্ঞান আসতেই সত্যের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ঘটল। সত্যমিথ্যা ভালমন্দ জীবন মৃত্যুর দ্বন্দ্ব এসে স্বর্গ থেকে মানুষকে লজ্জা দুঃখ বেদনার মধ্যে মানুষকে নির্বাসিত করে দিলে। এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে যে মানুষ আবার ফিরে আসে তার থেকে তার আর বিচ্যুতি নেই। কিন্তু এই সমস্ত বিপরীতের বিরোধ মিটতে পারে কোথায়? অনন্তের মধ্যে। তাই উপনিষদে আছে, সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্। প্রথমে সত্যের মধ্যে জড় জীব সকলেরই সঙ্গে এক হয়ে মানুষ বাস করে—জ্ঞান বিরোধ ঘটিয়ে মানুষকে সেখান থেকে টেনে স্বতন্ত্র করে সবশেষে মর্ত্যের পরিপূর্ণ অনন্ত রূপের ক্ষেত্রে আবার তাকে সকলের সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। ধর্মবোধের প্রথম অবস্থার সময়ে, মানুষ তখন আপন প্রকৃতির অধীন—তখন সে সুখকেই

চায়, সম্পদকেই চায়, তখন শিশুর মতো কেবল তার রসভোগের তৃষ্ণা, তখন তার লক্ষ্য প্রেয়। তারপর মনুষ্যত্বের উদ্‌বোধনের সঙ্গে তার দ্বিধা আসে; তখন সুখ এবং দুঃখ, ভাল এবং মন্দ, এই দুই বিরোধের সমর্থন সে খোঁজে—তখন দুঃখকে সে এড়ায় না, মৃত্যুকে সে ডরায় না। সেই অবস্থার সময়, তখন তার লক্ষ্য শ্রেয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়—শেষ হচ্ছে প্রেম আনন্দ। সেখান সুখ ও দুঃখের, ভোগ ও ত্যাগের, জ্ঞান ও মৃত্যুর গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম। সেখানে অদ্বিতীয়ম্; সেখানে কেবল যে বিচ্ছেদের ও বিরোধের সাগর পার হওয়া তা নয়। সেখানে তরী থেকে তীরে ওঠা। সেখানে যে আনন্দ সে তো দুঃখের ঐকান্তিক নিবৃত্তিও নয়, দুঃখের ঐকান্তিক চরিতার্থতায়। ধর্ম বোধের এই যে যাত্রা এর প্রথম জীবন, তারপরে মৃত্যু, তারপর অমৃত।" (আত্ম পরিচয়)

মৃত্যুর বিচিত্র প্রকাশ রূপকে জয় করিয়া অমৃতের আস্বাদ লাভের জন্য কবির জীবনে তপশ্চর্যা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া 'খেয়া' কাব্যের মধ্যে প্রথম সর্বাত্মক হইয়া উঠিয়াছে।

বিশ্ব-সত্তা লাভের অভীপ্সা যে কী, উহার অতি তীব্র প্রেরণায় কবি অধ্যাত্ম চেতনার কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন এবং পরিশেষে উহার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি জীবের কোন্ নিয়তি-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইতিপূর্বে তাহারই সামান্য পরিচয় লাভ করিয়াছি।

খেয়ার মধ্যেও এই ত্রিধারারই পরিচয় লাভ করা যায়। সর্বাগ্রে খেয়া সম্পর্কে কাব্যের উৎসর্গের মধ্যে কবি স্বয়ং যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন।

কোন্ সুদূর পারে প্রভাস্বর সূর্য। তাহার সহিত মর্ত্যের একান্ত কুণ্ঠিত লজ্জাবতী লতার অন্তরের নিবিড় যোগ! আলোর অ-দৃষ্ট ইশারাকে সে আপনার পত্রপুটে লুকাইয়া রাখে, উহা তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য, তাঁহার পরম সম্পদ। ওই আলোক যখন দৃষ্টি-পথ হইতে সরিয়া যায়, যখন অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, তখন নিঃসীম রাত্রির সহিত নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে সেও তাহার দীন-নাথের জন্য ধ্যানে প্রহর গণনা করিয়া চলে। তখন কি সে ওই অন্ধকারের স্তরে স্তরে আলোকের অ-দৃষ্ট ইশারা ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিতে পায়।

গোপন পথ বাহিয়া অন্তরে ঊর্ধ্বলোক হইতে কত যে অপূর্ব অনুভূতি নামিয়া আসে, তাহা স্পষ্ট করিয়া মানুষ ব্যক্ত করিতে পারে না। মনে হয় ওই চকিত

আভাস ওই অতি ক্ষীণ উপলব্ধিটিই জীবনে একমাত্র সত্য। আমাদের সমগ্র সত্তা ওই অ-দৃষ্ট লোকের আনন্দ সুধা পান করিয়া নিত্য সঞ্জীবিত।

কোন এক আশ্চর্য দুর্লভ মুহূর্তে মানুষ যখন এই অনুভূতি লাভ করে, তাহার পর হইতে উহাকে স্থায়ীরূপে লাভ করিবার আশায় সে বিনিদ্র রজনী যাপন করে, সেই দুর্লভ আনন্দ মুহূর্তটিকে নিত্য কাল অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া আনন্দ-বেদনার জাল বুনিয়া চলে ঃ

"ফুল গুলি সব নীল নয়নে
চুপি চুপি আকাশ পানে
তারার দিকে চেয়ে চেয়ে
কোন্ ধেয়ানে রতা।"

খেয়ায় কবি মানবীয় চেতনারও অগম পারে অনন্ত প্রসারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্যে চকিত মৃদু তরঙ্গের আবর্তন তুলিয়া ডুব দিয়াছেন, জ্যোতি সম্পদ তুলিয়া আনিবার জন্য। অসীমের কিছু সম্পদ বক্ষে জড়াইয়া লইয়া মর্ত্য-কূলে তিনি আবার ভাসিয়া উঠিয়াছেন। উহার কণামাত্র যে জীবনে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার কি আর ঘুম আসে। তাহার পর হইতে তাহার নিত্য জাগরণের পালা। সমগ্র জগতকে একান্তে রাখিয়া অন্তরের মধ্যে তাহারই ধ্যানে মানুষ কাল গণনা করিয়া চলে। খেয়ার মধ্যে কবির এই অসহনীয় অধ্যাত্ম নিপীড়ন, অনন্তের চকিত স্পর্শলাভ এবং তাহারই নিত্য ধ্যানের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে ঃ

"যত্ন ভরে খুঁজে খুঁজে
তোমায় নিতে হবে বুঝে
ভেঙ্গে দিতে হবে যে তার
নীরব ব্যাকুলতা।"

কবি জীবন ও জগতের একেবারে মর্মমূল পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া দেখিয়াছেন যে, এখানে সব ক্ষুধা মেটে না। সেইসঙ্গে কবি ইহাও বোধ করিয়াছেন যে, মানবীয় চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া না গেলে সমগ্র জগৎ ও জীবনের অর্থ উপলব্ধি অসম্ভব।

এই লোক লাভ করিতে হয় কোন্ পথ আশ্রয় করিয়া? ইহা সেই ধ্যানের পথ, অন্তরের পথ। সকল বহির্মুখী চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে হইবে, আর কোন পথ নাই।

একদিকে বৈচিত্রময় জীবনের অপরিতৃপ্তি বোধ, অন্যদিকে উহাকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য ধ্যান-লোকে আশ্রয় গ্রহণের পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নে উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে।

অসীমের পরিচয় লাভ করিতে এমন একটি আন্তঃবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, যাহা সকল বহিঃবৃত্তি নিরপেক্ষ। উহার স্বরূপ কি, সে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। আপাতত ইহাই আমাদের জানিলে চলিবে যে, বহিশ্চেতনার দীপটি সম্পূর্ণরূপে নিভাইয়া দিতে পারিলে অন্তরে আর এক আলোক উদ্ভাসিত হইয়া যায়। সাধক সেই জ্যোতিপথ ধরিয়া মর্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্য-লোকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া যান।

কবি তাই ধ্যান-লোকটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। এই ভাবের কয়েকটি কবিতা খেয়ার মধ্যে আছে। তাহাদের কিছু কিছু অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি:

"শ্রান্ত ওরে রেখে দে জাল বোনা,
গুটিয়ে ফেলো সকল মন্দ ভালো।
ফিরিয়ে আনো ছড়িয়ে পড়া মন,
সফল হোক রে সকল সমাপন।" (সমাপ্তি)

কেবল সীমা বা রূপের মধ্যে আমাদের অতৃপ্তি ঘুচে না। সকল রূপের পশ্চাতে যে অরূপের পূর্ণ ছন্দ নিত্য স্পন্দিত, সকল সীমা যে অসীমের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই যে পরম আশ্রয় স্থল, তাহাকে লাভ করিতে গেলে সীমার বোধ অতিক্রম করিতে হয়। মানুষের মধ্যে তাই এমন নিত্য অতৃপ্তির বিক্ষোভ:

"অনেক দেখে ক্লান্ত এখন প্রাণ,
* * *
এমন কেবল একটি পেলেই বাঁচি।" (পথের শেষে)

জীবন-পথটিকে অতিক্রম করিতে হইবে, না হইলে সংশয় ঘুচিয়াও ঘুচিবে না। প্রাণ-মনের পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করিয়া সমগ্র জগৎ ও জীবন মথিত করিয়া যখন পরিশেষে শূন্যতাই হাতে ঠেকে তখনই ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সার্থক আকাঙ্ক্ষা জাগে, তাহার পূর্বে নহে।

সমগ্র বহিশ্চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া কবি ধ্যান-নিমগ্ন হইয়াছেন, অথচ তখনও পর্যন্ত দেব-যান উদ্ভাসিত হয় নাই। বাহিরের সকল দীপ নিভিয়া গিয়াছে, অথচ হৃদয়-বৃন্তে জ্যোতির শিখা জ্বলিয়া উঠে নাই:

"সাঁঝের প্রদীপ সাজিয়ে ধরেছি
শিখা তাহার জ্বালিয়ে দেবে কবে?" (প্রতীক্ষা)

কবি চিত্তের এই গভীর ব্যাকুলতা সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মর্মমূলে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। কবির চিত্ত-লোকে যে প্রদোষ ঘনাইয়া উঠিয়াছে, যে আবির্ভাবের নিঃশব্দ সমারোহ, যে অ-দৃষ্ট ইশারার চকিত স্ফুরণ, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির চিত্ত-লোকে যেন সেই প্রদোষ, সেই নিঃশব্দ সমারোহ, সেই অ-দৃষ্ট ইশারা। সমগ্র বিশ্ব প্রকৃতি সেই দুর্লভ মুহূর্তের প্রতীক্ষার আবেগে কম্পমান, যেন সেই মুহূর্ত শেষে তাহার মধ্যেও এক আমূল রূপান্তর সাধিত হইয়া যাইবে।

ঠিক এই ভাবটি একটু ভিন্নরূপে প্রকাশ পাইয়াছে 'গানশোনা' কবিতাটির মধ্যে। যে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া কবি অসীমের স্পর্শলাভ করিয়াছেন, সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে সেই ধ্যান-তন্ময়তা। কবি কি ধ্যানের এই ইঙ্গিত লাভ করিয়াছেন বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট হইতে? বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহারই আভস ফুটিয়া উঠে।

যতক্ষণ পর্যন্ত না ধ্যান-নেত্রে জ্যোতির আভা ফুটিয়া উঠিতেছে ততক্ষণ কবি ধ্যান-লোক ছাড়িয়া উঠিবেন না। অসহনীয় বেদনার ভারে হৃদয়-বীণার প্রতিটি তন্ত্রী যদি টুটিয়া যায় যাক্ তবু সেই পরম রাগিণীকেই ধ্বনিত করিয়া তুলিতে হইবে।

"তোরা আমায় জাগাসনে কেউ
জাগাবে সে মোরে।" (জাগরণ)

ধ্যানের রাত্রি শেষে কবি ওই অসীম বা অরূপ-লোকে জাগিয়া উঠিবেন।

চূড়ান্ত ধ্যান তন্ময়তায় মানস-লোকের সর্বশেষ প্রান্ত অগ্নিরাগে আরক্তিম হইয়া প্রায় বিগলিত হইতে চলিয়াছে ঃ

"বুঝি দেরি নাই, আসে বুঝি আসে,
আলোকের আভা লেগেছে আকাশে।" (গোধূলি লগ্ন)

মর্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্য-লোকে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব মুহূর্তে কত আশঙ্কা জাগে, অপরিচয়ের আশঙ্কা। পূর্ণ চেতনার স্বরূপ কি, এই উপলব্ধি ঘটিলে সমগ্র সত্তা (দেহ-প্রাণ-মন) কি ভাবে রূপান্তরিত হইয়া যায়, তখনকার কর্ম কি, চিন্তা কি, কোন্ ভাব ভাবনাকে জীব তাহার পর হইতে প্রকাশ করিয়া চলে? এক কথায় দিব্য জীবনের স্বরূপ কি?

"আমায় কে জানে কি মন্ত্রে গানে
করিবে মগন রে।" (গোধূলি লগ্ন)

সমগ্র ভাবাবেগ অন্তর্মুখীন হইয়া যে কালে এক যোগে একটা শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া ঊর্ধ্বমুখে সীমার আবরণ উদ্‌ভিন্ন করিতে ভয়ঙ্কর প্রেরণায় থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, সেই মুহূর্তের ভাবাবস্থার পরিচয় ঃ

"ওরে আজি বহু দূরের
বহু দিনের পানে
পাঁজর টুটে বেদনা মোর ছুটেছে কোন্ খানে।" (ঝড়)

প্রবল এক টানা ঝড়ে গাছপালা যেমন একটা দিক্ মুখীন হইয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে থাকে, তেমনি অধ্যাত্ম বোধের আকস্মিক প্রেরণায় চিত্তের সকল বহির্মুখী, বিশৃঙ্খল প্রেরণা একমুখীন হইয়া অমন প্রবল শক্তির আবেগ রূপে অনুভূত হইয়াছে ঃ

"আজিকে হঠাৎ কী হল রে তোর
ভেঙ্গে যেতে চায় বুকের পাঁজর,
অকারণে বহে নয়নের লোর
কোথা যেতে চাস ছুটে।" (চাঞ্চল্য)

নিশ্চল প্রকৃতির মধ্যে মাঝে মাঝে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সেদিন সে সকল নিয়ম শৃঙ্খলের বন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য অধীর, উন্মত্ত হইয়া পড়ে। তাহার হৃদয়-লোকে যেন কার আহ্বান আসিয়া পৌঁছায়! সে আহ্বানে তাহার সমগ্র সত্তা একটি সীমাহীন ব্যাপ্তির মধ্যে আপনাকে হাহাকারে হারাইয়া ফেলিতে একটি অজ্ঞাত লোকে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিতে চায়।

মানব-জীবনে এমনি এক একটি অনুভূতির মুহূর্ত আসে, হৃদয়ে এক দিব্য-রূপের আভাস নামে, অমনি সজল মেঘের মত পরিব্যাপ্ত, পরিপূর্ণ, অমনি স্নিগ্ধ, অমনি সকল তাপ বিমোচনকারী, তখন প্রতিদিনের তুচ্ছতার বন্ধন হইতে মানুষ বাহির হইয়া পড়িবার জন্য মাথা কুটিয়া মরে, তখন জীবনের সব কিছু বোঝা বলিয়া বোধ হয় ঃ

"জানি না তো আমি কোথা হতে নামি
কী ঝড়ে আঘাত লেগে
জীবন ভরিয়া মরণ হরিয়া
কে আসিছে কালো মেঘে।" (চাঞ্চল্য)

এক একটি চেতনা পর্যায়ে কবির নিকট বিশ্বের এক একটি রূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। আজ কবি উন্নততর চেতনা পর্যায় লাভের জন্য উন্মুখ, ধ্যান-মগ্ন। সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতিও যেন কোন দয়িতকে লাভ করিবার জন্য তপস্যা রত। কবি চিত্তের বৈরাগ্য বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। কবি সেই একই বিশ্ব-প্রকৃতিকে দেখিতেছেন। তাহার প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত বিচিত্র প্রকাশ, বিচিত্রবেশ, ষড়ঋতুর বিচিত্র আবর্তন, কখন সুদিনের প্রসন্নতা, কখন দুর্দিনের ভয়ঙ্করতা; কিন্তু এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া কবি-চিত্তেরই মত অধীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

কবি একটি জীবন পর্যায় সম্পূর্ণ করিয়া আর একটি জীবন পর্যায়কে লাভ করিতে চলিয়াছেন। ইহা কবি-জীবনের এক পরম গম্ভীর পর্যায়। একদিকে অতীত দিনের স্মৃতিভারে মন আমন্থর, অন্যদিকে পরিব্যাপ্ত মহান অজ্ঞেয় লোক লাভের নিঃসাড় সমারোহ। ইহা যেন দিন শেষে রাত্রি আগমনের পূর্বের গোধূলি অবস্থা। যেন পথ পরিক্রমা শেষে পারের খেয়াতরী লাভের জন্য প্রতীক্ষা, যেন দূর দেশ যাত্রার পূর্বে প্রিয়জনদের নিকট বিদায় গ্রহণের পালা। কবির এই মানসিক অবস্থা ব্যক্ত করিতে কবিতার নামগুলিই যথেষ্ট। 'শেষ-খেয়া', 'ঘাটের পথ, 'ঘাটে,' 'গোধুলি লগ্ন,' 'বিদায়,' 'পথের শেষ,' 'সমাপ্তি,' 'বর্ষা' সন্ধ্যা,' 'খেয়া' ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটি রূপক কবির ওই মানসিক অবস্থাকে প্রকাশময় করিয়া তুলিয়াছে।

এখন কাব্যের একেবারে প্রারম্ভে ও শেষে 'খেয়া' নামে যে দুইটি কবিতা আছে তাহার অর্থ বুঝিতে পারা যাইবে।

এই 'খেয়া' মানুষের এমন একটি বৃত্তি যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ মর্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্য-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ধ্যান-লোকে কবি তাহার আভাস লাভ করিতে পারিলেও এখনও তাহাকে আশ্রয় করিতে পারেন নাই। ওই লোকে কবি বিশ্ব-মানবের ধ্যান-লোকের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। এমন একাত্মতা বোধ যে সম্ভব তাহা কবি নিজের জীবনেই উপলব্ধি করিয়াছেন।

ওই বৃত্তির খেয়ায় চড়িয়া কত মানুষ সীমার এপার হইতে অসীমের ওপারে যাত্রা করিয়াছে। অমর্ত্য-লোকে মানবাত্মাকে একাকী অভিসার করিতে হয়।

কবি মানস-লোকের উধ্ব´তম সীমা-লোকে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন, কিন্তু সেই বৃত্তির স্ফুরণ কোথায়, সেই খেয়া তরী, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি অসীমের ওপারে পৌঁছাইয়া যাইবেন?

"ওপার হতে সোনার আভা
পরাণ ফেলে ছেয়ে,
ওগো আমার নেয়ে।" (খেয়া)

কেবল অমর্ত্য-লোকের একটা আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়, কিন্তু ওই পারে পৌঁছাইবার কি কোন উপায় নাই ?

মর্ত্য ও অমর্ত্য-চেতনার মধ্যবর্তী যে সীমাহীন অন্ধকার-লোক, তাহাকে পার হইতে হয় কেমন করিয়া, কাহাকেই বা আশ্রয় করিয়া ?

তাহার পর কবি পরিশেষে ওই খেয়াতরী লাভ করিয়াছেন। ওই তরীতে উঠিয়া তিনি মর্ত্যের সকল বন্ধন একে একে খুলিয়া দিয়াছেন ঃ

"শুধু শিকল দিলেম খুলে
শুধু নিশান দিলেম তুলে" (সমুদ্রে)

কেবল যুক্তি, বিচার ও ভাবনার সহায়তায় অসীমের উপলব্ধি অসম্ভব। অসীমকে লাভ করিবার উপায় সীমা অর্থাৎ ব্যক্তি বা 'আমি'র বোধ বিসর্জন দেওয়া। আমিত্ব বলিতে মর্ত্যের আসক্তির সামগ্রিক প্রকাশটিকে বুঝায়। ইহাই 'শিকল খুলিয়া' দেওয়া। এই বোধ বিসর্জন দিতে মানুষকে অসীমের করুণার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। এই নির্ভরতাই ভক্তি। এই ভক্তির ভিতর দিয়া (ইহাই নিশান) মানুষ তাঁহারই কৃপার-বাতাসে ভর করিয়া লক্ষ্য স্থলে পৌঁছাইয়া যায়।

প্লেটোর মতে সত্তা উন্নততর অস্তিত্বের প্রকাশ। জগতে ভাব (ideas) মুখ্য এবং জড় মৌন। ডেস্‌কার্টেসের মধ্যে মোটামুটি এই মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে। অস্তিত্বের স্বরূপ ব্যাখ্যায় ডেস্‌কার্টেস এবং লিব্‌নিজের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য থাকিলেও কেহ ও আত্মার পৃথক অস্তিত্বে উভয়ে একমত ছিলেন। উভয়ের মধ্যে কোন সংযোগকে তাঁহারা স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদের মতে দুইটি এমন ভাবে বিন্যস্ত যাহার ফলে মনেহয় যেন একটি অন্যটিকে প্রভাবিত করিতেছে। ডেস্‌কার্টেস এবং লিব্‌নিজের এই অভিমত আইনষ্টাইনও পোষণ করিতেন।

আদর্শবাদী দার্শনিকগণ জগৎকে প্রথমে জড় ও মন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জড় জগতের নিজস্ব কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। ইহা মানস ধর্ম বিশিষ্ট এবং মনের দ্বারা স্রষ্ট। এই শ্রেণীর দার্শনিকদের মধ্যে বিশপ বার্কলের নাম সর্বাগ্রে করা যাইতে পারে।

আমাদের মন যখন অনুভব করিতেছে না তখনও যে জড় জগতের অস্তিত্ব থাকে তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। বার্কলে তাঁহার উত্তরে বলেন, যাহা আমাদের মনের মধ্যে নাই. যাহা আমাদের মনের দ্বারা উপলব্ধ নয় তাহা রহিয়াছে ঈশ্বরীয় মনের মধ্যে, এবং তাহা ঈশ্বরী মনের দ্বারা উপলব্ধ। বার্কলে যাহাকে ঈশ্বরীয় মন বলিয়াছেন, হেগেল তাহাকে বিশ্বমন বা পরমমন বলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ জড়, মন, বিশ্বমন এবং দিব্য-চেতনা এই প্রত্যেকটি তত্ত্বের পৃথক অস্তিত্বে যেমন বিশ্বাসী ছিলেন তেমনি তাহাদের মধ্যে কোন-না-কোন ভাবে যে সংযোগ আছে তাহাও বিশ্বাস করতেন।

দেখিতে দেখিতে মর্ত্যের আভাস ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। এই যে ধীর উত্তরণ, ইহার কোন্ পরিচয় কেমন করিয়া মানুষ দান করিবে? ইহা মানুষের সম্পূর্ণ অননুভূত লোক :

"যাক্ না মুছে তটের রেখা
নাই বা কিছু গেল দেখা—।" (সমুদ্রে)

মর্ত্য চেতনার আশ্রয় যখন নষ্ট হয়, চির পরিচিত মর্ত্য-সীমা যখন হারাইয়া যায়, তখন মনের মধ্যে এক অলৌকিক আশংকা জাগে। এই আশংকা জয় করিয়া উঠিতে হয় সর্বস্ব সমর্পণের ব্যাকুলতা, পরিপূর্ণ নির্ভরতা, অর্থাৎ ভক্তির সহায়তায়। তখন এই বোধ থাকে যে, যে-প্রেরণা তাহাকে পরিচিত জগৎ হইতে দূরে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে, সেই প্রেরণাই একদিন আকাঙ্ক্ষিত লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিবে।

কবির এই সাধনা এই যাত্রা নিষ্ফল হয় নাই। কবির খেয়াতরী পরিণামে অমর্ত্য-লোকের তীরে ভিড়িয়াছে :

"এমন সময় অরুণ তরণী বেয়ে
প্রভাত নামিল গগন পারে।" (সার্থক নৈরাশ্য)

এই অলৌকিক অনুভূতিকেও কবি ভাষা-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভাষা সীমার জগতের সামগ্রী, ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতিকে তাহা একটা সুস্পষ্ট ভাবরূপ দান করিতে পারে মাত্র। এই সীমাবদ্ধ ভাষা দিয়া অসীমের অনুভূতিকে তাই প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এই জাতীয় সকল প্রয়াসের মধ্যে তাই লক্ষ্য করা যায়, যে এক অলৌকিক উল্লাসের দিব্যোন্মাদের অস্থিরতা বারংবার সকল রূপ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে :

"আজ নয়ন মেলিয়া এ কী হেরিলাম
বাধা নাই কোন বাধা নাই
আমি বাঁধা নাই। (মুক্তি পাশ)

"এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে
আলোক আমার তনুতে-কেমনে
মিলে গেছে মোর তনুতে—" (মিলন)

"অন্তর হতে বাহিরে সকলি
আলোকে হইল দিশা,
নয়ন আমার হৃদয় আমার
কোথাও না পায় দিশা।" (টিকা)

অলৌকিক আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধকে রূপায়িত করিতে কবির রূপক ক্ষমতা যে কত ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে তাহার পরিচয় লাভ করিতে আমি কেবল একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এমন অনেক পরিচয় কাব্য মধ্যে আছে:

"ওগো পারিজাতের কুঞ্জবনে স্বর্গ পুরীতে
মৌমাছিরা লেগেছিল মধু চুরিতে।
আজ প্রভাতে একেবারে
ভেঙ্গেছে চাক সুধার ভারে
সোনার মধু লক্ষ ধারে লাগে ঝুরিতে।" (বর্ষা প্রভাত

এই সাক্ষাৎকারের পর মানুষের আর কিছু আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সেই সুধা-রস পানে মর্ত্যের মানুষের সকল পিপাসা পরিতৃপ্ত হইয়া যায়।

খেয়ার মধ্যে কবির বিচিত্র অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসার যে পরিচয় লাভ করা যায় এই প্রসঙ্গে তাহার কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

জগৎ ও জীবনের ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভই যদি পরম পুরুষার্থ হইয়া থাকে, তবে এই জীবনের মূল্য কি, ইহার অর্থই বা কি? একদিকে সীমার বোধ, অন্যদিকে অসীমের বোধ। এই দুইয়ের মাঝে যোগ কোথায়, কোন্ স্বরূপে?

জীবের সেই সঙ্গে বিশ্বসৃষ্টির সত্য মূল্য যদি কোথাও কিছু থাকে, তবে তাহা কেবল অসীমের যোগে। অসীম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে সীমা শূন্য হইয়া উঠে। সীমা-রূপ আশ্রয় করিয়া অসীম নিত্য নব রূপ নব ভাব সৃষ্টি করিতেছে। এই সৃজন প্রলয়ের মধ্যে তাঁহার আনন্দের প্রকাশ:

"শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা !" (লীলা)

এই লীলা যখন ফুরায় তখন সীমা অনস্তিত্ব হইয়া যায় :

"মেঘের খেলা মিলিয়ে যাবে
জ্যোতি সাগর পারে।" (লীলা)

তিনি আপনার সৃষ্টি বা মায়া-শক্তির দ্বারা মায়া রূপ পরিগ্রহ করিয়া আপনার আনন্দ আপনি সম্ভোগ করিতেছেন। সীমা আশ্রয় করিয়া যে 'নিত্য বিচিত্রতা' সৃষ্টি, তাহা তাঁহারই মায়া। সীমা ও অসীমের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করিতে পারা যায় না বলিয়া সীমাও শূন্য বা মায়া। সত্য শুধু এক জ্যোতি প্রসার। অদ্বৈতবাদীদের যাহা মায়া-তত্ত্ব, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে লীলা-তত্ত্ব রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

একখণ্ড মেঘ আকাশের বুকে বায়ুভরে ভাসিয়া বেড়ায়। প্রতিমুহূর্তে কত রূপ পরিগ্রহ করে, আলোক রশ্মি তাহার বুকে কত রঙের আলিম্পনা আঁকিয়া মুছিয়া দেয়। বৈশাখের ঝড়ের মুখে কখন দুর্বার, মধ্যাহ্নে আমন্থর। তাহার পর এক খণ্ড মেঘ কোথায় হারাইয়া যায়। উর্ধ্বে কেবল চির স্থির নীল আকাশ হাসিতে থাকে।

ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া বহির্জীবনের সকল প্রলোভন জয় করিয়া উঠিতে না পারিলে দিব্য জীবন লাভ ঘটে না। 'বিচিত্র ছলনা জালকে' যে কাটাইয়া উঠিতে পারে সেই কেবল পরম সত্য লাভ করিয়া ধন্য হয়।

সাংসারিক মানুষ ঐশ্বর্য খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ইহাদিগকে বঞ্চিত বোধ করে, কিন্তু ইহারা যে অনন্ত সম্পদ বক্ষে ধরিয়া মর্ত্য হইতে বিদায় লইয়া যায় তাহার পরিমাপ সাংসারিক মানুষ করিতে পারে না, বুঝিতে পারে না যে তাহারা কতদূর বঞ্চিত ও করুণার পাত্র। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিয়াছি। মর্ত হইতে বিদায় লইবার পূর্ব মুহূর্তে কবির এই উপলব্ধিই অসি-দীপ্ত-বাণী-বন্ধনে শেষ বারের মত উচ্চারিত হইয়াছে।

"এই হারা তো শেষ হারা নয়,
আবার খেলা আছে পরে।
জিতল যে সে জিতল কি না
কে বলবে তা সত্য করে।"

যে প্রেরণা একেবারে সামঞ্জস্য বা সুষমাকে লাভ করিতে চায়, তাহা খাঁটি কাব্য প্রেরণা নহে। রূপ বা এই অর্থে অসামঞ্জস্যকে পরিহার করিয়া একেবারে

অরূপ বা পূর্ণ সামঞ্জস্যকে রূপায়িত করিবার যে প্রেরণা, তাহা সঙ্গীতের প্রেরণা, খাঁটি কাব্য প্রেরণা নহে। সঙ্গীতের প্রেরণায় অব্যক্ত অনুভূতি আর রূপাশ্রয়ী হইয়া প্রকাশিত হয় না। কিন্তু কাব্যে ওই রূপটি যেমন থাকে, তেমনি ওই রূপ অতিক্রম করিয়া অরূপে উত্তরণের অলৌকিক একটি প্রেরণাও প্রচ্ছন্ন থাকে। খাঁটি কাব্যে তাই মানুষের উভয় প্রেরণা চরিতার্থ হয়, রূপ-পিপাসা যেমন, অরূপ-পিপাসাও তেমনি।

"সঙ্গীত এইরূপে অন্যান্য শিল্প কর্মের বিপরীত এবং উহা বিশ্ব-ছন্দটিকে অপরোক্ষ ভাবে রূপায়িত করিতে চায় বলিয়া উহার অচেতন অধ্যাত্ম মূল্য আছে।" (ক্রোচে)

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্বে এই কারণেই কবির অমন অফুরন্ত সঙ্গীত সৃষ্টি। এই সঙ্গীতধর্মী হইয়া উঠিবার পশ্চাতে যে বিশ্ব-সত্তা বা পূর্ণ সামঞ্জস্যকেই রূপায়িত করিবার প্রেরণা রহিয়াছে তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে।

কবি যেখানে রূপ আশ্রয় করিয়া অরূপ-লোকে ধীরে ধীরে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছেন, সেই খাঁটি কাব্য প্রেরণার পরিচয় খেয়ার মধ্যে যে কয়েকটি কবিতায় রহিয়াছে এখন তাহাদের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রির ঝঞ্ঝা ক্ষুব্ধ বর্ষণে সম্মুখের সরোবর কূলে কূলে ভরিয়া গিয়াছে। অবিশ্রান্ত ধারাপাতে এবং মত্ত বাতাসের তীব্র আলোড়ন-ক্লিষ্ট কমল-কলিকা প্রভাতে সূর্য কিরণে সকল দল বিকশিত করিয়া অপরূপ সৌন্দর্য বিস্তার করিয়াছে। এইটুকু মাত্র রূপ, কিন্তু কোন্ মহাভাবকে কবি এই রূপক আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন।

ধ্যানের নিঃসীম অন্ধকার অতিক্রম করিয়া কবির অন্তরে অলৌকিক প্রভা উদ্ভাসিত হইয়াছে। ধ্যান-লোকের সমুদ্রোচ্ছ্বসিত বেদনার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া জ্যোতির্ময় দিব্য শতদলের প্রকাশ ঘটে।

এইরূপে বাহিরের রূপ অন্তরে আর এক সরোবর, আর এক বর্ষণ ক্ষুব্ধ রাত্রি, আর এক প্রভাত, আর এক কমল-কলিকার দল বিস্তারে রূপায়িত হইয়া গিয়াছে।

"হেরো হেরো মোর অকুল অশ্রু
সলিল মাঝে
আজি এ অমল কমল কান্তি
কেমনে রাজে।" (প্রভাতে)

কুঁড়ির বক্ষে সৌরভের যে বেদনা তাহা যে পূর্ণতা লাভের জন্য তাহা সে তখনি বুঝিতে পারে যখন পাপড়ির বন্ধন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে। মানুষের জীবনেও একথা সত্য; অর্থাৎ মানুষও আপনার অর্থ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় পূর্ণতা লাভের ভিতর দিয়া, পরিণামে জীবনের ঊর্ধ্বে উঠিয়া। তাহার পূর্বে জীবন অর্থহীন বলিয়া বোধ হয়। জীবনের সম্পূর্ণ অর্থ জীবনের সীমায় লাভ করিতে পারা যায় না।

সৌন্দর্য-ধ্যান কি, উহার ধ্যান তন্ময় মুহূর্তে উন্নততর চেতনার আভাস কেমন করিয়া অন্তরে আসিয়া পৌঁছায় তাহার সুন্দর পরিচয় লাভ করা যায় 'দীঘি' কবিতাটির মধ্যে।

"শেওলা পিছল পৈঠা বেয়ে নামি জলের তলে
একটি একটি করে,
ডুবে যাওয়ার সুখে আমার ঘাটের মতো যেন
অঙ্গ উঠে ভরে।
ভেসে গেলাম আপন মনে ভেসে গেলাম পারে,
ফিরে এলাম ভেসে,
সাঁতার দিয়ে চলে গেলাম চলে এলেম যেন
সকল হারা দেশে।" (দিঘি)

এমনি করিয়া সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবি মর্ত্য-লোক হইতে অমর্ত্য আর এক লোকে, বহির্লোক হইতে সীমাহীন অন্তর্লোকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেন।

এই সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া চেতনা যখন সম্পূর্ণ অন্তরাবৃত্ত হইয়া যায়, তখন তাহা এমন এক অনুভূতি লোকে উত্তীর্ণ হয়, যাহাকে জাগতিক কোন বোধ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না।

"ওগো বোবা, ওগো কালো, স্তব্ধ সুগম্ভীর
গভীর ভয়ঙ্কর,
তুমি নিবিড় নিশীথ রাত্রি বন্দী হয়ে আছ
মাটির পিঞ্জর।" (দিঘি)

রাজা নাটকে রাণীর শেষ উক্তি স্মরণে পড়িতেছে। রাজা রাণীকে ডাকিতেছেন আলোকে, বিশ্ব-মানবের লীলা ক্ষেত্রের মাঝখানে। আর রাণী

সেই আলোকে বাহির হইয়া আসিবার পূর্বে তাঁহার অন্ধকার ঘর, আর তাঁহার সেই অন্ধকার ঘরের রাজাকে শেষ প্রণাম করিয়া লইতে চাহিতেছেন।

এই অন্ধকার ঘর কি, না চিত্তের সেই অবস্থা, যে অবস্থায় মানবীয় চেতনা সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন, অথচ তখনও পর্যন্ত সেই জ্যোতির্ময় দিব্য-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায় নাই।

"তীরের কর্ম সেরে আমি গায়ের ধুলো নিয়ে,
নামি তোমার মাঝে—
এ কোন্ অশ্রুভরা গীতি ছল্ ছলিয়ে উঠে
কানের কাছে বাজে." (দিঘি)

কবি বারংবার অন্তরের এই ধ্যান-লোকে আশ্রয় লাভ করিতেন, বাস্তব জীবনের রূঢ়তা ও মালিন্য হইতে সাময়িক ভাবে মুক্ত হইবার জন্য। সেই লোক আশ্রয় করিয়া আনন্ত্যের কত-না চকিত আভাস তাঁহার অন্তরে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। এক অন্তহীন ব্যথা ভরা সুর, এক নিঃসীম ব্যাকুলতা।

কবি চেতনা এই দিব্য পরিণাম লাভ করিয়াছে কেবল সৌন্দর্য-ধ্যানের মধ্য দিয়া নয় প্রেমের ধ্যানৈক পরিণামের মধ্য দিয়াও।

দার্শনিক চিন্তায় কোথাও কোথাও দিব্য ও মানবীয় চেতনাকে যেমন সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তেমনি ইহারই প্রভাবে আমরা মানবীয় প্রেম এবং ঈশ্বরীয় ভক্তিকে পৃথক বলিয়া বোধ করি। মানবীয় প্রেম যে একটা বিশেষ পরিণামে ভক্তি স্বরূপতা লাভ করে তাহা এই কারণেই বুঝিতে পারি না।

নর-নারীর প্রেম যে পরিণামে অহং-এর শাসন অতিক্রম করিয়া বিশ্ব বা আনন্ত্যমুখীন হয় প্রেমের সেই পরিণামকে বলে ভক্তি। দিব্য চেতনায় উহার যে অবসান তাহাই মুক্তি। প্রেমের এক স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন চেতনা-পর্যায়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ ও ধর্ম লইয়া প্রতিভাত হয়।

খেয়ার মধ্যে অধ্যাত্ম বোধাশ্রয়ী প্রেমের যে পরিচয় লাভ করা যায়, এক্ষেত্রে তাহারও কিছু আলোচনা করিতেছি।

নর-নারীর প্রেমোপলব্ধিকে যে মিষ্টিক উপলব্ধি বলা হয়, তাহার মূলে এই কারণ রহিয়াছে। প্রাণের অতি প্রবল স্ফুরণধ্যান-লোক বিদীর্ণকরিয়া মুহূর্তের জন্য জীবনে অলৌকিক সাক্ষাৎকার ঘটায়। তাহার পর নর-নারী ইহাকে একটি বিশিষ্ট রূপাশ্রয়ী করিয়া উহারই স্মৃতির ধ্যানে ডুবিয়া যায়। এইরূপে ধ্যান-লোকটি একান্ত হইয়া উঠিবার ফলে বহির্জীবনের সকল বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া যায়।

"ফেলিতে নিমেষ দেখা হবে শেষ
যাবে সে সুদূর পারে—" (শুভক্ষণ)

মুহূর্তের এই সাক্ষাৎকার লাভের পর হইতে জাগতিক সকল বন্ধন শিথিল হইয়া যায়, একটি পরিপূর্ণ বৈরাগ্য বা আত্ম সমর্পণের জীবন সুরু হয়। ইহার পরিচয় কবি 'ত্যাগ' কবিতাটির মধ্যে দান করিয়াছেন।

"ছিঁড়ি মণি হার ফেলেছি তাহার
পথের ধূলার পরে।" (ত্যাগ)

এই সাক্ষাৎকার ঘটে অন্তরে, ধ্যান-লোকে, তাই বাহিরে ইহার কোন পরিচয় নাই, পরিমাপ নাই।

"আমি কি দিলেম কারে জানে না সে কেউ
রহিল ধূলায় ঢাকা।" (ত্যাগ)

'মা' সেই লৌকিক চেতনা, যাহার নিকট অধ্যাত্ম-উপলব্ধি এবং ত্যাগের কোন মূল্য বোধ নাই। লৌকিক সত্তা ত্যাগের বেদনাটিকেই কেবল প্রত্যক্ষ করে। এই বেদনার পারে যে আনন্দ-শতদল একটির পর একটি করিয়া দল মেলিয়া চলে, অর্থাৎ ত্যাগের ভিতর দিয়া যে আনন্দ সম্ভোগ তাহার কোন পরিচয় তাহার নাই বলিয়া সে অমন বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া যায়। লৌকিক চেতনায় ত্যাগ শূন্যতা মাত্র। শুদ্ধ আনন্দ প্রেরণায় যে ত্যাগ তাহার কোন উপলব্ধি এই চেতনায় সম্ভব নয়।

নর-নারীর প্রেমে দেহ-প্রাণ-মন ঘিরিয়া যে তীব্র বিক্ষোভ ও জ্বালা তাহা বিশোধিত হইয়া ধ্যান-লোকে কেমন ভক্তিতে স্নিগ্ধ, পরিব্যাপ্ত বিষাদে পরিণত হইয়া যায়, তাহা লক্ষ্য করিতে আমি আর একটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি।

যে পুরুষ অজ্ঞাত, রহস্যপূর্ণ জীবনের অনন্ত যাত্রা পথে নারীকে ভালবাসিয়া তাহার উচ্ছলিত হৃদয়-কলসের পরিপূর্ণ প্রেম-সুধা অঞ্জলি ভরিয়া পান করিয়াছিল সে আজ কোথায় চলিয়া গিয়াছে। কোন্ অজ্ঞাত লোকের পর লোক অতিক্রম করিয়া সে চলিয়াছে, তাহার পথ চলার বিরাম নাই। সেই অবিরাম পথ চলায় হয়ত আজিকার এই স্মৃতিটুকু ম্লান হইয়া নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। নারীর তাহাতে অভিমান নাই। ওই দানেই তাহার প্রেম চিরকালের জন্য চরিতার্থ হইয়া গিয়াছে।

সেই তৃষিত প্রার্থনায় জল দানের পর হইতে নারীর চোখে আর ঘুম আসে না। ইহাকেই প্রাণের অলৌকিক জাগরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। সেই

সীমাহীন আনন্দ ও বেদনার স্মৃতি বক্ষে লইয়া তাহার প্রতীক্ষায় দিন কাটিয়া যায়। সে আর ফিরিয়া আসিবে না তাহা জানিয়াও নারী প্রতীক্ষায় প্রহর গণনা করে। ফিরিয়া আসা গৌণ, এই উপলব্ধির পর হইতে নারীর জীবন অহর্নিশ জাগরণে পরিণত হইয়া যায়।

"তোমায় দিতে পেরে ছিলাম একটু তৃষার জল
এই কথাটি আমার মনে রহিল সম্বল।" (কূয়ার ধারে)

নর নারীর জাগতিক জীবন যে একান্ত বিনষ্ট নয়, ঈশ্বরীয় বোধ ও জাগতিক বোধ যে একান্ত বিচ্ছিন্ন নয়, মানবিক প্রেমেরবিচিত্র লীলার ভিতরদিয়া নর-নারী স্বাভাবিক পরিণামে যে ঈশ্বরীয় ভক্তি লাভ করে কবির এই উপলব্ধির প্রকাশ ঘটিয়াছে 'বালিকা বধূ'র মধ্যে। ইহা কবি-জীবনের একটি স্থায়ী উপলব্ধি। এই উপলব্ধিকে তিনি পূর্বাপর নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিশেষে আর এক শ্রেণীর কবিতার কিছু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন। কবিতাগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট একটি রস-প্রেরণার পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। বিশিষ্ট একটি রস-প্রেরণাই শুধু নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট একটি সাধনার অধিকারী করিয়াছে। এই জাতীয় কবি-প্রেরণার প্রতি ইঙ্গিত ইতিপূর্বেও যেমন করিয়াছি, পরবর্তী কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহার উল্লেখ করিব। বিশিষ্ট এই রস-প্রেরণাই রবীন্দ্র-কাব্যের সিদ্ধ রস।

কবি জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেন, তাহার একটি পরিচয় তিনি 'ঘাটের পথে' কবিতাটির মধ্যে দান করিয়াছেন।

আমাদের জীবন কেবল প্রয়োজন বোধেই জল লইয়া আশায় সীমাবদ্ধ নয়, সীমাবদ্ধ চেতনায় কত অপরূপতার আভাস লাভ ঘটে, অনন্তের কত বিদ্যুদ্দীপ্তি।

সীমাবদ্ধ বোধ দিয়া অপরিজ্ঞাত জগৎকে আমরা যতটা বেষ্টন করিতে পারি ততটুকুই আমাদের পরিচিত জগৎ। এই পরিচিত জগতের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া অসীম রহস্য লোকের চির উদ্বেলতা। এই পরিচিত লোকের কেন্দ্র স্থলবর্তী হইয়া অপরিচিত লোকের চিন্তা করিলে অন্তরে যে অপার বিস্ময় বোধ জাগে জীবনে তাহারও একটি বিশিষ্ট রস-প্রেরণা আছে।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি প্রাণের যে লীলা, সৌন্দর্য ও প্রেমের যে বিচিত্র প্রকাশ তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীবনে যে অনির্বচনীয়তার আভাস লাভ, কবি তাহার পর্যায় অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন।

"আমার চুকেছে দিবসের কাজ,
শেষ হয়ে গেছে জল ভরা আজ,
দাঁড়ায়ে রয়েছি দ্বারে।" (ঘাটের পথ)

এই জীবনকে এই লীলাকে কবি কত আপনার করিয়া লাভ করিয়াছিলেন তাহা কবিকে কী নিশ্চিন্ত নির্ভরতাই না দান করিয়াছিল।

"যা হোক তা হোক এই ভালোবাসি
বহে নিয়ে যাই, ভরে নিয়ে আসি,
কতদিন কত বার।" (ঘাটের পথ)

কান্না হাসি, দুঃখ সুখ বিজড়িত এই মানব জীবন। বিশ্ব-প্রাণ স্রোতে সেই নিরুদ্দিষ্ট ভাসিয়া যাওয়া, আনন্দ-বেদনার কী আশ্চর্য প্রসার! কেবল প্রাণের আন্দোলন নয় সৌন্দর্য-প্রেমের অন্তহীন লীলা বিলাসই নয়, ধ্যানে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত সৌন্দর্যের যে স্থির অনির্বচনীয় রূপ ফুটিয়া উঠে সেই রূপের নিভৃত আরতি; তাহারও কত না পরিচয় আছে কবির কাব্যে।

আর এক অনির্দেশ্য ব্যাকুলতায় চিত্ত সজল হইয়া উঠে। যাহা মানবিক এই সকল বোধকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া কোন্ অসীম লোকে নিত্য উপচাইয়া পড়িতেছে।

"যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা,
ঘরের ভিতরে না দেয় থাকিতে
অকারণ আকুলতা।
আপনার মনে একা পথে চলি,
কাঁখের কলসী বলে ছল ছলি
জলভরা কলকথা—" (ঘাটের পথ)

বিশ্ব এমনি করিয়া কবির সমগ্র সত্তাকে নানাভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। কবিকে কত না নাম ধরিয়া কত খেলায় ডাক দিয়াছে।

"আমি বাহির হইব বলে
যেন সারাদিন কে বসিয়া থাকে
নীল আকাশের কোলে।" (ঘাটের পথ)

আজ কবির জীবনে এই পর্যায় শেষ হইয়া গিয়াছে। জীবনের এই রস প্রেরণাকে পরিহার করিয়া কবি আজ পূর্ণ চেতনা লাভের জন্য উৎসুক। এই ঔৎসুক্য বোধের সঙ্গে সঙ্গে কবি আবার মর্ত্য জীবনের প্রতি প্রবল

আকর্ষণ বোধ করিয়াছেন। জীবনে এই অপূর্ণতার পীড়া বোধ আছে বলিয়া তো এত প্রেম, প্রেমে এমন অধীরতা। মর্ত্যের প্রেম এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য নিত্য উৎকণ্ঠিত।

"কম কিছু মোর থাকে হেথা
পুরিয়ে নেব প্রাণ দিয়ে তা।" (ঘাটে)

যে রস-প্রেরণা মর্ত্যের এই অপূর্ণতাকেই কল্পলতা বোধে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতে চায়, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই রস-প্রেরণার স্বরূপ বুঝিতে হইবে।

মর্ত্য জীবনের প্রতি গভীর মমতাই অমন বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে 'পথিক' কবিতাটির মধ্যে। অন্তরের মধ্যে অলৌকিক প্রেরণা যখন অনুভূত হয়, তখন উহারই অনুপ্রেরণায় মানুষ সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া বসে। জীবনের আর কোন কিছুতে তাহার মন বসে না।

অমর্ত্য লোকে অভিসার করিবার পূর্বে মর্ত্যের ব্যাকুল আহ্বান তাহার হৃদয়কে করুণা-রস-সিক্ত করিয়া তুলে না। হায়! মর্ত্য প্রেম এমনি অসহায়! সে যে বাঁধিয়া রাখিবে এমন শক্তি তো তাহার নাই। সে শুধু মমতায় দ্বার প্রান্তে দাঁড়াইয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে পারে।

"পথিক ওগো মোদের নাহি বল
রয়েছে শুধু আকুল আঁখি জল।" (পথিক)

অন্তরের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া তুলিতে বিশ্ব প্রকৃতির প্রাণপণ কত না প্রয়াস।

"এ খেলা যদি না লাগে তব ভালো
শান্তি যদি না মানে তব প্রাণ,
সভার তবে নিভিয়ে দিব আলো
বাঁশির তবে থামিয়ে দিব তান।
স্তব্ধ মোরা আঁধারে রব বসি
ঝিল্লি রব উঠিবে জেগে বনে,
কৃষ্ণ রাতে প্রাচীন ক্ষীণ শশী
চক্ষে তব চাহিবে বাতায়নে।" (পথিক)

জাগতিক জীবনে, স্পষ্ট দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি আলোকের, রূপের, বৈচিত্র্যের, চাঞ্চল্যের এবং সম্ভোগের; আর একটি অন্ধকারের, একাকারের এবং ত্যাগের। একটিতে মানবীয় চেতনা বহির্মুখী অন্যটিতে অন্তর্মুখীন। মানবীয় চেতনার, জাগতিক বোধের দুইটি পর্যায়। একটির

অপরিতৃপ্তি দূর করিতে তাই জাগতিক চেতনা ছাড়াইয়া উঠিবার কোন প্রয়োজন নাই।

ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং যে জীবনের এই পর্যায় আশ্রয় করিয়া সমস্যার সমাধান অন্বেষণ করিয়াছিলেন তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমরা উল্লেখ করিয়াছি, যে জীবনের পূর্ণ সমাধান লাভ করিতে মানুষকে জাগতিক বোধের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। মন ও বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া এই রূপে যত তত্বই গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করা যাক্-না-কেন, তাহার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে।

কবি যে অতৃপ্তি বোধ করিতেন, তাহাকে অমর্ত্য কোন চেতনা-লোক লাভ করিয়া নহে, এই জগৎ ও জীবনের একটি ভিন্ন দিক আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ করিবার এইরূপ নানা চেষ্টা করিতেন।

এই বিশিষ্ট প্রেরণার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় 'নীড় ও আকাশ' কবিতাটির মধ্যে। কবি যে অমর্ত্য-লোক লাভে অসমর্থ হইয়া অমনি উপায়ে প্রাণ-মনকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহাও নহে।

উর্ধ্বতর চেতনা লাভে যে পূর্ণতা বোধ তাহা কবি লাভ করিয়াছিলেন।

"আপন মনের পাইনে দিশা
ভুলি শঙ্কা হারাই তৃষা,
যখন করি বাঁধন হারা
এই আনন্দ অমৃত পান।" (নীড় ও আকাশ)

সাধকের জন্ম জন্মান্তরের সাধনালব্ধ এই অমৃত পাত্রকে করায়ত্ত করিয়াও কবি তাহাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। অপূর্ণ জীবনের বিশিষ্ট যে রসাস্বাদ তাহার নিকট অমৃতের আস্বাদ বুঝি কটু।

"তবুও এই ভালোবাসি
আলো ছায়ার বিচিত্র গান।" (নীড় ও আকাশ)

এই রস-প্রেরণা রবীন্দ্রনাথকে বিশিষ্ট এক সাধন মার্গাশ্রয়ী করিয়া তুলিয়াছে। এই রস-প্রেরণার দার্শনিক স্বরূপ আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি

সকল রূপ, সকল সীমার ভিতর দিয়া কবি যে অসীম বা অরূপের বারংবার আভাস লাভ করিয়াছেন, যে অনির্বচনীয় আস্বাদ, মুহূর্তের জন্য চেতনার যে সীমাহীন প্রসার বোধ করিয়াছেন, আজ কবি সেই অসীম বা অরূপকে অব্যবহিত রূপে স্থায়ীভাবে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল।

বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে কবি তাঁহারই আভাস লাভ করিতে পারেন, সকল রূপ যেন তাঁহার শরীরী বাণী, যেন তাঁহারই আনন্দময়ী দূতীগুলি নিত্যকাল ধরিয়া তাঁহারই প্রেম ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। আজ কবি সকল রূপের অতীতে সেই অখণ্ড অরূপকে সকল আধার মুক্ত করিয়া লাভ করিতে চান। এতদিন তিনি বিশ্বময় রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরিয়াছেন, আজ সকল রূপকে অনুবিদ্ধ করিয়া সকল রূপের অতীত সত্তাকে লাভ করিবার জন্য উন্মুখ।

"রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করি।
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর
ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরি।"

কিংবা

"চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারার
আলোক দিয়ে প্রাচীর ঘেরা
আছে যে এক নিকুঞ্জ বন-নিভৃতে
চরাচরের হিয়ার কাছে
তারি গোপন দুয়ার আছে
সেইখানে ভাই করব গমন নিশীথে।"

কবির তাই প্রার্থনা

"তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করো হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু হাত দিয়ে ফেলো ঠেলে।"

আবরণ তো অসীমে নাই। তাহা স্বয়ং প্রকাশ। 'আমি'র ছায়া আমাদের দৃষ্টিকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে। এই আমিকেই বলে 'মায়া', 'হিরন্ময় পাত্র' কবি যাহাকে বলিয়াছেন, 'মুখের ঢাকা', 'মেঘাবরণ'। এখানে সেই কথা আসে। এই সর্বশেষ 'ওইটুকু' আবরণ ছিন্ন করিয়া দিতে ঈশ্বরের করুণা প্রয়োজন। তাঁহার মায়ার আবরণকে তিনি আপনি সরাইয়া না দিলে মানুষ বুঝি নিজের সাধনায় এই শেষ সিদ্ধি করায়ত্ত করিতে পারে না।

একদিন কবি বাহিরে রূপের জগতে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, সুখ-দুঃখ বিজড়িত বিচিত্র মানবিক বোধকে কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, আর ওই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়-লোকে কত বারবার কোন এক অপূর্ব-লোকের প্রসাদ আসিয়া পৌঁছাইয়াছে। তাঁহার প্রাসাদের বহিঃ প্রাঙ্গণে ইহা যেন ক্রীড়া। অথচ ইহার মধ্যে একটি নিঃসংশয় বোধ থাকে যে সন্ধ্যাবেলার ক্রীড়া শেষে সেই গৃহের অভ্যন্তরে ডাক পড়িবে, পরম আকাঙ্ক্ষার ধন যিনি তিনি সকল ধুলা ধুইয়া মানব শিশুকে তাঁহার ক্রোড়ে আপনি তুলিয়া লইবেন। দীর্ঘ জাগরণের পর সে যেন পরম বিশ্রাম। কবির জীবনে বাহির অঙ্গনে খেলার পালা বুঝি সাঙ্গ হইয়া আসিল, কবি তাই চকিতে চকিতে অন্যমনা হইয়া পড়েন, কখন গৃহের অভ্যন্তর হইতে ডাক আসিবে।

"এখন সময় হয়েছে কি।
সভায় গিয়ে তোমায় দেখি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মের স্বরূপ বুঝাইতে গিয়া একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, "আমার ধর্ম হইল অতি মানবিক সত্তা, বিশ্ব-মানব-সত্তা এবং আমার ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করা।"

ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতা ঘটে বিশ্ব-সত্তার যোগে; পরিণামে ব্যক্তি-সত্তা ও বিশ্ব-সত্তার মধ্যে আর কোন ভেদ থাকে না। ব্যক্তি আপনার চেতনাকেই তখন বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখে। কিন্তু এই পরিণাম লাভ করিয়াও ব্যক্তি-সত্তা সম্পূর্ণতা লাভ করে না। এখানেও সীমা বোধ থাকে। ব্যক্তি তখন বিশ্ব-সত্তাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে চায়। অসীম যিনি তিনি অব্যাকৃত থাকিয়াই কোন্ রহস্যের বশে সীমাকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া আনন্দ্যে নিত্য উপচাইয়া পড়িতেছেন। তাই ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ মিলন সাধনই শুধু নয় সেই এক রহস্যের ভিতর দিয়া বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়াই বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধনাই সর্বশেষ ও সর্বোত্তম সাধনা।

“এই চিত্ত আমার বৃন্ত কেবল,
তারি ’পরে বিশ্ব কমল ;
তারি ’পরে পূর্ণ প্রকাশ
দেখাও মোরে।”

যে সাধনায় পরিণামে দেশ-কাল তাহার অন্তহীন রূপ-লোক হইয়া চ্যুত বসনের মত চেতনা হইতে স্খলিত হইয়া যায়, সে সাধনা নয়, সে সাধনায় ব্যক্তি-চেতনা অসীমে ব্যাপ্ত হইয়া অন্তহীন সীমা-লোকে আপনাকে লীলায়িত হইতে দেখে সেই সাধনাই রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য।

“যে নিরালায় তোমার দৃষ্টি
আপনি দেখে আপন সৃষ্টি
সেইখানে কি বারেক আমায়
দাঁড় করাবে সবার ফাঁকে।”

মন ও বুদ্ধির জগৎ সীমার জগৎ। আমিত্ব বা অহঙ্কার বলিতে এই সীমার জগৎ ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়। অসীমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতার সহিত স্বাভাবিক ভাবে সীমার বোধ ছিন্ন করিবার ব্যাকুলতা ওতপ্রোত হইয়া দেখা দিয়াছে। আমি নিম্নে পর পর কয়েকটি অংশ কেবল উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে এই দিকটির পরিচয় মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে।

“মরে গিয়ে বাঁচব আমি, তবে
আমার মাঝে তোমার লীলা হবে।”
“মনকে, আমার কায়াকে,
আমি একেবারে মিলিয়ে দিতে
চাই এ কালো ছায়াকে।”
“নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে
আপন গড়া স্বপন হতে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।”
“আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা।”

"আমার হৃদয় সদা আমার মাঝে
বন্দী হয়ে থাকে।
তোমার আপন পাশে নিয়ে তুমি
মুক্ত করো তাকে।"
"আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো,—"
"ওগো আলো,
আমায় তুমি আপনি জ্বালো,
ভাঙা প্রদীপ পথের ধূলায়
দিলেম ফেলে।"
"তুমি আমায় সৃষ্টি করো
আজ তোমারে ডাকি,
ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।"
"আর আমায় আমি নিজের শিরে
বইব না।"

রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনার সেই চিরপুরাতন পথটিকে আশ্রয় করিয়াছেন। এক্ষেত্রে উপনিষৎ হইতে অনুরূপ কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে উভয় সাধনার ঐক্য স্পষ্টই লক্ষিত হইবে।

"ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। স্বয়ম্ভু সম্মুখ দিকে (ইন্দ্রিয়) দ্বার বিদ্ধ করিয়াছেন, সেইজন্য মানুষ বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করে, আপনার অন্তরের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না। কোন কোন জ্ঞানী অনন্ত জীবন লাভের আশায় অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।" (কঠ উপনিষৎ)

"বন্ধন ও মোক্ষের দুইটি শব্দ হইল অহঙ্কার বোধ ও অহঙ্কার বোধ শূন্যতা।" (পৈঙ্গল উপনিষৎ)

"শিক্ষার দ্বারা, মেধার দ্বারা, এমন কি বারংবার শ্রবণ করিয়াও আত্মাকে লাভ করিতে পারা যায় না। আত্মা যাঁহাকে নির্বাচন করেন তিনিই কেবল আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। কেবল এই পুরুষের নিকট আত্মা আপনার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেন।" (কঠ উপনিষৎ)

"পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে (আশ্বলায়ন) বলিলেন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান এবং যোগ সাধনার ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে জানিবার চেষ্টা কর। ধনের দ্বারা নয়, অমৃতত্ব লাভ করিতে হয় ত্যাগের দ্বারা।" (কৈবল্য উপনিষৎ)

"*** মন দ্বিবিধ বলিয়া কথিত হয়, বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত থাকিলে অবিশুদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হইলে বিশুদ্ধ। লয় বিক্ষেপ রহিত মনকে নিশ্চল করিয়া মানুষ মন হইতে মুক্ত হন। (মনের অতীত অবস্থা লাভ করেন)। ইহাই পরমপদ। মনকে ততক্ষণ পর্যন্ত নিরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না উহা পরম অবস্থা লাভ করে। ইহাই জ্ঞান, ইহাই মুক্তি; আর সমস্ত কিছু গ্রন্থির বিস্তার, বন্ধন স্বরূপ। সমাধির দ্বারা যাঁহার মনের মালিন্য বিধৌত, যিনি আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনের আনন্দময় অবস্থা বর্ণনাতীত। তাঁহাকে কেবল অন্তঃকরণের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হয়। জলের মধ্যে জলকে অগ্নির মধ্যে অগ্নিকে আকাশের মধ্যে আকাশকে যেমন পৃথক করিতে পারা যায় না যাঁহার মন ইহার মধ্যে প্রবেশ করে তাঁহারও অনুরূপ অবস্থা হয়। তিনি সম্পূর্ণ রূপে মুক্তি লাভ করিয়াছেন। মনই বস্তুতঃ মানব জাতির বন্ধন ও মুক্তির কারণ। উহা যখন বস্তুর সহিত যুক্ত তখন বন্ধন, যখন বস্তু মুক্ত তখন মুক্ত।" (মৈত্রী উপনিষৎ)

"শ্রেয় ও প্রেয় দুই মানুষের নিকট আসে। জ্ঞানী ব্যক্তিরা চিন্তা সহকারে ইহাদের পার্থক্য নিরূপণ করেন। জ্ঞানীরা প্রেয়কে পরিহার করিয়া শ্রেয়কে লাভ করিতে চান। সাধারণ মানুষ পার্থিব ভোগ সুখের জন্য প্রেয় আকাঙ্ক্ষা করে।" (কঠ উপনিষৎ)

এই সীমার বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে সমগ্র বহির্মুখী চেতনাকে অন্তরাবৃত্ত করিয়া একমাত্র অন্তর্জগৎকে আশ্রয় করিতে হয়, তাহার পর আত্মসমর্পণের ঐকান্তিক ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া ভক্তিতে সমগ্র সত্তাকে বিগলিত করিয়া দিতে হয়। কবির জীবনে এই ব্যাকুলতা কী ঐকান্তিক, কী মর্মান্তিক আর্তিরূপেই না প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণ ধূলার তলে।"
"আসন তলের মাটির 'পরে লুটিয়ে রব।
তোমার চরণ ধূলায় ধূলায় ধূসর হব।"

"নামাও নামাও আমায় তোমার
চরণ তলে,
গলাও হে মন, ভাসাও জীবন
নয়ন জলে!"

"একটি নমস্কারে, প্রভু,
একটি নমস্কারে
সকল দেহ লুটিয়ে পড়ুক
তোমার এ সংসারে।"

"আজকে শুধু একান্তে আসীন
চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,
আজকে জীবন-সমর্পণের গান
গাব নীরব অবসরে।"

"চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে,
নিয়ো না নিয়ো না সরায়ে।"

মানুষের সমগ্র সত্তা আশ্রয় করিয়া দিব্য-চেতনা আপনাকে নিম্নতর ভূমিতে লীলায়িত করিতে চান। এইরূপে সমগ্র সৃষ্টি আশ্রয় করিয়া তাঁহার একটি বিশেষ ইচ্ছা চরিতার্থ হইতে চাহিতেছে, কিন্তু মানুষ তাহার মানুষী বুদ্ধি মানবিক বোধ আশ্রয় করিয়া থাকিবার ফলে দিব্য-চেতনা আপনাকে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না। জীবনকে যদি তাঁহার যন্ত্র স্বরূপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারা যায় তবেই তাঁহার অভিপ্রায় মর্ত্য-লোকে রূপ লাভ করিতে পারে।

উন্নততর চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জীবন বিলুপ্তির আকাঙ্ক্ষা নাই, এই জীবনকে তাঁহারই যন্ত্রে পরিণত করা। আমিত্ব বিলোপের অর্থই হইল মানবিক বোধ ও বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত না হইয়া ঈশ্বরীয় বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া। ইহাকেই বলে দিব্য-জীবন।

"তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।"

এতদিন কবি জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন সীমার দিক হইতে, তাঁহার সকল প্রেরণা ছিল আমিত্ব বোধ জাত। এই জীবন যে উর্ধ্বতর কোন চেতনার অভিপ্রায় চরিতার্থ করিতে সৃষ্টি হইয়াছে তাহা তিনি এতদিন

নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আজ তাঁহার উপলব্ধির মধ্যে কোন সংশয় নাই। তাই আত্মসমর্পণের এমন ব্যাকুলতা।

ভক্তি তো নিশ্চেষ্টতা নয়। ইহার জন্য নিরলস, সদাজাগ্রত চেষ্টার প্রয়োজন। সমগ্র চেতনা-বৃত্তকে অন্তর্মুখীন করিয়া আজ কবি ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিয়াছেন। বাহিরে ইন্দ্রিয়-দ্বারে সকল আলোক নিভিয়া গিয়াছে, অথচ অন্তরে সেই জ্যোতিপথ উদ্ঘাটিত হয় নাই, যে পথ বাহিয়া তাঁহার চেতনা ঊর্ধ্বাভিসার করিয়া চলিবে। এই সাময়িক শূন্যতা বোধের অসহায় অবস্থা কতদূর অসহনীয় হইয়া উঠিতে পারে, সেই যে মরণান্তিক পীড়া তাহা তাঁহার জীবনেও প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

"কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।
রয়েছে দীপ না আছে শিখা,
এই কি ভালে ছিল রে লিখা
ইহার চেয়ে মরণ সে যে ভালো।"

নিম্নের উদ্ধৃতি কয়েকটির মধ্যে এই শূন্যতাবোধের সহিত বিজড়িত হইয়া কী গভীর ঐকান্তিকতা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"ছাড়িস নে ধরে থাক এঁটে,
ওরে হবে তোর জয়।"
"এই কথাটা ধরে রাখিস
মুক্তি তোরে পেতেই হবে,—"

এই নির্বন্ধ না থাকিলে ওই পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে পারা যায় না। বারংবার ব্যর্থতার ভিতর দিয়া জীবনের সর্বশেষ চরিতার্থতা সাধন করিতে হয়।

অতি জাগতিক সত্তা লাভ করিতে গিয়া কবির মনে আজ একে একে কত সংশয়ই না জাগিতেছে। দিব্য-চেতনার সাক্ষাৎকারে কবির সত্তা কি সম্পূর্ণ রূপে বিগলিত হইয়া যাইবে? ব্যক্তি-সত্তার পৃথক কোন অস্তিত্ব কি ওই লোকে আর কোন স্বরূপে থাকে না? জাগতিক সকল বোধই কি সেই কালে লুপ্ত হইয়া যায়? যদি থাকে তবে তাহা কোন্ স্বরূপে?

"জানি নে আর ফিরব কিনা
কার সাথে আজ হবে চিনা,—"

তখন কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কোন্ দিব্য-বাণীর প্রকাশ ঘটিবে, কোন্ অমর্ত্য-প্রেরণায় তাঁহার চিত্ত-লোকে তখন কোন্ সৌন্দর্য অন্তহীন হইয়া পড়িবে ? এক কথায় সেই দিব্য-জীবন কি, দিব্য-জীবন আশ্রয় করিয়া দিব্য-অভিপ্রায় কিভাবে সক্রিয় হয় ?

"তখন আমার পাখির বাসায়
জাগবে কি গান তোমার ভাষায়।
তোমার তানে ফোটাবে ফুল
আমার বনলতা ?"

এই অন্তহীন রূপ-লোকের মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য বা সুষমা রহিয়াছে বলিয়া রবীন্দ্রনাথ ইহাকে একটি সম্পূর্ণ সঙ্গীত রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। সৃষ্টির অনন্ত রূপ বৈচিত্র যেন এক একটি বিচ্ছিন্ন সুর। কোন গুণী এই বিচ্ছিন্ন সুরজাল বিস্তার করিয়া নিত্যকাল ধরিয়া এক অখণ্ড সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া চলিয়াছেন। সৎ স্বরূপ আত্মস্থিত থাকিয়া আপনাকে অন্তহীন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। গায়কের অন্তরে যেমন সঙ্গীতের একটি অখণ্ড রূপ থাকে এবং সেই অখণ্ড সঙ্গীতকে তিনি যেমন বিচ্ছিন্ন সুরের জাল বুনিয়া বাহিরে প্রকাশ করেন, এই সৃষ্টির সহিত স্রষ্টার তেমনি সম্পর্ক।

সৃষ্টি কেবল অন্তহীন, যদৃচ্ছা বিকাশ নয়। সমগ্র অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির একটি ধ্যান-রূপ পূর্ণ চেতনার মধ্যে রহিয়াছে। তাহারই বীজ-রূপ নিখিল বিশ্বসৃষ্টির বিকাশ ধারার মধ্য দিয়া ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছে।

বিজ্ঞান জড়জগতের মধ্যে শক্তি-স্পন্দের কথা প্রমাণ করিয়াছে। এক একটি বিশেষ রূপ, বিশেষ রস, বিশেষ ভাব, এই সমস্ত কিছু শক্তির এক একটি বিশেষ স্পন্দন। যে সমস্ত শক্তি স্পন্দন গ্রহ সূর্য তারকায় নিত্য স্পন্দিত, সেই এক শক্তি স্পন্দন তৃণ, ধূলি কণার মধ্যেও লীলা করিতেছে।

দেশ-কালের বক্ষে এই নিখিল বিশ্বসৃষ্টি সেই পরম গায়কের সঙ্গীত বিস্তার। তাঁহার গানের এক একটি ছিন্ন তান এই সংখ্যাতীত রূপ-লোক। ওই সুরের আবেগে যুগ যুগান্ত কাল ধরিয়া উহারা মহাশূন্যে উধাও হইয়া চলিয়াছে।

নিম্নের উদ্ধৃত অংশ কয়েকটির মধ্যে নিখিল বিশ্বের এই স্পন্দ-রূপটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,
সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে,

গগনটুটে ব্যাকুল বেগে ধেয়ে,
বহিয়া যায় সুরের সুরধুনী।”

দেশ-কাল ব্যাপ্ত রূপ শূন্য এই স্পন্দন চক্রের সজ্ঘাতে সজ্ঘাতে, আকর্ষণ বিকর্ষণে কোন্ অলৌকিক রহস্যে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ প্রাচুর্যের ভারে নিত্যকাল কেবলই উপচাইয়া পড়িতেছে।

“দিকে দিকে গগন মাঝে
মরণ বীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা চন্দ্র রে।
জ্বালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জ্বলবারই আনন্দে রে ;
* * *
সেই অনন্দ-চরণ পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ গীতে গন্ধে রে।”

সেই একই ভাবের পরিচয়

“মিশিয়ে দিয়ে উঁচু নিচু,
সুর ছুটেছে সবার পিছু,
রয় না কিছুই গোপনে।
ডুবিয়ে দিয়ে সূর্য চন্দ্রে
অন্ধকারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
পশিছে সুর স্বপনে।”

অন্যত্র

“বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নি ধারায়,—”

অথবা

“অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে।”

বিশ্ব জুড়িয়া এই যে অশ্রুত সঙ্গীত উৎসারিত হইতেছে প্রাণের মাঝে সে সঙ্গীত যে শুনিতে পারে সে শুনিতে পায়।

ব্যক্তি-সত্তা যতই বিকাশ লাভ করে, বিশ্বের সহিত তাহার মিলন যতই গভীর ও উদার হয় তাহার হৃদয়ে এই সঙ্গীত তত অধিক পরিমাণে শ্রুত হয়। এমন একটি পরিণাম আছে যে পরিণামে ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে। তখন ব্যক্তি-চেতনায় বিশ্ব পরিব্যাপ্ত পরিপূর্ণ সুর ধ্বনিত হইয়া যায়।

"For the moment nothing but an ineffable joy and exaltation remained. It is impossible fully to describe the experience. It was like the effect of some great orchestra, when all the separate notes have melted into one swelling harmony, that leaves the listener conscious of nothing save that his soul is being wafted upwards and almost bursting with its own emotion."

(Varieties of Religious Experience, P. 66—Williams James)

কবির ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতেছে তাঁহার সৃষ্টি ততই সঙ্গীতময় এবং সে সঙ্গীত ততই অনির্বচনীয় সুরের কম্পনে বিস্ময়কর বৈচিত্র্য লইয়া প্রকাশ লাভ করিতেছে। সেই বিশ্ব সঙ্গীতকে আজ আর আভাস রূপে নয় পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিবার জন্য কবি উৎকণ্ঠিত।

মহাশূন্যে অনন্ত কোটি রূপ-লোক পূর্ণ সাম সঙ্গীত গাহিয়া যে পরম দেবতার পূজা করিতেছে সেই পূজায় কবি ব্যক্তির পূজাকে এক করিয়া দিতে চাহিতেছেন। ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ বিকাশ লাভ না ঘটিলে এবং এইরূপে ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধিত না হইলে, ব্যক্তি ও বিশ্বের অতীত সত্তাকে লাভ করিতে পারা যায় না।

তাই কবি বিশ্ব-ছন্দটিকে লাভ করিতে চাহিতেছেন,—

"মনে করি অমনি সুরে গাই,
কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই।"
"আমার লাগে নাই সে সুর, আমার
বাঁধে নাই সে কথা,
শুধু প্রাণেরই মাঝখানে আছে
গানের ব্যাকুলতা।"

বিশ্ব সঙ্গীতের এই ব্যাকুল সুরের সহিত সুর মিলাইতে পারিলে বুঝি ঈশ্বরের করুণা লাভ করিতে পারা যায়, তাঁহার সাক্ষাৎ মেলে।

"সেই সুরে মোর বাজাও প্রাণে
তোমার ব্যাকুলতা।"

মানবিক বিচিত্র বোধকে নয়, আজ তাঁহার গানের ভিতর দিয়া কেবল অসীমের জন্য ব্যাকুলতা ধ্বনিত হইবে।

"যেখানে নীল মরণ লীলা উঠছে দুলে
সেখানে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।
*   *   *
দিশাহারা আকাশভরা সুরের কূলে
সেইদিকে মোর গানের তরী দিলেম খুলে।"

অসীম বা অরূপের অপরোক্ষ অনুভূতিকে সম্পূর্ণ প্রতীক মুক্ত করিয়া প্রকাশ করিতে সঙ্গীত যতখানি সহায়তা করে শিল্প, কাব্য প্রভৃতি আর কোন প্রকাশ-রূপ ততখানি সহায়তা করে না।

এই তিনখানি কাব্যের মধ্যে কবির অসীমের জন্য ব্যাকুলতা অতি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া এবং তাহাকে কতকটা অব্যবহিত রূপে লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া তাহা অজস্র সঙ্গীত রূপে উৎসারিত হইয়াছে। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে সঙ্গীতের এই সামর্থ্যের কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

"—the real content of music is not drawn from the ordinary human emotion at all, and that it is in no way merely a second language, alongside the usual one, by which these emotion find expression. Musical feeling is rather something 'wholly other', which while it affords analogies and here and there will run parallel to the ordinary emotions of life, cannot be made to coincide with them by a detailed point-to-point corespondence. It is of course, from those places where the correspondence holds that the spell of a composed song arises by a blending of the verbal and musical expression. But the very fact we attribute to it a spell, an enchantment, points in itself to that 'woof' in the fabric of music of which we spoke, the woof of the unconceived and non-rational."

(The Idea of the Holy : Rudolf Otto)

সৃষ্টি প্রেরণা কখন সুর, কখনও রূপ, কখনও ভাব রূপে কবির নিকট অনুভূত হইয়াছে। ইহা একই স্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন উপলব্ধি মাত্র। বিচ্ছিন্ন সুরকে কবি যেমন অখণ্ড সঙ্গীতে ডুবাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তেমনি তিনি রূপকে অরূপে ভাবকে রসে বিগলিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অসীমের সাক্ষাৎকার লাভ যদি তাঁহার জীবনে আজও না ঘটিয়া থাকে, তবে তাহার জন্য দায়ী তাঁহার সাধনার অসম্পূর্ণতা। সাধনা সম্পূর্ণ হইলে তবেই অসীম বা অরূপকে লাভ করা সম্ভব। কবির সাধনা কি? তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা মনুষ্যত্ব বা পূর্ণ সামঞ্জস্যের সাধনা নয়। যেখানে পরিণামে বিশ্বাতীতের আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্তি ও বিশ্ব অস্বীকৃত হইয়া গিয়াছে। জীবন ও জীবনাতীত সেক্ষেত্রে সম্পূর্ণ দ্বিধাগ্রস্ত।

রবীন্দ্রনাথের সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত একটি অখণ্ডতার অন্তর্গত। ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনাকে রবীন্দ্রনাথ এইরূপে পূর্ণতাভিমুখীন করিয়াছেন। তাঁহাকে সমস্ত জীবনভোর তপস্যার অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। অধ্যাত্ম জগতের এই পূর্ণ যোগের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে তাঁহার পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নাই।

রবীন্দ্রনাথ অসীমকে লাভ করিতে বারংবার ব্যাকুল হইয়াছেন, বারংবার আত্মোৎসর্গের ভিতর দিয়া আপনাকে পরম সত্তায় বিলীন করিয়া দিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু সেই পূর্ণতার সুরটি বাজে নাই বলিয়া সেই পরম সত্তা বারংবার তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন। কবির জীবনে এই সংগ্রাম দেখিতে পাই অনেক পরবর্তী কাল পর্যন্ত। বিশেষ করিয়া প্রান্তিকের উপলব্ধির কথা এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতে পারে।

জীবনের বিকাশ ঘটে বিশ্বের সহিত ধীর যোগের ভিতর দিয়া, জীবনের সম্পূর্ণতা ঘটে বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলনে। এই পূর্ণ মিলন ঘটিলে তবেই অসীমকে লাভ করিতে পারা যায়, অন্তত রবীন্দ্রনাথ এই স্বরূপে অসীমকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেকথা এক্ষেত্রেও বলিয়াছেন,

"শক্তি যারে দাও বহিতে
অসীম প্রেমের ভার
একেবারে সকল পর্দা
ঘুচিয়ে দাও তার।"

এই শক্তি লাভ ঘটিলে সাধনা সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বরই পরম করুণায় ওই সর্বশেষ আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া দেন।

জগৎ ও জীবনের নিয়তি সম্পর্কে কবির স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় মুহূর্তের জন্যও বিচলিত হয় নাই।

সমগ্র বিশ্ব-জগৎ ও মনুষ্য-সমাজ যে ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিয়াছে, এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল। ইহার পরিচয় আমরা কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে বহুবার লাভ করিয়াছি। এক্ষেত্রেও সেই বিশ্বাসের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে
গোলাপ হয়ে উঠবে।"

জীবন যে কোন পরিণামে একান্ত ব্যর্থ হইয়া যায় না। ভ্রষ্ট পথও যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিণামে সেই এক রাজপথে আসিয়া মিলিত হয়, এই গভীর অধ্যাত্ম প্রত্যয় রবীন্দ্রনাথ পোষণ করিতেন। তাঁহার করুণার বাহিরে কোন জগৎ নাই।

কমল-কলিকা জলের অন্ধকার তল হইতে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া পরম নির্ভরতায় নিঃসংশয়ে পথ চলে। সেই দীর্ঘ ক্লান্ত পথ চলার একদিন অবসান হয়। জলের ঊর্ধ্বে অন্ধকার-লোকের সীমা পার হইয়া প্লাবিত প্রভাত সূর্য কিরণে আপনার মুদিত সহস্র দল একটির পর একটি মেলিয়া দেয়। কমল জীবনের সেই চরম সার্থকতা।

এই বিশ্বাস সে কেমন করিয়া কোথা হইতে লাভ করে, যে তাঁহার এই পথ-চলার একদিন অবসান ঘটিবে, এই অন্ধকার-লোক পার হইয়া কোন এক আলোর তীর্থে? সেই অনিবার্য পরিণামের দিকে কে তাহাকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়?

অন্ধকারের মধ্যে আলোর প্রকাশ অমনি কমল-কলিকার মত প্রচ্ছন্ন থাকে। প্রভাতে ওই আলোর কমল অন্ধকারের সীমা পার হইয়া আপনার আলোর দলগুলিকে দিকদিগন্তে ছড়াইয়া দেয়।

মানব অন্তরেও অমনি প্রত্যয় পরিপূর্ণ প্রেরণা থাকে। মর্ত্য জীবনের অন্ধকার-লোক পার হইয়া একদিন তাঁহার চেতনা পূর্ণ লোকে পৌঁছাইয়া যাইবে।

সমগ্র দেশ-কাল সমেত এই বিসৃষ্টি অমনি ঊর্ধ্বাভিমুখী হইয়া চলিয়াছে। একদিন যে তাহা পূর্ণতাকে লাভ করিবে তাহাতে সংশয় নাই; সেদিন এই বিশ্বলোকের সার্থকতম প্রকাশ দেখা দিবে।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে বিশ্বের নিয়তির সহিত জীবের নিয়তি কিরূপ ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। বিশ্ব ব্যতিরিক্ত জীবের পৃথক কোন নিয়তি নাইঃ

"এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এই দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।"

কিংবা

"মুদিত আলোর কমল কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণ পুটে।
উতরিবে যবে নব প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।
উদয়াচলের সে তীর্থ পথে আমি
চলেছি একেলা সন্ধ্যার অনুগামী,
দিনান্ত মোর দিগন্তে পড়ে লুটে।"

পশ্চাতে মর্ত্য-জীবনের যে পর্যায় পড়িয়া থাকে, তাহার মূল্য কোথায়? তাহাকে পরিহার করিয়া মানুষ কোন্ সান্ত্বনা লাভ করে? এক্ষেত্রে ঐ মূল্য নিরূপণের এবং সান্ত্বনা লাভের সেই দার্শনিক স্বরূপটিই আমাদের বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবেঃ

"জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধূলায় তাদের যত হোক অবহেলা,
পূর্ণের পদ পরশ তাদের 'পরে।"

মুক্তি রবীন্দ্রনাথের নিকট সম্পূর্ণতা। জীবনের ধীর সম্পূর্ণতার ভিতর দিয়া পরিণামে মুক্তি লাভ করিতে হয়। নিখিল বিশ্বের সহিত সমগ্র মানব-সমাজ ওই পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে।

এই বিশ্বাস এবং মুক্তি বলিতে এই অখণ্ডতার বোধ জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়কে চূড়ান্ত মূল্য দান করিয়াছে। এই বোধে জীবনের কোন পর্যায় একান্ত মিথ্যা বা মায়া হইয়া উঠিতে পারে নাই। জীবনের এই মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রতিভা অধ্যাত্মবোধের আর একটি নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

জীবনের সার্থকতা কোন একটি বিশেষ পরিণাম লাভেই ঘটিতে পারে, তাহার

জীবন তাই রবীন্দ্রনাথের নিকট আনন্দময় হইয়া উঠিয়াছে। এই বিরহ, এই প্রতীক্ষাও আনন্দের, কারণ পরিণামে মিলনলাভ অনিবার্যরূপে ঘটিবে। পথের শেষে প্রিয়-মিলনেই শুধু আনন্দ নাই, এই সমগ্র পথ পরিক্রমাটাই যে তাঁহার জন্য এই বোধ পথ চলাকেই আনন্দময় করিয়া দিয়াছে। এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা এক্ষেত্রে বিশ্লেষণ করিতেছি, তাহাতে এই ভাবটি পরিস্ফুট হইবে।

মৃত্যুর ভয় মহৎ বিনষ্টির ভয়, অপরিচয়ের ভয়। যদি এই বোধ গড়িয়া উঠে যে, মৃত্যু জীবনের একটি পরিবর্তন মাত্র, মৃত্যুতে যে লোক আমরা লাভ করি-না-কেন, যে চেতনা এই লোককে মাতৃক্রোড়ের মত পরিচিত করিয়াছে, সেই একই চেতনা সেই ভিন্নতর লোককেও একান্ত পরিচিত করিয়া তুলিবে, তাহা হইলে আর ভয় থাকে না :

"জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখন যেখানে লবে,
চির জনমের পরিচিত ওহে,
তুমিই চিনাবে সবে।"

এমনি করিয়া কত নূতন জীবন, কত নূতন লোক তিনি লাভ করিয়াছেন। জীবন এমনি করিয়া ধীর সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া চলিয়াছে :

"সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপ দরশন।"
"চারিদিকে সুধা ভরা
ব্যাকুল শ্যামল ধরা
কাঁদায় রে অনুরাগে।
দেখা নাই নাই,
ব্যথা পাই,
সেও মনে ভালো লাগে।"

কিংবা

"আমার এই পথ-চাওয়াতেই আনন্দ।"

তীব্র বিরহ জীবন ও জগতের সকল মাধুর্যকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া না দিয়া

পূর্বের সমগ্র জীবন পর্যায়টাই কেবল নিরর্থক এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাহার সকল মাধুর্যকে নিঃসীম করিয়া দিয়াছে।

এই সমগ্র জীবন ওই পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে। এই বোধ যখন জাগে তখন আনন্দ নিঃসীম হইয়া উঠে। প্রতীক্ষা সহনীয় হয়, পরম স্থৈর্যে অন্তর ভরিয়া উঠে :

"কতই নামে ডেকেছি যে,
কতই ছবি এঁকেছি যে,
কোন্ আনন্দে চলেছি, তার
ঠিকানা না পেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।"

পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য মানুষ যেখানে জগৎকে সেইসঙ্গে জীবনকে পরিহার করে, রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবে সেই সাধনাকে অস্বীকার করিয়াছেন। পূর্ণ মনুষ্যত্বলাভ ও মুক্তিসাধনা রবীন্দ্রনাথের নিকট সমার্থক। এইজন্য রবীন্দ্রনাথের সাধনায় জগতের অনিবার্য স্বীকৃতি আসিয়াছে :

"এমনি করে চলতে পথে ভবের কূলে
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব নিস রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে তুলিস দিবস-রাতে!"

এই দুর্লভ আনন্দ মুহূর্তগুলি অন্তরে সঞ্চিত হইয়া অন্তরকে অক্ষয় সুধায় ভরিয়া তুলে। এই আনন্দ-মুহূর্তগুলি যেন এক-একটি প্রস্ফুটিত কুসুম, চেতনা-সূত্রে গ্রথিত হইয়া পরিশেষে একটি মালিকায় পরিণত হয়। এই মালিকার সঞ্চয়কে জীবনশেষে অশ্রুজলে দয়িতের কণ্ঠে পরাইয়া দিতে হয়। অর্থাৎ বিশ্বের সৌন্দর্য-মাধুর্যের ভিতর দিয়া জীবন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করে :

"ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি,
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—"

এই পথ চলা, এই প্রতীক্ষা তাই কবির নিকট পরম রমণীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই রমণীয়তার জন্য কবি কোথাও কোথাও পূর্ণ পরিণামের তত্ত্বকেও অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। এই অপূর্ণতা আছে বলিয়া বেদনা আছে, এই

বেদনাবোধের ভিতর দিয়া ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য মানব-মন ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া কত রূপে না তাঁহার আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়। পূর্ণ মিলনের আনন্দ নয়, এই লীলা-রসই রবীন্দ্রনাথের পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে:

"তোমায় খোঁজা শেষ হবে না মোর
যবে আমার জনম হবে ভোর!"

ব্যক্তি ও বিশ্ব যেমন ক্রমাগত হইয়া উঠিতেছে, তেমনি এই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া মানব-অন্তরে অরূপের আভাস নানারূপে আসিয়া পৌঁছাইতেছে:

"আপনাকে এই জানা আমার
ফুরাবে না।
এই জানারি সঙ্গে সঙ্গে
তোমায় চেনা।"

পথের আনন্দ যেখানে পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে:

"পথের শেষে মিলবে বাসা
সে কভু নয় আমার আশা,
যা পাব তা পথেই পাব—"

এই আকাঙ্ক্ষাকে তিনি নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন:

"যত আশা পথের আশা,
পথে যেতেই ভালোবাসা,
পথে চলার নিত্যরসে,
দিনে দিনে জীবন ওঠে মাতি।"

রবীন্দ্রনাথের সাধনা তাই কোন অবস্থাতেই পূর্ণ পরিণতি লাভ করিতে চায় নাই। কারণ তাহা হইলে ওই লীলা-রসটিকে তো আর আস্বাদ করিতে পারা যাইবে না। তিনি তাই গান করেন:

"সেই তো আমি চাই।
সাধনা যে শেষ হবে মোর
সে ভাবনা তো নাই।"

* * *

এমন করে মোর জীবনে
অসীম ব্যাকুলতা,
নিত্য নূতন সাধনাতে
নিত্য নূতন ব্যথা।"

প্রিয়তমের জন্য এই অন্তহীন প্রতীক্ষা, এই চির প্রেম-লীলা জীবন ও জগৎকে কী মাধুর্যেই না ভরিয়া তুলিয়াছে :

"আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখিবে কোথায় ঢেকে।"

কিংবা

"তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি
ঐ যে আসে, আসে, আসে।
যুগে যুগে পলে পলে দিন রজনী
সে যে আসে আসে আসে।"

অথবা

"তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
যুগে যুগে বিশ্ব ভুবন তলে
পরাণ আমার বধূর বেশে চলে
চির স্বয়ম্বরা।"

এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ স্বরূপে রবীন্দ্রনাথ যে উন্নততর চেতনা পরিণাম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তদাশ্রয়ী হইয়া এই জীবন ও জগতের যে দুর্লভ রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে তাহারই কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যাইবে :

"আকাশ তলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্ দিগন্তরে ;
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল

মাঝখানেতে সোনার কোষে
আনন্দে ভাই আছি বসে,
আমায় ঘিরে ছড়ায় ধীরে
আলোর শতদল।"

সমগ্র বিশ্বের সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া, সকল লোক-লোকান্তরের ভিতর দিয়া একটি দিব্য অভিপ্রায় ধীরে ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে। নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের অভিপ্রায়ের সহিত, তাহার সৃষ্টি ও বিনষ্টির যোগে আমারও অভিপ্রায় বিজড়িত, আমারও সৃষ্টি-বিনষ্টি ঘটিতেছে, যখন এই বোধ জাগে তখন জীবন কী অপার বিস্ময়ে বিজড়িত হইয়া যায়। এই উপলব্ধিকে মানুষ যখন অপরোক্ষ করে তখন সেই অবস্থাকে বলে বিশ্বানুভূতি। এই উপলব্ধিতে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুভয় চিরকালের জন্য দূর হইয়া যায়। কারণ, কোথাও আর হারাইয়া যাইবার ভয় থাকে না:

"কেমন করে তড়িৎ আলোয়
দেখতে পেলেম মনে
তোমার বিপুল সৃষ্টি চলে
আমার এই জীবনে।
সে সৃষ্টি যে কালের পটে
লোকে লোকান্তরে রটে,
একটু তারি আভাস কেবল
দেখি ক্ষণে ক্ষণে।"

জীবন ও জগৎকে পরিহার করিয়া দেশ-কালের সীমাকেও ছাড়াইয়া দিব্য-চেতনা লাভের যে-সাধনা, রবীন্দ্রনাথ যে সেই সাধনাকে স্বীকার করেন নাই, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। বিশ্বাতীতকে লাভ করিতে ব্যক্তি ও বিশ্বকে পরিহার করা নয়, ব্যক্তি ও বিশ্বের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্য সাধনের জন্যই বিশ্বাতীতকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা।

ইহার ফলে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম ও দর্শন আশ্চর্য সমৃদ্ধিই শুধু লাভ করে নাই, এক নূতন উপলব্ধির দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে।

দেশ-কালের ভিতর দিয়া এক দিব্য অভিপ্রায় ধীরে সার্থক হইয়া উঠিতেছে,

এবং পূর্ণতার সাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও বিশ্বাতীত পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত। মূল এই দুই উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় এক যুগান্তর সাধন করিয়াছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় জীবন ও জগতের স্বীকৃতি প্রায় নাই বলিলেও চলে। স্বীকৃতি যেখানে যতটুকু আছে তাহাও আপেক্ষিক স্বরূপে। —অন্যদিকে তাহার মূল্যের ক্ষেত্রে যে কিছুমাত্র পরিবর্তন ঘটিতেছে না এই সম্পর্কেও নিঃসংশয় বোধ। রবীন্দ্রনাথ স্বাভাবিকভাবে জীবন ও জগতের মূল্যের পরিবর্তন স্বীকার করেন।

ঈশ্বরীয় অভিপ্রায়কে জগতে সার্থক করিয়া তুলিবার পথে সর্বাধিক বাধা আমাদের বিচিত্র অহংকারবোধ, এবং এই অহংকারবোধ-প্রসূত বিচিত্র ধর্ম ও দর্শন এবং তাহারই অনুকূল সমাজ-পরিকল্পনা।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বকে এইভাবে সান্ত্বনা দান করিতে চান নাই। তাঁহার এই উপলব্ধি সম্পূর্ণ বিপ্লবাত্মক। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় প্রকাশের পথে ন্যূনতম বাধা ওই লাঞ্ছিত মনুষ্যত্বের মধ্যে বলিয়া সত্য ও ধর্ম ওইখানেই পূর্ণ রূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারে। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় যদি পরিণামে জয়ী হয়, তবে সে বিজয় আসিবে তাহাদের আশ্রয় করিয়া। এই অবিচলিত অধ্যাত্ম-বিশ্বাস তাঁহার ছিল। তিনি তাঁহার একাধিক নাটকের মধ্যে এই বিশ্বাসকে রূপায়িত করিয়াছেন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় সংস্কৃতির স্তরবিন্যাস করা হইয়াছে দেহবোধকে, সেইসঙ্গে জাগতিক বিচিত্র প্রয়াসকে ছাড়াইয়া উঠিবার ক্রমের উপর। রবীন্দ্র-নাথের অধ্যাত্ম-সাধনায় দেহ ও আত্মা পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে। সংস্কৃতির ক্রম তাই ওইভাবে নির্দেশ করিতে পারা যায় না।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় বিশ্বানুভূতির কথা আছে, কিন্তু এই জাতীয় উপলব্ধির পরিচয় কোথাও যে নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

ইহা কর্মকে আদৌ পাপ বোধ করিয়া নিষ্কাম কর্ম করা নয়। নিষ্কাম কর্মের মধ্যে মূল্যের পরিবর্তনও অস্বীকৃত। কর্মের প্রতি এই শ্রদ্ধা আসিতে পারে যদি এই বোধ থাকে যে, সকল কর্মের ভিতর দিয়া মনুষ্যসমাজ ধীরে উন্নততর পরিণাম লাভ করিতেছে। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় একমাত্র এই জাতীয় কর্মের ভিতর দিয়া সার্থক হইয়া উঠিতেছে। যাঁহারা আত্মাকে একমাত্র সত্য করিয়া তুলিয়া তাহারই অনুক্রমে মনুষ্যত্বের, সেইসঙ্গে সংস্কৃতির ক্রম সৃষ্টি করিতে চান তাঁহারা অন্ধ, মায়াবদ্ধ।

বহির্বিশ্ব অন্তর্লোকে একটি ভাব-জগৎ বা ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে। এই ধ্যান-লোকের মধ্যে উর্ধ্বতর চেতনালাভের ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজগতে এই তিনটি জগতের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। বহির্বিশ্ব কবির অন্তরে তাঁহার ধ্যানে আর এক অলৌকিক রূপ-লোক সৃষ্টি করে। এই রূপ-লোক আশ্রয় করিয়া অমর্ত্য-লোকের আভাস কবির অন্তরে আসিয়া পৌছায়। এই রূপ-লোক আশ্রয় করিয়া কবি কত দুর্লভ মুহূর্তে অরূপের চকিত স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। ব্যক্তি, বিশ্ব এবং দিব্য-চেতনার মিলিত প্রেরণায় কবির কাব্য-সৃষ্টি।

এই মর্ত্য-প্রেম কবির অন্তরে কত বারবার কত দুর্লভ চকিত মুহূর্তে প্রাণের জাগরণ ঘটাইয়াছে। সেই প্রাণ-বন্যায় ব্যক্তি ও বিশ্বের ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। এই মিলন অনুভূতি পরিণামে কবির চেতনায় সেই পরমের অনুভূতি দান করিয়াছে। ব্যক্তি-প্রেম এইরূপে বিশ্বমুখীনতা লাভ করে। উহা আবার পরিণামে বিশ্বকেও অতিক্রম করিয়া যায়।

মর্ত্য-প্রেমের নিবিড় উপলব্ধির ভিতর দিয়া কবির জীবনে অমর্ত্যের বারংবার স্পর্শ লাভ ঘটিয়াছে। ইহাই কবির অন্তরে দেবতার পাদস্পর্শ।

ধ্যাননিমগ্ন হইয়া কবি যে বিচিত্র অধ্যাত্ম অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার একটি পরিচয় সবশেষে দান করিতেছি।

ধ্যান-লোকটি যতই সমৃদ্ধ হইতে থাকে, আমাদের সমগ্র সত্তা ততই স্পষ্ট হইয়া যায়। একটিকে বলিতে পারি অধ্যাত্ম-সত্তা, অপরটি জীব-সত্তা।

সাধারণ মানুষের জীবনে অধ্যাত্ম-সত্তার নিগূঢ় অবশ একপ্রকার প্রেরণা যদি থাকেও জৈবিক প্রেরণাই মুখ্য। বহিঃসত্তাটিই মানুষের একমাত্র আশ্রয়স্থল হইয়া উঠে।

ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠিলে, জীবনে একটি গূঢ় দ্বন্দ্ব জাগে। মানুষ তখন কেবল অন্তর্লোকটিকে আশ্রয় করিতে চাহিলেও অন্যদিকে বহিঃসত্তা তখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত হয় নাই বলিয়া বহির্জগতের সান্নিধ্যে আসিলেই তাহা চঞ্চল হইয়া পড়ে।

কেবল তাহাই নহে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া যে নিগূঢ় ভাবানুভূতির স্ফুরণ ঘটে, উন্নততর জগতের যে চকিত আভাস আকাশ-পটে স্বর্ণ-রেখার মত ভাসিয়া উঠিয়া আবার মিলাইয়া যায়, সেই সাক্ষাৎকার এবং সেই অনুভূতিকে বহির্বিশ্বে ইন্দ্রিয়দ্বারে সম্ভোগ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে।

ধ্যানের জগৎ আরও সমৃদ্ধ হইলে বহিরিন্দ্রিয়সমূহ এতদূর অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে, ইন্দ্রিয়সমূহের উপর এমন একটি নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা জন্মায়, যে বহির্বিশ্বের সান্নিধ্যে আসিলেও উহা আর ভাঙ্গিয়া পড়ে না। অন্তর্লোকটি তখন মানুষের একমাত্র সত্তা হইয়া উঠে :

"কোন্ সে তাপস আমার মাঝে
করে তোমার সাধনা ?
* * *
তারি পূজার মালঞ্চে ফুল ফুটে যে
দিনে রাতে চুরি করে
এনেছি তাই লুটে যে।"

কবির অন্তরের তাপস, অর্থাৎ অধ্যাত্ম-সত্তা, 'তুমি' অর্থাৎ দিব্য-চেতনা লাভের জন্য ধ্যাননিমগ্ন। তাঁহার এই ধ্যান-লোকে যে অলৌকিক বিচিত্র অধ্যাত্ম-অনুভূতি লাভ ঘটে 'পূজার মালঞ্চে' যে ফুল ফুটে, তাহারই অলৌকিক সৌন্দর্য-লোককে কবি কাব্যে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ধ্যানের আরও উন্নত পরিণামে 'আমি' ও 'তাপসের' আর পার্থক্য থাকে না। আরও উন্নত পরিণামে 'তাপস' ও 'তুমি' একাকার হইয়া যায়।

ঊর্ধ্বতর চেতনা লাভের জন্য কবির তপশ্চর্যা এবং অনুভূতি লাভের বহু বিচিত্র দিকের যে পরিচয় লাভ করিলাম তাহার মধ্যে অপরিচয়ের বিস্ময়, ভীতি-বিহ্বলতা, ভয়ংকরতা বলিয়া কিছু নাই। সেখানে সব কিছু সুন্দর, আকাঙ্ক্ষিত ও মধুর। মৃত্যুর যে পথ বাহিয়ামানুষকে অমৃত-লোকে উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহার যে 'ভয়ের মুখোশ', কবি আপনার জীবনেই পরবর্তী কালে যাহার নানা পরিচয় লাভ করিয়াছেন, যে বিচিত্র ভয়ংকর, সর্বনাশা অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে লাভ করা যায়; (এক্ষেত্রে পাঠকবর্গের ভগবদ্গীতার বিশ্বরূপ দর্শন, তন্ত্রসাধনার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বুদ্ধদেবের তপশ্চর্যার কালে মারের বিচিত্র লীলা, পাশ্চাত্ত্য সাধকগণ যাহাকে 'the aweful', 'the mysterious', 'the fearfulness', 'the sublimity', 'the darkness', 'the silence', the emptiness', এবং 'the empty distances' প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করিয়াছেন, St. Paul, St. John of the Cross, Lurther, Bohme, Eckhart প্রভৃতি মিস্টিকদের জীবনে যাহার বহু বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, সেই সকল দিক একে একে স্মরণে পড়িতে

পারে) এবং সেই সকল অনুভূতিকে প্রকাশ করিতে যে নানা প্রতীকের উদ্ভব ঘটে তাহার কোন প্রকাশ এই তিনখানি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে না।

গীতায় (২য় অধ্যায়ে ২৯ নং শ্লোকে) ব্রহ্ম, অসীম বা অরূপের উপলব্ধিকে বলা হইয়াছে 'আশ্চর্যম্'। উপনিষদে (কেন উপনিষৎ) ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় স্বরূপকে বিদ্যুচ্চমকের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক বিদ্যুচ্চমক, তাহার ভয়ঙ্করতা, তাহার অভিভূতকারী অতি তীব্র মহিমা, ভীতি-বিহ্বলতা এবং আতঙ্ক মনের অলৌকিক অবস্থাকে প্রকাশ করে। একপ্রকার আ-আ-আ-ভয়ার্ত স্বর।

ইহার স্বরূপকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় :

"যখন বিদ্যুৎ স্খলিত হইয়াছে ;
আ আ আ !
তাহা যখন আমাদের দৃষ্টিকে বন্ধ করিয়া দেয়,
আ আ আ !
ইহাই দেবতার স্বরূপ।" (কেন উপনিষৎ)

সেন্ট পল হইতে শুরু করিয়া বর্তমানকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্যে সকল মিস্টিকদের উপলব্ধির মধ্যে এই জাতীয় একটি প্রকাশ কোন-না-কোন ভাবে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্র-জীবন-দর্শনে সামঞ্জস্য তত্ত্বের কথা পূর্বাপর উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবনে বোধের বৈচিত্র্য এত বেশি, এতদূর পরস্পর-বিরোধী, এমনি অভিনব এবং এই সকল বোধের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিতে তাঁহাকে যে অতি তীব্র অধ্যাত্ম-সংগ্রাম করিতে হয়, তাহার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যেও একান্ত বিরল। একটি সামঞ্জস্য তিনি কোন প্রকারে গড়িয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু আবার নূতন কোন বোধের, নূতন কোন মূল্যের সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইয়াছে, যাহার ফলে ইহাদের সহিত মিলিত করিতে তাঁহাকে আবার বৃহত্তর সামঞ্জস্যবোধের সন্ধান করিতে হইয়াছে। এমনি ভাবে তাঁহার সামঞ্জস্যবোধের সীমা ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার অন্তরে বেদনাবোধও শেষ পর্যন্ত রহিয়া গিয়াছে।

এইদিক দিয়া কালিদাসের কাব্য-জগতের সহিত রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জগতের সামান্য তুলনা করিলে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করিতে সুবিধা হইবে।

কালিদাস যে কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই কালে সমগ্র জাতির অধ্যাত্ম সংগ্রামের একপ্রকার অবসান ঘটিয়াছে, জাতি-চিত্ত দীর্ঘকালের অন্তর্দ্বন্দ্ব-শেষে একটি স্থায়ী পরিণাম লাভ করিয়াছে। জীবন, জগৎ ও জগৎ-অতীতের মধ্যে এমন একটি সুসংগত পরিকল্পনা লাভ করিয়াছে, যে সম্পর্কে জাতির মনে আর কোন সংশয় বা জিজ্ঞাসা নাই। (সমাজ, নীতি, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে কালিদাস যাহা বলিয়াছেন, তাহা শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলিত, কালিদাসের সৃজনী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানে কিছুমাত্র নাই।) এই সম্পূর্ণ সুসংগত জীবন-পরিকল্পনার সহিত কালিদাস সম্পূর্ণরূপে একাত্মতা বোধ করেন। এই জাতীয় কোন অধ্যাত্মসংগ্রাম না থাকিবার ফলে কালিদাসের কাব্যের মর্মমূলে কোন গভীরতর বেদনার স্পর্শ নাই। কেবল কালিদাস কেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যযুগীয় যে-কোন কবি-প্রতিভা সম্পর্কে এই মন্তব্য করিতে পারা যায়। তাহাদের জীবন কতকগুলি সুস্পষ্ট মূল্যবোধের (ইহ-লোক ও পর-লোক সম্পর্কিত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বোধ সম্পর্কিত) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

বর্তমান যুগে এই সকল মূল্যবোধ এতদূর বিচিত্রতা লাভ করিয়াছে এবং সেগুলি এমনি অভিনব এবং এতদূর বিপর্যয়কারী যে, তাহাদের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিবার জন্য মহত্তর প্রতিভা, অনেক গভীর অন্তর্দৃষ্টি, অনেক উদার, অনেক ব্যাপক প্রজ্ঞার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের কালে সমগ্র জাতি বৃহৎ বিশ্বের সহিত দীর্ঘকাল পরে সেই প্রথম স্থায়িভাবে যুক্ত হয়। জাতি-চিত্তে সমগ্র বিশ্বের বিপুল বিচিত্র চিন্তাধারা, বিশেষ করিয়া বৈজ্ঞানিক নিত্য নূতন আবিষ্কারের ফল আসিয়া পৌঁছায়। স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্রনাথের চিত্ত-লোককেও যে তাহা স্পর্শ করিবে সহজেই অনুমেয়।

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বিচিত্র বোধের পরিচয় লাভ করা যায় তাহাদের মধ্যে তিনি পরিণামে কোন পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিয়াছেন কি-না সে বিচার আপাতত না তুলিয়া তাহার বিপুল বৈচিত্র্য এবং সামঞ্জস্য সাধনের রক্তমোক্ষণ-কারী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে এই বৈচিত্র্য এবং এই সংগ্রাম প্রায় ছিল না বলিলেও চলে।

সংস্কৃত কবিদের কাব্য-জগৎ সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত কীথ সাধারণভাবে একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন :

"They live moreover in a world of tranquil calm, not in the sense that sorrow and suffering are unknown, but in the sense that there prevails a rational order in the world which is the outcome not of blind chance but in the actions of man in previous births. Discontent with the constitution of the universe, rebellion against it decrees, are incompatible with the serenity engendered by the recognition by all the Brahmanical poets of the rationality of the world order." (A History of Sanskrit Literature)

যে জীবন-দর্শনকে তাঁহারা আশ্রয় করেন, তাহার বিস্তারিত পরিচয় দান এক্ষেত্রে অবান্তর, তবে এই জীবন-দর্শন রবীন্দ্রনাথের কালে বিচিত্র জীবন-জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(সৌন্দর্য ও মাধুর্য-লোকের উল্লেখ করিয়া সংস্কৃত কবিদের বিশেষ করিয়া কালিদাসের কাব্যের সহিত আমরা রবীন্দ্র-কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা করি, কিন্তু মূল বোধের ক্ষেত্রে এই পার্থক্যের জন্য এই জাতীয় তুলনামূলক আলোচনার বিশেষ কোন সার্থকতা নাই। কাব্য আলোচনায় তাহা একান্ত বহিরঙ্গিক।)

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বেদনা তাহা নূতন সামগ্রিক জীবন-দর্শন সৃষ্টির বেদনা। তাঁহার কাব্যের মর্মমূলে যে অস্থিরতা তাহা নিত্য নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল। বিষয়টিকে আরো একটু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন।

সাধারণ চিন্তার ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য যতই থাক, প্রত্যেক জাতির একটি বিশিষ্ট চিন্তা-পদ্ধতি, একটি স্থায়ী ভাব-লোক আছে। চিন্তার বিচিত্র ধারা এই বিশিষ্ট ভাব-লোক বা চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে।

ইহা যেন মহাসমুদ্রের তীরে তীরে প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী এক-একটি ক্ষুদ্র জলাশয় কাটিয়া লওয়া। প্রত্যেকটি দেশ বা জাতি আপনার এই আবেষ্টনীকেই একমাত্র সত্যরূপে আশ্রয় করিয়া আছে। সেইসঙ্গে অন্য সকল জাতির ভাব-লোক হইতে আপনার ভাব-লোকের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের নিঃসংকোচ চেষ্টাও লক্ষিত হয়।

বর্তমানকালে নানাকারণে সেই প্রত্যেকটি ক্ষুদ্রবেষ্টনী ধীরে ধীরে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ইহা যে নির্বিশেষ সত্যকে সীমিত উপলব্ধির দ্বারা নানারূপে সীমিত করিবার চেষ্টা সেই সত্যই দিনে দিনে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এই এক-

একটি আবেষ্টনীকে প্রত্যেক জাতির বংশানুগতি বলা যাইতে পারে। এই বংশানুগতির আবেষ্টনী হইতে বাহির হইয়া প্রত্যেকটি দেশ একটি বৃহত্তর উদারতর সত্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠালাভ করিতে চাহিতেছে। এখানে আসিয়া বিশ্ব-মানব-মনের বিকাশের একটি পর্যায় শেষ হইয়া একটি নূতন পর্যায় শুরু হইয়াছে।

বিশ্ব-মানবের যে মানস-লোক তাহাও সীমিত বলিয়া তাহাদের সকলের উপলব্ধ সত্য যে সীমিত তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি সীমিতবোধের মিলিত প্রকাশ নয়। এই সকল ক্ষুদ্র সীমিতবোধ ভাঙ্গিয়া তাহা একটি অখণ্ডতা লাভ করিয়াছে। এই অখণ্ডবোধের সত্তাটি এখন হইতে ধীর বিকাশ লাভ করিয়া চলিবে।

বংশানুগতির সীমা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু সকল বংশানুগতিকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া উপচাইয়া যে একটি বোধের প্রসার তাহাও নিসংশয়িত স্পষ্ট রূপ লইয়া এখনও ফুটিয়া উঠে নাই। ইহা সেই রূপান্তরের পর্যায়। এই রূপান্তরের ফলে মানসিক নানা বিপর্যয় ও অব্যবস্থা স্বাভাবিকভাবে সর্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে মন নূতনকে গ্রহণ করিতে একান্ত অসমর্থ, যাহার মধ্যে পরিবর্তনের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত, যাহা কেবল বহনপটু, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যাহা কেবল বহন করিবার এই বৃত্তিটিকেই চর্চা করিয়াছে, এই পরিবর্তনের পর্যায়ে তাহারা স্বাভাবিকভাবে প্রাণপণে বংশানুগতিকে জড়াইয়া ধরিয়া একদিন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে। গ্রহণের ক্ষমতা যাহাদের আছে, তাহাদের সামর্থ্য এবং সেইসঙ্গে মানসিক প্রতিক্রিয়ার নানা ক্রম ও রূপ আছে। বিশ্বের সর্বত্র এই মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর প্রত্যক্ষ করা যায়।

ইহা এক্ষেত্রে উল্লেখ করিবার তাৎপর্য এই যে, আমাদের জাতি-চিত্তে যে রূপান্তর ঘটিয়া চলিয়াছে তাহার পূর্ণ প্রকাশ শুধু নয়, পূর্ণ আদর্শও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। সে আদর্শ শুধু নয়, পরিণামে একটি সত্যবোধে নিঃসংশয় স্থিতি আছে। বিশ্বের সকল সীমিতবোধের ধারা তাঁহার চেতনায় একাকার হইয়া একটি অখণ্ড সত্যবোধ যে ফুটাইয়া তুলিয়াছে তাহা বোধ হয় নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

রবীন্দ্রনাথের অন্তশ্চেতনায় বিক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব একান্ত স্পষ্ট। সেই দ্বন্দ্ব তাঁহার বিচিত্র চেতনা-পর্যায়ের মধ্যে, বিচিত্র চিন্তা-পদ্ধতির মধ্যে, বিচিত্র

ভাব-সাধনার মধ্যে, ব্যক্তি ও বিশ্ব, ব্যক্তি ও সমাজ, সমাজ ও জাতি, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা, ইহলোক ও পরলোক, ভক্তি, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে।

এই বহুবিচিত্র বিরোধিতার মধ্যে যদি নিয়ত সংঘাতই থাকিত এবং তাহাতে কবি-চেতনা কেবল আন্দোলিতই হইত তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের জীবনে যে মহান্ ট্র্যাজেডি চিহ্নিত হইয়া যাইত তাহাতে কোন সংশয় নাই। রবীন্দ্রনাথ এই সকল বোধের মধ্যে একটি পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যে সত্যবোধের মধ্যে তিনি পরিণামে এই সকল বিচিত্রবোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন সেই মূল সত্যবোধটিকে আমাদের উপলব্ধি করিতে হইবে।

বৃক্ষ যেমন প্রারম্ভিক অবস্থা হইতে পরিণত অবস্থা পর্যন্ত সকল পর্যায়ে বৃক্ষের পূর্ণ পরিচয় বহন করে, তাহা এক অংশের সহিত অপর অংশের কেবলই যোজনা নহে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের সত্য খণ্ড খণ্ড বোধের যোজনা নহে। তাঁহার উপলব্ধি-চক্রের পরিধি কেবলই বাড়িয়া গিয়াছে। আর পরিণামে আমরা আশ্চর্য হইয়া দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে বিশ্বের সকল ভাব-ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল অধ্যাত্ম-প্রেরণা কেমন করিয়া কোন্ রহস্যের বশে স্থান লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্র-কাব্যে যে বেদনা তাহা ক্ষুদ্রতর সামঞ্জস্য হইতে বৃহত্তর সামঞ্জস্য লাভের বেদনা। নিখিল মানব-সমাজের, বিশ্ব-প্রকৃতির সকল প্রেরণা তাঁহার অন্তশ্চেতনায় নিয়ত গূঢ় গোপন রস সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার প্রাণমূলে এই রস সঞ্চারিত হইয়া তাঁহার জীবন-বৃক্ষকে ধীরে ধীরে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। তাঁহার সত্য তাই জীব-দেহের ন্যায় অখণ্ড। তাহাকে বাহির হইতে খণ্ড খণ্ড আকারে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে পারা যায় না।

উপনিষদে দেশ-কালের ঊর্ধ্বে পরম সত্যের উপলব্ধির কথা আছে। নিখিল বিশ্ব যে এক অমোঘ নিয়মের অধীন (যাহাকে 'ঋত' বলা হইয়াছে) তাহার নিঃসংশয় উপলব্ধির কথাও আছে। বিসৃষ্টি যে ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া ক্রমিক উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহারও পরিচয় লাভ করা যায়।

এই তিনটি সত্য যে এক অখণ্ড বোধের মধ্যে বিধৃত, অর্থাৎ দিব্য-চেতনাই দেশ-কালের মধ্যে নানা চেতনা-ক্রমে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া নিখিল বিসৃষ্টি আবার আপনার পূর্ণ স্বরূপ ফিরিয়া লাভ করিতে চলিয়াছে, এই উপলব্ধির প্রকাশ কোথাও কোথাও লাভ করিতে

পারা গেলেও ঠিক নিঃসংশয় রূপ লইয়া কোথাও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই ঔপনিষদিক সাধনা অব্যাহত থাকিলে এই উপলব্ধি যে কালে সম্পূর্ণতা লাভ করিত তাহাতে সংশয় নাই।

বিশ্ব-সভ্যতার দিকে অখণ্ডরূপে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যখনই কোন একটি সমৃদ্ধির যুগ আসিয়াছে তখন তাহার প্রেরণা একদিকে জীবন ও জগৎ-সংসারকে যেমন আশ্রয় করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি মননশীলতা ও দার্শনিক চিন্তাধারাকেও আশ্রয় করিয়াছে।

গ্রীক সভ্যতার সমৃদ্ধির যুগে ইহাই লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একদিকে জীবনের প্রতি গভীর অনুরাগ, বিচিত্র সৃষ্টি-প্রেরণা, অন্যদিকে অপ্রত্যক্ষ, অতীন্দ্রিয়, সত্য লাভের জন্য ধ্যান-তন্ময়তা। প্রাণের রহস্যই এই। তাহা জীবনের উভয়মুখীন প্রেরণাকে আশ্রয় করিয়া অখণ্ড এক। কোন একটি দিক যখন একান্ত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করে তখন জীবনের সমৃদ্ধির অভাব সূচিত হয়। সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে কখন একটি কখন অন্যটির প্রেরণা মুখ্য হইয়া বারংবার দেখা দিয়াছে।

বৈদিক স্তোত্রগুলির মধ্যে এই উভয়মুখীন প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। সহজ প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাস, উচ্ছলতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি গভীর অনুরাগ, জীবন ও জগতের অপার রহস্যময়তা লক্ষ্য করা যায়। দেবদেবীগণ গ্রীক অলিম্পাসের দেবদেবীগণের ন্যায় মর্ত্যের নর-নারীদের সহিত মেলামেশা করিতেছেন। দেবতা ও মানবের মধ্যে তখনও সুস্পষ্ট কোন ব্যবধান রচিত হয় নাই। সেইসঙ্গে অপরদিকে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বিচিত্র গভীর জিজ্ঞাসা আসিয়াছে। জীবন ও জগতের স্বরূপ কি? বিশ্ব ব্যাপারের পশ্চাতে কি কোন সচেতন অভিপ্রায় আছে? যদি থাকে তবে তাহার সহিত ব্যক্তি-অভিপ্রায়কে কি যুক্ত করিতে পারা যায়? দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের মধ্যে সংযোগ কেমন করিয়া ঘটাইতে পারা যায়, এবং তাহার দ্বারা জীবন কি আপনার সত্য মূল্য লাভ করে?

মধ্যযুগে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের কালে জীবনের অসারতাবোধ প্রাধান্য লাভ করিলেও তাহা আদৌ জীবনের অসারতাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাহা হইলে সৃষ্টির বহু বিচিত্র প্রেরণার এমন আশ্চর্য প্রকাশ কখনই সম্ভব হইত না। দার্শনিক উপলব্ধি যেমনই হোক, জীবন জীবনের স্বরূপ বরাবর মানবচিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছে; বরং সেমিটিক সংস্কৃতির যতটুকু পরিচয়

আমরা জানি তাহাতে জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিবার, তাহার অসারবত্তা সপ্রমাণ করিবার প্রতি প্রবণতা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন হইতে অনেক বেশি।

মধ্যযুগে ইউরোপে জীবনকে অস্বীকার করিবার বিশেষ যে প্রবণতা দেখা যায় তাহা ভারতের মধ্যযুগীয় মনোভাব অপেক্ষা অনেক বেশি ব্যাপক ও গভীর।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে উভয়মুখীন প্রেরণার যে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দেখি তাহার পশ্চাতে জীবনের চিরন্তন এই ধর্মের দিকটিই প্রকাশলাভ করিয়াছে। তাহাকে বিশেষ কোন একটি সংস্কৃতির বিশিষ্ট দানরূপে যদি স্বীকার করিতে হয় তবে প্রাচ্য সংস্কৃতির স্ফুরণ বলাই অধিক সংগত। কারণ, জীবনের অস্বীকৃতি সেমিটিক সংস্কৃতির মধ্যে যতটা ঘটিয়াছে ভারতের মধ্যযুগেও ততটা ঘটে নাই। তাহা হইলে শিল্প-কলা নৃত্য-সংগীত-সাহিত্য প্রভৃতির এমন বিকাশ কখনই ঘটিতে পারিত না। তবে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতা কবির প্রাণমূলে সংঘাত সৃষ্টি করিয়া তাহাকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে যে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে তাহা অনস্বীকার্য। কিন্তু তাহার মধ্যে যে পূর্ণ প্রাণের উদ্বোধন ঘটিয়াছে তাহা গভীরভাবে যে প্রাচ্য দেশীয় তাহা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন ধারা পর্যালোচনা করিলে সহজেই প্রতীতি হয়।

মধ্যযুগে জাতি এই সাধন-ধারা হইতে সম্পূর্ণরূপে স্খলিত হইয়া পড়ে। (ইহার বহুবিচিত্র কারণ নির্দেশ এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন)। তাহাতে পরমার্থ সৎ স্বরূপের সহিত দেশ-কালের জাগতিক জীবনের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়।

দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় (আদৌ যদি তাহা থাকে) জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে পৃথক হইয়া পড়ে। (ভারতবর্ষই যে একমাত্র দেব-ভূমি, ঈশ্বরের একটি বিশেষ অভিপ্রায় যে এই দেশকে আশ্রয় করিয়া চরিতার্থ হইতে চায় তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। এই অভিপ্রায় দেশে দেশেই কেবল নয়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতেও পৃথক তাহা তাহার সামাজিক স্তর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে একথা স্পষ্টই স্বীকৃত।)

বর্তমানকালে বিজ্ঞানের অসামান্য সমৃদ্ধি ও বিচিত্র সত্য আবিষ্কারের ফলে সেই প্রাচীন সত্যের পুনরায় নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। বিশ্বের এক নিয়তি নিয়মের সহিত সকল দেশ, সকল জাতি, সকল মানবগোষ্ঠী বিধৃত হইয়া আছে। প্রত্যেকের ভিতর দিয়া সেই এক নিয়তি চরিতার্থ হইতেছে।

এই পূর্ণ দৃষ্টি এদেশে আমরা প্রথম রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখিতে পাই। তাঁহার এই পূর্ণতার সাধনায় কতখানি গ্রীক, কতখানি সেমিটিক, কতখানি খ্রীষ্টান,

কতখানি বৌদ্ধ, কতখানি উপনিষৎ, কতখানি বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম, কতখানি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক কাব্য সাহিত্যের কতখানি প্রভাব পড়িয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করিয়া নির্দেশ করা দুঃসাধ্য শুধু নয়, নিষ্প্রয়োজনও। বলিয়াছি, তাঁহার ধর্ম একটি অখণ্ড সৃষ্টি তাহা এক অংশের সহিত অপর অংশের সচেতন মিলন-চেষ্টার ফল নহে।

বলাকা

কবি তাঁহার জীবন-সাধনায় পরিপূর্ণতার যে আদর্শ লাভ করিতে চান, তাহার জন্য পূর্বে প্রয়োজন ব্যক্তি-সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার পূর্ণ মিলনবোধ, অর্থাৎ বিশ্বানুভূতি লাভ। এই মিলনবোধ সম্পূর্ণ না হইলে পূর্ণতার ওই আদর্শকে লাভ করিতে পারা যাইবে না। মূল এই অসম্পূর্ণতার জন্য কবির জীবনে যে পূর্ণ পরিণাম লাভ ঘটে নাই, তাহা কবি স্বীকার করিয়াছেন। গীতাঞ্জলি অধ্যায়ে আমরা কবির সেই স্বীকৃতির পরিচয় লাভ করিয়াছি।

বিশ্বের সহিত একাত্মতাবোধ কেন কবির জীবনে অচরিতার্থ রহিয়া গেল তাহার একটি স্পষ্ট কারণ নির্দেশ তিনি 'বলাকা'র মধ্যে করিয়াছেন। বিশ্বের সহিত একাত্মতা বলিতে কেবল তাহার সৌন্দর্য-ভাগের সহিত একাত্মতা বুঝায় না; তাহার অসুন্দর ভাগ, তাহার কঠোরতা, ভয়ংকরতা ও নির্মমতার সহিতও একাত্মতা বুঝায়।

বিশ্বে সুন্দর-অসুন্দর, রূপ-বিরূপের এই পার্থক্যের বোধটি থাকে মানসিক চেতনায়। বিশ্ব-সত্তা মানবিকবোধের অতীত সত্তা, তাহা সুন্দর নয়, অসুন্দরও নয়। তাহা 'নিরুপম' বা 'অনুপম'; অর্থাৎ তাহার তুলনা বা উপমা নাই। তাহা সুন্দর-অসুন্দরের মিলিত প্রকাশও নয়। তিনি সুন্দর-অসুন্দরকে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের পূর্ণ করিয়া অনন্তে ব্যাপ্ত। পূর্ণতার এই তত্ত্বটিকে মানুষ যখন লাভ করে তখন মানুষ আপনার চেতনাকেই সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখে। সেখানে ভেদ থাকে না বলিয়া সুন্দর-অসুন্দরের প্রশ্ন নিরর্থক। মানবীয় চেতনার এই পরিণামকে অনির্বচনীয় ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে।

বিশ্ব-সত্তার স্বরূপ সম্পর্কে আজ কবি এতদিন পরে নিঃসংশয় হইয়াছেন।

এই সত্তালাভের জন্য কবি পরবর্তী সমস্ত জীবন ধরিয়া সাধনা করিয়াছেন। কবির অধ্যাত্ম-সাধনায় ঈশ্বরীয় বিচার এইভাবে লীলা করিয়াছে।

ইতিপূর্বে কবির বিশ্ব-সত্তার স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বারংবার উল্লেখ করিয়াছি যে, তাহা যথার্থ বিশ্ব-সত্তা নহে, তাহা বিশ্বের সকল সীমিত সৌন্দর্যের সমাহার। সীমিত সকল সৌন্দর্যের সমাহার বলিয়া তাহাও সীমিতবোধ। তাহা মানবিক সৌন্দর্য-পিপাসাকে এইরূপে এক অপরূপ ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়া তাহার আশ্চর্য সমৃদ্ধি ঘটাইয়াছে।

অধ্যাত্ম-জীবনের পূর্ণ পরিণাম লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া কবি এতদিন পরে তাঁহার সাধনার অসম্পূর্ণতার মূল কারণ সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন। আমি এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া 'বলাকার' বিয়াল্লিশ সংখ্যক কবিতাটি উল্লেখ করিতেছি।

কবি যে সৌন্দর্যধ্যানে সচরাচর তন্ময় হইয়া থাকিতেন, বাস্তব জীবনের রূঢ় সংস্পর্শে বারংবার সে তন্ময়তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহাতে বারংবার তিনি অপ্রসন্ন অন্তরে বাস্তবতাকে পরিহার করিয়া সৌন্দর্য-স্বপ্নে আবার হারাইয়া গিয়াছেন। বাস্তব জগৎ তাহার অচিন্তনীয় বিপুল বিচিত্র সমস্যা লইয়া সেই ধ্যান-লোকের বাহি'র আবর্তিত হইয়া গিয়াছে।

নির্মম দারিদ্র্য, মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; ('ক্ষুধিত দারিদ্র্য সম মধ্যাহ্নে এসেছ দ্বারে মম') কিন্তু সৌন্দর্য-সাধনার অন্তরায় বলিয়া তাহাকে তিনি একান্তে পরিহার করিয়াছেন।

বিশ্বের অন্তরালবর্তী নির্মম, অতি ভয়ংকর শক্তির লীলা কত বার তিনি অপরোক্ষ করিয়াছেন। 'যেন মৃত্যুদূত', 'অস্পষ্ট অদ্ভুত দুঃস্বপনের মতো'। কিন্তু এই প্রকাশের রহস্যকে তিনি ভেদ করিতে চান নাই। আপনার জীবনে তাহার কোন প্রকাশকে সত্য করিয়া তুলিতে চান নাই।

আজ কবি ধ্যান-লোক হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বিপুল জনতার মাঝখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চান। মনুষ্যত্বের সকল প্রকার অবমাননাকে অসম্ভব করিয়া তুলিবার জন্য তিনি আজ দৃঢ়সংকল্প। তাই আজ তিনি সেই ভয়ংকর নির্মম শক্তির প্রকাশকে আপনার জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চান; যাহা সর্ববিধ অসত্যের মূলে দারুণ আঘাত করিতে পারে, যাহা পুরাতন সকল জীর্ণতাকে ঝরাইয়া দিয়া নূতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, যাহার প্রবল পরুষ স্পর্শে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ভয়ের সকল মুখোশ খুলিয়া পড়ে, ঈশ্বরের অমোঘ শাসনের মত যাহা সকল দ্বিধা-সংকোচ ও দুর্বলতা-মুক্ত।

যে সৌন্দর্য-ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া তিনি বিচিত্র সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আজ তিনি দেখিলেন বৃহৎ জীবনলাভের ফলে তাহা অধিক দূর সহায়তা করে না :

"এ দীর্ঘ জীবন ধরি
বহুমানে যাহাদের নিয়েছিনু বরি
একাগ্র উৎসুক,
আঁধারে মিলায়ে যাবে তাহাদের মুখ।
যে আসিলে ছিনু অন্যমনে,
যাহারে দেখি নি চেয়ে নয়নের কোণে,
যারে নাহি চিনি,
যার ভাষা বুঝিতে পারি নি,
অর্ধরাতে দেখা দিবে বারে বারে তারি মুখ নিদ্রাহীন চোখে
রজনীগন্ধার গন্ধে তারার আলোকে।"

গীতাঞ্জলি পর্বে কবি দিব্য-চেতনা লাভের জন্য যে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন 'বলাকা'র মধ্যে তিনি তাহার পরিচয় এইভাবে দান করিয়াছেন :

"চলেছিলেম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
কোথায় শান্তি স্বর্গ।
*   *   *
"ভেবেছিলেম বোঝাবুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।"

কিন্তু এই সাধনা তাঁহার জীবনে স্থায়ী ও সত্য হয় নাই। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা মোক্ষকে আকাঙ্ক্ষা করিয়া পরিণামে জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনা এই মোক্ষের সাধনা নয়। মোক্ষের সাধনা রবীন্দ্রনাথের নিকট শূন্যতার সাধনা।

যে রহস্যে দিব্য-চেতনা দেশ-কালের ভিতর দিয়া তাঁহার একটি বিশেষ অভিপ্রায় চরিতার্থ করিয়া তুলিতেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেই রহস্য ও অভিপ্রায়ের

স্বরূপ জানিতে চান। এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করেন যে, দিব্য অভিপ্রায়কে সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে এই সমাজকে তাহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। মানব-সমাজ যথেষ্ট পরিণতি না লাভ করিলে ওই শক্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটিতে পারে না। সেই রাজার একদিন আবির্ভাব ঘটিবেই, কিন্তু তাঁহার আসন, তাহার পূর্বে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার জন্য তাঁহার শয্যা প্রভৃতির রচনা চাই। অর্থাৎ জীবন ও জগৎকে তাঁহারই অনুকূল করিয়া গড়িতে হইবে। ইহার জন্য সমাজ হইতে সর্ববিধ মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার, দারিদ্র্য, ব্যাধি ও ভয় দূর করিয়া দিতে হইবে। যুগে যুগে মহাপ্রাণ ইহারই জন্য অকাতরে প্রাণবিসর্জন দিয়াছেন। এইভাবে সমাজকে তাঁহারা ধীরে ধীরে ওই পরিণামের দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

দিব্য-চেতনার মধ্যে এই অভিপ্রায় আছে বলিয়া তিনিই নির্মম আঘাত হানিয়া কবিকে ধ্যানাসন হইতে উঠাইয়া বৃহৎ বিশ্বের মাঝখানে টানিয়া আনিয়াছেন। তাঁহার জীবনে এমনি করিয়া দিব্য-অভিপ্রায় চরিতার্থ হইতে চলিয়াছে। ইহাকে তাই কবির অসামর্থ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিলে ভুল করা হইবে। কবিও তাঁহার এই উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন :

"হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।"

আজ কবিকে যদি সকল অসত্য ও অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়, ঈশ্বরের সেই অভিপ্রায় যদি তাঁহার জীবনে থাকে, তবে তাহাকে সত্য করিয়া তুলিতে তিনি স্বয়ং কবিকে শক্তি দিবেন :

"এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণ-সজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয় ডঙ্ক।"

কবি তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় অন্যত্রও দান করিয়াছেন। কবি ইতিপূর্বে যে মুক্তিলোক লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন, ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর সেই একই সত্তাকে লক্ষ্য করিয়াছে। কবি তাহার পরিচয় এইভাবে দান করিয়াছেন :

"তার আরম্ভ নাই, নাইরে তাহার শেষ,
ওরে নাই রে তাহার দেশ,
ওরে নাই রে তাহার দিশা,
ওরে নাইরে দিবস, নাইরে তাহার নিশা।"

উপনিষদেও এই একই উপলব্ধির পরিচয় দান করা হইয়াছে। ইতিপূর্বেও এই জাতীয় কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি।

"সেখানে চক্ষু যায় না, বাণী যায় না, মন যাইতে পারে না, (মানুষ) ইহাকে শিক্ষা দিবে কিরূপে, তাহাকে আমরা জানি না, উপলব্ধি করিতে পারি না।" (কেন উপনিষৎ)

"সেখানে সূর্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ প্রতিভাত হয় না, এই অগ্নি তাই কোথায়? কেবল সেই উজ্জ্বল আলোকে সমস্ত কিছু আলোকিত। তাঁহার দীপ্তি এই সমুদয় বিশ্বকে প্রদীপ্ত করিয়াছে।" (কঠ উপনিষৎ)

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার এই আকাঙ্ক্ষিত পরিণাম লাভ করেন। কিন্তু পার্থক্য এই যে, ইহা তাঁহার নিকট পূর্ণতার বোধ জাগ্রত না করিয়া শূন্যতা-বোধ জাগ্রত করিয়াছে। তিনি নিঃসংকোচে একথাও স্বীকার করিয়াছেন :

"ফিরেছি সেই স্বর্গে শূন্যে শূন্যে
ফাঁকির ফাঁকা ফানুষ।"

স্বর্গ বলিতে তিনি যাহা বোধ করিতেন তাহার পরিচয়ও তিনি এই প্রসঙ্গে দান করিয়াছেন :

"কত যে যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে
জন্মেছি আজ মাটির 'পরে ধুলামাটির মানুষ।
স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে, আমার স্নেহে
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।"

আপাতদৃষ্টিতে ইহা কেমন অভিনব বলিয়া বোধ হয়। অতি-জাগতিক সকল সত্যকে অস্বীকার করিবার প্রবণতা! একপ্রকার নাস্তিক্যবোধ!

দেশ-কালের মধ্যে দিব্য-চেতনা যেখানে আপনাকেই নিত্য উৎসর্গ

করিতেছেন, আপনার অভিপ্রায়কে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে তাঁহার যে বিশিষ্ট প্রকাশ, সেই উৎসর্গ, সেই অভিপ্রায়, সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ স্বর্গের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। দেশ-কালের এই আশ্রয়, রূপের এই আধার ছাড়া অসীম বা অরূপ বন্ধ্যা ; তাহার কোন ঐশ্চর্য নাই বলিয়া তাহা শূন্য। রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ সত্যোপলব্ধির ক্ষেত্রে সীমা ও অসীম, দুইটি সখার মত শাশ্বত কালের জন্য যুক্ত হইয়া আছে। বরং অসীমকে তিনি পরিহার করিতে পারেন, কিন্তু সীমাকে নয়। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনাকে সম্পূর্ণতা দান করিবার জন্যই রবীন্দ্রনাথের ইহা যেন সীমার প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত সত্যকে স্বীকার করে নাই, তাহার মূল্যের পরিবর্তনকেও সেইসঙ্গে অস্বীকার করিয়াছে। দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত মূল্য সকল কালের জন্যই এক। তাই ভারতীয় সাধনার লক্ষ্য হইল কোন একটি উপায়ে দেশ-কালের বোধকে ছাড়াইয়া উঠা। সেই সঙ্গে দেশ-কালের বোধ বা বুদ্ধিকে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করিয়া দিবার সকল প্রকার চেষ্টা হইয়াছে।

দেশ-কাল সম্পর্কে খ্রীষ্টধর্ম যে বিশ্বাস পোষণ করে এই প্রসঙ্গে তাহারও কিছু পরিচয় লাভের জন্য আমি Emil Brunner-এর দুই একটি মন্তব্য কিছু বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত করিতেছি, তাহাতে ভারতীয় এবং সেইসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধির পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

"The Orient has a conception of time entirely different from that of the West, and this difference belong to the religious and metaphysical sphere."

"It is timeless, motionless, self-satisfied eternity ; therefore it is the deeper desire of the Indian thinker to enter into or to share in that motionless eternal being, in Nirvana."

"There is a clear cut opposition between eternity and the temporal world. Eternity is the negation of time : time is the negation of eternity. How this time-world came into being, and what kind of being it has, is a question which can hardly be answered satisfactorily from Plato's presuppositions.

"The time process in its totality, from beginning to end, is present in Him. For Him there is no surprise. Everything that happens does so according to His eternal decree. God is eternal.

"But the relation of this eternal God to temporal being and becoming is totally different from what it is in Indian thought or in the systems of Parmenides, Plato or the Neoplatonists."

"Here history is no circular movement. History is full of new things, because God works in it and reveals Himself in it. The historical time-process leads somewhere. The line of time is no longer a circle, but a straight line, with a beginning, a middle and an end."

"Still the idea of universal progress is impossible within this Christian conception because, alongside this growth of the Kingdom, there is the concurrent growth of the evil powers and their influence within this temporal world. * * * The goal of history is reached not by an immanent growth or progress, but by a revolutionary change of the human situation at the end of history, brought about not by man's action, but by divine intervention—an intervention similar to that of incarnation, * * * the advent of the Lord, the ressurrection of the dead, the coming of the eternal world."

একদিকে দিব্য-চেতনা অন্যদিকে জড়জগৎ—এই দুইয়ের মধ্যে যোগের রহস্য যে ভারতীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনা করিতে পারে নাই এবং পরিণামে জড়-জগৎকে যে সে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়াছে এই সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ একস্থলে যে মন্তব্য করিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উপনিষৎ যে মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে, বৌদ্ধ, পারসী ও ইসলাম ধর্ম সেই এক মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে। ইজিপ্ট, সিরিয়া, এসিয়া-মাইনর প্রভৃতি প্রাচীন সকল সভ্য সংস্কৃতিতে এই এক মুক্তিই লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ও

শ্রীঅরবিন্দের সমস্যা ও সাধনা তাই একান্তরূপে ভারতবর্ষীয় নয়, তাহা সমগ্র বিশ্বের সমস্যা ও সাধনা।

"In India, for the last thousand years and more, the spiritual life and material have existed side by side to the exclusion of the progressive mind." (On Yoga)

অন্যত্র

"The material life, handed over to the Ignorance, the purposeless and endless duality, became a leaden and dolorous yoke from which flight was the only escape." (On Yoga)

দার্শনিক হোয়াইট হেড যে বিচিত্র বৈপরীত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন নিম্নে তাহারই একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই সকল বৈপরীত্যের সমন্বয় সাধনের ভিতর দিয়া যে পরিপূর্ণ দর্শন গড়িয়া উঠিবে তাহা তিনিও স্বীকার করেন। তবে এই সমন্বয়ের তত্ত্ব সন্ধানের ক্ষেত্রে তিনি কতদূর কৃতকার্য হইয়াছিলেন তাহা বিচার্য হইতে পারে

দ্বৈতবোধ : "—found within each occasion of actuality....The universe is dual, because, in the fullest sense, it is both transient and eternal. The universe is dual because each final actuality is both physical and mental. The universe is dual because each occasion unites its formal immediacy with objective otherness. The universe is many because it is wholly and completely to be into many final actualities....The universe is one, because of the universal immanence. There is thus a dualism in this contrast between the unity and the multiplicity. Throughout the universe there reigns the union of opposite which is the ground of dualism."

হোয়াইট হেড যাহাকে 'actual entities' বলিয়াছেন, তাহাকে বাংলায় 'সত্তা' বলা যাইতে পারে। সত্তার দুইটি প্রান্ত আছে, এক প্রান্তে জড় বা বস্তু, অন্য প্রান্তে মন বা ভাব। ভাবের সীমার দিকে আছে বস্তুর চিরন্তন সত্তা (eternal objects)। প্লেটো 'universal', 'Idea', or 'Form' বলিতে

যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছেন, চিরন্তন সত্তা বলিতে হোয়াইট হেড মোটামুটি তাহাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

বস্তুর ক্ষেত্রে সকল সত্তার মধ্যে যেমন একটি জৈবিক সমগ্রতা আছে, তেমনি চিরন্তন সত্তাগুলির মধ্যেও একটি জৈবিক অখণ্ডতা আছে। আবার বস্তু-জগতের সমগ্রতা এবং ভাব-জগতের সমগ্রতা একত্র মিলিত হইয়া একটি অখণ্ডতার সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপে হোয়াইট হেড সীমা ও অসীমের মধ্যে একপ্রকার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সেইসঙ্গে নিয়ত নূতন সত্তা-সৃষ্টির ভিতর দিয়া ক্রমিক উন্নততর মূল্য লাভের অর্থাৎ অভিব্যক্তির একটি দিক তাঁহার দর্শনের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ('prehension') ভিতর দিয়া জড়জগতে যেমন ভাব-জগতেও তেমনি ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে।

ঈশ্বরের মধ্যে একটি স্থির ধ্যান-রূপ আছে এবং তাহাই অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া জীবনে ও জগতে যে ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে হোয়াইট হেডের দর্শনের মধ্যে এই জাতীয় কোন উপলব্ধি নাই। তাঁহার অভিব্যক্তি তত্ত্ব কোন পরিণামের মধ্যে চরম সার্থকতা লাভ করে নাই।

জগৎ ও জীবনের পূর্ণতা সাধনের জন্য যদি পরিণামে দিব্য-সত্তার অবতরণ-কেই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে অভিব্যক্তি এবং সেইসঙ্গে মূল্যের রূপান্তরও অস্বীকৃত হইয়া যায়। কেবল দেশ-কালের স্বীকৃতির অবশেষ থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেশ-কালের অস্তিত্ব, অভিব্যক্তি ও মূল্যের রূপান্তরও স্বীকার করেন। কোনও ঈশ্বরীয় সত্তার অবতরণের কথা তিনিও যে বলেন নাই তাহা নহে (বলাকার মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। পাঁচ সংখ্যক কবিতা)। তবে রবীন্দ্রনাথের অবতরণের ক্ষেত্রে উত্তরণ ও অবতরণ একটি পরিণামে সমার্থক হইয়া উঠিয়াছে। এই জাগতিক ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-সমাজ ওই পরিণাম লাভ করিবে। জাগতিক ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটিতেছে বলিয়া সৎ-এর সহিত অসৎ সমভাবে বর্ধিত হইতেছেনা।

রবীন্দ্রনাথ তাই ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার মোক্ষকে অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি দিব্য-সমাজের সত্যতাকে স্বীকার করেন এবং তাহা জাগতিক ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া ঘটিবে।

বলাকার বাইশ সংখ্যক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কেন তিনি ঈশ্বরীয় সত্তার ওই পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে চান নাই, কিংবা ওই সত্তাই তাঁহাকে ওই পরিণাম লাভ করিতে দেন নাই তাহার এই কারণ কবিতাটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

মুক্তি বলিতে তিনি বোধ করিয়াছিলেন দেশ-কালের অন্তর্গত অন্তহীন প্রকাশের লোক হইতে বিচ্ছিন্নতা। এই পরিণাম লাভ করিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া তিনি বোধ করেন যে, মুক্তি হইল বিশ্বের সহিত পূর্ণ মিলন-অবস্থা। একান্ত আমিত্ব বোধ যেমন ব্যক্তিকে বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করে, মোক্ষও তেমনি ব্যক্তির বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্নতা। দুই-ই রবীন্দ্রনাথের অনাকাঙ্ক্ষিত। যে বোধ ব্যক্তিকে বিশ্বের সহিত মিলিত করে, যে বোধ ব্যক্তিকে বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে অপরূপের আস্বাদ লাভ ঘটায়, যে বোধ মানবিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতির মধ্যে অনির্বচনীয় রসের প্রকাশ ঘটায় রবীন্দ্রনাথ সেই বোধ লাভ করিতে চান।

আবার নূতন করিয়া বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার অনির্বচনীয় আনন্দের প্রকাশ ঘটিয়াছে কবিতাটির মধ্যে :

"একলা আপন তেজে
ছুটল সে যে
অনাদরের মুক্তি পথের 'পরে
তোমার চরণ ধুলায় রঙিন চরম সমাদরে।"

অরূপের অনির্বচনীয়তা যেমন একমাত্র রূপকে আশ্রয় করিয়া তেমনি ঈশ্বরীয় প্রেমের লীলা ব্যক্তি-সত্তাটিকে আশ্রয় করিয়া। এইভাবে ভক্তি-সাধনার এক অভূতপূর্ব দ্বার তিনি উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ইহার বিস্তারিত পরিচয় পরে লাভ করিতে পারা যাইবে। এক্ষেত্রে এই কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

এই ব্যবধান এবং এই লীলার ভিতর দিয়া তিনি ঈশ্বরকে আরো অধিক নিকটে লাভ করিয়াছেন :

"আঘাত হানি
তোমারি আচ্ছাদন হতে যেদিন দূরে ফেলাও টানি
সে-বিচ্ছেদে চেতনা দেয় আনি
দেখি বদন খানি।"

দিব্য-সত্তার অবতরণ সম্পর্কে কবির জীবনে এই কালে যে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ঘটে তিনি বলাকার একটি কবিতায় তাহার পরিচয় দান

করিয়াছেন। এই বিশ্বে তাঁহার আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী শুধু নয়, সে আবির্ভাবের কাল আসন্ন। এই বিশ্বে কোন্ মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার পূর্ণ প্রকাশ ঘটিবে? সেই দিব্য নির্বাচিত মানব কে, কোন্ সত্তার মধ্যে নীরবে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইবার জন্য সুগম্ভীর মহান্ প্রস্তুতি চলিতেছে, বিশ্বের কোন্ প্রান্তে, কোন গৃহে তাহা কবি জানেন না :

"কোন্ ঘাটে যে ঠেকবে এসে কে জানে তার পাতি,
পথহারা কোন্ পথ দিয়ে সে আসবে রাতারাতি,
কোন্ অচেনা আঙিনাতে তারি পূজার বাতি,
রয়েছে পথ চেয়ে।"

অখণ্ড শান্তির বাণী লইয়া তিনি আসিতেছেন। তাঁহারই প্রতীক রজনীগন্ধা ফুলের একটি গুচ্ছ। কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝঞ্ঝা, উৎপাত, মানবের কোন রক্তমোক্ষণকারী সংগ্রামের ভিতর দিয়া তিনি আসিবেন না। পরিপূর্ণ মাধুর্যের রূপে, 'আনমনে গান গেয়ে' লীলাভরে তাঁহার আবির্ভাব ঘটিবে। ঊষার উদয়ের মত সে আবির্ভাব হইবে একান্ত সহজ পরিপূর্ণ দিক্‌প্লাবী।

যে মানবের মধ্যে ঈশ্বরীয় সত্তার এই পূর্ণ প্রকাশ ঘটিবে, 'সে থাকে এক পথের পাশে'। সে যে যুগ যুগ লাঞ্ছিত, অবহেলিত মনুষ্যত্বের মাঝখানে কোথাও বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে, এই বিষয়ে কবির অন্তরে কোন সংশয় নাই।

তাঁহার আবির্ভাব ঘটিলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজের চেতনার ক্ষেত্রে এক বিপর্যয় ঘটিবে। একটি প্লাবিত আলোর বন্যায় স্নান করিয়া মানুষের সমগ্র সত্তা আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইবে :

"বাজবে নাকো তূরী ভেরী, জানবে নাকো কেহ,
কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ,
দৈন্য যে তার ধন্য হবে, পুণ্য হবে দেহ
পুলক-পরশ পেয়ে।"

যুগে যুগে মানুষ কতবার এই মর্ত্যের শান্তিকে ক্ষুব্ধ করিয়াছে, হিংস্রতা, বর্বরতায় পশুকে লজ্জা দিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সেই প্রতাপ বারবার ধূলায় ধূলি হইয়া বিলীন হইয়া গিয়াছে। পরম সুন্দর যিনি তিনি এই অসুন্দরকে আপন হস্তে বারবার ধুইয়া মুছিয়া দিয়াছেন। এই তো বিচার।

"হে সুন্দর
তোমার বিচার ঘর
পুষ্পবনে,
পুণ্য সমীরণে
তৃণ পুঞ্জে পতঙ্গ গুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গ কূজনে,
তরঙ্গ চুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লব বীজনে।"

মানুষের প্রতাপ যত বড়ই হোক, অত্যাচারের সৌধ যত উচ্চ করিয়া গাঁথা হোক-না-কেন, বিশ্বের অন্তর্নিহিত অখণ্ড সুষমার বিরুদ্ধ বলিয়া তাহা একদিন ভাঙ্গিয়া পড়ে; কিন্তু এই সুষমার সহিত সঙ্গত আছে বলিয়া তুচ্ছ তৃণদল, ওই কোমল একখণ্ড মাধুর্য বক্ষে অসহায় ফুল, ওই পাখির কূজন মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া এই বিশ্বে বিরাজ করিতেছে।

মানুষের নিঠুরতার প্রকাশ যত বীভৎস হোক, ঈশ্বরীয় বিচার জননীর স্নেহ রূপে, প্রণয়ীর অসীম বিশ্বাস রূপে, সতীর পবিত্র লজ্জা রূপ, বন্ধুর আত্মত্যাগ রূপে, প্রেমের প্রতীক্ষা রূপে, করুণা রূপে, ক্ষমা রূপে নিত্য প্রকাশ লাভ করিতেছে। তাহাতে প্রতি মুহূর্তে মনুষ্যত্বের বিকার ঘুচিয়া যাইতেছে।

ঈশ্বরীয় বিচার কখন রুদ্র রূপ লইয়া উদ্যত হয়। তাহাতে এক একটি মনুষ্য-সমাজ আত্মকৃত পাপের ভারে একদিন কোথায় তলাইয়া যায়।

কবির স্থির বিশ্বাস ছিল যে, মনুষ্যসমাজে এই বিপর্যয়, এই আত্মঘাতী সংগ্রাম, এই পরস্পর হানাহানি, কাড়াকাড়ি, লোভ, সংশয়ের শীঘ্রই অবসান ঘটিবে। ইহারই ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বের চিরন্তন আদর্শের প্রতিষ্ঠা হইবে। একটি নূতন সমাজ বিরচিত হইবে। একটি স্থায়ী দিব্য পরিণাম সে নিঃসন্দেহে লাভ করিবে। মানুষের পাপের শক্তি যত বড়ই হোক, মানুষের পুণ্যের শক্তি তাহার চেয়েও বড়। সেই শক্তিই পরিণামে জয়ী হইবে। এই পুণ্যের শক্তির বন্দনা-গান বজ্রদীপ্ত কণ্ঠে কবি গাহিয়াছেন:

"বলো অকম্পিত বুকে,
'তোরে নাহি করি ভয়,
এ-সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ-বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।"

এমনি বীরের মত মৃত্যু-স্বীকারের ভিতর দিয়া, এমনি সর্বস্ব সমর্পণের ভিতর

দিয়া, এমনি দুঃসহ দুঃখ-দহনের ভিতর দিয়া, মাতার, প্রেয়সীর স্নেহ অশ্রু-ধারার ভিতর দিয়া মর্ত্য-লোকে স্বর্গ-রাজ্যের নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা হইবে।

ঊর্ধ্বতর চেতনালাভের জন্য তিনি দীর্ঘকাল ধ্যাননিমগ্ন ছিলেন। সেই ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া আজ কবি নিখিল বিশ্বের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের যে রূপ প্রতিভাত হইয়াছে বলাকার দুই-একটি কবিতায় তাহার পরিচয় লাভ করা যায়।

এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের অন্তর্গত প্রতি ধূলিকণা, এই সৌরমণ্ডল, ওই অনন্ত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সমেত সমস্ত কিছুই অচিন্তনীয় বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে কোন্ শূন্যলোক হইতে মহাশূন্যে? সমস্ত কিছুই চঞ্চল, অধীর, বিরামশূন্য। আর এই বেগে, ঘূর্ণাবর্তে, পরস্পর সংঘাতে, রূপ, রস, গন্ধ, দুর্লভ চেতনা-বন্যার ধারার মত ফুটিয়া উঠিতেছে, আবার পরমুহূর্তে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত কিছু জড়াইয়া এই রহস্যের জন্যই চির পুরাতন পৃথিবী চির নবীন:

"বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু ফেনা উঠে জেগে।

* * * *

আলোকের তীব্রচ্ছটা বিচ্ছুরিয়া উঠে বর্ণস্রোতে
ধাবমান অন্ধকার হতে।
ঘূর্ণাচক্রে ঘুরে ঘুরে মরে
স্তরে স্তরে
সূর্য চন্দ্র তারা যত
বুদ্বুদের মতো।"

(রবীন্দ্রনাথ এইরূপে জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠিয়াছেন লক্ষ্য করিতে পারা যায়।)

এককালে তিনি বোধ করিয়াছিলেন (চিত্রার মধ্যে এই বোধের সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করা যায়) এই বিশ্বের অন্তরালে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লক্ষ্মী কোথায় বিরাজ করিতেছে, বিশ্বের সকল সীমিত রূপের মধ্যে তাহারই আভাস লাভ করিতে পারা যায়। তাহারই রূপের ছটায় বিশ্বের সকল রূপ বিচ্ছুরিত। বিশ্বের সকল অপূর্ণ রূপ সেই পূর্ণতাকে প্রতিনিয়ত ইঙ্গিত করিতেছে:

"সর্বনাশা প্রেমে তার নিত্য তাই তুমি ঘরছাড়া।

উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষহারে
ঘন ঘন লাগে দোলা ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি।
আঁধারিয়া ওড়ে শূন্যে ঝোড়ো এলোচুল।
দুলে উঠে বিদ্যুতের দুল।
অঞ্চল আকুল
গড়ায় কম্পিত তৃণে,
চঞ্চল পল্লব পুঞ্জে বিপিনে বিপিনে।"

বিশ্বের পরিবর্তনশীলতার মধ্যে এই অখণ্ড রূপ-কল্পনা রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে বৌদ্ধ স্পন্দবাদের উপলব্ধি হইতে স্বরূপত পৃথক করিয়াছে। কেবল তাহাই নয় এই নিরন্তর চলারও যে স্থির কোন লক্ষ্য আছে তাহারও অস্পষ্ট আভাস কবিতাটির মধ্যে লাভ করা যায়।

এই নিখিল বিশ্ব, নিখিল মানবের ভাব-লোক দ্রুত পরিবর্তিত হইতে চলিয়াছে, কোন একটি স্থির পরিণাম লক্ষ্য করিয়া।

একদিকে সমগ্র বিশ্বের চাঞ্চল্য :

"শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

অন্যদিকে ভাব-লোকের মধ্যে নিত্য অস্থিরতা :

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।"

এই সমগ্র পরিবর্তনশীলতার মধ্যে একটি পরিণাম লক্ষ্য থাকায় এই সাক্ষাৎকারের সহিত বৌদ্ধ স্পন্দবাদের স্বরূপত পার্থক্য ঘটিয়াছে।

বৌদ্ধরা জীবন-প্রবাহকে যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সেই দার্শনিক উপলব্ধিকে অত্যন্ত সংক্ষেপে এইভাবে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

জীবন কতকগুলি অবস্থার অবিচ্ছিন্ন পরম্পরা। প্রত্যেকটি অবস্থা উহার ঠিক পূর্ববর্তী অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং তাহার মধ্যে ঠিক পরবর্তী অবস্থার উদ্ভব হয়। জীবন-প্রবাহ তাই বিভিন্ন অবস্থার কার্যকারণ-শৃঙ্খলার উপর

প্রতিষ্ঠিত। জীবন-প্রবাহকে তাই প্রজ্বলিত দীপ-শিখার সহিত তুলনা করা হয়। প্রত্যেক মুহূর্তের শিখা আপনার নিজের অবস্থার উপর নির্ভরশীল এবং অন্যান্য অবস্থার উপর নির্ভরশীল অন্য মুহূর্তের শিখা হইতে পৃথক। তৎসত্ত্বেও প্রত্যেকটি বিভিন্ন শিখার মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ আছে। আবার একটি শিখা হইতে অন্য একটি শিখা প্রজ্বলিত করিতে পারা যায় এবং দুইটি শিখা পৃথক হইলেও কার্য-কারণ-সূত্রে যুক্ত, জীবনের সর্বশেষ অবস্থা তেমনি পরবর্তী জীবনের আদি অবস্থা হইতে পারে।

পুনর্জন্ম তাই আত্মার দেহান্তর গ্রহণ নয়, ইহা বর্তমান জীবন হইতে পরবর্তী জীবনের কারণ-রূপ প্রকাশ।

একদিকে চিরন্তন ভাব-লোক, অন্যদিকে রহিয়াছে চিরন্তন জড়-জগৎ। এই পরিপূর্ণ ভাব-লোকটি দেশ-কালের ভিতর দিয়া জড় জগৎকে আশ্রয় করিয়া ধীর বিকাশ লাভ করিতেছে। চিন্তা জড়-জগতের উপকরণের (Technology) দ্বারা সীমিত এবং উপকরণের ক্রমিক উন্নতির ফলে চিন্তারও ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে। এই বিকাশের কোন পরিণাম নাই, রবীন্দ্রনাথ এই দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতিকে স্বীকার করেন নাই। তবে অধ্যাত্মবাদীদের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জড় ও চেতনার মধ্যে যে বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে তাহা জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'আমি'র স্বরূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তী কাব্যে একস্থলে বলিয়াছেন, "অসীম যিনি, তিনি স্বয়ং করছেন সাধনা মানুষের সীমানায়, তাকেই বলে আমি।" মানুষের সীমানা, অর্থাৎ মনের সীমানা, মনের সীমানাই হইল দেশ-কালের সীমানা।

অসীম দেশ-কালের সীমানায় সাধনায় ব্যাপৃত। সে সাধনা হইল আপনার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে রূপের জগতে ধীরে ফুটাইয়া তোলা। দেশ-কালের এই সীমালোক না থাকিলে তিনি আপনার অন্তরের অন্তহীন সৌন্দর্য-লোককে তো প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন না।

ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কেও এ কথা সত্য। বিশ্ব-সত্তার অন্তহীন মাধুর্য-লোকের কোন প্রকাশই ঘটিত না, যদি ব্যক্তি-চেতনায় তাহা প্রতিফলিত না হইত। ব্যক্তি-প্রেমে বিশ্বের নিকট ধরা দিয়াছে বলিয়া ব্যক্তির চিত্ত-লোকে বিশ্বের মাধুর্য অফুরন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে। আর সেই প্রকাশের ভিতর দিয়া বিশ্ব আপনাকে নানারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছে। মানব-প্রেম এইরূপে বিশ্বকে তাহার

অপার ঐশ্বর্য ফিরিয়া দান করিতেছে। ব্যক্তি-সত্তার বিকাশের, তাহার প্রেমের প্রসারতার নানা ক্রম আছে। যে সত্তা যত বেশি বিকশিত বিশ্বের মাধুর্য তাহার ভিতর দিয়া তত বেশি প্রকাশ লাভ করে।

এই শ্রেণীর কয়েকটি কবিতা বলাকার মধ্যে আছে। এই কবিতা কয়েকটির মধ্যে তিনি ব্যক্তি-সত্তা বা 'আমি'র একটি বিশিষ্ট মূল্য নিরূপণ করিতে চাহিয়াছেন।

ইতিপূর্বে গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কাব্য রচনা পর্যায়ে কবি 'আমি'র নিঃশেষ বিলুপ্তির জন্য আকাঙ্ক্ষার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন। ওই কালে তিনি নিঃসংশয়ে বোধ করেন যে আমিত্ব বোধের লেশমাত্র থাকিতে দিব্য-চেতনা লাভ অসম্ভব। অন্তত স্থায়ীরূপে তাহাকে লাভ করিতে পারা যায় না। যে কারণেই হোক কবি পরিশেষে আপনার জীবনে ওই পরিণাম চিহ্নিত করিতে চান নাই। অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তিকে অস্বীকার করিয়াছেন।

ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের সহিত প্রেমে যে বিচিত্র লীলা তাহার আনন্দ কবির নিকট অনেক বেশি আকাঙ্ক্ষিত। ব্যক্তি-সত্তার নিঃশেষ অবসান কবি যে-কোন পরিণামে আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা যেন ঈশ্বরীয় সত্তার সহিত প্রেমে চিরকাল যুক্ত থাকে। প্রেম পার্থিব সকল ত্রুটিও অসম্পূর্ণতাকে সকল পাপ-তাপকেও বুক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য সদা উন্মুখ।

মানব-সত্তা ঈশ্বরের এক অপরূপ সৃষ্টি। ইহার বিনষ্টি তাঁহারও আকাঙ্ক্ষিত নয়। তাঁহার আপন সৃষ্টি, মানব প্রেমে অনুরঞ্জিত হইয়া অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়া এক দুর্লভ মহিমা লাভ করে। মানব-সত্তা রবীন্দ্র-কাব্যে তাই এক আশ্চর্য মূল্য লাভ করিয়াছে।

মানব কণ্ঠস্বর সঙ্গীতে সমুৎসারিত হইয়া মর্ত্যে এক অপরূপ লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। মানুষ বিচিত্র বন্ধনে বাঁধা। এই সকল বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই তো তাহার সাধনা। এই তপশ্চর্যার প্রকাশ বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে আর কোথাও নাই। দুঃখের দান মানব অন্তরে কোন অলৌকিক রহস্যের বশে আনন্দে পরিণত হয়। এমন করিয়া প্রেমে বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করিতে মানব-সত্তা ছাড়া আর কে পারে? মানব-সত্তাই এই শ্রীহীন বিশ্বে মাধুর্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। এই স্বর্গ-লোক রচনা করিতে মানুষ ছাড়া আর কে পারিত!

এমনি করিয়া ঈশ্বর আপনার দানকে ব্যক্তি-সত্তার ভিতর দিয়া শতগুণ করিয়া ফিরিয়া লাভ করিতেছেন। ব্যক্তি-সত্তার বিলুপ্তি তাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়।

"মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।"

কিংবা

"যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে তো হয় নি তোমার দেখা।
* * * *
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।"

এই 'আমি' নিঃসন্দেহে কবির ব্যক্তি-আমি নয়। এই আমি দেশ-কালের মধ্যে অভিব্যক্ত চেতনা যাহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, 'বিশ্ব-আমি'। তাঁহার এই 'অহঙ্কারবিশ্ব-মানবের হয়ে'। সীমা-অসীমের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে বলিয়া তো ব্যবধানের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া নিত্য এত গান উৎসারিত হইতেছে। পরস্পরকে লাভ করিবার জন্য তাই এত ব্যাকুলতা। প্রেমে এই যে উৎসুক অধীরতা, এই যে পথ চাওয়া, এই যে ব্যথা মাধুরিমা ইহার কোন প্রকাশ তখন তাঁহার মধ্যে ছিল না, যখন তিনি এই সীমা-লোক সৃষ্টি করেন নাই। নিখিল বিশ্বের মধ্যে এই যে অন্তহীন রূপের প্রকাশ তাহা তিনি ইতিপূর্বে তো প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই। এই রূপ-লোকের অন্তহীন সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া তাঁহার আনন্দ নিঃসীম হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।

মানবিক প্রেমের মধ্যে যে ব্যাকুল উৎকণ্ঠা, অধীরতা, যে অপার আনন্দ-বেদনার যুগপৎ লীলা তাহা তাঁহার পরম আকাঙ্ক্ষার ধন বলিয়া তিনি এই 'আমি'র সৃষ্টি করিয়াছেন। এই প্রেমে তিনি আপনাকেই ক্রমাগত গভীর করিয়া উপলব্ধি করিতেছেন।

তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে মানুষ লাভ করিতে পারিতেছে না। মায়ার এই আবরণ আছে বলিয়া মানুষের অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখী। এই ব্যবধান রচিত করিয়া মানব-প্রেমের এই অপূর্ব প্রকাশ দেখিবার জন্য তাঁহার কৌতূহলের সীমা নাই।

ঈশ্বর মানব-অন্তরের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশের ঐশ্বর্যকে নিত্য নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতেছেন।

"এমনি করেই হবে
এ ঐশ্বর্য তব
তোমার আপন কাছে, প্রভু, নিত্য নব নব।"

অন্তহীন রূপ-লোক লইয়া সমগ্র দেশ-কালের মধ্যে ঈশ্বরের একটি ধ্যান-রূপ ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে। বিশ্ব-আমির যোগে ব্যক্তি-আমিরও এমনি একটি প্রকাশের ধারা আছে। বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া লোক হইতে লোকান্তর লাভের ভিতর দিয়া কবির বিশিষ্ট ব্যক্তি-সত্তার অমনি ধীর উন্মোচন ঘটিতেছে। নিখিল বিশ্বের মধ্যে আপনার ধ্যান-রূপকে রূপায়িত করিবার মধ্যে যদি তাঁহার আনন্দ থাকে, তবে ব্যক্তি-আমির এই ধীর প্রকাশের ভিতর দিয়া তাঁহার একটি বিশিষ্ট আনন্দ-রস চরিতার্থ হইতেছে।

"জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস সরোবরে

*　　　*　　　*

তোমার লাজুক স্বর্গ আমার গোপন আকাশে।
একটি করে পাপড়ি খোলে প্রেমের বিকাশে।"

বিশ্বের নিত্য চলমান স্রোতের উঠা-নামা, ভাঙ্গা-গড়ার ভিতর দিয়া ইহার প্রকাশ চির নবীন হইয়া আছে। এই নিত্য রূপান্তরের জন্য বিশ্ব এমন অপরূপ, তাহার সৌন্দর্য-মাধুর্যের তাই অন্ত নাই।

যাহাকে ভালবাসিয়া একদিন এই পৃথিবীকে অপূর্ব সুন্দর দেখিয়াছিলাম, যাহার মাধুরী বিশ্বের সকল মাধুর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছিল, যাহার প্রকাশ এত সত্য, এমন নিবিড়, এমনি একান্ত, মৃত্যুতে সেই দুর্লভ সত্তার একান্ত বিনষ্টি ঘটে? এই জীবনে, এই জগতে তাহার কি কোন অবশেষ থাকে না? যাহা হারাইয়া যাইতেছে, তাহা চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইতেছে? বিশ্বের আর সব সত্য হইয়া বিরাজ করে, ওই গ্রহনক্ষত্রের চুমকি-লাগান নীল আভরণ, ওই তৃণের শ্যামলিমা, ওই পাখির কলকাকলি, ওই প্রভাত ও সন্ধ্যা, গৃহে গৃহে নর-নারীর বিচিত্র কর্মপ্রয়াস, আর সেই শুধু মিথ্যা হইয়া যায়?

যে উপলব্ধির ভিতর দিয়া কবি তাঁহার এই জিজ্ঞাসা ক্ষুব্ধ অন্তরকে শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন, সেই উপলব্ধির পরিচয়ও কবি দান করিয়াছিলেন।

মৃত্যুতে দেহ-রূপের হয়ত বিনষ্টি ঘটে ; কিন্তু প্রেমের ধ্যানের মধ্যে তাহার দিব্য-রূপ ফুটিয়া উঠে। এই দিব্য-রূপাশ্রয়ী প্রেমের নিগূঢ় প্রভাব জীবনের সর্বত্র ক্রিয়া করে। এমনি করিয়া ধ্যানের মধ্যে আমরা তাহাকে ফিরিয়া লাভ করি বলিয়া পৃথিবীর মাধুর্য অটুট থাকে, হয়ত করুণ প্রশান্তির ভিতর দিয়া তাহা অধিকতর মধুর হইয়া ধরা দেয়।

> "তোমারে পেয়েছি কোন্ প্রাতে,
> তারপরে হারায়েছি রাতে।
> তারপরে অন্ধকারে অগোচরে তোমারেই লভি।"

এই জাতীয় উপলব্ধির একপ্রকার বিপরীত প্রেরণার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়, ইহার ঠিক পরবর্তী কবিতার মধ্যে।

প্রাণ-সমুদ্রে মুহূর্তে কলহাস্য তুলিয়া সংখ্যাতীত রূপ বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিতেছে, আবার মুহূর্ত পরে তাহারা সকলে একে একে রূপের দীপ নিভাইয়া অন্ধকারে কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। মনুষ্য-সমাজের মধ্যেও এই একই লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। একদিনের ঐশ্বর্য প্রতাপ আর একদিন তাহার চিহ্নমাত্রও থাকে না। আজ যাহারা সংসার জুড়িয়া আছে কাল তাহারা কোথায় হারাইয়া যায়। সুদূর অতীতকাল ধরিয়া কত নর-নারী এই মাটির ধরায় মাটির ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, পরস্পরকে ভালবাসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, আজ তাহারা কোথায়! সমুদ্রের ঢেউ-এর চিহ্ন সমুদ্রের ঢেউএ মুছিয়া যায়। প্রাণের প্রকাশের জন্য প্রাণকে পথ করিয়া দিতে হয়।

মানুষের মন তবু এই নিয়তিকে মানিয়া লইতে চায় না। তাহার প্রেম এই মৃত্যুকেও জয় করিয়া উঠিবার বারংবার ব্যর্থ চেষ্টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছে। মানুষ মাত্রেরই এই আকাঙ্ক্ষা। আমি একদিন এই পৃথিবীতে থাকিব না ; কিন্তু আমার এমন প্রেম, যে প্রেম অন্তহীন মাধুর্যের লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, যাহা আমার নিকট বিশ্বের সকল সত্তার চেয়েও সত্য, তাহার কোন চিহ্নই এই পৃথিবীতে থাকিবে না? মানুষ তাই তাহার বিচিত্র সৃষ্টি কর্মের ভিতর দিয়া তাহার এই প্রেমকে বিশ্বের কাছে প্রচার করিতে বসে।

শাজাহান তাঁহার প্রেমকে তাজমহলের ভিতর দিয়া অমনি বিশ্ববাসীর কাছে অপরূপ করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার প্রেমকে তিনি অমনি করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু আনন্ত্যের দিক হইতে জীবনকে যখন প্রত্যক্ষ করি তখন জীবনের আর এক রূপ ফুটিয়া উঠে।

আমাদের জীবন তো এই জগতে একমাত্র এই রূপেই শেষ হইয়া যায় না। আমাদের জীবন লোক হইতে লোকান্তরে অনন্ত বিস্তৃত। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া বারংবার রূপ লাভ করিয়া মানবাত্মা লোক হইতে লোকান্তরে তাহার অনন্ত যাত্রাপথ পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে। সেই চলার শেষ নাই।

সেখানে এক জীবনের সঞ্চয়, এক হাটের বোঝা তাহাকে অন্য জীবনে অন্য হাটে শূন্য করিয়া দিতে হইতেছে। জীবনে আবার নূতন সঞ্চয় ভরিয়া উঠিতেছে। এই পাওয়া ও হারানোর লীলারও শেষ নাই।

এই জীবনে যে প্রেম শাজাহানকে অপার্থিব আনন্দদান করিয়াছিল তাহারই মূর্ত্য প্রকাশ এই তাজমহল সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা শাজাহানের অনন্ত জীবন-বিকাশের একটি ক্ষণ-পর্যায়ের পরিচয় বহন করিয়া আছে মাত্র।

মানুষ তাহার কীর্তির চেয়ে বৃহৎ। এমনি করিয়া জন্মে জন্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপ লাভ, ভিন্ন ভিন্ন লোকান্তর-প্রাপ্তির ভিতর দিয়া মানুষ বারংবার তাহার কীর্তিকে পশ্চাতে ফেলিয়া ফেলিয়া দিতে চলিয়াছে। এমনি করিয়া তাহার আত্মা ক্রমাগত ফলবান হইয়া উঠিতেছে।

'বলাকা'র মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে, যেগুলির মধ্যে কবির ব্যক্তি-জীবনের সহিত বিজড়িত হইয়া নানা তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা রূপ লাভ করিয়াছে।

নিখিল বিশ্বের চলমান ছবি, ব্যক্তি-সত্তার লোক-লোকান্তর ব্যাপ্ত মহিমা প্রত্যক্ষ করিয়া কবি ব্যক্তি-জীবনের আসক্তি জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন। জীবনের এই কান্না, কেন, না, আমার সুদীর্ঘ জীবনের সঞ্চয়, পরিচিত এই ভুবন, এই সব প্রিয়জন মৃত্যুতে সব পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়।

জীবন যদি লোক-লোকান্তর ব্যাপ্ত অনন্ত প্রসারিত হয়, তবে এক জন্মের ত্যাগের ভিতর দিয়া আর জন্মের প্রাপ্তির আনন্দকে লাভ করিতে হয়। তাহা না হইলে আসক্তি একান্ত হইয়া জীবনকে পরিণামে কেবল বিকৃত করে মাত্র।

লোকান্তর যদি নাও থাকে তবে নূতন সৃষ্টির জন্য পুরাতন সৃষ্টিকে বারংবার ছাড়াইয়া উঠিতে হয়। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে তো আমরা এই চির-পুরাতন অথচ চির-নবীন লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পাই। বিশ্ব-প্রকৃতি জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে ঝরাইয়া দিয়া নূতনকে বরণ করিয়া লইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের এই নিগূঢ় সত্যকে আপনার জীবনে রূপলাভ করিতে দেখিয়াছেন। পরিণত বয়সে আসক্তির প্রবলতা বাড়ে, কারণ সৃষ্টির প্রেরণা

ক্ষীণ হইয়া আসে। কবি এই সত্যাশ্রয়ী হইয়া আসক্তির বিকৃতিকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। জীবনের প্রতিক্ষণে যাহা সত্য, মৃত্যুতে তাহা মিথ্যা হইতে পারে না।

"যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।"

মর্ত্যে মানব-সত্তার এই যে দুর্লভ প্রকাশ, তাহার স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, অধীরতা ও উৎকণ্ঠা, সৌন্দর্য-বিহ্বলতা, বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের এই যে নিবিড় একাত্মতা—ইহাকে কোন তত্ত্ব-সাধনার দিক হইতে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। উপলব্ধির গভীরতা ও প্রসারতার ভিতর দিয়া ইহা আপনার সত্য মূল্য নিঃসংশয়ে আদায় করিয়া লয়।

মৃত্যুতে এই জীবনের অবশেষ কোন স্বরূপে কিছুমাত্র থাকে না। (মৃত্যুতে জীবনের পরিণাম সম্পর্কে বিচিত্র দার্শনিক চিন্তা আছে। এই জাতীয় কোন চিন্তা কোন উপলব্ধিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই।) মৃত্যুতে জীবনের নিঃশেষ অবসানকে স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহা যত নির্মম হোক এবং তাহা অন্তরে যত বড় বিক্ষোভ সৃষ্টি করুক ঃ

"এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।"

কিন্তু এই উভয়ের মাঝখানে কোন একটি মিল কোন স্বরূপে যে আছেই এমন একটি অধ্যাত্ম প্রত্যয়ও কবির অন্তরে চিরকাল ছিল।

"এ দুয়ের মাঝে তবু কোনো খানে আছে কোনো মিল,"

এই দুয়ের মিলনের রহস্যভেদ মানুষ হয়ত কখনই করিতে পারিবে না, কিন্তু এই যোগের সত্যতা না থাকিলে এই প্রয়াসের ভাবনাও আদৌ মানবচিত্তে যে জাগিত না তাহাও নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মানুষের মধ্যে যে একটি স্থায়ী সত্তা আছে, তাহাতে রবীন্দ্রনাথের মনে কখন কোন অবস্থায় সংশয় জাগে নাই। তাঁহাকে তিনি তাঁহার জীবন-তরীর হালের মাঝি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ঠিক স্বরূপটি তিনি জানেন না। তবে তিনি যে তাঁহার জীবনকে সকল জন্ম সকল মৃত্যুর ভিতর দিয়া বহিয়া লইয়া চলিয়াছেন এই গভীর বিশ্বাস বোধ তাঁহার ছিল। এই জীবনের বিচিত্র বাসনা-বন্ধনকে যদি স্বেচ্ছায় আমরা ছিন্ন না করি তবে মৃত্যু আসিয়া অনিবার্যরূপে সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া দেয়।

এই বিশ্বাস বুকে লইয়া সকল গভীর অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া কবি জীবন-লীলায় মাতিয়া উঠিয়াছেন :

"এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু-দিনের নদী হব পার গো।
তারপরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা
ভাসিয়ে দেব ভেলা,
তারপরে তার খবর কী যে ধারিনি তার ধার গো,
তারপরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।"

কিন্তু এত করিয়াও কবি বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিতে পারেন নাই।

মৃত্যুতে মানুষ কোন্ পরিণাম লাভ করে? জীব-সত্তার যদি অবশেষ থাকে তবে তাহা কোন্ স্বরূপে? মৃত্যুর পর মানুষ যে-লোক লাভ করে তাহা কি এই জগতের স্বরূপ লইয়া প্রতিভাত হয়? এই জগতেরই মত এমনি করিয়াই কি সেখানে ধীরে ধীরে পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠে? অসীমের সহিত তাঁহার এই যে লীলা, তাহা ওই লোকে কি ভিন্ন কোন স্বরূপতা লাভ করে? অজ্ঞাত জগৎ, অজ্ঞাত পরিণাম সম্পর্কে বিচিত্র জিজ্ঞাসা কবিকে আবার বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে :

"কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাবে সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ।"

মৃত্যুতেই কি জীবনের পরিবর্তন ঘটে? এই জীবনেই কি আমরা সহস্র পরিবর্তন লাভ করিতেছি না। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে বার্ধক্যে পরিবর্তনের এমনি কত-না পর্যায় আমরা পার হইয়া আসি। মৃত্যুতে আমরা

এমনি আর একটি পরিবর্তন লাভ করি মাত্র। মৃত্যু যদি জীবনের একটি পরিণামই হয়, শুধু কেবল একটি ভিন্ন লোক লাভ, তবে পশ্চাতে যাহা পড়িয়া থাকে, যাহাকে ফেলিয়া যাইতে হয় তাহার মূল্য কি ?

মৃত্যুকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইবার জন্য প্রস্তুতির ভিতর দিয়া কবির অন্তরে এই জিজ্ঞাসাও জাগিয়াছে :

“এই জনমের এই রূপের এই খেলা
এবার করি শেষ।
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।
যাবার কালে মুখ ফিরিয়ে পিছু
কান্না আমার ছড়িয়ে যাব কিছু।”

জীবনের এই যখন নিয়তি, তখন কিছু অশ্রুপাত করা ছাড়া আর কি উপায় থাকিতে পারে। এই অশ্রুপাত তো এই জীবনেই শুধু সত্য নয়। এমনি অশ্রুপাত করিতে করিতে আমরা অতীতে কত জীবন পরিক্রমা করিয়াছি, ভবিষ্যতে অনন্ত জীবন-পরিক্রমার ভিতর দিয়া এমনি করিয়া অশ্রুপাত করিতে করিতে আমাদের যাইতে হইবে :

“সামনে সেও প্রেমের কাঁদন ভরা
চির নিরুদ্দেশ।”

এই দেহ-বীণাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার কত বিচিত্র সুর বাজাইয়াছে, অন্তরে কত বোধের সঞ্চার করিয়াছে, কত অপূর্ব অনুভূতি। মৃত্যুতে এই দেহ-বীণাকে এইখানে ফেলিয়া যাইতে হয়, কিন্তু এমনিভাবে অন্তরের মধ্যে যে একটি স্থায়ী সত্তা গড়িয়া উঠে তাহার বিনাশ ঘটে না :

“এত কালের সে মোর বীণাখানি
এই খানেতেই ফেলে যাব জানি,
কিন্তু ওরে হিয়ার মধ্যে ভরি
নেব যে তার গান।”

মৃত্যুতে যে-লোক যে-পরিণাম তিনি লাভ করুন না কেন, যিনি তাঁহার সত্তাকে এমনিভাবে নানা জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া বহন করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, যিনি এই পৃথিবীকে পরিচিত করাইয়াছেন, ইহাকে ভালোবাসাইয়াছেন—

যাঁহার কত বারবার চকিত স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, মৃত্যুর পর তাঁহাকেই তিনি ফিরিয়া লাভ করিবেন, অপরিচিত জগৎকে তিনিই মাতৃ-ক্রোড়ের মত পরিচিত করাইয়া দিবেন :

"সে-গান আমি শোনাব যার কাছে
নূতন আলোর তীরে,
চিরদিন সে সাথে সাথে আছে
আমার ভুবন ঘিরে।"

সীমা ও অসীমের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণ করিতে গিয়া বিচিত্র ধর্ম ও দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথও নানা চিন্তা-পদ্ধতি, নানা উপলব্ধি আশ্রয় করিয়া এই উভয়ের যোগের রহস্য উদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইতিপূর্বে আমরা ইহার নানা পরিচয় লাভ করিয়াছি, পরেও ইহার নানা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

'বলাকা'র মধ্যে যে তত্ত্ব-দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া রবীন্দ্রনাথ সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করেন তাহাকে আমরা লীলা-তত্ত্ব বলিতে পারি। একদিকে অসীম, আর একদিকে সীমা। উভয়ের শাশ্বত মূল্য তিনি স্বীকার করেন। ব্যক্তি-সত্তা বারংবার জন্ম-মৃত্যুর ভিতর দিয়া অসীমকেই নানারূপে লাভ করে। ইহাই লীলা। ইহা একই রূপের, একই রসের পুনরাবৃত্তি নয়। ইহার ভিতর দিয়া জীব ক্রমিক উন্নততর পরিণাম, সেই সঙ্গে আনন্দের ক্রমিক গভীরতর আস্বাদ লাভ করিয়া চলিয়াছে।

এই যে নির্দিষ্ট একটি দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া তিনি এই পর্যন্ত নানাভাবে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিয়াছেন, 'বলাকা'র মধ্যেই এমন দুই একটি কবিতা লাভ করা যায়, যে-ক্ষেত্রে কবি-প্রাণের আর্তিতে এই সকল দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতি উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। বস্তুত সীমা-অসীমের ও যোগের রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারা যায় না। মানুষের জ্ঞান, মানুষের উপলব্ধি এখানে আসিয়া শেষ সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে।

দার্শনিক চিন্তার দুইটি ধারা আছে। একটির মতে চিন্তা কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ-কাল এবং নির্দিষ্ট সমাজ-রূপের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত, তাহারই ফল। এই জাতীয় অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট কোন একটি চিন্তার সম্যক্ পরিচয় দান করিতে সমসাময়িক সমাজ-রূপ, উপকরণ

প্রভৃতির পরিচয় দানকে অনিবার্য করিয়া তুলেন। আর এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, যাঁহারা চিন্তাকে দেশ-কাল-সমাজনিরপেক্ষ বলিয়া বোধ করেন। এই দুই বিশিষ্ট দার্শনিক চিন্তাধারার বিস্তারিত পরিচয়-দান এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ দার্শনিকভাবে যে বিশ্বাস পোষণ করিতেন, তাহাতে এই উভয়েরই আংশিক স্বীকৃতি আছে। পূর্ণতার একটি ধ্যান দেশ-কালের ভিতর দিয়া ধীরে চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে। এই উপলব্ধির ফলে দেশ-কাল নিরপেক্ষ অধ্যাত্ম সত্তার স্বীকৃতি যেমন আছে, তেমনি দেশ-কালের ভিতর দিয়া তাঁহারই ধ্যান ধীরে চরিতার্থতা লাভ করিতেছে বলিয়া নির্দিষ্ট সমাজ-রূপ ও উপকরণেরও অনিবার্য স্বীকৃতি আছে। এইরূপে জড় ও অধ্যাত্মের দ্বন্দ্বকে তিনি জয় করিয়া উঠিয়াছেন।

এক্ষেত্রে ইহা উল্লেখের কারণ এই যে, বলাকার মধ্যে এমন দুই-একটি কবিতা আছে, যে ক্ষেত্রে চিন্তা বা সৃষ্টি-প্রেরণা সম্পূর্ণ ভাবাত্মক হইয়া দেশ-কালের অনুপ্রেরণাকে অস্বীকার করিতে চাহিয়াছে। চিরন্তন ভাবনা-লোক, আদর্শ ও কল্পনার জগতের সহিত বস্তুজগতের, তাহার রূপান্তরের যেন কোন মিল নাই। তাঁহার সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন ঃ

"মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে।"

মূল নাই, অর্থাৎ দেশ-কালের নির্দিষ্ট কোন সমাজ-রূপের অনুপ্রেরণা হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। তাঁহার সৃষ্টির অনুপ্রেরণা সম্পূর্ণ ভাবাত্মক। সম্পূর্ণ ভাবাত্মক বা নির্বিশেষ বলিয়া সকল কালের, সকল দেশের নর-নারীর হৃদয়-লোকে তাহা স্থান লাভ করিতে পারিবে।

সার্থক সৃষ্টির সহিত অনিবার্যরূপে দেশ-কালের পরিচয় বিজড়িত হইয়া থাকে কি-না, নির্বিশেষ রস-পরিণামের ক্ষেত্রেও আদিতে একটি বিশেষ আশ্রয়ের অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনীয়তা আছে কি-না, ইত্যাদি বিচার এক্ষেত্রে তুলিয়া লাভ নাই। কবির উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিলেই আমাদের চলিবে। তাঁহার এই উপলব্ধির পরিচয় অন্যত্রও লাভ করিতে পারা যায়।

একটি চিরন্তন বস্তু জগৎ। আর একটি চিরন্তন ভাব-লোক।—সকল দেশের, সকল অতীত-ভবিষ্যতের ভাবনার সামগ্রিক প্রকাশ। এই ভাব-লোকের মধ্যে রূপ-পরিগ্রহ করিবার একটি ব্যাকুলতা আছে। এই আকাঙ্ক্ষার বশে তাহারা

বস্তু বা জড় জগৎকে আশ্রয় করিতে চায়। মানুষের সমাজ, গ্রাম-নগর রচনার মধ্যে সেই অমূর্ত্য ভাবনার মূর্ত্য রূপই ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেবল জড়-রূপের মধ্যেই নয়, ওই ভাব-ভাবনার প্রকাশ ঘটে কবির কাব্যে, সকল প্রকার সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে। কবির অন্তরে যে সকল ভাব-ভাবনা তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিতে পারিতেছে না, সেই সকল ভাব-ভাবনা বিশ্বের চিরন্তন ভাবনা-স্রোতের সহিত মিলিত হইয়া আর কোন ব্যক্তিত্ব আশ্রয় করিয়া প্রকাশ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে :

"অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহার কোন্ হর্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।"

একদিকে চিরন্তন ভাব-লোক, অন্যদিকে চিরন্তন বস্তু-জগৎ। উভয়ের মধ্যে আসা ও যাওয়ার, ভাঙা ও গড়ার চিরন্তন লীলা। এইরূপে জড় ও অধ্যাত্ম জগৎ দুইটি বিরুদ্ধ তত্ত্ব হইয়া উঠিয়াছে। অভিব্যক্তি-তত্ত্ব-সূত্রের সহিত গ্রথিত করিয়া তিনি ইতিপূর্বে এই দ্বন্দ্বকে যেভাবে জয় করিয়া উঠিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা এক্ষেত্রে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

সৃষ্টি-প্রেরণাকে কবি এই জীবন-পর্যায়ে কতদূর ভাবাত্মক করিয়া তুলিয়াছেন তাহার আরও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

পার্থিব জীবনের সমস্ত কিছুই, তাহার মূল্য যেমনই হোক-না-কেন, একদিন বিনষ্ট হইয়া যাইবে। বাণী বা ভাষা-বন্ধনে সৃষ্ট কবির কাব্যও অনন্ত কাল-প্রবাহে একদিন লুপ্ত হইয়া যাইবে। যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, যাহা কিছু রূপ-লব্ধ তাহা কালে হারাইয়া যায় :

"নিজ হতে তব হাতে যাহা দিব তুলি
তারে তব শিথিল অঙ্গুলি
যাবে ভুলি,
ধূলিতে খসিয়া শেষে হয়ে যাবে ধূলি।"

কবির চেতনায়, তাঁহার সৌন্দর্য-কল্পনা ও ধ্যানের ভিতর দিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে যে দিব্য-চেতনার আভাস নামিয়াছে, সেই অলৌকিক আনন্দ-প্রেরণায় কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন :

"আমার যা শ্রেষ্ঠধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে
দেখা দেয় মিলায় পলকে।"

এই দিব্য-প্রেরণা তাঁহার জীবনে সত্য, কিন্তু তাহাকে তিনি স্থায়িরূপে লাভ করিতে পারেন নাই। এই অনুপ্রেরণা তাঁহার জীবনে অনিয়ন্ত্রিত। মর্ত্য-চেতনায় তাহা উপলব্ধি করিবার কোন উপায় নাই। তাহা বাক্য ও মনের অগোচর ঃ

"সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত নাহি যায় বাণী।"

দিব্য-চেতনা যদি সকল মানবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হইয়া থাকে, তবে তাহাকে মানুষ আপনার ভাবে আপনি নানা পথে চিরকাল ধরিয়া লাভ করিতে থাকিবে। কোন ব্যক্তি তাহার জন্য নির্দিষ্ট কোন পথ নির্দেশ করিয়া তাহাতে আপনার নাম অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে না ঃ

"বন্ধু, তুমি সেথা হতে আপনি যা পাবে
আপনার ভাবে
না চাহিতে না জানিতে সেই উপহার
সেই তো তোমার।"

দিব্য-চেতনাকে কাহারও 'নাম' বা সীমা-রূপের দ্বারা চিহ্নিত করা যাইবে না, তাহা চিরন্তন কালের সর্ব মানব সাধারণ শাশ্বত সত্তা ঃ

"সেই আলো অজানা সে উপহার
সেই তো তোমার।"

কবিতাটির মধ্যে 'আমার পুষ্পবনে' এবং 'বীথিকায় মোর' শব্দ কয়েকটি লক্ষণীয়। কবির কাব্যে যে রূপের পরিচয় আছে তাহা বিশেষ, কিন্তু এই বিশেষ সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া তিনি যে দিব্য-চেতনার স্পর্শ লাভ করিয়াছেন, তাহা নির্বিশেষ। ওই বিশেষ রূপ বিনষ্ট হয়, কিন্তু ওই নির্বিশেষ সত্তার বিনাশ নাই।

বিশ্বের দুইটি স্বরূপের কথা কবি নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন। ইহা মানুষেরই দুইটি সত্তা। মানুষ আপনার স্বরূপকেই বিশ্বে প্রতিফলিত দেখে। একটি সত্তায় সে বহির্মুখী, বিশ্বের রূপ হইতে রূপে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া সে বিহার করিয়া চলে অন্তহীন রূপ-পিপাসা বক্ষে লইয়া তাহার দিন-রজনী স্বপ্নবিভোর

হইয়া কাটিয়া যায়। তাহার নিঃসংশয় নিশ্চিন্ত কোন পরিণাম নাই। কেবল মাধুর্যের দোলায় দোল খাইতে খাইতে কোন্ অতলতার মধ্যে তলাইয়া যাওয়া। সে নারীর অপরূপ রূপ যেন বিশ্বময় কেমন করিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে তাই তাহারই আভাস লাভ করিতে পারা যায়। বিশ্বের সকল রূপের ভিতর দিয়া তাহারই গোপন আহ্বান নিয়ত ব্যক্ত হইতেছে। কখন মিনতিবিজড়িত অশ্রুসজল, কখন কৌতুকময় নিষ্ঠুর, কখন একান্ত নিকটের, পরমুহূর্তেই আবার কোন্ দূরলোকের। সে ক্ষণে ক্ষণে নূতন, একান্ত মুহূর্তের জন্য স্পর্শ করিয়া চকিত কলহাস্য তুলিয়া কোন্ শূন্যতার মধ্যে হারাইয়া যায়, সুদূর নীলিমা ব্যাপ্ত করিয়া তাহার নূপুর-সিঞ্জনের অতি ক্ষীণ অনুরণন যেন তখনও ধ্বনিত হইতে থাকে। তাহাকে পরিপূর্ণরূপে লাভ করিবার বাসনা অন্তরে সঞ্চারিত হইয়া যায়। কিন্তু তাহাকে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। সেইজন্যই তাহাকে ঘিরিয়া এত বিস্ময়, এত রহস্য···অপরিতৃপ্ত বক্ষের হাহাকার ও কান্নার উদ্বেলতা।

আর একটি সত্তায় পুরুষ অন্তর্মুখী বিশ্বের কল্যাণের জন্য সেখানে সে তপস্যা-নিরত যেখানে পরম স্থৈর্য অচঞ্চল মাধুর্য। এই অচঞ্চলতাকে আশ্রয় করিয়া মানুষের হৃদয়-লোকে অনন্তের বিচিত্র আস্বাদ আসিয়া পৌঁছায়। ওই অবিক্ষুব্ধ ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া তাহার চেতনা মর্ত্যের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া যায়।

এই নারী-পুরুষের সমগ্র বহির্মুখী চেতনাকে অন্তর্মুখীন করিয়া তাহাকে একটি বিশিষ্ট সৌন্দর্যাশ্রয়ী করিয়া ধ্যান-তন্ময় করিয়া তুলে। এখানে আছে সেবা, আত্মত্যাগ, উৎসুক প্রতীক্ষা, সেই দুঃখ যাহার বক্ষের মধ্যে অমৃত লুকান থাকে।

'বলাকা'র ২৩ সংখ্যক কবিতার মধ্যে কবি নারীর এই যে দুইটি রূপের বন্দনা করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে বিশেষ করিয়া চিত্রার মধ্যে লাভ করিয়াছি। সেক্ষেত্রে এই দুইটি সত্তা স্পষ্ট পৃথক বলিয়া বোধ হইলেও এই দুইটি কোন এক চেতনা-বৃন্তে বিধৃত কি-না, তাহার জন্য কবির পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। এই দুইটি সত্তাকে একটি নারীর মধ্যে একত্রে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাও গভীর হইয়া দেখা দিয়াছে। কারণ, পুরুষের চেতনায় এই দুই আপাত-বিরুদ্ধ প্রেরণাও ওতপ্রোত হইয়া আছে। কোন একটিতে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া পুরুষের অন্তরের পূর্ণ পরিতৃপ্তি ঘটে না। 'মানস সুন্দরী' কবিতার মধ্যে

যে নারী-সত্তায় তিনি এই উভয় প্রেরণার আশ্চর্য সমন্বয়সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা আজ একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া সেই সাধনাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে।

আজ বিশ্বের প্রাণ-লীলায় কবি-প্রাণ তেমন করিয়া সাড়া দিতে পারে না। নিখিল বিশ্বের প্রাণধারা সৌন্দর্য-মাধুর্য রূপে বাহিরে প্রকাশ পায়। ব্যক্তি-হৃদয়ে এই সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিবিড় অনুভূতির ভিতর দিয়া ধীরে ব্যক্তির প্রাণ বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় আসিয়া মিলিত হয়।

কবি-চিত্তে সেই প্রাণের উদ্বোধন আর তেমন করিয়া ঘটে না। হৃদয়ে তাহা কেবল অতি ক্ষীণ একপ্রকার বেদনাহত শিহরণ জাগাইয়া তুলে মাত্র ঃ

"দক্ষিণ হাওয়া ক্ষণে ক্ষণে দিল কেবল দোল
উঠল কেবল মর্মের কল্লোল।
এবার শুধু গানের মৃদু গুঞ্জনে
বেলা আমার ফুরিয়ে গেল কুঞ্জবনের প্রাঙ্গণে।"

"যে বসন্ত একদিন করেছিল কত কোলাহল
লয়ে দল বল
আমার প্রাঙ্গণ-তলে কলহাস্য তুলে।"

সে বসন্ত আজ কবির অন্তরে আসিয়া পৌছায় না, তাহা কবির হৃদয়ের বহিঃ-প্রান্তে স্থিরনেত্র মেলিয়া বসিয়া থাকে। যে বেদনার সুরটি এক্ষেত্রে কবির চেতনায় ধ্বনিত হইয়াছে, তাহা ওই লীলার সহিত যুক্ত হইতে না পারিবার ফলে। এমনি করিয়া কবিকে ধীরে ধীরে বিশ্ব-লীলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে হইবে? এই ব্যাকুল জিজ্ঞাসায় কবিচিত্ত মূক, বেদনাহত।

দূরদিগন্তে অনিমেষ দৃষ্টি মিলিয়া কবি অন্যমনা বসিয়া থাকেন। ওখানে আকাশের উদার নীলিমায় মর্ত্যের শ্যামশ্রী আসিয়া মিলিত হইয়াছে। স্থির অনিমেষ দৃষ্টি অকস্মাৎ অশ্রুভারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

বলাকার মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে, যাহার মূল ভারপ্রেরণাকে যৌবন-বন্দনা বলা যাইতে পারে। এই যৌবন বলিতে কবি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? যৌবন এক্ষেত্রেও প্রাণ-তত্ত্ব তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা সৌন্দর্য-মাধুর্যাশ্রয়ী নয়, তাহা মুগ্ধতা ও আবেশের লীলা নয়।

যুগে যুগে যে শক্তি মহৎ আদর্শ ও কল্পনাকে, ঈশ্বরের অভিপ্রায়কে বাস্তবে রূপান্বিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, আত্মত্যাগ ও সর্বস্ব বিসর্জন দিয়াছে, দুঃসহ দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে হাসিমুখে বরণ করিয়াছে, সেই বিশিষ্ট অনুপ্রেরণাকেই কবি চিরযৌবন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

তাঁহার জীবনে যদি এই জাতীয় ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় কিছু থাকে, যদি ইহারই জন্য তাঁহাকে ধ্যানাসন হইতে তিনি বহির্লোকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তবে কবির জীবনে এই অনুপ্রেরণা যেন সত্য হয় :

"যৌবনেরি পরশমণি
করাও তবে স্পর্শ।"

চির নূতনকে বরণ করিয়া লইবার জন্য চির পুরাতনের সহিত যে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হয়, প্রাণের এই উভয়মুখীন প্রেরণাই যৌবন। যে ব্যক্তি আসক্তির সকল সঞ্চয়ভারকে ভোগবাসনাকে নিত্য জয় করিয়া উঠে তাহাই যৌবন। সত্য লাভের জন্য যে প্রেরণা মানুষকে সাধননিষ্ঠ করে, মৃত্যুকে মন্থন করিয়া অমৃত আহরণ করে, সেই প্রেরণাই যৌবন। যে প্রেরণা পুরাতন দেহ প্রাণের আধারকে জীর্ণ বসনের মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন দেহাধার লাভ করিতে চায়, এবং এইরূপে মৃত্যুকে তাহারই সহায়ক বলিয়া বোধ করে তাহাই যৌবন। জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া মানুষ যে প্রাণকে লাভ করে, সেই প্রাণ-তত্ত্বই যৌবন-তত্ত্ব :

"চির যুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।"

কিংবা

"স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিন কার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারবার
জীবনের এপার ওপার।"

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে আপাতদৃষ্টিতে একটি আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এই পরিবর্তনধারা লক্ষ্য করা যায় 'গীতাঞ্জলি'-পর্যায়ের পর হইতে। সে পরিবর্তন হইল দিব্য-সত্তায়, অসীম বা অরূপে স্থিতি লাভ না করিয়া সীমা বা রূপের জগৎকে পরিণামে আশ্রয় করা। বিশ্বের এই রূপের জগৎ নর-নারীর এই প্রেমের জগৎকে কবি ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

মর্ত্যের এই মোহ মুগ্ধ প্রেম, সৌন্দর্য ও মাধুর্য আস্বাদ করা, তাহার পর মৃত্যুতে নিঃশেষে বিদায় গ্রহণ করিয়া যাওয়া।

"এই ভালো আজ এ সঙ্গমে কান্না-হাসির গঙ্গা-যমুনায়
ঢেউ খেয়েছি, ডুব দিয়েছি, ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।" (পূরবী)

সকল রূপ বা সীমার অতীত সত্তা লাভ করিয়াও কবির অন্তরে অতৃপ্তি দূর হয় নাই। এই রূপের জগৎটিকে ফিরিয়া লাভ করিয়া যেন একটি গভীর পরিতৃপ্তি-বোধে তাঁহার হৃদয়-লোক ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'ইতিপূর্বের অলৌকিক অতৃপ্তি যে বিশ্বের সহিত বিচ্ছিন্নতা-বোধ জাত তাহা তিনি বিশ্বকে ফিরিয়া লাভ করিয়া নিঃসংশয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন।

"তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে
ঘিরে তোরে রাখে নানান পাকে।" (মাটির ডাক)

"তাই এতদিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাইনি তাহা বুঝে—" (মাটির ডাক)

বিশ্বকে লাভ করিয়া কবির অন্তর আজ প্রাপ্তির আনন্দ-সুধায় ভরিয়া উঠিয়াছে।

"আজকে খবর পেলাম খাঁটি
মা আমার এই শ্যামল মাটি,—', (মাটির ডাক)

কেবল তাহাই নয়। সকল রূপের অতীত সত্তা লাভের জন্য তাঁহার ইতি-পূর্বের সকল সাধনাকে তিনি ব্যর্থতা, জীবনের অপচয় বলিয়া উল্লেখ করিতেও লেশমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। ইহার জন্য কবির কী অপরিসীম গ্লানিবোধ।

দিব্য-চেতনা লাভ যদি সাধনার একমাত্র শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হয় এবং সেই সঙ্গে সীমা বা রূপের সকল বোধ যদি পরিণামে মিথ্যা বা মায়া বলিয়া বোধ হয়, তবে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় আশ্রয়-পরিবর্তনকে স্বাভাবিক ভাবে সাধনচ্যুতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মর্ত্যের আসক্তি প্রবল হইয়া কবিকে সাধনার পূর্ণ পরিণাম লাভ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে।

প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধনা প্রায় সর্বত্র কোন-না-কোন রূপে জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়া এমন একটি সত্তাকে পরিণামে লাভ করিতে চাহিয়াছে, যাহা সকল সীমা বা রূপের অতীত। (প্রাচ্য ঔপনিষদিক ব্রহ্ম এবং পাশ্চাত্ত্যে গ্রীক Idea of the Good) অধ্যাত্ম-সাধনার মূল এই বোধের মধ্যে আমরা লালিত। এই বোধের জন্যই রবীন্দ্রনাথের বোধের এই পরিবর্তনকে ওইভাবে ব্যাখ্যা করিতে সহজেই প্রলুব্ধ হই। কিন্তু তাহাতে রবীন্দ্রনাথের সাধনার বিশিষ্ট রূপটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে না।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার লক্ষ্য কি, তাহার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। তাহাতে এক প্রান্তে অরূপ বা অসীম, অন্যপ্রান্তে সীমা বা রূপ, এক প্রান্তে দিব্য চেতনা অন্য প্রান্তে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন একপ্রান্তে ঈশ্বরীয় প্রেম, অন্য প্রান্তে জাগতিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতির পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়াছে তাহাতে কোন একটিকে আশ্রয় করিয়া অন্যটিকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা নাই।

রবীন্দ্রনাথ যদি জাগতিক চেতনা, মর্ত্যের স্নেহ-প্রেম-প্রীতিকেই সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আজ একান্তরূপে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহার জন্য দায়ী তাঁহার সাধনার অসামর্থ্য নয়। তবে কোন একটিকে যদি আদৌ একমাত্র রূপে আশ্রয় করিতে হয় তবে তাহার জন্য তিনি দিব্য-চেতনাকে পরিহার করিয়া মর্ত্য-চেতনাকে আশ্রয় করিতে প্রস্তুত আছেন। প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধনার ও অধ্যাত্ম-বোধের কী আশ্চর্য বিপরীত ও বিরুদ্ধ প্রেরণা। এই বৈপরীত্য বোধের জন্য Plato-র রচনার কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার এই জাতীয় প্রেরণার সহিত আমরা অত্যন্ত পরিচিত। তাহা আমাদের রক্তের সহিত একাত্ম হইয়া আছে।

"In this present life, I reckon that we make the nearest approach to knowledge when we have the least possible intercourse or communion with the body, and are not contaminated

with the bodily nature, but keep ourselves pure until the hour when God himself is pleased to release us."

'When the soul uses the body as an instrument of perception, that is to say, when it uses the sense of sight or hearing or some other sense, she is dragged by the body into the region of the changable, and wanders and is confused ; the world spins round her, and she is like a drunkard, when she touches change. But when she contemplates in herself and by herself, then she passes into the other world, the region of purity, and eternity, and immortality, and unchangableness, which are her kindred, and with them she ever lives, when she is by herself and is not left or hindered ; then she ceases from her erring ways, being in communion with the unchanging. And this state of the soul is called wisdom."

"Evils, * * can never pass away ; for there must always remain something which is antagonistic to good. They have no place among the Gods in heaven, and so of necessity they hover around the mortal nature and this earthly sphere."

রবীন্দ্রনাথ চেতনার আদি-অন্ত প্রসারের সকল পর্যায়ে বিচরণ করিয়াছেন, একবার চূড়ান্ত অসীম তত্ত্বে, পুনরায় ফিরিয়া একান্ত মুগ্ধতার লোকে। ইহার ভিতর দিয়া তিনি চেতনার ক্রমনিম্ন বা ক্রমঊর্ধ্ব প্রসারের প্রত্যেকটি গ্রন্থি-মোচনের চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্র-সাধনার যে লক্ষ্য তাহাতে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত চেতনার নির্বাধ চলাচলতা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া ইহাই করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি তাঁহার এই সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন ছিলেন? তবে এক্ষেত্রেও যে একটি দিব্য অভিপ্রায় তাঁহার জীবনে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। তাঁহারই নিগূঢ় কোন অভিপ্রায়ের ফলে নিম্নাভিমুখী প্রেরণা তাঁহাকে যে ওই ঊর্ধ্ব পরিণাম-লোক হইতে অনিবার্য

বেগে মর্ত্যে আকর্ষণ করিয়া আনে তাহার পরিচয় তিনি স্বয়ং দান করিয়াছেন। কতকটা বিহ্বল হইয়া কবি আপনার জীবনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছেন।

কবি এই জীবন-পর্যায়ে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তাহাকে বিশ্ব-সত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষা বলা যাইতে পারে। বিশ্ব-সত্তা লাভ বলিতে চেতনার সেই পরিণাম বুঝায় যে পরিণামে মানবীয় চেতনা বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনাকে অনুপ্রবিষ্ট ও লীলায়িত হইতে দেখে।

পরিব্যাপ্ত দেশ-কালের মধ্যে যে রূপ-শূন্য-শক্তি-প্রবাহের স্পন্দনে মুহূর্তে সংখ্যাতীত রূপ-রঙ্গ-রেখা অজস্র ধারায় ফুটিয়া উঠিতেছে; অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্র-লোক হইতে মর্ত্যের ধূলিকণা পর্যন্ত যাহার বক্ষে কেবল বুদ্‌বুদের মত জাগিয়া ফাটিয়া যাইতেছে, সেই আদি প্রাণ-উৎসের সহিত কবি আপনার চেতনাকে মুক্ত করিতে চাহিতেছেন। তাহা হইলে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের আদি প্রাণের অফুরন্ত সৃষ্টিরূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করিবে। ইহার ফললাভকে লীলা ছাড়া আর কী নামে অভিহিত করা যাইবে।

কোন সুদূর অতীত কাল হইতে মহাকাল এক হাতে রঙ্গের পাত্র, অন্য হাতে তুলিকা লইয়া শূন্য-পটে মুহূর্তে কত গণনাতীত অপরূপ রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আবার নির্মমভাবে মুছিয়া দিতেছেন, তাঁহার সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তেমনি নিরাসক্ত সৃষ্টির প্রবাহ ঝরনার মত সমুৎসারিত হইয়া একদিন হারাইয়া যাইবে। জীবনকে এই সৃষ্টি-লীলার দিক হইতে তিনি দেখিতে চান। তিনি সে কথা বলিয়াছেন,—

"সৃষ্টি মোর সৃষ্টি সাথে মিলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,—" (মুক্তি)

সৃষ্টির আবিষ্ট মুহূর্তে, সুরের পথ বাহিয়া তাঁহার চেতনা মাঝে মাঝে সেই সত্তার চকিত স্পর্শ লাভ করিয়াছে, চেতনার সেই সীমাহীন ব্যাপ্তির উপলব্ধি মুহূর্তে তাঁহার জন্ম-জন্মান্তর যেন ধন্য হইয়াছে:

"মাঝে মাঝে গানে মোর সুর আসে, যে সুরে, হে গুণী,
তোমারে চিনায়।" (মুক্তি)

বিশ্ব-সত্তার সহিত কবি আপন ব্যক্তি-সত্তাকে স্থায়িরূপে যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন। প্রাণের যে রহস্যে শূন্যে অমন অজস্র রূপের ফুল ফুটে সেই

রহস্যকে তাহা হইলে তিনি ভেদ করিতে পারিবেন। আপনার সৃষ্টির মধ্যে সেই রহস্যের প্রকাশ ঘটিবে ঃ

"তাহলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল ;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোতুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।" (মুক্তি)

বিশ্বের মর্মমূলে সৃষ্টি-প্রেরণার যে আদি রহস্য, আপনার সৃষ্টির মধ্যে যখন সেই রহস্যের প্রকাশ ঘটিবে তখনই তিনি পূর্ণ মুক্তির আস্বাদ লাভ করিবেন ঃ

"যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
সুরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সঙ্গম তীর্থ পাব আমি আমারি প্রাণের
আপন সঙ্গীতে।" (মুক্তি)

জড় ও চেতনার দ্বন্দ্ব সেই পরিণামে সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়। দেশ-কাল পূর্ণ করিয়া এক রূপ-হারা শক্তির প্রবাহ পরস্পরের সংঘাতে, আকর্ষণ-বিকর্ষণে অন্তহীন রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছে ঃ

"সেদিন বুঝিব মনে নাই নাই বস্তুর বন্ধন,
শূন্যে শূন্যে রূপ ধরে তোমারি এ বীণার স্পন্দন।—" (মুক্তি)

বিশ্ব-সত্তা লাভ বলিতে আমরা সেই অবস্থাটিকে বুঝি যে অবস্থায় বিশ্বের এই ছন্দের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের ছন্দের পূর্ণ মিলন ঘটে। ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সত্তার অভিপ্রায় যখন সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হইয়া প্রকাশ পায়। ব্যক্তির সকল অনুভূতি ও অনুপ্রেরণা বিশ্বের অনুভূতি ও অনুপ্রেরণার এক বিচিত্র প্রকাশ বলিয়া ব্যক্তির আসক্তি তখন সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়। কবির এই আকাঙ্ক্ষা পূরবীর মধ্যে বারংবার নানাভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে ঃ

"নিয়ে যাও সেইখানে নিঃশব্দের গূঢ় গুহা হতে
যেখানে বিশ্বের কণ্ঠে নিঃসরিছে চিরন্তন স্রোতে
সঙ্গীত তোমার।" (অন্ধকার)

সমগ্র সৃষ্টির মর্মমূলে এক গূঢ় গোপন প্রেরণা রহিয়াছে—পূর্ণতাকে লাভ করিবার ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতার বহিঃপ্রকাশই তো এই বিচিত্র রূপ। এ যেন নিত্যদিন ধরিয়া একই পাত্রে বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া লেখা। প্রিয়তমের নিকট লেখা বিরহের নীলপত্র। সে তাহার বেদনাকে নিঃশেষ করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তাই সৃষ্ট রূপের মধ্যে বাণীর মধ্যে এমন করুণ কোমলতা, একটি বিষাদের ঘের।

ব্যক্তি-সত্তার মর্মমূলেও এই একই প্রেরণা রহিয়াছে। তাঁহার সকল সৃষ্টির পশ্চাতে এই একই প্রেরণা সক্রিয়। যে সত্তা বিশ্ব-সত্তাকে যত গভীর করিয়া লাভ করে, বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের যোগ যত নিবিড় হয়, বিশ্বের এই প্রকাশের রহস্য তাহার নিকট তত বেশি উদ্ঘাটিত হয়। তাহার প্রকাশ তত অফুরন্ত এবং তত অনির্বচনীয়তা লাভ করে।

কবির বাণীর মধ্যে যেন বিরহিণী ধরিত্রীর 'চকিত ইঙ্গিত' তাঁহার 'বসন-প্রান্তের ভঙ্গীখানি' চিহ্নিত হইয়া যায়। তাঁহার সঙ্গীতের মধ্যে যেন তাঁহার 'ছল ছল অশ্রুর আভাস' ফুটিয়া উঠে। তাঁহার প্রাণের স্পন্দন, যেন তাঁহার কাব্যের ছন্দকে আশ্রয় করে। 'উৎকণ্ঠিত আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার বক্ষতলে নিত্য যে ক্রন্দন' জাগে, সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি যেন তাঁহার কাব্যের ছন্দের মধ্যে প্রকাশ পায়। 'মিলনের অমৃতে'র জন্য বিশ্বের যে নিত্য ক্ষুধা, সেই ক্ষুধাকে যেন তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে পারেন। অর্থাৎ বিশ্বের প্রকাশের রহস্য, তাহার ছন্দ, ধ্বনি, ভঙ্গী, তাহার রূপ-রঙ্গ-রেখা, ইঙ্গিত সমস্ত কিছু যেন তাঁহার সৃষ্টির মধ্যে সম্পূর্ণ ধরা পড়ে।

মুক্তি-লোক বলিতে তিনি এই বিশ্ব-চিত্ত-লোকের কথাই বুঝাইয়াছেন :

"—সেথা সুগম্ভীর বাজে
অনন্তের বীণা, যার শব্দহীন সঙ্গীতধারায়
ছুটেছে রূপের বন্যা গ্রহে সূর্যে তারায় তারায়।" (সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

ভারতীয় মোক্ষ সাধনা এবং রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতার সাধনার মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে। গীতাঞ্জলি আলোচনা পর্যায়ে তাহারই কিছু পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি। এই পার্থক্যকে আর একটি দিক হইতে বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে।

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর যে পরিণাম তাহাতে সৃষ্টি-প্রেরণা নাই। দেশ-কালের অন্তর্গত সৃষ্টি-লোক এবং দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর চেতনার মধ্যে স্বরূপতঃ পার্থক্য আছে। আবার দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর সত্তাই একমাত্র সত্য বলিয়া তাহাকে লাভ করিবার জন্য তাঁহারা দেশ-কালের সকল বোধকে ছাড়াইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ এই উভয় সত্তার স্বরূপতঃ পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। যে রহস্যের ভিতর দিয়া (যাহাকে বলা হইয়াছে, উত্তমম্ রহস্যম্) দেশ-কালের অতীত সত্তা, অসীম বা অরূপ, দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপের ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে, সেই রহস্যকে তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া উদ্ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ শিল্পী বা স্রষ্টা বলিয়াই যে এই মহত্তম সৃষ্টির রহস্য ভেদ করিতে চাহিয়াছেন, তাহা নহে ; ওই রহস্যভেদ করিতে পারিলে মনুষ্যসমাজে ও মনুষ্য-জীবনে সৃষ্টির এক অপার্থিব দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। এই স্থির অধ্যাত্ম-বিশ্বাস তাঁহার ছিল। এই জীবন ও জগৎ দিব্য-জীবন ও জগতে পরিবর্তিত হইয়া যাইবে। মানুষের সকল ক্রিয়ার মধ্যে অনায়াস ঐশী লীলা প্রকাশ পাইবে। প্রত্যেকটি নর-নারী ঈশ্বরের এক একটি সুসম্পূর্ণ সংগীত স্বরূপতা লাভ করিবে।

অন্তহীন অনায়াস সৃষ্টি-প্রেরণাটি কবির মুক্তি-লোক বলিয়া তাঁহার নিকট আজ তাই প্রাণ আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ রূপে প্রাণের অনুভূতি কবিকে পরিণামে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দিবে। বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির বিচিত্র সৃষ্টি বলিয়া পরিণত বয়সে প্রাণের ক্ষীণ স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে কবির বিচিত্র সৃষ্টি-প্রেরণাও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। কবি তাই প্রাণের উদ্বোধন ঘটাইতে চাহিয়াছেন। বলাকার মধ্যে যৌবন-বন্দনা রূপে কবির প্রাণ-বন্দনার বিচিত্র রূপের পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। পূরবীর মধ্যে কবির সৃষ্টি-ধর্মের বৈশিষ্ট্যের জন্যই স্বাভাবিকভাবে প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়াছে :

"হে নূতন,
দেখা দিক আরবার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ।

আচ্ছন্ন করেছে তারে আজি।"

শীর্ণ নিমেষের মত ধুলিকীর্ণ জীর্ণ পত্ররাজি।" (পঁচিশে বৈশাখ)

কুজ্ঝটিকার ঘন আবরণ উদ্ভিন্ন করিয়া যেমন সূর্যের প্রকাশ ঘটে, শীতের জীর্ণতা ঘুচাইয়া উপচীয়মান প্রাণ-প্রাচুর্য লইয়া যেমন বসন্ত আবির্ভূত হয়, চতুর্দিকে অনন্তের অক্লান্ত বিস্ময় ফুটিয়া উঠে, কবির জীবনে যেন তেমনি করিয়া প্রাণের প্রকাশ ঘটে।

প্রাণ, যৌবন অথবা নূতনের বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক ইহার সহিত বিজড়িত হইয়া সৃষ্টির আর এক লীলা-রূপ কবির দৃষ্টি-সমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। এই লীলা-রূপের একটি অপরূপ পরিচয় লাভ করা যায় 'তপোভঙ্গ' কবিতাটির মধ্যে।

সমগ্র বিস্‌ষ্টি তাহার অন্তহীন রূপ ও মাধুর্যের পরিচয় লইয়া ঈশ্বরের ধ্যানের মধ্যে একবার সংকুচিত, সংহত হইয়া আসিতেছে; আবার তাহা পর্যায়ের পর পর্যায়ে একের পর এক ঐশ্বর্যের দল বিস্তার করিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপের মত আপনার পূর্ণ মহিমা লাভ করিতেছে। এমনি করিয়া একবার ধ্যানের মধ্যে ফিরিয়া আসা, আবার দেশ-কালের মধ্যে প্রসার লাভ করা,—যুগ-যুগান্ত, কোটি কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া ইহারই চিরন্তন লীলা চলিতেছে।

সৃষ্টিতে যদি একথা সত্য হয়, তবে মানুষের জীবনেও একথা নিশ্চিত সত্য যে, প্রাণের অন্তহীন ঐশ্বর্য যৌবনাবসানে নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যায় না। তাহার সকল ঐশ্বর্য অন্তরে সংহতরূপে সুপ্ত হইয়া থাকে। আবার তাহার কোন-না-কোন রূপে নিঃসংশয় প্রকাশ ঘটিবে। যৌবনে অপরূপ রূপ-লীলা কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন:

"ললাটের চন্দ্রালোকে
নন্দনের স্বপ্ন চোখে
নিত্য নূতনের লীলা দেখেছিনু চিত্ত মোর ভরে।
দেখেছিনু লজ্জিতের পুলকের কুণ্ঠিত ভঙ্গিমা,
রূপ তরঙ্গিমা।" (তপোভঙ্গ)

সেই রূপমাধুরী, সৌন্দর্যের সেই বিচিত্র প্রকাশ, আর ইহাকে আশ্রয় করিয়া চেতনার সেই যে অপার বিস্তার, তাহা যে জীবনের একটি পর্যায়ে

নিঃশেষে বিলুপ্ত হয় তাহা নয়। বসন্তের ঐশ্বর্য শীতের দীনতার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে :

"নহে নহে, আছে তারা; নিয়েছ তাদের সংহরিয়া
নিগূঢ় ধ্যানের রাত্রে, নিঃশব্দের মাঝে সম্বরিয়া
রাখ সঙ্গোপনে।" (তপোভঙ্গ)

এই প্রসুপ্ত ঐশ্বর্যের আবার প্রকাশ ঘটিবে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে, তবে জীবনেও ইহা যে সত্য তাহাতে সংশয় নাই :

"বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্র বেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।" (তপোভঙ্গ)

কবি তাঁহার অন্তরের মধ্যে প্রসুপ্ত ঐশ্বর্যরাশিকে বাহিরে আবার বিচিত্র প্রকাশ রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চান।

যে প্রেরণা সমগ্র বিশ্বসৃষ্টিকে ধ্যানের মধ্যে সংহত করিয়া বিলীন করিয়া রাখে, সে প্রেরণা নয়, যে প্রেরণায় এই সংহত ধ্যান-মন্ত্রটি, বিশ্বসৃষ্টির অন্তহীন বৈচিত্র্য রূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেই প্রেরণাকেই কবি আপনার জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চান। কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের পশ্চাতে এই প্রেরণা।

"সে নৃত্যের ছন্দে লয়ে সঙ্গীত রচিনু ক্ষণে ক্ষণে তব সঙ্গ ধরে।"

সৃষ্টি-প্রকাশের সেই আদি তত্ত্বের সহিত কবি আপনাকে একাত্ম করিয়া তুলিয়াছেন। কবির মুক্তি সেই আদি-সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত পূর্ণ একাত্মতা-বোধের মধ্যে :

"বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন নাশন
বারে বারে দেখা দিবে, আমি রচি তারি সিংহাসন,
তারি সম্ভাষণ।
তপোভঙ্গ দূত আমি মহেন্দ্রর, হে রুদ্র সন্ন্যাসী,
স্বর্গের চক্রান্ত আমি। আমি কবি যুগে যুগে আসি
তব তপোবনে।" (তপোভঙ্গ)

আমরা ইতিপূর্বে বারংবার লক্ষ্য করিয়াছি যে, ব্যক্তি-জীবনের গূঢ় অন্তর্দ্বন্দ্বের সহিত বিজড়িত হইয়া সৃষ্টির এক-একটি স্বরূপ এমনি করিয়া কবির নিকট উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। কবির সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের যেমন, বিশ্বের সেই স্বরূপ

সাক্ষাৎকারেরও তেমনি বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। শাস্ত্রে এই উপলব্ধির পরিচয় আছে।

"অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্য হরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥" (গীতা)

"ইহাই সত্য। প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে যেমন অনুরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি হে সৌম্য, অব্যক্ত হইতে এই বহুবিধ সত্তা জন্মলাভ করিয়াছে এবং পুনরায় তাহার মধ্যে ফিরিয়া যায়।" (মুণ্ডক উপনিষদ্)

সৃষ্টির এই স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা এই সংকোচন ও প্রসারণের নিত্য লীলারও উর্ধ্বতর তত্ত্বলাভকে লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রূপের এই লোকটিকেই ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়াছেন।

নিদ্রামগ্ন বিশ্বের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ঊষা ডাক দেয়। সুপ্তির ঘন আবরণের স্তরে স্তরে সে আহ্বানে কম্পন জাগে। অমনি প্রভাত আসিয়া উপস্থিত হয়, লোক-লোকান্তরে তাহার ঐশ্বর্য ছড়াইয়া পড়ে।

স্বর্গ-লোকে কোন এক নারীর ব্যাকুল আহ্বান সুরে সুরে নিয়ত উৎসারিত হইতেছে, তাই তো মর্ত্যের মধ্যে সে আহ্বানে সাড়া দিবার জন্য এমন চাঞ্চল্য, এত ব্যাকুলতা। এই বিচিত্র সৃষ্টি, এই রূপ, রস, এই সমস্ত কিছু তো সেই চাঞ্চল্যের প্রকাশ।

কবি আপন সত্তার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই আহ্বান শুনিতে পাইবার জন্য বিনিদ্র হইয়া কান পাতিয়া আছেন, সে আহ্বানে তাঁহার অন্তর্লীন সমগ্র ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটিবে বিচিত্র সৃষ্টি রূপে।

এই প্রেরণা তিনি জীবনে বারবার লাভ করিয়াছেন, তাহাকে কত বিচিত্র সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সমস্ত কিছুর মধ্যে যেন অসম্পূর্ণতার বেদনা বিজড়িত হইয়াছে। সে সৃষ্টি বিশ্ব-প্রকৃতির মত অমন পরিপূর্ণ, অনায়াস, অমন অন্তহীন বৈচিত্র্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই।

বিশ্বের মর্মমূলে স্বর্গের জন্য যে আকুতি, অমৃতের জন্য যে ব্যাকুলতা, যে পূর্ণ সামছন্দ, মর্ত্যের নারীর মধ্যে তো তাহারই প্রকাশ। প্রেমে তাই মানুষ সেই ব্যাকুলতা, সেই পূর্ণ সামছন্দের কিছু আভাস লাভ করে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধকে আশ্রয় করিয়া কবির বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে সেই অমৃতের ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে :

"তাই তো কবির চিত্তে কল্পলোকে টুটিল অর্গল
বেদনার বেগে,
মানস তরঙ্গ তলে বাণীর সঙ্গীত শতদল
নেচে ওঠে জেগে।
সুপ্তির তিমির বক্ষ জীর্ণ করে তেজস্বী তাপস
দীপ্তির কৃপাণে ;
বীরের দক্ষিণ হস্ত মুক্তি মন্ত্রে বজ্র করে বশ
অসত্যেরে হানে॥"

বিশ্ব-প্রাণ ব্যক্তির অন্তরে সৌন্দর্য ও প্রেম-রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি ব্যক্তি-সত্তাকে বিশ্ব-সত্তার গভীর হইতে গভীরতর লোকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। প্রাণের যোগে বিশ্ব-সত্তার অনুভূতি যতই গভীর হইতে থাকে, সৌন্দর্য ও প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ততই অন্তহীন হইয়া পড়ে। কবির জীবনে এই লীলার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। আজ অতিক্রান্ত যৌবনে কবির সেই প্রাণের অনুভূতি একান্ত ক্ষীণ। বিশ্ব-প্রাণের সহিত কবি-প্রাণের সংযোগ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। সেইসঙ্গে সৃষ্টি-প্রেরণাও ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। তাই কবি ফিরিয়া ফিরিয়া প্রাণকে ('যৌবন') আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন ; বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় আপনার প্রাণকে যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন।

কবির মুক্তির স্বরূপ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তাহা হইল বিশ্ব-সত্তা লাভ, বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দের সহিত ব্যক্তি-প্রাণের পূর্ণ যোগ সাধন। এই পরিণাম লাভে বিশ্বের সৃষ্টি-প্রেরণার মত তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণাও অন্তহীন বৈচিত্র্যরূপে পূর্ণ সুষমা লইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে। সে সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বের সৃষ্টির মত আসক্তির কোন পরিচয় থাকিবে না। বিশ্ব-প্রাণ গণনাতীত সত্তার ভিতর দিয়া আপনাকে যেমন অন্তহীন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিতেছে, কবির ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তেমনি অন্তহীন সৃষ্টি রূপে প্রকাশ করিবে। কবির সত্তা বিশ্বেরই সৃষ্টি, বিশ্বের কোন এক গূঢ় অভিপ্রায় চরিতার্থ করিয়া তাহা একদিন বিশ্ব-প্রাণে হারাইয়া যাইবে।

কবি আজ আপনার ব্যক্তি-জীবনের সেই পরিচয় সেই সার্থকতাই লাভ করিতে চান। সেই পূর্ণ সার্থকতা লাভ হইতে বঞ্চিত হইয়া হয়ত তাঁহাকে একদিন এই মর্ত্যভূমি হইতে বিদায় লইতে হইবে :

"মনে জানি, এ জীবনে সাঙ্গ হয় নাই পূর্ণ তানে
মোর শেষ গান।" (আহ্বান)

কিংবা

"অসমাপ্ত পরিচয়, অসম্পূর্ণ নৈবেদ্যের থালি
নিতে হল তুলে।" (আহ্বান)

এই অসম্পূর্ণতাবোধের বেদনার পরিচয় কবি অন্যত্রও দান করিয়াছেন। বিশ্বের বিচিত্র খণ্ড রূপের অন্তরালে যে অখণ্ড সৌন্দর্য-সত্তা, কত দুর্লভ মুহূর্তে কবি তাহার আভাস লাভ করিয়াছেন ; সেই চকিত সাক্ষাৎলাভের অলৌকিক আনন্দকে তিনি তাঁহার কাব্যে নানাভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে তিনি স্থায়িরূপে লাভ করিতে পারেন নাই। যদি তিনি স্থায়িরূপে লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনি তাঁহার এই জীবনের চরম অর্থবোধ করিয়া যাইতে পারিতেন :

"তার সেই ত্রস্ত আঁখি, সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।" (ক্ষণিকা)

এই 'স্বপ্নে অবগুণ্ঠন খোলাই' কবির বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি। খণ্ডিত, সীমিত রূপের মধ্যে তাহারই ইঙ্গিত, তাহারই আভাস, কিন্তু সেই পরিপূর্ণ শ্রী, যাহা এই সকল খণ্ডিত রূপকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া অনন্তে আপনার নিঃসীম মহিমায় নিত্য উপচাইয়া পড়িতেছে, তাহাকে তাই বুঝি পরিপূর্ণ রূপে লাভ করিতে পারা যায় না :

"গেল না ছায়ার বাধা ; না বোঝার প্রদোষ আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে .
সংশয় মোহের নেশা ;—সে মূর্তি ফিরেছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।" (ক্ষণিকা)

এই একই মনোভাবের প্রকাশ নিম্নের উদ্ধৃত অংশ কয়েকটির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায় :

"পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা ;
তোমার সাথে কই হল গো দেখা।" (অপরিচিতা)

"হয়তো তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়াল খানা,
চোখের দেখায় হয়নি প্রাণের জানা।" (অপরিচিতা)
"আধেক চাওয়ার ভুলে যাওয়ায় হয়েছে জাল-বোনা,
তোমার আমার হয়নি জানা শোনা।" (অপরিচিতা)

কবি কেন বিশ্ব-সত্তা লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার একটি কারণ নির্দেশের চেষ্টা ইতিপূর্বে করিয়াছি এবং ইহাও সেক্ষেত্রে উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, কবি যে-পূর্ণতার সাধনা লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার জন্য প্রথমে প্রয়োজন বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ একাত্মতা-বোধ। কবির সে সাধনার লক্ষ্য হইল ব্যক্তি-চেতনা, বিশ্ব-চেতনা ও দিব্য-চেতনার পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা, ইহাদের যোগের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে মুক্তিলাভের যে আকাঙ্ক্ষা, তাহা কোথাও কোথাও কতকাংশে সার্থকও হইয়াছে লক্ষ্য করিতে পারা যায়:

"যেন আমি নিস্তব্ধ মৌমাছি
আকাশ পদ্মের মাঝে একান্ত একেলা বসে আছি।
যেন আমি আলোকের নিঃশব্দ নির্ঝরে
মন্থর মুহূর্তগুলি ভাসায়ে দিতেছি লীলা ভরে।
ধরণীর বক্ষ ভেদি যেথা হতে উঠিতেছে ধারা
পুষ্পের ফোয়ারা,
তৃণের লহরী,
সেখানে হৃদয় মোর রাখিয়াছি ধরি;
ধীরে চিত্ত উঠিতেছে ভরি
সৌরভের স্রোতে।" (প্রভাত)

কবি-চেতনার এই পরিণামকে যে নামে বা যে স্বরূপে চিহ্নিত করা যাক-না-কেন সমগ্র পূরবী কাব্যের মধ্যে কবি-চেতনায় এই ঊর্ধ্ব পরিণামের পরিচয় আর কোথাও লাভ করিতে পারা যাইবে না।

বিশ্ব-সত্তায় কবি-চেতনার চূড়ান্ত পরিণাম না ঘটিলেও সৌন্দর্য ও প্রেমের সাধনা মাত্রেই কিছু-না-কিছু নিরাসক্তি-বোধ থাকিবেই, চেতনার ঊর্ধ্ব পরিণাম ও সামগ্রিক দৃষ্টি কোন-না-কোন পর্যায় স্বরূপতা লাভ করিবে।

ভারতীয় তত্ত্ব-সাধনা ও সৌন্দর্য-সাধনা যে চূড়ান্ত পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছে,

ইহা যে সেই জাতীয় কোন বোধ নহে, রবীন্দ্রনাথ যে ওই পরিণাম লাভ করিতে চান নাই তাহা বুঝিতে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"কোন বস্তুর আদি অকৃত্রিম স্বরূপ বিচার করিতে হইলে কতকটি শূন্যতা-বোধের প্রয়োজন, মনুষ্য-চেতনা সম্পর্কেও এই একই কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু আদি অবস্থা বলিতে যে পূর্ণ অবস্থা বুঝিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। * * * আদি নির্বিশেষ অবস্থার মধ্যে বিলীন হওয়া অপেক্ষা মানুষ হিসাবে মানুষের সম্পূর্ণতা বেশি।" (মানুষের ধর্ম)

এই উপলব্ধি ও সাক্ষাৎকারও যে তাই বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ মিলনবোধ-জাত নয়, তাহা যে কবি-মনের কতকটা শূন্যতাবোধ-জাত তাহা স্বাভাবিক ভাবে অনুমান করা যাইতে পারে।

কবির চেতনা-লোকের আশ্রয় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারই অনুকূল বিশ্বের আর এক রূপও সেই সঙ্গে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। আমরা ইতিপূর্বে এই চেতনা-লোকের যেমন, তাহার অনুকূল বিশ্বের এই স্বরূপেরও তেমনি পরিচয় লাভ করিয়াছি। বিশ্বের এই স্বরূপের পরিচয় লাভ কবির বর্তমান হইতে চেতনা-পর্যায় সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

ইহা সেই চেতনা পর্যায়ের উপলব্ধি যে পর্যায়ে কবি বিশ্বের সকল খণ্ডিত সৌন্দর্যের মধ্যে একটি অখণ্ড সৌন্দর্যের আভাস লাভ করিতেন। সেই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লক্ষ্মী বিশ্বের সকল সৌন্দর্য-মাধুর্যের ভিতর দিয়া তাঁহাকে নানা ভাবে আকর্ষণ করিয়াছে। এই সকল খণ্ড রূপ যেন তাহারই এক-একটি আহ্বান-বাণী, মর্ত্য ব্যাকুলতা।

কবির জীবনে এই বোধের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁহার চেতনাবিকাশের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে, যে পর্যায় লাভ করিয়া তিনি সকল রূপের অতীত একটি অখণ্ড সত্তা সম্পর্কে প্রথম সচেতন হইয়াছেন। এই পরিপূর্ণ সত্তার সহিত কবির যে একটি বিশিষ্ট যোগের সম্পর্ক আছে, যে সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত এবং ইহার সহিত যোগের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনে যে একটি নিয়তি-রূপ চরিতার্থ হইতেছে, 'জীবন দেবতা' ইত্যাদি বোধের মধ্যে যাহার প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি, তাহা তখনও অত্যন্ত স্পষ্ট অনুভূত হয় নাই। এই বিশিষ্ট বোধের পরিচয় লাভ করা যায় 'মানসী' হইতে 'সোনার তরী' পর্যন্ত। এই পর্যায়ে কবি সৌন্দর্য ও প্রেম-বোধের ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রাণের সহিত যোগ অনুভব করিলেও, তাহা তখনও পর্যন্ত যথেষ্ট নিবিড় হইয়া উঠে নাই ঃ

প্রারম্ভিক. যৌবনে সৌন্দর্য ও প্রেমকে আশ্রয় করিয়া কবি যে লীলা করিয়াছেন সেই চেতনার অধ্যায়টিকে লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই লীলা-রূপটি পুনরায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পরিণাম লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে তাই জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে ঃ

"উদয় ছবি শেষ হবে অস্ত সোনায় এঁকে
জ্বালিয়ে সাঁঝের বাতি।" (খেলা)

কিংবা

"চাও কি তুমি যেমন করে হল দিনের শুরু,
তেমনি হবে সারা।" (খেলা)

জীবনের প্রারম্ভে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে বিচিত্র স্বপ্ন তিনি দেখিয়াছেন, যে বিচিত্র রূপ-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের আশ্রয় করিয়া তন্ময় মুহূর্তে চেতনার সেই যে সীমাহীন প্রসার, জীবনের শেষ পর্যায় কি এমনি সৌন্দর্য-প্রেমের ধ্যানের মধ্যে বিচিত্র রূপ-সৃষ্টির মধ্যে কাটিয়া যাইবে?

এই চেতনা-লোক লাভের সঙ্গে সঙ্গে কবির সেই লীলা-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে ঃ

"দুয়ার বাহিরে যেমনি চাহি রে
মনে হল যেন চিনি,
কবে, নিরুপমা, ওগো প্রিয়তমা,
ছিলে লীলা-সঙ্গিনী ?" (লীলা-সঙ্গিনী)

সেই নিরুপমা প্রিয়তমার কত চকিত স্পর্শ কত ভাবেই না তিনি লাভ করিয়াছেন ঃ

"বর্ষা শেষের গগন কোণায় কোণায়
সন্ধ্যা মেঘের পুঞ্জ সোনায় সোনায়,
নির্জন ক্ষণে কখন অন্যমনায়
ছুঁয়ে গেছ থেকে থেকে।" (লীলা-সঙ্গিনী)

বিশ্ব-সত্তার সহিত ব্যক্তি-সত্তার ব্যবধান সেই পরিণামে আসিয়া পৌঁছাইয়াছে, যে পরিণামে কবি সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ভিতর দিয়া চকিতে চকিতে তাহার স্পর্শ লাভ করিতে পারেন।

দিব্য-চেতনার সহিত কবি একদিন একাত্মতা বোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সকল প্রকাশ লুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া এবং এইভাবে

অসীম বা অরূপের যে বিচিত্র রূপের প্রকাশ তাহার আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া কবি কতকটা ব্যবধান রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই ব্যবধান ধীরে ধীরে প্রসারিত হইয়া আজ এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে, যে পরিণামে বিশ্ব-সত্তা 'লীলা সঙ্গিনী' রূপে অনুভূত হইয়াছে।

এই চেতনা লাভ করাই যদি তাঁহার নিয়তি হয়, তবে আজও কবিকে ধ্যানে সৌন্দর্য-প্রেমের বিচিত্র রূপ ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। কবির এই জীবন-পর্যায়ে কি তাহা সত্য হইবে?

"আবার সাজাতে হবে আভরণে
মানস-প্রতিমাগুলি?
কল্পনা পটে নেশার বরণে
বুলাব রসের তুলি?" (লীলা-সঙ্গিনী)

কিন্তু এই পরিণত বয়সে প্রাণের এই লীলা কেমন করিয়া সত্য হইবে?

"দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,
সারা হয়ে এল দিন।
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীণ।" (লীলা-সঙ্গিনী)

জীব-জীবনের সকল নিয়তিকে মানিয়া লইয়া, সকল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা নিরুদ্ধ করিয়া, সকল অধ্যাত্ম ফল পরিণামকে পরিহার করিয়া কবি আজ মানবিক সৌন্দর্য ও প্রেমকে কেবলমাত্র তাহার এই একমাত্র স্বরূপে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। সৌন্দর্য ও প্রেমের এই স্বরূপই কবিকে এক আশ্চর্য দুর্লভতার আস্বাদ দিয়াছে।

একদিকে প্রকৃতির এই সহজ, সরল, নিরাভরণ সৌন্দর্য:

"গাছটির স্নিগ্ধ ছায়া নদীটির ধারা,
ঘরে আনা গোধূলিতে সন্ধ্যাটির তারা,
চামেলির গন্ধটুকু জানালার ধারে,
ভোরের প্রথম আলো জলের ওপারে।" (আশা)

অন্যদিকে তেমনি আত্মবিস্মৃত অকুণ্ঠিত প্রেমের প্রকাশ।

"হৃদয়ের সুর দিয়ে নামটুকু ডাকা
অকারণে কাছে এসে হাতে হাত রাখা,

দূরে গেলে একা বসে মনে মনে ভাবা,
কাছে এলে দুই চোখে কথা ভরা আভা।" (আশা)

কবি যদি মর্ত্যের এই সৌন্দর্য ও প্রেমের আস্বাদ লাভ করিতে পারেন, ইহারই ভিতর দিয়া যদি তাঁহার জীবন একদিন অবসিত হইয়া যায়, তবে তাঁহার আর ক্ষোভ থাকিবে না।

কখন যদি অন্তরে প্রেম জাগে, আর এই অনুভূতির ভিতর দিয়া যদি বিশ্বসত্তার ক্ষীণতম আভাসও অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়, তাহা হইলে তাহার পর হইতে অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখীন হইয়া থাকে। ওই পরিণামকে জীবনে স্থায়ী করিবার জন্য তাহার ব্যাকুলতার অন্ত থাকে না :

"হয়তো তারে দুঃখ দিনে
অগ্নি আলোয় পাবে চিনে,
তখন তোমার নিবিড় বেদন নিবেদনের জ্বালবে শিখা।" (স্বপ্ন)

নর-নারীর জীবনে প্রেমের উপলব্ধি যে কি, কবি তাহার পরিচয় দান করিয়াছেন :

"ভোগ সে নহে, নয় বাসনা,
নয় আপনার উপাসনা,
নয় কো অভিমান ;
সরল প্রেমের সহজ প্রকাশ, বাহিরে যে তার নাই রে পরিমাণ।

"আপন প্রাণের চরম কথা
বুঝবে যখন, চঞ্চলতা
তখন হবে চুপ।
তখন দুঃখ-সাগর তীরে
লক্ষ্মী উঠে আসবে ধীরে
রূপের কোলে পরম অপরূপ।" (প্রকাশ)

প্রেমের উপলব্ধি সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক। আধ্যাত্মিক এই অর্থে যে তাহাকে জাগতিক কোন কিছুর সহায়তায় ব্যাখ্যা বা পরিমাপ করিতে পারা যায় না। তাহার স্বরূপ ব্যাখ্যা কেবল নিষেধাত্মক ভাবে করা যাইতে পারে। প্রেম নর-নারীর ভোগবিলাস নহে। তাহা জাগতিক বিচিত্র কামনা-বাসনাও নহে। তাহা আপনার পূজা বা উপাসনাও নহে ; মনের বিচিত্র বিকার, মান-অভিমান,

প্রেম বলিতে তাহাও বুঝায় না। তাহা এমন এক উপলব্ধি যাহা নর-নারীর চেতনাকে সম্পূর্ণ অন্তর্মুখীন করিয়া দেয়। বাহিরের বিচিত্র প্রয়াস নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। চিত্তে এক অলৌকিক বেদনাবোধ সঞ্চারিত হইয়া যায়। আর এই ব্যথা -সমুদ্র মন্থন করিয়া প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তরে পরস্পরের এক দিব্য-রূপ ফুটিয়া উঠে। এই দিব্য-রূপের ধ্যান-তন্ময়তায় নর-নারী পরিণামে সকল রূপের অতীত সত্তার বারংবার চকিত স্পর্শ লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। এই অর্থে প্রেমকে অধ্যাত্ম উপলব্ধি ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে :

"তোমার পরশ নাহি আর,
কিন্তু কী পরশমণি রেখে গেছ অন্তরে আমার,
বিশ্বের অমৃতছবি আজিও তো দেখা দেয় মোরে
ক্ষণে ক্ষণে, অকারণ আনন্দের সুধাপাত্র ভ'রে
আমারে করায় পান।" (কৃতজ্ঞ)

প্রেমে বিচ্ছেদ আছে, বিয়োগ আছে; কিন্তু অন্তরে তাহার রূপ অম্লান হইয়া বিরাজ করে। আমরা ধ্যানে তাহার সহিত নিত্য মিলিত হই। অশ্রুজলে নিত্য তাহাকে অভিষিক্ত করি। এইরূপে বাহিরে যাহাকে হারাই,তাহাকে অন্তরে আরো নিবিড় করিয়া লাভ করি। ধ্যানের এই মূর্তি আবার ক্ষণে ক্ষণে অসীম বা অরূপের আভাস দান করে, চেতনাকে বিশ্বের সকল রূপের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়। ইহা চেতনার এমন এক বিকাশ যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্বের অন্তহীন মাধুর্য-লোকের দ্বারা বিশ্বের অমৃতছবি উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।

বিশ্বে বঞ্চনা আছে, সহস্রবিধ প্রতারণা, অন্যায়, অবিচার ও মিথ্যাচার আছে; তাহার সঙ্গে আছে দেবতার দান এই প্রেমের অনুভূতি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মানুষ পরিণামে অমৃতের আস্বাদ পায় :

"যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি'
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে

যে সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয় তিমিরে।" (সৃষ্টিকর্তা)

তিনি প্রেমে আপনাকেই দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপে রূপে বহুধা করিয়াছেন, তাহার পর হইতে পরস্পরকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতার অন্ত নাই। একদিকে দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন রূপ-লোক অচিন্তনীয় বেগে আবর্তিত হইতেছে, অন্যদিকে তিনি দেশ-কালের ঊর্ধ্বে থাকিয়া নিয়ত ব্যাকুল সুরে তাহাকে আহ্বান করিয়া চলিয়াছেন। মিলন যেখানে, সেখানে তো রূপের কোন প্রকাশ নাই, তাই তাহা 'সর্বহারা প্রলয় তিমির।'

যে প্রেমে ঈশ্বর আপনাকে সৃষ্টি-রূপে বহুধা করিয়াছেন, সেই এক প্রেম মানুষের অন্তরে। নর-নারীর মধ্যে ব্যবধান আছে বলিয়া তো শূন্যতা পূর্ণ করিয়া এত গান জাগে, এত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটে। প্রেমে পরস্পরকে নিকটে লাভ করিবার এই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া পরস্পরের ঐশ্বর্য নিঃসীম হইয়া পড়ে।

নর-নারী যখন প্রেমে মিলিত হয়, তখন তাহাদের অন্তরে যে ছন্দের কম্পন জাগে, যে সুরের অনুরণন, তাহার সহিত বিশ্ব-ছন্দের ও বিশ্ব-সুরের মিল আছে। অন্তরে যে রূপ-লোক গড়িয়া উঠে তাহাতে বিশ্বের অন্তরালবর্তী পরিপূর্ণ রূপের আভাস ফুটিয়া উঠে।

প্রেমে প্রাণের দুর্বার প্রকাশ ঘটে। প্রাণের এই আবেগ সহ্য করিতে পারে যৌবন। যৌবন যেমন প্রাণকে জাগ্রত করিতে পারে, তেমনি প্রাণের বিচিত্র ক্ষুধাকে যৌবনই প্রশমিত করিতে পারে। আজ কবি প্রাণ-লোক হইতে অনেক দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার অবসিত যৌবনে আজ প্রাণের প্রেরণা একান্ত ক্ষীণ। প্রাণের আকস্মিক প্রবল স্ফুরণকে মহাদেবের গঙ্গোত্রীর প্রবল জলোচ্ছ্বাসকে ধারণ করিবার মত ইন্দ্রিয়ের সে সামর্থ্যও কবির আজ নাই। আজ তাই কবি কাহারও অন্তরে প্রাণ জাগ্রত করিতে আশঙ্কা বোধ করিতেছেন। তাহাতে যে তাঁহার প্রাণের দীনতা আরো স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আর প্রাণকে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য-মাধুর্যের সেই যে অন্তহীন লীলা তাহারও দিন শেষ হইয়া গিয়াছে:

"তপস্বিনী, তোমার তপের শিখাগুলি
হঠাৎ যদি জাগিয়ে তুলি
তবে যে সেই দীপ্ত আলোর আড়াল টুটে
দৈন্য আমার উঠবে ফুটে।

কবি হবে তোমার প্রেমের হোমাগ্নিতে
এমন কি মোর আছে দিতে।" (আশঙ্কা)

বিশ্ব-প্রাণের লীলা হইতে কবি আজ কত দূরেই না সরিয়া আসিয়াছেন। ওখানে তো তাঁহার একদিন স্থান ছিল। বিশ্ব-প্রাণকে কত গভীর করিয়াই না তিনি অন্তরের মধ্যে লাভ করিয়াছেন। সেই উপলব্ধির গভীরতায় তাঁহার প্রাণ-ধারা বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় একাকার হইয়া গিয়াছে। বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্য-মাধুর্যকে তিনি কত ভাবেই না আস্বাদ করিয়াছেন। তাঁহাকে কত বারবার অমৃতের আস্বাদ দিয়াছে, তাঁহার চেতনাকে অবারিত করিয়া কত বারবার সীমাহীন প্রসারতা দান করিয়াছে। কত বিচিত্র ভাবের, কত সূক্ষ্ম অনুভূতির সঞ্চার করিয়া এই দিন-রাত্রি এই ষড় রূপ ও রঙ্গের ষড় ঋতু তাঁহার মনকে বিভোর, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিয়াছে।

তাহার কোন অবশেষ কি ওই প্রাণ-লোকে কোন স্বরূপেই থাকে না? বিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে ওই সমস্ত কিছু মুহূর্তে শূন্যময় হইয়া যায়? এই সংশয়-ব্যাকুল জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলিয়াছে:

"আষাঢ়ের মেঘ রহে না কি মোরে চাহি?
সেই নদী যায় সেই কলতান গাহি,
তাহার মাঝে কি আমার অভাব নাহি?
কিছু কি থাকে না বাকি?" (বকুল বনের পাখি)

একদিন তাঁহাকে এই জগৎ হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইতে হইবে। সেদিন এই ধরিত্রীর মাধুরিমার কোথাও লেশমাত্র হানি ঘটিবে না। সেদিনও বসন্ত তাহার অফুরন্ত দানভার লইয়া মর্ত্যকে দুর্লভ ভূষায় সাজাইয়া তুলিবে। আম্রমুকুলের গন্ধে আতপ্ত বাতাস সঘন, আমন্থর হইয়া উঠিবে। আকাশে পরিপূর্ণ মাধুর্য লইয়া পূর্ণচাঁদ বিরাজ করিবে। আর নিম্নে বসুন্ধরার বক্ষে স্বপ্নের ঘোর জড়াইয়া আসিবে, সুখভরা মুগ্ধতা। বকুল বীথিকায় জ্যোৎস্নার আলো পড়িয়া আলোছায়ার স্বপ্ন-লোক রচিত হইবে। যেন মূর্ছাহত দুর্লভ কোন মাধুরী। প্রেয়সী নারীর মত বসুন্ধরা কণ্ঠে ফুলের মালা দুলাইয়া কাহার প্রত্যাশায় অধীর উন্মুখ। প্রতীক্ষায় আঁখি দুটি খিন্ন সজল।

এমনি কত দুর্লভ মুহূর্তে তিনি ব্যথার গান গাহিয়া ধরিত্রীকে উপহার দিয়াছেন। তাহার বেদনাকে আপনার অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন।

কবি যেদিন এই মর্ত্যে থাকিবেন না, সেদিন তাঁহার গান থাকিবে—ধরিত্রীর গণনাতীত বোধের প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে যাহার মধ্যে :

"তোমার ফাগুন উঠবে জেগে, ভরবে আমের বোলে,
তখন আমি কোথায় যাব চলে।
পূর্ণচাঁদের আসবে আসর, মুগ্ধ বসুন্ধরা,
বকুল-বীথির ছায়াখানি মধুর মূর্ছাভরা;
হয়তো সেদিন ব্যর্থ আশায় সিক্ত চোখের পাতা;
সেদিন আমি আসবো না তো নিয়ে আমার দান,
তোমার লাগি রেখে গেলেম গান।"

ধরণীর শ্যাম বক্ষে কত দুর্লভ রূপ ফুটিয়া উঠে। কত অনির্বচনীয়তার প্রকাশ ঘটায়; কত রেখা, কত রঙ্গ, কত গন্ধ। তাহার পরমুহূর্তে তাহারা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।—যে প্রকাশ এত সত্য, এত প্রত্যক্ষ, সমগ্র বিশ্বের যেন লক্ষ লক্ষ বৎসরের নিভৃত সাধনার ধন। বিনষ্টিতে তাহা একান্ত শূন্য হইয়া যায়? এই জগতে তাহার কোন অবশেষ থাকে না?

এই জিজ্ঞাসা কবিকে আপনার নিয়তি সম্পর্কে মুহূর্তে অত্যন্ত সচেতন করিয়া দিয়াছে। তাঁহার জীবন ও মৃত্যুর উভয়তট পূর্ণ করিয়া এই যে দুর্লভ সত্তার প্রকাশ, সহস্র বোধের এই যে নিত্য উৎসারণা, এত প্রেম, এত মাধুর্য, এত সাধ, এত আশা, মৃত্যুতে সমস্ত মিথ্যা হইয়া যায়? এই জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়া তাহার সমগ্র সত্তাকে মুহূর্তে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে।—ফিরিয়া ফিরিয়া বিমূঢ় বিহ্বল অবোধ জিজ্ঞাসা :

"সেই মাধুরী আজ কি হবে ফাঁকি?
লুকিয়ে সে কি রয়নি কোনোখানে?
কাহিনী তার থাকবে না আর বাকি
কোনো স্বপ্নে, কোনো গন্ধে গানে?
আরেক দিনের বনচ্ছায়ায় লিখা
ফিরবে না কি তাহার মরীচিকা?
অশ্রুতে তার আভাস দিবে নাকি
আরেক দিনের আঁখি।"

তাহার পর কবি-চিত্ত একপ্রকার আর্তনাদ তুলিয়াছে। অশ্রু-ধারার আর

শেষ নাই। মৃত্যুতে আর কোন স্বরূপে মর্ত্যকে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যায় না, তাহার একান্ত নিঃশেষ অবসান ঘটে :

"সব ছেড়ে যাব, প্রিয়ে,
সমুখের পথ দিয়ে,
ফিরে দেখা হবে না তো আর।
ফেলে দিয়ো ভোরে গাঁথা ম্লান মল্লিকার মালাখানি।
সেই হবে স্পর্শ তব, সেই হবে বিদায়ের বাণী।" (শেষ বসন্ত)

চতুর্দিকে প্রতিনিয়ত যে দুর্লভ সত্তার প্রকাশ দেখিতে পাই, যে অপরূপ রূপের প্রকাশ, তাহার বিকাশ ও বিনষ্টির মধ্যে আসক্তির ক্লিষ্টতা তো কোথাও নাই। জীবন ও মৃত্যুকে তাহারা কী আশ্চর্য নিরাসক্ত ভাবেই না বরণ করিয়া লয়। জীবন-রঙ্গমঞ্চে তাহারা ভিড় করিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হয়, আবার এই লীলার পালা সাঙ্গ করিয়া তেমনি হাসিতে হাসিতে মরণ-উৎসবে যোগ দেয়। মৃত্যুর শেষ মুহূর্তেও আপনার ঐশ্বর্যকে অকুণ্ঠিতভাবে দান করিয়া যায়।

যে প্রাণের লীলায় আমাদের এই দুর্লভ সত্তার প্রকাশ, জীবনে সেই প্রাণের বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটাইয়া একদিন সেই প্রাণের মধ্যে হারাইয়া যাইতে হইবে। এই সত্যকে যদি মর্মের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি, তবে আসক্তি একান্ত হইয়া জীবনকে এমন বিকৃত করিতে পারে না। প্রাণের এই লীলা-রূপটিকে কবি জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন।

"ফুলের মতন সাঁঝে পড়ি যেন ঝরে
তারার মতন যাই যেন রাত ভোরে,
হাওয়ার মতন বনের গন্ধ হ'রে
চলে যাই গান হাঁকি।" (বকুল বনের পাখি)

সাবিত্রী তাঁহার প্রভাতের দানকেই যে নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলেন তাহা তো নয়, তিনি যে তাঁহার বিদায়ের দানকেও অমনি বিচিত্র রূপ ও রঙ্গের ঐশ্বর্য দিয়া ভরাইয়া তুলেন। তাহার জীবন-প্রারম্ভের ও জীবন-শেষের প্রকাশের মধ্যে লেশমাত্র পার্থক্য নাই। অস্তোন্মুখ সূর্য তাহার শেষ কিরণজাল পূর্বাকাশে দিগ্‌দিগন্তে ছড়াইয়া দেয়, আকাশ-পটে রঙের তুলিকা হস্তে অন্তহীন রূপ ফুটাইয়া তুলে, অপরূপ, অনির্বচনীয়; মুহূর্ত পরে এই সমস্ত কিছুর উপর একটি কৃষ্ণ আবরণ টানা হইয়া যায়, সমস্ত রূপ মুছিয়া একাকার হইয়া যায়

তেমনি অহেতুক আনন্দে কবি তাঁহার জীবন-প্রারম্ভের সৃষ্টির লীলাকে জীবন-শেষের পূর্বেও যেন সত্য করিয়া তুলিতে পারেন। অস্তোন্মুখ সূর্যের মত অমনি প্রাচুর্যের ভারে আপনাকে নিঃশেষ করিয়া দেওয়া, তাহার পর আসক্তির সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অকুণ্ঠিত মনে মৃত্যুকে বরণ করিয়া লওয়া :

"তোমার দূতীরা আঁকে ভুবন-অঙ্গনে আলিম্পনা।
মুহূর্তে সে ইন্দ্রজাল অপরূপ রূপের কল্পনা
মুছে যায় সরে।
তেমনি সহজ হ'ক হাসি-কান্না ভাবনা-বেদনা—
না বাঁধুক মোরে।" (সাবিত্রী)

রবীন্দ্রনাথ আকাশ-মার্গে সূর্যের প্রকাশ, সঞ্চরণ এবং অস্তকে কত ভাবেই না প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কত বিচিত্র ভাবনার সহিত এই সকল প্রকাশকে না বিজড়িত করিয়াছেন। তিনি সূর্যের মধ্যে দেখিয়াছেন সমগ্র সৃষ্টির প্রকাশ ও বিনয়ের রূপ। নিখিল বিশ্বের প্রাণের উৎস সূর্য। সূর্যকে আবেষ্টন করিয়া তাই নিত্যদিন ছিল তাঁহার প্রাণের বন্ধনী। যে তমসার আবরণ উদ্‌বিগ্ন করিয়া সূর্যের নিত্য মহান্ আবির্ভাব, সে তমসা বিশ্বের পুঞ্জীভূত অপরাধ। সূর্যের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন নিত্য-চলার রূপ। সে চলায় ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া সূর্যের অন্তর্লীন সকল ঐশ্বর্যের অফুরান প্রকাশ ঘটে। তাহার উদয় ও অস্তের মধ্যে যে বিস্মিত মহান্ সৌন্দর্য তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাঁহার রূপ কল্পনার আর অন্ত ছিল না। সূর্য ছিল তাঁহার নিকট সকল চেতনার চেতনা, সকল জ্যোতির জ্যোতি। সকল রূপকে তিনি কেবল উদ্‌ভাসিত করেন না সকল রূপের অতীত যে অপরূপ তাহারও উৎস তিনি। এইরূপে সূর্য পার্থিব ও অপার্থিব সকল সৌন্দর্যের, সকল ভাবনা, বোধ ও চেতনার সম্মিলিত প্রকাশ। কবি আপনার চেতনাকে তাই নিত্যদিন সেই আদি চেতনাসঙ্গমে নিমগ্ন করাইয়া শুচি করিয়াছেন।

সূর্যের এই প্রতিটি রূপ-কল্পনা তিনি প্রাচীনতম সাহিত্য ঋগ্বেদ হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে আধুনিক কবির কাব্যে তাহা যে বহুবিধ সৌন্দর্য-মণ্ডিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই।

ঋগ্বেদের সূর্য ও সাবিত্রীর সূক্তগুলি হইতে কিছু কিছু অংশ সংগ্রহ করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে উভয় কবির মূল ভাবানুষঙ্গ কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

"দিব্য সাবিত্রী আপনার স্বর্ণরথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে অন্ধকারাবৃত অন্তরীক্ষে আবর্তিত হইয়া মর ও অমর সকলকে জাগরিত করিয়া লোক (সকল) নিরীক্ষণ করিতেছেন।

দিব্য সাবিত্রী ঊর্ধ্ব ও নিম্নপথে পরিভ্রমণ করিয়া মহান্ দুইটি শ্বেত অশ্বে যাত্রা করিয়া, সকল পাপ দূরীভূত করিয়া এখানে বহুদূর হইতে আগমন করেন।

স্বর্ণহস্তবিশিষ্টা, সর্বতোদৃষ্টিসম্পন্ন সাবিত্রী স্বর্গ ও মর্ত্যের মধ্যবর্তী স্থানে বিচরণ করেন, ব্যাধি দূরীকরণ করেন, সূর্যের নিকট আগমন করেন এবং পর্যায়ক্রমে আলোক ও অন্ধকার দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করেন।

সমস্ত কিছুর প্রকাশক সূর্যের আবির্ভাবে রাত্রি তাহার তারাদল লইয়া চোরের মত পলায়ন করেন।

দিবস ও রাত্রিকে পরিমাপ করেন, সকল জাত সামগ্রীর বিষয় চিন্তা করেন, আপনি মহান্ শূন্য-লোক পরিভ্রমণ করেন।

সূর্যের ইহাই দেবত্ব ও মহিমা, অস্তমিত হইলে তিনি অসমাপ্ত কর্মের উপর বিকীর্ণ কিরণ আপনার মধ্যে সংহৃত করেন, যখন তিনি তাঁহার পথগুলিকে মুক্ত করেন, তখন রাত্রি সমস্ত কিছুর উপর অন্ধকারের যবনিকা টানিয়া দেয়।

সূর্য, মিত্র ও বরুণের সম্মুখে স্বর্গের মধ্যস্থলে আপনার (জ্যোতির্ময়) রূপ উদ্ভাসিত করেন এবং তাঁহার কিরণজাল একদিকে তাঁহার অসীম এবং মহান্ শক্তি প্রসারিত করে, অন্যদিকে (অন্তর্ধানের) দ্বারা রাত্রির অন্ধকার আনয়ন করে।

ধাবমান সূর্য আপনার দ্রুত কিরণের দ্বারা মুক্ত ; তিনি পথিকদের পথ পরিক্রমা হইতে নিরত করিয়াছেন ; তিনি যোদ্ধাদের যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা দমিত করিয়াছেন, কারণ সাবিত্রীর ক্রিয়া (নিরুদ্ধ হইলে) রাত্রি আসে।

তিনি (রাত্রি) প্রসারিত (জগৎকে) আবৃত করেন, যেমন করিয়া (নারী) (বসন) বয়ন করে ; বিজ্ঞ ব্যক্তি যে কর্ম সম্পাদন করিতে সমর্থ তাহাকে আপনার কর্মের মাঝখানে ফেলিয়া রাখে ; কিন্তু যখন দিব্য, অক্লান্ত, ঋতুর বিভাগকারী সূর্য পুনরায় আবির্ভূত হয়, তখন সকলে (নিদ্রা হইতে) জাগিয়া উঠে।

দিব্য (সূর্য) সর্বাধিক শক্তিশালী (অশ্বে) (কিরণ)-জাল বিস্তার করেন এবং রাত্রির কৃষ্ণ আবাস ছেদন করিয়া অগ্রসর হন। সূর্যের কম্পমান কিরণ অন্তরীক্ষে বিস্তৃত চক্রের ন্যায় অন্ধকারকে দূরীভূত করে

এই সূর্য অধিক দূরবর্তী নন, অপ্রতিহত, উর্ধ্বে বা নিম্নে যেদিকে দৃষ্টিপাত করুন-না-কেন, কাহারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নন, কোন্ শক্তির দ্বারা তিনি পরিভ্রমণ করেন ? যিনি স্বর্গের মিলিত স্বপ্নের ন্যায় আকাশকে সঞ্জীবিত করেন, তাঁহাকে সত্যই কে দেখিয়াছে ?

সাবিত্রী নটের ন্যায় আপনার আকৃতিবিশিষ্ট বাহুগুলি প্রসারিত করুন। তিনি মর্ত্যের প্রান্তভাগ হইতে আকাশের শীর্ষদেশে আরোহণ করেন এবং পরিভ্রমণ করিতে করিতে সমস্ত কিছুকে নন্দিত করেন।

দিব্য সাবিত্রী স্বর্গ ও মর্ত্য-লোক সকল জ্যোতির দ্বারা পূর্ণ করিতেছেন, আপনার কর্মে আপনি নন্দিত, উৎপাদনের জন্য, বিশ্বকে নিয়মিত করিবার জন্য এবং আলোর দ্বারা তাহাকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য সাবিত্রী আপনার বাহু প্রসারিত করেন।”

তাহা ছাড়া কোন সত্তার বিনষ্টি তাহা যত দুর্লভই হোক না কেন, প্রাণের ক্ষেত্রে স্থায়ী শূন্যতা সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহার স্থান পূর্ণ করিয়া নূতন সত্তার আবির্ভাব ঘটে। প্রাণের এই লীলা সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি আপনার ব্যক্তিগত শোক ও চিরন্তন মানব-ভাগ্যকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন ঃ

“শুকিয়ে পড়া পুষ্পদলের ধূলি
এ ধরণী যায় যদি বা ভুলি—
সেই ধূলারি বিস্মরণের কোলে
নতুন কুসুম দোলে।” (বিস্মরণ)

বিশ্বের সেই প্রথম সূর্যোদয় কিরূপ ছিল, কোন্ বিস্মিত সৃষ্টির সমক্ষে তাহার একের পর এক রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছিল ? সেই আদি-সৃষ্টির কাল হইতে এ পর্যন্ত যে অচিন্তনীয় কালের বিস্তার তাহাতে কত রূপ, কত রঙ্গেরই না প্রকাশ ঘটিয়াছে! আবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। আজও মহাকালের বক্ষে নিত্য রূপের আঁকা ও মোছার বিরাম নাই। তাহার পর যুগ-যুগান্তর কাল পরে মনুষ্য-চেতনার দুর্লভ প্রকাশ। আর সবচেয়ে দুর্লভ প্রকাশ তাহার এই প্রেম, যাহা বিচ্ছেদ-আশঙ্কায় নিয়ত কাতর, সদা অশ্রুমুখী। এই দুর্লভতম প্রকাশও নিয়ত জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। এই বিশ্বের প্রাঙ্গণে যুগে যুগে কত মানব-যাত্রী আসিয়াছে, সংসার পাতিয়াছে, পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছে,

তাহারা আজ কোথায় ? এখানে আজ নূতন যাত্রীর মেলা। তাহাদের পদচিহ্নে পূর্বের পদচিহ্ন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিশ্বের এই দুর্লভ সৌন্দর্য ও প্রেমকে স্থায়ী করিয়া রাখিবার আশায় মানুষ তাহার বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে তাহাদের রূপায়িত করিবার চেষ্টা করে। প্রাণ-জাহ্নবীর বক্ষে তাহারাও কিছুকাল ভাসিয়া স্রোতের আবর্তে একদিন কোথায় হারাইয়া যায়। কবির এই সাক্ষাৎকারের মধ্যে কি জগৎ ও জীবনের, সমগ্র বিশ্বসৃষ্টির মায়া রূপ ফুটিয়া উঠে নাই ? কবি সে কথা বলিয়াছেন:

"এমনি রঙের খেলা নিত্য খেলে আলো আর ছায়া—
এমনি চঞ্চল মায়া
জীবন অম্বর তলে ;
দুঃখে সুখে বর্ণে বর্ণে লিখা—
চিহ্নহীন পথচারী কালের প্রান্তরে মরীচিকা।
তারপরে দিন যায় অস্ত যায় রবি ;
যুগে যুগে মুছে যায়—লক্ষ লক্ষ, রাগরক্ত ছবি।" (ছবি)

অধ্যাত্ম-চেতনার কোন্ স্তর হইতে কবির কাব্য বিরচিত এবং কবির কাব্য পাঠক-চিত্তে কোন্ উন্নততর বোধের জাগরণ ঘটায়, এক কথায় কবির কাব্যের সিদ্ধি-সীমা কোথায়, তাহার পরিচয় কবি স্বয়ং পূরবীর একটি কবিতায় দান করিয়াছেন।

"আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি জানি কাহার পরশ খোঁজ,
সেই প্রভাতের আলো এলো, আমি কেবল ভাঙ্গিয়ে দিলাম ঘুম।" (বাতাস)

রবীন্দ্র-কাব্য আমাদের অন্তরে সুপ্ত অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত করে। যে চূড়ান্ত উপলব্ধিতে মানব-জীবনের সকল আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়া যায়, রবীন্দ্র-কাব্যে সেই উপলব্ধি হয়ত ঘটিবে না, কিন্তু যে অধ্যাত্ম ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া পরিণামে ওই ফল লাভ ঘটে, রবীন্দ্র-কাব্য-সৃষ্টির পশ্চাতে সেই ব্যাকুলতার নিপীড়ন রহিয়াছে। রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে অন্তরে সেই ব্যাকুলতা সঞ্চারিত হইয়া যায়:

"আমি জানি তুমি কারে খোঁজ,
সেই আকাশে জাগল আলো, আমি কেবল দিনু তোমায় আনি
সীমাহীনের বাণী।" (বাতাস)

রবীন্দ্র-কাব্য মুক্তির লোক নহে। বস্তুত, কোন কাব্যই তাহা নহে, পরম-রসের আলম্বন স্বরূপে তাহা সত্য। ঋষির দিব্য সাক্ষাৎকার যে-কোন আলম্বন-শূন্য, কাব্যপাঠে সেই সাক্ষাৎকার ঘটে একান্ত চকিতে, বিশিষ্ট কোন ভাব আশ্রয় করিয়া।

মানবাত্মার ব্যাকুলতার মূলে যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা আছে, রবীন্দ্রনাথ তাহা নিঃসংশয়ে জানেন। তিনি তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া সেই সীমাহীনের বাণী প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু কবির নিজের কথা কি? কবি নিজের জীবনে কোন্ ফললাভ আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন? কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, কী তুমি চাও নিজে? তবে তিনি কি উত্তর দিবেন?

কবি স্বয়ং মুক্তিতে বিলয় চান নাই, সকলের অন্তরে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া তুলিতে চান। কবি যদি স্বয়ং মুক্তিলাভ করিতে চাহিতেন, তবে সকলকে মুক্তির বাণী শুনাইত কে? ঈশ্বরের দূত তিনি। তাঁহার কাব্যে তিনি পরমের লিপি চিত্রিত করিয়াছেন:

"আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান
আমার শুধু গান।" (বাতাস)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্য-সাধনার সামর্থ্য-সীমা আর একদিক দিয়া আর একভাবে নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

যে মন চঞ্চল, বহির্মুখী, বাহিরে রূপের জগতে বন্দী, কেবল অস্থির হইয়া রূপ হইতে রূপে বিহার করিয়া ফিরে সে মন রবীন্দ্র-কাব্য-রস আস্বাদ করিতে পারিবে না। রবীন্দ্র-কাব্যের মর্মমূলে যে ভাব-প্রেরণা ও সত্যবোধ রহিয়াছে, সে মন কখনই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। রবীন্দ্র-কাব্যের বাণী সে মনের কাছে ব্যর্থ।

প্রকৃতির মধ্যে এক-একটি মুহূর্ত ঘনাইয়া আসে, যখন মনে হয় সমগ্র প্রকৃতি দয়িতকে লাভ করিবার জন্য প্রতীক্ষা-উন্মুখ। চতুর্দিকে ধীরে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে, যেন একটি মুগ্ধতার আস্তরণ। ক্লান্ত হংসের দল জনশূন্য তটপানে ফিরিয়া আসিয়াছে। নদী-জলের মধ্যে একটি পরিব্যাপ্ত স্তব্ধতা। যেন আকাশের কোন মহামৌন বাণীকে কান পাতিয়া শুনিতে চায়, যেন মহাশূন্যে অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্রের মধ্যে স্পন্দিত সংগীত শুনিবার অভিলাষী। একটি একটি করিয়া পাখি নীড়ে ফিরিয়া আসিতেছে। বেনু শাখার অন্তরালে

অস্তোন্মুখ সূর্য শেষ বিদায়ের পূর্বে আকাশকে রঙের দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করিয়া দিতেছে। দিনের ক্ষুব্ধতা ধীরে শান্ত হইয়া আসিতেছে। আকাশে সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। নারীর উদার স্থির দৃষ্টির সহিত তাহার মিল। বনের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে চাঁপার মৃদু গন্ধ যেন অব্যক্ত বেদনার মত; বিকীর্ণ শুষ্ক কুসুমের মত মনের ভাবনা কত লঘু, শিথিল।

এমনি একটি মুহূর্তে যদি মন খোলা থাকে, অর্থাৎ সমগ্র প্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত প্রত্যাশার ভাবটি যদি অন্তরের মধ্যে ঘনাইয়া আসে; অমনি বিষাদ, অমনি অনৈসর্গিক বেদনাবোধ; যদি সেই বেদনার দীপ জ্বালাইয়া হৃদয় কাহারো প্রত্যাশায় আসন পাতিয়া বসিয়া থাকে, তবে কবির কাব্য সেই বেদনাকে আরো নিবিড় করিয়া তুলিবে, সেই আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র, ধ্যানকে আরো গভীর করিয়া তুলিবে। প্রতীক্ষাশেষে, ধ্যানের পরিণামে যে চূড়ান্ত ফললাভ, কবির কাব্যে তাহা হয়ত পাওয়া যাইবে না, তবে তাহাকে লাভ করিবার জন্য নিগূঢ় প্রত্যয় জাগাইয়া নর-নারীর উৎসুক প্রতীক্ষাকে সহনীয় করিয়া তুলিবে :

> "ছন্দে গাঁথা বাণী তখন পড়ব তোমার কানে
> মন্দ মৃদুল তানে
> ঝিল্লি যেমন শালের বনে নিদ্রা নীরব রাতে
> অন্ধকারে জপের মালায় একটানা সুর গাঁথে।
> একলা তোমার বিজন প্রাণের প্রাঙ্গণে
> প্রান্তে বসে একমনে
> এঁকে যাব আমার গানের আলপনা,—" (আনমনা)

এই প্রসঙ্গে খেয়াকাব্যের 'গান শোনা' প্রভৃতি কবিতার কথা স্বাভাবিকভাবে স্মরণে পড়িতে পারে। এই জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে একটি ভাব-সঙ্গতি স্পষ্টই লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

রবীন্দ্র-কাব্যে অতীতচারিতার অথবা স্মৃতি-সঞ্চরণের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। সেই সম্পর্কে প্রসঙ্গক্রমে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

জীবনে বিশেষ কোন ঘটনা, অভিজ্ঞতা, বিশেষ কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য— কতকটা অবচেতন মানসকে আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকাল পরে কীভাবে প্রতীক স্বরূপতা লাভ করে এবং এইরূপে সাহিত্যের উপাদানে পরিণত হয় আমরা সেইদিক হইতে কবির অতীতচারিতার কথা আলোচনা করিতেছি না।

যে রোমান্টিক কবি-ভাবনা সুদূর অতীত-লোকে প্রয়াস করে এবং এইরূপে উভয় লোকের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে বিচিত্র সমৃদ্ধ কল্পনায় ভরাইয়া তোলে এই স্থলে কবির সেই রোমান্টিক ভাবনার কথাও নির্দেশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

শিল্পী যেমন করিয়া নিত্য নূতন রঙ ও রেখার বিন্যাসকে ইতিপূর্বে বিন্যস্ত রঙ ও রেখার সহিত নিয়ত মিলাইয়া দেখে এবং এইরূপে ফিরিয়া আবার নূতন রঙ ও রেখা সংযোগ করে এমনি ভাবে ধীরে অন্তরের স্থির (বাহিরের রূপ সঞ্চয়ের ভিতর দিয়া তাহাও স্পষ্টীকৃত হইয়া চলে) ধ্যান-রূপটিকে বাহিরে ফুটাইয়া তুলে, কবি ঠিক তেমনি করিয়া আপনার জীবনে নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ভিতর দিয়া অন্তরে সত্তার ধীর বিকাশটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের অতীতচারিতার নিগূঢ় রহস্য রহিয়াছে একমাত্র ইহার মধ্যে। লব্ধ নূতন অভিজ্ঞতার মূল্য বিচার করিতে এবং তাহাকে স্থায়ী বোধের বিকাশের সহিত নিয়ত সামঞ্জস্যীভূত করিয়া তুলিবার এবং এইরূপে প্রতি মুহূর্তের জীবনকে তাহার আদি-অন্ত সমেত সমগ্র রূপে স্থির ধ্যান-নেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়া চলিবার যে পরিচয় আমরা কবির জীবনে লাভ করি তাহার তুলনা বোধ হয় বিশ্বের অন্য কোন স্রষ্টার জীবনে লাভ করিতে পারা যাইবে না।

কবির জীবনে কিশোর কাল হইতেই কেমন করিয়া এই জাতীয় একটি অধ্যাত্ম-বিশ্বাস গড়িয়া উঠে যে জীবনের কোন অভিজ্ঞতা, কোন বোধ একান্ত রূপে হারাইয়া যায় না, তাহা জীবনের মধ্যে কোন-না-কোন স্বরূপে থাকিয়া যায়। এই সকল অভিজ্ঞতা আশ্রয় করিয়া অসীম আপনার একটি কল্প-রূপকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। অতিচেতনার এই কার্যে কবির সচেতন মানস অত্যন্ত আনুকূল্য করিয়াছে।

ব্যক্তি-জীবন সম্পর্কে যাহা সত্য, সমষ্টি-জীবন সম্পর্কেও তাহা নিশ্চয়ই সত্য। ইহা তত্ত্বালোচনার দিক। আমরা প্রসঙ্গক্রমে কোথাও কোথাও ইহার উল্লেখও করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

"যেথায় পুরানো গান যেথায় হারানো হাসি
যেথা আছে বিস্মৃত স্বপন
সেইখানে সমতলে রেখে দিস গানগুলি,
রচে দিস সমাধি শয়ন।" (সন্ধ্যা : সন্ধ্যাসঙ্গীত)

মূল এই বোধটি প্রভাত-সঙ্গীত আরো কতকটা বিকাশ লাভ করিয়া একটি দার্শনিক-বোধ রূপে গড়িয়া উঠিয়াছে।

ব্যক্তির জীবনে সকল অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা লইয়া কী জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া একটি বোধের বিকাশ যেমন ঘটিয়া চলিয়াছে,

"স্মৃতির কণিকা তারা স্মরণের তলে পশি
রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার-পাশে
চিনিতে পারিনে তাহা আর।"

(অনন্ত জীবন : প্রভাত-সঙ্গীত)

তেমনি নিখিল বিশ্বের অন্তরালেও একটি 'অনন্তজীবন মহাদেশ' নিয়তই গড়িয়া উঠিতেছে। (কবিতার ভাব-জীবন যেমন ব্যক্তি-আত্মা নয়, এই 'অনন্ত-জীবন মহাদেশ'ও তেমনি বিশ্বাত্মা নয়)।

যে জীবন নিয়ত জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে, চন্দ্র-সূর্য হইতে, কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র হইতে যে আলোর ধারা নিয়ত ঝরিয়া পড়িতেছে মানব সংসারের 'যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ', সেই সমস্ত কিছু 'অনন্ত জীবন মহাদেশে' আসিয়া মিলিত হইতেছে। এই মহাদেশ রচনার কোথাও কি কোন পরিণাম আছে, না নিত্য কাল ধরিয়া ইহার শুধু হইয়া উঠা ?

"জগতের মাঝখানে সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে
অনন্ত জীবন মহাদেশ,
কে জানে হবে কি তাহা শেষ।"

(অনন্ত জীবন : প্রভাত-সঙ্গীত)

ভাব-সত্তার এই ধীর বিকাশকে কবি-জীবনের প্রথম পর্যায় হইতে একেবারে শেষ পর্যায় পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করিয়া গিয়াছেন। তাহার কি বিস্ময়কর প্রকাশ-রূপ। কবির জীবনে তাহা পরিণামী রহিয়া গিয়াছে।

জীবনের পূর্বাপরকে একটি স্থির দৃষ্টিতে দেখিবার এবং উভয়ের পূর্ণ মান নির্ণয়ে অসামান্য শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় কবির একান্ত কৈশোর হইতে।

এক্ষেত্রে 'প্রভাত-সঙ্গীত' এর 'পুনর্মিলন' কবিতাটি আমরা উল্লেখ করিতে পারি। কবিতাটির মধ্যে শৈশবে প্রকৃতি কোন্ স্বরূপ লইয়া কবির নিকট

প্রতিভাত হইত, পরে বয়ঃসন্ধিকালে বিচ্ছিন্ন সত্তায় প্রকৃতির আসঙ্গ লাভের গভীর আকাঙ্ক্ষা এবং তাহারও পরে প্রকৃতির সহিত পুনর্মিলনে কবির নিবিড় আনন্দের উপলব্ধির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। তাঁহার 'জন্মদিন'-বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে এই ধারার কি বিস্তারিত পরিচয় আমরা লাভ করি না?

কবির অন্তর্দৃষ্টি কী গভীর, কতদূর ব্যাপক এবং কী রূপ অভ্রান্ত ছিল, কৈশোরের এই জাতীয় কবিতাগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিয়া আছে।

শৈশবে প্রকৃতির সৌন্দর্য কবির অন্তরে যে অতলের রহস্য সঞ্চারিত করিয়া দিত কবি তাহার কয়েকটি চিত্র পরপর চিত্রণ করিয়াছেন। এই চিত্র কয়েকটি কবির স্মৃতি-লোকে চিরস্থায়ী হইয়া গিয়াছে। এই চিত্রগুলির পরিচয় কবির পরবর্তী কাব্য-রচনার মধ্যে বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, জীবন-স্মৃতির কথা আর নাই বা উল্লেখ করিলাম।

শৈশবে অতি প্রত্যুষে যখন পূর্বাকাশ সবে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছে, কবি তখন তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে বাগানে ছুটিয়া আসিতেন। বাগানের এক পাশে সারি-দেওয়া নারিকেলগাছ। আম্রমুকুলের গন্ধে বাতাস আকুল। পথের দুই ধারে রাশি রাশি বেলফুল ফুটিয়া আছে। বাগানে পৌছাইবা মাত্র চারিদিক হইতে গন্ধ ছুটিয়া আসিয়া কবিকে অভিভূত করিয়া দিত।

চারিধারে জুঁইগাছের মাঝখানে বাঁধানো বেদী। প্রাচীরের ওপারে অপার মহিমা লইয়া সূর্যোদয় হইত। সূর্যের প্রথম আলোকসম্পাত কবির সমস্ত দেহে মনে অলৌকিক এক পুলকের সঞ্চার করিয়া দিত।

সেই সঙ্গে আর একটি ছবি কবির মনে পড়িয়া যায়। শৈশবে কত নির্জন দুপুরে কবি একটি জানালার উপর বসিয়া থাকিতেন। চোখে পড়িত উদার নীল আকাশ, মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিত চিলের সুতীক্ষ্ণ স্বর। গলির এক পার্শ্বে পুকুর। সারাদিন স্নানার্থীদের আনাগোনার বিরাম নাই। তীরে রাজহাঁস আপন মনে ভাসিয়া বেড়ায়। পুকুরের পূর্বধারে একটি প্রাচীন বট। তাহার ঘন ডালপালা এবং শিকড় বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নের এই শান্ত ছবি, দূরশ্রুত পাখির একটানা কূজন, সমস্ত কিছু বিজড়িত হইয়া কবির মনে কী রহস্য ও বিস্ময় সঞ্চারিত করিয়া দিত।

সেই সঙ্গে আরো একটি ছবি। গঙ্গার তীরে ছোট একটি ঘর, সম্মুখে পেয়ারাগাছ ফলে ফুলে ভরিয়া আছে। তাহারই তলায় বসিয়া শৈশবে

তিনি কতদিন উদাস দৃষ্টি মেলিয়া প্রবহমান নদীর স্রোতের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিত। নদীজলের উপর ছায়া ও আলোর কম্পন, ধীর মৃদু বাতাস, পাতার মর্মর শব্দ, সব মিলিয়া কবির মনকে কোন্ রূপকথার রাজ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইত।

এই চিত্রগুলি কবির স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া ধীরে রূপান্তরিত হইতে হইতে প্রতীক স্বরূপতা লাভ করে। অর্থাৎ তখন তাহা আর প্রাকৃতিক দৃশ্যমাত্র থাকে না, এক অজ্ঞাত লোকের আভাস স্বরূপে সত্য হইয়া উঠে। এখানে যে কয়েকটি চিত্র-রূপের পরিচয় আছে, সেগুলির মধ্যে এই প্রতীকধর্মিতার কোন প্রকাশ নাই সত্য, তবে পরবর্তী কালে ইহা যে স্বাভাবিক নিয়মে প্রতীকত্ব লাভ করে তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমরা কবির প্রতি মুহূর্তের অতীত জীবনের সহিত বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতাকে মিলাইয়া দেখিবার চেষ্টার কথাই বলিতেছি, এবং তাহা যে একান্ত শৈশব হইতেই সুরু হয় তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। এই চেষ্টা-রূপকে স্থপতির স্থাপত্য সৃষ্টির সহিত আমরা তুলনা করিয়াছি। বহির্জীবনের সমসূত্রে এইরূপে কবির একটি ভাব-জীবন ধীরে গড়িয়া উঠিতেছে। উভয়ের মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু তাহা স্বারূপ্যের যোগ নহে। নিহিত তাৎপর্য বিজড়িত হইয়া তাহা কবির এক চিন্ময় রূপ। কবির সমগ্র সৃষ্টিকর্মের মধ্যে তাহারই ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন প্রকাশ।

শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে কিশোর প্রেমের অনেকগুলি আখ্যায়িকা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূরবীর 'কিশোর প্রেম', শ্যামলীর 'কলি', 'মিলভাঙ্গা' হঠাৎ দেখা কিংবা আকাশপ্রদীপের শ্যামা ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে

পরিণত বয়সে জীবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দিন অবসিত হইয়া গেলে মানুষ স্মৃতির সঞ্চয়কে বাহির করিয়া আনিয়া তাহাকে গভীর মমতায় ফিরিয়া ফিরিয়া প্রত্যক্ষ করে। কৈশোরে অনুভূত সৌন্দর্য ও প্রেমের স্মৃতিকে আশ্রয় করিবার কবির জীবনে ইহাই যে একমাত্র কারণ নয়, তাহাই আমাদের বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিতে হইবে। কৈশোরে অনুভূত প্রেমের অনুভূতি কবির জীবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র রূপে অনুভূত

হইয়াছে। ইহার মধ্যে আছে ধীর পরিণামের একটি ধারা। এইরূপে সামগ্রিক ভাবে কখন বা বিচ্ছিন্ন এক-একটি বিশেষ অনুভূতিকে কবি এমনি ধীর বিকাশের দিক দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। একই মূর্তিকে ইহা নানা দিক দিয়া প্রত্যক্ষ করিবার ব্যাকুলতা। সকলের পশ্চাতে সেই একই প্রেরণা ক্রিয়া করিয়াছে। বীথিকার 'কৈশোরিকা, আকাশ প্রদীপের বধূ', এবং আরোগ্যের তের সংখ্যক কবিতাটি বিশেষ করিয়া স্মরণে পড়িতেছে।

ইহা তাই বঞ্চিত প্রাণের শূন্যতাকে ভরাইয়া তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা নয়। জীবনের আদি ও অন্তকে তাহার সামগ্রিক রূপে বিচিত্র বোধাশ্রয়ী করিয়া প্রত্যক্ষ করিবার গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা জাত।

আকাশ প্রদীপের 'স্কুল পালানে', 'ধ্বনি' এবং 'কাঁচা আম' প্রভৃতি কবিতা সন্ধ্যা-সঙ্গীতের কবিকে আকাশপ্রদীপের কবির সহিত এক সূত্রে গাঁথিয়া তাঁহাকে কি আশ্চর্য ঐক্য ও অখণ্ডতা দান না করিয়াছে।

ইহা যে নিছক রোমান্টিক কবি-ভাবনা বা পরিণত বয়সের অতীতচারিতার ফল নয় তাহা নিশ্চয়ই আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

পূরবীর 'পঁচিশে বৈশাখ'-এর মধ্যে একদিকে যেমন আছে অসীম বা অরূপের উপলব্ধি, যে মুহূর্তে—

"জন্ম মরণের
দিগ্বলয় চক্ররেখা জীবনেরে দিয়েছিল ঘের,
সে আজি মিলাল।"

কিংবা, "আলোকের অসীম সঙ্গীতে
চিত্ত মোর ঝঙ্কারিছে সুরে সুরে রণিত তন্ত্রীতে।"

তেমনি অন্যদিকে আছে সেই অসীমের প্রেরণায় জীবনকে নিত্য নূতন বোধের ভিতর দিয়া প্রসারিত করিবার আকাঙ্ক্ষা।

এক্ষেত্রে সামগ্রিক রূপে জীবনকে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষার দিকটি নাই বটে, কিন্তু অসীমের প্রেরণাই যে তাঁহার জীবনকে একটি সমাপ্তির মধ্যে না টানিয়া আনিয়া তাহাকে ক্রমাগত অগ্রসর করিয়া দিতেছে তাহা বোধ করিতে পারা যায়। কবির ভাব-জীবনকে আশ্রয় করিয়া অসীমের যে একটি অভিপ্রায় চরিতার্থ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে জীবনের নিয়ত প্রসার আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে।

কবির এই ভাব-রূপ গড়িয়া উঠিয়াছে, বলিয়াছি একদিকে অসীম অন্যদিকে সীমার যোগে। কবি কোথাও একটি কোথাও অন্যটির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। পরিশেষের 'জন্মদিন' কবিতাটির মধ্যে সীমার দিকটিই বিশেষ করিয়া আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ সপ্তকের তেতাল্লিশ সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে কবি আপনার জীবনের তীর প্রসারকে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাহার অনেকটাই কবির সচেতন বোধের সীমার বহির্ভূত।

আমরা কবির বহির্জীবন এবং কাব্যে রূপায়িত ভাব-জীবনকে আশ্রয় করিয়া যতটুকু আভাস ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি না কেন, তাহা কবির সেই বিপুল ভাব-জীবনের তাঁহার মানসী-মূর্তির কতটুকু পরিচয় বহন করে। অথচ কবির সম্পর্কে জনগণ-মানসে প্রতিফলিত যে ছবি তাহাতেও কবিকে স্বীকৃতি দান করিতে হইয়াছে।

জনগণ-মানসে প্রতিফলিত কবির যে মানসী মূর্তি তাহাকে তিনি স্বীকার করিলেও, কবি-চেতনা কিন্তু তাহাতে আদৌ বিক্ষুব্ধ হয় নাই। তিনি আপনার স্থির ধ্যাননেত্রে তাহাকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং পূর্বাপরের বিকাশ-ধারা পর্যালোচনা করিয়া পূর্ণতার একটি চিত্র উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সে কার্যে অসীমের সহিত তাঁহার নিগূঢ় পারস্পরিক যোগ। আপনার ভাব-জীবনকে সেই সর্বশেষ পরিণতি দান করিবার জন্য কবি আজ উন্মুখ।

"নির্জন নামহীন নিভৃতে ;
নানা সুরের নানা তারের যন্ত্রে
সুর মিলিয়ে নিতে দাও
এক চরম সঙ্গীতের গভীরতায়।"

জীবনের ধীর পরিণতির সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য ধীরে লুপ্ত হইতে থাকে কিন্তু বহির্বিশ্বের সহিত যোগে কবির অন্তরে আর একটি যে দিব্য সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে মৃত্যু তাহাকে কোনদিন স্পর্শ করিতে পারিবে না। মৃত্যুতে সেই অমৃত রূপ কবির চিরযাত্রার সহচর হইয়া থাকিবে। কবি আপনার এই ভাব-জীবনের তত্ত্বে সীমা অসীমের চিরন্তন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাইয়াছেন।

অদ্বৈতবাদী দার্শনিকগণ বলেন কবির জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত ভাব-জীবনের এই তত্ত্বও মূলত রূপের তত্ত্ব। মৃত্যুর আলোকসম্পাতে কবির এই সকল

সীমার তত্ত্ব বিগলিত হইয়া গিয়াছে। অদ্বৈত উপলব্ধিতে একথা হয়ত সত্য, কিন্তু দ্বৈতবোধে ভক্তির ক্ষেত্রে রূপ যে-কোন পরিণামে কাম্য। কবির ভাব-জীবনের বিকাশের তত্ত্ব ভক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে যে এক অসামান্য দান তাহাতে সংশয় নাই। আমরা উপরে যে মন্তব্য করিয়াছি তাহা বিশেষ করিয়া সেঁজুতির 'জন্মদিন' কবিতাটি উপলক্ষ্য করিয়া। সেঁজুতির মধ্যে এই পর্যায়ের আর একটি কবিতা আছে।

কবির জীবনে আর যাহা কিছু সমস্তই যদি বিনষ্ট হইয়া যায় তাহার জন্য কবির অন্তরে কোন ক্ষোভ থাকিবে না। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া মানবিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তরে ক্ষণে ক্ষণে যে অপূর্বতার আস্বাদ নামিয়া আসিয়াছে, সব ক্ষয়ক্ষতি শেষে তাহা চিরন্তন হইয়া থাকিবে।

সেঁজুতির জন্মদিন কবিতা আলোচনা প্রসঙ্গে অদ্বৈতবাদীদের রূপ-তত্ত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছি। এই সম্পর্কে সংশয় নিবিড় হইয়া আসে যখন নবজাতকের 'জন্মদিন' কবিতা পাঠ করি।

কবির অন্তর-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রূপকার যে রূপ ফুটাইয়া তুলিবার কার্যে ব্যাপৃত তাহা কবিরও বোধের অগম পারের সামগ্রী।

"কাল সমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতি।" (জন্মদিন : নবজাতক)

সেখানে বাহির হইতে স্পষ্ট ও অস্পষ্টতায় মিশাইয়া খণ্ড খণ্ড আভাস, রূপ আর কল্পনা বিজড়িত করিয়া মানুষ তাহার কত রূপ না গড়িয়া তুলিয়াছে। ব্যক্তি-চিত্তে অনুভূত রবীন্দ্রনাথের এমনি কত-না রূপ। সেই সকল রূপ না রবীন্দ্রনাথের না তাঁহার অন্তর্যামীর পরিচিত।

"তোমরা রচিলে যারে
নানা অলঙ্কারে
তারে তো চিনিনে আমি,
চেনে না মোর অন্তর্যামী
তোমাদের স্বাক্ষরিত সেই মোর নামের প্রতিমা।

বিধাতার সৃষ্টি সীমা
তোমাদের দৃষ্টির বাহিরে।" (জন্মদিন ঃ নবজাতক)

এই মন্তব্য যত রূঢ় হোক-না-কেন, ইহা নির্মম সত্য। এমন অকুণ্ঠিত মন্তব্য কবি ইতিপূর্বে কোথাও করেন নাই।

কবির ভাব-জীবন অদৃশ্য মূর্তিকারের খেলানা। কেন যে তিনি এত প্রেমে এত অনুরাগে এমন অপরূপ খেলানা সৃষ্টি করেন, আবার নির্মম হস্তে ভাঙিয়া ফেলেন তাহা যাঁহার লীলা তিনিই বলিতে পারেন। এখানে সকল রূপ বিনষ্টির কথা থাকিলেও কবির অজ্ঞাত কোন স্বরূপে তাহা যে কোথাও থাকিয়া যায় এমন স্থির আধ্যাত্মিক প্রত্যয় কবি ইহার পূর্বে এবং পরে বারংবার প্রকাশ করিয়াছেন।

"সংসার খেলার কক্ষে তাঁর
সে খেলে না রচিলেন মূর্তিকার
মোরে লয়ে মাটিতে আলোতে
সাদায় কালোতে,
কে না জানে সে ক্ষণভঙ্গুর
কালের চাকার নিচে নিঃশেষে ভাঙিয়া হবে চুর।"
(জন্মদিন ঃ নবজাতক)

পূরবীর অনেকগুলি কবিতার মধ্যে কবি-চিত্তের একপ্রকার অসম্পূর্ণতা-বোধের অতি তীব্র বেদনা লক্ষ্য করা যায়।

কবি যাহাকে চরম উপলব্ধি বলিয়াছেন, যে উপলব্ধিতে জীবনের সর্বশেষ চরিতার্থতা, অন্তত পূরবী কাব্যের মধ্যে কবি তাহার যে স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া লইবার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে কবির উপমাগুলির সহায়তা গ্রহণ করিতেছি।

অস্তোন্মুখ সূর্য যেমন শেষ বিদায়ের পূর্বে সমস্ত জল-স্থল-অন্তরীক্ষকে আপনার দাক্ষিণ্যের ভারে পূর্ণ করিয়া দেয়,—নিঃশেষ সমর্পণের অপরূপ মহিমা; কবি তেমনি করিয়া আপনার জীবনের শেষদিনগুলিকে অফুরন্ত দৃষ্টিতে পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন তবে ধন্য বোধ করিবেন।

বসন্তে প্রাণের প্রাচুর্য প্রকৃতি যেমন আপনাকে বর্ণে, রূপে, রসে, গন্ধে দান করিয়া শেষ করিতে পারে না; তেমনি পূর্ণতার উপলব্ধির নিবিড় আনন্দে

কবি যেন শেষবারের মত আপনাকে নিরন্তর সৃষ্টির ভিতর দিয়া নিঃশেষ করিয়া দিতে পারেন।

কালবৈশাখীর বজ্র নিপাতনে ঘনকৃষ্ণ মেঘ যেমন ধারায় ধারায় নিম্নে ঝরিয়া পড়ে, পরিশেষে তাহার আর চিহ্নমাত্র থাকে না; কেবল চির-নির্মল অপার নীল আকাশ উর্ধ্বে বিরাজ করে, কবি তেমনি করিয়া আপনার অন্তরের অসহনীয় দাগ ভার নামাইয়া দিয়া মৃত্যুতে চির অবসান লাভ করিবেন।

আমরা জানি কবি বিশ্ব-সত্তাকে যত গভীর করিয়া লাভ করিয়াছেন তাঁহার সৃষ্টি-প্রেরণা ও সৃষ্টি-বৈচিত্র্য তত অফুরান হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্ব-সত্তা লাভ তাই কবির লক্ষ্য, কারণ ওই পরিণাম লাভ করিলে সৃষ্টি-প্রেরণা অফুরান হইয়া উঠে।

'মুক্তি' ও 'লিপি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কবি আপনার সাধনার এই গল্পের কথাই একান্ত স্পষ্ট করিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা কবির অসম্পূর্ণতা-বোধের কথা বলিতেছিলাম। কবির কাব্য হইতে প্রথমে তাহারই কিছু পরিচয় উদ্ধৃত করি, তাহার পর এই অসম্পূর্ণতা-বোধের যে স্বরূপ আমাদের দিক হইতে অনুভূত হয়, তাহা উল্লেখ করিবার চেষ্টা করিব।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবি-প্রাণের যে সৃষ্টি তাহারই বা মূল্য কি? ইহা প্রাণের যোগে প্রাণের লীলা, আবার প্রাণেই ইহার অবসান। দুর্নিবার সুরে সুরে রাগিনীর শেষ ঝঙ্কারের মত কবি আপনার জীবনকে একটি অনন্ত পরিণাম দান করিবেন। জীবনের উদয়াস্ত জুড়িয়া বিশ্ব-সত্তার আপন হাতে রচিত ইহা এক অপরূপ ছবি। আঁকিয়া তিনি আবার মুছিয়া দেন।

তারা সবে মিলে থাক্ অরণ্যের স্পন্দিত পল্লবে,
শ্রাবণ বর্ষণে;
যোগ দিক নির্ঝরের মঙ্কীর গুঞ্জন কলরবে
উযল ঘর্ষণে।
ঝঞ্ঝার মদিরামত্ত বৈশাখের তাণ্ডব-লীলায়
বৈরাগী বসন্ত যবে আপনার বৈভব বিলায়,
সঙ্গে যেন থাকে।

তারপরে যেন তারা সর্বহারা দিগন্তে মিলায়,
চিহ্ন নাহি রাখে।" (সাবিত্রী)

ঠিক অনুরূপ ভাবের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে।

"বর্ষণ কাঙাল মোর মেঘের অন্তরে বহ্নি জ্বালো,
হে কালবৈশাখী।
অশ্রুভারে ক্লান্ত তার স্তব্ধ মূক অবরুদ্ধ দান
কালো হয়ে উঠে।
বন্যাবেগে মুক্ত করো, রিক্ত করি কর পরিত্রাণ
সব লও লুটে॥
তারপরে যাও যদি যেয়ো চলি ; দিগন্ত অঙ্গন
হয়ে যাবে স্থির।
বিরহের শুভ্রতায় শূন্যে দেখা দিবে চিরন্তন
শান্তি সুগম্ভীর।" (আহ্বান)

ক্ষণিকার মধ্যেও এই অসম্পূর্ণ উপলব্ধির বেদনা।

"গেল না ছায়ার বাধা ; না বোঝার প্রদোষ আলোকে
স্বপ্নের চঞ্চল মূর্তি জাগায় আমার দীপ্ত চোখে
সংশয় মোহের নেশা ;—সে মূর্তি ফিরিছে কাছে কাছে
আলোতে আঁধারে মেশা,—তবু সে অনন্ত দূরে আছে
মায়াচ্ছন্ন লোকে।" (ক্ষণিকা)

'অপরিচিতা' হইতে অনুরূপ কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"পথ বাকি আর নাই তো আমার, চলে এলাম একা
তোমার সাথে কই হল গো দেখা।

* * *

হয়ত তুমি এসেছিলে, যায় নি আড়ালখানা,
চোখের দেখায় হয়নি প্রাণের জানা।

* * *

অর্ধেক চাওয়ায় ভুলে যাওয়ায় হয়েছে জাল বোনা
তোমায় আমায় হয়নি জানাশোনা।"

এইরূপে দেখিতে পাই কবির নিকট জীবন ও জগৎ চির রহস্যময় রহিয়া গিয়াছে। এই রহস্যময়তাকেই কবি আপনার সংখ্যাতীত সৃষ্টি-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"তার সেই ত্রস্ত আঁখি সুনিবিড় তিমিরের তলে
যে-রহস্য নিয়ে চলে গেল, নিত্য তাই পলে পলে
মনে মনে করি যে লুণ্ঠন।
চিরকাল স্বপ্নে মোর খুলি তার সে অবগুণ্ঠন।"

(ক্ষণিকা)

তাঁহার কাব্যে হয়ত চরমের উপলব্ধি নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাহা আবার চরমের একান্ত উপলব্ধিশূন্যও নহে। রূপকে আশ্রয় করিয়া ক্ষণে ক্ষণে অপরূপের আভাস তাঁহার সৃষ্টির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অসম্পূর্ণতার সম্পূর্ণতাকে লাভ করিবার যে কান্না তাহাই তাঁহার সকল সৃষ্টির মূল প্রেরণা।

"আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।" (বাতাস)

কিংবা,

তোমার পথের ধারে ধারে তাই এবারের মতো
রেখে গেলাম গান সঁপিলাম যত।"

(অপরিচিতা)

হয়ত মানুষের সকল সৃষ্টিতে এই অপূর্ণতার পীড়া বোধ থাকিবেই। সকল রূপের বা মায়ার তত্ত্ব উদ্ভিন্ন করিয়া সত্যকে অপরোক্ষ করিবার যে তত্ত্ব তাহা রূপের তত্ত্ব নয় বলিয়া তাহা সৃষ্টি-তত্ত্বও নয়, কিংবা মানব-সভ্যতায় তাহার ভিন্নতর প্রকাশ-রূপ আজও অনাবিষ্কৃত।

রূপের সাধক এইকালে অন্তত আপনার সৃষ্টিকর্মের সহিত বিজড়িত করিয়া মানবভাগ্যের এই চিরন্তন নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

আরো অনেক পরবর্তী কালে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে কবি মানব-সত্তার এই চিরন্তন নিয়তিকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। সকল রূপের তত্ত্বকে ছিন্নভিন্ন করিয়া রূপাতীত জ্যোতিকে তিনি যেমন অপরোক্ষ করিতে দুঃসাধ্য সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছেন, তেমনি তাঁহার কাব্যের প্রকাশ-রূপও ধীরে ধীরে

পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ইহার সিদ্ধিতে কাব্য পরিণামে ঠিক কি রূপ লাভ করিত তাহা আমরা অনুমানও করিতে পারি না। তাহার পূর্বেই কবির জীবনাবসান ঘটিয়াছে।

এখানে কয়েকটি কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি যেখানে রূপের বিচিত্র তত্ত্ব কবির সত্যলাভের পথকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে।

কবির নিকট মৃত্যু আজও বিচিত্র মাধুর্যের রূপে অনুভূত হয়। সত্যের বিচিত্র সৌন্দর্য ও মাধুর্য দিয়া তাহা গড়িয়া তোলা। সত্যের বিচিত্র রূপ-আস্বাদের ভিতর দিয়া তিনি ক্ষণে ক্ষণে যে অনির্বচনীয় মাধুর্যের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, সমগ্ররূপে তাহাকেই তিনি আজ মৃত্যুরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

"না জানি সে কোন্ শান্ত শিউলি-ঝরার শুক্লরাতে,
দক্ষিণের দোলা লাগা পাখি জাগা বসন্ত প্রভাতে;
নব মল্লিকার কোন আমন্ত্রণ দিনে; শ্রাবণের
ঝিল্লি মন্ত্র—সঘন সন্ধ্যায়; মুখরিত প্লাবনের
অশান্ত নিশীথ রাত্রে; হেমন্তের দিনান্ত বেলায়
কুহেলি গুণ্ঠন তলে।" (সত্যেন্দ্রনাথ)

মৃত্যুকে ঘিরিয়া চিরকালের মানুষের যে অজানিত বিস্ময়, যে ভীতি-বিহ্বলতা, যে ভিন্নতর চেতনা-বৃত্তের প্রকাশ তাহার কোন উপলব্ধি মৃত্যুর এই জাতীয় ধ্যানের মধ্যে নাই। মৃত্যুর ধ্যানকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি একের পর এক রূপের বিচিত্র অঞ্জন আমাদের দৃষ্টিতে লাগাইয়া দিয়াছেন।

কিংবা, 'যাত্রা' কবিতার এই কয়েকটি পংক্তি

"যে অস্তগামী রবি
সন্ধ্যামেঘে রচে বেদী নক্ষত্রের বন্দনা সভায়,
যেথা তার সর্বশেষ রশ্মিটির রক্তিম জবায়
সাজায় অন্তিম অর্ঘ্য; যেথায় নিঃশব্দ রেণু 'পরে
সংগীত স্তম্ভিত থাকে মরণের নিস্তব্ধ অধরে।" (যাত্রা)

রূপের বিচিত্র বোধের মধ্যে কবি-চেতনা আজও যে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন সে সম্পর্কে কোন সংশয় থাকে না তখন এই জাতীয় অংশ পাঠ করি।

"কবি বলে, 'যাত্রী আমি, চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে
যেখানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে

মৃত্যুদূত নিয়ে গেছে আমার আনন্দ দীপগুলি,
যেথা মোর জীবনের প্রত্যুষের সুগন্ধি শিউলি
মাল্য হয়ে গাঁথা আছে অনন্তের অঙ্গদে কুণ্ডলে,
ইন্দ্রাণীর স্বয়ম্বর বরমাল্য সাথে ; দলে দলে
যেথা মোর অকৃতার্থ আশাগুলি, অসিদ্ধ সাধনা,
মন্দির-অঙ্গন দ্বারে প্রতিহত কত আরাধনা
নন্দন-মন্দার গন্ধ-লুব্ধ যেন মধুকর পাঁতি,
গেছে উড়ি মর্ত্যের দুর্ভিক্ষ ছাড়ি।" (যাত্রা)

সুদীর্ঘ জীবনে কবি যে সমস্ত আনন্দ-মুহূর্তগুলিকে হারাইয়াছেন, যে সকল দুর্লভ মুহূর্তের ভিতর দিয়া তিনি অনির্বচনীয়তার বারংবার আভাস লাভ করিয়াছেন, সেই পরম আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তগুলিকে তিনি মৃত্যুর ভিতর দিয়া ফিরিয়া লাভ করিবেন। বস্তুত জীবনের আকাঙ্ক্ষাই ভিন্ন স্বরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে, ইহা মৃত্যুর প্রস্তুতি নয়।

পলাতকা

মৃত্যুর অনুভূতি কবিকে সকল তুচ্ছতার আবেষ্টনীর বাহিরে আসিয়া জীবন ও মৃত্যুকে যেমন একাকার করিয়া দিয়াছে, তেমনি সেই নির্মোহ স্বচ্ছ দৃষ্টিতে জীবন ও জগতের প্রতিটি তুচ্ছ অবহেলিত সামগ্রী আজ এক দুর্লভ মূল্য লাভ করিয়া কবির নিকট আরো আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে।

"আজকে কেন মনে আসে প্রাণের যত ক্ষণিক ব্যাকুলতা।"
(মুক্তি)

'পলাতকা' কাব্যের ইহাই মূল সুর।
সকল দায় সকল ভারমুক্ত চিত্তের এক পরম গম্ভীর শান্ত পরিণাম।

"সম্মুখে তার জীবন-মরণ সকল একাকার,
অজানিতের ভয় কিছু নেই আর।" (পলাতকা)

কিংবা,

"জনম মরণ এক হয়েছে ওই যে অকূল বিরাট মোহনায়,—"

(মুক্তি)

এবং

সংসারের ঐ ভাঙা ঘাটের কিনার হতে
আজ আমাদের ভাসান যেন চির প্রেমের স্রোতে,—"

(ফাঁকি)

আরও

"আকাশ-পারের বাণী তারে ডাক দিয়ে যায় আলোর ঝরনা বেয়ে ;
রাতে অন্ধকারে
কোন্ অসীমের রোদনভরা বেদন লাগে তারে।" (নিষ্কৃতি)

একটা লাভক্ষতির হিসাব কোথাও যে আদৌ নেই তাহা নয়, তবে অসীমের অনুভূতিতে জীবনের সকল ব্যর্থতা ও বঞ্চনা ধীরে ধীরে ছায়া হইয়া মিলাইয়া গিয়াছে।

আমাদের সমাজে যেখানে নারীর মূল্য প্রাণ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত, সেখানে নারীর পরমাশ্চর্য প্রকাশ তাহার এমন এক অপার্থিব মূল্যের আবিষ্কার আমাদের কেবল বিস্মিতই করে। রবীন্দ্র-কাব্যের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত নারী-বন্দনার কত বিচিত্র রূপ না আমরা প্রত্যক্ষ করি। তবে 'পলাতকা' কাব্যে নারী যেমন একমাত্র হইয়া উঠিয়াছে তেমনি অবশ্য কবির অন্য কোন কাব্যে ঘটে নাই। সমগ্র পলাতকা কাব্য আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত যে একটি মূল ভাবের সুরে বাঁধা, তাহাকে কবি একটি নারীর ভক্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে জ্যোৎস্নাবীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।"

(মুক্তি)

এই প্রসঙ্গে পলাতকা কাব্যের কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দিকের প্রতি পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

আমরা ভূমিকায় রূপ-কল্পনা অধ্যায়ে কবির উপমা ও তুলনা প্রয়োগের দক্ষতা এবং অভিনবত্বের দিক লইয়া সামান্য আলোচনা করিয়াছি।

বাংলাদেশের সকল অধিকার-বঞ্চিত লাঞ্ছিত নারীসমাজকে ঘিরিয়া কবির অন্তরে যে আমার বেদনাবোধ ছিল, আবার এই কুণ্ঠিত জীবন বলিয়া তাহাদের মধ্যে যে একটি বিশিষ্ট প্রকাশ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার মাধুর্যকে কবি পরপর কয়েকটি উপমার সহায়তায় সমগ্ররূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন ঃ

"ও যেন জুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা ;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে—
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরনাখানি ঝিরি ঝিরি
কালো পাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাত-জাগা এক পাখি,
মৃদু করুণ কাকুতি তার তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘন ঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

(কালো মেয়ে)

কৃষ্ণপক্ষের স্তব্ধ নিশীথ রাত। ঘন অন্ধকারে ঢাকা জুঁইফুলের বাগান হইতে মৃদু কোমল গন্ধ অন্ধকারের সকল রন্ধ্রকে পরিপূর্ণ করিয়া উপচাইয়া পড়িতেছে। আকাশপারে ম্লান ক্ষীণ শশীকলার ক্ষীণতর ছায়া পড়িয়াছে গভীর কালো জলের এক প্রান্তে। কৃষ্ণরাত্রির রহস্য নিবিড় অতল এই মাধুর্যের সহিত কবি এক দীনা রমণীর তুলনা করিয়াছেন ; কবি-কল্পনার এই জাতীয় সমুন্নতিতে এবং চমৎকারিত্বে আমরা কেবল মুগ্ধ বিস্মিত হই।

কালো পাথরের বুকে ক্ষীণ ঝরনার ধারা যেমন আপনার সকল ঐশ্বর্যকে ঢাকিয়া লইয়া সংগোপনে ধীরে ধীরে বহিয়া যায়, কালো মেয়ে। বুকের মধ্যে অপরিমিত স্নেহ ও মাধুর্য লইয়া তেমনি সংসারের একপ্রান্তে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে।

পরিব্যাপ্ত অন্ধকার। মাথার উপর কেবল অগণিত নক্ষত্রের দীপ জ্বালা। চতুর্দিকের নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে এক ঘুমহারা পাখি থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছে। তাহার বক্ষতলে কী যেন এক অসীম বেদনা, প্রকাশ করিতে চায় কিন্তু কুণ্ঠায় প্রকাশ করিতে পারে না। মনে হয় অসীম জগৎ সংসারে সে একা।

এই একাকীত্ব, এই কুণ্ঠা, এই নিঃসীম বেদনা, নিশীথ রাত্রির অপার রহস্য ও বিস্ময় এই সমস্ত কিছুর সহিত তিনি এক ভীরু কুণ্ঠিত বেদনাহত রহস্যময়ী অথচ অনিঃশেষ মাধুর্য-বিজড়িত নারীর তুলনা করিয়াছেন।

নিদ্রার অতল রহস্য ভেদ করিয়া মাঝে মাঝে স্বপ্নের এক একটি দুর্লভ রত্নকণা ভাসিয়া উঠে। তাহার স্পষ্টরূপ স্বপ্নেরও হয়ত গোচরীভূত নয়। মনে হয় যাহাকে পাইলে জীবন সকল অর্থ লাভ করিতে পারিত, অথচ তাহাকে লাভ করিতে পারা যায় নাই, সেই মূর্তি জীবনের তেমনি এক দুর্লভতম মূল্য লইয়া প্রকাশ পায়। ঘুমঘোরে তাহাকে আবেষ্টন করিয়া আমরা অশ্রু বিসর্জন করিয়া চলি। নারীর মাধুর্যের সহিত এই জাতীয় তুলনা যে কতখানি সার্থক তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

নারীকে আশ্রয় করিয়া কবির এই বোধ-দৃষ্টি সমগ্র 'পলাতকা' কাব্যের পশ্চাতে স্থির কিরণ বিকীর্ণ করিয়াছে।

আর একটি চিত্ররূপ—

"যেখানে ওই সজনেগাছের ফুলের ঝুরি বেড়ার গায়ে
রাশি রাশি হাসির ঘায়ে
আকাশধারে পাগল করে দিবস রাত্রি।" (নিষ্কৃতি)

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যায়ের কাব্যগুলির মধ্যে শৈশব-প্রেমের স্মৃতি নানা-ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সে প্রেম অচরিতার্থ কিন্তু দুর্লভতায় জীবনের সকল মূল্যকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

"সেই তো আমার এই জনমের ভোর-গগনের তারা
অসীম হতে এসেছে পথহারা ;
সেই তো আমার শিশুকালের শিউলিফুলের কোলে
শুভ্র শিশির দোলে ;
সেই তো আমার মুগ্ধ চোখের প্রথম আলো,
এই ভুবনের সকল ভালোর প্রথম ভালো।" (ছিন্নপত্র)

সাধারণ উপেক্ষিত অশিক্ষিত মানুষের মধ্যে তিনি কত রূপে যে দুর্লভতম মনুষ্যত্বের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং তাহাকে কাব্যে রূপদান করিতে তিনি যে সম্পূর্ণ সক্ষম, ইহার জন্য যেমন গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, তেমনি সেই সঙ্গে প্রয়োজন চিত্তের সর্ব সংস্কার মুক্ততা।

"তারার মতো আপন আলো নিয়ে বুকের তলে—
যে মানুষটি যুগ হতে যুগান্তরে চলে,
প্রাণখানি যাঁর বাঁশির মতো সীমাহীনের হাতে
সরল সুরে বাজে দিনে রাতে,
যাঁর চরণের স্পর্শে
ধুলায় ধুলায় বসুন্ধরা উঠল কেঁপে হর্ষে,
আসিবেন দেখতে পেতেম তাঁরে
দীনের বাসায়, এই পাগলের ভাঙা ঘরের দ্বারে।" (আসল)

মহুয়া

নর-নারীর অন্তরে প্রেমের প্রারম্ভিক যে অনুভূতি, তাহাই প্রাণের উপলব্ধি। প্রাণের অনুভূতির ভিতর দিয়া অন্তরে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। নর-নারীর চেতনা ওই ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া যখন ব্যক্তি-চেতনারও সীমা অতিক্রম করিয়া যায় তখন বিশ্ব-প্রাণের সহিত তাহার মিলন ঘটে। প্রেমে মুক্তি বলিতে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-চেতনার এই পরিণামটিকে বুঝাইয়াছেন।

বিশ্ব-সত্তা কেবল মুক্তি-লোক নহে, সৃষ্টি-লোক বলিয়া অন্তরে অনিঃশেষ সৃষ্টি-প্রেরণা রূপে অনুভূত হয়। ব্যক্তি-চেতনা যত গভীর করিয়া বিশ্ব-চেতনা লাভ করিতে থাকে ততই তাহার অন্তরে সৃষ্টি-প্রেরণা প্রবলভাবে অনুভূত হয়। প্রকৃতির সৌন্দর্যবোধে হোক, কিংবা প্রেমবোধে হোক এইরূপে বিশ্বের সহিত মিলন ঘটে বলিয়া নর-নারী সৌন্দর্য ও প্রেমবোধে অবিরাম সৃষ্টির পরিচয় দান করে।

প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-চেতনার ধীর পরিণামের পরিচয়ই মহুয়া কাব্যের মুখ্য পরিচয়। সে পরিচয় লাভ করিবার পূর্বে প্রেমের একটি তত্ত্ব সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে জিজ্ঞাসা নানাপ্রসঙ্গে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

নারী কিংবা পুরুষের জীবনে বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া প্রেম অনুভূত হয় এবং সেই প্রেম বা 'রূপ' আশ্রয় করিয়া পরিণামে প্রাণ বিশ্ব-প্রাণে যুক্ত হইয়া

যায়। প্রেমে ওই একের প্রাণের যোগে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলন ঘটে নর-নারীর জীবনে প্রেমের ওই আধার যদি ভাঙ্গিয়া যায় তবে ওই অনন্ত প্রেম-প্রস্রবণ নিরুদ্ধ করিয়া উহারই শোকে জীবনকে বিনষ্ট করিয়া দেওয়াই কি প্রেমের একমাত্র ধর্ম? অর্থাৎ আর কাহাকেও আশ্রয় করিয়া কি ওই প্রেম অনুভূত হইতে পারে না? প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় জিজ্ঞাসার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে রবীন্দ্রনাথেরই একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"সকল মানুষের হৃদয়ে প্রেমের অমৃত উৎস আছে, তাহার জন্যই জগতে সন্ধান পড়িয়া গেছে। যত দিন যাইতেছে ততই মানবহৃদয়ের সেই অমৃত-উৎস গভীরতর হইতেছে।

যদি এমন হয় যে, একজন সাহসী এক আঘাতে তোমার হৃদয়ের কঠিন স্তর বিদীর্ণ করিয়া অমৃত উৎসের অনন্ত মূল অবারিত করিয়া দিয়াছে তবে সেই উৎস কি কেবল খননকারীর নাম-খোদিত সমাধি-পাষাণ দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে?

প্রেমের উন্মুক্ত সদাব্রতই প্রেমিকের স্মরণ-চিহ্ন, পাষাণ-ভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল নহে।

প্রেম জাহ্নবীর ন্যায় প্রবাহিত হইবার জন্য হইয়াছে। তাহার প্রবহমান স্রোতের উপরে সীলমোহরের ছাপ মারিয়া আমার বলিয়া কেহ ধরিতে পারে না। সে জন্ম-জন্মান্তরে প্রবাহিত হইবে। তাহার উৎসের মধ্যে গোরের মাটি চাপা দিয়া তাহার প্রবাহ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা কেবল বৃথা কষ্টের কারণ মাত্র।

বিস্মৃতি আমাদের জীবন-গ্রন্থের ছেদ, দাঁড়ি মাঝে মাঝে আসিয়া উত্তরোত্তর আমাদের জীবনবিকাশের সহায়তা করে। এক জীবনের মধ্যেও শত সহস্র বিস্মৃতি চাই, তবেই জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারে। অতএব ব্যাকরণবিরুদ্ধ একটিমাত্র দীর্ঘ স্মৃতি লইয়া জীবন শেষ করিলে জীবন শেষই হয় না।

অতএব আমাদের বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য এবং বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অসীম একের দিকে ক্রমাগত ধাবমান হইতে হইবে।"

যে বিস্তৃত অংশটি উদ্ধৃত করিলাম তাহা রবীন্দ্রনাথের অপরিণত বয়সের চিন্তা না হইলেও সুপরিণত বয়সের চিন্তা নয়।

বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ক্রমে আপনার প্রেমকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিতে হইলে যে সহস্র বিস্মৃতির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত কোথাও যদি সত্য হয় নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে নহে।

প্রণয়নিষ্ঠা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে তীব্র মন্তব্য উদ্ধৃতির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'খননকারীর নাম-খোদিত সমাধি-পাষাণ, 'পাষাণ-ভিত্তির মধ্যে নিহিত শোকের কঙ্কাল', 'সীলমোহরের ছাপ', 'গোরের মাটি চাপা দিয়া তাহার প্রবাহ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা' ইত্যাদি কোন্ চেতনাধিষ্ঠিত হইলে সম্ভব তাহাই আমাদের সর্বাগ্রে বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইবে নর-নারীর প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি কতখানি সত্য।

বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে প্রেম অনুভূত হয় তাহাতে ওই আধার ভাঙ্গিয়া গেলে হয় সীমাশূন্য শোকে প্রেম মুহূর্তে বিশুষ্ক হইয়া পড়ে, নতুবা নূতন কোন আধার আশ্রয় করিয়া ওই প্রেমকে আবার সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে হয়। প্রেম যেখানে ক্রমাগত এক রূপ হইতে আর এক রূপ আশ্রয় করিয়া চলে সেখানে বিস্মৃতির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্য লাভ সম্ভব, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া কোন কালে এককে লাভ করিতে পারা যায় না।

আমাদের বোধ সীমাবদ্ধ, এই সীমাবদ্ধ বোধ দিয়া আমরা খণ্ড খণ্ড রূপ গড়িয়া তুলি, কিন্তু এই খণ্ড রূপকে যতই গ্রথিত করা যাক-না-কেন তাহাদের সমাহারের ভিতর দিয়া একের বোধ কোনপ্রকারেই গড়িয়া উঠে না। রূপের সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে কেবল একের অনুভূতি লাভ সম্ভব। আমরা রূপ হইতে রূপে কেবল বিচরণ করিতে পারি, অরূপের সন্ধান লাভ করিতে পারি না।

প্রেমে নিষ্ঠার প্রয়োজন রূপের সীমা ছাড়াইয়া অরূপকে লাভ করিবার জন্য। বিরহে আমাদের অন্তর শূন্য হইয়া যায়। সাধনার ভিতর ওই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া যে রূপ-লোক গড়িয়া উঠে, নর-নারীর চিত্তে তাহাই ধ্যান-লোক। এই ধ্যান-লোকের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা যখন উন্নততর চেতনার আভাস লাভ করে তখন ঐ রূপটা গৌণ হইয়া যায়। নর-নারীর তাহা নির্বিশেষ এক উপলব্ধি। বারংবার আধার পরিবর্তনে নর-নারী এই পরিণাম লাভ করিতে পারে না।

সুপরিণত বয়সে নর-নারীর প্রেম এবং জীবন-সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে অধ্যাত্ম বিশ্বাস গড়িয়া উঠে তাহার একটি সুন্দর পরিচয় মিলিবে "তিনসঙ্গী" গল্পের অচিরা এবং তাহার অধ্যাপক দাদুর শেষ কথোপকথনের মধ্যে।

'মহুয়া'র মধ্যে এমন কয়েকটি কবিতা আছে, যে ক্ষেত্রে প্রেমের এই সাক্ষাৎকার প্রধান হইয়া প্রেমের নিষ্ঠা বা সাধনার দিকটিকে নষ্ট করিয়া

দিয়াছে। অবশ্য মহুয়ার মধ্যেই প্রেমের সাধনার দিকটিরও পরিচয় লাভ করা যায়। তাহাতে কবির এই জাতীয় সাক্ষাৎকারের প্রতিবাদই মিলিবে।

"যে ঘরে তোমার শয্যা একদিন পেতেছি আদরে
ডাকিলাম তারে সেই ঘরে।
আনিলাম অর্ঘ্য থাল,
দীপ দিনু জালি।
দেখিলাম বাঁধা তারি ভালে
যে মালা পরায়েছিনু তোমারেই বিদায়ের কালে।" (দূত)

বিশ্ব-প্রাণ এমনি করিয়া নর-নারীর অন্তরে নিত্য নূতন ভাবে অনুভূত হইতে চায়। নর-নারীর প্রেমে রবীন্দ্রনাথ প্রাণের এই ধর্মটিকে স্বীকার করিয়াছেন। বিরহে ধ্যানের ভিতর দিয়া নারীর যে চেতনা উন্নততর পরিণাম লাভ করে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে তাহাকে শূন্যতার সাধনা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন। প্রেম যেখানে নিত্য নূতন বিগ্রহ আশ্রয় করিতে চায় সেখানে ব্যাপ্তি ধর্মটি আছে সত্য, কিন্তু সে ব্যাপ্তি কেবল রূপ হইতে রূপে সঞ্চরণ।

প্রেমে রূপ-ধ্যান আশ্রয় করিয়া নর-নারীর চেতনা যখন উন্নততর পরিণাম লাভ করে, তখন আর রূপের বোধটি থাকে না, সেখানে প্রেমের যে বোধ তাহা নৈর্ব্যক্তিক।

উন্নততর চেতনালোকে বিস্মরণ যেমন সত্য, তেমনি মর্ত্য-চেতনার রূপ হইতে রূপে, আধার হইতে আধারে নিত্য পরিবর্তিত যে প্রেম সে ক্ষেত্রেও বিস্মরণ সত্য। যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহাতে কবি-প্রাণের যে বিস্মরণ-তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই মর্ত্য-চেতনা-লোকে মনোভূমিতে।

বহিশ্চেতনায় মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই। এই চেতনায় 'শুধু আমি অংশ জনতার'। কেবল অধ্যাত্ম-সত্তায় মানুষ সমস্ত সৃষ্টি হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া বোধ করিতে পারে। ওই সত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি, 'বিধির স্বতন্ত্র সৃষ্টি জানিব আমারে'।

প্রেমে নর-নারীর চিত্তে প্রাণের জাগরণ ঘটে। প্রাণের এই জাগরণ মুহূর্ত হইতে নর-নারীর বহিরিন্দ্রিয় সকল অন্তর্মুখীন হইয়া পড়ে। এই অন্তর্মুখীন চেতনাশ্রয়ী অন্তরের আর এক যে উপলব্ধি তাহাই অধ্যাত্ম-উপলব্ধি।

ঊর্ধ্বতর লোকের সহিত মানবীয় চেতনার যে যোগ তাহা এই অধ্যাত্ম-সত্তা আশ্রয় করিয়াই ঘটে। একদিকে অমর্ত্য-চেতনা, অন্যদিকে মর্ত্য-চেতনা, উভয়ের সংযোগস্থলে আলো-আঁধারের যে-লোক তাহাই অধ্যাত্ম-লোক।

"সে মহা নির্জন
যে গহনে অন্তর্যামী পাতেন আসন
সেইখানে আনো আলো—" (প্রকাশ)

প্রেমের উপলব্ধি মনুষ্য-সত্তাকে স্পষ্ট দ্বিধা করিয়া অন্তর্জগৎ সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলে।

নারীর মূল্য আমরা এইদিক দিয়া বিচার করি না। সমাজে নারীর যে মূল্য পুরুষ নির্ধারণ করে তাহা কতকটা স্থূল ভোগ ও সেবার দিক দিয়া, কতকটা বা পারিবারিক ও সামাজিক বিচিত্র প্রয়োজনের দিক হইতে।

নারী যে পুরুষের ধর্ম-সঙ্গিনী এক্ষেত্রে সেই অর্থটাই লুপ্ত হইয়াছে। সামাজিক বা পারিবারিক যে ধর্মের কথা বলা হয় তাহার কথা নয়, মানুষের যে খাঁটি অধ্যাত্মবোধ তাহার কথাই বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মবোধ বিকাশের মূল কথা যদি হয় মানুষের সকল বৃত্তিকে ঊর্ধ্বমুখীন করিয়া দেওয়া, বাস্তবের নিত্য গ্লানির ঊর্ধ্বে অন্তরকে তুলিয়া ধরা এবং পরিণামে মর্ত্য-চেতনাকে অতিক্রম করিয়া মহামুক্তি লাভ করা, তবে নর-নারীর প্রেমেও সেই সামর্থ্য আছে। পুরুষের অধ্যাত্ম-জীবনে নারী-প্রেমের চূড়ান্ত সামর্থ্যের কথাটিই নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি পংক্তির মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে।

"তোমার প্রবল প্রেম প্রাণভরা সৃষ্টির নিঃশ্বাস,
উদ্দীপ্ত করুক চিত্তে ঊর্ধ্বশিখা বিপুল বিশ্বাস।" (প্রতীক্ষা)

কিংবা

"হে নারী, আত্মার সঙ্গিনী;
অবসাদ হতে লহো জিনি
স্পর্ধিত কুশ্রীতা নিত্য যতই করুক সিংহনাদ,
হে সতী সুন্দরী, আনো তাহার নিঃশব্দ প্রতিবাদ।" (প্রতীক্ষা)

নারী পুরুষের জীবনে এমনি সৃষ্টি-প্রেরণা লইয়া আসে। প্রাণের যে উপলব্ধি, সৃষ্টিরই আবেগ বলিয়া যে এমনটি ঘটে, তাহা বলিয়াছি। এই

অনুভূতি যে অধ্যাত্ম অনুভূতি, অর্থাৎ প্রাণের জাগরণের ভিতর দিয়া অন্তরে যে ধ্যান-লোক জাগ্রত হয় তাহা বলিয়াছি। ধ্যান-লোক জাগ্রত হইলে মানুষের জীবনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ফিরিয়া আসে। ধ্যান-লোকে মানুষ চেতনার এমন এক বিপুল ব্যাপ্তি, এমন এক অন্তহীন মহিমা প্রত্যক্ষ করে যাহার ফলে মর্ত্যের এই একান্ত সীমাবদ্ধ দেহ-রূপটিকে বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করে না।

ছলনা-প্রতারণা, রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু পরিকীর্ণ এই জীবনের অন্তরালে যে এক পূর্ণ সুষমা-লোক রহিয়াছে প্রেমে মানুষ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে। প্রেমে মানুষ মর্ত্যলোকে সেই পূর্ণ সুষমা ফুটাইয়া তুলিতে নিরন্তর সংগ্রাম করে। ইহা যেমন যে-কোন অধ্যাত্ম-সাধনার তেমনি প্রেম-সাধনারও লক্ষ্য।

পুরুষ যেন নারীকে এই সাধনার অঙ্গ স্বরূপে আশ্রয় করে। খাঁটি প্রেমের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য। নর-নারীর প্রেমে আর কোন লক্ষ্য থাকিতে পারে না; সমাজের দোহাই দিয়া নয়, তথাকথিত ধর্মের দোহাই দিয়াও নয়।

পরিবার ও সমাজের সকল প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে যে ধর্ম, সকল ধর্ম-চেতনারও অতীত যে অধ্যাত্ম পরিণাম পুরুষ নারীকে যেন এই ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার জন্য গ্রহণ করে।

নর-নারীর এই প্রেমোপলব্ধির দিক হইতে এইকালে রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার একটি সুন্দর পরিচয় লাভ করিতে পারা যায় 'মিলন' কবিতাটির মধ্যে।

প্রকৃতির মধ্যে দেখি প্রাণ প্রতি মুহূর্তে প্রাণকে আকর্ষণ করিতেছে, লাভ করিতেছে, উভয়ের মিলনে আবার নূতন রূপের প্রকাশ ঘটিতেছে। প্রাণের এই নিত্য লীলায় প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ প্রাচুর্যের ভারে উপচাইয়া পড়িতেছে। প্রাণের নিত্য যোগে প্রকৃতি তাই প্রাচীন হইয়াও চির নবীন।

মানবসংসারের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে এই এক দৃশ্য চোখে পড়ে। নর-নারীর হৃদয় আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাণ নিত্য আপনাকে প্রকাশ করিতেছে; প্রাণের নিত্য মিলনে এই সংসার তাই চির নবীন। প্রেমে নর-নারী মিলিত হইবে এ আকাঙ্ক্ষা একেবারে সৃষ্টির মর্মমূলে রহিয়াছে।

"সৃষ্টির সে রঙ্গ আজি দেখি মানবের লোকালয়ে
দুজনার গ্রন্থির বাঁধন।

অপূর্ব জীবন তাহে জাগিবে বিচিত্র রূপ লয়ে
বিধাতার আপন সাধন।" (মিলন)

অসীম প্রাণস্পন্দে এই নিখিল জগৎ রূপে রূপে মহতো মহীয়ান্। নর-নারীর অন্তরে প্রেমে যে প্রাণের উদ্বোধন ঘটে, তাহা পরিণামে উভয়কে বিশ্বের সহিত মিলিত করিয়া দেয়।

"নিবি তোরা তীর্থবারি সে অনাদি উৎসের প্রবাহে
অনন্ত কালের বক্ষ নিমগ্ন করিতে যাহা চাহে
বর্ণে গন্ধে রূপে রসে—" (মিলন)

প্রকৃতির মধ্যে নূতন সৃষ্টির জন্য মিলন লাভের এই যে প্রেরণা, সেই একই প্রেরণা নর-নারীর মধ্যে অনুভূত হয়। নর-নারীর মধ্যে মিলন ঘটাইবার এই প্রকৃতি-প্রেরণার পশ্চাতে ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা আছে।

প্রাণের যে অনুভূতি, নর-নারীর যে মিলনাকাঙ্ক্ষা, তাহার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তাহারা উন্নততর পরিণাম লাভ করিবে। এই ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রকৃতির অভিব্যক্তির মর্মমূলে রহিয়াছে।

প্রেম প্রকৃতিপরবশ। এই প্রকৃতি বশ্যতায় যে সৃষ্টির বিকাশ ধরা পড়িতে পারে মনুষ্যসমাজে তাহারই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রেমের অথবা প্রাণের উপলব্ধি যেখানে প্রকৃতি বশ্যতা ছাড়াইয়া উঠে, সম্পূর্ণ আত্মচেতনাধিষ্ঠিত হইয়া তাহারই প্রেরণায় যে সৃষ্টি তাহা প্রকৃতির শাসনমুক্ত এমন এক দিব্য সৃষ্টি-প্রেরণা যাহার কোন উপলব্ধি আমাদের নাই।

নর-নারীর প্রেমে প্রকৃতির শাসন আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃতির এই শাসনের মধ্যেই উন্নততর চেতনালাভের আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত রহিয়াছে বলিয়া নর-নারীর অন্তরে তাহা নিত্য অতৃপ্তির অগ্নি-শিখা জ্বালাইয়া দেয়।

মানবীয় চেতনা যেখানে ব্যক্তি-চেতনার সীমা অতিক্রম করে সেখানে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া সমগ্র সৃষ্টি-রূপ মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া যায়। এক মায়া-রূপে মহামায়ার সে এক আশ্চর্য প্রকাশ।

"অন্তহীন কাল আর অসীম গগন,
নিদ্রাহীন আলো
কী অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলাল।" (সৃষ্টি-রহস্য)

দিব্য-চেতনা ছিলেন আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত। তখন তিনি ছিলেন বন্ধ্যা। তিনি প্রেমে ধন্য হইতে চাহিলেন, আপনাকেই প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলেন। যুগ-যুগান্ত তপস্থার পর তাঁহারই অনন্ত শক্তি দেশ-কালের মধ্যে সীমা-রূপ লাভ করিয়াছে। তিনি সীমা-রূপে আপনাকে নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হইতেছেন।

পুরুষও প্রেমে নারীর মধ্যে তেমনি আপনার অন্তহীন রহস্যকে বিগ্রহ রূপে প্রত্যক্ষ করে। এই প্রত্যক্ষ করিবার সাধনাই প্রেমের সাধনা, তাহার পরা প্রাপ্তি। প্রেমে পুরুষ আপনার চেতনাকে অনন্তপ্রসারী দেখিবে, আবার সেই অনন্তপ্রসারী চেতনামাত্রকে একটি বিগ্রহের মধ্যে রূপ-বদ্ধ দেখিবে। প্রেমে রূপ ও অরূপের, সীমা ও অসীমের লীলা।

সৃষ্টির ইহাই নিগূঢ় কথা। নর-নারীর অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটাইয়া ক্রমে তাহাদের বিশ্ব-চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া।

> "আপনারে দান সেই তো চরম দান,
> আকাশে আকাশে তারি লাগি আহ্বান।" (পরিণয়)

সমগ্র সৃষ্টি-লোক জুড়িয়া বাসনার আগুন জ্বলিতেছে। ধূলিকণা হইতে আদি অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্র-লোক সকলে এই অগ্নি বক্ষে জ্বালাইয়া ছুটিয়াছে। ছুটিয়া চলিয়াছে একে অন্যের সহিত মিলিত হইবার জন্য।

প্রেমে অসীম যিনি তিনি আপনাকে অন্তহীন রূপে রূপে সীমিত করিয়াছেন। সকল কিছুর মূলে তাঁহারই অনন্ত প্রাণ প্রৈতি, তাঁহারই প্রেম আছে বলিয়া সকল কিছু এমন গতিচঞ্চল নিয়ত-অস্থির।

প্রাণের এই জাগরণের ভিতরে দিয়া ব্যক্তি-প্রাণ যখন বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত হয়, তখন মানুষ আপনার চেতনাকেই অনন্ত প্রসারিত দেখে।

> "নীরবে গোপনে মর্ত্য ভুবন 'পরে
> অমরাবতীর সুর সুরধনী ঝরে।
> যখনি হৃদয়ে পশিল তাহার ধারা
> নিজেরে জানিলে সীমার বাঁধন-হারা—" (পরিণয়)

প্রাণের স্পর্শে, প্রেমে যখন প্রাণ জাগে তখন নর-নারী আপনার মধ্যেই অনন্ত প্রাণের প্রসার বোধ করে, তখন ব্যক্তি-প্রাণ, বিশ্ব-প্রাণ-সমুদ্রে একাকার হইয়া যায়।

জগৎ ও জীবনের এই স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি। অনন্ত প্রাণের লীলায় কত রূপ বিনষ্ট হইতেছে, আবার নূতন রূপ জাগিয়া তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতেছে। প্রাণ-লোকে তাই চির-নবীনের জয়ঘোষণা।

তেমনি বিশিষ্ট প্রেম নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু সংসারে প্রেম নিত্য নূতন রূপ লইয়া আবির্ভূত হয়। কত প্রেম হাহাকারে বুদ্বুদের মত বিদীর্ণ হইয়া যায়, তাহা বলিয়া সংসারে প্রেম তো হারাইয়া যায় না। অনন্ত কোটি নর-নারীর হৃদয় আশ্রয় করিয়া যুগ-যুগান্ত ধরিয়া প্রেমধারা প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

"যায় নাই, যায় নাই,
নব নব যাত্রী মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই

* * *

বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন তুমিও অমর।" (বাসরঘর)

সংসারে প্রাণের ধারা চিরন্তন। ব্যক্তি-প্রাণ ক্ষণিক। এই ক্ষণিকতার ভিতর দিয়া প্রাণের ধারা নিত্য বহিয়া চলিয়াছে। এই জগতে মানুষ আসে মানুষ যায়; পশ্চাতে তাহার সকল কর্মভার নামাইয়া দিয়া যায়। বিশ্ব-প্রাণের চিরন্তন ধারা ব্যক্তি-প্রাণ আশ্রয় করিয়া নানারূপে আপনার ঐশ্বর্য ফুটাইয়া তুলিতেছে। সে ঐশ্বর্য তাই সকল কালের সকল মানুষের তাহাতে ব্যক্তির নাম-রূপ খোদিত করিয়া রাখিবার কোন উপায় নাই। মানুষ যতই উন্নততর সৃষ্টি-প্রেরণা লাভ করিতেছে, ততই সে অতীত সৃষ্টির অপূর্ণতাকে আপনার হাতে বারংবার মুছিয়া দিতেছে। সেই সঙ্গে উহার সহিত বিজড়িত হইয়া কত নাম-রূপ মুছিয়া যাইতেছে, কে তাহার পরিচয় রাখে। সৃষ্টি সৃষ্টির প্রতি এমনি উদাসীন!

"জনে জনে রচি গেল কালের কাহিনী,
অনিত্যের নিত্য প্রবাহিনী
জীবনের ইতিবৃত্তে নামহীন কর্ম-উপহার
রেখে গেল তার।" (নববধূ)

ইহাই যখন জীবনের স্বরূপ, তখন জীবনের সার্থকতা কোথায়, কোন্ বোধ আশ্রয় করিয়া মানুষ সান্ত্বনা লাভ করিবে? বস্তুতঃ, এই চেতনাশ্রয়ী হইয়া সর্বোচ্চ যে জীবন-দর্শন গড়িয়া তোলা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহাই

করিয়াছেন। এই জীবন-দর্শনের মর্মকথা হইল মানব-প্রেম এবং প্রেমে আত্ম বিসর্জন।

জীবনে দুঃসহ দুঃখ আছে, বিচ্ছেদের হাহাকার আছে, তুচ্ছতা ও গ্লানির কত-না কণ্টক আছে। ইহা সত্য। কিন্তু মানুষ এই সমস্ত কিছুকে স্বীকার করিয়া লইয়া জগৎকে যদি সব কিছু দিয়া ভালোবাসিতে পারে, যদি হৃদয়ের ভালোবাসা অন্য হৃদয়ের ভালোবাসা জাগ্রত করিতে, লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে জীবনে আর ক্ষোভ থাকে না। প্রেমে আত্মত্যাগে জীবনের এমন এক আশ্চর্য পূর্ণতা-বোধ জাগে যাহা মৃত্যুর বেদনাকেও জয় করিয়া উঠে ঃ

"প্রাণ দিয়ে যে ভরেছে বুক
সেই তার সুখ।" (নববধূ)

মহুয়ার মধ্যে এক শ্রেণীর কবিতা আছে যেগুলির মধ্যে কবি একটি বিশিষ্ট তত্ত্বকে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সেই কবিতাগুলির আলোচনা করিবার পূর্বে এই তত্ত্বটির একটি সামগ্রিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনা বিশেষ করিয়া অদ্বৈতবাদ চেতনাকে স্পষ্ট দুইটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; একটি সৃষ্টি-লোক, (ইহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন মায়া) অপরটি সকল সৃষ্টির উর্ধ্বতর চেতনা, মুক্তি-লোক, মায়াবাদীরা ইহাকে বলিয়াছেন আত্মা বা ব্রহ্ম।

যে সাধনা জীবন ও জগৎকে মায়া বলিয়া অস্বীকার করিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাহাকে শূন্যতার সাধনা বলিয়া পরিহার করিয়াছেন।

মুক্তিলাভের আশায় পুরুষ প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করিতেছে প্রকৃতির প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে; অন্যদিকে প্রকৃতি প্রতিমুহূর্তে চেষ্টা করিতেছে পুরুষের অন্তরে আপনার বোধ সঞ্চারিত করিয়া দিতে।

নারী-প্রেমে পুরুষের ধ্যান-লোকে জগৎ ও জীবনের যে অসীম সৌন্দর্য ও রস-লোকের সন্ধান ঘটে সেই অসীম সৌন্দর্য ও রস-প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রেরণা। যে প্রেমে জগৎ ও জীবন এইরূপে অনন্ত স্বরূপতা লাভ করে কবি সেই প্রেমকেই আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন ঃ

"সেই খানেতেই আমার অভিসার
যেথায় অন্ধকার

ঘনিয়ে আছে   চেতন বনের
ছায়া তলে,
যেথায় শুধু ক্ষীণ জোনাকির
আলো জ্বলে।” (মায়া)

যে পুরুষ তত্ত্বজ্ঞান আশ্রয় করিয়া জগৎ ও জীবনের সকল সৌন্দর্য উন্মূলিত করিয়া দেয়, সৌন্দর্যের আবরণ উদ্‌ভিন্ন করিয়া কেবল যন্ত্রটিকেই বাহিরে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করে, সে পুরুষের অন্তরে নিভৃততম প্রদেশে যদি কোথাও ক্ষীণতম ভাবেও সৌন্দর্যবোধ রহিয়া যায় (যাহাকে ইঁহারা বলেন মোহ) তবে ওই মোহ বা সৌন্দর্য-বোধ আশ্রয় করিয়া মায়া ধীরে ধীরে পুরুষের সম্পূর্ণ অগোচরে আপনার প্রভাব বিস্তার করে। নারী-প্রেম সেইখানে আপনাকে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া পুরুষের তত্ত্বজ্ঞানের পাষাণ বিদীর্ণ করিয়া দেয়।

নারী-প্রেম, যাহা মায়াই বটে, এই রূপে পুরুষের ধ্যান-লোকে অপরূপ রূপ-লোক সৃজন করে। পুরুষের যে মুক্তির এষণা তাহা এই ধ্যান-লোকে, সৃষ্টির উর্ধ্বতর কোন চেতনা-লোকে নয়। নারী প্রেমে পুরুষকে এই রূপে সৌন্দর্য ও রস-লোকে মুক্তি দান করে। মুক্তি-তত্ত্ব বলিতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

নারী-প্রেম এবং তদাশ্রয়ী সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া পুরুষের অন্তরে উন্নততর লোকসমূহের আভাস নামে ঃ

“গন্ধ দিবে সিন্ধু পারের
কুঞ্জবীথির,
আনবে ছবি কোন বিদেশের
কী বিস্মৃতির।” (মায়া)

প্রেমোপলব্ধিতে পুরুষের অন্তরে যে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, উহারই চূড়ান্ত তন্ময় মুহূর্তে পুরুষের চেতনা ক্ষণে ক্ষণে মর্ত্য-চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। অন্তরে রূপের নিবিড় আসঙ্গ বোধ বা ধ্যান এবং ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া উন্নততর চেতনায় দিব্য আনন্দ আস্বাদ করিয়া পুরুষ হয় গীতকার, রূপকার ; পুরুষ হয় স্রষ্টা ঃ

“পরশ মম লাগবে তোমার
কেশে বেশে,

অঙ্গে তোমার রূপ নিয়ে গান
উঠবে ভেসে।" (মায়া)

অন্তরে ধ্যান-লোকে এই যে নিত্যনূতন রূপ সৃষ্টি তাহাই নারীর সত্য রূপ। সত্য রূপ বলিবার অর্থ এই যে, ধ্যানে নারীর যে রূপ প্রতিভাত হয়, তাহা সীমা বা রেখার বন্ধনে আবদ্ধ রূপ নহে। ধ্যানে নারীর যে রূপ প্রতিভাত হয়, তাহা মুক্ত-স্বরূপ এই অর্থে যে তাহাতে অসীমের চকিত আভাস লাভ ঘটে।

এই তত্ত্ব তো রবীন্দ্র-কাব্যে নূতন নয়। পরন্তু এই মূল উপলব্ধিটিকেই তিনি নানা-ভাবে নানা-প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করিয়াছেন। পূরবীর 'স্বপ্ন' কবিতাটি এক্ষেত্রে স্মরণে পড়িতেছে। সেখানে বস্তুর মুক্ত স্বরূপ সম্পর্কে কবি যে উক্তি করিয়াছিলেন, 'স্বপ্ন শুধুই মর্ত্যে অমর আর সকলই বিড়ম্বনা'; ঠিক সেই ভাবটিই বর্তমান কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে:

"বস্তু হতে সেই মায়া তো সত্যতর
তুমি আমায় আপনি রচে আপন কর।" (মায়া)

নির্বিশেষ রূপ প্রেমে, সৌন্দর্য-ধ্যানে এমন একটি বিশিষ্টতা লাভ করে বিশ্বে যাহার আর তুলনা মেলে না। অন্তহীন রূপ-লোকে তাহা একক প্রকাশ। পুরুষের ধ্যান-লোকটি বিশিষ্ট, বাহিরের রূপ উহারই অনুরাগের আশ্চর্য স্পর্শে অপরূপতা, অনন্যতা লাভ করে।

জগৎ ও জীবনের 'মায়া'-রূপ পুরুষের চেতনায় কোন্ পরিণামে মুক্তিলাভ করে এবং এইরূপে মায়ার সাধনায় কোন্ পরম পরিণাম রবীন্দ্রনাথের নিকট মুক্তি স্বরূপতা লাভ করিয়াছে তাহা হয়ত কিছুটা বুঝিতে পারা গিয়াছে। এই তত্ত্বটিকে রবীন্দ্রনাথ মহুয়ার আরও দুই একটি কবিতায় যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইতে পারে। তাহা হইলে এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তার স্বরূপটিকে একপ্রকার বুঝিতে পারা যাইবে।

মায়াবাদী তাত্ত্বিকের নিকট জগৎ ও জীবন যেমন মায়া, তেমনি আর একটি দিক আছে, যেক্ষেত্রে সৌন্দর্যবোধে এই যে মুক্তি তাহা শূন্যতা বলিয়া বোধ হয়।

যাহাকে ইন্দ্রিয় দিয়া বোধ করিতে পারি, বুদ্ধির দ্বারা বিশ্লেষণ করিতে পারি কেবল তাহাই এই শ্রেণীর মানুষের নিকট সত্য। এই শ্রেণীর মানুষের সমগ্র

সত্তা বহির্বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া নির্ভরতা পায়। বহিশ্চেতনা নিরপেক্ষ যে-কোন অস্তিত্বের উপলব্ধি ইহাদের নিকট সত্য নহে।

রবীন্দ্রনাথের যে মুক্তি-লোক বা রস-লোক তাহা ভাবেরই বিচিত্র বিলাস এবং ওই ভাব আশ্রয় করিয়া উন্নততর চেতনার আভাস লাভ। এই ভাবে মর্ত্য ও অমর্ত্য-লোকের মধ্যে তিনি একপ্রকার সামঞ্জস্য লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের যে মুক্তি-লোক তাহা মায়াবাদীদের অমর্ত্য-চেতনা নহে, তেমনি জড়বাদীদের কেবল মর্ত্য-চেতনাও নহে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসা যাক্। -যেখানে এইরূপ উক্তি লাভ করা যায় ঃ

"যেথায় তুমি গুণী জ্ঞানী, যেথায় তুমি মানী,
যেথায় তুমি তত্ত্ববিদের সেরা,
আমি সেথায় লুকিয়ে যেতে পথ পাব না জানি
সেথায় তুমি লোকের ভিড়ে ঘেরা।" (ছায়ালোক)

সেখানে তত্ত্বজ্ঞান বলিতে মায়াবাদীদের ব্রহ্মজ্ঞানও যেমন হইতে পারে, তেমনি জড়বাদীদের বস্তুতত্ত্বও হইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রেমের কোন মূল্য নাই। একদিকে মর্ত্য-প্রেমকে মায়া বলিয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হইয়াছে, অন্যদিকে নারীর মূল্য কেবল প্রয়োজনবোধের দ্বারা নির্ণীত।

যদি সৌন্দর্যবোধের ক্ষীণতম আভাসও এই সমস্ত পুরুষের অন্তরে থাকে, তবে সেই সৌন্দর্যবোধ আশ্রয় করিয়া অন্তরে প্রেম জাগে। অন্তরে প্রেম বা প্রাণ জাগ্রত করিয়া তুলিতে সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে ষড়যন্ত্র চলিতেছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য জড়বাদীদের অন্তরে এমন একটি অতৃপ্তি বোধ সঞ্চারিত করিয়া দেয় যাহাকে বাহিরের কোন কিছুর দ্বারা পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারা যায় না। অন্যদিকে ক্ষণে ক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানীদের শূন্যচিত্তে প্রকৃতির কিংশুক রক্তিমা লাঞ্ছিত হইয়া যায়। ওই অতৃপ্তি বা ওই রক্তিমা লাঞ্ছনের ভিতর দিয়া পুরুষের চিত্তে অনুরাগ জাগে ঃ

"সেথায় আমি যাব যখন চৈত্র রজনীতে
বনের বাণী হাওয়ায় নিরুদ্দেশা
চাঁদের আলোয় ঘুম হারানো পাখির কলগীতে
পথ হারানো ফুলের রেণু মেশা।" (ছায়ালোক)

আর কিছু নয় একটা সৌন্দর্য-লোক ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা। চৈত্রের রাতে বাতাস উতলা হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় শাখান্তরাল হইতে মাঝে মাঝে পাখি ডাকিয়া উঠিতেছে আসন্ন প্রভাত বোধ করিয়া। সারারাত তাহাদের চোখে ঘুম নাই। ফুলের গন্ধ ও রেণু বিজড়িত বাতাসে সেই কলকাকলি মিশ্রিত হইয়া চতুর্দিকে যেন স্বপ্নের জাল বুনিতে থাকে। তখন মনের মধ্যে এক অনাস্বাদিত বেদনা জাগে, যে বেদনায় বৃক্ষে বৃক্ষে ফুল ফুটে, কিশলয় জাগে, সেই বেদনার পথ বাহিয়া মন কোন্ অজ্ঞাত লোকে অভিসার করে কে জানে। কাহাকে লাভ করিতে তাহার এমন ব্যাকুলতা, তাহা সে জানে না। শুধুমাত্র জানে যে, তাহাকে লাভ না করিলে জীবন ব্যর্থ হইয়া যায়।

প্রেমে মানুষ অন্তরের ধ্যানটিকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করে, তাহাকে বাহিরে নানাভাবে রূপায়িত করিতে চায়।

এই তত্ত্ব সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত বিজড়িত। স্রষ্টা আপনার অন্তরের ঐশ্বর্যকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিলেন। ইহা প্রেমের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া দেশে-কালে তিনি অন্তহীন রূপ-লোক সৃষ্টি করিলেন। এই সৃষ্টি-লোক আশ্রয় করিয়া তিনি নিত্যকাল আপনার ধ্যান-রূপটিকে প্রেমে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

বস্তুত প্রত্যেক চেতনা-পর্বে সৃষ্টির এক একটি পর্যায় আছে। এই সৃষ্টির পর্যায় ব্যতীত চেতনা বন্ধ্যা। চূড়ান্ত তত্ত্বের কথা থাক্। অন্তত সৃষ্টি-লোকে রূপ এবং চেতনা অঙ্গাঙ্গী বিজড়িত। একটি ব্যতীত আর একটির কোন অস্তিত্ব নাই।

প্রেম যে চেতনা জাগ্রত করে পুরুষ তাহাকে নানারূপে বাহিরে সৃষ্টি না করিয়া থাকিতে পারে না। নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার অবিরাম সৃষ্টি-ক্রিয়া চলে। নারীর বাস্তব রূপ গৌণ। পুরুষ নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া তাহার আপনার রূপ-ধ্যানকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করে:

"সে রূপ আমার দেখবে ছায়ালোকে,
যে-রূপ তোমার পরাণ দিয়ে আঁকা।" (ছায়ালোক)

প্রেমে বিশিষ্ট একটি রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। এই ধ্যান-লোকে উন্নততর চেতনার আভাস লাভ ঘটে বলিয়া যে রূপ প্রতিভাত

হয় তাহা বাহিরের রূপ আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠিলেও তাহা বহিঃ-সৌন্দর্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ আর এক সামগ্রী হইয়া উঠে। অন্তরের ধ্যানে সৌন্দর্য অপার মহিমা লাভ করে। নিত্য নূতন রস-বিস্ময়ে মনকে আবিষ্ট করে।

কখন কখন ধ্যানের এই সৌন্দর্যকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। যে-রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরের ধ্যান সমৃদ্ধ হইয়াছে সেই ধ্যানলব্ধ সৌন্দর্যকে পুরুষ ওই বিগ্রহের মধ্যে অনুসন্ধান করে ঃ

"কিসের নিবিড় ছায়া
নিয়েছে স্বপন কায়া
তোমার মর্মের মাঝখানে।" (ছায়া)

নারীর মর্মের মাঝখানে এই যে 'স্বপন কায়া' তাহা তো নারীর মধ্যে নাই। পুরুষের ধ্যান-রূপটি নারীর রূপের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া পুরুষের দৃষ্টিতে ওই রূপ অপরূপের বিস্ময় দান করে ঃ

"বসন্ত কূজিত রাতে
তোমার বাণীর সাথে
অশ্রুত কাহার বাণী মেশে।" (ছায়া)

সেই কথাই বলিতে চাহিয়াছিলাম। নারীর কণ্ঠস্বরে অমর্ত্য আর এক সুর-ঝংকারের যে কথা বলা হইয়াছে, তাহা কিন্তু পুরুষের ধ্যানলব্ধ শ্রুতি, তাহার কোন পরিচয় বাহিরে নাই। সেই উপলব্ধিটিকেই অন্য এক ভাবে পুনরায় ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

"মনে তব গুপ্ত কোন্ নীড়ে
অব্যক্ত ভাবনা এসে ভীড়ে।" (ছায়া)

মূল এই কথাটিই আমাদের বুঝিলে চলিবে যে অন্তরে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া মানুষের চেতনা মুহূর্তে মুহূর্তে উর্ধ্বতর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। 'অব্যক্ত ভাবনা এসে ভিড়ে', 'অশ্রুত কাহার বাণী মেশে', কিংবা 'স্বপন কায়া' ইত্যাদি বোধ জাগে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া উর্ধ্বতর লোকের চকিত আভাস লাভের ফলে।

নারীর সৌন্দর্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে যে ধ্যান-লোক উদ্‌বাটিত হইয়া যায় সেই ধ্যান-লোক নিত্যনূতন রূপ-সৃষ্টি করিয়া পুরুষের চেতনা

অন্তহীন অভিসার করিয়া চলে। রস-লোকের দ্বারের পর দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া এই যে রূপাভিসার, রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে ইহাকেই মুক্তি-তত্ত্ব স্বরূপে আশ্রয় করিয়াছেন, তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। সেই সৌন্দর্য-লোকের কথাই কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন :

"সেথায় কখন অগম গোপন গহন মায়ায়
পথ হারাইল ও-যে। (সন্ধান)

কিন্তু অন্তহীন সৌন্দর্য-ধ্যানে পুরুষের এই যে মুক্তি, তাহার মধ্যেও অপূর্ণতার পীড়া লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এই বেদনাবোধটিকে রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, সে কথা নহে। এই বেদনাবোধেরই বা স্বরূপ কি? তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলাম, যে সীমার যে-কোন স্বরূপে মানবীয় চেতনা পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না।

সেই একই চেষ্টার পরিচয় এক্ষেত্রেও লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু তাহাতেও অসম্পূর্ণতার বেদনা কবি বোধ না করিয়া পারেন নাই :

"আতুর দিঠিতে শুধায় সে নীরবেরে
নিভৃত বাণীর সন্ধান নাই যে রে,
অজানার মাঝে অবুঝের মত ফেরে
অশ্রুধারায় মজে।" (সন্ধান)

অন্তরে ধ্যান-লোকের রূপের সহিত যখন নিত্য মিলন ঘটে তখন বাহিরের রূপ হারাইয়া গেলেও হৃদয় আর শূন্যতার ভারে ভাঙিয়া পড়ে না। রূপ ধ্যানে যখন স্থির পরিণাম লাভ করে, তখন রূপ মুক্তি পায়। যেখানে বাহিরে রূপ হারাইয়া গেলে অন্তর শূন্যতায় ভরিয়া যায় এবং শূন্যতার ভারে মানুষের মন একেবারে শতধা হইয়া যায়, রূপ সেখানে বন্ধন।

বাহিরে রূপের বিনষ্টিতে অন্তর যখন নিরন্ধ্র অন্ধকারে ঢাকিয়া যায় তখন ওই অন্ধকার-লোক অতিক্রম করিয়া প্রাণের দুর্জয় শক্তির বশে মনুষ্য-চেতনায় আর এক রূপ সাক্ষাৎকার ঘটে। ধ্যান-লোকে এই যে রূপ সাক্ষাৎকার এবং তাহার সহিত যে নিত্য মিলন রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই বলিয়াছেন সাধনা। মানুষ যেখানে বিরহের এই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ধীরে ধীরে দিব্য আর এক রূপ সাক্ষাৎ করিতেছে সেইখানেই সৃষ্টি, সেইখানেই সঙ্গীত। নহিলে শুধু শূন্যতাবোধে যেমন গান নাই, তেমনি পরিপূর্ণ প্রাপ্তিতেও সঙ্গীত নিরুদ্ধ হইয়া যায় :

"তুমি হাসি
মোর হাতে দিলে তব বিরহের বাঁশি।
তার পরদিন হতে
বসন্তে শরতে
আকাশে বাতাসে উঠে খেদ,
কেঁদে কেঁদে ফিরে বিশ্বে বাঁশি আর গানের বিচ্ছেদ।" (বিচ্ছেদ)

বিচ্ছেদের অন্তহীন অশ্রু-সমুদ্রের দুই তীরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে সুরের প্রবাহ। শুধু বিচ্ছেদ তো নয়, উহার বেদনার ভিতর দিয়া যে সঙ্গীত জাগে। 'গানের বিচ্ছেদ' শব্দটির ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়।

অসীম বা অরূপ যিনি তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যের তো কোন প্রকাশ ছিল না। দেশ-কালের পরিসীমায় তিনি আপনাকেই রূপে বিশ্লিষ্ট করিলেন। রূপ ও অরূপের এই আপাত-বিচ্ছেদ (ইহাই শাশ্বত মায়া-তত্ত্ব) সৃষ্টির মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ প্রাচুর্যের ভারে উপচাইয়া পড়িতেছে। নর-নারীর বন্ধ্যা একক চেতনা প্রেমে দ্বিধা হইয়া যায়। তখন সেই যুগল লীলায় অন্তর্লীন সকল ঐশ্বর্যের একে একে প্রকাশ ঘটে।

'অন্তর্ধান' কবিতাটির মধ্যে এই তত্ত্বটির সুন্দর প্রকাশ লক্ষ্য করিতে পারা যায়ঃ

"বিচ্ছেদেরি হোম-বহ্নি হতে
পূজা মূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।" (অন্তর্ধান)

বিচ্ছেদের শূন্যতা পূর্ণ করিয়া ধ্যান-লোকে ধীরে ধীরে ওই রূপ ফুটিয়া উঠে। পুরুষের বেদনা-দীপ ওই মূর্তিকে নিত্য উদ্‌ভাসিত করিয়া তুলে। নিত্য নিভৃত অশ্রুপাতে ওই ধ্যান-মূর্তিকে সে নিষিক্ত করিয়া দেয়।

ধ্যানে রূপের সহিত এই যে নিত্য আসঙ্গ তাহাতে অপার বেদনাবোধ আছে সত্য, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঊর্ধ্বতর চেতনা-লোকে ওই বোধকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে চান নাই। তাহাতে বেদনা হয়ত লোপ পায় কিন্তু সেইসঙ্গে দ্বৈতবোধটি আর থাকে না বলিয়া প্রেমের এই বিশিষ্ট সম্ভোগটিও আর থাকে না। সেই একই তত্ত্বঃ

"তুমি কবে মর্ম মাঝে পশি
আপন মহিমা হতে রেখে গেলে বাণী মহীয়সী॥" (বিরহ)

নর-নারীর প্রেমের কয়েকটি বিশিষ্ট ধর্মের পরিচয়ও কবি ইতস্তত দান করিয়াছেন। বস্তুত, বিচিত্র ধর্ম নহে, একই বোধের বিচিত্র বিলাস মাত্র। 'মহুয়া' কাব্য পাঠ করিতে বসিয়া এই দিকগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লাভ প্রয়োজন।

পুরুষের প্রেমে তাহার প্রেম নিবেদনে এমনি অধ্যাত্ম-প্রত্যয়। বাহিরে আশা বিশ্বাসের ক্ষীণতম আভাস যদি না থাকে, যদি বাহিরে তাহার পরিচয় হারাইয়া যায়, তবু পুরুষের প্রেম ধ্যান-লোকে অনির্বাণ নিঃসংশয়ের দীপ জ্বালাইয়া রাখিতে পারে। পুরুষের প্রেমে এই দৃঢ় প্রত্যাশা, তাহার রূপক-স্বরূপ কদম্বফুলের অর্ঘ্যের উল্লেখ সার্থক কবি-কল্পনার পরিচায়ক।

যেদিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘ নামে, সূর্যের সকল দাক্ষিণ্য হইতে ধরণী যেদিন বঞ্চিত, তাহার অসীমতার চতুর্দিক ঘিরিয়া সীমার পর সীমা টানিয়া দেয়, ধরিত্রীর কান্নাই যেন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ধারার পর ধারায় নামিয়া আসিতে থাকে, সেদিনও কদম্বফুল কেশরে রৌদ্রের স্বপ্ন লইয়া ওই নৈরাশ্য জয় করিয়া জাগিয়া থাকে। প্রিয়মিলনে ইহা সাময়িক বিচ্ছেদ মাত্র, একটা ক্ষণিক দুঃস্বপ্ন —সূর্য-দয়িতের সহিত তাহার মিলন ঘটিবেই :

"মন্থর মেঘেরে যবে দিগন্তে ধাওয়ায়
পুবন হাওয়ায়,
কাঁদে বন শ্রাবণের রাতে
প্লাবনের ঘাতে,
তখনো নির্ভীক নীপ-গন্ধ দিল পাখির কূলায়
বৃন্ত ছিল ক্লান্তিহীন তখনো সে পড়েনি ধূলায়
সেই ফুলে দৃঢ় প্রত্যাশার দিনু উপহার।" (পরিচয়)

নারীর প্রেম পুরুষকে সৌন্দর্য-ধ্যানের লোকে, রস-লোকে মুক্তি দান করে। যেখানে পুরুষ নারীকে বাহিরে আপনার ভোগের আবেষ্টনে লাভ করিতে চায়, সেখানে পুরুষ যেমন স্বধর্মচ্যুত হয়, নারীর প্রকৃতিও তেমনি বিকৃত হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ কোন কোন ক্ষেত্রে এমন মন্তব্য করিয়াছিলেন, যে মাতাল দীপ-শিখাকে আলিঙ্গন করিতে চায়, সে যেমন নিজে পুড়ে তেমনি দীপ-শিখাটিকেও নিভাইয়া দেয়।

নারী-প্রেমে তাই দুইটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি তাহার অন্তরের সৌন্দর্য-সৌরভের দিক, সেই সৌরভ পুরুষের ধ্যানকে সদা জাগ্রত করিয়া রাখে। আর একটি তাহার দেহ-ধর্মের দিক, সম্ভোগের মধ্যে যাহা পুরুষের সমস্ত ধর্মকে মুহূর্তে পুড়াইয়া ছাই করিয়া দেয়। নারী-প্রেমের এই ধর্মটি কেতকী ফুলের রূপকে সুন্দরভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিদ্ধ-কণ্টকের জ্বালার ভিতর দিয়া পুরুষকে নারী-প্রেমের এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হয়ঃ

"সহজ সাধন লব্ধ নহে সে মুগ্ধের নিবেদন
অন্তরে ঐশ্বর্যরাশি আচ্ছাদনে কঠোর বেদন।" (পরিচয়)

যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হইয়া যায়, সেই সঙ্গে মানুষের বহু বিচিত্র কীর্তি, কত-না প্রয়াস একদিন ধূলিসাৎ হইয়া পড়ে। একদিনের গৌরব, আর একদিনে স্মরণেও থাকে না। সেখানে কেবল প্রেম চিরন্তনী। উহারই স্নিগ্ধ ছায়ায়, উহারই শীতল ধারায় তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া জীবনের এই কয়েকটা দিন কাটাইয়া দেওয়া।

চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অদূরে ভগ্ন দেউল হতগৌরব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। যে প্রান্তরের উপর দিয়া একদিন রাজধানীর প্রশস্ত পথ রচিত হইয়াছিল, আজ সে রাজধানী নাই, সে পথও নাই। নির্জন প্রান্তরের প্রান্তে পায়ে-চলা পথ দিয়া নিঃসঙ্গ জনপদ-বধূ কেবল কলসীতে জল ভরিয়া ঘরে ফিরিতেছে। এই চতুর্দিক ব্যাপী রিক্ততার মাঝখানে কেবল দুটি শ্যামল তরু দাঁড়াইয়া।

জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুই বুঝি এমনি অন্তহীন পাষাণ-ভার। নর-নারী যেখানে প্রেমে মিলিত হয়, সেইখানেই কিছু শ্যামলিমা, কিছু প্রাণের মৃদু গুঞ্জরণ, অর্থের চকিত আভাস।

জীবন অবসানে নর-নারীর অন্তরের এই দুর্লভ ধন হয়ত হারাইয়া যায়, কিন্তু প্রেম বা প্রাণ চিরন্তন। যুগ যুগ ধরিয়া নর-নারী পরস্পরকে ভালোবাসিবে, একই চিরন্তন প্রেম, একই প্রাণধারা উভয়ের হৃদয় আশ্রয় করিয়া ব্যক্ত হইবেঃ

"আর কোন যুগে অন্য যুগের প্রিয়া
তারে আর কারে দিবে কি উদ্ধারিয়া।" (বাপী)

সমগ্র কাব্য-দেহ বেষ্টন করিয়া এমন একটি করুণ সুর ধ্বনিত হইয়াছে, যাহাকে ভাষা-বন্ধনে বাঁধিতে পারা যায় না।

"অসীমের বুকে অনাদি বিষাদি থানি
আছে সারাক্ষণ মুখে আবরণ টানি।" (বাপী)

এই অনাদি বিষাদের সুর সমগ্র কবিতাটি পরিপূর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়াছে। প্রেমে প্রত্যাশায় স্বরূপটিও কি কম বিস্ময়ের। যাহাকে কোন কালে ফিরিয়া লাভ করা যাইবে না, যাহার সকল চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে, তথনও অন্তরের কোন্ স্থির বিশ্বাসে প্রেমিকা অনন্ত রজনীর প্রহর গণনা করিয়া চলে। তাহারই নামের মালা জপিতে জপিতে আয়ু শেষ হইয়া আসিলেও অন্তরে মিলনের দৃঢ় প্রত্যয় বহিয়া সে মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া যায়। কোথায় কোন্ লোকে মিলিত হইবে বলিয়া তাহার এই বিশ্বাস। ধ্যানের কোন্ দিব্য-আলোক মৃত্যুর ঘন কৃষ্ণ যবনিকাকেও বিদীর্ণ করিয়া লোক-লোকান্তরকে প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলে, তাহা আমরা জানি না। প্রেমিকার বহিশ্চেতনায় মাঝে মাঝে সংশয় জাগে বৈকি! তথন সে কী বেদনা-বোধ। তাহার অসহনীয় নিপীড়নে প্রতি রোমে রোমে রক্তধারা নিস্থত হইতে চায়। সেই আবেগ মুহূর্তেও অন্তরের ধ্যান-অচঞ্চল আলোক-শিখা বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে :

"আবার কথন এমনি দিনেই ফাগুন মাসে
কি বিশ্বাসে
ডালগুলি তার রইবে শ্রবণ পেতে
অলখ জনের চরণ শব্দে মেতে।" (প্রত্যাশা)

সমগ্র বিশ্ব-প্রকৃতি যেন বিরহিণী বধূ। চিরনির্বাসিত কোন দয়িতের জন্য নিত্য প্রত্যাশার অগ্নি বক্ষে জ্বালাইয়া দ্বারপ্রান্তে আকাশ-নীলিমার উদার সিক্ত দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া থাকে। কবি বিশ্ব-প্রকৃতির নিকট হইতে এই প্রত্যয়-রহস্য শিক্ষা করিতে চান :

"হায় গো আমার ভাগ্যরাতের তারা
নিমেষ গগন হয়নি কি মোর সারা।
প্রত্যহ বয় প্রাঙ্গণময় বনের বাতাস এলোমেলো,
সে কি এলো।" (প্রত্যাশা)

মহুয়ার মধ্যে কবির অধ্যাত্ম-সংগ্রামের যে পরিচয় রহিয়াছে তাহার স্বরূপ না বুঝিলে কাব্যপাঠ সম্পূর্ণ হইবে না। পরিশেষে তাই তাহারই একটি দিক নির্দেশ করিব।

মহুয়ার মধ্যে কবি সৌন্দর্য ও প্রেম আস্বাদের জন্য যেমন প্রাণ প্রার্থনা করিয়াছেন, তেমনি এই সৌন্দর্য ও প্রেম-লীলায় কিছুকাল যাপনের পর ইহাকে আবার তিনি পরিহার করিয়াছেন। ইহা কবি উপলব্ধি করিয়াছেন যে, ইহার পথ বাহিয়া মানবীয় চেতনা খুব বেশিদূর ঊর্ধ্বগামী হইতে পারে না।

মানবীয় চেতনার ঊর্ধ্বাভিসারে সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির একটা সীমা আছে বলিয়া কেবল যে কবি ইহাকে পরিহার করিয়াছেন তাহা নহে, অবসিত যৌবনে ক্লান্তিজনিত, অসামর্থ্যজনিত একটি অসহায়বোধের গোপন হাহাকারও উহার সহিত বিজড়িত হইয়া গিয়াছে।

একথা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে, ইন্দ্রিয়-প্রাণের সামর্থ্য যখন স্বাভাবিক ভাবে কমিয়া আসে তখন প্রকৃতি হইতেই নির্দেশ আসে অধ্যাত্ম-জীবনটিকে আশ্রয় করিবার। বসন্তে ফুলের ঐশ্বর্যের পর গ্রীষ্মের প্রখর তাপে ফল ফলানোর পর্যায় আসে।

পরিণত বয়সে এমনি করিয়া একটি পর্যায় শেষ করিয়া আর একটি পর্যায় শুরু করিতে হয়। তাহা না হইলে অর্থাৎ বাহিরের রূপ মাত্রকে আশ্রয় করিলে ইন্দ্রিয় প্রাণের অসামর্থ্যে এইরূপ দিনে দিনে স্তিমিত হইয়া আসে। প্রাণের হাহাকার দিনের পর দিন বাড়িয়া যায়। পরিশেষে এক সান্ত্বনাশূন্য হাহাকারের মধ্যে জীবন হারাইয়া যায়।

অধ্যাত্ম-জীবনে এই যে পরিণামের কথা বলিলাম তাহা লাভ করিতে কিংবা আশ্রয় করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে কি মর্মান্তিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই? ইতিপূর্বে এই সংগ্রামের পরিচয় আমরা প্রায় সর্বত্রই লাভ করিয়াছি। মহুয়ার মধ্যে ইহার যে সামান্য পরিচয় আছে প্রসঙ্গত তাহার উল্লেখ করিব।

প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মানবীয় প্রেম আস্বাদের জন্য কবি অন্তরে আজ প্রাণের উদ্বোধন ঘটাইতে চান। ফাল্গুনে প্রকৃতির মধ্যে কেবল প্রাণের সাড়া জাগে নাই, কবির অন্তরে সেই প্রাণের স্পর্শ আসিয়া লাগিয়াছে ঃ

"প্রাণদেবতার মন্দির-দ্বার
যাক রে খুলে,
অঙ্গ আমার অর্ঘ্যের থাল
অরূপ ফুলে।" (অর্ঘ্য)

কবির এই সুপরিণত জীবনে এই নূতন সৃষ্টির মূলে আছে প্রাণের অনুভূতি।

প্রাণের বোধ সঞ্চারিত হইবামাত্র সৃষ্টির এক প্রবল প্রেরণা কবির জীবনে আসিয়া গিয়াছে ঃ

"আমার প্রকাশ নতুন বচন ধরে
আপনাকে আজ নতুন বরণ করে।" (অর্ঘ্য)

যৌবনে অতি সমৃদ্ধ প্রাণপ্রাচুর্যে কবি একদিন যে গান গাহিয়াছিলেন, প্রাণ-ধারার স্পর্শে কবিকণ্ঠে আজ সেই গান ধ্বনিয়া উঠিয়াছে। যৌবনে কবি যে চেতনাশ্রয়ী ছিলেন, সেই চেতনাশ্রয়ী হইতে আবার সেই চেষ্টা জাগিয়াছে ঃ

"কী ইঙ্গিতে আচম্বিতে
ডাকিলে লীলা ভরে
দুয়ার খোলা পুরানো খেলা ঘরে
যেখানে বসে সবার কাছাকাছি
অজানা ভাবে অবুঝ গান
একদা গাহিয়াছি।" (মুক্তি)

যৌবনের একই ভাবে ভাবিত হইলেও কবির অন্তরে সেই প্রাণ যেমন গভীর ভাবে অনুভূত হইতে পারে না, তেমনি সৌন্দর্য ও প্রেমের ভাব কল্পনাগুলির সেই পরিপূর্ণ প্রকাশও ঘটতে পারে না। সুপরিণত বয়সে অতিক্ষীণ প্রাণ-ধারায় যৌবনের স্মৃতি-লোকটি কেবল উদ্বেল হইয়া উঠে। সৌন্দর্য ও প্রেম আস্বাদ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথচ জীবনে তাহার অক্ষমতা বোধ কবির অন্তরকে বেদনাবিক্ষুব্ধ বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই প্রসঙ্গে 'পুরাতন' কবিতাটি সম্পূর্ণ পাঠ করা যাইতে পারে। আমি এক্ষেত্রে তাহারই কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ

"যে গান গাহিয়াছিনু কবেকার দক্ষিণ বাতাসে
সে গান আমার কাছে কেন আজ ফিরে ফিরে আসে
শরতের অবসানে।" (পুরাতন)

কবির জীবনে আজ যৌবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের স্মৃতি-লোকটিই একমাত্র সম্বল। নূতন করিয়া প্রাণের স্পন্দন আহরণের শক্তি কবির জীবনে প্রায় নিঃশেষিত ঃ

"শুনি যেন কানন-শাখায়
বেলা-শেষের বাজায় বেণু

মাখিয়ে নে আজ পাথায় পাথায়
স্মরণ ভরা গন্ধ রেণু।” (শেষ মধু)

কবির জীবনেও ফাল্গুন অবসিত হইয়া গিয়াছে, আজ কেবল তাহার স্মৃতিকেই গভীর মমতায় জড়াইয়া ধরিতে পারা যায়।

কবি সৌন্দর্য ও প্রেম আশ্রয় করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু শীঘ্রই অসামর্থ্য বোধ করিয়া স্মৃতি-লোকটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও একটি দিক লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে যে, কবি বহির্জীবনকে পরিহার করিয়াছেন, কেবল বাধ্য হইয়াই নহে, মহত্তর পরিণামে ইহাদের সত্য-মূল্য খুব বেশি নাই বলিয়া :

“সারাটা বেলা সাগর ধারে
কুড়ালি যত নুড়ি
নানা রঙের শামুক ভ'রে
বোঝাই হল ঝুড়ি,
লবণ পারাবারের পারে
প্রখর তাপে পুড়ি
মরিলি পিপাসায়।” (অবশেষে)

বহির্জীবনকে আশ্রয় করিয়াও অন্তরে অধ্যাত্ম-লোকের গভীর বাণী কবি বারংবার শুনিয়াছেন। এই আহ্বানে উন্মনা হইয়া কবি কতবারই তো কর্ম ভুলিয়া, ঝিনুক সংগ্রহ পরিহার করিয়া অন্তর্জগতের অতল গহ্বরে অধ্যাত্ম-সমুদ্রের তীরে বসিয়া তাহার বাণী শুনিয়াছেন। অজানিত গভীর গোপন বেদনায় কবির দুই চক্ষু পরিপূর্ণ করিয়া বারংবার অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে। এই ব্যাকুলতার অর্থ কবি তখন বুঝিতে পারেন নাই। কখনও বা বুঝিতে পারিয়া বারংবার অজানা সমুদ্রে যাত্রা করিয়াছেন। ইহাকেই বলিয়াছিলাম ঊর্ধ্বতর চেতনালাভের জন্য গভীর গোপন বেদনা। এই অধ্যাত্ম-পরিণামের জন্যই তো মানুষকে অন্তর্লোকটিকে আশ্রয় করিতে হয়। অন্তরের ওই পথ ছাড়া উন্নততর পরিণাম-লাভের আর কোন উপায় নাই :

“ঢেউয়ের দোল তুলিল রোল
অকূল তল জুড়ি
কহিল বাণী কী জানি কী ভাষায়।” (অবশেষে)

কবি অবশেষে অন্তর্জগৎটিকে আশ্রয় করিয়াছেন, কিন্তু আশ্রয় গ্রহণের মধ্যে কবি-চিত্তের দ্বন্দ্বটি আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে।

"কাননবীথি ফুলের রীতি
না হয় গেছে ভুলি
তারকা আছে গগন কিনারায়।" (অবশেষে)

যৌবনের সৌন্দর্য-প্রেমের পর্যায় যদি শেষ হইয়া থাকে, তবে আশ্রয় করিবার মত অন্তরে ধ্যান-লোক আছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, এই আশ্রয়গ্রহণের মধ্যে পূর্ণতর চেতনালাভের গভীরতর আনন্দের কোন প্রকাশ নাই। যেন একটির পরিবর্তে আর একটিকে আশ্রয় করা, কাননের ফুলের পরিবর্তে আকাশের তারা। একটা সংশয়ের গোপন পীড়ার ক্ষীণতম আভাস যে ইহার মধ্যে নাই তাহাও নহে।

'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে সতেরোটি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলির ভিতর দিয়া তিনি নারীর সতেরোটি বিশিষ্ট প্রকৃতিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি দেশে-বিদেশে সংখ্যাতীত নারীর নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তবে বাঙলা দেশের নারীই তাঁহার চিত্ত জয় করিয়াছিল সর্বাধিক। 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছের অন্তর্ভুক্ত সতেরোটি কবিতার মধ্যে তিনি আপনার পরিচিত বাঙলা দেশের নারীদের কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রে বিভক্ত করিয়াছেন।

এই চরিত্র-চিত্রণের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেকটি চরিত্র এক-একটি স্বাতন্ত্র্য লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এমন একটি অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব যাহার সহিত অন্য কোন চরিত্রের কোন সাদৃশ্য নাই। প্রত্যেকটি চরিত্র পৃথক অস্তিত্বের গৌরবে গৌরবান্বিত।

চরিত্র-চিত্রণের যে দক্ষতা বিশ্বের প্রথম শ্রেণীর নাট্যকারদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়, সেই অসামান্য দক্ষতার পরিচয় এই কয়েকটি নারী-প্রকৃতি রূপায়ণের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত, নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি লইয়া তিনি মহান্ স্রষ্টার ন্যায় এই প্রত্যেকটি চরিত্রকে তাহার স্বকীয় অন্তর্গূঢ় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তাঁহার ধ্যান-নেত্রে চরিত্রগুলির আদি ও অন্ত যেন উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে।

এই চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে তাঁহার দৃষ্টি কোন আদর্শের দ্বারা, কোন বিশিষ্ট ভাবনা, কোন নৈতিকবোধ, কোন ধর্মসংস্কারের দ্বারা আদৌ আচ্ছন্ন

নয়। সম্পূর্ণ তন্ময় (objective) দৃষ্টিভঙ্গী বলিতে যাহা বুঝায় এই কবিতা কয়েকটি রচনার ক্ষেত্রে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর আশ্চর্য প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নারী-জীবনের বিচিত্র লীলাকে তিনি দেখিয়াছেন তাহাদের বিশিষ্ট স্বরূপে।

ব্রাউনিং-এর কবিতার মধ্যে এই জাতীয় চরিত্র-চিত্রণের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় লাভ করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নর-নারী আপনার ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা, আকাঙ্ক্ষা-অনাকাঙ্ক্ষা, সামর্থ্য ও অসামর্থ্য লইয়া এক অজ্ঞাত-অভিপ্রায়কে জীবনে চরিতার্থ করিয়া চলিয়াছে। তাঁহার এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে সকল আদর্শ প্রেরণা, সর্ববিধ নৈতিক সংস্কার, সকল ধর্মবোধ, জীবনের সকল মূল্যায়ণ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এই চরিত্রগুলির মধ্যে অনেক বিরূপ, বীভৎস, হীন, তুচ্ছ চরিত্রও আছে। তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনি সত্তার দুর্লভ মূল্যকে আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই কয়েকটি নারীরূপ চিত্রণের অসামান্য দক্ষতাকে স্বীকার করিয়া লইয়াও কোন কোন সমালোচক অভিযোগ করিয়াছেন যে 'নাম্নী' কবিতা-গুচ্ছের প্রত্যেকটি নারী স্বভাব-বৈচিত্র্য সত্ত্বেও অসামান্যা সুন্দরী তরুণী। নারীর মধ্যে যে ভয়ংকর শক্তির লীলা, যে অন্ধ আবেগের প্রলয়ংকর ঝটিকা, মহামায়ার সেই যে ভীষণামূর্তি, তাহার কোন ধ্যান কবির কাব্যে তেমন কোথাও সত্য হইয়া উঠে নাই। 'প্রণয়প্রশ্ন' ইত্যাদি কবিতার মধ্যে তাহার কিছু আভাস মাত্র আছে।

প্রকৃতির মুখ্যত সুন্দর ভাগের অগণিত রূপ-বৈচিত্র্যকে তিনি যেমন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তেমনি নারীর মধ্যে মুখ্যত প্রেম ও মাধুর্যের অগণিত বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। বিকৃতি যতটুকু ধরা পড়িয়াছে তাহাও মূলত প্রেমকে আশ্রয় করিয়া। 'মহুয়া' কাব্যের আরো কয়েকটি কবিতা নিয়ে আলোচনা করিতেছি।

'মহুয়া'র বাহিরের একটি প্রকাশরূপ আছে। এই প্রকাশরূপের ভিতর দিয়া ইহারই রূপকে কবি সার্থক প্রেমের যে ধর্মটি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার সহিত 'পরিচয়' কবিতার মর্মগত সাদৃশ্য আছে।

মহুয়ার একটি মহিমময় প্রকাশ আছে। 'শাল তাল সপ্তপর্ণ অশ্বত্থের মাঝে এই প্রকাশ মহিমার মিল। চতুষ্পার্শের বৃহতের সঙ্গে তাহার মিল। নিত্য-দিন প্রথম প্রভাতে সূর্য তাহাকে নির্মল কিরণস্পর্শে অভিনন্দন জানায়। মহুয়া

তাহার বিপুল প্রসারিত শাখাবাহু আন্দোলন করিয়া সে অভিনন্দনের প্রত্যুত্তর দেয়।

যেদিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসে, চতুর্দিকে দুর্যোগ দেখা দেয়, সে দুর্যোগে সমস্ত বনস্থলী তখন দারুণ আশংকায় উদ্বেগে কম্পমান, শাখায় শাখায় কালবৈশাখী তখন মত্ত আলোড়ন তুলে, সেদিন মহুয়া অচঞ্চল মহিমায় ভীত-ত্রস্ত বিহঙ্গকুলকে আশ্রয় দেয়। মহুয়ার মধ্যে তখন শরণার্তের রূপটি ফুটিয়া উঠে।

অনাবৃষ্টির দিনে যখন সমস্ত বনস্থলী রিক্ত, শূন্য, জীবকুল শ্যামল ছায়ার জন্য, ক্ষুধার অন্নের জন্য ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন সেই দারুণ দুঃসময়ে মহুয়া জীবকুলকে আশ্রয় ও অন্ন দুই-ই অকৃপণভাবে দান করে।

তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসীর মত তাহার ধ্যান-সৌম সুগম্ভীর রূপ। অথচ এই কঠিন প্রকাশরূপের অন্তরালে প্রাণের কী উচ্ছল মদিরাই না পরিব্যাপ্ত থাকে। ফাল্গুনে তাহারই প্রকাশ ফুলের প্রাচুর্যে আপনাকে আর নিঃশেষ করিয়া দিতে পারে না।

প্রেমের সার্থক প্রকাশটিও এমনি। তাহার একদিকে আছে নিঃসঙ্গ মহিমময় প্রকাশ,—তাহার সহিত বিশ্বের সকল মহত্ত্বের, বিরাটের সঙ্গে তাহার আত্মিক মিল; অন্যদিকে দুর্যোগের দিনে বিচিত্র দুঃখভোগের মাঝখানে আসিয়া আর্তত্রাণের জন্য সে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দিতে দ্বিধা করে না। সার্থক প্রেমের একদিকে আছে পরিপূর্ণ সংযম ও তপস্যা, অন্যদিকে আছে বিচিত্র লীলা-বিলাস, মদির-বিহ্বলতা। প্রেমের এই প্রকাশের রূপক রূপ হইল 'মহুয়া'।

'লগ্ন' কবিতার মধ্যে কবি প্রকৃতির তিনটি রূপকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন; একটি বর্ষার, একটি ফাল্গুনের এবং শেষেরটি শরতের। প্রকৃতির এই তিনটি রূপকে ঘিরিয়া তিনি যে তিনটি ভাবকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন, তাহা কবির কাব্যে বারংবার প্রকাশ পাইয়াছে।

বর্ষায় সুন্দরী বসুন্ধরা প্রাঙ্গণে আচ্ছাদন ঘেরিয়া ছায়ার আসন মেলিয়া প্রসাধনে রত হয়। সবুজ বর্ণের চেলি পরিয়া, চক্ষে অঞ্জন লাগাইয়া কদম্বের কেশর দিয়া বক্ষকে রঞ্জিত করে। বর্ষার বসুন্ধরা যেন দীর্ঘকালের বিরহ-অবসানে আসন্ন মিলনোৎসুকা নারী। বিরহ স্মৃতিভারে আসন্ন মিলন-মুহূর্তে তাহার চক্ষু দুইটি সজল।

প্রেমের এই যে আবেগকম্পিত বক্ষ দুরুদুরু অশ্রুসজল রূপ, বিচিত্র বেশবাসে অপরূপ রহস্যময়ী, ম্লানমধুর রূপ কবির নিকট ইহা আজ আকাঙ্ক্ষিত নয়। প্রেমের এই বিশিষ্ট প্রকাশরূপকে কবি তাঁহার ইতিপূর্বের কাব্যে নানা-ভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মানব-হৃদয়ে সৌন্দর্য ও মাধুর্য-লোককে ঘিরিয়া তাহার যে সীমাহীন বেদনা ও ব্যাকুলতা, তাহারই বিচিত্র বাণী-রূপ।

ফাল্গুনে বনে বনে ফুল ফুটিবার পালা শুরু হয়। বাতাস ফুলের গন্ধে বিভোর। ভূমিতলে ধূলায় নাগকেশরের ফুলের রেণু অবিশ্রাম ঝরিয়া পড়িতেছে। পাখির ডাকের আর বিরাম নাই। বিচিত্র বর্ণের সমারোহের সহিত বিচিত্র ধ্বনির সমারোহ মিলিত হইয়া এক অপরূপ লোক সৃজন করে। অরণ্যের শাখায় শাখায় প্রজাপতির দল বিচিত্র বর্ণের ডানা মেলিয়া উড়িয়া বেড়ায়। ধরিত্রীর সে উদ্দাম উৎসবে আকাশও আসিয়া মিলিত হয়। সমস্ত আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া বর্ণ, গন্ধ, কলরোলের বন্যা বহিয়া যায়। এই আত্মবিস্মৃত মদির বিহ্বল উচ্ছ্বসিত অধীর প্রেমকে কবি ইতিপূর্বে কত-না ভাবে বন্দনা করিয়াছেন। সে প্রলাপের সুরে রূপের বন্যায় কবির বীণার তার ঝংকারে ঝংকারে উতলা হইয়াছে। আজ বার্ধক্যে কবি এই প্রেমকে উপেক্ষা করিয়াছেন।

আশ্বিনে আকাশের দানে ধরিত্রীর অঞ্চল সম্পদে পূর্ণ হইয়া যায়। নদী কূলে কূলে ভরা, গতি মন্থর। সমুদ্রের সহিত আসন্ন মিলনে সে এক গম্ভীর মহিমা লাভ করে। মেঘমুক্ত নিবিড় নীল আকাশ প্লাবিত সূর্যলোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত করিয়া ধরিত্রীর একটি পূজারতা শুচি-স্নিগ্ধ রূপ ফুটিয়া উঠে। তাহার চিত্তের মধ্যে কোন অসম্পূর্ণতার বেদনা, কোন বিক্ষোভের অশান্তি নাই। আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে অনেক দূরে দেখা যায় দুই একটি লঘু শুভ্রমেঘ তীর্থযাত্রী রিক্ত উদাসী সন্ন্যাসীর মত ভাসিয়া চলিয়াছে। এই প্লাবিত সূর্যালোকে, আকাশ ও ধরিত্রীর পরিপূর্ণতার মাঝখানে যেখানে মুক্তি, যেখানে শান্তি, কবি আজ প্রেমকে সেইখানে উপলব্ধি করিবেন।

কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের কথা এই প্রসঙ্গে অনিবার্যরূপে স্মরণে আসে। কাব্যের মধ্যে কবি প্রেমকে তিনটি প্রকাশরূপের মাঝখানে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ঃ একটি বসন্তের মত্তবিহ্বল সৌন্দর্য, একটি বিচিত্র দুঃসহ নিদারুণ তপস্যা, একটি মিলনে চরিতার্থতা। প্রেমকে এই পরিণামে আনিয়া কবি

তাঁহার কাব্যকে সমাপ্ত করিয়াছেন। নববধূর বেশে ভূষিতা উমার যে সৌন্দর্য তাহার তুলনা কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন জ্যোৎস্না-প্লাবিত শরৎ-রাত্রির মধ্যে, শরতের পরিপূর্ণ শ্রীমণ্ডিত ধরিত্রীর মধ্যে।

গৃহাভ্যন্তরে, কল্যাণ কঙ্কণ করে, বাসরকক্ষে নারীর যে একটি দুর্লভ মাধুর্যময়ী প্রকাশ আছে; সেবার মধ্যে, নিয়ত ত্যাগের মধ্যে, মাধুর্যময় লীলা-বিলাসের মধ্যে তাহার যে একটি বিশিষ্ট রূপ সাহিত্যে ও পুরাণে তাহারই বিচিত্র বন্দনা।

ইহা নারীর একমাত্র পরিচয় নয়, সর্বোত্তমও নয়। বহির্বিশ্বে বিচিত্র কষ্টের, দুঃসহ কর্মের মধ্যে, দারুণ বিপ্লবের মধ্যে পুরুষের সকল দুঃসাধ্য সাধনায় সহায়তা করিবার মধ্যে তাহার চরিতার্থতার যে আর একটি বিরাট দিক আছে, সেই সংঘাতে-আন্দোলনে আলোড়নে নারীর অন্তর্লীন সকল সুপ্ত ঐশ্বর্যের যে প্রকাশ ঘটে, তাহার কোন বন্দনা প্রাচীন কাব্যে ও সাহিত্যে নাই বলিলেও চলে। ইতস্তত যেটুকু পরিচয় বিকীর্ণ রহিয়াছে তাহাকে পরবর্তী কালে নানা-ভাবে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

পুরুষ চিত্তে বিরাটের জন্য, মহত্ত্বের জন্য যে ক্ষুধা তাহা নারীর এই বিরাট ঐশ্বর্যের দ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে সীমিত পরিবেশকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নারী যে অতি সূক্ষ্ম মায়াময় অপরূপ সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া তুলে তাহাতে মানবাত্মার সকল ক্ষুধা মিটে না।

নারীকে বৃহৎ ক্ষেত্রে চরিতার্থ হইতে দিবার দায় পুরষের। তাহাতে পুরুষ নারীর ভিতর দিয়া অনির্বচনীয় অতুল সম্পদকে ফিরিয়া লাভ করিবে। তাহা সুন্দর নয়, মহান্। নারী সেই সত্যটিকেই ব্যক্ত করিয়াছে ঃ

"যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্তমাঝে পায় মোর প্রিয়।" (সবলা)

মহুয়ার মধ্যে কতকগুলি কবিতা আছে যেমন, 'দায়মোচন,' 'পথবর্তী', 'মুক্তরূপ', 'দীনা' প্রভৃতি যেগুলির ভিতর দিয়া কবির মূল একটি ভাবনা নানা-ভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

পুরুষের অসীম প্রসারিত জীবনে প্রেম একটি পর্যায়মাত্র। প্রেম জীবনের আদি-অন্ত সব কথা নয়। এই দূরপ্রসারিত জীবনে পুরুষ বিচিত্র স্নেহ-বন্ধনে বাঁধা পড়ে, আবার তাহাকে ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হয়। প্রেম পুরুষের জীবনে কিছু ক্লান্তি, কিছু অবসাদ দূরীভূত করিবার জন্য শ্যাম ছায়া বিস্তৃত করে,

তাহার চক্ষে সৌন্দর্য ও মাধুর্যের অঞ্জন লাগাইয়া দেয়, সেবায়-দাক্ষিণ্যে তাহার দিনগুলিকে ভরাইয়া তুলে। আবার এই প্রেমের মধ্যে আছে আবেগ, যে আবেগে পুরুষ ক্লান্তিশেষে নূতন প্রেরণায় পথ পরিক্রমা শুরু করে। এমনি করিয়া প্রেমে বন্ধন-লাভ ও বন্ধন-মুক্তির ভিতর দিয়া নব নব সার্থকতার ক্ষেত্রে পুরুষের চিরযাত্রা।

নারীর জীবনে থাকে স্মৃতির সম্বল। তাহার চিরজীবনের সান্ত্বনা। নারী পুরুষের স্বধর্মটিকে চিনে, তাই বন্ধন সৃষ্টি করিয়া সে পুরুষের পরিপূর্ণ প্রকাশ রূপটিকে আচ্ছন্ন করিতে চায় নাই। ইহাকেই বলিয়াছি প্রেমের আত্মসচেতনতা। এই প্রেম পুরুষ ও নারী উভয়কে জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন করিয়াছে। কেবল তাই নয়, আত্মত্যাগের গৌরবে এখানে নারী বিশেষ একটি গৌরব লাভ করিয়াছে।

প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটি বিপরীত প্রকৃতির অস্তিত্ব রহিয়াছে। পুরুষের মধ্যে নারী-স্বভাবের কতকটা অংশ যেমন থাকে, প্রত্যেক নারীর মধ্যে তেমনি পুরুষ-স্বভাবের কতকটা অংশ থাকে। পুরুষের মধ্যে নারীর এই স্বভাব অংশটিকে মনস্তাত্ত্বিকরা বলেন এ্যানিমা।

স্বপ্নে এই নারী-সত্তাটির প্রকাশ ঘটে, মানুষের জীবনে অজ্ঞাত উপায়ে নানা প্রেরণা সঞ্চার করে। পুরুষের সৃজনধর্মী বিচিত্র কর্মের মধ্যে এই নারী-সত্তাটিরই প্রকাশ। এই নারী-সত্তার প্রেরণা সম্পূর্ণ অবচেতন মনকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া নারী-সত্তার রূপটি প্রায়শই অতিপ্রাকৃত-বোধ বিজড়িত হইয়া প্রকাশ পায়।

পুরুষ যতদিন এই সত্তাটি সম্পর্কে সচেতন না থাকে ততদিন সে মাঝে মাঝে বাস্তব নারীর উপর এই সত্তাটিকে অভিক্ষিপ্ত করে।

নারী-অংশভাগ (এ্যানিমা) অবচেতন লোকের একটি বিচ্ছিন্ন চিরন্তন সত্তা (archetypes)। পৌরাণিক দেব-দেবীর উদ্ভবের মূলে আছে এই নারী ও পুরুষ অংশ ভাগ। দেব-দেবীর অস্তিত্ব আমাদের ব্যক্তিত্বের মর্মমূলের সহিত বিজড়িত। তাহা পুরুষ ও নারীর জীবনে একরূপে না হইয়া ভিন্ন রূপে প্রকাশ পায় মাত্র।

সমষ্টিগত অবচেতন-লোকে এই সকল সত্তার চিরন্তন-অস্তিত্ব। এই সমষ্টিগত অবচেতন-লোক এক অচিন্তনীয় বিপুল জগৎ। আমাদের চেতনার

দেশ-কাল হইতে ইহার দেশ-কাল সম্পূর্ণ পৃথক। ইহাকেই আমরা বিশ্বচেতনা নামে অভিহিত করি।

প্রাকৃতিক বিচিত্র সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া যে বিচিত্র রূপ-কল্পনা সেগুলি মনের গভীরতর অবচেতন-লোকের অভিক্ষেপ-প্রসূত প্রতীকময় প্রকাশ।

বিশ্বের সকল ধর্মবোধের ক্ষেত্রে কতকগুলি চিরন্তন রূপ-কল্পনা আছে। এগুলির প্রকাশ ঘটিয়াছে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের আদি বিষয়রূপে। সকল ধর্মের মধ্যে দিব্য-সত্তার উপলব্ধির যে বিচিত্র রূপ সেগুলি ইহারই প্রকাশ।

সমষ্টিগত অবচেতন-লোক ব্যষ্টির সীমার বহির্ভূত বলিয়া নারী-অংশ (anima) মানুষের ব্যক্তিগত নারী-সত্তা মাত্র নয়। ইহার একটি চিরন্তনতার দিক আছে। ইহাকে চিরন্তন নারী-সত্তা (The eternal feminine) বলা যাইতে পারে। নারীর এই যে উপলব্ধি তাহা ব্যক্তির নারী-অংশ ভাগের উপলব্ধি হইতে অনেক গভীর। এই নারীরই প্রকাশ ঘটিয়াছে বিচিত্র পুরাণ-কাহিনী এবং উপকথার মধ্যে। নারী-অংশভাগের (anima) চিরন্তন প্রকাশ রূপের ভিতর দিয়া আমরা দেব-দেবী বা আধ্যাত্মিক জগতে অনুপ্রবেশ করি।

প্রেমের অলৌকিক বিচিত্র অনুভূতির কথা, তাহার বিচিত্র আধ্যাত্মিক ফললাভের কথা, জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত জীবন বিকাশে তাহার নিগূঢ় প্রেরণার কথা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে নানাভাবে প্রকাশ লাভ করিলেও কোন বিশ্বাস-বোধকে আশ্রয় করিয়া তাহা যেমন অনুভূত হয় নাই, তেমনি পরিণামে তাহা কোন বিশ্বাস-বোধকে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। কোন বিয়াত্রিচে তাঁহার প্রেমের অনুভূতি এবং শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক অনুভূতিকে একাকার করিয়া দিতে পারে নাই। 'মানসী' কাব্যের মধ্যে তিনি প্রথম প্রেমের যে 'অসম্পূর্ণ প্রতিমা' গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, যাহা 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যের ভিতর দিয়া ধীরে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছিল, তাহা সুসম্পূর্ণতা লাভের পূর্বেই নানাকারণে পরিত্যক্ত হয় বলিয়া তাহার আধ্যাত্মিক পূর্ণ বিকাশের দিকটি ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহা পূর্বেই বারংবার উল্লেখ করিয়াছি যে, তাঁহার সৌন্দর্য-লক্ষ্মী জীবন ও জগতের কেবল সৌন্দর্য ও মাধুর্যের দিকটিকে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে বলিয়া শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই। জীবনের সুন্দর ও অসুন্দর, পাপ ও পুণ্যকে আশ্রয় করিয়াই প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রতীক-রূপ জন্ম লাভ করে। তাঁহার প্রেম ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি তাই পরিশেষে স্পষ্ট দ্বিধা হইয়া গিয়াছে।

ব্রাউনিং-এর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে মর্ত্য ও অমর্ত্য প্রেমের সার্থক সমন্বয়ের যে প্রকাশ-রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে তেমন প্রকাশ ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের মধ্যে আর কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। এক্ষেত্রে তাই ব্রাউনিং-এর প্রেমের উপলব্ধির সহিত বিজড়িত করিয়া তাহার সামগ্রিক জীবনবোধের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

ব্রাউনিং-এর সকল কবিতার মূল ভাব হইল মানুষের সহিত ঈশ্বরের রহস্যময় যোগ, ঈশ্বর অভিমুখী দুর্জ্ঞেয় যাত্রার পথে মানবাত্মার বিচিত্র অভিজ্ঞতা। প্রত্যেকটি নর-নারীর পশ্চাতে যে একটি ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় আছে তাহাকে তিনি নানাভাবে অপরোক্ষ করেন।

তিনি যে কেবল জীবনের সুন্দর ভাগটিকে প্রত্যক্ষ করেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে অন্যায় ও পাপকেও প্রত্যক্ষ করেন। সেক্ষপীয়রের মত তিনিও জীবনকে তাহার সামগ্রিক রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সৃষ্টি-কর্মের একদিকে যেমন আছে আধ্যাত্মিকতা ও সৌন্দর্য, তেমনি অন্যদিকে আছে বিচিত্র জৈবিক কদর্যতা।

তিনি আপনার সৃষ্টি-কর্মের মধ্যে কোথাও জীবন বিমুক্ত আধ্যাত্মিকতার কথা ব্যক্ত করেন নাই। তাঁহার মতে আত্মার অতীন্দ্রিয় অনুভূতি এবং বিশুদ্ধ চৈতন্যই জীবন নয়। জীবন তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর ও ব্যাপক। আত্মা দেহকে যেমন প্রকাশ করে, দেহও তেমনি আত্মাকে প্রকাশ করে।

শেলি জগৎকে অপরাধের নিষ্ক্রমণ রূপে বোধ করেন, তাঁহার আপনার জীবন এই উপলব্ধির সাক্ষ্য স্বরূপ হইয়া আছে। তবুও জীবনের সুসম্পূর্ণতায় তিনি বিশ্বাস হারান নাই এবং এই বিশ্বাসের দিকে স্থির লক্ষ্য রাখিয়া তিনি নিয়ত সংগ্রাম করিয়াছেন। ব্রাউনিং-এর উদ্দেশ্য জীবনকে তাহার এই স্বরূপে সমর্থন করা নয়, তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করা; মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের যোগের যে বিচিত্র পথ।

শেলি তাঁহার 'Laon and Cythna' কাব্যের মধ্যে বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বীকৃতির উপরেই অপরাধের অস্তিত্ব। তাই প্রত্যেকটি কবিতার ভিতর দিয়া তিনি প্রেমের সেই শক্তির কথাই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, যাহা মানব-চিত্তকে বিশুদ্ধ করে, স্বর্গরাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

ব্রাউনিং-এর কবিতায় সর্বত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি মানবাত্মার গভীরতর তলদেশ হইতে সত্যকে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিবার গভীর বাসনা।

জীবনের তুচ্ছতম ঘটনা, তুচ্ছতম বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি ব্লেকের মত ঈশ্বরীয় সৃষ্টির মহান্ বিস্ময় ও শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিতেন।

ব্রাউনিং বিশ্বাস করিতেন যুক্তি-বিচারের সহায়তায় সত্যকে অপরোক্ষ করা যায় না, একমাত্র প্রেম সত্যকে অপরোক্ষ করিতে পারে। ব্রাউনিং-এর কবিতায় তাই প্রেমের এমন গভীর উপলব্ধি নানাভাবে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

মানবাত্মার অন্তহীন সম্ভাবনায় তিনি বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিকাশে সহায়তা করে প্রেম। যাহা এই বিকাশের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ তিনি তাহার সহিত নিরন্তর সংগ্রামের কথা বলিয়াছেন।

তিনি ব্লেকের মত বিশ্বাস করিতেন যে, আকাশ চন্দ্রাতপের নিম্নে ধরিত্রীর শ্যামল বেদীকে মানুষ যেদিন ঈশ্বরের মন্দির বলিয়া অনুভব করিবে, যেদিন মর্ত্যের সকল প্রকাশ-রূপকে পবিত্র বলিয়া অনুভব করিবে সেদিন মর্ত্যে স্বর্গ-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে।

প্রি-র‍্যাফেলাইট যুগের কবিরা যে ব্লেক, কোলরিজ এবং কীটস্ প্রভৃতি রোমান্টিক কবিদের দ্বারা প্রভাবিত হন তাহাতে কোন সংশয় নাই। কিন্তু তাঁহারা সেই কবি-প্রতিভার রহস্যময় জাদুকে আশ্রয় করিয়াছেন, জগৎকে রূপান্তরিত করিবার জন্য নয় তাহাকে একান্তে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য। রোমান্সের কতকগুলি প্রচলিত উপাদানকে আশ্রয় করিবার ফলে রোমান্টিক কবিদের অত্যুচ্চ স্বপ্নলোক তাঁহাদের হাতে প্রায়ই অসুস্থ বিষাদময়তায় পরিণত হইয়াছে।

ইহারা না ছিলেন ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, রোমান্টিক অথবা মানবতার ধর্মাশ্রয়ী। তাঁহাদের মতে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যের উপাসক হইবার জন্য এই সমস্ত কিছু সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন ইহারা ভিক্টোরীয় যুগের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সুন্দর রূপ (form), ধ্বনি-ঝংকার এবং রূপ-বিন্যাস সৃষ্টির কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। যে ধর্মসত্যাশ্রয়ী অধ্যাত্মিক উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা কবিতাকে সেই ধর্ম রূপে বোধ করিতেন। তাঁহারা কবিতাকে কোথাও প্রাচীন আধ্যাত্মিক বাণীর আনন্দময় প্রকাশ রূপে, কোথাও খ্রীস্টধর্মের বাণীর রূপক রূপে, কোথাও প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির বাহক রূপে, কোথাও অতি-মানবিক উন্নততর বোধের পরিবর্তে মানবতাবাদের রক্ষক রূপে, কোথাও নির্বিশেষ চৈতনার প্রকাশ রূপে বোধ করিতেন। এগুলির কোন একটিকে তাঁহারা

একান্ত করিয়া আশ্রয় করিতে পারেন নাই, অথচ রোমান্টিক কবিদের স্বপ্ন-লোকটিকে তাঁহারা চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত।

তাঁহাদের চেতনায় দুইটি দ্বন্দ্ব দেখা যায়—একদিকে রোমান্টিক কবিদের অনুভূতির জগৎ লাভের আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে সেই সঙ্গে শিক্ষামূলক হইয়া পড়িবার ভয়। তাহার ফলে তাঁহাদের সুন্দর সামগ্রীর প্রতি আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা সত্য হইয়া উঠিতে পারে নাই।

তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন, 'a thing of beauty is a joy for ever'। কিন্তু ইহা তখনই সত্য যখন এই বিশ্বাস থাকে যে, 'Beauty is Truth, Truth Beauty'; কিন্তু এই উপলব্ধিকে একান্তরূপে প্লেটোনিক বলিয়া তাঁহারা পরিহার করেন, অথচ ইন্দ্রিয়াশ্রয়ী আনন্দের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীও তাঁহাদের ছিল না। সৌন্দর্য উপাসনার দার্শনিক বা ধর্মীয় কোন বোধ-ভিত্তি না থাকিবার ফলে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন অনুভূতির চরম মুহূর্তগুলিকে আশ্রয় করেন। ইহা অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী বলিয়া এবং জগতে সৌন্দর্যের সম্যক্ প্রকাশ সম্ভব নয় বলিয়া তাঁহাদের কাব্যে সর্বত্র একটি পরিব্যাপ্ত বিষাদের ভাব বিজড়িত।

তাঁহাদের কাব্যে রূপসী নারীর সৌন্দর্য আমাদের আচ্ছন্ন চেতনাকে যতখানি জাগ্রত করিতে পারে, বিশ্বের আর কোন সুন্দর সামগ্রী ততখানি পারে না। নারী-সৌন্দর্যের এই ধর্ম তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের ধর্মে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

তাঁহারা প্রেমকে পূজা, ঈশ্বর, পূজারী, ধর্ম ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করিলেও কোন বিশ্বাস-বোধকে আশ্রয় না করিবার ফলে তাঁহাদের কাব্যে প্রেম আধ্যাত্মিক পরিণতি লাভ করে নাই।

তাঁহারা ঈশ্বর, মানব, প্রকৃতি, সৌন্দর্য, প্রেম প্রভৃতির কোন একটিকে স্থির গভীরভাবে আশ্রয় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কাব্য-রূপের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন অন্তর্জগতের শূন্যতার জন্য।

বনবাণী

বিশ্ব-প্রাণ প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্য রূপে এবং মানুষের মধ্যে প্রেম রূপে অভিব্যক্ত। কখনও বহিঃসৌন্দর্যের ধ্যানে, কখনও মানব-প্রেমের ধ্যানে কবি সকল সীমার অতীত বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম বোধ করিয়াছেন।

বনবাণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, কবি বিশ্ব-প্রাণের সংযোগ লাভের জন্য একমাত্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছেন। মানব-প্রেমকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া কেবলমাত্র প্রকৃতিকে আশ্রয় করিবার মধ্যে কি কোন গূঢ় কারণ আছে?

তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে কবি এই কাব্যের ভূমিকায় বনবাণী সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে কবির কাব্য ধারার এই পরিণামটিকে বুঝিয়া লইতে সুবিধা হইবে।

"মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙ্গে রঙ্গে তরঙ্গিত, আর গভীর তলে শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রানি দেখি ফুলে ফুলে পল্লবে, তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধের বাণী শুনি।"

"গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন-সঙ্গীতে বদ্‌সুর লাগে না।"

"সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নব নবোন্মেষ-শালিনীর সৃষ্টির চির-প্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীর ভাবে বিশুদ্ধ ভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।"

"সেই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে স্নিগ্ধ হয়ে তবে আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই।"

নর-নারীর মিলনবোধ প্রাণেরই বোধ। প্রেমে যে প্রাণের উদ্বোধন তাহাতে উহা দুইটি বিপরীত শক্তিরূপে ক্রিয়া করে, একটির প্রেরণায় উভয়ে

সমগ্র বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর একটি গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রেমের ইহা আসক্তির দিক। এই দিকটি প্রবল হইয়া নর-নারীর জীবনে ঘোর বিনষ্টি ঘটায়।

প্রেমের আর একটি দিক আছে, যেদিকে সে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া অসীম ব্যাপ্তি লাভ করিতে চায়। বিশ্ব-প্রাণের যোগে নর-নারীর প্রেম যতই ব্যাপ্তি লাভ করিতে থাকে ততই তাহা আসক্তি-মুক্ত হইয়া পরিশুদ্ধ আনন্দের সামগ্রী হইয়া উঠে।

নর-নারী যখন আপনার প্রেমকে সমগ্র বহির্বিশ্বের সহিত যুক্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে তখন ওই প্রেম বন্ধন স্বরূপ না হইয়া মুক্তির আস্বাদ ঘটায়।

প্রেমকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত মিলিত করিবার সার্থকতম উপায় প্রকৃতির নিবিড় আসঙ্গ লাভ। এই কথাই রবীন্দ্রনাথ এই উক্তির মধ্যে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"গাছের মধ্যে প্রাণের বিশুদ্ধ সুর, সেই সুরটি যদি প্রাণ পেতে নিতে পারি তাহলে আমাদের মিলন-সঙ্গীতে বদ্‌সুর লাগে না।"

এই তো গেল দুইটি পর্যায়, একদিকে প্রেমে প্রাণের উদ্বোধন, অন্যদিকে প্রকৃতির সহিত মিলনে বিশ্ব-প্রাণের মহামুক্তির আস্বাদ।

'বনবাণী'র মধ্যে মনুষ্য-চেতনার পরম পরিণাম বা মুক্তি-তত্ত্ব স্বরূপে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-প্রাণ-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন। 'বনবাণী'র কাব্য-প্রেরণা ইহার ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ইহারও ঊর্ধ্বতর পরিণাম যে আছে সে সম্পর্কে এই কালেও কবি সচেতন। ভূমিকায় কবি তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন।

"এই স্নানের দ্বারা ধৌত হয়ে (অর্থাৎ বিশ্ব-চেতনা লাভের পর) স্নিগ্ধ হয়ে আনন্দলোকে প্রবেশের অধিকার আমরা পাই।"

ভূমিকায় কবি এইরূপে ব্যক্তি-চেতনা, বিশ্ব-চেতনা এবং দিব্য-চেতনার ক্রমিক তিনটি পর্যায় নির্দেশ করিয়াছেন।

প্রেমে ব্যক্তি-চেতনায় প্রাণের জাগরণ, বিশ্ব-চেতনায় তাহার মহা ব্যাপ্তি এবং দিব্য-চেতনায় তাহারই পরম পরিণাম।

কিন্তু যে কথা উল্লেখ করিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এই যে, বিশ্ব-চেতনা লাভের জন্য কবি মানব-প্রেমকে অস্বীকার করিয়া একমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য-

ধ্যানকেই আশ্রয় করিলেন কেন; কেবল তাহাই নহে প্রেমে প্রাণের যে উদ্বোধন তাহাকে কবি আজ একপ্রকার অস্বীকার করিয়াছেন।

প্রেমে প্রাণের যে জাগরণ তাহার মধ্যে আসক্তির একটা দিক আছে সত্য, কিন্তু ওই আসক্তির দিকটিকেই অমন একান্ত করিয়া তুলিবার কারণ যৌবনের যে দুর্বার শক্তি ওই আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিতে পারে, কবির জীবনে সে যৌবন অবসিত।

প্রকৃতির সৌন্দর্য-ধ্যানেও বিশ্ব সত্তার সংযোগ লাভ ঘটে, একথাও সত্য যে, ইহার জন্য মানুষকে আসক্তি বা প্রবৃত্তির সহিত দুরন্ত সংগ্রাম করিতে হয় না, কিন্তু প্রেমে আসক্তির সহিত সংগ্রামের ভিতর দিয়া নর-নারীর চেতনা যখন বিশ্ব-চেতনা লাভ করে, তখন উভয়ের দেহ-প্রাণ মন-আত্মার যে বিরাট মহিমা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহার পরিচয়ও অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না।

কেবলমাত্র প্রকৃতির সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-প্রাণ যেখানে বিশ্ব-প্রাণের সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে সেখানে জীবনের এই জাতীয় ঐশ্বর্যের কোন পরিচয় থাকে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ কবির 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেখানে যে-প্রাণ-লীলা প্রত্যক্ষ করা যায় তাহাতে মর্ত্য-প্রেম-পিপাসা এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য-পিপাসা একাকার হইয়া গিয়াছে। প্রাণের আবেগ কখন প্রকৃতির সৌন্দর্য কখন বা মর্ত্য-প্রেম আশ্রয় করিয়া বারংবার রূপ লাভ করিয়া আবার নির্বিশেষ প্রাণ-লীলায় পরিণত হইয়াছে। বিশ্ব-প্রাণের সে এক অত্যাশ্চর্য লীলা। সেইরূপ কোন ঐশ্বর্যের পরিচয় যে 'বনবাণী'র মধ্যে নাই তাহা নিশ্চয়ই আর বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে না।

দিব্য-চেতনাই দেশ-কালের পরিসীমায় অনন্ত রূপ-বৈচিত্র্য লাভ করিয়াছে। সীমাহীন শক্তি সমুদ্রের বক্ষে রূপের সংখ্যাতীত ঢেউ জাগিয়া উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। সেই অন্তহীন প্রাণ-লীলার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন:

"সে জীবন
মরণ তোরণ দ্বার বারম্বার করি উত্তরণ
যাত্রা করে যুগে যুগে অনন্ত কালের তীর্থ পথে
নব নব পান্থশালে বিচিত্র নূতন দেহ রথে।" (বৃক্ষ-বন্দনা)

মৃত্যু তো জীবনের নিঃশেষ বিনষ্টি নয়, মৃত্যু জীবনের অন্তহীন পথ চলার এক একটি তোরণদ্বার। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ লোক হইতে লোকান্তরে নব নব দেহরূপ লাভ করিয়া চলে। এক প্রাণ-সূত্রে সকল লোক বিধৃত। নব নব রূপে লোক হইতে লোকান্তরে তাই প্রাণের এক অবিচ্ছিন্ন লীলা চলিয়াছে, তাহার আদি নাই, অন্ত নাই।

দেশ-কালের পরিসীমার মধ্যে সৃষ্টির যে স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার কিছু পরিচয় মিলিবে:

"দেবকন্যা দুঃসাহসী
কবে যাত্রা করেছিল জ্যোতিঃ স্বর্গ ছাড়ি দীনবেশে
পাংশু ম্লান গৈরিক বসন-পরা, খণ্ডকালে দেশে
অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে
দুঃখের সজ্ঘাতে তারে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।"

মানুষ দিব্য-চেতনা লাভের অতি তীব্র প্রেরণায় বারংবার মর্ত্যের সীমা অতিক্রম করিয়া অনন্তের চকিত স্পর্শ লাভ করিবে ইহাই ছিল সৃষ্টির একমাত্র স্বরূপ।

সীমা অসীমেরই প্রকাশ, মর্ত্য অমর্ত্যেরই এক পরিণাম। অসীম কেমন করিয়া সীমারূপ লাভ করিলেন, অমর্ত্য কেমন করিয়া মর্ত্য পরিণাম লাভ করিলেন, তাহা দার্শনিক ব্যাখ্যার অতীত সামগ্রী। এখানে সকল দর্শন মূক।

রবীন্দ্রনাথ এই খণ্ড দেশ-কালে পরিপূর্ণ রূপ-লোকটিকে অরূপ বা অসীমেরই এক পরিণাম বলিয়া বোধ করিতেন। মর্ত্য যে স্বরূপেই হোক অমর্ত্য-জাত, সে তাই 'দেব-কন্যা'।

খণ্ড দেশ-কালে এই বিসৃষ্টির অর্থ কি? কেন অসীম আপনাকে এই রূপের জগতে সীমিত করিলেন? "অমরার আনন্দেরে খণ্ড খণ্ড ভোগ করিবারে"। সীমার জগতে মর্ত্য-চেতনায় সেই অপার্থিব আনন্দের আস্বাদ পাই কেমন করিয়া? যখন মানুষের সমগ্র সত্তা দারুণতম দুঃখের সজ্ঘাতে উন্মুখ হইয়া উঠে, সকল ইন্দ্রিয় অন্তর্মুখীন হইয়া যায় তখন মানুষ অন্তরের পথে ঊর্ধ্বমুখী হইয়া অভিসার করে:

"দুঃখের সজ্ঘাতে বিদীর্ণ করিয়া বারে বারে
নিবিড় করিয়া পেতে।"

এই যে রস-প্রেরণা অর্থাৎ মর্ত্য-চেতনায় দিব্য-চেতনার জন্য এই যে নিত্য উৎকণ্ঠা এবং উহারই তীব্র, ব্যাকুল মুহূর্তে সীমা বা রূপের আবরণ বিদীর্ণ করিয়া দিব্য চেতনার চকিত সাক্ষাৎকার, ইহা রবীন্দ্রকাব্যে একটি বিশিষ্ট দর্শন স্বরূপতা লাভ করিয়াছে। শুধু বিশিষ্ট দর্শন নয়, মর্ত্য ও অমর্ত্য চেতনার এইভাবে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া রবীন্দ্রনাথ আপনার একমাত্র দর্শন গড়িয়া তুলেন। মর্ত্য-চেতনাশ্রয়ী প্রাণ যেখানে হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া তাহারই রক্ত নিষেকে মনের কল্পলতায় দিব্য-আলোর কুসুম ফুটাইয়া তুলিয়াছে, সেই সাক্ষাৎকারের প্রেরণা রবীন্দ্রকাব্যের মুখ্য প্রেরণা।

প্রকৃতির নিবিড় আসঙ্গ এবং সৌন্দর্য অনুধ্যানের ভিতর দিয়া কবির প্রাণ কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাকার হইয়া যাইত, 'বনবাণী'র কয়েকটি কবিতা বিশ্লেষণ করিয়া তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে।

যে প্রাণের যোগে বৃক্ষের পত্রসম্ভার, তাহার বিচিত্র প্রকাশ, সেই প্রাণ-স্পর্শে মানুষের অন্তরে নিত্য নূতন ভাবের কুসুম ফুটে। নির্বিশেষ প্রাণ উভয়ের মধ্যে দুইটি বিশিষ্ট ধারায় প্রকাশ পায়, একটি সৌন্দর্য রূপে, অপরটি ভাব রূপে। বৃক্ষ যেমন প্রাণের যোগে আপনাকে নিত্য নবীন রাখে, জীর্ণতাকে প্রতি মুহূর্তে ঝরাইয়া দেয়, মানুষ তেমনি বিশ্ব-প্রাণের যোগে আপনার প্রাণকে চির নবীন করিয়া রাখে।

জড়ের মধ্যে সুপ্ত দিব্য-চেতনার সেই একই এষণা রহিয়াছে পরম পরিণাম লাভের। সেই এষণার বশেই ধরিত্রীতে প্রাণের প্রকাশ। প্রাণ তো শেষ পরিণাম নহে, তাই ওই পর্যায়ে উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য অহর্নিশ একটা আবেগ অনুভূত হয়। পূর্ণ পরিণাম লাভের জন্য ধরিত্রীর বিরহ প্রকৃতির মধ্যে অমনি মুখর হইয়া উঠে।

প্রাণের স্তরে যে আকাঙ্ক্ষা ও ব্যাকুলতা এবং মানস-চেতনায় যে উৎকণ্ঠা, উভয়ের ধর্ম বা স্বরূপ একই, পার্থক্য কেবল পরিণামগত :

"তাই বহে নিয়ে যাও, আকাশের অন্তরঙ্গ তুমি
ধরণীর বিরহ বারতা
গভীর গোপনে।" (আম্রবন)

বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে গভীর অতৃপ্তি-বোধ জাগে। এই অতৃপ্তির স্বরূপ কি, না উন্নততর পরিণাম লাভের জন্য আকাঙ্ক্ষা।

প্রাণের এই ধীর জাগরণের ভিতর দিয়া অন্তরে ধীরে ধীরে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে। এই ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া মনুষ্য-চেতনা পরিণামে সীমালোক অতিক্রম করিয়া যায়।

বিশ্ব-প্রকৃতির যোগে অন্তরে ধীর অতৃপ্তি বোধের সঞ্চার এবং উহারই ভিতর দিয়া ধ্যান-লোক সৃষ্টির সেই পরিচয় রবীন্দ্রনাথ এইভাবে দান করিয়াছেন :

"আমার নিভৃত চিত্তে সে ভাষা সহজে চলে আসে
মিশে যায় সঙ্গোপনে অন্তরের আভাসে আশ্বাসে
স্বপনে বেদনে
ধ্যানে মোর করে সঞ্চরণ।" (আম্রবন)

তাহার পর কবির চেতনা ওই ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-চেতনায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে।

"আমার জীবন আজি প্রসারিত তব গন্ধ সনে
জনম মরণ পরপার।" (আম্রবন)

বিশ্ব-প্রাণের যোগে রূপের যে লীলা কবি ইহারই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চান। তাহা হইলে আপনার জীবনে উহাকে সত্য করিয়া তুলিতে পারিবেন। বিশ্ব-প্রাণের যোগে 'আমি'-রূপে বিশিষ্ট প্রাণের যে লীলা কবি তাহাকেই প্রত্যক্ষ করিতে চান :

"ভুবনে ভুবনে যে প্রাণ সীমানা হারা
গগনে গগনে সিঞ্চিল গ্রহতারা
লজ্জায় লহে ভরি।" (মধু মঞ্জরী)

কিংবা

"যে ইন্দ্রজাল দ্যুলোকে ভূলোকে ছাওয়া
বুকের ভিতর লাগে ওর তারি হাওয়া
বুঝিতে যে চাই কেমনে সে ওর পাওয়া
চেয়ে থাকি অনিমেষে।" (মধু মঞ্জরী)

অন্তরে প্রাণের যখন কোন প্রকাশ নাই, তখন নিখিল বিশ্ব-লোক পূর্ণ করিয়া যে অপার সৌন্দর্য-লীলা, তাহার কোন পরিচয় আমরা পাই না। প্রকৃতির বিশিষ্ট কোন রূপ আশ্রয় করিয়া যখন অন্তরে প্রাণের জাগরণ ঘটে এবং এই রূপে বিশ্ব-প্রাণের সহিত ব্যক্তি-প্রাণ যুক্ত হইয়া যায়, তখন সমগ্র

সৃষ্টি-লোক ঘিরিয়া রূপ-রস-গন্ধের যে অসীমতার আভাস লাভ করা যায় তাহাতে মানবীয় চেতনা অপার বিস্ময় পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

বিশ্ব-চেতনার সহিত ব্যক্তি-চেতনার যোগে যে বিস্ময়, সেই অপার বিস্ময়-তত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ পরম তত্ত্ব স্বরূপে আশ্রয় করিয়াছেন। এই বিস্ময়বোধে রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে :

"কেন একে জানে এত বর্ণ গন্ধের উল্লাস,
প্রাণের মহিমাছবি রূপের গৌরবে পরকাশ।" (নীলমনি লতা)

অন্তহীন প্রাণ-সমুদ্রে কত সংখ্যাতীত রূপ জাগিয়া উঠিয়া অপরূপ সৌন্দর্য-মাধুর্যের বিকাশ ঘটাইয়া ক্ষণকাল পরে হারাইয়া যাইতেছে। উভয়কে মিলিত করিয়া এই যে দেখা তাহাতে কবি-প্রাণ বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। এই বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় সকল তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা একপ্রকার রস-পরিণাম লাভ করে।

যে কথা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই কালে কবিকে কি আসক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হয় নাই? বিশ্ব-চেতনার সহিত পূর্ণ যোগের তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াও ব্যক্তিরূপের বিনষ্টিজনিত যে হাহাকার তাহাকে কবি কি জয় করিয়া উঠিতে পারিয়াছেন? 'বনবাণী'র কয়েকটি কবিতা হইতে তাহারই উত্তর লাভের চেষ্টা করিব।

অনন্ত প্রাণ-স্পন্দের একটি ক্ষুদ্র বিচি-বিক্ষেপ এই 'আমি'-রূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। বিশ্ব-প্রাণের এই যে বিশিষ্ট একটি প্রকাশের লীলা যাহাকে বলি 'আমি', এই 'আমি'র বিনষ্টিতে প্রাণের এই বিশিষ্ট প্রকাশটিকে তো আর কোনপ্রকারেই ফিরিয়া লাভ করা যাইবে না।

ইতিপূর্বে নানা তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া কবি মৃত্যু-শোক জয় করিয়া উঠিবার যে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা প্রসঙ্গক্রমে তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি। ব্যক্তির এই বিশিষ্ট রূপের জন্য হাহাকার এক্ষেত্রেও লুপ্ত হইয়া যায় নাই।

আমরা কেবল জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী এই বিশিষ্ট প্রকাশটিকে দেখি, জন্মের পূর্বে এবং মৃত্যুর পর তাহার আদি-অন্তহীন যে প্রসার তাহার কোন পরিচয় আমরা জানি না। কেমন করিয়া এই জগতে এই রূপের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে! এই জীবনের এই লীলা সমাপ্ত করিয়া মৃত্যুতে উহা আবার কোথায় হারাইয়া যায়, তাহাও মানুষ জানে না।

ক্ষোভ তো এইজন্য নয়, তাহার সহিত এমন হৃদয়কে কে যুক্ত করিয়া দিয়াছে! সে যে ভালোবাসে, ভালোবাসে এই মর্ত্যের প্রতি ধূলিকণাকে, ভালোবাসে তাহার সংখ্যাতীত নর-নারীকে, এই ভালোবাসা যে সকল সীমিত বোধকেও ছাড়াইয়া যায়। মৃত্যুতে এই ভালোবাসার সম্পদকে চিরকালের জন্য হারাইতে হয়। ক্ষোভ তো এইজন্য ঃ

"সেথা আমি গেঁথে আছি দুদিনের কুটির মৃত্তির,
তোমার উৎসবে আমি আজি গাব এক রজনীর
পথ চলা গান,
কালি তার হবে সমাপন।" (আম্রবন)

প্রাণের লীলায় সৃষ্টির আনন্দ তো শুধু নাই, বিনষ্টির বেদনাও আছে। সৃষ্টি-বীণায় একযোগে আনন্দ-বেদনার দুইটি সুর নিত্যকাল ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্ব-প্রাণ-ধারা অন্তরে এমনি দ্বিধা হইয়া উর্ধ্বতর চেতনায় যে এক নির্বিশেষ পরিণাম লাভ করে তাহা আনন্দ নহে, বেদনাও নহে। সকল তত্ত্বের আবরণ উদ্‌ভিন্ন করিয়া ব্যক্তি-রূপের জন্য কবি-চিত্ত আর্তনাদ তুলিয়াছে ঃ

"তারপরে যবে চলে যাব অবশেষে
সকল ঋতুর অতীত নীরব দেশে,
তখনো জাগাবে বসন্ত ফিরে এসে
ফুল ফোটাবার ব্যথা।" (মধু মঞ্জরী)

মৃত্যুতে 'আমি' কোথায় হারাইয়া যাইব কে জানে! তখনও এই পৃথিবীতে এই সমস্ত কিছুর লীলা চলিতে থাকিবে। 'আমার' জন্য তাহার মধ্যে কোথাও কোন অভাব জাগিয়া থাকিবে না। তখনও বসন্ত অফুরন্ত পুষ্পভার রাশি রাশি করিয়া ঢালিয়া উজাড় করিয়া দিবে আর কবির একান্ত প্রিয় এই যে 'মধুমঞ্জরী' লতা তাহাতেও ফুল ফুটিবে, কিন্তু সেদিন কবি সৌন্দর্য ও প্রীতির সেই অর্ঘ্যভার অন্তরের মধ্যে বরণ করিয়া লইতে পারিবেন না। বৎসরের পর বৎসর কবির শূন্য আঙ্গিনায় এমনি কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যাইবে। সে প্রতীক্ষা আর কোন কালে পূর্ণ হইবে না।

তাহার পর প্রাণের অনন্ত লীলায় 'আমি'-রূপে বাঁচিয়া থাকিবার যে চেষ্টা পরিশেষে লক্ষ্য করা যায়, তাহা যে কীরূপ করুণ এবং ওই কালে কবি-চিত্ত যে কতদূর অসহায় বোধ করিয়া ছিল তাহা নিম্নের কয়েকটি পংক্তি পাঠ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায় ঃ

"অনেক কাহিনী যাবে যে সেদিন ভুলে,
স্মরণ-চিহ্ন কত যাবে উন্মূলে
মোর দেওয়া নাম লেখা থাক ওর ফুলে
মধুমঞ্জরী লতা।" (মধুমঞ্জরী)

বিশ্ব-প্রাণ-লীলার এই স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি ঃ

"নিত্যের মালার সূত্রে অনিত্যের যত অক্ষ গুটি
অস্তিত্বের আবর্তনে দ্রুতবেগে চলে তারা ছুটি,
মর্ত্য প্রাণ তাহাদের ক্ষণেক পরশ করে যেই
পায় তারা জপ নাম, তারপরে আর তারা নেই,
নেমে যায় অসংখ্যের তলে।" (শাল)

শাশ্বত চেতনার বুকে দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত রূপের এই নিত্য উঠা-নামা। তাহার মধ্যে এই মর্ত্য-লোক কতটুকু, কত ক্ষণিক। এই মর্ত্যে মুহূর্তে কত সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া ঝরিয়া যাইতেছে। মর্ত্য-লোকের এক নিভৃত প্রদেশে এই 'শালবৃক্ষ'। মর্ত্যের কাল পরিমাণে ইহার কাল পরিমাণ কতটুকু! তবু মানুষের জীবন অপেক্ষা উহা স্থায়ী। কী অচিন্তনীয় দ্রুত বেগে রূপের এই সৃজন প্রলয় চলিতেছে!

মৃত্যুতে 'রূপ' বিনষ্টির যে বেদনা তাহা কবির অন্তরে ছিল। এই বেদনাকে মহাব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াছে অতীতের বিনষ্টি-বোধ। বস্তুতঃ, প্রকৃতির কোন রূপের মধ্যে বেদনা বিজড়িত নাই। কবির অন্তর্বেদনা এমনি করিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে।

এই বেদনাবোধ সঞ্চারিত করিয়া দেওয়ার মধ্যে প্রাণের আর একটি গূঢ় বেদনা চরিতার্থতা অন্বেষণ করিয়াছে। এই বিশ্ব-সৌন্দর্যের মধ্যে যে বেদনা বিজড়িত রহিয়াছে, তাহার সহিত কবির বেদনাও এক হইয়া থাকিবে। চিরন্তন কাল ধরিয়া ভবিষ্যতের নর-নারীর অন্তরে এই বেদনাবোধের সহিত কবির হৃদয়-ব্যথাও সঞ্চারিত হইয়া যাইবে। এমনি করিয়া কবির প্রাণ-মনকে ঘুম পাড়াইয়া একপ্রকার স্বপ্নে সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছে ঃ

"হায়, আজি তব পত্র দোলে
সেদিনের স্পর্শ নাই। তাই এই বসন্ত কল্লোলে,
পূর্ণিমার পূর্ণতায়, দেবতার অমৃতের দানে
মর্ত্যের বেদনা মেশে।" (শাল)

প্রাকৃতিক দৃশ্যের বিচ্ছিন্ন উপাদান দিয়া শেলি কল্পনায় একটি ভিন্নতর প্রকৃতি, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ অপেক্ষা একটি উন্নততর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। একটি আদর্শ জগৎ ও জীবনের প্রতীকরূপে তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের উপাদানগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করিয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক উপাদানের সহায়তায় নব জাগ্রত চেতনার জন্য একটি উজ্জ্বল ইথরবৎ বাসভূমি সৃষ্টি করিয়াছেন। শেলি ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের গীতিকার। তিনি ইহার অন্তর্গত অনুপলব্ধ দ্যোতনাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। দৃশ্যমান সামগ্রী দিয়া তিনি এক অ-দৃষ্ট আদর্শ জগৎ রূপায়িত করিয়াছিলেন। এই আদর্শীকরণের ক্ষেত্রে তিনি তাঁহার চেতনার দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন,—তাঁহার উদ্দাম অপূর্ব কবি-কল্পনা। এইরূপে জাগতিক দৃশ্যাবলী বিশ্ব-চেতনার প্রতীকরূপে অনুমিত হইয়াছে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নিকট প্রাকৃতিক দৃশ্য-প্রভাব। প্রাকৃতিক দৃশ্য যে নৈতিক-বোধ জাগ্রত করে, তিনি তাহাকেই কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন। এই নৈতিক প্রেরণা প্রকৃতির যথার্থ প্রক্রিয়া হইতে লব্ধ নয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মানবিক বোধকে রূপায়িত করিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি, অভিব্যক্তি এবং বিচিত্ররূপা প্রাকৃতিক শক্তির কবি। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রভেদের ভিতর দিয়া নিখিল বিশ্বের একটি অংশমাত্র তাঁহার কৌতূহল জাগ্রত করিয়াছে। এই প্রভাব অত্যন্ত সত্য, শান্ত আকাশ অথবা পর্বতের উদার ব্যাপ্তি, অথবা নিস্তরঙ্গ জলের বিস্তার মানবচেতনাকে আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া ক্ষণকালের জন্য সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেয় ;—এক পরিব্যাপ্ত প্রীতিবোধ।

প্রাকৃতিক দৃশ্য মানবজীবনের একটি অংশ। প্রত্যেকটি স্থান, প্রত্যেকটি ঋতুর সঙ্গে বিজড়িত হইয়া আছে মানুষের প্রভাব। যতক্ষণ তিনি মানুষের কথা বলেন, ততক্ষণ তিনি সত্যিকারের প্রকৃতির কবি। যখন তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যের কবি, তখনও তিনি মূলত মানবজীবনের কবি। কোথাও তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির প্রসঙ্গে তিনি সাধারণত নীতির কথা বলেন, মানুষের বা আপনার প্রসঙ্গে তিনি প্রকৃতির একটি অংশকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখান।

কোন প্রতীক আশ্রয়ী না করিয়া প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক ভাবেও দেখা সম্ভব। কারণ, সকল প্রতীকবিমুক্ত প্রকৃতির নিজস্ব একটি গতি ও সঙ্গীত আছে।

প্রকৃতি-কবিতা যে-বোধশক্তিকে জাগ্রত করে, এবং যে-উপলব্ধিকে প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ তাহার দ্বারা উপলব্ধ হইতে পারে। এই সমস্ত গুণাবলী আত্মার

তন্ত্রীগুলিকে আকর্ষণ করিয়া তাহার পূর্ণ প্রাণ ও সঙ্গীত বাহিরে প্রকাশ করে প্রকৃতিতন্ত্র প্রত্যক্ষতার এবং দৃশ্য সামগ্রীর প্রতি প্রযুক্ত কল্পনার দর্শন, প্রকৃতির সকল দৃশ্য ও ধ্বনি ইহার মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া ইহাকে তাহাদের প্রত্যক্ষতা, তীক্ষ্ণতা এবং শক্তিদান করে। প্রকৃতিতন্ত্র একটি বুদ্ধিগ্রাহ্য দর্শন ; ইহা দৃশ্যমান জগতের গভীরে বস্তুকে পরিবর্তনের পশ্চাতে পারম্পর্য এবং ভাগ্যের পশ্চাতে বিধানকে প্রত্যক্ষ করে। এইভাবে দেখিলে দেখা যায় প্রকৃতির যেমন গভীরতল আছে, তেমনি উপরিতল আছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি শক্তিরও প্রয়োজন আছে। এই অন্তর্দৃষ্টির মহিমার সহিত তুলনায় উপমা ও তুলনার সকল রূপ লঘু এবং কৃত্রিম বলিয়া বোধ হয়। এই সকল কবি প্রকৃতি, ইতিহাস এবং মানুষের প্রকৃত ভাবাবেগকে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা পুরাণ ও রূপকথা পরিহার করেন।

পরিশেষ

ধরিত্রীর প্রাণের অন্তহীন বিচিত্র প্রকাশকে কবি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিবার সাধনা করিয়াছেন। ফাল্গুনে তরুর মজ্জায় মজ্জায় যে ফুল ফুটাইবার গভীর গোপন বেদনা, প্রাণের সেই অধীর উৎকণ্ঠাকে কবি আপনার কাব্যের মর্মমূলে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আর নিয়ত রূপ বিনষ্টির জন্য প্রাণের যে গভীর বিষাদ তাঁহার কাব্যে সেই বিষাদেরও কত-না পরিচয় আছে। প্রাণ-চেতনায় সৃষ্টি ও বিসৃষ্টির আনন্দ-বেদনা ওতপ্রোত হইয়া আছে। প্রতি তৃণে তৃণে মৃত্তিকা নিম্নের প্রতি প্রাণকণায় আলোকের আনন্দ স্পর্শলাভে যে নিঃসাড় আনন্দ কোলাহল, তাঁহার কাব্যে সেই আনন্দের কত-না প্রকাশ ঘটিয়াছে। সূর্য দয়িতের জন্য রূপহারা বিবশা অমানিশার যে ভয়ংকরী তপশ্চর্যা, অন্তশ্চেতনার দীপ জ্বালাইয়া প্রতীক্ষায় যে ক্লান্ত প্রহর গণনা, পরমের স্পর্শলাভের জন্য কবির কাব্যে সেই তপশ্চর্যার বাণী-রূপ রহিয়াছে। পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য, জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা সাধনের জন্য মানব-হৃদয়ের যে কান্না, তাঁহার কাব্য-রূপের মধ্যে তাহা বাণীলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। নিরুদ্ধ হৃদয়ের সংশয় ব্যাকুলতাকে কবি এইরূপে প্রকাশ করিয়া ভার-মুক্ত করিয়াছেন। দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রাণের প্রবাহ চলিয়াছে, তাহারই

আঘাতে-সংঘাতে এই অন্তহীন গ্রহনক্ষত্র বুদ্‌বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে। সৃষ্টি ও বিনষ্টি, হাসি ও কান্না, আলো ও ছায়া সেই প্রাণ-সমুদ্রে একাকার হইয়া আছে। মহাকালের এ যেন আদি অন্তহীন নিষ্কারণ লীলা। তাঁহার এক চরণ পাতে সংখ্যাতীত রূপ ফুটিয়া উঠিতেছে, অন্য চরণ পাতে তাহারা আবার কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। এই নিঃসীম আনন্দ-বেদনাকে কবি তাঁহার কাব্যে কিছুটা সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন :

> "চেতনাসিন্ধুর ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মৃদঙ্গ গর্জনে
> নটরাজ করে নৃত্য, উন্মুখর অট্টহাস্যসনে
> অতল অশ্রুর লীলা মিলে গিয়ে কলরল রোলে
> উঠিতেছে রণ রণি, ছায়ারৌদ্র সে-দোলায় দোলে
> অশ্রান্ত উল্লোলে। আমি তীরে বসি তারি রুদ্রতালে
> গান বেঁধে লভিয়াছি আপন ছন্দের অন্তরালে
> অনন্তের আনন্দ বেদনা।" (প্রণাম)

আর যে মানব-চেতনাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্বের এই অন্তহীন বিচিত্র বোধের অনুভূতি লাভ, কবির সকল বোধের ধারা পরিণামে সেই মানব-সমুদ্রে একাকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে :

> "এই গীতি পথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
> দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
> আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
> বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।" (প্রণাম)

বিশ্বের বিচিত্র অনুভূতির যোগে মানবীয় সত্তার সম্পূর্ণতা। এই সম্পূর্ণতাই কবির নিকট মুক্তি। বিশ্বের বোধ মুক্ত যে মুক্তি তাহা কবির নিকট মহাশূন্যতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আজ সমগ্র জীবনের তপস্যার সঞ্চয় ভারকে ঈশ্বরের পদপ্রান্তে একটি সূত্রে গ্রথিত করিয়া মাল্যস্বরূপে অর্ঘ্যদানের সময় আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। আজ জীবনসন্ধ্যায় কবির প্রাণ-মন ক্লান্ত অবসন্ন। গভীর কোন সত্যলাভের জন্য দুঃসহ তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হইবার দিন কবির জীবনে অবসান লাভ করিয়াছে। বাহিরে রূপের জগতে স্নিগ্ধতায়, মাধুর্যে, কারুণ্যে অপরূপের যতটুকু আভাস

লাভ করিতে পারা যায়, আজ কবি তাহাতেই পরিতৃপ্ত। বনভূমির শ্যামল ছায়ায়, আষাঢ়ের মেঘের কারুণ্যে দিবাবসান পূর্বের আকাশ-পটে বিচিত্র বর্ণের অপরূপ ইন্দ্রজাল রচনার মধ্যে, সন্ধ্যা-তারার অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহারই যে ক্ষীণ আভাস মুহূর্তে মুহূর্তে ফুটিয়া উঠিয়া হারাইয়া যায়, কবি আজ তাহাই মাত্র প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। শ্যামলা ধরিত্রীর সহজ সরল প্রাণের বিচিত্র দাক্ষিণ্যই আজ কবির পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে ধূলিতলে অনায়াসে ফুল ফোটা ও ঝরা, পাখির কণ্ঠে এই যে বিচিত্র সুরে প্রাণের সহজ সরল বন্দনা গান, যে গানের সুরের সহিত মিল রহিয়াছে আলোর সংঘাতে জাগা সবুজের ছন্দে, এই একান্ত তুচ্ছতম মহত্তম প্রাণের সম্পদ আজ কবির জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে :

"এই বিশ্ব সত্তার পরশ,
স্থলে জলে তলে তলে এই গূঢ় প্রাণের হরষ
তুলি লব অন্তরে অন্তরে,
সর্বদেহে, রক্তস্রোতে, চোখের দৃষ্টিতে, কণ্ঠস্বরে,
জাগরণে, ধেয়ানে তন্দ্রায়,
বিরাম সমুদ্রতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায়।"

স্বর্গ বা মুক্তি-লোক তো আর কোথাও নাই। এই নিখিল বিশ্বে এই মানব-সংসারে একদিন স্বর্গের প্রকাশ ঘটিবে। জীবন ও জগৎ ছাড়াইয়া তাহাকে বাহিরে আর কোথাও আর কোন রূপে লাভ করিতে পারা যাইবে না। মানুষের মুক্তি বলিতে তিনি বুঝিতেন মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ। ব্যক্তির জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মকে বিশ্ব-জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের যোগে পূর্ণ বিকশিত করিয়া পরিণামে ব্যক্তির সহিত বিশ্বের পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করা। মূল এই উপলব্ধিকে তিনি নানা প্রসঙ্গে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। 'পান্থ' কবিতাটির মধ্যে এই একই ভাবের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের জোয়ার-ভাটা চলিয়াছে। নর-নারীর মধ্যে আনন্দ-বেদনা, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি রূপে তাহারই বিচিত্র প্রকাশ। তাহার একদিকে সৃষ্টি, আর একদিকে বিনষ্টি। এই প্রাণ-স্রোতে নিত্যকাল ধরিয়া উষা ও চন্দ্র আলোকসম্পাত করিয়া কত বিচিত্র বর্ণের আলপনা আঁকে। ওই মহাশূন্যে অনন্ত কোটি গ্রহ-তারা-লোক, ওই অস্তোন্মুখ সূর্যের আভায় রাঙা দিগ্‌দিগন্ত, তাহারই বুকে কত ফুল ফুটিয়া ঝরিয়া যায়, পাখি তাহার গানের

অর্ঘ্য ভাসাইয়া দেয়। বিশ্ব-প্রাণের এই লীলার সহিত কবি যখন আপন প্রাণের লীলাকে যুক্ত করিয়া দিতে পারেন, তখনই কবি মুক্তির আনন্দ আস্বাদ করেন। প্রাণের এই প্রকাশ-লোকের বাহিরে কোন মুক্তি-লোক নাই ঃ

"সে তরঙ্গ নৃত্যছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সঙ্গীতে
এ বিশ্ব প্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে।
রাখিতে চাহি না কিছু, আঁকড়িয়া চাহি না রহিতে
ভাসিয়া চলিতে চাই সবার সহিতে
বিরহ-মিলন-গ্রন্থি খুলিয়া খুলিয়া,
তরণীর পালখানি পলাতকা বাতাসে তুলিয়া।" (পান্থ)

শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার 'On Yoga' গ্রন্থে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্য সম্পর্কে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা রবীন্দ্রনাথের কাব্য সম্পর্কেও করা যাইতে পারে। নিম্নে সেই অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি ঃ

"If we read the poems in which Wordsworth expressed his realisation of Nature, we may acquire some distant idea of what realisation is. For, first, we see that he had the vision of something in the world which is the very Self of all things that it contains, a conscious force and presence other than its forms, yet cause of its forms and manifested in them. We perceive that he had not only the vision of this and the joy and peace and universality which its presence brings, but the very sense of it, mental, aesthetic, vital, physical; not only this sense and vision of it in its own being but in the nearest flower and simplest man and the immobile rock; and, finally, that he even occasionally attained to that unity, that becoming the object of his dedication, one phase of which is powerfully and profoundly expressed in the poem "A slumber did my spirit seal", where he describes himself as become one in his being with earth, "rolled round in its diurnal course with stocks and stones and trees."

কবি আপনার সমগ্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিনটি সত্তার যুগপৎ ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এক বহিঃসত্তা, যাহার জন্ম আছে, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও বিনষ্টি আছে। মৃত্যুতে এই জড় সত্তাটিরই বিনাশ ঘটে। কিন্তু এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া

বাহিরের যে বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ প্রতিনিয়ত অনুভূত হয়, প্রাণের যে বিচিত্র অনুভূতি তাহা অন্তরে নিয়ত সঞ্চিত হইয়া অন্তরে আর একটি স্থির ভাব-লোক গড়িয়া তুলে, ইহাকে অধ্যাত্ম-সত্তা বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পৃথক, ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে বিশিষ্ট। কবি বা শিল্পী অন্তরের এই ভাব-লোকটিকে বাহিরে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে প্রকাশ করেন। দেহ-রূপের বিনষ্টিতে দেহের নিয়ত সেই সঞ্চয় ভার আর থাকে না বলিয়া এই ভাব-লোকটিরও নিঃসন্দেহে বিনষ্টি ঘটে। ব্যক্তির আর একটি সত্তা আছে যাহা এই ভাব-লোকের সীমাকেও অতিক্রম করিয়া যায়। মানুষ ভাব-তন্ময় মুহূর্তে চকিতে চকিতে সেই অপর সত্তা সাক্ষাৎ লাভ করে, মানবিক সত্তার তাহা যেন এক অপার বিস্তৃতি। এই সত্তা সর্বমানব সাধারণ সত্তা। এই সাধারণ সত্তা ব্যষ্টির ভাব-লোক আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। ইহাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বিশ্ব-আমি। এই সত্তা দেশ-কালের ভিতর দিয়া অন্তহীন মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঐতিহাসিক ক্রম-পরিণাম রূপে আপনাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। সমগ্র মানব-সত্তার এই নিয়তি-রূপের সহিত ব্যক্তির নিয়তি-রূপ বিজড়িত। এই 'বিশ্ব-আমি'র যেমন তাঁহার রচনারও তেমনি বিনাশ নাই। ইহার উর্ধ্বতর তত্ত্ব হইল অসীম, যিনি নির্বিশেষ।

সাধক, কবি, বা শিল্পী বিশ্ব আমির যোগে নিখিল মানবের ভাব-লোককে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রসারিত ও বিচিত্র করিয়া তুলিতেছেন।

"এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।" (আমি)

আদি অন্তহীন অতীত ভবিষ্যতের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিশ্ব-আমির সেই পরিপূর্ণ রূপটি কেমন? নিখিল মানব-চিত্তকে আশ্রয় করিয়া এ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন যে রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাদের মিলিত প্রকাশের মধ্যে ওই পূর্ণ-রূপের কতটুকু আভাস ফুটিয়াছে?

ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে

নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।" (আমি)

বিশ্ব-প্রাণের বিচিত্র লীলায়, সত্তার বিচিত্র প্রকাশের মাঝে আমারও প্রাণ লীলা করিয়াছে, আমারও সত্তা বিরাজিত। এই বিস্ময়ের কি অন্ত আছে! জীবনের এই প্রকাশ মহিমার নিকট আর সব গৌরব বুঝি ম্লান হইয়া যায়।

"আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।" (আছি)

সীমা ও অসীমের বোধ বিজড়িত এই জীবন কী অপার বিস্ময়ে কবি-চেতনাকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। আজ জীবন-সন্ধ্যায় সেই বিস্ময়বোধের কথাই বারংবার মনে পড়িয়া যায়। আর সমস্ত কিছু জড়াইয়া রহিয়াছে কবির ভালোবাসা, যাহার অপূর্বতায় জন্ম-মৃত্যুর সীমা একাকার হইয়া যায়ঃ

"এই শেষ কথা নিয়ে নিশ্বাস আমার যাবে থামি,—
কত ভালোবেসেছিনু আমি।" (বর্ষশেষ)

আপনার অতীত সমগ্র জীবনটিকে দৃষ্টিসম্মুখে প্রসারিত করিয়া কবি আজ তাহার একটি মূল্য নিরূপণ করিতে চান। সে লীলায় কবি-চেতনা কখন অশ্রু সজল, কখন আশায় উদ্দীপ্ত, কখন পূর্ণতার আস্বাদ লাভে পরম শান্ত,—যাহা মানুষের সকল জন্ম, সকল মৃত্যুর সীমা পার হইয়া অনন্ত প্রসারিত। আর আপনার এই লীলার সহিত যুক্ত করিয়া তিনি বিশ্ব-মানবের লীলা-রূপ তাহার নিয়তি-রূপটিকে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন।

আজ তাঁহার দুঃসহ তপশ্চর্যার, দারুণ পরীক্ষা-মুহূর্তগুলির কথা স্মরণে পড়ে; মানুষের সংশয়ে, প্রতিবাদে, অপবাদে যখন তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিয়াছে তখনই তাঁহার অন্তরে ঊর্ধ্ব-লোক হইতে আলোক নামিয়া আসিয়াছে। সে আলোকে, সে নির্দেশে তিনি আবার নিঃসংশয় বোধে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

এই বিশ্ব-প্রকৃতি তাহার অন্তহীন ঐশ্বর্যের দানভার লইয়া কবির সম্মুখে নিত্যদিন আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার মাধুর্যের তিনি অন্ত পান নাই। তাঁহার দেহ-প্রাণ-মন এই মাধুর্যের স্রোতে অবগাহন করিয়া নিত্য শুচি হইয়াছে। নিখিল বিশ্বের এই প্রাণের লীলা, তাহারই আনন্দ-বেদনাকেই তিনি আপনার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

"যে নিশ্বাস তরঙ্গিত নিখিলের অশ্রুতে হাসিতে
তারে আমি ধরেছি বাঁশিতে।" (বর্ষশেষ)

যে সকল মহাপুরুষ অসীমের লীলাকে মর্ত্যে দৃষ্টিগোচর করাইবার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন; অসীম বা অনন্তের বিজয়ঘোষণা করিবার জন্য যাঁহারা সকল নির্মম অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অবমাননা ও মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন, তাঁহারাই মানুষের পরমাত্মীয়। তাঁহাদের মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ। এই প্রকাশের লীলা-রূপটিকে কি আমরা কবির জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পাই না।

বিশ্ব-প্রাণের, বিশ্ব-সত্তার যোগে, তাহারই ক্রমিক গভীর উপলব্ধির ভিতর দিয়া মানুষের জ্ঞানের জগৎ, ভাবের জগৎ, সৃষ্টির জগৎ ক্রমাগত প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছে। বিশ্ব-সত্তার যোগে ব্যক্তি-সত্তার যা-কিছু সৃষ্টি তা বিশ্বের মানব-সাধারণের। এমনি করিয়া সমগ্র মানব-সমাজের যাত্রা চলিয়াছে ক্রমোন্নতি, ক্রমবিকাশের দিকে। অন্তহীন ব্যক্তি-সত্তার যোগে বিশ্ব-সত্তা আপনাকে ধীরে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। কবির চেতনাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সত্তা আপনার অন্তর্লীন ঐশ্বর্যের এক অভাবিত দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে। বিশ্ব-সত্তার সে ঐশ্বর্য আজ সকল মানুষের আপনার প্রাণের সম্পদ।

যে-সত্তা সকল সীমাবোধের অতীত, যাহা অসীম বা অরূপ কবি তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন:

"ধূলির আসনে বসি ভূমারে দেখেছি ধ্যানচোখে
আলোকের অতীত আলোকে।" (বর্ষশেষ)

কিংবা

"ক্ষণে ক্ষণে দেখিয়াছি দেহের ভেদিয়া যবনিকা
অনির্বাণ দীপ্তিময়ী শিখা।" (বর্ষশেষ)

ইহা প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"যেখানে মানুষ দেখিতে পায় না, কিছু শুনিতে পায় না, কিছু উপলব্ধি করে না, তাহাই ভূমা। যেখানে মানুষ কোন কিছু দেখিতে পায়, কোন কিছু শুনিতে পায়, কোন কিছু উপলব্ধি করে তাহাই অল্প। যাহা ভূমা তাহাই অমৃত, যাহা অল্প তাহা মৃত্যু। 'হে ভগবন, ভূমা কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত'? স্বীয় "মহিমায় অথবা মহিমার উপরও নয়'।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)

মানুষ যেখানেই আপনার নিত্যদিনের তুচ্ছতাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার সাধনা করিয়াছে, সেইখানেই সে মানুষের শ্রেষ্ঠ সাধনার অংশভাগী হইয়াছে, সকল যুগের সকল শ্রেষ্ঠ মানুষের সে আত্মীয়ভুক্ত হইয়াছে।

এমনি বিচিত্র পথে কবির জীবন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া আজ অবসান-লাভের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তবু কবি জানেন এই অবসানও একান্ত বিচ্ছেদ নয়, তাহা আর এক নূতন আরম্ভের সূচনা।

শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতের নির্মম পীড়নকেও জয় করিয়া নিঃশঙ্কে যূথী অন্তরের পূর্ণতাকে ধীরে ফুটাইয়া তুলে; অচঞ্চল সাহস, আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুলতা, আপনার সীমায় সহজে স্ববশ থাকিবার মূর্ত্য প্রকাশ। তাহার পর আপনার সৌন্দর্যের, সৌরভের দান ভারকে অকাতরে বিলাইয়া দিয়া একদিন ঝরিয়া পড়ে। অমনি যূথীর মত বাহিরের সকল নিন্দা খ্যাতি, মান অপমানের ঊর্ধ্বে উঠিয়া অবিক্ষুব্ধ অন্তরে পরম সুন্দরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া কবি যেন তাঁহার সকল চিন্তা ও ভাবনাকে রূপদান করিতে পারেন।

নিখিল বিশ্বের সর্বত্র নিয়ত পরিবর্তন-পরম্পরা লক্ষ্য করা যায়। এই নিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে, নিয়ত মৃত্যুলাভের ভিতর দিয়া। নিয়ত মৃত্যু-দ্বার পার হইয়া নিয়ত ভিন্ন রূপ জন্মলাভ করিতেছে। এই যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যু মানবজীবনে একান্ত বিচ্ছেদ কখনই দান করিতে পারে না। মৃত্যুর ভিতর দিয়া নিঃসন্দেহে নূতন জীবন লাভ করি। জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-সত্তা নিত্য নবরূপ লাভ করিয়া চলিয়াছে। নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই সঙ্গে মানবসত্তার এই যে নিত্য নবরূপ লাভ, তাহা কি কেবল আবর্তন মাত্র, ফিরিয়া ফিরিয়া একই লীলা, তাহার ভিতর দিয়া কি মূল্যের পরিবর্তন ঘটিতেছে না? রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাসের পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি:

"হে দুয়ার, জীব-লোক তোরণে তোরণে
করে যাত্রা মরণে মরণে।
মুক্তি-সাধনার পথে তোমার ইঙ্গিতে
'মাভৈঃ' বাজে নৈরাশ্য নিশীথে।" (দুয়ার)

আদি-অন্তহীন প্রসারিত দেশ-কালের মধ্যে প্রাণের যে নিত্য প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে তাহাতে কত রূপ-বুদ্বুদ নিত্য জাগিয়া মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অনন্তকালের বক্ষে এই শ্যামলা ধরণী তেমনি একটি বুদ্বুদ মাত্র। এই ধরণীতেই আবার কত ভাঙ্গা-গড়া, কত রূপান্তর, রাজ্যের কত উত্থান-পতন, কত

বিলুপ্তিবিস্মৃতি, কত নূতনের আবির্ভাব। তাহার মধ্যে আমার এই জন্ম-মৃত্যুর বেড়া দিয়া ঘেরা এই আমির প্রকাশ কী অচিন্তনীয় ক্ষণিক! কিন্তু এই ক্ষণিকতা-বোধটিই এই কবিতার মর্মকথা নয়। এই ক্ষণিক সত্তা যে বিশ্বের আর সকল সত্তার সহিত একদিন সত্য ছিল, এই বিস্ময় কবি-চেতনাকে স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে। কবি আপনার জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তকে এই বিস্ময়বোধের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বিস্ময় প্রেরণায় কবির দৃষ্টি-সমক্ষে এই বিশ্বের যে অন্তহীন সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চেতনাকে যে সদা জাগ্রত ও উন্মুখ করিয়াছে, একটি আনন্ত্যের বোধে মনকে সর্বদা নিমজ্জিত করিয়া তাহাকে যে আশ্চর্য ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াছে, তাহার কোন পরিমাপ আমরা কেমন করিয়া দান করিব:

"আজ আমি নিখিলের জ্যোতিষ্ক সভাতে
রয়েছি দাঁড়ায়ে। আছি হিমাদ্রির সাথে
আছি সপ্তর্ষির সাথে, আছি যেথা সমুদ্রের
তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া উঠে উন্মত্ত রুদ্রের
অট্টহাস্যে নাট্য লীলা।" (বিস্ময়)
এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।" (বিস্ময়)

সত্তার এই ক্ষণিক প্রকাশের এক আশ্চর্য মূল্য নিরূপণের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় 'প্রাণ' কবিতাটির মধ্যে।

দেশ-কালের মধ্যে তুচ্ছতম হইতে মহত্তম যে-কোন সত্তার প্রকাশ তাহা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক-না-কেন, তাহাদের প্রত্যেকটির অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে। যে চিত্রকর মুহূর্তে এক-একটি অপরূপ রূপ সৃষ্টি করিয়া আবার মুছিয়া দিতেছে, সেই সমগ্র চিত্রের সম্পূর্ণতার জন্য তুচ্ছতম সত্তারও প্রয়োজন। তাহা না হইলে এই সমগ্র সৃষ্টি অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। সেই কবিতাটির কিয়দংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:

"বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা,
ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
অগ্নির আবর্ত্য ঘুরে ওঠে।
সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্‌বুদ;
তারি মধ্যে এই প্রাণ

অণুতম কালে
কণাতম শিখা লয়ে
অসীমের করে সে আরতি।" (প্রাণ)

সংসারে প্রাণের লীলায় মুহূর্তে কত প্রাণ বিনষ্ট হইতেছে, আবার তাহাদের স্থান পূর্ণ করিয়া কত প্রাণের প্রকাশ ঘটিতেছে। তাই সংসার চির পুরাতন হইয়াও চির নবীন। আমার সীমিত বোধের আবেষ্টনী ঘেরা যে-'আমি'র প্রকাশ, তার সুখ-দুঃখ, লাভ ক্ষতি, হাসি-কান্না ওই চির চঞ্চল, চির নবীন প্রাণের প্রবাহকে কিছুমাত্র স্পর্শ করিতে পারে না।

"দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়া ঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না নিখিলের পানে।"

অসীম প্রাণের লীলার দিক হইতে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিলে দেখা যায় সৃষ্টি ও বিনষ্টি, লাভ ও ক্ষতি একই তরঙ্গের উঠা ও নামা, কান্না-হাসির মিলিত সুরে একই প্রাণের বীণায় নিত্য সামগান ধ্বনিত হইতেছে।

ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আবেষ্টনীর বাহিরে আসিয়া যাঁহারা বিশ্বপ্রাণের এই লীলারূপটিকে যত অধিক করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে, লাভ করিতে পারেন, মৃত্যুভয় তাঁহাদের তত অধিক পরিমাণে বিলুপ্ত হয়। তাঁহাদের চেতনা পরিণামে সেই শান্তিকে লাভ করিতে সমর্থ হয়, যে শান্তি এই সৃষ্টি-বিনষ্টির, তরঙ্গের এই নিত্য উঠা-নামার দ্বারা অবিক্ষুব্ধ।

"যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীর মন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।" (যাত্রী)

বিশ্বপ্রাণের সহিত ব্যক্তিপ্রাণের যোগের যে-পর্যায় লাভের ফলে বিশ্ব-সত্তা কবির নিকট 'মানসী', 'মানস-সুন্দরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি রূপে অনুভূত হইয়াছিল, যাহাকে বিশ্ব-সত্তার পূর্ববর্তী পর্যায় জীবন-দেবতারও পূর্ববর্তী পর্যায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, সুদীর্ঘকাল পরে 'বলাকা' এবং তাহারও পরবর্তী কাব্য 'পূরবী'র মধ্যে কবি ওই চেতনা-পর্যায় লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে 'লীলাসঙ্গিনী', 'তুমি' প্রভৃতি রূপে তাহার পুনরায় আবির্ভাব ঘটিয়াছে লক্ষ্য করা যায়।

একই সত্তা ভিন্ন চেতনা-পর্যায়ে ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। ফিরিয়া ফিরিয়া কবির ভিন্ন ভিন্ন চেতনা-পর্যায় লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব স্বরূপের ফিরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ ঘটিয়াছে।

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া কবি তাঁহারই স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। মানবিক বিচিত্র প্রেম সম্পর্কের মধ্যেও তাঁহারই প্রকাশ।

"জীবনধারা অকূলে ছোটে,
দুঃখে সুখে তুফান ওঠে,
আমারে নিয়ে দিয়েছ তাহে খেয়া।" (বিচিত্রা)

প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মানবিক বিচিত্রবোধ তাঁহাকে পরিণামে এক অপূর্ব লোকের আভাস দান করিয়াছে, যেখানে সকল বোধের সীমা হারাইয়া যায়। অনির্বচনীয়তার মূর্ছনায় নিঃশেষ আত্মবিস্মৃতি।

"পালের 'পরে দিয়েছ বেগে
সুরের হাওয়া তুলে,
সহসা বেয়ে নিয়েছ তরী
অপূর্বেরি কূলে।" (বিচিত্রা)

অপরূপকে এমনি রূপ বা সীমা আশ্রয় করিয়া লাভ করিতে হয়। প্রাণের উপলব্ধি বলিয়া এবং যৌবনে প্রাণের সামর্থ্য সর্বাধিক থাকে বলিয়া প্রাণের আস্বাদ লাভের মুহূর্তে ফিরিয়া ফিরিয়া যৌবনের কথা মনে পড়িয়া যায়। আর সেই সঙ্গে মনে পড়িয়া যায় ধীর নিঃশেষিত প্রাণের বঞ্চনা। যৌবনের সেই প্রাণের লীলা, আনন্দ-বেদনার উদ্‌ভ্রান্ত দিবস রজনী, নিবিড়তম সুখ ও গভীরতম বেদনায় কম্পিত হৃদয়ের শতবর্ণের প্রকাশ; তাহাকে জীবনের এই পর্যায়ে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই। প্রাণের তবুও কেন এই গভীর আকুতি, এমন মিনতি বিজড়িত, সকরুণ, অশ্রু-ছলোছলো চক্ষের আহ্বান।

"তবুও কেন এনেছ ডালি
দিনের অবসানে;
নিঃশেষিয়া নিবে কি ভরি
নিঃস্ব করা দানে।" (বিচিত্রা)

এই পর্যায়ের আর একটি কবিতা 'তুমি'। চিত্রার পূর্বে 'মানসী,' 'সোনার তরী' প্রভৃতি কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে এই তুমির স্বরূপ বিচার করিয়াছি।

কবি ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সকল বিরোধ অবসান শেষে সেই প্রথম আপন অন্তরের মধ্যে একটি সুসমঞ্জসিত ভাব-লোক গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। বিশ্ব-প্রাণ-মনের যোগে বিকাশ যেমন ঘটে, তেমনি সামঞ্জস্যও সাধিত হয়। আপনার মধ্যে পরিপূর্ণ সুষমামণ্ডিত এই অপর সত্তার অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকল বিরোধ-বৈচিত্র্যের অন্তরালে একটি সুষমামণ্ডিত সত্তার উপলব্ধি ঘটিয়াছে। চেতনাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অন্তরে যেমন বিশ্বের অন্তরেও তেমনি সুষমা-লোকটির ধীরে বিকাশ ঘটিতে থাকে। ইহার নানা পরিণাম, নানা ঐশ্চর্যের পরিচয় আমরা পূর্ববর্তী কাব্যগুলির মধ্যে লাভ করিয়াছি। এই পর্যায়ে কবি যাহাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহা ওই 'মানসী', 'সোনার তরী' পর্যায়ে পৃথক সত্তা রূপে অনুভূত 'তুমি'।

এই 'তুমি' বিশ্ব-প্রাণ বা বিশ্ব-সত্তা, কিন্তু ব্যক্তি-চেতনার বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে অনুভূত। চেতনাবিকাশের ক্রমিক উন্নততর পরিণামে একই বিশ্ব-সত্তা, 'তুমি' ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপে অনুভূত হইয়াছে।

বর্তমানে কবিতাটির মধ্যে যাহা সবিশেষ লক্ষণীয় তাহা হইল এই চেতনা-পর্যায় লাভ করিয়াও কবি সান্ত্বনা লাভ করিতে পারেন নাই। কারণ এই চেতনা-পর্যায়ে বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণের যে বিচিত্র লীলা, সৌন্দর্য, প্রেমের যে বিচিত্র মাধুর্যাবেশ তাহা কবি-প্রাণের দ্রুত অবসানের জন্য আর সম্ভব নয়।

এই অসামর্থ্যের জন্য কবির হৃদয় কান্নার ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অসহায় হইয়া কবি আপনার ধীর আচ্ছন্ন চেতনাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, সহস্র জিজ্ঞাসা বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"চেনামুখখানি আর নাহি জানি
আঁধারে হতেছে গুপ্ত,
তব বাণীরূপ কেন আজি চুপ
কোথায় সে হায় সুপ্ত।
অবগুণ্ঠিত তব চারিধার,
মহামৌনের নাহি পাই পার,
হাসিকান্নার ছন্দ তোমার
গহনে হল যে লুপ্ত।" (তুমি)

কবির জীবনে সৌন্দর্য-মাধুর্য ও প্রেমের সম্পদ আহরণের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাই আজ ফিরিয়া ফিরিয়া যৌবনের কথা মনে পড়িয়া যায়।

সেদিনকার আহরিত সম্পদগুলিকে স্মৃতির মঞ্জুষা খুলিয়া একে একে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখেন, দেখিতে দেখিতে কখন অন্যমনা হইয়া পড়েন, আঁখিপাতা সজল হইয়া আসে। অতীত দিনের স্মৃতিবিজড়িত হইয়া প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য ও প্রেম পরম গম্ভীর মহিমা ও বিষাদ বিজড়িত হইয়া যায়।

আজিকার পথ চলায় পথপার্শ্বের ঘন বনের মধ্যেকার লেবুডালের স্নিগ্ধ-ছায়ায় কোকিল ডাকিয়া উঠে। সেই সুরে আজিও কবির মন মুহূর্তে অপূর্বতার আভাসে ভরিয়া উঠে, তাহারই পথ বাহিয়া মন কোন সীমাহীন লোকে প্রয়াণ করে, যেখানে নিত্যকাল ধরিয়া পরম শান্তির মঙ্গল-ধ্বনি উঠিতে থাকে; সংসারে পাপ-তাপ-গ্লানি কুশ্রীতা যে পথ অতিক্রম করিতে পারে না।

"যে-শান্তিটি সব-প্রথমের, যে শান্তিটি সবার অবসানে,
যে-শান্তিতে জানায় আমায় অসীম কালের অনির্বচনীয়;—
'তুমি আমার প্রিয়'।" (চিরন্তন)

এই শ্রেণীর আর একটি কবিতা 'কণ্টিকারি'। বাহিরে প্রাণের সম্পদ আহরণের দিন যখন ফুরাইয়া আসে তখন অন্তরের স্মৃতি-লোকটি একমাত্র আশ্রয় হইয়া উঠে। কবি আজ তাই ক্ষণে ক্ষণে ওই স্মৃতি-লোকটিকে আশ্রয় করিয়া ফিরিয়াছেন। স্মৃতি-বিজড়িত বলিয়া সেই প্রত্যেকটি সৌন্দর্য-লোক করুণ-কোমল, বিষাদ-নীল।

"আজকে যখন হৃদয় আমার ক্ষণিক শান্তি যাচে
দুঃখ দিনের দুর্ভাবনার প্রচণ্ড পীড়নে,
হঠাৎ কেন জাগল আমার মনে,
সেই সকালের টুকরো একটুখানি—
মাটির কাছে কণ্টিকারির নীল-সোনালির বাণী।" (কণ্টিকারি)

যে-সংসারে নিত্য নূতন প্রাণের লীলা চলিতেছে, সেই সংসার হইতে কবি আজ কত দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। আজিকার প্রত্যক্ষ প্রেমের লীলা দৃষ্টে কবির হৃদয় শূন্য করিয়া কেবল দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

"বক্ষে আমায় বাজিয়ে দিল গভীর বেদনা সে
পঁচিশ বছর বয়সকালের ভুবনখানির একটি দীর্ঘশ্বাসে,
যে-ভুবনে সন্ধ্যা-তারা শিউরে যেত ওই পাহাড়ের দূরে
কাঁকরঢালা পথের 'পরে ডাকপিয়নের পদধ্বনির সুরে।"
(আরেক দিন)

'তে হি-নো দিবসাঃ', 'সাথী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে এই একই ভাবের পরিচয় লাভ করা যায়।

বিশ্ব-প্রাণ কত-না রূপে কত ভাবে মানুষের প্রাণকে আকর্ষণ করে, মনের মধ্যে কত অপূর্বতার বোধ জাগাইয়া তুলে, অজানিত কত বেদনা,—এই সমস্ত কিছুকে একত্র করিয়া মানুষ কত মানসী মূর্তি গড়িয়া তোলে। জীবনকে জড়াইয়া রহিয়াছে কী আশ্চর্য বিচিত্র বিরুদ্ধ বোধ, কত সত্য, কত মিথ্যা, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, কত তর্ক ও বিশ্বাস, কত ভীতির পীড়ন, কত কাল্পনিক সান্ত্বনা, অতীতের কত বিচিত্র প্রাণহীন সংস্কার, কত আদেশ, কত নির্দেশ, কত গোপন ভালবাসা, কল্পনার কত মূর্তি সৃষ্টি, কত আত্মত্যাগ, অসম্ভবকে লাভ করিবার কত-না প্রয়াস, কত মহত্ত্বের পূজা, কত হীনতার সন্তোষ সাধন, কত প্রবঞ্চনা, কত জয়, কত পরাভব। এই সমস্ত কিছু জড়াইয়া মনুষ্য-সত্তায় পরমাশ্চর্য প্রকাশ। তাহার পর একদিন এই মনুষ্য-সত্তা তাহার এই সমস্ত কিছু বোধ লইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সকল মনুষ্য-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া এই লীলার এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে। সত্তার এই প্রকাশের, তাহার বিচিত্র সৃষ্টির এইরূপে মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ ও সৃষ্টির যে ধারা চলিয়াছে তাহার অর্থ কি?

"যে-চৈতন্য ধারা
সহসা উদ্ভূত হয়ে অকস্মাৎ হবে গতিহারা,
সে কিসের লাগি,—

*   *   *

অসংখ্য এ রচনার উদ্‌ঘাটিছে মহা ইতিহাস,
যুগান্তে ও যুগান্তরে এ কার বিলাস।" (অপূর্ণ)

মানব-সত্তার অর্থ সম্পর্কে এই যে জিজ্ঞাসা ও সংশয়ের পীড়া তাহা যে কবির গভীর অধ্যাত্ম অনুভূতির এক বিচিত্র প্রকাশ তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

"জন্মদিন মৃত্যুদিন, মাঝে তারি ভরি' প্রাণভূমি
কে গো তুমি।
কোথা আছে তোমার ঠিকানা,
কার কাছে তুমি আছ অন্তরঙ্গ সত্য করে জানা।" (অপূর্ণ)

কিংবা

"তোমার সে-সম্ভাষণে
জানাইতে চেয়েছিলে নিখিলের নিজ পরিচয়
হঠাৎ কি তাহার বিলয়,
কোথাও কি নাই তার শেষ সার্থকতা।" (অপূর্ণ)

কবির এই জিজ্ঞাসা ব্রহ্মবাদীদের চিরন্তন জিজ্ঞাসা।

"ব্রহ্মবাদীরা বলেন, কি কারণ? ইহা কি ব্রহ্ম? কথন আমরা জ্ঞানলাভ করিয়াছি? কাহার দ্বারা আমরা জীবন ধারণ করিব? আমরা কাহার উপর প্রতিষ্ঠিত? হে ব্রহ্মবিদ্ (আমাদের বলুন) কাহার উপর অধিষ্ঠিত হইয়া আমরা সুখ-দুঃখের বিভিন্ন পর্যায় যাপন করি।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

"কাহার ইচ্ছায় এবং কাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া মন তাহার বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করে? কাহার আদেশে প্রাণ প্রথম চঞ্চল হইল? কাহার ইচ্ছায় মানুষ এই বাক্য উচ্চারণ করে? তিনি কোন্ দেবতা যিনি চক্ষু ও কর্ণকে নিয়োজিত করেন।" (কেন উপনিষদ্)

কবির সেই সামগ্রিক বোধটি কি, যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল জিজ্ঞাসা একটি উত্তর লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে। ইতিপূর্বে তাহারই পরিচয় লাভের চেষ্টা করিয়াছি।

সমগ্র বিস্থষ্টির (তাহার সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমেত) একটা পরিপূর্ণ ধ্যানরূপ রহিয়াছে পরম চেতনায়। দেশ-কালের ভিতর দিয়া সেই ধ্যানরূপ বিস্থষ্টির মধ্য দিয়া ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। মানব-সত্ত একক এবং সামগ্রিকভাবে তাহাদের বিচিত্র স্থষ্টির ভিতর দিয়া এই পরিণামকে ধীরে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলিয়াছে। পরিণামে এই মুর্ত্য লোকে, এই মানব-সমাজে স্বর্গলোকের অভাস ফুটিয়া উঠিবে। ঈশ্বরের সহিত মানুষের তখন পূর্ণ যোগের লীলা। কোন সীমিত বোধ বা অহঙ্কার এই লীলার পথে আর লেশমাত্র বাধা দান করিবে না।

মানুষের এমন সত্তা আছে যাহা অবিনাশী, অক্ষয়। মনুষের স্পর্ধা যত বড়ই হোক, অত্যাচার যত নির্মম হোক, পাপ যত ঘন মসীলিপ্ত হোক মৃত্যুতে তাহার একদিন বিনাশ ঘটে। কিন্তু মানবাত্মা মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে। এই সমস্ত কিছু তাহার অমর আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তাই পাপের সহিত সংগ্রামে মানবাত্মা অপরিম্লান হইয়া বিরাজ করে। যাঁহারা মানবাত্মার এই

অমরতাকে আপনার আত্মার আলোকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছে, এই জীবনে তাঁহারা ধন্য।

"আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা ব'লে
যাব আমি চলে।" (মৃত্যুঞ্জয়)

বিশ্বের সৌন্দর্য-মাধুর্য, মানবিক স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, অবিক্ষুব্ধ শান্তির মধ্যেই একমাত্র ঈশ্বরের প্রকাশ নয়। যেখানে মানুষ দুরূহ কার্যে, দুঃসাধ্যের সাধনায় নির্মম কর্তব্যসাধনে, বিচিত্র পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত সেখানেও তাঁহার আর এক প্রকাশ, আর এক রূপ। এই উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ঈশ্বরের আহ্বান শুনিয়াছেন। কিন্তু সৌন্দর্য-মাধুর্যের সাধনায় তাঁহার চিত্ত-লোক যত গভীর করিয়া সাড়া দিয়াছে, তাঁহার সমগ্র সত্তা যত গভীর করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে ; দীপ্ত প্রাণের নির্মম অসঙ্কোচ প্রকাশ লীলায় তাঁহার চেতনা তেমন করিয়া সাড়া দিতে পারে নাই।

"ডেকেছ তুমি মানুষ যেথা পীড়িত অপমানে,
আলোক যেথা নিবিয়া আসে শঙ্কাতুর প্রাণে,
আমারে চাহি ডঙ্কা তব বেজেছে সেইখানে
বন্দী যেথা কাঁদিছে কারাগারে।" (আহ্বান)

কিন্তু

"শরম লাগে, মন না জাগে, ছুটিয়া চলি নাকো,
দ্বিধার ভরে দুয়ারে করি দেরি।" (আহ্বান)

এই উভয় ক্ষেত্রকে একযোগে আশ্রয় করিতে পারিলে সাধনা সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের ছবি ফুটাইয়া তুলিবার জন্য যেমন নিরন্তর সাধনা করিতে হইবে, তেমনি তাহাকে বহির্বিশ্বে রূপায়িত করিবার জন্য নিরলস চেষ্টা করিতে, তাহার জন্য সকল প্রকার দুঃখ-ভোগ করিতে জীবনকে প্রস্তুত করিতে হইবে। ঈশ্বর যে মানুষের অন্তর বাহিরকে পরিপূর্ণ করিয়া অনন্ত প্রসারিত। কোন একস্থানে তাহাকে একান্ত করিয়া লাভ করিবার যে সাধনা তাহাতে অপূর্ণতার পীড়াবোধ থাকিবেই। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি পর্যায়ের পর হইতে এমনি একটি অপূর্ণতা-বোধের পীড়া কবির জীবনে ক্রমাগত গভীর হইয়া চলিয়াছে। আমি পূর্বাপর এই ধারার একটি পরিচয় দানের চেষ্টা করিয়াছি।

নারী-পুরুষে মিলিত হইয়া মর্ত্য-লোকে সৌন্দর্য-মাধুর্যের যে অপরূপ ভাব-লোক সৃষ্টি করে, প্রেমে তাহাদের পরস্পরের জন্য যে ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা, যে আশ্চর্য আবেশ, যে আত্ম-বিস্মৃতি, যে মুগ্ধতা, চেতনার যে সীমাহীন প্রসার, জীবন ও জগতের যে অপরূপ সৌন্দর্য-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটন, তাহাকে বোধ হয় মৃত্যুতে আর কোন স্বরূপে লাভ করিতে পারা যায় না।

"এই যে সত্যে ও ভুলে
রচিত আমার মূর্তি, সংসারের কূলে
এ নিয়ে সে এতদিন কাটায়েছে বেলা।
এরে ভালোবেসেছিল, এরে নিয়ে খেলা
সাঙ্গ করে চলে গেছে।" (নিরাবৃত)

মৃত্যুতে জীবনের যদি একান্ত অবসান না ও ঘটে, সত্তার কোন স্বরূপে যদি অবশেষ থাকেও তবে তাহাতে এই বিশিষ্ট লীলা-রস আস্বাদ যে সম্ভব নয় তাহা নিশ্চয়। তাহা সকল সীমার, অজ্ঞানতার, অপূর্ণতার বোধ মুক্ত পূর্ণ তত্ত্ব-দৃষ্টি হইতে পারে; কিন্তু জীবন জ্ঞান ও অজ্ঞান, সত্য ও ভুল, পূর্ণ ও অপূর্ণের বোধ বিজড়িত যে এক অপূর্ব প্রকাশ তাহাকে তো আর লাভ করিতে পারা যাইবে না।

প্রেম-তত্ত্বের সহিত রূপ-তত্ত্ব অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত। প্রেম উপলব্ধির সহিত একটি বিশিষ্ট রূপের বোধ অন্তরে চিরকালের জন্য চিহ্নিত হইয়া যায়। মৃত্যুর পরপারে এই রূপ আর কোন রূপে নিশ্চয়ই প্রতিভাত হয়, কারণ তখন এই দৃষ্টি আর থাকে না। প্রেম যে সেই একমাত্র রূপটিকে ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতে চায়।

দিব্য-চেতনা তো বন্ধ্যা তাঁহার মধ্যে ঐশ্বর্যের প্রকাশ কিছু নাই। তিনি আপনার চতুর্দিক ঘিরিয়া সীমার অবগুণ্ঠন টানিলেন। দেশ-কালের মধ্যে রূপ-রস-গন্ধ তাই অন্তহীন হইয়া পড়িল। নিখিল বিশ্ব অসীমের সীমারূপ। ইহা এক পরমাশ্চর্য প্রকাশ। এই রূপ, এই সীমা, প্রতিনিয়ত সরিয়া, বিকাশ লাভ করিয়া, পরিপূর্ণ হইয়া, বিদীর্ণ হইয়া, বিশীর্ণ হইয়া অসীমকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিকট সীমার এই আশ্চর্য প্রকাশটি পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে।

"পরিপূর্ণ আলো
সে তো প্রলয়ের তরে, সৃষ্টির চাতুরি
ছায়াতে আলোতে নিত্য করে লুকোচুরি।

সে মায়াতে বেঁধেছিনু মর্ত্যে মোরা দোঁহে
আমাদের খেলাঘর, অপূর্ণের মোহে
মুগ্ধ ছিনু, মর্ত্য পাত্রে পিয়েছি অমৃত।
পূর্ণতা নির্মম সে যে স্তব্ধ অনাবৃত।" (নিরাবৃত)

যে তত্ত্ব-দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎ এমন সুদুর্লভ মহিমা লাভ করে, সেই তত্ত্ব-দৃষ্টির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলে, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-দর্শনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

মানুষ মুহূর্তের জন্যও যদি সেই অপূর্বতার আস্বাদ লাভ করে, তবে ধর্মের নামে সমাজের নামে গড়া সংস্কারের বিচিত্র বেড়া, পাকের ঘের দিগন্তে স্খলিত বসনের মতো ছায়া লইয়া কোথায় মিলাইয়া যায়। তখন এই বোধ জাগে, বিশ্বের অন্তহীন সত্তার মত তিনিও আমার সত্তাকে পরম অনুরাগে সৃষ্টি করিয়াছেন। সত্তার অপার বিস্ময় আমার মধ্যেও প্রকাশমান। আমার জীবন-পাত্র পূর্ণ করিয়া তিনি আপনার অমৃত আপনি পান করিয়াছেন। এই কণাতম কালে তুচ্ছতম আমার এই প্রকাশ না ঘটিলে তাঁহার এই বিশ্ব-রচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। আমার এই আমি রূপের যোগে বিশ্বের সকল রূপের একতানে, এক সুরে লীলা।

ঈশ্বরীয় চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বের সকল রূপের সহিত যোগে এই লীলা আস্বাদের পর মানুষের জীবনে আকাঙ্ক্ষার আর কিছু থাকে না।

"তারপর হতে
এ ভঙ্গুর পাত্রখানি প্রতিদিন ঊষার আলোতে
নানা বর্ণে আঁকি,
নানা চিত্ররেখা দিয়ে মাটি তার ঢাকি।" (জলপাত্র)

অর্থাৎ মুহূর্তের এই উপলব্ধি লাভের পর হইতে মানুষের জীবনে নিয়ত চেষ্টা চলে জীবনকে তাহারই অনুকূল করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য। —পরম সুন্দরের যোগে জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিবার চেষ্টা। পরম সুন্দরের যোগে জীবনকে কেবল গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাই নয়, জগতে তাহাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য তাহার পর হইতে মানুষ প্রাণপণ করে। তাহার পর হইতে এই জীবন একটি যজ্ঞে, একটি পরিপূর্ণ প্রণামে, একটি অখণ্ড আত্মনিবেদনে পরিণত হইয়া যায়।

"হে মহান্ নেমে এসে তুমি যারে করেছ গ্রহণ,
সৌন্দর্যের অর্ঘ্য তার তোমা পানে করুক বহন।" (জলপাত্র)

প্রাচীন সৃষ্টি তাহা যতই অপূর্ব হোক-না-কেন, কালে তাহা একদিন জীর্ণ হইয়া ধূলির সহিত ধূলি হইয়া হারাইয়া যায়। কিন্তু মানুষের সৃষ্টিপ্রেরণা তো অব্যাহত থাকে। নূতন কালের মানুষ আবার নূতন রূপ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রাচীন সৃষ্টি নূতনকালে একান্ত মিথ্যা হইয়া যায় না। প্রাচীন সৃষ্টির সাধনাকে নূতন কাল আরো উন্নত সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দেয়। এমনি করিয়া সৃষ্টি যুগ হইতে যুগান্তরের ভিতর দিয়া নিত্য নব-রূপ লাভ করিয়া পূর্ণতাকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিতেছে।

"ধূলা তারে ডাক দিয়ে কয়—
'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।'" (লেখা)

বলাকা আলোচনা প্রসঙ্গে কবির উপলব্ধি চিরন্তন ভাব বা বাণী-লোকের পরিচয় লাভ করিয়াছি। বলাকার 'অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী', ইত্যাদি উদ্ধৃত অংশটির সহিত মিলাইয়া পরিশেষের 'আলেখ্য' কবিতাটি পাঠ করা যাইতে পারে। এই ভাবের একটি প্রবাহ পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ পুনশ্চের 'চিররূপের বাণী' এবং আরোগ্যের 'বিরাট মানবচিত্তে' প্রভৃতি কবিতাগুলি উল্লেখ করিতে পারা যায়।

"অপেক্ষা করিয়াছিলি শূন্যে শূন্যে কবে কোন গুণী
নিঃশব্দ ক্রন্দন তোর শুনি
সীমায় বাঁধিবে তোরে সাদায় কালোয়
আঁধারে আলোয়।

* * *

প্রকাশের ভ্রম কোন
চিরদিন রবে না কখনো।

* * *

আরবার মুক্ত হবি দেহহীন অব্যক্তের পারে।" (আলেখ্য)

স্থির একটি চিন্তা বা ভাব-লোক আছে, যাহা মানব-হৃদয়ের ভিতর দিয়া ক্রম-পরিণাম রূপে ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি লাভ করিতেছে। এই ধীর অভিব্যক্তির নিঃসংশয় উপলব্ধি প্লেটোর চিরন্তন 'Ideas', 'forms' বা 'universals'-এর তত্ত্ব হইতে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিকে মূলত পৃথক করিয়াছে। মিল যেটুকু রহিয়াছে

তাহা চিরন্তন কতকগুলি বোধের উপলব্ধির ক্ষেত্রে। রূপ বিনষ্ট হয় কিন্তু রূপাশ্রয়ী ভাবগুলি (অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-প্রেরণা সমেত) চিরকাল রহিয়া যায়। সেইগুলি আবার ফিরিয়া ফিরিয়া নূতন রূপ লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিকে একটু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করা প্রয়োজন। বিশ্বের সহিত এই ধীর মিলনবোধের গভীরতা ও প্রসারতার ভিতর দিয়া ব্যক্তির প্রেমের, কর্মের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। বিশ্বের সহিত মিলনবোধের ভিতর দিয়া মানবহৃদয়ে এই যে আর একটি ভাব-লোক সৃজিত হইতেছে, তাহা নিখিল মানবের চিত্ত-লোক আশ্রয় করিয়া ক্রমিক গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সকল খণ্ড বিচ্ছিন্ন ভাব ধীরে এইরূপে একটি অখণ্ড ভাব গড়িয়া তুলিতেছে। তাহার সমগ্র প্রকাশটি আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইতেই পারে না। কিন্তু সমগ্র বিশ্বের সাহিত্যকে তাহার সকল অতীত সমেত যদি সমগ্ররূপে দেখি, তবে একটি অখণ্ড রূপের আভাস নিঃসংশয়ে ফুটিয়া উঠে।

বিশ্ব-মানব-হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া এইরূপে যে ভাব-লোকের ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতেছে, তাহা বহির্বিশ্বের সহিত একান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। মানুষ যুগে যুগে বিচিত্র কর্মের ভিতর দিয়া এই ভাবকেই বাহিরে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছে। ভাবের ধীর বিকাশ বা সম্পূর্ণতার সঙ্গে কর্মের ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিতেছে। তাহার প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সমাজ-চিন্তায়, রাষ্ট্র-চিন্তায়, বিচিত্র ধর্মনৈতিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তায়। মানুষের জ্ঞান সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। অর্থাৎ মানুষ জ্ঞান-জগতের বিচিত্র বিভাগকে মিলিত করিয়া ক্রমাগত উন্নততর সামঞ্জস্য বা মিলন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিতেছে। ওই সামঞ্জস্যের সহিত যাহা মিলিতেছে না তাহা কালে বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ভাব, চিন্তা ও কর্ম, অন্তর ও বাহির একত্রে মিলিত হইয়া এইরূপে একটি অখণ্ডতা লাভ করিতে চলিয়াছে।

ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনায় অখণ্ডতার কোন তত্ত্ব নাই। তাহার একদিকে জীবন, অন্যদিকে জীবনাতীত ; তাহার যে নামই দেওয়া হোক-না-কেন। তেমনি তাহার সাহিত্য-তত্ত্বানুশীলনের ক্ষেত্রেও এই একই ভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। অর্থাৎ মানবিক কোন একটি বোধকে (হৃদয় বা মানস-বৃত্তি) রস পরিণাম দান করিয়া তাহার একাত্মতা ও তন্ময়তার ভিতর দিয়া পরিণামে সকল

বোধের সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইবার চেষ্টাই সাহিত্যের পরা প্রাপ্তি বা শ্রেষ্ঠ ফললাভ হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় ভাব ও রূপ পরিণামে একাত্মতা লাভ করিয়া একটি অখণ্ডতার সৃষ্টি করিয়াছে। অর্থাৎ সাহিত্যে ভাবের সম্পূর্ণতার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে রূপের জগতেও ধীর সম্পূর্ণতা ঘটিয়া চলিয়াছে, পরিণামে এই ভাব ও রূপ একটি একাকারত্বে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবার জন্য।

সাহিত্যের লক্ষ্য তাই নিখিল বিশ্ব-মানব-হৃদয়ের মিলিত চেষ্টার শ্রেষ্ঠ রূপাদর্শ লাভ, তাহা কোন অরূপ তত্ত্ব নহে। এই শ্রেষ্ঠ রূপাদর্শের সহিত একদিন বহির্বিশ্বের রূপের মিলন ঘটিবে।

বিশ্বের সহিত মিলনবোধের ভিতর দিয়া তাহার জ্ঞানরাজ্যের সীমা ক্রমাগত প্রসার লাভ করিতেছে। এইরূপে জ্ঞানের প্রসারতার ভিতর দিয়া সে বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিশ্বকে ক্রমাগত আপনার করিয়া লইতেছে।

বিশ্বের সহিত হৃদয়বোধের ক্ষেত্রে যে মিলন, যাহাকে আমরা বলি সৌন্দর্য, তাহার সীমাও ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। এইরূপে সৌন্দর্যের প্রসারতার ভিতর দিয়া হৃদয়বোধের ক্ষেত্রে সে বিশ্বকে ক্রমাগত আপনার করিয়া লইতেছে। মধ্যে আমরা মানুষের হৃদয়বোধের এই ধীর প্রসারতার পরিচয় সাহিত্যে লাভ করি।

ব্যক্তি-মানুষ এইরূপে বিশ্বের সহিত যোগে বিশ্ব-মানবে পরিণাম লাভ করিতে চলিয়াছে;—যে মানুষ বিশ্বের সকল জ্ঞান, সকল প্রেম ও সৌন্দর্যের মধ্যে সকল কর্মের মধ্যে আপনার অব্যবহিত যোগ অনুভব করে।

নিখিল বিশ্বের মানুষ এই যে বিশ্ব-মানবতা লাভ করিতে চলিয়াছে, বিশ্বের সহিত বন্ধনে যে মহানন্দময় মুক্তি লাভ করিতে চলিয়াছে, তাহার সহিত নির্বাণ মুক্তির যে সুদূর কোন মিল নাই, তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। এই বিশ্বমানবতা সাহিত্যের লক্ষ্য। তাহাকে তাই মুক্তি-তত্ত্বের বা যোগ-তত্ত্বের সহিত মিলিত করিয়া পাঠ করিবার কোন উপায় নাই।

সাহিত্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিচারের তাই নূতন সূত্র প্রয়োজন। সে সূত্র হইল ব্যক্তির অনুভূত সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক, ব্যক্তির হৃদয়লোক, বিশ্বের সৌন্দর্য ও প্রেমলাভের কতখানি অনুকূল বা প্রতিকূল। বিশ্ব-হৃদয়ে হৃদয় সংযোগের এই ক্রমপ্রসারিত আবেগের প্রাবল্যে প্রতিকূল যে-কোন প্রেরণা একদিন লুপ্ত হইয়া যাইবে। অপকৃষ্ট সাহিত্যের রূপ এইরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া কালে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

পুনশ্চ

[১]

আমরা জানি কাব্য-রূপের পরিবর্তন ঘটে কবি-প্রেরণার পরিবর্তনের সঙ্গে। ইতিপূর্বে কবির কাব্যে তাহারই নানা প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। তবে সেই সকল প্রকাশ-রূপ ছন্দের বন্ধনকে কোন-না-কোন ভাবে স্বীকার করিয়াছে।

কিন্তু 'পুনশ্চ', 'শেষসপ্তক', 'পত্রপুট' এবং 'শ্যামলীর' মধ্যে পদ্যের সেই নিয়মিত ছন্দ-বন্ধনকে কবি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়া এমন একটি রূপ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন যাহার কোন পূর্ব পরিচয় কবির কাব্যে ছিল না। কবি ইহার নামকরণ করিয়াছেন গদ্য-কাব্য।

এই বিশিষ্ট প্রকাশ-রূপ আবিষ্কার চেষ্টার নানা কারণ কবি নির্দেশ করিয়াছেন, ইহার নূতনতর বিচিত্র সামর্থ্যের দিকের উল্লেখও তিনি করিয়াছেন। তাহার বিচার ও বিশ্লেষণ আমরা করিব না। এই নূতন রূপ সৃষ্টির ভিতর দিয়া কবির সেই আকাঙ্ক্ষা কতদূর চরিতার্থ হইয়াছে, সেই সকল নূতন সামর্থ্যের প্রকাশ তাহার মধ্যে কতদূর ঘটিয়াছে তাহার বহু বিচিত্র আলোচনার সহিত আমরা পরিচিত। এক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

নূতন কাব্য-রূপ সৃষ্টির নানা কারণের মধ্যে তিনি যে একটি কারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তাহা হইল, ইহার ভিতর দিয়া তিনি আপনার চেতনাবৃত্তকে ব্যাপকতর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। অর্থাৎ জীবনের এমন একটি দিক আছে, জগতের এমন উপাদান আছে, যাহার সত্য মূল্য স্বীকার করিতে গেলে কাব্যের প্রাচীন প্রকাশ-রূপকে অনিবার্যরূপে অস্বীকার করিতে হয়।

জীবনবোধের সেই নূতন দিকটি কি? এই বোধের প্রথম সঞ্চার এবং তাহার ধীর তীব্রতার একটি ধারা নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছি। কবির কাব্যে ইহারই একটি ধারা গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে। কবি সাধনারূপে যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে এই গভীরতা অনিবার্যরূপে জাগিবে।

তাহা জানি, ব্যক্তির সহিত বিশ্ব-সত্তার যোগ এবং ইহারই পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়া বিশ্বাতীতের সহিত মিলন লাভ। এখন বিশ্ব-সত্তা বলিতে কবি ইতিপূর্বে যাহা বুঝিয়াছিলেন প্রকৃতি ও মানব সংসারের কেবল মাধুর্যের ভাগ মাত্র। জীবনের বিচিত্র কঠিন প্রয়াসের কথা, তপস্যার কথা, দুঃখভোগের কথা, অপরাধের বিচিত্র কূটিল, স্বার্থের বিচিত্র ছলনা-জালের কথা যে ইতস্তত আত্মপ্রকাশ লাভ করে নাই তাহা নহে, তবে সৌন্দর্য কল্পনাই ফিরিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এই সৌন্দর্য ও মাধুর্য-লোক সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে কী অফুরান না হইয়া উঠিয়াছে। ইহার তুলনা বিশ্ব-সাহিত্যেও দুর্লভ।

বিশ্ব-সত্তা লাভকে জীবনে যদি সত্য করিয়া তুলিতে হয়, তবে বিশ্বের অন্তহীন বহু বিচিত্র বোধের সহিত ব্যক্তির চেতনাকে মুক্ত করিতেই হইবে। এই বহু বিচিত্র বোধের মধ্যে যাহা বিরূপ, যাহা কঠিন কঠোর, যাহা নিন্দিত, অবহেলিত, অস্বীকৃত, অননুভূত তাহার সহিত কবি-চেতনার যোগ কতটুকু সাধিত হইয়াছে! এই মৃত্যু-আকীর্ণ, দুঃখ-জর্জরিত, আর্ত মানব সংসারের ক্ষীণ আভাস মাত্র কবির কাব্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই বোধের জগতে জন্মলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হইতে তীব্রতর হইয়া, এই বোধের জগতে অনুপ্রবিষ্ট চেতনা-প্রবাহকে বিচিত্র হইতে বিচিত্রতর করিয়া কবি এমন একটি পরিণামে আসিয়া উপনীত হইয়াছেন যখন প্রাচীন কাব্য-রূপ এই বোধ প্রকাশে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ বলিয়া অনুভূত হয়। নূতন কাব্য-রূপ সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে কবিপ্রাণের মূল এই প্রেরণা ক্রিয়া করিয়াছে।

[২]

সমালোচকগণ এই বিষয়ে সকলেই একমত যে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য কোথাও কোথাও লক্ষ্য করিতে পারা গেলেও তাঁহার মূল জীবনবোধ, তাঁহার মানস-গঠন, তাঁহার কবি-প্রাণতার বৈশিষ্ট্যের মূলগত পরিবর্তন এতটুকু হয় নাই। যেখানে সাধারণ জীবনের তুচ্ছতা ও মালিন্যের কথা আছে সেখানে সেই সকল বিষয়বস্তুকে কবি যেন অত্যন্ত সচেতনভাবে আনয়ন করিয়াছেন, চিত্তের প্রসন্নতা তাহার সহিত মিশ্রিত হয় নাই।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রকাশ কচিৎ দেখা যায়। অধিকাংশ স্থলে কবি প্রয়াণ করিয়াছেন অতীত স্মৃতি-লোকে, কোথাও বা স্বপ্নের গভীরতায়। দৃষ্ট

সামগ্রী এবং প্রত্যক্ষ অনুভূত বিষয় এবং কবির মাঝখানে সকল সময় একটা ব্যবধান কোন-না-কোন রূপে থাকিয়া যায়। এই ব্যবধানটিকে কবি ভরিয়া তুলিয়াছেন আপনার বিচিত্র অতি সমৃদ্ধ কল্পনার সহায়তায়।

প্রকাশ রূপের সহজ সরল ভাবটি তো ফুটিয়া উঠে নাই, পরন্তু যে কয়েকটি স্থলে চমৎকারিত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেই সকল স্থলে রূপ-কল্পনা এতদূর সমৃদ্ধ, বাণী-বন্ধন এমনি দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে যে বলাকা কাব্যের সুদূরপ্রসারী ভাবগাম্ভীর্য ও কাঠিন্য তাহার নিকট হার মানে।

সুতরাং তাঁহাদের মতে কবির এই প্রয়াস, অসামান্য বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, তাঁহার স্বাভাবিক অতিসমৃদ্ধ কল্পনার ফলে (দুই চারিটি দৃষ্টান্ত ছাড়া) একপ্রকার ব্যর্থ হইয়াছে বলা চলে।

[৩]

রবীন্দ্রনাথ যে নূতন কালের সহিত যোগ অনুভব করিতে চাহিয়াছিলেন ছন্দের বন্ধন-মুক্তির ভিতর দিয়া, তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণে সমালোচকগণের মধ্যে নানা প্রমাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

নূতন কাল বলিতে তাঁহারা মোটামুটিভাবে জীবন ও জগতের অনিশ্চয়তা, প্রাচীন সকল বিশ্বাসবোধে বিলুপ্তি, অথচ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া নূতন কোন বিশ্বাসবোধের সঞ্চারের অভাব, ফলে চিত্তের শূন্যতাবোধ, এবং এই অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় সকল প্রকার চিরন্তন মূল্যের বিপর্যয়ের ফলে পাপ-পুণ্য, সদ্-অসদ্, উচ্চ-নীচ, মহৎ-তুচ্ছ সকল নিষেধ নিয়মের বেড়া ভাঙ্গিয়া একাকার হইয়া সর্বত্র যদৃচ্ছা বিহার করিয়া ফিরিতেছে। ইতিপূর্বে জীবনে যাহা পরিত্যক্ত, ধিক্‌কৃত ছিল নূতন কাল তাহাকেই যেন বিশেষ করিয়া বরণ করিয়া লইতে উৎসুক! রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতা যেন ইহাকেই প্রকাশ করিবার জন্য যেন সৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি পরে যেমন তাঁহার চিরন্তন সৌন্দর্য ও মহিমার লোকে, শাশ্বত মূল্যবোধের লোকে ফিরিয়া গিয়া আত্মস্থ হইয়াছেন, তেমনি সেই সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকাশ-রূপটিকেও পরিহার করিয়াছেন।

এখন নূতন কাল বলিতে রবীন্দ্রনাথ কী বুঝিতেন তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা প্রয়োজন। এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমরা ইতিপূর্বেও করিয়াছি। এক্ষেত্রে তাহার বিশিষ্ট কয়েকটি লক্ষণ নির্দেশ করা যাইতে পারে।

স্তর-বিন্যস্ত সমাজ-রূপ এবং তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে বিচিত্র ধর্ম ও দর্শন প্রাচীনকালে সকল দেশে কোন-না-কোন রূপে ছিল, তাহাতে ব্যক্তিকে তাহার যথার্থ স্বরূপে উপলব্ধি করা আদৌ সম্ভব ছিল না। সমাজ ও সম্প্রদায়ের একটি অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের অন্তরালে ব্যক্তির স্বকীয় বিশিষ্ট মহিমা আচ্ছন্ন হইয়া যাইত। এমনি কতকগুলি অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব যেমন নেশন, ধর্ম ও দর্শনের বিচিত্র সংস্কার ও অনুভূতি, বিচিত্র মতবাদ প্রভৃতিও ব্যক্তির সত্য-মূল্যকে উপলব্ধি করিবার পথে বৃহৎ অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল বহু-বিচিত্র জটিল অবচ্ছিন্ন তত্ত্বের বাহিরে না আসিতে পারিলে জীবন ও জগৎকে তাহার যথার্থ স্বরূপে উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। এই সকল তত্ত্ব-সূত্রে, সংস্কার-সূত্রে বাঁধা জীবনের যে প্রকাশ তাহা একান্ত সীমিত। ইহার বাহিরে জীবনের যে অনন্ত সম্ভাবনা, যে অসীম প্রসার তাহার কতটুকু দুই এক সহস্র বৎসর লব্ধ বোধের দ্বারা লাভ করিতে পারা গিয়াছে। জীবনের প্রসার বলিতে নিশ্চয়ই কবি-কল্পনার রোমান্টিক প্রসার বুঝাইতে চাই নাই। জীবন ও জগতের এই স্বরূপেই যে অনাবিষ্কৃত সংখ্যাতীত বোধের জগৎ আছে, তাহার কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছি। সেই নূতন কালের জন্ম হইতেছে বিপুল বিশ্ব জুড়িয়া। ইহার জন্য মানুষের তপস্যা আজ বহু বিচিত্র, অতি অসহনীয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

নূতন কাল বলিতে তাই অঘোরপন্থীদের মত কেবল কদর্যে আসক্তি বুঝায় না। নানা মোহের, নানা ছলনার, বহু বিচিত্র কুটিল আসক্তি ও স্বার্থের দ্বারা জীবনের সত্য রূপ আবৃত। এইগুলিই এক-একটি হিরণ্ময় পাত্র। এই হিরণ্ময় পাত্রগুলিকে উদ্ঘাটিত না করিতে পারিলে সত্যকে তাহার যথার্থ রূপে দেখিবার কোন সম্ভাবনা নাই।

সৌন্দর্য-তত্ত্বাশ্রয়ী বহুবিচিত্র-বোধ কবির বহু বিচিত্র মোহের মধ্যে একটি। আপনার উপলব্ধির এই অসম্পূর্ণতার কথা কবি নিঃসঙ্কোচে তাহার পরবর্তী কাব্য-ধারার ভিতর দিয়া নানা ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। বলিয়াছি, এই অপূর্ণতার পীড়া তাঁহার জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে।

জীবন ও জগতের এই অনাবিষ্কৃত ক্ষেত্রে চেতনাকে প্রসারিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় কবি নূতন বাণী-রূপ লাভ করিতে দুশ্চর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। এই নূতন বাণী-রূপ তিনি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন কি-না সেই সম্পর্কে নিঃসংশয় মন্তব্য প্রকাশের দিন আজও আসে নাই। এই প্রয়াস প্রথম দেখা দেয় তাহার

জীবনের অবসন্ন গোধূলিবেলায়। তাহার ফলে নূতন বোধের জগতে সম্পূর্ণ উত্তরণ তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই। সেইজন্য এই বাণী-রূপের পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে তিনি শীঘ্রই পরিহার করেন। তবে ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে, নূতন বোধের জগতে জন্মলাভের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহার অনেকটা মোহ-মুক্তি ঘটে। এই স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টির কতকটা প্রকাশ ঘটে পরবর্তী কালের কাব্য-ধারার ভিতর দিয়া। যে স্বচ্ছ নির্মোহ দৃষ্টির ভিতর দিয়া বৈদিক ঋষি-কবিদের মন্ত্র উচ্চারিত কবির কাব্য যে সেই মন্ত্র পরিণামমুখী হইয়া চলিয়াছে তাহা বোধ করিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি দিক উল্লেখ করা প্রয়োজন। নূতন বোধের জগতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য কবি একদিকে যেমন নূতন বাণী-রূপ লাভ করিতে নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তেমনি অন্যদিকে ঠিক এই প্রেরণার বশে একই সময়ে তাঁহার আর একটি সৃষ্টি-রূপের প্রকাশ ঘটে। আমিরা কবির চিত্র-রূপের কথা বলিতেছি। ইহা বিশ্বের অন্তহীন সত্তার প্রবাহকে নির্মোহ ভাবে প্রত্যক্ষ করিবার চেষ্টাও নয়। কেবল অস্তিত্বের গৌরব ঘোষণা করিবার চেষ্টাও ইহা নয়। রবীন্দ্রনাথের শিল্প-কলার সম্যক্ মূল্য বিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

মানব-সভ্যতার ঐতিহ্য রূপে তিনি রূপের যে বিচিত্র বোধ ও সংস্কার লাভ করিয়া তাহাকে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দান করেন, আপনার এবং বিশ্ব-সংস্কৃতির সেই চিরন্তন বোধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ভিতর দিয়া যে এই চিত্রশিল্পের উদ্ভব ঘটে, তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

কাব্যে এবং শিল্পে নূতনতর প্রকাশ-রূপ সৃষ্টির এই উভয়মুখীন চেষ্টার ভিতর দিয়া কবির সৃষ্টি যে অনেকটা স্বচ্ছ হইয়া আসে তাহা সত্য। সেই নিরাভরণ, অনলঙ্কৃত, বর্ণ-বিরল, একান্ত সহজ সরল, অথচ আশ্চর্য কঠিন অন্তস্তল বিশিষ্ট এবং অজ্ঞাত এক জগতের আলোক স্পষ্টে অত্যন্ত দীপ্ত।

[৪]

রবীন্দ্রনাথ আপনার অসম্পূর্ণতাকে কতটা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা বিচার না করিয়াও বলা যায় যে ইহার ভিতর দিয়া তিনি যে অনাবিষ্কৃত দেশটির প্রতি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা পরবর্তী কোন ভাস্বর প্রতিভা-সম্পন্ন কবির দৃষ্টিতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত হইবে তাহাতে সংশয় নাই।

জীবনের অন্তিম পর্যায়ে তিনি তাঁহাকেই ফিরিয়া ফিরিয়া আহ্বান জানাইয়াছেন। সেই অনাগত কালের কবির উদ্দেশ্যে তিনি আপনার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।

মানব-বোধের এই প্রসারতা সাধনের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম বাধা শ্রেণী-বিন্যস্ত সমাজের বোধ। আদিতে মানুষকে এই বোধ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিতে হইবে। তাহার পর হইতে নিত্য নূতন সমস্ত বৈচিত্র্য পূর্ণ সম্ভাবনার দ্বার একের পর এক উদ্ঘাটিত হইয়া যাইবে। মানুষ যে সর্বমেবাধিশন্তি তাহা তখনই সার্থক হইবে। ইহাই লক্ষ্য। এই লক্ষ্যাভিমুখীন হইয়া মানুষের চির অভিসার।

[৫]

কাব্যের প্রকাশ-রূপ লইয়া রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। এই যে নিত্য নব রূপ-সৃষ্টির ব্যাকুলতা ইহার ভিতর দিয়া তিনি পরিণামে এমন একটি প্রকাশ-রূপ লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন যাহার সহায়তায় জীবন ও জগতের চরম রহস্যটিকে প্রকাশ করা সম্ভব। ইহা যেমন তাঁহার জীবনের মূল আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা তেমনি তিনি মূলত কবি বলিয়া সেই বিচিত্র আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে প্রকাশ-রূপও নিত্য নব রূপতা লাভ করিয়াছে।

এই সম্পর্কে Hermann Broch-এর একটি সারগর্ভ আলোচনার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"পরিণত রচনারীতি বলিতে সকল সময় পরিণত বয়সের রচনা বোঝায় না, শিল্পীর এই বিশিষ্ট ক্ষমতা অন্যান্য ক্ষমতার সহিত বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিণতি লাভ করিতে পারে, কখন কখন মৃত্যুর ছায়ায় পরিণত বয়সের পূর্বেই ইহার প্রকাশ ঘটে, কখনও বা বয়স ও মৃত্যুর আবির্ভাব ছাড়া ইহার প্রকাশ ঘটে। ইহা প্রকাশের নূতন স্তরে উত্তরণ, যেমন টিসিয়ানের সকল অনুবিদ্ধকারী আলোকের আবিষ্কার,—ইহা মানবিক দেহ ও আত্মাকে একটি উন্নততর সুষমায় বিগলিত করিয়া দিয়াছে, অথবা রেমব্রাণ্ড এবং গোয়া,—তাঁহারা পরিণত বয়সে মনুষ্য এবং বস্তুর প্রত্যক্ষ রূপের অন্তরালে যে তাত্ত্বিক স্তর আবিষ্কার করেন তাহাকেই তাঁহারা চিত্রিত করিয়াছেন, অথবা যেমন 'Art of the Fugue'। ইহাকে ব্যাক তাঁহার পরিণত বয়সে মনে কোন বাস্তব যন্ত্র না লইয়াই মুখে বলিয়া

গিয়াছিলেন, কারণ তিনি যাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সঙ্গীতের শ্রুতি-স্তরের হয় নিম্নে নতুবা অতীতে, অথবা যেমন বিঠোফেনের শেষ গীতি-চতুষ্টয়গুলির (Quartets) মধ্যে। তিনি মৃত্যুর পূর্বে কাছাকাছি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে পার্থিব সঙ্গীত হইতে অপার্থিব সঙ্গীতের পথ খুঁজিয়া পান; অথবা যেমন গেটের শেষ লেখা; দৃষ্টান্তস্বরূপ ফাউস্টের শেষ কয়েকটি দৃশ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে, সেখানে ভাষা তাহার আপন রহস্য, এইরূপে সকল অস্তিত্বের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে।

এই বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সামান্য ধর্মটি কি? ইহার প্রত্যেকটি প্রকাশরীতির একটি আমূল পরিবর্তন সূচনা করে, ইহা মূল ধারার কেবল বিকাশ নয়, এবং এই রচনাগত গভীর পরিবর্তনকে অমূর্তের রীতি রূপে বর্ণনা করা যায়। এই অমূর্তের মধ্যে প্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দের উপর নির্ভরতা ক্রমেই হ্রাস পাইতে থাকে, এইরূপে অবশেষে কয়েকটি মূল প্রতীকে পরিণতি লাভ করে, এবং ক্রমাগত গভীরভাবে বাক্যবিন্যাসের উপর নির্ভর করিতে থাকে। কারণ অমূর্ততা বলিতে মূল এই কথাটি বুঝায়:—শব্দাবলীর উৎকর্ষ, প্রকাশের বাক্য-বিন্যাসগত সম্পর্কের সমৃদ্ধি। গণিতে শব্দাবলী একেবারেই থাকে না, এবং প্রকাশপদ্ধতি কেবলমাত্র পদ-বিন্যাসের উপর নির্ভর করে।

* * *

যে শিল্পীর মধ্যে পরিণত রচনারীতির সম্ভাবনা আছে তিনি যুগলব্ধ প্রচলিত শব্দাবলীতে সন্তুষ্ট হন না। যুগ সৃষ্টি করিবার জন্যই তিনি ইহার মধ্যে থাকিতে পারেন না। ইহার বাহিরে তাহাকে একটা কিছু অন্বেষণ করিতে হয়। ইহা তাঁহার নিকট প্রায় একটা কলাকৌশল-জাত সমস্যা বলিয়া বোধ হয়, প্রচলিত শব্দাবলীকে ভাঙ্গিবার সমস্যা এবং ইহার পদ-বিন্যাসগত মূল হইতে আপনার শব্দাবলী গড়িয়া তোলা। তাঁহার প্রধান, কখন কখন তাঁহার একমাত্র সম্পর্ক হইল শিল্প-নিপুণতার।

* * *

কিন্তু যদিও শিল্পীর সমস্যা প্রধানত মনে হয় কলাকৌশলগত, তাহার প্রকৃত প্রবণতা ইহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, ইহা যায় বিশ্বে এবং যথার্থ শিল্প, এমনকি যদি ইহা সংক্ষিপ্ততম গীতি-কবিতা হয়, অনিবার্যরূপে সর্বদা জগতের সমগ্রতাকে আবেষ্টন করে। ঐ জগতের অবশ্যম্ভাবী দর্পণ হয়, অবশ্য সম্পূর্ণ বিপরীত ওজনের একটি। প্রকৃত শিল্পী মাত্রেই ইহা অনুভব করেন, কিন্তু

পরিণত বয়সের শিল্পীর দ্বারা ইহা সৃষ্টিগতভাবেই অনুভূত। যাঁহারা প্রচলিত শব্দাবলীর মধ্যে আবদ্ধ, ইহার বিষয়বস্তুর পরিচিত সমৃদ্ধির দ্বারা প্রলুব্ধ, তাঁহারা যতই তাহাদের শিল্পকে প্রসারিত করুন না কেন, এবং এইরূপে অপরিমিত প্রাচুর্যে পৌছান না কেন, প্রকৃত লক্ষ্যে কখনোই পৌছাইতে পারেন না। তিল তিল করিয়া মানুষ বিশ্বকে লাভ করিতে পারে না। মানুষ ইহার মূল এবং প্রয়োজনীয় তত্ত্বের সহায়তায় ইহাকে লাভ করিতে পারে। ইহার মূল এবং ইহাকে গাণিতিক কাঠামো বলা যায়; এবং এইখানে এইরূপ চরম তত্ত্বের অমূর্ততা কলাকৌশলগত সমস্যার অমূর্ততার সঙ্গে হাত মেলায়। এই মিলন পরিণত রচনারীতি গড়িয়া তুলে।

[৬]

সাহিত্যের এই নূতন প্রকাশ-রূপের সামর্থ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গে যে নানা মন্তব্য করিয়াছেন, আমরা সেই সকল মন্তব্যের সহিত পরিচিত। তাহাতে প্রাচীন ও আধুনিক আলঙ্কারিকগণ গদ্য ও পদ্যের যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন তাহার মূল্য নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। নিম্নে সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি।

কাব্যে কবি যে ভাষা ব্যবহার করেন তাহা প্রচলিত, প্রাপ্ত ভাষা নয়। আমাদের নিত্য দিনের ব্যবহৃত এবং আলোচিত ভাষার মধ্যে তাহা প্রথম বারের মত উচ্চারিত। কবিতা লব্ধ উপাদানের ন্যায় ভাষাকে গ্রহণ করে না,- বরং বলা যায় কবিতা প্রথম ভাষা সৃষ্টি করে।

গদ্য ও পদ্য উভয় জাতীয় রচনার মধ্যে ছন্দ থাকিলেও কবিতার ছন্দ নিয়মিতির দিকে ঝোঁক নেয়, এবং ইহার সর্বদা একটি নিয়মিত ছন্দ-রূপ থাকে। কিন্তু গদ্যকে যদি আদৌ পদ্য হইতে পৃথক করিতে হয় তবে তাহার মধ্যে ছন্দের কোন রূপের নিয়মিতি অসম্ভব। গদ্যের ছন্দ বাক্য গঠন বিধি সংক্রান্ত এবং বৈয়াকরণিক রূপের অধীন, ইহার লক্ষ্য সুস্পষ্টতা এবং সঙ্গতি। অন্যদিকে কবিতার ছন্দ নন্দন তত্ত্বাশ্রয়ী এবং চৈতন্যময় অবস্থার জন্য স্বরের সম্পর্ক অন্বেষণের অন্তর্নিহিত প্রয়োজনের দ্বারা স্থিরীকৃত। এই অবস্থায় যাহা রূপলব্ধ তাহা সকল সময় যুক্তিসঙ্গত এমনকি উপলব্ধিগম্য হয় না।

গদ্য একটি বিশেষ অবস্থার ব্যাখ্যা ও চিন্তন: ইহা কোন একটি বিশেষ ভাবনাকে অথবা কোন বিক্ষিপ্ত বিশ্বজনীন অস্পষ্ট বা অস্ফুট ভাবনাকে সংহতি

দান করিতে পারে। অন্যদিকে কবিতা উদ্ঘাটন বা আবিষ্কার বলিয়া ইহার রূপান্তর সাধন অসম্ভব।

কবিতা একটি সংহত রূপ। সুদীর্ঘ কবিতার মধ্যে আকৃতিগত বিভাগ আছে, প্রত্যেকটি এক-একটি সংহত রূপ এবং এই সকল রূপ একত্র মিলিত হইয়া একটি সমগ্রতার বা অখণ্ডতার বোধ জাগ্রত করে।

কবিতার মধ্যে কেবল সুর থাকে না, কবিতা এই সকল ছন্দময় রূপের একটি অখণ্ড প্রকাশ। এই সকল ছন্দময় রূপ কাব্যের চিত্র-রূপগুলির সহিত সম্পর্কান্বিত।

চিত্র বা সঙ্গীতের ন্যায় কবিতার একটি অনন্যসাধারণ রূপ আছে। ইহা রূপ-কল্পনা এবং সুরের একটি সমন্বয়। এই রূপ শিল্পীর অনুভূতির একটি মূর্ত্য প্রকাশ এবং যে অর্থ প্রকাশ করে তাহা প্রযুক্ত সকল শব্দের যথাযথ অর্থের মিলিত প্রকাশ নয়। কবিতা গদ্য হইতে কেবল পৃথক নয়, ইহার গদ্য রূপ অপেক্ষা অনেক বেশি তাৎপর্যমণ্ডিত। ইহার একটি দেহ-রূপ আছে একটি সঙ্গীতময় বাহ্যিক গঠন। প্রত্যেকটি পংক্তি এবং স্তবকের এমন একটি ধ্বনি-রূপ আছে, যাহাকে কবিতার বিষয়বস্তুর ভাষা রূপ হইতে পৃথক করা যায়। যখন বিচ্ছিন্ন করা যায় তখন এই ধ্বনি-রূপের একটি প্রকাশময় ক্রিয়া থাকে।

এই সম্পর্কে নবম শতকের আলঙ্কারিক এবং দার্শনিক আনন্দবর্ধন যাহা আলোচনা করেন, এবং তাঁহার টীকায় অভিনব গুপ্ত প্রায় দেড় শত বৎসর পরে যে মন্তব্য করেন পরবর্তীকালের ভারতীয় আলঙ্কারিকগণ মোটামুটি ভাবে তাহাকে সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন কাব্যের ভাষা গদ্যের ভাষা হইতে পৃথক। কবিতার ভাষা পাঠকচিত্তে যে ভাব সঞ্চার করে, যে সৌন্দর্যবোধ, তাহা গদ্যে নাই। গদ্যের ভাষা সম্পূর্ণরূপে তথ্যমূলক এবং শিক্ষা-মূলক। ভারতীয় আলঙ্কারিকদের মতে গদ্যের শব্দের তিন প্রকার শক্তি আছে ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান অভিধা-শক্তি। নিঃসন্দেহে সৌন্দর্যতত্ত্বের উপলব্ধিকে অভিধা-শক্তির সীমায় সীমিত করা যায় না।

আনন্দবর্ধন সৌন্দর্যতত্ত্বের উপলব্ধিকে এমন একটি বৃত্তি বলিয়াছেন, যাহা প্রচলিত বোধ অপেক্ষা ভিন্নতর বোধের প্রকাশ ঘটায়। এই নূতন বোধটিই রস এবং ধ্বনিকারগণ ইহারই নাম দিয়াছেন ধ্বনি বা রসধ্বনি। এই টীকার মধ্যে অভিনব গুপ্ত শব্দ ও রসের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা

কার্য ও কারণের সম্পর্কে নয়, প্রকাশরূপ এবং প্রকাশিত বিষয়ের মধ্যে তাত্ত্বিক সম্পর্ক নয়, ইহা প্রকাশ ও প্রকাশকের সম্পর্ক।

কাব্যের শব্দের দ্বারা প্রকাশিত সৌন্দর্যতত্ত্বের উপলব্ধি পূর্বের বা পরের অভিনব গুপ্ত বলেন, গদ্যের শব্দ তথ্যের বাহন মাত্র, এবং এই কার্য সমাধা বোধের কার্য-কারণ-ক্রমে উদ্ভূত নয়, সংসারের প্রাত্যহিক জীবন হইতে উত্তরণ। হইলে গদ্যের শব্দের আর কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। বিপরীত ভাবে পদ্যের শব্দ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ এবং পাঠ সমাপ্ত হইলে অথবা রস আস্বাদিত হইয়া গেলেও তাহার স্বকীয় মূল্যের কিছুমাত্র হ্রাস ঘটে না।

অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হইতে সকল শিল্প জন্মলাভ করে। এই সাক্ষাৎকার জ্ঞানের সহিত একাত্মীভূত এবং যখন সচেতনভাবে বিষয়ীকৃত হয় কেবলমাত্র তখনই ইহা সম্পূর্ণরূপে বজায় থাকে। অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের এই ক্রিয়া তন্ময়ীভূত মনের একটি অবস্থা মাত্র।

কাব্য একদিকে এই সাক্ষাৎকারকে সামগ্রিকভাবে রক্ষা করে এবং অন্যদিকে ইহাকে শব্দের সহায়তায় প্রকাশ করে। গদ্যে শব্দগুলি সাধারণত একটি মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ। কাব্যে শব্দগুলি অনিবার্য পরিণামে অথবা ছন্দ রূপে সজ্জিত হয়, যে পর্যন্ত-না কবির তীব্র মানসিক অবস্থা অনুরূপ প্রকাশ-রূপের দ্বারা নিঃশেষিত বা নিঃসারিত হয়। কাব্যকে তাই গদ্যে রূপান্তরিত করা যায় না। প্রকাশের উভয়বিধ রূপ সম্পূর্ণ পৃথক, আমাদের যে-কোন একটিকে অনিবার্য রূপে স্বীকার করিয়া লইতে হয়। গদ্য রূপাত্মক হইতে পারে, কিন্তু কাব্য অপরোক্ষ সাক্ষাৎকারের রূপময় প্রকাশ।

[৭]

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবির অন্তরে প্রাণের অনুভূতি যত ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, কবির কাব্য-প্রতিভাও তত ম্লান হইয়া পড়িতেছে।

'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি রচনাকালে কবির প্রাণের অনুভূতিকে যদি প্রমত্তা পদ্মার সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে কবির অন্তরে প্রাণের এখনকার অনুভূতিকে 'কোপাই'য়ের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। 'কোপাই'য়ের সৌন্দর্য-সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া প্রাণে যে অনুভূতির সঞ্চার হয় তাহা প্রকাশ করিতে গিয়া আজ তাই কবির পদ্মার কথা মনে পড়িয়া যায়—যৌবনের কত দিন-রজনীর কত সুখ-দুঃখের সঙ্গী।

একদিকে পদ্মা

"ও স্বতন্ত্র। লোকালয়ের পাশ দিয়ে চলে যায়,
তাদের সহ্য করে স্বীকার করে না।
বিশুদ্ধতার আভিজাতিক ছন্দে
একদিকে নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর একদিকে নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান।"
(কোপাই)

পদ্মার এই বর্ণনার মধ্যে কবির প্রতিভা-প্রদীপ্ত যৌবনে রচিত কাব্যধর্মের নিগূঢ় পরিচয় লাভ করা যায়। সেই নিগূঢ় ধর্মের স্বরূপ কি? অন্ততঃ কবি আপনার কাব্যের কোন স্বরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন?

যে প্রাণ বিশ্বকে অতিক্রম করিয়া সকল রূপের কূল ছাপাইয়া অনন্তের অভিমুখে দুর্নিবার বেগে ছুটিয়া চলে কবির যৌবনে রচিত কাব্যে প্রাণের সেই জাতীয় প্রেরণা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

জীবনে সীমার দিকটিকে সহ্য করিতে হয়, সহ্য করিতে হয় ইহার সকল বন্ধন-দশা, তুচ্ছতা ও মালিন্য। কিন্তু কবি জীবনের এই স্বরূপকে স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি জানিতেন এই সকল সীমা-বোধকে ছাড়াইয়া জীবন অনন্ত বিস্তৃত। অসীমের জন্য তাঁহার প্রাণ নিত্য দীপ্ত হুতাশন জ্বালাইয়া বসিয়াছিল। আর এই মহাভাবকে প্রকাশ করিতে সেদিন কবির কাব্যে ছিল বিশুদ্ধ আভিজাতিক ছন্দ।

তাঁহার কাব্যে একদিকে ছিল নির্জন পর্বতের স্মৃতি, আর অন্যদিকে ছিল নিঃসঙ্গ সমুদ্রের আহ্বান। অর্থাৎ সেদিনের কাব্যের মধ্যে সকল বস্তুভার সত্ত্বেও ছিল আশ্চর্য নিরাসক্তি, অতি তীব্র বৈরাগ্য। সে কাব্যের আদিতে ও অন্তে অর্থাৎ সমগ্র কাব্য ব্যাপিয়া ছিল অমর্ত্য-লোক লাভের অতি প্রবল অভীপ্সা।

সৃষ্টি-লোক ব্যাপ্ত অন্তহীন প্রাণ-স্পন্দনের একদিকে চিরস্থির শাশ্বত দিব্য-চেতনা-লোক, অন্যদিকে চেতনার সর্বশেষ পরিণাম, জড়লোক। সৃষ্টির অনন্ত প্রাণ-ধারার সহিত কবির চেতনাও সেকালে একপ্রকার সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছিল।

অন্যদিকে কোপাই—

"বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো
ভাঙ্গে না ডোবায় না,

ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা
দুই তীরকে ঠেলা দিয়ে দিয়ে
উচ্চ হেসে বয়ে চলে।" (কোপাই)

আজ কবির প্রাণের অনুভূতি যখন সর্বাধিক তীব্র হয়, তখন হয়ত বর্ষার দুই কূল পরিপূর্ণ 'কোপাই'য়ের মত অমনি একপ্রকার গতি ও বিস্তার লাভ করে, তাহা ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বে মহাব্যাপ্তি লাভ করিতে পারে না। অচিন্তনীয় বিপুল বিশ্ব-প্রাণ-প্রবাহ কবির চেতনায় আজ 'কোপাই'য়ের মত ক্ষীণ এক ধারায় প্রবাহিত।

তাহাতে অন্তরের গভীর উদাত্ত মহান্ বৈরাগ্যের ওঙ্কার ধ্বনি নাই। প্রাণের সে প্রবাহে অসীমের ছায়াপাত ঘটে না। আজ কবির প্রাণ-প্রবাহ একান্ত ক্ষীণ, আসক্তির নানা বাধা-বন্ধনে মন্থর, সহস্র তুচ্ছতাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া তাহাদের ছায়া বক্ষে লইয়া করুণ রোল তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে প্রাণের এই অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সাক্ষাৎকারও কেমন ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

আমি এক্ষেত্রে আরও একটি কবিতার উল্লেখ করিতেছি, তাহাতে কবির এই অধ্যাত্ম-পরিণামটিকে আর একদিক দিয়া বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

বিশ্বের সহিত নিবিড় মিলনের ভিতর দিয়া, বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় আপনার প্রাণের যোগের ভিতর দিয়াই কবি সৃষ্টি-প্রেরণা বোধ করিতেন। আজ কবি সেই প্রাণ-ধারাকে অন্তরে গভীর করিয়া সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারিতেছেন না। বিচ্ছিন্ন সত্তার নিঃসঙ্গ বোধে সৃষ্টি-প্রেরণা শূন্য হইয়া কবি জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিতে চাহিয়াছেন।

"কাল আপনার পায়ের চিহ্ন যায় মুছে মুছে,
স্মৃতির বোঝা আমরাই বা জমাই কেন,
একদিনের দায় টানি কেন আর একদিনের পরে,
দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে হাতে হাতে
ছুটি নিয়ে যাই না কেন সামনের দিকে চেয়ে।" (নূতন কাল)

বলিয়াছি, প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও প্রেম সম্ভোগের দিন, প্রাণের যোগে প্রাণ আস্বাদের দিন কবির জীবনে একপ্রকার অবসিত হইয়াছে।

প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সামর্থ্য ধীরে ধীরে কমিয়া বাহিরের যোগ অনিবার্য রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বাহিরের যোগ বিচ্ছিন্ন হয় কিন্তু মনের বন্ধন ঘুচে না। মন তখন অতীত স্মৃতির ওই সঞ্চয় লইয়া তাহাকেই গভীর মমতায় জড়াইয়া ধরে। স্মৃতির ওই সঞ্চয় তখন কাব্যের একমাত্র বিষয়বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। কবির কাব্য-জীবনে এই পরিণামও আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

কিন্তু ধীরে ধীরে এই স্মৃতিও ম্লান হইয়া আসিতে থাকে। তখন জীবনে অবশেষ থাকে শুধু অন্তহীন বেদনার ভার, যাহাকে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারা যায় না। তাহার পর একদিন জীবন-দীপ অকস্মাৎ নির্বাপিত হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের এই নিয়তি-রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জীবনের এই রূপাশ্রয়ী সাধনাকে তাই তিনি পরিহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু পরিহার করা কবির জীবনে ঘটিল না। কেন ঘটিল না তাহার কারণও কবি নির্দেশ করিয়াছেন।

"দরজার কাছ পর্যন্ত এসে যখন ফিরে তাকাই,
তখন দেখি তুমি যে আছ
একালের আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে।" (নূতন কাল)

এই 'তুমি' কে? 'তুমি' বলিতে রবীন্দ্রনাথ কাহাকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন? সৌন্দর্য ও প্রেমের যে বোধ আশ্রয় করিয়া কবি বিশ্ব-প্রাণের স্পর্শ লাভ করিতেন, সেই প্রাণের যে ক্ষীণ ধারা আজও তাঁহার অন্তরে আছে এবং উহাকে আশ্রয় করিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের যোগে বিশ্ব-প্রাণ-ধারার যে ক্ষীণ অনুভূতি আজও তিনি লাভ করেন তাহারই আকর্ষণের কথাই তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন।

এই 'তুমি' বিশ্ব-প্রাণ-ধারাই বটে, সৌন্দর্য ও প্রেম রূপে যাহার অনুভূতি অন্তরে আসিয়া পৌছায়। কবি এই প্রাণের সৌন্দর্য ও প্রেমের এই সাধনাকে এক্ষেত্রে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

জীবনের তুইটি সাধন-ধারা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটি রূপাশ্রয়ী, জীবনের সকল পর্যায়ে এই রূপকেই কোন-না-কোন স্বরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া। আর একটি সাধনা রূপকে উত্তীর্ণ হইয়া অরূপকে লাভ করিতে চাহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ এই রূপের সাধনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অরূপ

চেতনাধিষ্ঠিত হইয়া জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ প্রকাশ পাক-না-কেন, তাহা যত অপরূপ, যত দুর্লভ হোক, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে পরিহার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের নিকট এই রূপের জগৎ, এই স্বরূপেই দুর্লভতম, উহারই রসাস্বাদ দিব্য-চেতনার আনন্দ আস্বাদ অপেক্ষাও মহৎ। সেই রস-সাধনার নাম রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দিয়াছেন প্রেম।

"দিনের শেষে নূতন পালা আবার করেছি শুরু
তোমারি মুখ চেয়ে,
ভালোবাসার দোহাই মেনে।" (নূতন কাল)

মর্ত্যের এই 'ভালোবাসা' অমর্ত্য-প্রীতি অপেক্ষাও দুর্লভ! এই 'ভালোবাসার' স্বরূপটিকে তাই আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে।

বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-ধারা সৌন্দর্য ও প্রেম রূপে কবির অন্তরে যত ক্ষীণ ভাবে হোক আজও তো অনুভূত হয়। ওই অনুভূতিকেই তিনি তাঁহার কবি-জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানা ভাবে প্রকাশ করিয়া যাইবেন। কিন্তু কাব্য-রচনার ওই প্রয়াসের কালে কবি দেখিলেন—

"তুমি গেলে সেই খানেই
যেখানে আমার পুরানো কাল অবগুণ্ঠিত মুখে চলে গেল,
যেখানে পুরাতনের গান রয়েছে চিরন্তন হয়ে।" (নূতন কাল)

ইহার অর্থ কি? সৌন্দর্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়া যে প্রাণের অনুভূতি তাহা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে কবি-চেতনাকে বিশ্ব-চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়াছে, আমরা তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছি। অনুভূতির এই ধীর পরিণাম এবং বিশ্ব-চেতনার আভাস লাভের মধ্যেই কবির সার্থক কাব্য-সৃষ্টি।

সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্য দিয়া প্রেমের যে বিকাশ ঘটে তাহা যদি পরিণামে বিশ্ব-চেতনায় পরম বিস্তার লাভ না করে, তাহা হইলে আসক্তি প্রবল হইয়া চিত্তের বন্ধন সৃষ্টি করে।

পরিণত যৌবনে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে অনুভূতি কবির প্রাণ-ধারাকে বিশ্ব-প্রাণ-ধারায় যুক্ত করিয়া দিয়াছিল; ('তুমি'র আসঙ্গ লাভ ঘটিয়াছিল) সুপরিণত বয়সে তাহা আর ওই পরিণাম লাভ ঘটায় না বলিয়া 'তুমি'র সহিত মিলন বোধটাও নাই।

যৌবনে বিশ্ব-প্রাণের যোগে কবির যে সার্থক কাব্য-সৃষ্টি-প্রেরণা, তাহা এই কালে একপ্রকার নিরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। একালে সৌন্দর্য ও প্রেমের

অনুভূতিটি আছে বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম নাই, আজ তাহা কেবল বন্ধন মাত্র। অধ্যাত্ম-সত্তা এবং তাহারই যোগে বিশ্ব-সত্তার সহিত মিলনের পরিচয় বহন করিয়া আছে কবির অতীত কালের কাব্য।

বিশ্ব-চেতনা লাভের এই পরিণামটিকে যদি স্পষ্ট করিয়া লইতে পারি, তাহা হইলে কবির কাব্য পাঠে সুবিধা হইবে। বস্তুতঃ ইহা ছাড়া আর ভিন্ন পথ নাই।

'পুনশ্চে'র মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের এই বিশিষ্ট ধর্ম বর্তমানে কবি-প্রাণের কোন্ পরিণামের ফলে সম্ভব হইয়াছে তাহাই কেবল বুঝিতে হইবে।

অলস তপ্ত মধ্যাহ্নে পুকুরের স্থির কালো জলের বিস্তারের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কবির বুকের ভিতর গোপন কোন এক বেদনা জাগে। আর এই বেদনার ভিতর দিয়া কবির স্মৃতি-লোক উদ্বেল হইয়া উঠে।

স্মৃতিটাও খুব স্পষ্ট নয়। সব ঘিরিয়া বেদনার একটা চকিত আভাস। যে আলেখ্যটি স্মৃতি-লোক মথিত করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি।
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
ছুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে,
সে আঙ্গিনাতে আসন বিছিয়ে দেয়,
সে আঁচল দিয়ে ধূলো দেয় মুছিয়ে,
সে আম কাঁঠালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে শজনের ডালে,
ফিঙে লেজ ছুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।
যখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি
সে ভালো করে কিছু বলতে পারে না,
কপাট অল্প একটু ফাঁক করে পথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে,
চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।" (পুকুরের ধারে)

সৌন্দর্য ও প্রেমের মমতা বিজড়িত সকরুণ একটি ছবি! কবির প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও প্রেম আস্বাদের জীবন অবসিত হইয়াছে। তাই অমন করিয়া অতীত স্মৃতির মণি-মঞ্জুষা খুলিয়া তাহাদের একটি একটি করিয়া অঙ্গুলিপ্রান্তে তুলিয়া

গভীর মমতায় ঘুয়াইয়া ঘুরাইয়া দেখেন। প্রত্যক্ষভাবে তাহাদের লাভ করিবার উপায় নাই। দেখিতে দেখিতে মন উদাস হইয়া যায়। শিথিল অঙ্গুলিপ্রান্ত হইতে স্মৃতির মুক্তা-খণ্ডটুকু খসিয়া পড়ে। চোখের জলে দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে। অবশেষে থাকে কেবল এক অসহায় শূন্যতা-বোধ।

এই সৌন্দর্য-ধ্যানের মধ্যে দুটি দিক প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক অপরটি ওই লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিবার বেদনা।

এই সৌন্দর্য ও প্রেমের লোক আবার কবির স্মৃতি-লোক। কবির যৌবনে সৌন্দর্য ও প্রেম-লোক সৃষ্টির যে পরিচয় লাভ করিয়াছি তাহার মধ্যেও এক-প্রকার বেদনা-বোধ বিজড়িত ছিল। সেদিনের সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান এবং বিরহ-বোধের মধ্যে আজিকার সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান ও বিরহের পার্থক্য আছে।

তাহা প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা বলিয়া শুধু নয়, সেই পিপাসা দেখিতে দেখিতে আর এক পিপাসায় রূপান্তরিত হইয়া যাইত। সকল রূপের পশ্চাতে যে অরূপ, শাশ্বত, চিরস্থির চেতনা, রবীন্দ্রনাথ যাহাকে অনন্ত বা অখণ্ড সৌন্দর্য-লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ফলে সৌন্দর্য ও প্রেম-লীলার যে অলৌকিক ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহার কোন প্রকাশ যে কবির একালের কাব্যে নাই তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

ওই লোক-লাভের সেই আশ্চর্য প্রেরণা কোথাও একটা দুর্বার আবেগরূপে স্বর্গে ও মর্ত্যে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে রূপ বিহার করিয়া ফিরিয়াছে। কবি-প্রাণের বেদনা যেন একেবারে সৃষ্টির মর্মমূলে ধ্বনিত হইয়াছে। সেই কান্নার সুরে সৃষ্টির কান্নার সুর মিলিয়াছে। সেই একাত্মতার ভিতর দিয়াই কবি বোধ করিতেন, "অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া দুলিছে যেন"। অনন্ত বা অসীমকে লাভ করিবার প্রেরণায় সেদিন ব্যক্তি ও বিশ্ব একাকার হইয়া যাইত।

সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানের মধ্যে আজ কবির বেদনা মিশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা মানুষের সেই পূর্ণতা লাভের শাশ্বত কান্নার বিশিষ্ট প্রকাশ নয়। এই কান্না আসক্তির রূপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য নয়, রূপকে মমতায় বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার জন্য।

জগৎ ও জীবনের যতটুকু স্পর্শ, প্রাণের যতটুকু সাড়া কবি আজ অন্তরে বোধ করেন, তাহা স্মৃতি-লোকের ভিতর দিয়া—অতীত দিনের কত সুখ-দুঃখ-মথিত অমৃত সঞ্চয়।

"মনে আনবার অনেক দিন ক্ষণ আমারো আছে,
অনেক কথা অনেক দুঃখ।
তার ফাঁকের ভিতর দিয়েই
নূতন বসন্তের হাওয়া আসে
রজনীগন্ধার গন্ধে বিষণ্ণ হয়ে।" (ফাঁক)

সেই স্মৃতির বিষামৃত বক্ষে বহন করিয়া কবি জগৎ ও জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। জীবনের সেই চিরন্তন নিত্য পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা। তাহা আজও বহিয়া চলিয়াছে। সেই লীলার জগৎ হইতে কবি কত দূরে সরিয়া আসিয়াছেন। মাঝখানে যেন অন্তহীন পথ। তাহার ওপার হইতে ওই জীবনের মিনতি-মাখান অতি করুণ আহ্বান-ইঙ্গিত আসে। কবি কেমন করিয়া উহার সহিত মিলিত হইবেন। বক্ষের সমস্ত পঞ্জর জীর্ণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আসে।

"তারি ফাঁকের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই
লিখছে চিঠি নূতন বধূ
ফেলছে ছিঁড়ে, লিখছে আবার।
একটুখানি হাসি দেখা দেয় আমার মুখে
আবার একটুখানি নিঃশ্বাসও পড়ে।" (ফাঁক)

প্রত্যক্ষ জীবনের এই রিক্ততা বঞ্চনা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কবি মনে মনে সৌন্দর্য-লোক সৃজন করিয়া তাহাতে প্রাণের অতবড় শূন্যতা ভরাইয়া তুলিতে চাহিয়াছেন।

জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ যোগে, প্রাণের সহিত প্রাণের তীব্রতম আসঙ্গে কবির এই সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি নয়। তাহা জীবনের প্রতিরূপ নয় (যে স্বরূপ হোক-না-কেন) একপ্রকার কল্পনা-আহৃত সামগ্রী।

'পুরবী'র 'আশা' কবিতাটির মধ্যে ইহারই একটি পূর্বাভাস আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। তবে সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও প্রেমের ওই পিপাসা অনুভূত হইয়াছে জগৎ জীবনের গভীর আকাঙ্ক্ষা হইতে। কিন্তু 'পুনশ্চে'র 'বাসা' কবিতাটির মধ্যে জীবনের রিক্ততাকেই অমনি একটা স্বপ্ন-সঞ্চরণের ভিতর দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার বাসনা। কবি আজ প্রাণ-লীলার কেন্দ্রস্থলে আপনার 'বাসা' নির্মাণ করেন নাই; তাহা জীবন-বিচ্ছিন্ন এক শূন্য-লোক।

“আমার মন বসবে না আর কোথাও,
সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে
চলে যেতে চায় উদাস প্রাণ
ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।” (বাসা)

ময়ূরাক্ষীর স্বরূপ আমরা জানি, তাহা সেই পূর্ণতার লোক, রবীন্দ্রনাথের নিকট যাহা অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের অধ্যাত্ম স্বরূপে অনুভূত হইয়াছে।

ওই পূর্ণতা লাভের গোপন আকাঙ্ক্ষা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সকল সময় জাগ্রত ছিল। সেই অখণ্ড সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান আজ কোন্ পরিণামে ‘ময়ূরাক্ষী’তে পরিণত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

কেবল তাহাই নহে, তাহা ছিল জীবন ও জগৎকেই তাহার পূর্ণ স্বরূপে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। সেই সাক্ষাৎকারে জগৎ ও জীবন অন্তহীন সৌন্দর্য ও লীলাস্থলীতে পরিণত হইয়া যায়। কবি আজ সেই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছেন জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া। মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমে মুহূর্তে মুহূর্তে উন্নততর লোকের ছায়াপাত ঘটিয়া যায়। এই প্রতিভাস হইতেই তো বুঝিতে পারা যায়, যে মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেম, সৌন্দর্য ও প্রেম স্বরূপেই কেবল সত্য নহে। উহা অপর কোন সত্য স্বরূপে উত্তীর্ণ হইবার একটা পর্যায় মাত্র।

সৌন্দর্য-বোধের ক্ষেত্রে যেমন—

“একে দেখছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনখানে,
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।”

তেমনি প্রেমের অনুভূতির ক্ষেত্রে—

“প্রেয়সীকে মনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা,
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্য যুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।” (সুন্দর)

মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমে যে অরূপ সৌন্দর্য ও প্রেমে মুহূর্তে প্রতিভাসিত হইয়া যায়, তাহাকে কবির ধ্যান-লোক বা অধ্যাত্ম-সত্তা বলিয়া কোথাও কোথাও উল্লেখ করিয়াছি, কবি এই প্রতিভাসিত সৌন্দর্য ও প্রেমের জগৎ লাভের জন্য একদিন দুরূহ সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। উন্নততর চেতনা-লোকে উত্তীর্ণ হইয়া ওই জগৎ হইতে কত না অপরূপ সৌন্দর্য ও প্রেমের সম্পদ আহরণ করিয়া

আনিয়াছিলেন। আজ সেই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার মত কবির সে প্রাণশক্তি নাই।

অবশ্য 'পুনশ্চে'র মধ্যে এমন দুই একটি কবিতা আছে যেখানে মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানে একান্ত ক্ষীণভাবে অধ্যাত্মলোকের বিদ্যুচ্চকিত ছায়াপাত ঘটিয়া গিয়াছে।

এই বিদ্যুচ্চকিত ছায়াপাতের ভিতর দিয়াই তো উন্নততর চেতনালোক লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগে। একদিন এই আকাঙ্ক্ষাকে কবি সার্থক করিয়াছেন; অন্তত সদাজাগ্রত সাধনা ছিল। আজ তাহা আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই রহিয়া গিয়াছে।

"যেখানে ওর অন্তর্যামীর আসন পাতা,
সেইখানে তার পায়ের কাছে
রয়েছে কোন্ ব্যথা ধূপের পাত্রখানি।" (কোমল গান্ধার)

কিংবা

"যায় না বোঝা যখন চক্ষু তোলে
বুকের মধ্যে অমন করে
কেন লাগায় চোখের জলের মিড়।" (কোমল গান্ধার)

লক্ষ্য করা যায় এই সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের সহিত বেদনাবোধ-বিজড়িত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথ ইতিপূর্বে নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে এই বেদনা-বোধের দার্শনিক স্বরূপ নির্দেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'শান্তিনিকেতন'-এর 'সৌন্দর্যের সকরুণতা' প্রবন্ধটি এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া স্মরণে পড়িতেছে।

তাহার মূল ভাবটি এই যে, সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া আমাদের অন্তরে একটি অধ্যাত্ম ব্যাকুলতা জাগে। এই ব্যাকুলতা হইল উন্নততর চেতনা-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষাই জাগতিক জীবনে মানুষকে সম্পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিতে দেয় না।

যে অংশটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে এই একই ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এককালে ব্যাকুলতা নিরসনের যে প্রয়াস ছিল এবং ওই প্রয়াসের ভিতর দিয়া কবি-চেতনার যে অপরূপ বিকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, আজ সে চেষ্টা নাই, সে বিকাশও নাই।

নিখিলের যে প্রাণ-ধারা সৌন্দর্য-প্রেম রূপে বিকশিত সেই প্রাণ-ধারার সহিত প্রাণের অতি ক্ষীণ সংযোগ রহিয়াছে বলিয়া ওই ব্যাকুলতা অমন অসহায় ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। যে বোধে প্রাণের সহিত প্রাণ একাকার হইয়া

বিশ্বপ্রাণের মধ্যে আপনাকেই অনন্ত ব্যাপ্ত দেখে, প্রেমের সেই যে পরিণাম তাহার কোন পরিচয় কি এক্ষেত্রে রহিয়াছে ?

নিম্নে যে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য-ধ্যান আশ্রয় করিয়া চেতনা ব্যক্তি বা রূপের সীমা কেমন করিয়া প্রায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছে, তাহার একটি পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

ধ্যান-লোকে ইন্দ্রিয়-চেতনা-লব্ধ সৌন্দর্যের রূপান্তর ঘটে, কেবল তাহাই নহে, উহাতে দিব্য-চেতনার চকিত আভাস নামিলে ওই পরিচিত সৌন্দর্য-লোক এমন একপ্রকার অপরিচয়ের বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়, যে তাহাকে আর পরিচিত বলিয়া বোধ হয় না।

"অন্তহীন কাল সরোবরে
মাধুরীর শতদল
তার 'পরে যে রয়েছে একা বসে
চেনা যেন তবু সে অচেনা।" (ভীরু)

এই কালে জীবন ও জগতের যে স্বরূপ কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং সেই সাক্ষাৎকারের সহিত বিজড়িত হইয়া যে সমস্ত দার্শনিক জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তে জাগিয়াছিল এখন একে একে তাহাদের পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

জীবন যে স্বরূপে আজ কবির নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, তাহার পরিচয় নিম্নের কয়েকটি পংক্তির মধ্যে মিলিবে।

"এর পানে অনেকদিন যাদের সঙ্গে দৃষ্টি মিলিয়েছি,
যারা মন মিলিয়েছিল
এখানকার বাদল দিনে আর আমার বাদল গানে
তারা কেউ আছে, কেউ গেল চলে।
আমারও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
নিশীথ রাত্রের তারা ডাক দেবে
আকাশের ওপার থেকে।"

কবি অনুরাগে হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া কত প্রাণের সহিত প্রাণ মিলাইয়া এই জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এই জগৎ ও জীবনকে মধুময় বলিয়া বোধ করিয়াছেন। আর আজ প্রাণের অতি ক্ষীণ প্রেরণায় জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও প্রেমোপভোগের দিন তো গিয়াছেই, স্মৃতির সঞ্চয়টাও একান্ত ম্লান ও শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ স্মৃতি বা ধ্যান-লোকটিও অম্লান থাকে জগৎ ও

জীবনের সহিত নিত্য প্রাণের যোগে। বিচ্ছিন্ন সত্তাবোধে তাই কবির স্মৃতি বা কাব্য-লোক অমন সৌন্দর্য-শূন্য কেবল বেদনা-কলুষিত। এমনি করিয়া প্রাণের সঞ্চয়ও একদিন হারাইয়া যাইবে। তাহার পর এই জগৎ হইতে নিঃশেষে বিদায় লইবার শেষ মুহূর্ত ঘনাইয়া আসিবে।

অকস্মাৎ কোথা হইতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটে? প্রাণের যোগে প্রাণ কেমন করিয়া এই জীবন ও জগৎকে অপরূপ সৌন্দর্য ও প্রেমমণ্ডিত বলিয়া বোধ করে? সৌন্দর্য ও প্রেমের এই বোধটাই বা কি? মৃত্যুতে এই প্রাণ আবার কোথায় হারাইয়া যায়? এই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর লাভ করিতে চাহিয়া বিচিত্র দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু যে অংশটি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার মধ্যে দার্শনিক এই জাতীয় কোন জিজ্ঞাসা এবং তাহার উত্তর লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায় নাই।

দেশ-কালের পরিসীমায় জীবনকে কেবল জীবনের স্বরূপে প্রত্যক্ষ করা, উহারই বিস্ময়বোধে দার্শনিক বিচিত্র জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

জগৎ ও জীবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের এই লীলা শাশ্বত। এই জীবন তাহারা মধ্যে ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়া মণিদীপ্তি ছড়াইয়া কোথায় হারাইয়া যায় কে জানে।

এই সৌন্দর্য সাক্ষাৎকার, এই অনুরাগ, এমনি অনিচ্ছায় একদিন নিঃশেষে সমস্ত কিছু পরিহার করিয়া যাওয়া জীবনের এই নিয়তি সাক্ষাৎকার।

'খেলনার মুক্তি' কবিতাটির মধ্যে জীবনের এই স্বরূপ সাক্ষাৎকারের আর একটি দিক প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়।

নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের যে প্রবাহ নিত্য বহিয়া চলিয়াছে, ব্যক্তিপ্রাণ তাহারই একটি অচিন্তনীয় ক্ষুদ্র তরঙ্গ-ভঙ্গ মাত্র। মৃত্যুতে ওই প্রাণ অনন্ত প্রাণ-প্রবাহে মিলিয়া যায়। অনন্ত প্রাণের যোগে সৃষ্টির সকল রূপের মধ্যে মানুষ আপনার চেতনাকেই লীলায়িত দেখিয়া মুক্তি লাভ করে।

"ওর ছুটি নানা রঙে
নানা চেহারায়
নানা দিকে
বাতাসে বাতাসে
আলোতে আলোতে।" (খেলনার মুক্তি)

মানুষের প্রেম এই সাক্ষাৎকারে সান্ত্বনা মানে না। সে যে রূপের ভিখারী। ওই বিশিষ্ট রূপ না হইলে তাহার প্রেম ধন্য হয় না। আমরা যাহাকে ভালবাসি তাহাকে ওই বিগ্রহ স্বরূপেই লাভ করিতে চাই। মৃত্যুতে ওই হাহাকার তাই শূন্য হৃদয় ঘিরিয়া প্রতিধ্বনি তুলে।

জীবনের এই সান্ত্বনাশূন্য শোককে রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন দার্শনিক পরিণাম লাভে এই শোককে যে দূরীভূত করিতে পারা যায় না, এক্ষেত্রে কবির এমনি এক প্রকার বিশ্বাস-বোধ জাগিয়াছে। তাই এমন জিজ্ঞাসা হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। 'তবে শুধু কি রহিবে বাকি কান্নার খেলা'।

এই বেদনা যত গভীর হোক তাহা একক হৃদয়ের। মৃত্যুতে ওই শোকও নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। নিত্য নবীনের লীলা এই জগতে। ব্যক্তির যে-কোন বোধ প্রাণ-সমুদ্র-তটে ক্ষণকালের জন্য রেখামাত্র টানিয়া চিরকালের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।

"রাত হয়ে যাবে শেষ,
কাল সকালের ফোটা বৃষ্টি ধোওয়া মালতীর ফুলে
সে খেলাও চিনবে না কেউ।" (খেলনার মুক্তি)

আমরা আমাদের চেতনা দিয়া এই বিপুল বিশ্বের অস্তিত্ব বোধ করি। এই অচিন্তনীয় বিপুল অস্তিত্ব যদি সত্য হয়, তবে মৃত্যুতে আমরাই কেবল অনস্তিত্ব হইয়া পড়িব, ইহা কখনও সত্য হইতে পারে না।

সীমাহীন দেশ-কালের বক্ষে অগণিত জ্যোতিষ্ক-লোকের কল্পনাতীত শক্তির স্পন্দন-লীলা চলিতেছে।

"যত গ্রহ নক্ষত্রের
দূর হতে দূরতর ঘূর্ণ্যমান স্তরে স্তরে
অগণিত অজ্ঞাত শক্তির
আলোড়ন আবর্তন
মহাকাল সমুদ্রের কূলহীন বক্ষতলে
সমস্তই আমার এ চৈতন্যের
শেষ সূক্ষ্ম অকম্পিত রেখার এধারে।" (মৃত্যু)

দেশ-কাল জুড়িয়া এত বড় অস্তিত্ব যদি কবির চেতনায় সত্য হয়, তবে মৃত্যুতে সেই চেতনার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি কেমন করিয়া সম্ভব হইবে।

"নিবিড় সে সমস্তের মাঝে
অকস্মাৎ আমি নেই।
একি সত্য হতে পারে।" (মৃত্যু)

কিংবা 'ছুটি' কবিতাটি। তাহার মধ্যে কবি জীবনের কোন্ স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ?

অনন্ত প্রাণপ্রবাহে কত রূপ নিত্য জাগিয়া উঠিতেছে আবার বিলীন হইতেছে। পরিপূর্ণ নিরাসক্ত এই সৃষ্টির লীলা। এই অনন্ত লীলা যিনি প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তাঁহার প্রাপ্তির আনন্দ নাই, বিয়োগের বেদনাও নাই। সৃষ্টি এবং বিনষ্টি দুইকে আশ্রয় করিয়াই সেই এক পরম অস্তিত্বের প্রবাহ।

"যাওয়া আসার স্রোত বহে যায়
দিনে রাতে
ধরে রাখার নাই কোন আগ্রহ
দূরে রাখার নাই তো অভিমান।" (ছুটি)

পর পর যে কয়েকটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিলাম, তাহাতে ইহাই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে কবি জীবনের এই নিয়তি-রূপটিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।

এই মর্ত্য-লোকে মানুষ জন্মগ্রহণ করে, বাড়িয়া উঠে, ভালোবাসে, মুগ্ধ হয়, আনন্দ-বেদনার সংখ্যাতীত তরঙ্গ তাহার হৃদয়তটে একের পর এক রেখা চিহ্নিত করিয়া দিয়া যায়, সেই বিচিত্র বোধকে গভীর করিয়া লাভ করিতে, প্রকাশ করিতে সে কত নর-নারীকে আকর্ষণ করে, তাহারা একে একে আবার কোথায় দূরে চলিয়া যায়, কেহ মর্ত্য-লোকে, কেহ মৃত্যুর পরপারে,—এমনি করিয়া একদিন আসে যখন মানুষের চেতনা-দীপ ফুৎকারে নিভিয়া যায়।

মানুষ কোথা হইতে আসে, মৃত্যুতে আবার কোথায় হারাইয়া যায়? সে কি কোন শূন্যলোক হইতে শূন্যলোকে, মাঝখানে ক্ষণিক অস্তিত্বের একটা বোধ সৃষ্টি করিয়া? না অস্তিত্ব হইতে অস্তিত্ব-লোকে মাঝখানে মায়াময় মরীচিকা সৃষ্টি করিয়া?

এই জীবন-সৃষ্টি কেন? কোন্ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে তাহার এই জগতে আসা? এই জগৎ ও জীবন-সৃষ্টির পশ্চাতে কোন্ উদ্দেশ্য আছে? সে উদ্দেশ্য কি?

এই জাতীয় যে-কোন জিজ্ঞাসা মানুষকে অন্ধকার হইতে গাঢ়তর অন্ধকারে লইয়া যায়, জ্ঞান-মরীচিকার সন্ধানে ছুটিয়া তাহার তৃষিত বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই এক্ষেত্রে জীবনকে জীবনের স্বরূপে মানিয়া লইয়াছেন। সৃষ্টি যেমন আমার ইচ্ছায় হয় নাই, এই জীবনের কোন কিছুর উপর যেমন আমার নিয়ন্ত্রণ নাই, তেমনি মৃত্যুতে জীবনের যে পরিণাম তাহাকে এমনি নিরাসক্ত ভাবে মানিয়া লওয়াই ভাল। রবীন্দ্রনাথের একটি মনোভাব কেবল ব্যক্ত করিলাম। ইহার বিচার তাই নিষ্প্রয়োজন।

'খেলনার মুক্তি' কবিতাটির মধ্যেও কবি এই জীবন-জিজ্ঞাসাকে আর একটি দিক দিয়া পরিষ্কার করিয়াছেন।

আমার মধ্যে যে প্রকাশ মৃত্যুতে তাহা বিসৃষ্টির অনন্ত প্রাণ-ধারায় একাকার হইয়া যায়, নানা রূপের মধ্য দিয়া আবার তাহার প্রকাশ ঘটে। অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে সংখ্যাতীত রূপের তরঙ্গ উঠিয়া আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। শাশ্বত কাল ধরিয়া সৃজন-প্রলয়ের এই লীলা চলিতেছে।

কিন্তু এই বিশিষ্ট ব্যক্তি-রূপ? হাহাকার তো এই বিশিষ্ট রূপের জন্য। কোন্ সাক্ষাৎকার এই বেদনাকে লোপ করিয়া দিতে পারে? অন্ততঃ সেরূপ কোন সাক্ষাৎকার আছে কি-না, রবীন্দ্রনাথ তাহাও জিজ্ঞাসা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্তি-রূপের নিঃশেষ বিনষ্টিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। রূপের এই অনতিক্রমণীয় নিয়তি। ইহার জন্য হাহাকার তাই চিরন্তন। তবে এই বেদনার চিহ্ন জগতে থাকে না। ঢেউয়ে যে রেখা পড়ে ঢেউয়েই তাহা ধুইয়া মুছিয়া যায়।

"মৃত্যু" কবিতাটির মধ্যে কবি এই জিজ্ঞাসাটিকে সম্পূর্ণ পরিহার করেন নাই। তাঁহার উত্তর লাভের স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট অধ্যাত্ম-উপলব্ধি বলিয়া কিছু বিচার প্রয়োজন।

মানুষ তাহার চেতনাকে যতদূর প্রসারিত করুক-না-কেন, তাহা যে-কোন পরিণামে সীমাকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে না। এই সীমাবদ্ধ চেতনা দিয়া সে বহির্বিশ্বকে যতদূর আবেষ্টন করিতে পারে ততদূর তাহার জগৎ। আমিত্ব বলিতে এই সীমার বোধটিকেই আমরা বুঝিয়া থাকি।

ইহার বাহিরে যে অনন্ত প্রসারিত জগৎ তাহাকে মানবীয় চেতনা দিয়া আমরা প্রমাণ করিতে পারি না বটে, কিন্তু এই চেতনাকেও ছাড়াইয়া উঠিবার উপায় আছে। তাই মানবীয় চেতনার বাহিরের জগৎ অপ্রমাণ হইয়া যায় না।

মৃত্যুতে এই সীমাবদ্ধ বিশিষ্ট চেতনা এবং উহার সহিত অন্বিত হইয়া যে বিশিষ্ট সীমাবদ্ধ জগৎ, (ভাবময় বা রূপময়) তাহা লুপ্ত হইয়া যায়।

যে অসীমের বুকে এই সকল সীমার প্রকাশ, সেই অসীম চিরন্তন, তাহার এই সীমা বা রূপের লীলাও চিরন্তন ; কিন্তু মৃত্যুতে এই বিশিষ্ট রূপ, বিশিষ্ট এই সীমার বোধ চিরকালের জন্য অনস্তিত্ব হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ সীমার দিক হইতে চিরন্তনতার যে-কোন বোধ, যে-কোন তত্ত্ব গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া যায়।

'ছুটি' কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বিসৃষ্টির আর এক রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সৃষ্টি-লোকে সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া আবার বিনষ্ট হইতেছে। একটা সীমাশূন্য শক্তির স্পন্দন ছুটিয়া চলিয়াছে শূন্য হইতে শূন্যে, তাহারই আবর্তে ঘুরিয়া কত রূপ বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে। মানুষের জীবন এমনি এক-একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ মাত্র ; জীবনের ইহাই যখন স্বরূপ তখন আসক্তির এই বেদনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যে নিয়মে এই চেতনার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই নিয়মে একদিন এই চেতনা হারাইয়া যাইবে। মাঝখানে আসক্তির এই বিকৃত প্রয়াস কেন ?

ইতিপূর্বে রবীন্দ্র-সাহিত্যে এক জাতীয় রস-সাধনার পরিচয় লাভ করিয়াছি। 'পুনশ্চে'র মধ্যে তাহার যে পরিচয় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, এক্ষেত্রে সেইগুলি সংগ্রহ করিয়া একস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অদ্বৈতবাদীরা অবিদ্যা মায়া ইত্যাদি নামে অভিহিত করিয়া যে জীবন ও জগৎকে পরিহার করিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে আশ্রয় করিয়াই সাধনা করিয়াছেন। এই সাধনার পরম ফললাভ হইল প্রেম, উহারই পরিণাম করুণা।

ইহার যে বিশিষ্ট আস্বাদ তাহা উন্নততর চেতনালাভে, পূর্ণতার সাধনায় লাভ করিতে পারা যায় না, ইহাই কেবল সত্য নয়, সে আস্বাদে ব্রহ্মাস্বাদও অনাকাঙ্ক্ষিত হইয়া গিয়াছে।

সীমাবদ্ধ চেতনায় জগৎ ও জীবনের যে স্বরূপ (অপূর্ণ স্বরূপই) উদ্ভাসিত হয়, তাহার সৌন্দর্য ও প্রেমের (আসক্তি ও মোহ বিজড়িত) দুর্লভতা অমৃতকেও পরাভূত করিয়াছে। সীমাবদ্ধ চেতনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া আর যাহাকেই লাভ করা যাক, জীবনের ঠিক এই স্বরূপটিকে তো আর লাভ করিতে পারা যায় না।

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী চেতনার এই যে বিশিষ্ট লীলা, এই চেতনাশ্রয়ী হইয়া জগৎ ও জীবনের যে বিশিষ্ট সৌন্দর্য ও প্রেমোপভোগ তাহা অনন্ত কালপ্রবাহে আর কোন এক মুহূর্তের জন্যও লাভ করিতে পারা যাইবে না।

যে সাক্ষাৎকার জীবনকে জীবনের এই স্বরূপেই এমন একান্ত মধুর করিয়া তুলে, সেই সাক্ষাৎকারের তত্ত্বটিকে আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

"কোন অভাব নেই দেবলোকের
সেই তার পিপাসা
সে জানেই না চাইতে,
তবে কেন আমি হলেম সুন্দর।
তার মধ্যে মন্দ নেই,
তবে ভালো হওয়া কার জন্যে।

*　　*　　*

তোমার আকাঙ্ক্ষা দিয়ে করো আমাকে বরণ
দেবলোকের দুর্লভ সেই আকাঙ্ক্ষা
মর্ত্যের সেই অমৃত অশ্রুর ধারা।" (নাটক)

মর্ত্যে এই অপূর্ণতা আছে বলিয়াই তো পূর্ণতার জন্য মানুষের অন্তরে নিত্য ব্যাকুলতা। রবীন্দ্রনাথের নিকট পূর্ণতার প্রাপ্তিটা এক্ষেত্রে বড় কথা নয়, তাঁহার নিকট মানব-প্রেমের ওই ব্যাকুলতার মূল্য তাহার চেয়েও বড়।

জীবনের ইহা এক আশ্চর্য মূল্য-নিরূপণ! ওই ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া অন্তরে যে বিশিষ্ট অনুভূতি জাগে, তাহার আস্বাদ লাভই জীবনে পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী।

অমরতার বোধ বড় কথা নয়। প্রেমে যে মৃত্যু-কাতরতা, বিচ্ছেদ-বিয়োগের যে নিত্য আশঙ্কা এবং ওই আশঙ্কা-বিক্ষুব্ধ প্রেমের যে নিত্য-জাগরণ, কল্যাণ-কামনায় যে নিয়ত করুণ কাতর প্রার্থনা, তাহা অমরতার বোধ অপেক্ষাও বড়। মৃত্যুকে নিত্য অমৃতে রূপান্তরিত করিয়া চলিয়াছে এই প্রেম। ইহা মৃত্যুকে পরিহার করিয়া অমৃতের প্রার্থনা জানায় না।

মৃত্যু আছে, অপূর্ণতা আছে, সেই সঙ্গে আসক্তিও আছে, ইহাকে কবি কোন চেতনা আশ্রয় করিয়া, কোন দার্শনিক বোধে লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করেন নাই (এই দার্শনিক মনোভাবের ক্ষেত্রে কেবল একথা বুঝিতে হইবে)। ইহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই, ইহার যে মূল্য তিনি নির্ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে ঋষির দিব্য-চেতনা লাভের আকাঙ্ক্ষাও ম্লান হইয়া পড়িয়াছে।

পূর্ণের জন্য ব্যাকুলতার ভিতর দিয়া অন্তরে যে অহর্নিশ অনুরাগের দীপ্ত দীপ জ্বলে, তাহাতে দিব্য-চেতনার আদিত্যবর্ণও ম্লান বোধ হয়। ওই ব্যাকুলতার মধ্য দিয়া চিত্তের যে আস্বাদ তাহাকেই কবি সার্থক আনন্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

পূর্ণ যখন আপনার মধ্যে আপনি সমাহিত হইয়াছিলেন তখন তাহার মধ্যে ঐশ্বর্যের কোন প্রকাশ ছিল না, কোন আনন্দ ছিল না।

তিনি আপনার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্য সাক্ষাৎ করিতে চাহিয়া আপনাকেই দেশ-কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলেন। এই নিখিল বিস্থষ্টি তাঁহারই সীমারূপের প্রকাশ।

'মায়া' (ব্যাখ্যাতীত) এই অসীমের বুকে দেশ-কালের, সীমার বোধ স্থষ্টি করিয়াছে। তিনি মায়া আশ্রয় করিয়া আপনাকেই দ্বিধা করিয়া আপনার আনন্দ ও ঐশ্বর্যকে অফুরান করিয়া লাভ করিতেছেন।

আবার ওই পূর্ণতাকে ফিরিয়া লাভ করিতে চাহিয়া নিখিল বিস্থষ্টির মধ্যে অভিব্যক্তি ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া বিস্থষ্টির মধ্যে এক-একটি চেতনা-পর্বের সেই সঙ্গে স্থষ্টির এক-একটি পর্যায়ের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটিতেছে। যেন চেতনা-শতদলের এক-একটি দল খুলিয়া খুলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেকটি দল বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমিক উন্নততর সৌন্দর্য ও সুষমার প্রকাশ ঘটিতেছে, তাহার মধুকোষ ধীরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত ক্রমে আমোদিত হইয়া উঠিতেছে।

অন্য দিকে আপনারই ঐশ্বর্যের ধীর প্রকাশ লক্ষ্য করিয়া অসীমের আনন্দ সীমাহীন হইয়া পড়িতেছে। এমনি করিয়া একবার বন্ধনের ভিতর দিয়া আরবার মুক্ত স্বরূপে তিনি আপনাকেই আপনি ফিরিয়া ফিরিয়া লাভ করিতেছেন।

> "অপূর্ণ যখন চলেছে পূর্ণের দিকে
> তার বিচ্ছেদের যাত্রাপথে
> আনন্দের নব নব পর্যায়।
> পরিপূর্ণ অপেক্ষা করেছ স্থির হয়ে,
> নিত্য পুষ্প নিত্য চন্দ্রলোক
> নিতান্তই সে একা, সেই তো একান্ত বিরহী।" (বিচ্ছেদ)

এই প্রসঙ্গে 'শাপমোচন' কবিতাটিও উল্লেখ করা যাইতে পারে। জীবনের অপূর্ণতা, অসুন্দর ও বেদনার মূল্য কবি আর একদিক দিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। পূর্ণের নিজের তো কোন রূপ নাই, আনন্দ নাই। অপূর্ণ, সসীম বিশ্বসৃষ্টি-লোক আশ্রয় করিয়াই তো তাহার রূপের লীলা। বস্তুতঃ পূর্ণতা-তত্ত্বে করুণা-তত্ত্ব নাই। করুণা নাই তাহার অর্থ, প্রকাশ নাই। অপূর্ণতাকে আশ্রয় করিয়াই পূর্ণের করুণা ধন্য হয়।

অসুন্দর ও অপূর্ণতা সকল দিক দিয়া সুন্দর ও পূর্ণতাকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। এই সার্থকতার ভিতর দিয়া আবার এমন এক বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটিতেছে যাহা পূর্ণের মধ্যে ছিল না, কিংবা অপূর্ণ না হইলে যাহার প্রকাশ ঘটিত না।

শ্যামল মেঘ আছে বলিয়াই সূর্যালোক অমন ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলে। মর্ত্যলোকের রিক্ততায় 'শ্যামল সুন্দরের আবির্ভাব, ইহার কোন প্রকাশ তো বৃষ্টিধারায় ছিল না।

"ওই কুশ্রীর পরম বেদনাতেই তো সুন্দরের আহ্বান"

কিংবা

"আপনারই আন্তরিক রসের দাক্ষিণ্যে,
কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।"

অসুন্দর ও অপূর্ণকে পরিহার করা নয়। প্রেম যখন অসুন্দর ও অপূর্ণকে আশ্রয় করিয়া তাহাকে বিশিষ্ট একটি শ্রী দান করিতে সমর্থ হয়, তখন প্রেমের সার্থক সাধনা।

নর-নারীর জীবনে এ সাধনা তো সহজ নয়। কমলিকাও প্রথমে ব্যর্থ হইয়াছিল। হওয়াই স্বাভাবিক ; কারণ কমলিকার মধ্যে তখন সে প্রেম ছিল না। প্রেম কি, না সেই বোধ যাহা রূপের অন্তরালে আর একটি রূপময় ভাব-লোক প্রত্যক্ষ করিতে পায়।

"কী অন্যায়, কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা,
বলতে, বলতে, কমলিকা ঘর থেকে ছুটে পালিয়ে গেল।"

কমলিকার অন্তরে একদিন ওই প্রেম জাগ্রত হইয়াছে। দুঃখের নিপীড়নের ভিতর দিয়া কমলিকার অন্তরে অধ্যাত্ম-বোধের বিকাশ ঘটিয়াছে। এই বোধে নরনারীর যে সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করি তাহা ইন্দ্রিয়জাত সৌন্দর্যবোধের অনেক ঊর্ধ্বে।

সৌন্দর্যবোধ আদিতে ইন্দ্রিয়বোধকে আশ্রয় করিলেও পরিণামে ইন্দ্রিয়বোধের অনেক উর্ধ্বে উঠিয়া যায়। 'মাটির প্রদীপ শিখায়' এইরূপে 'সোনার প্রদীপ জ্বলে' উঠে। ইন্দ্রিয়লব্ধ সৌন্দর্যই ধ্যান-লোকে আর এক সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলে।

সে কোন্ প্রেম, যে প্রেমের আলোকে অসুন্দরের মধ্যেও নর-নারী পরম সুন্দরকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়। ইন্দ্রিয়বোধে আমাদের যে সুন্দর ও অসুন্দরের পার্থক্য-বোধ তাহা লোপ পায়। প্রেমে যে সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে, 'রাজা ও রানী' নাটকের রানীর উক্তি আশ্রয় করিয়া বলা যায়, তাহা 'সুন্দর' নয়, 'কুৎসিত' নয় তাহা 'অনুপম'।

দেখা দুই রকমের আছে। একটি সাধারণ ইন্দ্রিয়বোধ দিয়া দেখা। আর একটি দেখা আছে যাহা আদৌ ইন্দ্রিয়-বোধাশ্রয়ী নয়। আমাদের বোধ ইন্দ্রিয়-বোধাশ্রয়ী বলিয়া তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি না। যাঁহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও উহাকে উপমা দিয়া বুঝাইতে পারেন না।

এই 'শাপ'-বদ্ধ এ জগতের প্রত্যেকটি নর-নারী। ওই 'শাপ' কি, না অন্তরে স্নেহ-প্রেম-শূন্যতা, যে প্রেমে জগৎ ও জীবন অপার সৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে, অধ্যাত্মবাদীদের মত ব্রহ্ম রূপ-পরিণাম-স্বরূপে জগৎ ও জীবনকে সাক্ষাৎ করিবার সাধনা ইহা নহে। ইহা আসক্তি ও মোহ বিজড়িত মর্ত্য-প্রেমের সাধন-প্রসূত দেবদুর্লভ করুণা। সে করুণায়, এই জগৎ ও জীবন অমন পরম আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে।

একদিকে বিচ্ছিন্ন সত্তায় 'আমি'র প্রকাশ, অন্যদিকে এই বিশ্ব-জগৎ। আমার আনন্দে যেমনি, আমার বেদনায়ও তেমনি সে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত। আমার আনন্দ-বেদনার কোন চিহ্নই তাহার মধ্যে নাই:

"অতি বৃহৎ বিশ্ব
অম্লান তার মহিমা.
অক্ষুব্ধ তার প্রকৃতি
মাথা তুলেছে দুর্দশ সূর্য-লোকে,
অবিচলতি অকরুণ দৃষ্টি তার অনিমেষ,
অকম্পিত বক্ষ প্রসারিত
গিরি নদী প্রান্তরে।" (বিশ্ব-শোক)

যেখানে এই বিচ্ছিন্ন সত্তা বিশ্ব-সত্তার সহিত একাত্ম হইয়া যায়; অর্থাৎ আমার প্রাণ-ধারা আমার চেতনার স্পন্দন, বিশ্ব-প্রাণ-ধারা ও তাহার স্পন্দনের সহিত সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়, সেখানে আমার মধ্যেই বিশ্ব-প্রাণ-লীলার সাক্ষাৎকার ঘটে। মানবীয় চেতনায় ওই অনন্ত শক্তির স্পন্দন অলৌকিক আনন্দের আবার অসহনীয় আনন্দোচ্ছ্বাস বলিয়া অলৌকিক বেদনার সঞ্চার করে। ওই চেতনা লাভের মুহূর্তে বিশ্ব-চেতনা কখন অপার আনন্দের প্লাবন, কখন অন্তহীন বেদনার অশ্রুধারা বলিয়া বোধ হয়।

"এই ব্যথাকে আমার বলে ভুলব যখনি
তখনি সে প্রকাশ পাবে বিশ্ব-রূপে।" (বিশ্ব-শোক)

আর কিছু নয়, বিশ্ব-চেতনা লাভটিই বড় কথা। তাহার অনন্ত প্রাণ-লীলাকে বেদনারূপে যেমন, আনন্দরূপেও তেমনি সাক্ষাৎ করা যাইতে পারে। আনন্দ ও বেদনা-তত্ত্ব বিশ্ব-চেতনায় এক হইয়া যায়।

মানুষের একটি মুক্ত চেতনা আছে, যাহা দেহ-প্রাণ-মনের বিনষ্টিতেও বিনষ্ট হইয়া যায় না। মানুষ তাহার পরিচয় লাভ করিয়াছে মানস-চেতনার সীমা অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র বৎসরের সাধনার পর।

এই নিখিল বিসৃষ্টিও দিব্য-চেতনার যোগে সত্য। দিব্য-চেতনার ধ্যানই বস্তু আশ্রয় করিয়া রূপ লাভ করিয়াছে। কবি 'চির রূপের বাণী' কবিতাটির মধ্যে যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছেন, তাহা এই যে দিব্য-চেতনার যে ধ্যান বস্তু (দেশ-কালের পরিসীমায় যে নিখিল বিসৃষ্টি) আশ্রয় করিয়া রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া গেলেও ধ্যান চিরন্তন হইয়া থাকে।

"মাটির জিনিস ফিরে যায় মাটিতে,
ধ্যানের রূপ রয়ে যায় আমার ধ্যানে।" (চির রূপের বাণী)

চিরন্তন 'অশ্রুত এক বাণী'—লোক রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ পায় বস্তু আশ্রয় করিয়া। বস্তু জীর্ণ হইয়া কালে ভাঙ্গিয়া পড়ে তাহাতে ওই 'অশ্রুত বাণী' বিনষ্ট হয় না। বাণী চিরন্তনী। কালে কালে তাহা মানুষের হৃদয় হইতে হৃদয়ে বহিয়া চলে। মনুষ্যলোক বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহা থাকে বিশ্ব-মানব মনে।

"বায়ুসমুদ্রে ঘুরে ঘুরে চলে অশ্রুত বাণীর চক্র লহরী,
কিছুই হারায় না।" (চির রূপের বাণী)

এমনি করিয়া কবি বস্তুর ঊর্ধ্বে ভাবের অশ্রুত বাণীর, তাহারও ঊর্ধ্বে আত্মার, তাহার অরূপ ধ্যানের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। এমনি করিয়া কবি

আপনার অন্তরে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছেন। কবির কাব্যে যে অরূপ ধ্যান এবং অশ্রুত বাণী রূপ লাভ করিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইলেও ওই ধ্যান ও বাণী রূপহীন স্বরূপে চিরন্তন হইয়া থাকিবে।

আপনার রূপ ও বাণীকেই (যাহা অরূপ ও অশ্রুত) মানুষ বস্তু আশ্রয় করিয়া প্রকাশ করে। এই সত্যটি যখন উপলব্ধি করি তখন মানুষের সকল সৃষ্টি-প্রেরণার মূল রহস্যটিকে যেমন উপলব্ধি করিতে পারি, তেমনি সেই কারণে মৃত্যু ও বিনষ্টির মহৎ ভয়ও দূরীভূত হইয়া যায়।

"দেহমুক্ত রূপের সঙ্গে যুগল মিলন হ'ল দেহমুক্ত বাণীর
প্রাণ-তরঙ্গিনীর তীরে, দেহ-নিকেতনের প্রাঙ্গণে।" (চির রূপের বাণী)

কেবল মাত্র অরূপ-ধ্যানে যে মানুষের ক্ষুধা মেটে না, তাহাকে বস্তু আশ্রয় করিয়া রূপদান করিয়াই যে মানুষের পিপাসা মেটে, তাহারই পরিচয় 'প্রথম পূজা' কবিতাটির মধ্যে।

অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে বস্তুর মধ্যে বিগ্রহস্বরূপে সাক্ষাৎ করিতে মাধব আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়া দিল।

'চির রূপের বাণী'র মধ্যে অরূপের ধ্যানে মানুষ মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠিয়াছে, 'প্রথম পূজা'র মধ্যে মানুষ রূপ সাক্ষাৎ করিতে মৃত্যু বরণ করিয়াছে। এই দুই বিপরীত তত্ত্ব সাক্ষাৎকারের স্বরূপ আমাদের বুঝিতে হইবে।

একদিকে অরূপের সাধনা অন্যদিকে রূপের জন্য চির হাহাকার, একদিকে আত্মা আর একদিকে দেহ, (স্থূল ভোগের বাসনা নয়) এই দুইয়ের মধ্যে যে তত্ত্ব পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে তাহাই শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব, উহার সাধনা শ্রেষ্ঠ সাধনা।

বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের আনন্দবোধেই কবি সমগ্র জীবন ধরিয়া কত-না সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। প্রাণ-প্রবাহে নিত্য কত রূপ গড়িয়া উঠিতেছে, আবার তাহারা প্রাণ-প্রবাহে হারাইয়া যাইতেছে। তেমনি কবির গান, যাহা প্রাণ-জাহ্নবীর বন্দনা-গানই বটে, তাহা প্রাণ-প্রবাহে ভাসিতে ভাসিতে একদিন ডুবিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। জীবনের এই নিয়তি-সাক্ষাৎকারে, কবির প্রাণ সান্ত্বনা অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছে।

কিন্তু 'গানের বাসার' মধ্যে একটি বিপরীত প্রেরণার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

প্রকৃতির এই নিয়তি-নিয়মকে লঙ্ঘন করিতে চাহিয়া মানুষ সৃষ্টি করে। সে তাহার ধ্যানকে, তাহার প্রেমকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়া রাখিবে বলিয়াই তো তাহার সৃষ্টি। কাল-প্রবাহে প্রকৃতির সকল রূপ, সকল সঙ্গীত নিত্য জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে মানুষ কেবল এই নিয়মকে মানিতে চায় নাই। সে প্রতি মুহূর্তে এই নিয়মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছে।

"আমরা মানুষ, ভালোবাসার জন্যে বাসা বাঁধি,
চিরকালের ভিত গড়ি তার গানের সুরে,
খুঁজে আনি জরা-বিহীন বাণী
সে মন্দিরের গাঁথন দিতে।" (গানের বাসা)

সাধারণ মানুষের জীবনের বঞ্চনাকে কী নগ্ন ভাবেই না কবি ব্যক্ত করিয়াছেন 'বাঁশি' কবিতাটির মধ্যে। কিন্তু এই কথাটিই শেষ নয়। প্রেমের অনুভূতির ভিতর দিয়া এমনি একটি বঞ্চিত মানুষও যে বিশ্ব-চেতনায় পরম বিস্তার লাভ করিতে পারে, অধ্যাত্ম-সম্পদে প্রেমের বিভূতিতে জগতের যে-কোন সম্রাটের সহিত একাসনে বসিতে পারে, সেই উপলব্ধিই বর্তমান কবিতাটির একমাত্র ভাব-প্রেরণা।

বাহিরের ঐশ্বর্যে মানুষে মানুষে যতই পার্থক্য থাক, অন্তরের পথই মানুষের অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভের একমাত্র পথ। অধ্যাত্ম-সম্পদ লাভের জন্য ওখানে সব মানুষকে বাহিরের সমস্ত ঐশ্বর্য পরিহার করিয়া দীনতম ভিখারীর মত আসিতে হয়। কারণ দুইকে একযোগে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। জগতের কত নর-নারী অন্তরের পথ বাহিয়া সেই এক পরম তীর্থের পানে চলিয়াছে। সকলের চরণরেণু-ধূসরিত, কণ্টক-বিদ্ধ, বিক্ষত-হৃদয় করুণ-কোমল, নয়নে অশ্রুর কালিমা। অন্তর্জগতে, অধ্যাত্ম-লোকে প্রেমের অভিসারে বিশ্বের নর-নারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

"বাঁশির করুণ ডাক বেয়ে
ছেঁড়া ছাতা রাজছত্র মিলে চলে গেছে
এক বৈকুণ্ঠের দিকে॥" (বাঁশি)

এই অধ্যাত্ম-বোধের জাগরণ ঘটিয়াছে সৌন্দর্য ও প্রেমের বোধ আশ্রয় করিয়া। ওই রূপাশ্রয়ী হইয়া অরূপের সেই বোধ আসিয়াছে বলিয়া ওই রূপ তাহার সহিত জড়াইয়া একাকার হইয়া এক শাশ্বত পরিণাম লাভ করিয়াছে।

যে রূপ আশ্রয় করিয়া প্রেম অনুভূত হয়, ধ্যানে আসঙ্গ লাভ ঘটে, ওই ধ্যান আশ্রয় করিয়া পরিণামে ঊর্ধ্বতর চিরন্তন এক সৌন্দর্য ও প্রেম-লোকের আভাস লাভ ঘটে, সেই রূপের মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে না। সেই গোধূলি-লগ্ন, সেখানে ধলেশ্বরী বহিয়া চলিয়াছে। তাহার তীরে তমালের শ্রেণী। উহার শ্যামছায়া পড়িয়াছে ধলেশ্বরীর বুকে। গৃহের আঙ্গিনায় বসিয়া অন্যমনা সেই কিশোরী নারী। 'তার পরনে ঢাকাই শাড়ি কপালে সিন্দূর।'—এই ছবি ধ্যানে চিরস্থির হইয়া গিয়াছে। বাহিরের জগৎ ওই সৌন্দর্য-লোকের চতুর্দিকে আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে, সেখানে কত ভাঙ্গা-গড়া, কত পরিবর্তন।

'পুনশ্চে'র মধ্যে কয়েকটি কবিতা আছে যেমন, 'শুচি', 'রঙরেজিনী', 'মুক্তি', 'প্রেমের সোনা', 'স্নান সমাপন', 'প্রথম পূজা' প্রভৃতি, যেগুলির ভিতর দিয়া কবি-চিত্তের একটি সাধারণ ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়াছে। সেই সম্পর্কে প্রসঙ্গত কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

ঔপনিষদিক উপলব্ধির একটি সার্বজনীন আবেদন আছে নানা কারণে। দেশ-কালের অতীত, জাগতিক সকল সীমার বাহিরে যে সত্য, তাহাকে কোন একটি বিশিষ্ট পূজাপদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার চেষ্টা সে ক্ষেত্রে নাই। প্রচলিত যে-কোন পূজা-পদ্ধতি, যে-কোন সাধন-পন্থাকে আশ্রয় করিয়া তাঁহাকে যেমন উপলব্ধি করিতে পারা যায়। তেমনি এই পূজা-পদ্ধতি ও সাধন-পন্থার অনন্ত সম্ভাবনাকেও সেক্ষেত্রে স্বীকার করা হইয়াছে। আচার-অনুষ্ঠানের ইতস্তত কিছু কিছু উল্লেখ থাকিলেও তাহা একান্ত ভারস্বরূপ হইয়া উঠে নাই। ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে জন্মগত অধিকার-বৈষম্যের স্বীকৃতি উপনিষদের মধ্যে কোথাও কোথাও যে একেবারে নাই তাহা নহে, তবে ইহার বিরুদ্ধ ভাবনার প্রকাশ উপনিষদগুলির মধ্যে সর্বত্র নানাভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকল কারণের জন্য উপনিষদ রবীন্দ্রনাথের জীবনে অত্যন্ত ফলপ্রসূ হইয়াছিল।

বৌদ্ধধর্মে চরম উপলব্ধির স্বরূপ যেমনই হোক, জীবন ও জগৎকে তাহা যেভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করুক-না-কেন, বৌদ্ধধর্ম জীবনে আচার-অনুষ্ঠানের গুরুভারকে অত্যন্ত লঘু করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল বলিয়া এবং জাগতিক ও অতিজাগতিক সাধনক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের সমান অধিকারকে অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকৃতি দান করিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধধর্মের যুক্তি-আশ্রয়ী মানবতার

এই দিকটি রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাই রবীন্দ্রনাথের অনুরাগ অপরিসীম।

মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বকালে ধর্ম-আন্দোলনের সেই দিকগুলির প্রতি তিনি বিশেষ করিয়া আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে ধর্মমতগুলি বাহিরের নিষ্প্রাণ আচার-অনুষ্ঠানকে উপেক্ষা করিয়া অন্তরের শুচিতা এবং ঈশ্বরীয় ভক্তিকে একান্ত ভাবে আশ্রয় করিয়াছে। এই ধর্মমতগুলি জীব ও ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এবং জগৎ ও ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কিত বিচিত্র তত্ত্ব-আলোচনাকে বিশেষ প্রাধান্য দান করে নাই। ভক্তিসাধনার ক্ষেত্রে এই ধর্মমতগুলি ভ্রাতৃভাবকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছে। বহির্জগতে ক্ষমতা ও বস্তুর উপভোগের ক্ষেত্রে সমানাধিকারকে স্বাভাবিকভাবে তাহারা বড় করিয়া দেখিয়াছে বলিয়া ইহার ঠিক বিপরীত বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ণাশ্রম-ধর্মের কাঠামোকে যত দিক দিয়া যতভাবে সম্ভব শিথিল করিবার চেষ্টা করিয়াছে। একান্ত সুস্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ রূপে না হইলেও ইহাদের মূল সত্যটি এই; ঈশ্বরীয় সাধনায়, তাহা যে পন্থাকেই আশ্রয় করুক-না-কেন, সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম লাভের ক্ষেত্রে নর-নারী মাত্রেরই অধিকার আছে। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে বাহিরের আচার-অনুষ্ঠানের আদৌ কোন মূল্য নাই। কেবল তাহাই নয়, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান সামাজিক শক্তি ও উপকরণের বৈষম্যকে স্থায়ী করিয়া রাখিতে সহায়তা করে। (এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার ক্ষেত্র ইহা নহে। পৌরাণিক আচার-অনুষ্ঠানের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যার একটি সুন্দর এবং সামগ্রিক পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে ডঃ হাজরা প্রণীত 'পুরাণ' এবং 'উপপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যে।) বর্ণাশ্রম ধর্মের কাঠামোকে শিথিল করিতে চাহিয়া তাহারা মানুষের যে মুক্তিকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে তাহা কেবল অন্তর্জগতে নয়, বহির্জগতে অধিকার-সাম্য লাভের মধ্যে।

শ্রীচৈতন্য ও বল্লভাচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম, রামানন্দ, কবির, দাদু, মীরাবাঈ, নানক প্রভৃতি সাধু-সন্তদের ধর্ম-সাধনা তাহার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই সকল ধর্মসাধনার মধ্যে ভক্তির যে অনাবিল ধারা প্রবাহিত, ভারতবর্ষীয় ধর্মসাধনায় ইহার পূর্বপরিচয় থাকিলেও এবং তাহার মূল ভাবগত পুরান হইলেও সুফি-সাধনার ভক্তি-উপাদান যে ইহাদের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে তাহাতে কোন সংশয় নাই। সুফি-সাধনার এই

দিকটি রবীন্দ্রনাথের উপর কী গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা রবীন্দ্র-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই নিকট বিদিত।

মুসলমানধর্মের আচার-অনুষ্ঠানের বন্ধন হইতে, ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয় সংস্কারের বিচিত্র নিগড় হইতে মানুষকে মুক্ত করিয়া এক উদার ভক্তির ক্ষেত্রে সকলকে মিলিত করিবার চেষ্টার ভিতর দিয়া সুফি-সাধনার জন্ম হয়।

মুসলমানধর্মের সহিত সঙ্ঘাতের ফলে মধ্যযুগে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এইরূপে যেমন বিচিত্র সংস্কার সাধিত হয়, তেমনি হিন্দুধর্মের সহিত ইংরেজী সভ্যতার সঙ্ঘাতের ফলে ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ঘটে। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে যেমন, সংবিধানের ক্ষেত্রে তেমনি মানুষমাত্রেই যে সমান—এমন নিঃসঙ্কোচ ও নিঃসংশয় অভিমত ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইংরেজ আগমনের পূর্বে কোথাও উচ্চারিত হয় নাই। ঔপনিষদিক উপলব্ধির সহিত পাশ্চাত্য এই মানবতা মিশ্রিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ঘটিয়াছে।

প্রাচীন সকল ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে এই জাতীয় একটি চেষ্টার রূপ সকল যুগে কোন-না-কোন রূপে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী কালে এই সকল চেষ্টা এক একটি বিচ্ছিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইয়া গিয়াছে মাত্র।

বিশ্ব-ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ইহারই একটি ঐতিহাসিক ধীর বিকাশের ধারা নির্দেশ করিয়াছেন। দেশ-কালে বিচ্ছিন্ন এই সকল চেষ্টার স্রোতোধারা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক সাগরসঙ্গমে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথকে তাই ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে কোন একটি ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া দেখিবার কোন উপায় নাই। এই জাতীয় চেষ্টার ভিতর দিয়া যাঁহারা সন্তোষ লাভ করেন তাঁহাদের সন্তোষ অমূলক।

নারীর সৌন্দর্য হোক, অথবা প্রকৃতির সৌন্দর্য হোক, কবিতা তাহার মধ্যে অন্তহীন বিস্ময় ও মাধুর্যের সন্ধান লাভ করিয়াছেন। কিংবা বলা যায় বিশ্বের প্রত্যেকটি রূপের ছিদ্রপথ দিয়া তাঁহার চেতনা ক্ষণে ক্ষণে এমন একটি অপার্থিব সৌন্দর্যের আভাস লাভ করিয়াছে যাহা অনির্বচনীয়। সকল দেশ-কালের অতীত এক দেশ-কালের ছায়াপাত করিয়া বিশ্বের সকল সামগ্রী এক দিব্য আভা বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। এই দৃষ্টিতে পরিপূর্ণতা এবং অসীমতা এক অজ্ঞাত রহস্যের দেশ-কালের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া একপ্রকার হইয়া গিয়াছে। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে আর একটি পরিচয় লাভ করিতে যাইবে।

"জানিনে কেন মনে হয়,
এইদিন দূর কালের আর কোনো একটি দিনের মতো।
* * * *
একে দেখেছি যে অতীতের মরীচিকা বলে
সে অতীত কি ছিল কোনো কালে কোনো ক্ষণে
সে কি চিরযুগেরই অতীত নয়।
প্রেয়সীকে মেনে হয় সে আমার জন্মান্তরের জানা—
যে কালে স্বর্গ, যে কালে সত্যযুগ,
যে কাল সকল কালেরই ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে।
তেমনি এই যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে
এর মাধুরীকেও মনে হয় আছে তবু নেই,
এ আকাশ বীণায় গৌড় সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।" (সুন্দর : পুনশ্চ)

শৈশবে খোয়াই-এর তীরে নুড়ির দুর্গ রচনা করিয়া কবি কত আনন্দই না লাভ করিয়াছেন। সেই কালে তাহা কবির জীবনে কত-না সত্য ছিল। তাহার পর কত দিন চলিয়া গিয়াছে। সেই নুড়ির দুর্গ আর নাই। হয়ত সে-দিনের অপরিমিত আনন্দের এই তুচ্ছ উপকরণের কথা স্মরণ করিয়া আজ মৃদু হাসি জাগে।

পরবর্তী জীবনে যে বিরাট কাজের রূপ তিনি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি ছিল তাহার এমনি নির্মম নিরাসক্তি। এক বৃহত্তর চেতনা-বৃত্তে এই সুবৃহৎ কাজের রূপ কবির নিকট সেই নুড়ির দুর্গ রচনার ন্যায় বোধ হয়। কবি আজ জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এক বৃহত্তর দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহৎ বৈরাগ্যে আবৃত করিয়া।

"রচনা করতে বসেছি একটি কাজের রূপ
ঐ আকাশের তলায় ভাঙা মাটির ধারে,
ছেলেবেলায় যেমন রচনা করেছি
নুড়ির দুর্গ।" (খোয়াই : পুনশ্চ)

প্রত্যেকটি মানুষ এক-একটি বিশিষ্ট বোধের জগতের মধ্যে আবদ্ধ। আমরা আমাদের বিশিষ্ট সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা-অনাকাঙ্ক্ষা, ভালোলাগা-মন্দলাগা, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের বোধ লইয়া বহির্বিশ্ব ও মানব-সমাজের সহিত যতদূর সম্পর্কান্বিত ততটুকু আমাদের বোধের জগৎ। ইহার বাহিরে আর যাহা কিছু তাহার অস্তিত্ব হয়ত যুক্তি দিয়া সপ্রমাণ করিতে পারা যায়, কিন্তু আমাদের নিকট তাহা কেবল 'ছায়াছবি'।

"পথিকটিকে দেখা গেল
আমার বিশ্বের শেষ রেখাতে
যেখানে, বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল।"

(একজন লোক : পুনশ্চ)

কবি গন্ত-কাব্য সম্পর্কে একস্থলে বলিয়াছেন, গন্ত-কাব্যের প্রকাশ-রূপের সহায়তায় তাঁহার পক্ষে এমন কতকগুলি বিষয়বস্তুকে কাব্য-রূপ দান করা সম্ভব হইয়াছে, যেগুলিকে কাব্যের নিয়মিত ছন্দ-বন্ধের মধ্যে প্রকাশ করা সম্ভব হইত না। এই কথা ভূমিকায়ও তিনি বলিয়াছেন, "অসংকুচিত গন্ত-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।"

কাব্যের অধিকারকে বাড়িয়ে দেওয়ার অর্থ হইল বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং এইরূপে কবির চেতনা-বৃত্তির বিস্তৃতি। কবির কাব্যের সেই বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে 'ছেলেটা', 'বালক', 'কীটের সংসার', 'শিশুতীর্থ' প্রভৃতি কয়েকটি কবিতার মধ্যে।

বিচিত্রিতা

বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দে কবির প্রাণ যখন সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যীভূত হইয়াছে, তখন চেতনার অচিন্তনীয় ব্যাপ্তিতে কবি মুক্তির উল্লাস বোধ করিয়াছেন। মুক্তির এই উল্লাসবোধে, এই আকাঙ্ক্ষায় কবির অন্তর হইতে অবিরাম সৃষ্টি-ধারা সমুৎসারিত হইয়াছে।

বিচিত্রিতায় বিশ্ব-সত্তার সেই পরিপূর্ণ উপলব্ধি নাই বলিয়া কবি-প্রেরণা আজ একান্ত দীপ্তিহীন। বিচিত্রিতা হইতে কবি-প্রতিভার এই পরিণামের দিকটিই সর্ব্বাগ্রে নির্দেশ করিব।

বিশ্ব-প্রাণ-ধারা কবি-চিত্তকে আজ মুহূর্তে মুহূর্তে কেবল চকিত স্পর্শ করিয়া যায়। সেই চকিত স্পর্শে একটি ক্ষীণ আনন্দবোধ কবির অন্তরে জাগে। সেই পূর্ণ মিলনবোধ, মুক্তির সেই উল্লাস আজ আর নাই।

"ছবির মত ভাবনা পরশিয়া
একটু আছ মনেরে হরষিয়া।" (অচেনা)

প্রাণের সহিত প্রাণের যোগ তেমন নাই বলিয়াই আজ বাহিরের রূপটুকুই কেবল কবির দৃষ্টি-গোচর হয়। বিশ্বের অনন্ত রূপ-লীলার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে কবি পৌছাইতে চাহিয়াছিলেন।

"আমার কাছে রহিলে বিদেশিনী
লইলে শুধু নয়ন মম জিনি।" (অচেনা)

আজ বিশ্বজগতের বিচ্ছিন্ন রূপ কেবল দৃষ্টিগোচর হয়।

কবি যতই উন্নততর চেতনা-লোক লাভ করিয়াছেন এই জগৎ সেই সঙ্গে মহৎ হইতে মহত্তর রূপে কবির নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। ইহার সৌন্দর্য-সীমা ক্রমাগত প্রসারিত হইয়াছে। তবুও ঐ রহস্য পূর্বেও যেমন ছিল তেমনি রহিয়া গিয়াছে।

উন্নততর চেতনা-লোক লাভে অপরিচয়ের যে বিপুল বিস্ময় তাহা অবশ্য এক্ষেত্রে নাই। অন্তরে প্রতিভাসিত জগৎটাই একান্ত খণ্ডিতভাবে ক্ষীণ এক-প্রকার বিস্ময়বোধ জাগাইয়াছে। অনেক কালের সাক্ষাৎকার সত্ত্বেও কবির

নিকট এই জগৎ অপরিচিত রহিয়া গিয়াছে। এই অনেক কালের বিস্ময়বোধ এবং অপরিচয়ের কথা এবং আজিকার অপরিচয়-বোধের কথা আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে।

"অনেকদিন দিয়েছ তুমি দেখা,
বসেছ পাশে তবুও আমি একা!" (অচেনা)

কবি বিশ্ব-সত্তার অনুভূতি লাভে যেখানে সমর্থ হইয়াছেন তাহারই পরিচয় লাভ করিতে এখানে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। এই অংশ পাঠ করিলে স্বতঃই বুঝিতে পারা যাইবে কবি-প্রতিভা আজ কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছে।

একথা যদি সত্য হয় যে বিশ্ব-প্রাণের অনুভূতি-লাভের সহিত কবির সৃষ্টি-প্রতিভারও একটা নিবিড় যোগ আছে, তাহা হইলে একান্ত আচ্ছন্ন এই সৃষ্টি-প্রেরণার জন্য একথাও সত্য হইয়া উঠে, যে বিশ্ব-প্রাণের এই অনুভূতি কবির জীবনে আজ তেমনি সত্য নহে।

বহিঃসৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবির অন্তর ধীরে ধীরে ধ্যান-তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, এই ধ্যানের ভিতর দিয়া কবির চেতনা পরিশেষে সীমা-লোক অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

"নিরালা মাঠের মাঝে বসি
সাম্প্রতের আবরণ মন হতে গেল দ্রুত খসি।" (পসারিণী)

মন হইতে সাম্প্রতের আবরণ খসিয়া যাওয়ার পর কবির দৃষ্টিতে বিশ্বের যে রূপ উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

"আলোকে আকাশে মিলে
যে-নটন এ নিখিলে
দেখ তাই আঁখির সম্মুখে,
বিরাট কালের মাঝে
যে ওঙ্কার-ধ্বনি বাজে"— (পসারিণী)

দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত অন্তহীন রূপ-লীলা সাক্ষাৎকারের কোন বিস্ময়বোধই এখানে নাই। এইক্ষণে অন্ততঃ মানসী হইতে পূরবীর মধ্যবর্তী এই পর্যায়ের প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থের রূপ সাক্ষাৎকারের বিস্ময়বোধ যদি স্মৃতিপথে অতি দ্রুত একবার আবর্তিত হইয়া যায় তাহা হইলে পার্থক্য যে কত গভীর তাহা সহজেই বোধ করিতে পারা যাইবে।

প্রকৃতি এবং নারীর সৌন্দর্য অনুধ্যানের ভিতর দিয়া কবির চেতনা পরিণামে যে বিশ্বচেতনায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এই মহত্ব কবির সমগ্র জীবনের উপলব্ধি আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বিশ্ব-প্রাণের এক ছন্দ প্রকৃতি এবং মানবীর সৌন্দর্য ও প্রেমের মধ্যে অভিব্যক্ত।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম হইয়া কবি-চেতনা একবার বিশ্ব-প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে একবার নর-নারীর নির্বিশেষে প্রেম-চেতনার মধ্যে আপনাকে কিরূপ সীমাহীন রূপে বোধ করিয়াছে, তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। আজ তাহার ক্ষীণ আভাসমাত্র নিম্নে উদ্ধৃত এই জাতীয় পংক্তির মধ্যে লাভ করা যায়।

প্রকৃতির সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া অস্তিত্বের যে 'ঘনিষ্ঠ অনুভূতি ভরি উঠে মনে, প্রাণের যে প্রশান্ত পূর্ণতা', সেই অনুভূতি তিনি মানবীর সান্নিধ্যেও লাভ করিতেন।

"লভি তাই
যখন তোমার কাছে যাই",—(শ্যামলী)

যৌবনে কবির প্রাণ বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত যে একাত্ম হইয়া যাইত তাহাও কবি উল্লেখ করিয়াছেন। আজ সেই অনুভূতি নাই বলিয়া যৌবনের কথাই এমন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া মনে পড়ে।

ব্যক্তি এবং বিশ্ব-সত্তার মধ্যে প্রভেদ আছে, কিন্তু কবির যৌবনে ওই ভেদ-রেখাটি মুহূর্তে মুহূর্তে লুপ্ত হইয়া যাইত। যৌবনে প্রাণের দুর্নিবার প্রবাহ দুটি রূপকে একাকার করিয়া বিশ্ব-প্রাণ-সমুদ্রের অতলে কত বারবার তলাইয়া দিয়াছে।

"নিমেষে দোঁহারে করেছে সমান
একই আবর্তে টানি।" (প্রভেদ)

আজও কবি যে মাঝে মাঝে প্রাণের আকর্ষণে বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্মতা লাভ করিতে সমর্থ হইতেন তাহারও পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"আমারে তোমার বসাইল বাঁয়ে
একাসনে দিল আনি।
নবারুণ রাগে রাঙ্গা হয়ে গেল
কালো ভেদ রেখাখানি।" (প্রভেদ)

এই অনুভূতি কেবল বিবৃতি মাত্র। পূর্ণ মিলনের যে অলৌকিক আনন্দ-বাণী রূপলাভের জন্য উদ্দাম হইয়া উঠে সে আনন্দ-প্রেরণার কোন পরিচয় কি

এক্ষেত্রে আছে? উহারই একটা অতি ক্ষীণ আভাস কবি-চিত্তে চকিত একপ্রকার শিহরণ জাগাইয়া নিঃশেষিত হইয়াছে।

যৌবনের সৌন্দর্য ও প্রেমের বিচিত্র রঙীন বিহ্বল দিনগুলিই ধ্যান-লোকটিকে গড়িয়া তুলিতেছে। প্রাণের অনুভূতি এমনি করিয়া উন্নততর চেতনা-লোক লাভের জন্য ধ্যানলোক গড়িয়া তুলে।

"জান না কি যে-বসন্ত সম্বরিল কায়া
তারি মৃত্যুহীন ছায়া
অহর্নিশি আছে তব সাথে সাথে
তোমার অজ্ঞাতে।" (ছায়াসঙ্গিনী)

কবিতাটিকে ভিন্ন দিক হইতে পাঠ করা যাইতে পারে। যৌবন গত হয়, তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের সেই মধুময় দিনগুলিও চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়। এই অতীত হওয়ার অর্থ নিঃশেষ বিলুপ্তি নয়। সৌন্দর্য ও প্রেমের সেই অনুভূতি এই জীবনের সহিত কোন একটা স্বরূপে একাত্ম হইয়া থাকে।

ইহা পূরবীর 'তপোভঙ্গে'র সান্ত্বনা নয়। অর্থাৎ ওই সুপ্ত যৌবন আবার প্রকাশ লাভ করিবে এমনি করিয়া যৌবন বারংবার ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে, সমগ্র সৃষ্টি-তত্ত্বের সহিত বিজড়িত করিয়া এই জাতীয় তত্ত্ব-সৃষ্টি এবং সান্ত্বনা লাভের কোন প্রয়াস এখানে নাই।

সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলার ভিতর দিয়া জীবন ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য ও প্রেমই অন্তরে একটি পরম গম্ভীর ধ্যান-লোক গড়িয়া তুলে। পরিণত বয়সে এই ধ্যান-লোকটিকে আশ্রয় করিতে হয়।

পার্থিব অনুভূতি এইরূপে অপার্থিব অনুভূতি লাভে সহায়তা করে। যে রূপ জীবনের একটি বিশিষ্ট পর্যায়ে বহির্মুখীনতা দান করে, সেই রূপ আর একটি পর্যায়ে সমগ্র সত্তাকে অন্তর্মুখীন করিয়া ধ্যাননিমগ্ন করে।

"যে চাঞ্চল্য হয়ে গেছে স্থির
তারি মন্ত্রে চিত্ত তব সকরুণ শান্ত সুগম্ভীর।" (ছায়াসঙ্গিনী)

একান্ত শৈশব হইতেই কবির নিকট এই জগৎ ও জীবন পরম কোন এক সত্যের প্রতিভাস বলিয়া বোধ হইয়াছে; সেই সঙ্গে এই সত্য লাভের আকাঙ্ক্ষাও জাগিয়াছে।

তাঁহার সকল সৃষ্টি-কর্ম সকল সাধনার ভিতর দিয়া সেই পরিণাম লাভের আকাঙ্ক্ষাই নানা স্বরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

"যে আমারে হারালে সেই কবে
তারই সাধন করে গানের রবে
তোমার বীণাখানি।" (নীহারিকা)

কিংবা

"মোর বিরহ সব মিলনের তলে
রইল গোপন স্বপন-অশ্রু-জলে" (নীহারিকা)

চেতনার উর্ধ্ব পরিণামের যেমন শেষ নাই, তেমনি ওই অনন্তকে নিঃশেষে লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অচিন্তনীয় বিরাট বোধ মানব-চিত্তকে অভিভূত করে। অপরিচয়ের বিস্ময় তাই কোন কালেই লোপ পায় না।

অভিসার অন্তহীন বলিয়া যে-কোন পর্যায়ে কবির চেতনায় অতৃপ্তি বোধের পীড়া যেমন, তেমনি বেদনাবোধও রহিয়াছে। উর্ধ্বতর চেতনালোক প্রাপ্তির আনন্দ অতিক্রম করিয়া কবি-চিত্তে চিরকাল অতৃপ্তির বেদনার সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

সৃজনের পূর্বে অরূপ বা অসীম ছিলেন বন্ধ্যা। আপনার ঐশ্বর্য সাক্ষাৎকার হইতে তিনি ছিলেন বঞ্চিত। আপনার ঐশ্বর্য প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি আপনাকে আনন্দে প্রেমে দেশ-কালের পরিসীমায় আবদ্ধ করিয়াছেন। অসীম মায়া আশ্রয় করিয়া সীমারূপ গড়িয়া তুলিলেন।

এই রূপে অসীম আপনাকেই কোন উপায়ে (ইহাই মায়া) বিশ্লিষ্ট করিয়া আপনার আনন্দ-রূপকে নিত্য কাল ধরিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই পৃথক বোধ আছে বলিয়া বিশ্বের ঐশ্বর্য দিনের পর দিন অফুরান হইয়া উঠিতেছে।

ব্যক্তি বা বিশ্বের মাঝখানে এমনি ব্যবধান আছে বলিয়া ব্যক্তির এমন নিত্য ব্যাকুলতা। এই ব্যাকুলতাই সৃষ্টি-প্রেরণা রূপে অনুভূত হয়। এই মিলন-লাভের আকাঙ্ক্ষার ভিতর দিয়া মানুষ আপনার অন্তর্লীন ঐশ্বর্যকে নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

"এপারে চলে বর বধূ সে পরপারে,
সেতুটি বাঁধা তার মাঝে।

তাহারি পরে দান আসিছে ভারে ভারে
তাহারি পরে বাঁশি বাজে।" (বরবধূ)

এককালে যাহাদের তিনি নিকটে লাভ করিয়াছিলেন, আজ তাহারা কোথায়! জীবন-সায়াহ্নে তাহাদের স্মৃতি একে একে জাগ্রত হইয়া কবির হৃদয়কে করুণ-কোমল করিয়া তুলিয়াছে। সেই সকল আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে যে পরমের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহা কবির জীবনে আজও অচরিতার্থ রহিয়া গিয়াছে।

"সেই দূরে ছায়া রূপে রয়েছে সে
বিশ্বের সকল শেষে।
যে আসিতে পারিত, তবুও
এল না কভুও।" (অনাগতা)

এই অধ্যাত্ম শূন্যতাবোধের কালে কবি পরম মমতায় স্মৃতি-লোকটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া তো হৃদয়ের শূন্যতা ভরে না। এই দুঃসহ একাকীত্ব বোধের কথাই আলোচনার প্রারম্ভে উল্লেখ করিয়াছি।

প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যোপভোগের দিন, স্মৃতি-সঞ্চয়ের দিন কবির জীবনে গত হইয়াছে। আজ সৌন্দর্য সাক্ষাৎ করিলে স্মৃতি-লোকটিই কেবল উদ্বেল হইয়া উঠে। তাহারই ম্লান ছায়া সকল রূপের উপর প্রতিফলিত হইয়া ছায়াছবির মত ধীরে ধীরে সরিয়া যায়।

নিশ্চেষ্ট অবস্থায় স্মৃতি-লোকটি কখন বাহির হইয়া কবির দৃষ্টিসমক্ষে মরীচিকার মত ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন তিনি ওই স্মৃতিতে আবিষ্ট হইয়া পড়েন। সচেতন হইয়া বোধ করেন অজানিত বেদনায় হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, স্তিমিত দুই চোখের কোণে জল।

"এসেছিল বহু আগে যারা মোর দ্বারে
যারা চলে গেছে একেবারে
ফাল্গুন মধ্যাহ্নবেলা শিরীষ-ছায়ায় চুপে চুপে
তারা ছায়া রূপে
আসে যায় হিল্লোলিত শ্যাম-দূর্বাদলে।" (অনাগতা)

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিসিজম্ যে উন্নততর চেতনার জগৎলাভের আকাঙ্ক্ষা-প্রসূত তাহা আমাদের বুঝিতে হইবে। তাহা জীবনেরই প্রসার, জীবনবিমুখী

কল্পনাবিলাস নয়। জীবনের স্বরূপ লাভ করিবার জন্য কবির চেতনা উর্ধ্ব হইতে উর্ধ্বতর লোকে অভিসার করিয়াছে।

বাহিরের সৌন্দর্যকে ইন্দ্রিয়-চেতনার জগৎ হইতে মুক্ত করিয়া যখন ধ্যান-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, তখন ওই সৌন্দর্য কতকটা মুক্ত স্বরূপতা লাভ করে বলিয়া উহার সম্ভোগে মানুষ তেমন বন্ধন-পীড়া বোধ করে না।

ধ্যান-লোকে সৌন্দর্য ও প্রেমের এই যে সম্ভোগ তাহা আদিতে প্রাণের অতি গভীর অনুভূতিকে আশ্রয় করে বলিয়া সুপরিণত বয়সে প্রাণের অনুভূতি ক্ষীণ হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান-লোকটিও ক্রমশঃ শ্রীহীন হইয়া পড়ে।

এক্ষেত্রে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি; সেক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও প্রেমের অনুভূতি ধ্যান-লোকে অন্তশ্চেতনাকে দ্বিধা করিয়া কেমন পরস্পরের আসঙ্গ লাভ করিয়া ধন্য হইতেছে তাহার একটা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে সত্য, কিন্তু 'কল্পনা' প্রভৃতি কাব্যের সেই আন্তর লীলার, সেই ঐশ্বর্যের কোন প্রকাশের পরিচয় এক্ষেত্রে নাই।

মানস-লোকটিই দ্বিধা হইয়া একদিকে মানস-প্রজাপতি রূপে মনেরই আর একটি অংশকে পুষ্পিত করিয়া তাহারই সৌন্দর্য সম্ভোগ করিয়া চলিয়াছে।

একদিকে

"ঐ যে তোমার মানস প্রজাপতি"

অন্যদিকে

"মনে তোমার ফুল ফোটান মায়া"

এই উভয়ের সেই মানস-সম্ভোগ

"মরীচিকার ফুলের সাথে
মরীচিকার প্রজাপতির মিলন ঘটে ফাল্গুন প্রভাতে।"

একদিকে 'ফাল্গুন প্রভাত' অন্যদিকে 'তোমার যৌবন' অর্থাৎ প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য কবির অন্তরে প্রাণের ক্ষীণ সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে।

এই ধ্যান-লোক হইতে কবি সৌন্দর্য ও প্রেমের লীলা সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়া বাহিরের 'রূপ' আপনার সীমাকে অনেকটা ছাড়াইয়া বিরাটতর কোন এক সৌন্দর্য ও প্রেমকে আভাসে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। মনুষ্য-চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে একই সত্তা ততই বিরাটতর সৌন্দর্য-লোকের আভাস দান করে।

"মনে হয় যেন তুমি ভুলে যাওয়া তুমি
মর্ত্য ভূমি,
তোমাদের যা বলে জানে সেই পরিচয়
সম্পূর্ণ তো নয়।" (পুষ্পচয়নী)

কিংবা

"যে ভঙ্গীটি পেয়েছে প্রকাশ
দেয় বহু দূরের আভাস।
মনে হয় যেন অজানিতে
রয়েছে অতীতে।" (পুষ্পচয়নী)

এই সৌন্দর্য সাক্ষাৎ যে ধ্যানাশ্রয়ী তাহা সৌন্দর্যের ব্যাপকতা ও বিস্ময়বোধ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

"আজি মোর চোখে
কাছের মূর্তির চেয়ে দূরের মূর্তিতে তুমি বড়ো।" (বিদায়)

বিরহে প্রেমের আধারটি দৃষ্টি বহির্ভূত হইলে অন্তরে অতলস্পর্শ শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কারণ প্রেমে যে প্রাণের উপলব্ধি তাহা ওই কালে কতকটা ঊর্ধ্ব পরিণাম লাভ করিলেও তাহা ইন্দ্রিয়-চেতনাকেই মুখ্যতঃ আশ্রয় করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় আশ্রয় শূন্য হইয়া পড়িলে মানুষ অন্তরের মধ্যে সীমাহীন শূন্যতা বোধ করে। তাহার পর প্রাণের প্রেরণায় ধ্যান-লোকে ওই রূপটি ইন্দ্রিয়-চেতনাশ্রয় হইতে অনেকাংশে মুক্ত হইয়া যায় বলিয়া তাহার আর এক বিরাট রূপ ফুটিয়া উঠে। মানুষ তখন ধ্যানের ওই রূপ আশ্রয় করিয়া বাহিরের সকল রূপ পরিহার করে। অন্তর্লোকের সেই সৌন্দর্য ও প্রেমের তুলনা বাহিরে কোথাও নাই।

সর্বস্ব সমর্পণের সার্থকতা তো কাহারও প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে না। ইহা সেই প্রেরণা, যে প্রেরণায় মনুষ্য-চেতনা বহির্বিশ্বকে পরিহার করিয়া ধ্যান-লোকে, ক্রমে ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর লোকে অভিসার করে। বাহিরে ত্যাগের সার্থকতা অন্তরে ক্রমিক প্রাপ্তির মধ্যে।

এই কালে কবি-চিত্তে যে বিচিত্র অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা জাগিয়াছিল তাহারও কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। এই জিজ্ঞাসাগুলি কবির জীবনে যেমন নূতন নয়, তেমনি উহারা কবির সমগ্র সত্তা মথিত করিয়া জাগ্রত হয় নাই।

বস্তুত পূর্ববর্তী জীবনের দার্শনিক জিজ্ঞাসা ও উপলব্ধিগুলি আজ ক্ষণে ক্ষণে কেবল অবশ প্রেরণায় কবি-চিত্তকে মুহূর্তের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া তুলে।

বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দন প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যরূপে নর-নারীর মধ্যে প্রেমরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও নর-নারীর প্রেমের মধ্যে একই প্রাণের প্রকাশ, পার্থক্য কেবল পরিণামগত।

"তোমার আমার মর্মতলে
একটি যে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।
কী যে বলে সেই সুর, কোন দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।" (পুষ্প)

অসীম কালের পটে কণাতম কালে আনন্দ-বেদনাপূর্ণ জীবনের এই যে বিদ্যুচ্চকিত প্রকাশ ইহার অর্থ কি? অসীম প্রাণের কোন ইচ্ছায় এই জীবন গড়িয়া উঠিয়া আবার বিলীন হইয়া যায় তাহার স্বরূপ আমরা জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে আমাদের জীবন-বিকাশ যেমন আমাদের ইচ্ছায় হয় নাই, ইহার বিনষ্টিও তেমনি আমাদের ইচ্ছা-বহির্ভূত। সুতরাং ইহার অর্থ যদি কোথাও থাকে, তবে তাহা তাঁহারই মধ্যে যাঁহার ইচ্ছায় এই প্রাণের প্রকাশ।

জীবনের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারা যাক কিংবা না যাক, এই জীবন-লীলার পশ্চাতে কাহারও সচেতন আকাঙ্ক্ষা এবং সাক্ষাৎকার যে আছে, সে সম্পর্কে কবি নিঃসংশয়।

মৃত্যুতে এই জীবনের সমস্ত কিছুর অবসান। এই ধরণীর বুকে তাহার চিহ্ন মাত্রও কোথাও কোন স্বরূপে থাকে না।

"তার পরেতে ভোলার পালা, কথা কবে না,
অসীম কালের পটে ছবির চিহ্ন রবে না।" (সাজ)

কিন্তু এই স্বরূপ সম্পর্কে কবি নিঃসংশয়—

"এই মানে তার বুঝতে পারি
খেয়াল যাঁহার খুশি তাঁরি
জান-না-জান।" (সাজ)

একদিকে বিশ্ব-প্রাণপ্রবাহ অন্যদিকে রূপে রূপে নর-নারীর হৃদয়ে প্রেম-স্বরূপে তাহার বিচিত্র প্রকাশ।

প্রকৃতি ও মানবের সৌন্দর্য ও প্রেমকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া যে সাক্ষাৎকার, তাহাই রবীন্দ্রকাব্যে পূর্ণ সাক্ষাৎকার তত্ত্ব। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে এই তত্ত্বটির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে; কিন্তু বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত নর-নারীর প্রেমের পূর্ণযোগের সেই অপার সৌন্দর্যলীলার সেই মহৎ ঐশ্বর্যের কোন পরিচয় মিলিবে না।

নিখিল বিশ্বসৃষ্টির অন্তরালে যে প্রাণ-প্রৈতি, যে আদি বাসনা, সেই বাসনা চাঞ্চল্যে নিত্য অন্তহীন রূপ সৃষ্টি হইয়া মহাশূন্যে নিত্যকাল কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছে। এই চলার আদি নাই অন্ত নাই।

নর নারীর মিলন-আকাঙ্ক্ষার মাঝে সেই আদি এষণা। এই আকাঙ্ক্ষায় যখন তাহারা মিলিত হয়, তখন বিশ্বের সুরের যোগে উহারই সৃষ্টি-প্রেরণায় তাহাদের সকল সৃষ্টি সুন্দর ও সার্থক হইয়া উঠে।

"সমস্ত বিশ্বের মর্মে যে চাঞ্চল্য তারায় তারায়
তরঙ্গিছে প্রকাশ ধারায়
নিখিল ভুবনে নিত্য যে সঙ্গীত বাজে
মূর্তি নিল বনচ্ছায়ে যুগলের সাজে।" (যুগল)

বাহিরের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট সৌন্দর্য, অন্তরে ধ্যান-লোকে আর এক সৌন্দর্যে পরিণত হইয়া যায়। এই ধ্যানের সৌন্দর্যকে বেষ্টন করিয়া থাকে এক অপার্থিব-জগতের আভা। এই আভা বিজড়িত হইয়া ধ্যানের সৌন্দর্য এক বিস্মিত রূপ উদ্ঘাটিত করে। সীমা-বদ্ধ রূপ এইরূপে অন্তরে জড়ের বন্ধনমুক্ত হইয়া একপ্রকার মুক্ত স্বরূপতা লাভ করে। একখণ্ড মেঘকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া সূর্যের কিরণ যেমন মুহূর্তে মুহূর্তে শত বর্ণের আলিম্পনা আঁকে, অপূর্বতার নানা আভাস, তেমনি এই রূপকে আশ্রয় করিয়া অলৌকিকতার নানা আভাস অন্তরে আসিয়া পৌঁছায়।

"কেমনে জানিবে তুমি তারে সুর দিয়ে
দিয়েছি মহিমা।
প্রেমের অমৃত স্নানে সে যে অয়ি প্রিয়ে,
হারায়েছে সীমা।" (আরশি)

কালের আবর্তে, পথ চলায় একদিন আত্মবিস্মৃত প্রেম হারাইয়া যায়। কিন্তু এই হারাইয়া যাওয়ায় তাহার নিঃশেষ বিলুপ্তি ঘটে না, তাহা স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে। তাহার পর একদিন উদাস অবসরে ওই বিস্মৃত প্রেমের আত্মপ্রকাশ ঘটে সুদুর্লভ মহিমায়। তখন ওই স্মৃতির মূর্তিটিকে বেষ্টন করিয়া মন নিত্য অশ্রুপাত করিয়া চলে। এক-একটি অশ্রুবিন্দু পূজার এক-একটি ফুল।

"এতদিন পরে ভাণ্ডার খুলে
দেখছি তোমার রত্নমালা
নিয়েছি তুলে বুকে।"

সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি, নানা তুচ্ছ কর্ম, নানা ঘটনার সূত্রে গাঁথা জীবন, তারই মধ্যে প্রেমের স্পর্শ নামে অন্তরে হয়ত মুহূর্তের জন্য, কিন্তু সেই মুহূর্ত মানুষের চেতনাকে সকল বাধামুক্ত করিয়া কোন্ সীমাহীন-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। এক অপার্থিব সৌন্দর্য-লোকের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। জীবন ও জগৎ ঘিরিয়া অসীম রহস্যের মহামৌনতা মুহূর্তের জন্য যেন ঘুচিয়া যায়, সৃষ্টি-লোকের গূঢ়তম মহামন্ত্র চিত্তকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠে।—এক গভীরতম অস্তিত্বের অনুভূতি।

"জোয়ারের তরঙ্গ লীলায় গভীর থেকে উৎক্ষিপ্ত হ'ল
চির দুর্লভের একটি রত্নকণা
শতলক্ষ ঘটনার সমুদ্রবেলায়।"

প্রেম জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতির সঞ্চয়। জীবনের সকল পরিণাম, সকল পরিবর্তনের ঊর্ধ্বে তাহা স্থির ধ্রুবতারকার মত কিরণ বিস্তার করে। আর সেইদিকে স্থিরদৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একদিন জীবন-মৃত্যুর অতলতার মধ্যে হারাইয়া যায়। তখনও কি সেইসব সঙ্গহারা জীবনের অজ্ঞাত কোন পরিণামে এই দুর্লভ প্রেমই একমাত্র সঙ্গী হইয়া থাকে?

"তারপরে মনে পড়ে
একদিন সেই বিস্ময়-উন্মনা নিমেষটিকে
অকারণে অসময়ে;—"

সৃষ্টির যাহা চরম সত্য তাহা অমনি সহজ, সরল, তাহা অমনি নিঃসংশয় প্রত্যক্ষগোচর, যেমন প্রত্যক্ষগোচর রৌদ্র-ঝলমল একগুচ্ছ কিশলয়। প্রাণের কী আশ্চর্য রূপময় প্রকাশ! সমগ্র সৃষ্টির অন্তরালে সেই এক আশ্চর্যের প্রকাশ। প্রেমে প্রাণের জাগরণের ভিতর দিয়া সমগ্র সৃষ্টি-রহস্যের কিছু আভাস লাভ করিতে পারা যায়। হয়ত কোন শুভলগ্নে সেই রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত, কিন্তু তাহার পূর্বেই কবির সেই প্রেম অবসান লাভ করিয়াছে। শ্রেষ্ঠ উপলব্ধির সেই নিরাভরণ বাণীরূপ কেমন? যেমনই হোক জীবনে তাহার প্রকাশ ঘটিলে কোথাও আর সংশয়ের লেশমাত্র থাকে না।

শ্লোকের একটি পদ পুরুষ আর একটি পদ নারী। প্রেমে এই দুইটি পদের মধ্যে মিল ঘটে। তখন জীবন-শ্লোকের সম্পূর্ণ অর্থটি ধরা পড়ে। প্রেমের অনুভূতি নর-নারীর জীবনে এতখানি অর্থাবহ। প্রেমের দুর্লভতাকে, নর-নারীর জীবনে তাহার আধ্যাত্মিক তাৎপর্যকে কবি কত রূপে কত ভাবে যে ফিরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। নিম্নে অনুরূপ আর একটি প্রকাশ।

"আমি যে খুঁজে বেড়াই
সে তো আমার ছিন্ন জীবনের
সবচেয়ে গোপন কথা;
ও-কথা হঠাৎ আপনি ধরা পড়ে
যার আপন বেদনায়,
আমি জানি
আমার গোপন মিল আছে তারি ভিতর।" (ত্রিশ : শেষ সপ্তক)

সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ অনুভূতির দিন, সৌন্দর্য ও প্রেমের বিচিত্র স্বপ্ন সঞ্চরণের দিনের অবসান ঘটে। থাকে ওই সকল স্মৃতির সম্পদগুলিকে নানাভাবে গভীর মমতায় একে একে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবার দিন। কবির এই দুটি জীবন-পর্যায়েরই পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি।

"ঝরে পড়া ফুলের ঘন গন্ধে আবিষ্ট আমার প্রাণ,
চারদিকে তার স্বপ্ন মৌমাছি
গুন গুন করে বেড়ায়,
কোন্ অলক্ষ্যের সৌরভে।"

প্রাণের সম্পদ সঞ্চয়ের দিনের শেষ হয়, সেই সঙ্গে প্রাণ-লোকের সহিত ধীরে বিচ্ছেদ ঘটিতে থাকে। বিচ্ছেদ ঘটে, কিন্তু মনের গ্রন্থি আরো দৃঢ় হয়। এই স্মৃতি-লোকটিকে মানুষ তখন আরো গভীর করিয়া জড়াইয়া ধরে। স্মৃতি-লোকে জড়ের বন্ধন-মুক্তি কতকটা ঘটে, কিন্তু স্মৃতি-লোকও সীমার লোক। তাই স্মৃতি-লোক জীবন ও জগতের সম্যক পরিচয় লাভের পথে দুর্লভ বাধার সৃষ্টি করে। কবি তাই তাঁহার স্মৃতি-লোকের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুল। ব্যক্তির সকল প্রকার সীমিত বোধের বাহিরে আসিবার জন্য ব্যাকুলতা। তাহা হইলে জীবন ও জগৎকে তাহার যথার্থ স্বরূপে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হইবে।

"এই ছায়ার বেড়ায় বদ্ধ দিনগুলো থেকে
বেরিয়ে আসুক মন
শুভ্র আলোকের প্রাঞ্জলতায়।
অনিমেষ দৃষ্টি ভেসে যাক
কথাহীন ব্যথাহীন চিন্তাহীন
সৃষ্টির মহাসাগরে।"

সীমিত বোধের বাহিরে আসিয়া পরম অস্তিত্বের অনুভূতি লাভের এই যে আকাঙ্ক্ষা তাহা ব্রহ্মবাদীদের অরূপ বা অসীম যে নয় তাহা অন্ততঃ নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। তাহা কি, না সৃষ্টির প্রেরণা বক্ষে লইয়া যে অন্তহীন প্রাণের প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে, যে প্রবাহে মুহূর্তে মুহূর্তে সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে, তাহারই সামগ্রিক অস্তিত্বের উপলব্ধি।

"এর আলো-ছায়ার উপর দিয়ে
ভাসতে ভাসতে চলে যাক আমার চেতনা
চিন্তাহীন তর্কহীন শাস্ত্রহীন
মৃত্যু-মহাসাগর সঙ্গমে।"

প্রাণ-তত্ত্বে মহাপ্রাণ ও মহামৃত্যু সমার্থক।

এই বিশ্বলোক ঈশ্বরের অন্তহীন মানস-সরোবরের একটি পদ্ম। এই বিস্‌সৃষ্টি পদ্মের দল একটির পর একটি করিয়া বিকশিত হইতেছে, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের একটির পর একটি করিয়া দ্বার ধীরে উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইতেছে। একটি পরিণামে এই বিস্‌সৃষ্টি-পদ্ম পূর্ণ বিকশিত হইয়া তাহার অন্তর্লীন সকল ঐশ্বর্যকে প্রকাশ করিবে। তিনি আপনার সৃষ্টির সেই পূর্ণ প্রকাশ দেখিবার জন্য আপনি

অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন। তাঁহার সেই প্রতীক্ষার সেই প্রেমের কী পার আছে! কত যুগ-যুগান্ত পার হইয়া গিয়াছে সামনে কত যুগ-যুগান্ত!

সমগ্র বিশ্বের সহিত একাত্ম বলিয়া মানুষের জীবনে এই একই নিয়তি চরিতার্থ হইবে। অর্থাৎ এক-একটি ব্যক্তি-সত্তাকেও আশ্রয় করিয়া চেতনার ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। এই বিকাশ তো এক জীবনে এক-লোকে সম্পূর্ণ হয় না। লোক হইতে লোকান্তরের ভিতর দিয়া মানবাত্মা রূপ হইতে রূপান্তর লাভ করিয়া চলিয়াছে।

"এই আমার সমগ্র সত্তা
তার সমস্ত সঞ্চয় সমস্ত পরিচয় নিয়ে
কোনো যুগে কি কোনো দিব্য সৃষ্টির সম্মুখে
পরিপূর্ণ অবারিত হবে?

এই জিজ্ঞাসা সংশয়মূলক নয়, বরং পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-প্রত্যয়প্রসূত। তাহা তাঁহার পরবর্তী উক্তি হইতে বোধ করিতে পারা যায়।

"কবে প্রকাশ হবে পূর্ণ,
আপনি প্রকাশ হব আপনার আলোতে।"

কবির এই প্রার্থনা উপনিষদের ঋষি-কবির প্রার্থনার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

"পূষন্ ; একর্ষে যম, প্রাজাপত্য
ব্যূহ রশ্মীন সমূহ-তেজঃ
যৎ তে রূপং কল্যাণতমম্, তৎ তে পশ্যামি
যো সাব অসৌ পুরুষম্ সোহম্ অস্মি।"

কিন্তু এই উভয় প্রার্থনার মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ যে 'আমি'র পূর্ণতা লাভ করিতে চান তাহা অন্তর ও বহিঃসত্তার পূর্ণতা, বহির্বিশ্বের যোগে যাহার ধীর বিকাশ। ইহাতে আছে দেশ-কাল ও রূপের পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। উপনিষদের ঋষি-কবির প্রার্থনায় (অন্ততঃ অদ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্যা বা ভাষ্য অনুসারে) যে-'আমি', তাহা কেবল অসীম বা অরূপ। তাহার সহিত দেশ-কাল ও রূপের কোন তত্ত্ব নাই। দেশ-কাল ও রূপের যে-কোন তত্ত্ব তো মানব মন ও বুদ্ধি প্রসূত, যাহা আদৌ সীমিত বোধ, তাহাই মায়া।

বিশ্বের যোগে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনকে আশ্রয় করিয়া কবির চেতনা কত বারবার সীমাহীন মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া যে অন্তহীন বিচিত্র মানস-সম্ভোগ, ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের ধীর সামর্থ্য হ্রাসের ফলে ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিয়া জীবনাবসানে একদিন নিঃশেষে লুপ্ত হইয়া যাইবে।

"যে প্রদীপ জ্বলেছিল মিলন-শয্যার পাশে
সেই প্রদীপ এনেছিলেম হাতে ক'রে।
তার শিখা নিবল আজ,
সেটা ভাসিয়ে দিতে হবে স্রোতে।"

কিংবা

"যে বাঁশি বাজিয়েছি
ভোরের আলোয়, নিশীথের অন্ধকারে,
তার শেষ সুরটি বেজে থামবে
রাতের শেষ প্রহরে।"

কবির ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের আধারই তো প্রদীপ, তাহাই তো বাঁশরি। মৃত্যুতে ইহার নিঃশেষ বিনষ্টি ঘটে এমনি একপ্রকার অধ্যাত্ম-প্রত্যয় কবির পরবর্তী জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। 'বলাকা'য় এই বোধের প্রথম পরিচয় লাভ করা যায়। নিখিল বিশ্বে ব্যক্তি-সত্তার বিশেষের কোন মূল্য নাই। কেবল মানব-জীবনে নয় বিশ্বসৃষ্টির সর্বত্রই সত্তার এই বিনাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশে যাহা এত সত্য, এত প্রত্যক্ষ, এত নিবিড়, এমন একান্ত, অনিবার্য, অসংশয়, মৃত্যুতে তাহার নিঃশেষ অবসান ঘটে এও সত্য। জীবন ও জগতে একক সত্তার বিনাশ কোন শূন্যতার সৃষ্টি করে না। এই উপলব্ধির মধ্যেই কিন্তু কবিতার সমাপ্তি নয়।

"তবু তার আগে কোনো একদিনের জন্য
কেউ একজন
সেই শূন্যটির কাছে একটি ফুল রেখো
বসন্তের যে ফুল একদিন বেসেছি ভালো।"

মানব-প্রেমের মধ্যে সেই অমৃত আছে, যাহার মুহূর্তের আস্বাদ জন্ম-মৃত্যুর সকল সীমানা পার হইয়া যায়। তাঁহার সমগ্র সৃষ্টির মর্মমূলে এই আস্বাদ আছে। কাব্যের ভিতর দিয়া মানব অন্তরে সেই আস্বাদকে তিনি অনিবার্য করিয়া তুলিয়াছেন। মানব-প্রেম হইল অসীমের সীমিত প্রকাশ। মানব-প্রেমের ভিতর দিয়া আমরা অসীমকেই বিচিত্ররূপে সম্ভোগ করি।

দেশ-কালের বক্ষে কত কোটি কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া মহত্তম রূপ হইতে ক্ষুদ্রতম প্রাণ-কণা পর্যন্ত অন্তহীন রূপ-লোকের সৃষ্টি হইতেছে, আবার তাহার বিনাশ ঘটিতেছে। ইহা যেন প্রাণ-সমুদ্রে অন্তহীন বুদ্বুদের বিকাশ ও বিনষ্টি। এই প্রাণ-ধারা কোন্ অকূল হইতে কোন্ অকূলে ছুটিয়া চলিয়াছে তাহা কে জানে!

"মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতল স্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ-শিখরে
উচ্ছৃত হয়ে উঠছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গ তলে।"

তাঁহার ধ্যানই একবার অন্তহীন সৃষ্টিরূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে, আবার তাহারা তাঁহার ধ্যানের মধ্যেই বিলীন হইয়া যাইতেছে।

এই সৃষ্টি ও বিনষ্টির উর্ধ্বে যে অবিক্ষুব্ধ শান্তি, যে নির্মল নিরাসক্তির লোক, কেবল পরম অস্তিত্ব রূপে যাহার প্রকাশ, সমগ্র চঞ্চলতার মধ্যে যাহা মহান্ বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ অচঞ্চল হইয়া রহিয়াছে। এই উপলব্ধি বৌদ্ধ স্পন্দবাদ হইতে রবীন্দ্রনাথকে মূলতঃ পৃথক করিয়াছে। নিম্নের পংক্তি কয়েকটির মধ্যে সেই অধিষ্ঠানভূমি লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষাই ব্যক্ত হইয়াছে।

"জীবন আর মৃত্যু, পাওয়া ও হারানোর মাঝখানে
যেখানে আছে অক্ষুব্ধ শান্তি
সেই সৃষ্টি হোমাগ্নি-শিখার অন্তরতম
স্তিমিত নিভৃতে
দাও আমাকে আশ্রয়।"

যিনি অসীম দেশ-কালের মধ্যে তিনিই আপনাকে অন্তহীন সীমা-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রকাশেই তাঁহার আনন্দ, তাঁহার লীলা।

মানুষের সৃষ্টির মূলে এমনি অহেতুক আনন্দ-প্রেরণা। বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের যে অলৌকিক আনন্দ-অনুভূতি, বিচিত্র সৃষ্টি তাঁহারই বন্দনা-গান। সৃষ্টি প্রাণের যোগে প্রাণের প্রকাশ আবার প্রাণেই তাহার অবসান।

"এই নিত্য বহমান অনিত্যের স্রোতে
আত্মবিস্মৃত চলতি প্রাণের হিল্লোল;
তার কাঁপনে আমার মন ঝলমল করছে
কৃষ্ণচূড়ার পাতার মতো।"

কবির সৃষ্টি এই প্রাণ-সঞ্জীবিত মনের আনন্দানুভবের প্রকাশ। নিখিল বিশ্বের অন্তরালে যে প্রাণ বিচিত্ররূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে, সেই একই প্রাণ ব্যক্তি-হৃদয় আশ্রয় করিয়া নানা সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সেই সকল সৃষ্টির গায়ে নামাঙ্কিত করিয়া রাখিবার যে চেষ্টা তাহা মানবিক হইতে পারে, কিন্তু তাহার অধ্যাত্ম মূল্য কিছু নাই। তাহা আসক্তি মাত্র। কালে তাহা একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এই আসক্তিকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টাই বর্তমান কবিতার মুখ্য প্রেরণা।

"সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্ব চিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।"

মানুষ আপনার ভাবনাকে বাহিরে রূপায়িত করে। এই রূপায়ণকে আমরা বলি সৃষ্টি। ব্যক্তি-মানুষ সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া যাহা সৃষ্টি করে, সেই সকল সৃষ্টি-রূপকে জোড়া দিয়া তাহার একটি মানস-রূপ গড়িয়া তোলা সম্ভব। এই ভাব-জগৎটিকে আমরা বলি ব্যক্তির অধ্যাত্ম-সত্তা। সৃষ্টি-রূপ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির এই যে সত্তার উপলব্ধি, তাহা প্রত্যক্ষগোচর। ইহাকেই বলি স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব বা আমিত্ব। কিন্তু ব্যক্তির কতটুকু প্রকাশ ঘটে তাহার সৃষ্টির মধ্যে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে সীমাহীন অপ্রত্যক্ষতা। এই অপ্রত্যক্ষতার আবরণের অন্তরালে থাকিয়া বিশ্ব-স্রষ্টা তাঁহার একটি ভাবনা বা অভিপ্রায়কে রূপায়িত করিয়া চলিয়াছেন। যতদিন না সেই ভাবটি সম্পূর্ণরূপে রূপায়িত হইতেছে ততদিন ব্যক্তি-মানসের পক্ষে সেই ভাবের সম্যক্ উপলব্ধি অসম্ভব। কবির সমগ্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহার একটি আভাস হয়ত লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু সেই সমগ্র রূপ-কল্পনা অসম্ভব।

কবির এই জীবনে বিধাতার সেই অভিপ্রায় সম্পূর্ণ সার্থক হয় নাই—

"আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয়নি,
তাই আমাকে বেষ্টন ক'রে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা;
অজানার ঘেরের মধ্যে এ সৃষ্টি রয়েছে তাঁরি হাতে,
কারো চোখের সামনে ধরবার সময় আসেনি,

সবাই রইল দূরে,
যারা বললে 'জানি', তারা জানল না।"

অসম্পূর্ণতার এই বেদনাবোধ কিন্তু এই কবিতার শেষ কথা নয়। এক-একটি ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের এক-একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় চরিতার্থ হইতেছে বলিয়া এই অভিপ্রায়ের সম্পূর্ণ রূপায়ণের পূর্বে কোন সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তি তাই অসম্ভব। মৃত্যু জীবনের একটি ছেদ মাত্র, নূতন আরম্ভের সূচনা। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া জীবনের ধারা বহিয়া চলে যে পর্যন্ত না একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতেছে।

"এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে ?
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষী।"

কোন্ অধ্যাত্ম-উপলব্ধিতে কবি-হৃদয় সান্ত্বনা লাভ করিয়াছে, তাহার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। তাহার পর কবির ওই জিজ্ঞাসা—

"তার নকশা শেষ হবে কবে ?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার ?"

মুক্তি বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন তাহারও পরিচয় এই উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়। ব্যক্তি-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় যতদিন না চরিতার্থ হয়, ততদিন জীবনের গতি অব্যাহত থাকে। জন্ম হইতে জন্মান্তরে তাহার যাত্রা চলিতে থাকে। ব্যক্তি-সত্তা তাহার এই বিশিষ্ট অভিপ্রায়টিকে যখন সম্পূর্ণরূপে লাভ করে তখনই ব্যক্তির মুক্তি। মুক্তি এই পরিপূর্ণতা। এই পরিপূর্ণতা সাধন ব্যতিরিক্ত যে মুক্তি রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহা শূন্যতা মাত্র। ব্যক্তি-সত্তা তাহার বিশিষ্ট-স্বভাবের (এই বৈশিষ্ট্যকে স্বধর্ম বলে, তাহার কারণ ইহার ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় চরিতার্থতা লাভ করে।) ভিতর দিয়া যখন সম্পূর্ণতা লাভ করে, তখনই ঈশ্বরের সহিত তাহার 'প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়। ঈশ্বরের

সহিত পূর্ণ বিকশিত ব্যক্তির প্রত্যক্ষ যোগের এই লীলাই রবীন্দ্রনাথের নিকট মুক্তি।

সৃষ্টির সমগ্র সম্ভাবনা যে বীজ রূপে কোথাও ছিল এবং তাহাই যে ধীরে বিকাশ লাভ করিয়াছে প্রাচীন ধর্ম ও দার্শনিক চিন্তায় এই ধারণা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

একটা নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসের সহিত বিজড়িত হইয়া পূর্ব নির্ধারণের এই মতবাদ পাশ্চাত্য চিন্তাশীলদের চিন্তাধারাকে নানাভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। হিন্দুর জন্মান্তর বা কর্মবাদের ধারণা ইহারই কতকটা ভিন্ন রূপ।

আধুনিক বিজ্ঞানের যান্ত্রিক যুগে মানুষ এখন ঈশ্বরকে মহান্ পরিকল্পনাকার এবং এক মহা যন্ত্রের নির্মাতা রূপে কল্পনা করে। জীনস্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মানুষের এই স্বরূপটির কথা বলিলেও তাহার কতকটা স্বাধীন ইচ্ছাকেও সেই সঙ্গে স্বীকার করিয়াছেন।

মানুষের এই স্বাধীন ইচ্ছার স্বরূপ লইয়া আলোচনা করিয়াছেন বর্তমান যুগে পশ্চাত্য বহু চিন্তাশীল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। ইঁহাদের মধ্যে কতকটা স্বল্প-পরিচিত Sir William Bragg, Mr Wisdom, Prof. C. D. Brood, L. J. Russell, E. F. Carritt এবং Mr H. W. B. Joseph প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ব্রাগ মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাকেও কতকটা স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। তিনি বলেন, বিশ্বের যথার্থ স্বরূপ এখনও আমাদের অজ্ঞাত বলিয়া এই সম্পর্কে আমরা এখনও কোন নিঃসংশয় অভিমত প্রকাশ করিতে পারি না। বৈজ্ঞানিক এডিংটনের মতের সহিত ব্রড এবং রাসেলের মতের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। তিনি বিশ্বাস করেন বিশ্বে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার ধারণা কতকটা বিরুদ্ধ।

বস্তুত ধর্মীয় পূর্ব নির্ধারণ ও ও পূর্ব জ্ঞানের ধারণা এবং বৈজ্ঞানিক নিমিত্ত-বাদের ধারণা—আমাদের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছে। বিজ্ঞানের নিমিত্তবাদের ধারণাকে শিথিল করিতে হাক্সলের রচনাবলী বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছে এডিংটন ল্যাপলাসের মত চরম চৈতন্যে (Supreme Intelligence) বিশ্বাস করেন। তাহার পর তিনি দিব্য ইচ্ছার সহিত মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার সমন্বয় সাধনের নানাভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। অবশ্য সে চেষ্টা কোনোও সার্থক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

Stebbing প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা এই যে, আমাদের একটি স্বাধীন সত্তা আছে সন্দেহ নাই, তবে আমাদের কর্মের স্বাধীনতা সীমিত, কারণ জগতে আমরা একা নই, তাহা ছাড়া আমাদের অনেক ইচ্ছা আছে অসঙ্গত এবং যে জগতে আমরা বাস করি সে জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনও যথেষ্ট নয়।

এই সম্পর্কে Stebbing-এর একটি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Human freedom consists in this : that we do not yet know what we shall be, not because the knowledge is too difficult to acquire, not because there are no certainties but only very great improbabilities, but because we are not yet finished. We are begun ; what we have already become and are now becoming plays a part in what we shall become. Nothing could be more inadequate image for a human being than a pot or a machine, unless it be a hazy collection of qualities accidentally collected and labelled with a name."

(L. Susan Stebbing : Philosophy and the Physicists)

বিচিত্র তারে বাঁধা, সুরে বাঁধা, যন্ত্রের প্রকাশ সীমিত। তাহার চতুর্দিকে মানুষ কত সৌন্দর্যের আলপনা আঁকে, কত বিচিত্র রঙ না ফুটাইয়া তোলে। তাহাকে ঘিরিয়া মানুষের এই ভালোলাগার ভালোবাসার বিচিত্র প্রকাশ। কিন্তু যন্ত্রে যে সুর ধ্বনিত হয় তাহাতে সীমার সকল পরিচয় হারা। সুরের সে কম্পনে যন্ত্রের তার দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া যায়, সীমা অসীমে, রূপ অরূপে পরিণত হইয়া যায়।

বিশ্বের সকল রূপের মত নারী রূপের মধ্যেও সীমা ও অসীমের অপরূপ সমন্বয়। কয়েকটি বিশিষ্ট রেখার মধ্যে সীমিত নারীর যে প্রকাশ, যাহাকে ঘিরিয়া আমরা অন্তরের মধ্যে বিচিত্র স্বপ্ন-লোক বা সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করি, বাস্তবে ও কল্পনায় আমাদের একান্ত পরিচিত যে নারী-রূপ, ধ্যানের তন্ময়তা ও প্রগাঢ়তার একটা পরিণামে তাহা কেমন করিয়া কোন্ অপরূপতার মধ্যে তলাইয়া হারাইয়া যায়। বিশ্বের অন্তহীন রূপের মধ্যে সে-রূপের আভাস কেমন করিয়া বিলসিত হইয়া যায়। বিশিষ্ট একটি রূপের ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে পারে যে পরিণামে ব্যক্তির হৃদ্-স্পন্দন বিশ্বের প্রাণ-স্পন্দনের সহিত চকিতে চকিতে সংযোগে লাভ করিতে পারে, তখন বিশ্বের সকল রূপের যোগে বিশিষ্ট রূপ হারাইয়া যায়।

"সেই যন্ত্র তোমার রূপের খাঁচা,
দোলে বসন্তের বাতাসে।

তাকে বেড়াই বুকে ক'রে ;
ওতে রং লাগাই, ফুল কাটি
আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে।
যখন বেজে ওঠে, ওর রূপ যাই ভুলে,
কাঁপতে কাঁপতে ওর তার হয় অদৃশ্য।
অচিন তখন বেরিয়ে আসে বিশ্ব-ভুবনে,
খেলিয়ে যায় বনের সবুজে
মিলিয়ে যায় দোলনচাঁপার গন্ধে।"

কেবল সৌন্দর্য-ধ্যান নয়, প্রেমের উপলব্ধিও (উভয়ের মধ্যে একই প্রাণের তত্ত্ব আছে বলিয়া) মানবীয় চেতনাকে একটি দুর্লভ আকস্মিক মুহূর্তে অন্তহীন ব্যাপ্তি ও প্রসারতা দান করে। সেই ব্যাপ্তি বা প্রসারতা সকল জন্ম সকল মৃত্যুর সীমা পার হইয়া যায়। যত ক্ষণ-কালের জন্য, যত অস্থায়িভাবে হোক-না-কেন, নর-নারী যখন আপনার এই অসীমতার পরিচয় লাভ করে, তখন জীবনের আর সমস্ত কিছু আর সকল বোধ একান্ত তুচ্ছ হইয়া যায়। মৃত্যুতে সত্তার একান্ত বিলুপ্তি ঘটুক কিংবা নাই ঘটুক, মানবের স্মৃতি-লোকে অশেষ হইয়া থাকিতে পারা যাক বা না যাক, এই উপলব্ধিতে তাত্ত্বিক ওই সকল জিজ্ঞাসা গৌণ শুধু নয়, নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

"সেই মুহূর্তে তোমার প্রেমের অমরাবতী
ব্যাপ্ত হল অনন্ত স্মৃতির ভূমিকায়।
সেই মুহূর্তের আনন্দ বেদনা
বেজে উঠল কালের বীণায়,
প্রসারিত হল আগামী জন্ম-জন্মান্তরে।
সেই মুহূর্তে আমার আমি
তোমার নিবিড় অনুভবের মধ্যে
পেল নিঃসীমতা।"

একথা তিনি কত-না-ভাবে কত-না-রূপে ফিরিয়া ফিরিয়া বলিয়াছেন। আমরা তাহাকেই সুন্দর বলি যাহা মানবীয় চেতনাকে সীমার বন্ধন হইতে মুক্তি দেয়।

"পরিচয়ের সীমার মধ্যে থেকেও
সুন্দর যায় সব সীমাকে এড়িয়ে।"

সৌন্দর্যের ইহা যেমন বস্তুগত ব্যাখ্যা তেমনি সৌন্দর্যের একটি ভাবগত ব্যাখ্যার দিকও আছে। মানবীয় চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে থাকে, যতই অহং বা সীমার বোধকে ছাড়াইয়া উঠিতে থাকে, ততই তাহার দৃষ্টিতে সৌন্দর্য-লোক উদ্ঘাটিত হইয়া যাইতে থাকে। মানবীয় চেতনা এমন একটি পরিণাম লাভ করিতে পারে, যখন রূপের আর অন্ত থাকে না; অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত কিছু তখন অলৌকিক সৌন্দর্য ও মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া যায়।

এই তত্ত্বটিকেই একটু ভিন্ন ভাবে তিনি এক্ষেত্রে উপস্থাপিত করিয়াছেন। অর্থাৎ বস্তুকে যখন অন্তহীন দেশ-কালের (মহাপ্রাণ না মহামৃত্যু?) পরিপ্রেক্ষিতে দেখিতে পারি, তখন বস্তুর সৌন্দর্য নিঃসীম হইয়া উঠে। বস্তুকে তাহার অন্তহীন দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা তখনই সম্ভব যখন মানুষ সম্পূর্ণরূপে অহং বা সীমার বোধ মুক্ত হয়। এই দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি মানুষ দেবতার দিব্য আভা বিজড়িত হইয়া যায়, এই দৃষ্টিতে প্রতি ধূলিকণা অন্তহীন সৌন্দর্য ও বিস্ময়ের আভাস দেয়। এই দৃষ্টিতে এই মর্ত্য-লোকই স্বর্গ-লোকে পরিণত হইয়া যায়। তিনি পাল্কী-বাহকের মধ্যে দেবতার মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

> "তার মধ্যে একজনকে দেখলেম
> যেন কালো পাথরে কাটা দেবতার মূর্তি ;—"

আর এই আনন্ত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের সমস্ত কিছুকে দেখা—

> "এই সঙ্গে দেখি মৃত্যুর মধুর রূপ, স্তব্ধ নিঃশব্দ সুদূর,
> জীবনের চারদিকে নিস্তরঙ্গ মহাসমুদ্র ;
> সকল সুন্দরের মধ্যে আছে তার আসন, তার মুক্তি।"

এই বিশ্বকে দুই দিক হইতে দেখা আছে। একটি ভাব, ধ্বনি ও স্পন্দনের দিক হইতে, অন্যটি রূপ-রঙ্গ ও রেখার দিক হইতে। ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তাকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে, ব্যক্তি-চেতনায় ততই বিশ্বের ভাবধারা অথবা বিশ্বের রূপ-রঙ্গ ও রেখা অফুরান হইয়া উঠে। ব্যক্তি-সত্তা আপন সৃষ্টির মধ্যে কখন ভাবকে প্রকাশ করেন, কখন রূপকে চিত্রে রূপায়িত করেন। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কোথাও এই উভয় প্রেরণা যুগপৎ ক্রিয়া করিতে পারে।

বিশ্বের যোগে ভাব অনুসরণ করিয়া কবি একদিন এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছিলেন, যে পরিণামে নিখিল বিশ্বের পরিব্যাপ্ত ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে

সমুচ্ছ্বসিত হইয়াছিল। সেই ভাবনাকে তিনি অনায়াসে তাঁহার অতুল বৈচিত্র্যময় কাব্য-ধারার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আজ রূপ অনুসরণ করিয়া বিশ্বের যোগে তিনি এমন একটি পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, যে পরিণামে বিশ্বের অন্তহীন আকার বা রূপ তাঁহার হৃদয়-তটে মুহূর্তে মুহূর্তে ভাসিয়া উঠিতেছে।

বিশ্ব-স্রষ্টা যিনি তিনি দেশ-কালের সীমার ঊর্ধ্বে থাকিয়া দেশ-কালের মধ্যে আপন গড়া অন্তহীন রূপকে অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া শেষ করিতে পারিলেন না।

"সংসারটা আকারের মহাযাত্রা।
কোন্ চির-জাগরূকের সামনে দিয়ে চলেছে,—"

কিংবা

"চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।"

এই কথা তিনি অন্যত্র অন্যভাবে বলিয়াছেন—

"অসীম আকাশে কালের তরী চলেছে
রেখার যাত্রী নিয়ে ;
অন্ধকারের ভূমিকায় তাদের কেবল
আকারের নৃত্য ;
নির্বাক অসীমের বাণী
বাক্যহীন সীমার ভাষায়, অন্তহীন ইঙ্গিতে।
অমিতার আনন্দ সম্পদ
ডালিতে সাজিয়ে নিয়ে চলেছে সুমিতা
সে ভাব নয়, সে চিন্তা নয়, বাক্য নয়,
শুধু রূপ ; আলো দিয়ে গড়া।"

অসীম আকাশের পটে অন্তহীন অন্ধকারের বক্ষে সংখ্যাতীত আলোক-কুসুমের শুধু ফোটা ও ঝরা। অসীমের আনন্দকে সীমা নিয়ত সরিয়া সরিয়া নিয়ত বিদীর্ণ হইয়া, প্রসারিত হইয়াই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

বিশ্ব-রূপকারের এই আদর্শ, মানুষ-স্রষ্টারও আদর্শ। কিন্তু এই আদর্শকে মানুষ তখনই লাভ করে যখন মানুষ আপনার সকল সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। ঈশ্বরের মত মানুষ তখন হয় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। আবার এই মুক্তি

আসে বিশ্বের সহিত যোগের ভিতর দিয়া বিশ্বকে পরিপূর্ণ করিয়া পরিণামে তাহাকে অতিক্রম করিয়া গেলে।

"সমস্ত বিশ্বজুড়ে দেবতার দেখবার আসন,
আমিও বসেছি তাঁরই পাদপীঠে,
রচনা করছি দেখা।"

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তো কোন ভাষা নাই। তাহার আছে ইঙ্গিত, ভঙ্গি, ছন্দ ও নৃত্য। তাহার অন্তরের মধ্যে আছে এক অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতাকেই সে প্রকাশ করতে চায় নানা ব্যঞ্জনায়। সেই প্রকাশের ব্যাকুলতা তৃণ পুষ্প হইতে অন্তহীন নক্ষত্র-লোক পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। সেই প্রকাশের ব্যাকুলতার ভিতর দিয়াই বিশ্বে স্পন্দন দেখা দিয়াছে। এক-একটি বিশিষ্ট রূপ এক-একটি বিশিষ্ট স্পন্দন বা নৃত্য।

মনুষ্যরচিত কাব্যেও সেই আদি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতার প্রকাশ। এই প্রকাশের জন্য তাহাকে অনির্বার্য রূপে ভাষাকে আশ্রয় করিতে হয়। কিন্তু ভাষার সামর্থ্য সীমিত। ভাষা সীমাবদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করিতে পারে। কবি তাই সীমাবদ্ধ ভাষাকে এরূপভাবে বিন্যাস করেন, এমন ব্যঞ্জনা দান করেন, এমন ইঙ্গিতময় করিয়া তুলেন যাহাতে তাহা আপনার যুক্তি-পারম্পর্য হারাইয়া এক অলৌকিকতা লাভ করে। এই অলৌকিক কাব্য-দেহই অলৌকিক ভাবের বাহন। বস্তুত অলৌকিক বোধের রূপায়ণ ক্রিয়া ঠিক সচেতনভাবে হয় না। অনির্বচনীয় উপলব্ধির দুর্নিবার আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন ভাষা-রূপ আবর্তিত হইতে হইতে ধীরে একটি রূপ ফুটিয়া উঠে; কিংবা বলা যায়, উপলব্ধির অসহনীয় উত্তাপে বিচ্ছিন্ন সীমিত বিচিত্র বোধ রূপ বিগলিত হইয়া একটি আশ্চর্য ভাষা-ধাতু-মূর্তি গড়িয়া তুলে। এই ক্রিয়া কতকটা হয় কবির অবচেতন মনে, উপলব্ধির অলৌকিক আনন্দ মুহূর্তে কতকটা হয় সচেতন মনে যখন কবি উহাকে বাহিরে ভাষা-বন্ধনে বাঁধিবার চেষ্টা করেন।

এই উপলব্ধিকেই প্রকাশ করিবার জন্য মানুষ যেমন ভাষাকে বাহন করে তেমনি করে সুরকে। পরমাণুপুঞ্জ যেমন স্পন্দনকে এক-একটি বিশিষ্ট সীমা-রূপ দান করিয়া এক-একটি বিশিষ্ট আবর্তন-চক্র গড়িয়া তুলে, মানুষের সুরও তেমনি অন্তহীন সুরকে এক একটি বিশিষ্ট রূপ বা ভঙ্গী দান করে। এই গানে গড়া রূপ, অর্থাৎ মানুষ আপনার সুরের আবেষ্টনী দ্বারা বিশ্ব-সঙ্গীতকে যে একটি বিশিষ্ট সীমিত রূপ দান করে, সেই বিশিষ্ট রূপ আবার সকল স্পন্দিত রূপের সহিত মিলিত

হইতে থাকে। ব্যক্তি-চেতনা যতই উন্নত হয়, বিশ্বকে যতই গভীর করিয়া সে লাভ করিতে থাকে, বিশ্বের আদি স্পন্দন তাহার হৃদয়ে ততই অন্তহীন হইয়া উঠিতে থাকে। তাহার সৃষ্ট সুরের সহিত বিশ্ব-সুরের ততই মিল ঘটিতে থাকে।

প্রাণের ধীর অবসানের ফলে বিশ্ব-প্রাণের উপলব্ধির গভীরতাও ধীরে হ্রাস পাইতেছে। ফলে প্রাণের যে লীলা ঘটিত বিশ্বের অন্তহীন সৌন্দর্য রূপে প্রেমের অনির্বচনীয় মাধুর্য রূপে তাহাও কবির জীবনে ধীরে কেমন ম্লান হইয়া আসিতেছে। ইহার একটি ধারা কবির পরিণত বয়সের কাব্যগুলির মধ্যে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কবির জীবনে এই ধারা সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া মানব জীবনের চিরন্তন বেদনার দিকটিকেই প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ইহা তাই একপ্রকার আত্মা-সাক্ষাৎকার। জীবনের এই যে ক্ষতি, ইহা যদি অপূরণীয় হইত তাহা হইলে হাহাকারে মানুষের সকল প্রয়াস যে মুহূর্তে নিরুদ্ধ হইয়া যাইত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই ক্ষতিকে মানুষ অধ্যাত্ম সম্পদ দ্বারা পূর্ণ করিয়া লয়।

"মনের রসনা থেকে
অজানার স্বাদ গেছে মরে,
অনুভবে পাইনে
ভালোবাসার সম্ভবের মধ্যে
নিয়তই অসম্ভব ;
জানার মধ্যে অজানা.
কথার মধ্যে রূপকথা।
ভুলেছি প্রিয়ার মধ্যে আছে সেই নারী,
যে থাকে সাত সমুদ্রের পারে,—"

বিশ্ব-সত্তা লাভের পক্ষে একটি মহৎ অন্তরায় ও অসম্পূর্ণতার বোধ সম্পর্কে কবি প্রথম সচেতন হন 'বলাকার' মধ্যে। অন্ততঃ এমন নিঃসংশয় উপলব্ধি কবির জীবনে ইতিপূর্বে যে কোথাও ঘটে নাই তাহা বলিতে পারা যায়। এই অসম্পূর্ণতা-বোধের পীড়া কবির জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিতেছে লক্ষ্য করা যায়।

বিশ্বের একমাত্র না হইলেও, অন্তত মুখ্যত সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকটিই কবির জীবনে আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠে। এই সৌন্দর্য-মাধুর্যকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার

চেতনা পরিণামে বিশ্ব-সত্তাকে লাভ করিতে চাহিয়াছে। কেবল মাত্র সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আশ্রয় করিবার ফলে বিশ্ব-সত্তা অন্তহীন সৌন্দর্য-মাধুর্যরূপে অনুভূত হইয়াছে। কিন্তু বিশ্বে নির্মমতার, ভয়ঙ্করতার, দুঃসহ তপশ্চর্যার, নিদারুণ দাহ, সর্বস্ব সমর্পণেরও একটি দিক আছে।

বিশ্ব-সত্তার মধ্যে এই উভয়ের আশ্চর্য সমন্বয় আছে। কোন একটিকে অস্বীকার করিলে বিশ্ব-সত্তা লাভের পূর্ণতা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। এই অসম্পূর্ণতা বোধের পীড়া বর্তমান কবিতাটির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়।

ইতিপূর্বে তাঁহার কাব্য-সাধনা জীবনের যে দিকটিকে আশ্রয় করে, তাহা একান্ত মধুর, স্পর্শকাতর, সযত্নে রক্ষার সামগ্রী, সেখানে লজ্জা, সাধ্বস ও কুণ্ঠা। নানা নিপুণতা, সূক্ষ্ম কারুকার্য। জাগতিক রূঢ়তা ও মালিন্যের চিহ্নমাত্র সেখানে নাই। তাহা যেন সকল প্রবাহ নিরুদ্ধ এক পদ্মসরোবর, তাহারই বক্ষে বড় ঋতুর নানা বর্ণসম্ভার, আলো ও ছায়ায় বিচিত্র অনির্বচনীয় লীলা।

কিন্তু জীবন যেখানে সকল বন্ধনকে অস্বীকার করিয়াছে, সকল ঐশ্বর্য-অলঙ্কারকে পরিহার করিয়াছে, যাহা নির্মম, যাহারা দুঃসাধ্যের সাধনায় লিপ্ত, যাহারা সত্য লাভের আশায় নিত্য আত্মত্যাগ করিয়াছে, যাহারা বিশ্বে নানা কর্মে ব্যাপৃত, যাহারা একমাত্র বিবেকের নির্দেশ ছাড়া আত্মার আলোক ছাড়া বাহিরের কোন নির্দেশ ও আলোককে স্বীকার করে না, কবির কাব্য-সাধনায় তাহার কতটুকু পরিচয় আছে। তাঁহার কাব্য সাধনায় জীবনে এই দিকটিকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য পরবর্তী জীবনে তিনি বারংবার সচেষ্ট হইয়াছেন।

"যাব দুর্গমে, কঠোরে নির্মমে,
নিয়ে আসব কঠিন চিত্ত উদাসীনের গান।"

মহাকালের বক্ষে অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্র যেন মহাসমুদ্রের বক্ষে এক একটি বুদ্বুদ। মহাকালের পরিধি তবে কত বিপুল, কত কোটি কল্প কাল ব্যাপিয়া। তাহার মধ্যে আমাদের এই সৌরমণ্ডল কতটুকু। কী অচিন্তনীয় ক্ষুদ্র। সেই মণ্ডল মধ্যবর্তী একটি ক্ষুদ্র গ্রহ আমাদের এই মাটির পৃথিবী। তাহাতে আবার ইতিহাসের আরম্ভ কাল। এই ইতিহাসটুকুর মধ্যেই মানুষের সৃষ্ট কত কীর্তি, মানুষের কত জয়ধ্বজা, কত প্রতাপ কালে একদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

কবির সৃষ্ট কাব্যও তেমনি একদিন ধূলায় ধূলি হইয়া হারাইয়া যাইবে। কিন্তু যে-ভাবকে তিনি কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, সেই ভাব যে অমর। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একদিন অবসান ঘটিতে পারে, আবার নূতন কল্পের আরম্ভের

জন্য ; কিন্তু তখনও এই ভাবগুলি থাকিবে কল্পারম্ভে আবার ফিরিয়া রূপলাভ করিবার জন্য। আর এই চিরন্তন ভাব-লোককে আশ্রয় করিয়া কবির চেতনা বারবার সেই অমৃতের স্পর্শ লাভ করিয়াছে, যাহা সকল জন্ম সকল মৃত্যুর, সকল সৃজন ও সকল প্রলয়ের ঊর্ধ্বে। কবির এই উপলব্ধির সহিত প্লেটোর 'ideas' বা 'forms' সংক্রান্ত মতবাদের যে মিল রহিয়াছে তাহার আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি।

"আমি পেয়েছি ক্ষণে ক্ষণে অমৃতভরা
মুহূর্তগুলিকে,
তার সীমা কে বিচার করবে ?

* * *

কল্পান্ত যখন তার সকল প্রদীপ নিবিয়ে
সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চ দেবে অন্ধকার করে
তখনো সে থাকবে প্রলয়ের নেপথ্যে
কল্পান্তরের প্রতীক্ষায়।"

প্রাণ-মন ও বুদ্ধি সমেত এই যে আমার সমগ্র সত্তা এবং তাহার সহিত অন্বিত করিয়া এই যে আমার জগৎ, আর সেই জগতের সহিত বিজড়িত হইয়া আমার হাসি-কান্না, ভাবনা-বেদনা ; —এই সমগ্র প্রকাশ-লীলাকে যে ঊর্ধ্বতর-কোন সত্তায় অধিষ্ঠিত হইয়া সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে দেখা সম্ভব রবীন্দ্রনাথ আপনার জীবনে সেই উপলব্ধির পরিচয় দান করিয়াছেন।

"উপরের তলায় বসে দেখব ওকে
ওর নানা খেয়ালের আবেশে,
আশা-নৈরাশ্যের ওঠা-পড়ায় সুখ-দুঃখের আলো-আঁধারে।"

এই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থতারও পরিচয় লাভ করা যায়—

"মুক্ত আমি, স্বচ্ছ আমি, স্বতন্ত্র আমি,
নিত্যকালের আলো আমি,
সৃষ্টি-উৎসবের আনন্দধারা আমি,
অকিঞ্চন আমি,
আমার কোনো কিছুই নেই
অহঙ্কারের প্রাচীরে ঘেরা।"

"যিনি সকল ভূতকে আপনার আত্মার মধ্যে এবং আপনার আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন তিনি কোন জুগুপ্সা বোধ করেন না।" (ঈশ উপনিষদ)

"যিনি সকল ভূতকে আপনার আত্মার মধ্যে এক করিয়া জানেন, যিনি এক তত্ত্বকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহার কোন্ মোহ, কোন্ শোক থাকিতে পারে?" (ঈশ উপনিষদ)

"জ্ঞান তৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ, প্রশান্তচিত্ত, ধীর যুক্তাত্মাগণ আত্মাকে সর্বদিকে লাভ করিয়া সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রবেশ করেন।" (মুণ্ডক উপনিষদ)

নিখিল বিশ্ব-লোকে প্রাণের প্রকাশে ছেদ কোথাও নাই। সে প্রাণ দেশ-কালের প্রান্ততম সত্তা হইতে মর্তের তৃণপুষ্প পর্যন্ত স্পন্দিত। একটি পরম অস্তিত্বের মহান্ আনন্দে সকলে যুক্ত, ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধা। ব্যক্তি-চেতনা সেই মহাপ্রাণ সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিচি-বিক্ষেপ মাত্র। ব্যক্তি-প্রাণ যদি মহাপ্রাণ সমুদ্রের সহিত যুক্ত হয়, সেই যোগে যদি সকল রূপের সহিত আপনাকে মুক্ত দেখে তবে এক অনির্বচনীয় অস্তিত্ব বা মিলনের বোধ জাগে। যে অস্তিত্বের আনন্দ সমগ্র সৃষ্টির মর্মমূলে রহিয়াছে, যে আনন্দে সমস্ত কিছুই সঞ্জীবিত মানুষ সেই আনন্দ সেই অস্তিত্ব বোধ করে:

"যেন কোন্ লোকান্তর গত চক্ষু
জন্মান্তর থেকে চেয়ে থাকে
আমার মুখের দিকে,
চেতনাকে নিষ্কারণ বেদনায়
সকল সীমার পরপারে দেয় পাঠিয়ে।
ঊর্ধ্বলোক থেকে কানে আসে
সৃষ্টির শাশ্বত-বাণী
"ভালোবাসি।"

সমগ্র বিস্সৃষ্টির অন্তরালে যে আনন্দ-প্রেরণা, যে প্রেরণায় নিত্য সংখ্যাতীত রূপ সৃষ্টি হইতেছে, সেই এক আনন্দ কবির সকল সৃষ্টির মধ্য দিয়া রূপ লাভ করিয়াছে, পরম অস্তিত্বের এক নিগূঢ় আনন্দানুভূতি। এই আনন্দের অতিরিক্ত আর কিছু নাই:

"সৃষ্টি যুগের প্রথম লগ্নে
প্রাণ সমুদ্রের মহাপ্লাবনে
তরঙ্গে তরঙ্গে দুলেছিল এই মন্ত্রবচন।
এই বাণীই দিনে দিনে রচনা করেছে
স্বর্ণচ্ছটায় মানসী প্রতিমা
আমার বিরহ-গগনে—"

যৌবনে জীবন ও জগতের যে অর্থ ধরা পড়িয়াও ধরা পড়ে নাই, পরমের যে রূপকে তিনি কেবল বিচিত্র ইঙ্গিতের ভিতর দিয়া আভাস মাত্র রূপে লাভ করিয়াছেন; আজ জীবন-সায়াহ্নে বিশ্ব-প্রকৃতি তেমনি রহস্যময়ী মাধুর্যময়ী প্রেয়সীর মূর্তিতে ঠিক তেমনি করিয়া কবি-চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেছে। তেমনি করিয়া মর্মের কোন গূঢ় বাণীকে প্রকাশ করিবার ব্যাকুলতা তাহার চোখে মুখে। যৌবনের সেই প্রাণের প্রকাশ যদি থাকিত, বিশ্ব-প্রাণের যোগে বিশ্বের সৌন্দর্য-মাধুর্যকে যদি তিনি তেমনি করিয়া বারেকের জন্য ফিরিয়া লাভ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে বিশ্বের গূঢ়তম বাণী, গভীরতম সত্য যে মুহূর্তের জন্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইত না তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু জীবনের এই পরিণামে প্রাণের সেই প্রকাশকে ফিরিয়া লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণ যতই প্রসার লাভ করিয়াছে, চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করিয়াছে, ব্যক্তির অন্তরে যেমন একটি রূপ ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, বিশ্বের মধ্যেও তেমনি একটি রূপ ক্রমে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'মানসী' হইতে 'চিত্রা' এবং তাহারও পরবর্তী 'চৈতালি', 'কল্পনা' পর্যন্ত এই রূপ কল্পনার ক্রমবিকাশের একটি ধারা নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছি।

নিম্নে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহার মধ্যে প্রাণের ধীর অবসানের পরিচয় যেমন তেমনি সেই একই কারণে বিশ্বের সৌন্দর্য কল্পনাও ধীরে ম্লান অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

"আজ দেখা দিয়েছে তার মূর্তি,
স্তব্ধ সে দাঁড়িয়ে আছে
ছায়া-আলোর বেড়ার মধ্যে,
মনে হচ্ছে কী একটা কথা বলবে,
বলা হল না,

ইচ্ছে করছে ফিরে যাই পাশে,

ফেরার পথ নেই।"

এই অসম্পূর্ণতা-বোধের পীড়া লক্ষ্য করা যায় অন্যত্রও। কেবল পুরুষ পয়ারের একটি পদ, কেবল নারীও তেমনি। উভয়ের মিলনে ছন্দের সম্পূর্ণতা। সমগ্র অর্থটি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়া উঠে। এই বিশ্বে পুরুষ তাই নিয়ত অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে তাহার অপর পদকে, আপনার সম্পূর্ণ অর্থটিকে লাভ করিবার জন্য। কিন্তু এক প্রেম, প্রেমে এই মিলন একান্ত দুর্লভ। এই জীবনে পথচলায় কচিৎ তাহার সাক্ষাৎ মিলে। এক্ষেত্রে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে প্রেমের যে উপলব্ধি আছে, তাহা অতি ক্ষীণ, নিবিড়তায় সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই, তাই পরম অর্থটি তাহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। রূপের একটা আভাস মাত্র জাগাইয়া তাহা নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। আর সেই ছিন্ন রূপের স্মৃতি বক্ষে জড়াইয়া এক অজানিত বেদনাবোধের নিত্য নিপীড়ন।

"সংসারে আনাগোনার পথের পাশে

আমার প্রতীক্ষা ছিল

শুধু ঐটুকু নিয়ে

তারপরে সে চলে গেছে।"

নারী-পুরুষের প্রেমানুভূতির ক্ষেত্রে পরস্পরের অন্তরে একটি বিশিষ্ট রূপ চিরস্থায়ী হইয়া যায়। বাহিরে রূপের জগতে নিত্য-পরিবর্তনের সঙ্গে নর-নারীর দেহে-মনে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে, কিন্তু উভয়ের ধ্যানে উভয়ের সেই বিশিষ্ট রূপ অপরিবর্তনীয় হইয়া থাকে। প্রেমে তাই ওই বিশিষ্ট রূপ ছাড়া জীবন ও জগতের আর সমস্ত কিছু অপরিচিত রহিয়া যায়।

প্রেমে যে রূপ-নিষ্ঠা তাহা কেবল একজন পুরুষ এবং একজন নারীর প্রতিই নয়, তাহাদের এক-একটি বিশিষ্ট রূপের প্রতি নিষ্ঠা। উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে প্রেমের এই রূপ-তত্ত্বের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"পৃথিবীতে এসে

যাকে জেনেছিলেম একান্তই,

সেই আমার চিরকিশোর বঁধু

তাকে তো আর পাইনে দেখতে

এই ঘরে।"

শুধালেম, "সে কি নেই কোথাও?"

মৃদু শান্ত সুরে বললে,

"সে আছে সেইখানেই
যেখানে আছি আমি।
আর কোথাও না।"

ধ্যানে যে রূপ চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয় হইয়া আছে তাহার সহিত আজিকার নারীর কোন মিল নেই। শুধু এই জীবনে নয়, জন্ম হইতে জন্মান্তরে সে চলিয়াছে নানা অভাবিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া। সেদিনের সেই প্রেয়সীর সহিত আজিকার নারীর মধ্যে মিল খুঁজিয়া কোন লাভ নাই। তাহাকে বাহিরে ফিরিয়া লাভ করিবার চেষ্টা তাই বৃথা।

কেবল নারীর মধ্যে নয়, পুরুষের মধ্যেও মিল নেই। সুদীর্ঘ জীবনে তাহার মধ্যেও কত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। সেই যুগল-মূর্তি কেবল ধ্যানে চিরন্তন হইয়া থাকে, তাহার সহিত পুরুষের যেমন নারীরও তেমনি কোন মিল নেই।

সেই মিলন-বেদীতলে মানুষ চিরকাল কেবল আপন প্রাণের প্রদীপ জ্বালাইয়া রাখে। সেই আলোকে ওই যুগল-মূর্তিকে উদ্ভাসিত করিয়া সে অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া থাকে। কাল-প্রবাহে ওই দীপ-শিখা যখন নিভিয়া যায়, তখন ওই ধ্যানের রূপ কোন্ শূন্যে হারাইয়া যায় কে জানে।

এই নিয়ত পরিবর্তন, ভাঙ্গা-গড়া, উঠা-নামা, সৃষ্টি ও বিনষ্টির মধ্যে একটি স্থির সত্তা আছে, যাহা জীবন ও জগৎকে আশ্রয় করিয়া পরিপূর্ণ করিয়া অনন্ত ব্যাপ্ত। এই ধর্মই সমস্ত কিছুকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। কবি ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার আভাস লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে অপরোক্ষ করিয়াছেন।

"এই অনিত্যের মাঝখান দিয়ে চলতে চলতে
অনুভব করি আমার হৃৎস্পন্দনে
অসীমের স্তব্ধতা।"

নিখিল বিশ্বের প্রত্যেকটি সত্তা, মাটির তলায় প্রচ্ছন্ন বীজ-কণা হইতে গ্রহ-নক্ষত্র লোক সমস্ত কিছুর মধ্যে যে অধীরতা তাহা আপনার পূর্ণতাকে লাভ করিবার জন্য। মাটির তলায় বীজের মধ্যে প্রকাশের যে অধীরতা তাহার কোন পরিচয় তাহার এখনকার এই পরিবেশের মধ্যে লেশমাত্র প্রত্যক্ষ গোচর হয় না। কিন্তু বীজের এই স্বপ্ন তো মিথ্যা নয়। তাহা একদিন মাটির আবরণ ভেদ করিয়া অঙ্কুর রূপে আত্মপ্রকাশ করে, অসীম আকাশের সঙ্গে বিশ্বের সঙ্গে তাহার তখন আনন্দের যোগ। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে এমনি একটি পরিণামের

ধারা নিশ্চয়ই আছে, যাহার কোন প্রকাশ আজিকার পরিবেশের মধ্যে কোথাও নেই। মানুষের জীবন সম্পর্কেও এ কথা সত্য। একটি পরিপূর্ণতার গূঢ় প্রেরণা বক্ষে লইয়া তাহার জীবন ক্রমাগত উর্ধ্ব পরিণাম লাভ করিয়া চলিয়াছে, জন্ম হইতে জন্মান্তরের ভিতর দিয়া ঃ

"মাটির তলায় সুপ্ত আছে বীজ।
তাকে স্পর্শ করে চৈত্রের তাপ,
মাঘের হিম, শ্রাবণের বৃষ্টিধারা।
অন্ধকারে সে দেখছে অভাবিতের স্বপ্ন।
স্বপ্নেই কি তার শেষ?
উষার আলোয় তার ফুলের প্রকাশ ;
আজ নেই, তাই বলে কি নেই কোনোদিনই?"

সামান্য গাছ, শ্যামল প্রাচুর্যের মধ্যে পরিচয় হারা, আত্মবিস্মৃত। ফাল্গুনের দুর্লভ আবির্ভাবে তাহার অন্তরে অন্তরে মজ্জায় মজ্জায় আনন্দের যে শিহরণ জাগে, অস্তিত্বের যে গূঢ় অনুভূতি, তাহাকেই সে প্রকাশ করে বাহিরে ফুলের অর্ঘ্যের ভিতর দিয়া। অলৌকিক আনন্দস্পর্শে এ কোন্ অলৌকিক ঐশ্বর্যের প্রকাশ। তাহার সাধারণ পরিচিত জীবনের সহিত ইহার ত কোন্ মিল নেই।

মানুষের গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমনি অভাবিত আনন্দের, এক পরম অস্তিত্বের, চেতনার এক সীমাহীন প্রসারের মুহূর্ত আসে। কবি বা শিল্পীর সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া সেই অলৌকিক আনন্দ আস্বাদ অনিবার্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সামান্য মানুষের মধ্যে তখন অসামান্যতার প্রকাশ ঘটে।

"সে-সব দুর্মূল্য নিমেষ
কোনো রত্নভাণ্ডারে থেকে যায় কি না জানিনে ;
এইটুকু জানি—
তারা এসেছে আমার আত্মবিস্মৃতির মধ্যে,
জাগিয়েছে আমার মর্মে
বিশ্বমর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি।"

কবি আজ জীবনের প্রান্ত-সীমানায়। জীবনকে এমনি করিয়া অতিক্রম করিয়া না আসিতে পারিলে জীবন তাহার সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ সমেত সমগ্র

রূপ লইয়া প্রতিভাত হয় না। যে জীবনটি এমনি অতিক্রম করিয়া আসি, সেটাই তো আমার আমির একমাত্র প্রকাশ নয়, জন্মজন্মান্তর ব্যাপ্ত অন্তহীন আমার আর এক প্রকাশ আছে। আমার প্রত্যেকটি মুহূর্তের সহিত বিজড়িত অন্তহীন অতীত এবং অন্তহীন ভবিষ্যৎ। দুই দিকে প্রসারিত দুই বিপুল নিঃশব্দ। তাহার মাঝখানে আমার এই আমি-রূপে এই জীবনের প্রকাশ। এ কী অপার বিস্ময়। এ কী সুদুর্লভ মহিমা! সবকিছু জড়াইয়া এ জীবনের প্রকাশ কি মধুময়।

"দুইদিকে প্রসারিত দেখি দুই বিপুল নিঃশব্দ,
দুই বিরাট আঁধখানা,
তারি মাঝখানে দাঁড়িয়ে
শেষ কথা বলে যাব
দুঃখ পেয়েছি অনেক,
কিন্তু ভালো লেগেছে,
ভালোবেসেছি।"

বীথিকা

বিশ্ব-প্রাণের যোগে প্রাণের সম্পদ আহরণের দিন, সৌন্দর্য ও প্রেমের বিচিত্র লীলা সম্ভোগের দিন কবির জীবনে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু অতীত সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া তিনি প্রাণের যে বিচিত্র সম্পদ আহরণ করিয়াছেন, অন্তরের মধ্যে তাহাদের সঞ্চয় স্থায়ী হইয়া আছে। এই জীবনের কোন পরিণামে তাহাদের একান্ত রূপে বিনষ্টি ঘটে না। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাহাদের হয়ত লাভ করিতে পারা যায় না, কিন্তু তাহারা হৃদয়ের গভীরতল আশ্রয় করিয়া জীবনে গূঢ় রস সঞ্চার করিয়া তাহাকে আশ্চর্য সমৃদ্ধি দান করে। অতীত জীবন এই রূপে অক্ষয় হইয়া নিত্য নূতন উপলব্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

কেবল তাহাই নয়। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ক্ষেত্রে একপ্রকার অস্পষ্টতা থাকে, কতকটা চঞ্চল, চিত্তের দাহ বিজড়িত হইয়া কতকটা লৌকিক! এই অস্পষ্ট, অস্থির, লৌকিক অনুভূতি কালে হৃদয়ের গভীর হইতে গভীরতর স্থান লাভ করিতে থাকে। গভীরতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধির ক্ষেত্রে নানা বিক্রিয়া ঘটিতে থাকে। লৌকিক অনুভূতির তীব্রতা হ্রাস পাইয়া তাহা করুণ-কোমল অপরূপ শ্রী লাভ করিতে থাকে। লৌকিক অনুভূতি এইরূপে গভীরতা ও প্রসারতার ভিতর দিয়া এমন এক আশ্চর্য পরিণাম লাভ করে, যাহাকে আর

লৌকিক কোন অনুভূতির দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না। তাহা সকল সুখ-দুঃখ বোধের ঊর্ধ্বতর এক পরম শান্ত পরিণাম। ঝিনুকের বক্ষের ভিতর অনুপ্রবিষ্ট বালুকণা দুঃসহ বেদনার সৃষ্টি করে, কিন্তু কালে ঝিনুক তাহাকে লালন করিতে করিতে জয় করিয়া উঠে। বক্ষের উত্তাপ, বিচিত্র রস ক্ষরণের ভিতর দিয়া সেই বালুকণা একদিন দুর্লভ মুক্তায় রূপান্তরিত হইয়া যায়। মানুষের জীবনেও একথা সত্য। প্রত্যক্ষ উপলব্ধির সঞ্চয় কালে রূপান্তরিত হইয়া এক ভিন্ন স্বরূপতা লাভ করে। সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চয়কে জীবন-সায়াহ্নে আহরণ করিতে হয়, স্মৃতির দুর্লভ রত্ন-কণা।

"দুঃখ যত সয়েছি দুঃসহ
তাপ তার করি অপগত
মূর্তি তারে দিব নানা মতো
আপনার মনে মনে।" (অতীতের ছায়া)

ব্যক্তিজীবনে সৃষ্টির এই রহস্য যদি সত্য হয়, তবে সমগ্র বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কেও একথা সত্য। রবীন্দ্রনাথ সে কথাও বলিয়াছেন। বিশ্বে প্রতিনিয়ত যে রূপ-রস-গন্ধ-ধ্বনি হারাইয়া যাইতেছে, তাহাদের একান্তরূপে যে বিনষ্টি ঘটিতেছে না এমনি একটি গভীর অধ্যাত্ম বিশ্বাস তাঁহার ছিল। কোন-না-কোন স্বরূপে কোথাও-না-কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব থাকিয়া যাইতেছে। কেবল তাহাই নহে, বিশ্বের নব নব রূপ-রস-গন্ধ-ধ্বনি সৃষ্টির ক্ষেত্রে অতীতের এই সকল সম্পদ কোন দুর্জ্ঞেয় নিয়মে নিগূঢ় প্রেরণা সঞ্চারের ভিতর দিয়া নিয়তই আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

"বর্তমানে যেতে যেতে এই শূন্যে যায় ভ'রে রেখে
আপন অন্তর থেকে
অসংখ্য স্বপন ;
অতীত এ শূন্য দিয়ে করিছে বপন
বস্তুহীন সৃষ্টি যত,
নিত্যকাল-মাঝে তারি ফল শস্য ফলিছে নিয়ত।" (অতীতের ছায়া)

এক্ষেত্রে 'প্রভাত-সঙ্গীতের 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটি স্মরণে পড়িতে পারে। সেক্ষেত্রে কতকটা বিশিষ্ট হইলেও এই জাতীয় উপলব্ধিরই প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ইহাতে এই সত্যটিকেই উপলব্ধি করিতে পারা যায় যে মহান্ জীবনে বিচিত্র ভাবের এবং আরোও গভীরে একটি অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ধীর বিকাশ ও

পরিণামধারা থাকে। যেখানে তাহা ঘটে না, সেখানে তাহা যে সত্য নয়, কিংবা গভীরতর কোন সত্য পরিণাম লাভ করিতে পারে নাই, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়।

মানুষ আসে যায়। এই সংসারে যে যাহার আপন আপন কর্ম সমাধা করিয়া তাহার পর একে একে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই আসা ও যাওয়ার যদি কোন অর্থ থাকে, তবে এ সমগ্র জীবন লইয়া যিনি লীলা করিতেছেন তাহা একমাত্র তাঁহারই নিকট পরিস্ফুট। এইটুকু একপ্রকার বোধ করিতে পারা যায় যে বিশ্ব মহাকবি রচিত কোন মহানাটককে মানুষ নিত্যকাল ধরিয়া অভিনয় করিয়া চলিয়াছে :

> "যে খেলা খেলিতে এল হয়তো কোথাও তার আছে
> নাট্যগত অর্থ কোনোরূপ, বিশ্ব মহাকবি কাছে
> প্রকাশিত।" (নাট্যশেষ)

জীবন ও জগতের এই মায়ার স্বরূপ উপলব্ধিই এই কবিতার মূল ভাব-প্রেরণা নয়। যুগযুগান্ত কাল ধরিয়া চলমান মানব-যাত্রীর যে ছায়াছবি আবর্তিত হইয়া চলিতেছে, মহাকবি তাহারই একটি মুহূর্তকে দেশ-কাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাব্যে অমরতা দান করেন। কালে একদিন যাহা বিস্মৃতির তলে বিলীন হইয়া যাইত, তাহা এমনিভাবে কবির কাব্য আশ্রয় করিয়া আনন্দের সঞ্চয় হইয়া বিরাজ করে। কবির পরবর্তী জীবনে সৃষ্টি সম্পর্কে যে স্মৃতি-তত্ত্বের বারংবার প্রকাশ লক্ষ্য করি, বর্তমান কবিতাটি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত।

জীবনে প্রেমে অনির্বচনীয়তার প্রকাশ ঘটে। সেই বোধে দেশ-কালের সীমা-রেখা জীবনের পরিধি পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। অজানা এক অধীরতায় নিত্য জাগরণ। অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরা জীবনের অক্ষয় সে বোধ। সেই বোধে ব্যক্তির আনন্দ-বেদনা বিশ্বের আনন্দ-বেদনা পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কে জীবন পাত্রকে এমনি করিয়া অপরূপ মাধুর্যে পূর্ণ করিয়া দেয় কে-ই বা তাহা আবার নিঃশেষ করিয়া দেয়। কিন্তু অনির্বচনীয় এই উপলব্ধি অক্ষয় স্মৃতিরূপে অন্তরে রহিয়া যায়। এই স্মৃতিই কবির জীবনে বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করে।

> "সে ভাঙ্গা যুগের 'পরে কবিতার অরণ্যলতায়
> ফুটিছে ছন্দের ফুল, দোলে তারা গানের কথায়।

সেদিন আজিকে ছবি হৃদয়ের অজন্তা গুহাতে
অন্ধকার ভিত্তি পটে ; ঐক্য তার বিশ্ব শিল্প সাথে।” (নাট্যশেষ)

নর-নারীর প্রেমে এই মর্তে অন্তহীন রূপ-লোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। অনির্বচনীয় পুলকের আবেশ, অনির্বচনীয় মুগ্ধতা। কিন্তু এই উপলব্ধিই জীবনের শেষ নয়, জীবনের ভিন্নতর উন্নততর পরিণাম আছে। এই উন্নততর পরিণামের সহিত মানবিক প্রেমের স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই ; বরং ওই পরিণাম লাভের জন্য মানবিক এই বোধের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা আছে। মানুষকে এই মানবিক বোধের ভিতর দিয়াই উন্নততর পরিণাম লাভ করিতে হয়। তাহা মানবিক বোধেরই সম্পূর্ণতা। একটিকে পরিহার করিয়া আর একটিকে লাভ নয়, একটির ধীর পূর্ণতার ভিতর দিয়া আর একটির মধ্যে সম্পূর্ণতা।

প্রেমে যে সৌন্দর্য-লোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়, তাহা যতই অপূর্ব হোক, তাহা বিশ্বের পরিপূর্ণ সুষমা নয় ; বরং এই সুষমা-লোকটি ভাঙ্গিয়া গিয়া সুন্দর ও অসুন্দর ভাগকে একান্ত করিয়া এবং ওই সুন্দর-লোকটির দ্বারা আবার অসুন্দর ভাগকে আচ্ছাদিত করিয়া এক অখণ্ড নির্দ্বন্দ্ব রূপ-লোক সৃষ্টি করে। ইহা পূর্ণ সুষমা-লোক নহে। এই পূর্ণ সুষমা-লোকে রূপ-বিরূপ, সুন্দর-অসুন্দর, পাপ-পুণ্য আশ্চর্যভাবে সামঞ্জস্য লাভ করে।

প্রেম খণ্ড সুষমা-লোক হইতে পরিণামে নর-নারীকে অখণ্ড সুষমা-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। প্রেমের সেই সৌন্দর্য-লোক প্রাণ-মনের সীমার দ্বারা সীমিত। অধ্যাত্মবোধে এই খণ্ডিত সৌন্দর্য-লোক পরিপূর্ণ সৌন্দর্যের মধ্যে হারাইয়া যায়।

প্রেমের অনির্বচনীয় উপলব্ধির কথা কত না ভাবে তিনি ব্যক্ত করিয়াছেন—

“সে-মুহূর্ত বাঁশির গানের মতো ;
অসীমতা তার কেন্দ্রে রয়েছে সংহত।
সে-মুহূর্ত উৎসবের মতন ;
একটি সংকীর্ণ মহাক্ষণ
উচ্ছলিত দেয় ঢেলে আপনার সবকিছু দান।” (দুজন)

কিন্তু প্রেম এই সুষমার ভিতর দিয়া পরিণামে আর এক সুষমার আভাস দান করে। “সর্ব দুঃখ, সর্ব সুখ মেলে সেথা প্রকাণ্ড মিলনে।” প্রেমে পরিণামে যে অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা, যে অশ্রু উদ্বেলতা তাহার মূলে আছে এই অপরিতৃপ্তি।

"বিশ্বের বৃহৎ বাণী লেখা আছে যে মায়া অক্ষরে,
তার মধ্যে কতটুকু শ্লোকে
ওদের মিলন-লিপি, চিহ্ন তার পড়েছে কি চোখে।" (দুজন)

বিচ্ছেদে বা বিয়োগে বাহিরের রূপ হারাইয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা অন্তরে একান্ত শূন্যতার সৃষ্টি করে না, যাহার ছিদ্রপথ দিয়া প্রাণ দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া যায়। এই বিরহের ভিতর দিয়া বাহিরের রূপই অন্তরে ফিরিয়া আসে। অন্তরের মধ্যে এই যে প্রাপ্তি তাহাতে ওই রূপের রূপান্তরীকরণ ঘটে। ওই রূপ তাহাতে অপরূপ মহিমায় ফুটিয়া উঠে। তাহা এক অলৌকিক সৌন্দর্য ও রহস্য বিজড়িত হইয়া যায়। তাহা একান্ত নিকটের হইয়াও একান্ত দূরের, অপ্রাপণীয়। নিদ্রায় অভিভূত চৈতন্যের মাঝখানে তাহার করুণ অতি লঘুহস্তের স্পর্শ লাভ করি, অভিমান অশ্রুধারা রূপে গলিয়া গলিয়া পড়ে। জাগরণে সেই মূর্তি দূরে আকাশ নীলিমায় তাহার স্থির সজল দুটি চক্ষু মেলিয়া ভাসিতে থাকে। অন্তরের মধ্যে এইরূপে আর একটি যে জগৎ সৃষ্টি হইয়া যায়, সেখানে সেই নারী-মূর্তির সহিত পুরুষের বিচিত্র লীলা চলে। পরিবর্তনশীল রূপ-লোক হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই অন্তর্লোকটি অসীমের বক্ষে বিরাজ করে। বাহিরে বিচিত্র কর্মধারা বিচিত্র স্রোতধারা রূপে ওই রূপ-লোকটিকে বেষ্টন করিয়া বহিয়া যায়, সেখানে কত পরিবর্তন, কত ভাঙ্গা-গড়া, কত উত্থান-পতন, দিন-রাত্রির কত কক্ষাবর্তন। সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই ধ্যানের জগতে কেবল দুটি সত্তার চিরন্তন বিরহ-মিলন লীলা।

"তোমাতে সমস্ত লীন, তুমি আছ একা
আমি হীন চিত্ত মাঝে একান্ত তোমারে শুধু দেখা।"

একই বিশ্ব ভিন্ন চেতনা-পর্যায়ে ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হয়। প্রাণের প্রথম জাগরণে বিশ্বের যে সুষমা-লোকের প্রকাশ ঘটে, সেই যে অপর এক সত্তার প্রকাশ তাহাকে তিনি এক্ষেত্রে 'তুমি' রূপে অভিহিত করিয়াছেন। এই 'তুমি' যেন কিশোরী নারী, যাহার মধ্যে সৌন্দর্যের অপরিস্ফুট প্রকাশ। এই 'তুমি' যৌবনে প্রাণের পূর্ণ প্রকাশে অপরূপ সৌন্দর্যময়তা প্রাপ্ত হয়, যেন পূর্ণ লাবণ্যময়ী তরুণী; অর্থাৎ বিশ্বের মধ্যে তখন সুষমা আশ্চর্য সমৃদ্ধি লাভ করে। পরিশেষে এই চেতনা এমন একটি পরিণাম লাভ করিয়াছে, সেই সঙ্গে বিশ্ব এমন একটি অখণ্ড সুষমা প্রাপ্ত হইয়াছে, যেখানে 'তুমি' বিশ্বের সকল রূপের মিলিত প্রকাশ

হইয়া উঠিয়াছে। যখন বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে তাহারই স্পর্শ লাভ করিতে পারা যায়, তাহারই আভাস ফুটিয়া উঠে।

"চিররূপখানি নবরূপে আসে প্রাণে ;
নানা পরশের মাধুরীর মাঝখানে
তোমারি সে হাত মিলেছে আমার হাতে।" (কৈশোরিকা)

এই অপর সত্তা বা 'তুমি' তাহা বিশ্ব-সত্তারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ, তাহাকে তিনি 'অসীমের দূতী' বলিয়াছেন। অর্থাৎ বিশ্বের বিচিত্র খণ্ড সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া তিনি এই অখণ্ড রূপেরই শুধু আভাস লাভ করেন নাই, এই সত্তা তাঁহার চেতনাকে নানাভাবে অসীম বা অরূপের স্পর্শ দান করিয়াছে, অসীমের বিচিত্র অলৌকিক দান ভার।

"অসীমের দূতী, ভরে এনেছিলে ডালা
পরাতে আমারে নন্দন-ফুল-মালা
অপূর্ব গৌরবে।" (কৈশোরিকা)

এই আভাস রূপে লব্ধ পূর্ণ সুষমা-লোকটিকে, তাঁহার সৌন্দর্য-লক্ষ্মীকে অপরোক্ষ করিবার আকাঙ্ক্ষাও এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে কবির এই জাতীয় আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র প্রকাশ আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি।

"প্রতি দিবসের সংসার মাঝে তুমি
স্পর্শ করিয়া আছ যে মর্তভূমি
তার আবরণ খসে পড়ে যদি কভু,
তখন তোমার মূরতি দীপ্তিমতী
প্রকাশ করিবে আপন অমরাবতী
সকল কালের বিরহের মহাকাশে।" (কৈশোরিকা)

এই অখণ্ড সত্তা কবির জীবনে পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-লক্ষ্মী রূপে প্রতিভাত হইলেও এবং সৌন্দর্য ও প্রেমের যোগে কবির জীবনে তাহার বিচিত্র লীলা সঙ্ঘটিত হইলেও তাহা নানা রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে এবং অনুরূপ কারণের জন্য স্বাভাবিক ভাবে সেই সব ক্ষেত্রে তাহার যোগের লীলা ভিন্ন স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

"তাহারি বেদনা কত কীর্তির স্তূপে
উচ্ছ্রিত হয়ে উঠে অসংখ্যরূপে
পুরুষের ইতিহাসে।" (কৈশোরিকা)

এই ভাবের পরিচয় ইতিপূর্বে তিনি বারংবার দান করিয়াছেন। নারী শুধু বিধাতার সৃষ্টি নয়, পুরুষেরও সৃষ্টি। পুরুষ তাহার সৌন্দর্য-ধ্যান দিয়া নারীকে বিচিত্র রূপে সৃষ্টি করে। নারী-রূপ বেষ্টন করিয়া পুরুষের এই যে নিত্য নবীন সৌন্দর্য কল্পনা, কবি বা শিল্পী এই ধ্যানকেই তো বাহিরের নানা সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন। এই অন্তহীন নিত্য নূতন সৌন্দর্যের পরিচয় লাভ করিয়া নারীর বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। একান্ত সাধারণ, বিশিষ্ট কয়েকটি রেখাবন্ধনের মধ্যে যাহার পরিচয় নিঃশেষিত তাহার মধ্যে এ কোন্ দুর্লভতার প্রকাশ।

কিন্তু পুরুষের এই ঐশ্বর্যের দানকে আরো অধিক করিয়া নারী যে আবার পুরুষকেই ফিরাইয়া দেয়, এই ভাবটি এক্ষেত্রে নূতন। নারীর এই প্রত্যর্পণ কি, না, এই সৌন্দর্য-ধ্যানই পুরুষকে আরো উন্নততর লোকে, রসের মুক্তি-লোকে ধীরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। এই ধীর পরিণতির ভিতর দিয়া পুরুষের প্রাণ-মন কি বিচিত্র দুর্লভ ঐশ্বর্যে ভূষিত হইয়া যায় না ?

"প্রিয় হাত হতে পর পুষ্পের হার,
দয়িতের গলে কর তুমি আরবার
দানের মাল্য দান।
নিজেরে সঁপিলে প্রিয়ের মূল্যে
করিয়া মূল্যবান।" (প্রত্যর্পণ)

সকল সীমা বা রূপ অসীম বা অরূপের যোগে সত্য। কেবল তাহাই নয়, সেই অসীম বা অরূপই দেশ-কালের মধ্যে সীমা রূপে প্রকাশিত। অসীম কেমন করিয়া সীমা-রূপ লাভ করিলেন ? ইহাই মায়া, ব্যাখ্যাতীত। এই সীমা বা রূপের মধ্যে অসীম বা অরূপের পূর্ণ মহিমা ও বিস্ময়বোধের প্রকাশ।

মানবীর মধ্যে বিশ্বরূপিণীর সাক্ষাৎকার তখনই ঘটে যখন প্রেমে মানবীয় চেতনা বিশ্ব-চেতনায় পরিণাম লাভ করে। ওই সীমা তখন মুহূর্তে অসীমে পরিণত হইয়া যায়। তখন বিশ্বের সকল রূপের মধ্যে ওই অরূপ মাধুরীর লীলা প্রত্যক্ষ গোচর হইয়া উঠে।

"অধরে তোমার বীণাপাণি
রেখে দিয়ে বীণা তাঁর
নিশীথের রাগিণীতে দিতেছেন নিঃশব্দ ঝঙ্কার।" (শ্যামলা)

রূপ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় উপলব্ধির পরিচয় আমরা বারংবার লাভ করিয়াছি।

সৌন্দর্যবোধ কি, না যাহা সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়, (ইহার নানা পরিণাম আছে। এই পরিণাম নির্ভর করে ধ্যান-তন্ময়তার উপর।) যাহা প্রতিভাকে ছাড়াইয়া গভীরতর সত্তায় অনুপ্রবিষ্ট করায়। সীমা বা রূপ কবিকে অসীম বা অরূপের আভাস দান করিয়াছে, তাই তো তাহা অমন সুন্দর, পরম বিস্ময় বিজড়িত।

প্রেমকে আশ্রয় করিয়াই কেবল নয়, প্রকৃতির সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি-চেতনার এই এক পরিণাম ঘটিয়াছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নারীর প্রেম একাকার হইয়া গিয়াছে।

"শ্রাবণে অপরাজিতা, চেয়ে দেখি তারে
আঁখি ডুবে যায় একেবারে—
ছোটো পত্রপুটে তার নীলিমা করেছে ভরপুর,
দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর
বাজে তাহে, সেই দূর আকাশের বাণী
এনেছে আমার চিত্তে তোমার নির্বাক মুখখানি।" (শ্যামলা)

শ্রাবণের ঘন নীলিমাভরা অপরাজিতার সৌন্দর্য-ধ্যানের ভিতর দিয়া কবির মর্মে ধ্বনিত হয় "দিগন্তের শৈলতটে অরণ্যের সুর।" সেই এক সুর ধ্বনিত হয় যখন কবি ওই নির্বাক মুখখানির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকেন।

অপরাজিতা ফুল এবং নির্বাক মুখ উভয়েই কবি-চিত্তে একই দূর-লোকের আভাস দান করিয়াছে ; অর্থাৎ সৌন্দর্য প্রকৃতির হোক, অথবা মানবীর হোক, উহার ধ্যান-তন্ময়তার ভিতর দিয়া কবি উন্নততর সৌন্দর্য ও প্রেমের, বৃহত্তর সুষমার (যে পূর্ণ সুষমায় প্রকৃতি ও নারীর সৌন্দর্য বিধৃত হইয়া আছে) আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

এই মানব প্রেমই কবির নিকট পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অন্তরের মধ্যে প্রেমে এই যে প্রাপ্তি তাহাতে জীবনের সকল অভাব পূর্ণ হইয়া যায়। মর্ত-লোকে এই অমৃত আস্বাদ করিয়া মানুষ অমরতা লাভ করে।

মানুষ এই সত্যটিকে কোন একটি উপায়ে লাভ করিতে পারিতেছে না বলিয়া অন্তরের এই নিত্য শূন্যতার পীড়া জয় করিয়া উঠিবার জন্য বাহিরে বস্তুর পর বস্তু সঞ্চয় করিয়া চলিয়াছে, বস্তু সঞ্চয়ের ক্ষমতাকে ক্রমাগত প্রসারিত করিয়া

চলিয়াছে, তাহার জন্য দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাত-বিরোধ-বিক্ষোভের অন্ত নাই। এই প্রেম যখন জাগে তখন বোধ করিতে পারা যায় যে এতদিন একমাত্র ইহারই জন্য অন্তর তৃষিত হইয়াছিল। এই উপলব্ধিতে বাহিরের আর সমস্ত কিছু নিরর্থক হইয়া যায়।

"তৃষিত হিয়া চেয়েছে যাহা নহে সে হীরা সোনা,
পর্ণ পুটে একটু শুধু জল,
উৎসতটে খেজুরবনে ক্ষণিক ছায়াতল।
সেইটুকুতে বিরোধ ঘোচে জীবন মরণের
বিরাম জোটে শ্রান্ত চরণের।" (অন্তরতম)

এই জীবন ও জগৎ, সীমা ও অসীম, মুক্তি ও বন্ধনের এক অপরূপ আশ্চর্য প্রকাশ। তাহা একদিকে সীমা বা বন্ধন, তাহা না হইলে রূপের প্রকাশ ঘটে না, আর একদিকে মুক্ত বা অসীম, তাহা না হইলে অন্তরের প্রকাশ হয় না। কবির কাব্যের মধ্যে এই একই প্রকাশ-রহস্য। তাহা একদিকে সীমিত, বাণী-বদ্ধ, অন্যদিকে ব্যঞ্জনার ভিতর দিয়া তাহা প্রতি মুহূর্তে সীমাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেছে। কাব্যের ব্যঞ্জনা (শিল্প শাস্ত্রে যাহা বর্ণিকাভঙ্গ) সীমা ও অসীমের মধ্যে সংযোগসেতু স্বরূপ।

"বৈকুণ্ঠের সুর যবে বেজে উঠে মর্তের গগনে
মাটির বাঁশিতে, চিরন্তন রচে খেলাঘর
অনিত্যের প্রাঙ্গণের 'পর,
তখন সে সম্মিলিত লীলারস তারি
ভরে নিই যতটুকু পারি
আমার বাণীর পাত্রে, ছন্দের আনন্দে তারে
বহে নিই চেতনার শেষ পারে,
বাক্য আর বাক্যহীন
সত্যে আর স্বপ্নে হয় লীন।" (মাটিতে-আলোতে)

এই প্রেমের আলোকে জীবন ও জগতের মাধুর্য তাহার নিকট অন্তহীন হইয়া ধরা পড়িয়াছে। নারীর যে রূপকে তিনি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় দেখা রূপ নয়। ঈশ্বর যে প্রেমে এই সীমা-রূপ চিত্রিত করিয়াছেন, সকল রূপের মধ্যে তাঁহার যে প্রেম ব্যক্ত

সেই এক প্রেমের আলোকে তিনি রূপকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সে রূপ তাই অনন্ত বিস্ময়রসে পরিপূর্ণ। তাহা নিত্য নূতন, অনির্বচনীয়।

"তোমার যে-সত্তাখানি প্রকাশিলে মোর বেদনায়
কিছু জানা কিছু না জানায়,
যারে লয়ে আলো আর মাটিতে মিতালি,
আমার ছন্দের ডালি
উৎসর্গ করেছি তারে বারে বারে;
সেই উপহারে
পেয়েছে আপন অর্ঘ্য ধরণীর সকল সুন্দর।" (মাটিতে-আলোতে)

বিশ্বের সকল রূপ, মর্তের তৃণ-পুষ্প হইতে অন্তহীন নক্ষত্র-লোক পর্যন্ত এই সমস্তকিছুই এক একটি বিশিষ্ট স্পন্দন। এক অনাদ্যন্ত মহা স্পন্দন-সমুদ্রের বক্ষে অন্তহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্পন্দনের বিচি-বিক্ষেপ। একবার জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

সঙ্গীতের স্পন্দনের ভিতর দিয়া মানবীয় চেতনা সেই নির্বিশেষ স্পন্দন-লোকের সহিত পরিণামে যোগ যুক্ত হইয়া যায়। সেই স্পন্দন-উৎস হইতে মর্ত-লোকে নিত্যকাল ধরিয়া অন্তহীন রূপ বিচ্ছুরিত হইতেছে। তাহারই জন্য সেই পরিণাম লাভে মানব-মন বিশ্বের সকল রূপের সহিত অনির্বচনীয় মিলন বোধ করে।

সুর সৃষ্টি সম্পর্কেই কেবল যে একথা সত্য তাহা নহে, কবির কাব্য সম্পর্কেও একথা সত্য। কাব্যের রূপ-ধ্যান ছন্দের স্পন্দনে স্পন্দিত হইয়া বিশ্ব-স্পন্দনের সহিত মিলিত হইয়া যায় বলিয়া ওই রূপের আভাস বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়া এক অলোকিকত্ব প্রাপ্ত হয়।

রূপ তাহা নারীরই হোক, অথবা প্রকৃতিরই 'হোক, তাহার যথার্থ প্রকাশ আমাদের দৃষ্টিতে কোনক্রমেই ঘটে না। রূপের সম্পূর্ণ প্রকাশ তখনই ঘটে যখন চেতনার মধ্যে অন্তহীন সুদূরতা থাকে। সকল সীমার বোধ মুক্ত হইয়া এই যে রূপ সাক্ষাৎকার, তাহাকেই বলা হইয়াছে অনন্তের পটভূমিকায় রূপ বা সীমাকে সাক্ষাৎ করা। অন্তহীন প্রাণ-সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ, নিশ্চল কৃষ্ণ পটভূমিকায় একটি বুদ্বুদের মতো, একটি চকিত বিদ্যুচ্চমকের মত সে রূপ একবার জাগিয়া উঠিয়া হারাইয়া যায়। রূপের এই বিস্ময়ের কী পার আছে। এই সাক্ষাৎকারে প্রত্যেকটি রূপ আপন বৈশিষ্ট্যে অন্তহীন বিস্ময়বিজড়িত হইয়া যায়। এই অন্তহীন বিস্ময় লইয়া তাহা অনন্য।

"নিত্যের চিত্তের পটে ক্ষণিকের চিত্র গেহু দেখি
আশ্চর্য সে-লেখা।
সে তুলির রেখা
যুগ-যুগান্তর-মাঝে একবার দেখা দিল নিজে,
জানিনে তাহার পরে কী যে।" (দুই সখী)

'মাটি' কবিতার মধ্যে জীবন ও জগতের 'মায়া'-রূপটি সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়া গিয়াছে।

আমার চেতনার দ্বারা সীমিত এই যে আমার বোধ, আমি-রূপে যাহার প্রকাশ, আর আমার একান্ত আপনার এই যে বাসভূমি, যাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া আমার এত দীর্ঘ দিনের এত ভালোবাসার প্রকাশ ঘটিয়াছে, মৃত্যুতে আমার সকল বোধ লইয়া যখন আমি অনস্তিত্ব হইয়া যাইব তখন এই মাটিতে তাহার রেখামাত্র কোথাও থাকিবে না। কোন্ সুদূর অতীত কাল হইতে মানুষ এইখানে এই মাটিতে সংসার পাতিয়াছে, কত বিচিত্র জীবন লীলা সমাপন করিয়া মৃত্যুতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়াছে। এই মাটিতে তাহাদের চিহ্নমাত্রও কোথাও নাই! আজিকার মানব-যাত্রীও তেমনি কাল নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। এখানে তেমনি করিয়া শ্যামল তৃণের প্রকাশ ঘটিবে, তেমনি করিয়া আকাশ ছায়ারৌদ্র লইয়া ইহার বক্ষে খেলা করিবে তেমনি করিয়া ষড়ঋতু তাহার অন্তহীন দানভার লইয়া পর্যায়ক্রমে ধরিত্রীর প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইবে।

"আসে যায়
ঋতুর পর্যায়,
আবর্তিত অন্তহীন
রাত্রি আর দিন;
মেঘ-রৌদ্র এর 'পরে
ছায়ার খেলনা নিয়ে খেলা করে
আদিকাল হতে।" (মাটি)

সেখানে

"হায় আমি
হায়রে ভূস্বামী,
এখানে তুলিছ বেড়া, উপাড়িছ হেথা যেই তৃণ
এ মাটিতে সে-ই রবে লীন

পুনঃ পুনঃ বৎসরে বৎসরে। তার পরে

এই ধূলি রবে পড়ি আমি-শূন্য চিরকাল তরে।" (মাটি)

কিন্তু এই মায়ার স্বরূপ উপলব্ধিরও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। চিরকালের জন্য আমি অনস্তিত্ব হইতে পারি, কিন্তু মানব-যাত্রীর তো শেষ নেই। বৎসরে বৎসরে এই ঋতু, এই আলো-ছায়া তাহাদের আহ্বান করিয়া লইবে, এই মাটির কোলে তাহাদের নিত্য-নূতন করিয়া সংসারলীলা চলিবে, ভালোবাসার কত-না অনুভূতি। আর এই অন্তহীন রূপ-লোক তাহাদের মুগ্ধদৃষ্টিতে কী রূপের অঞ্জন না লাগাইয়া দিবে।—কত-না-স্বপ্নের জাল।

'সত্যরূপ' কবিতাটির মধ্যে কবি যাঁহাকে 'তুমি' রূপে সম্বোধন করিয়াছেন এক্ষেত্রে তাহার স্বরূপ বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নাই। বর্তমান কবিতায় তাহা গৌণ-দিক। কবি তাঁহার এই তুমির উপলব্ধি-বঞ্চিত এবং তুমির উপলব্ধি-ধন্য এই দুটি জীবনের পরিচয় এক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া দান করিয়াছেন।

'তুমি'র উপলব্ধি-বঞ্চিত অবস্থায় কবির নিকট এই জীবন ও জগৎ একান্ত অর্থহীন, শ্রীহীন বলিয়া বোধ হয়, তাহা নিদারুণ ভারমাত্র। এখানে মানুষের পরিচয় একান্ত ক্ষুদ্র, কতকগুলি জাগতিক প্রয়াসের মধ্যে নিঃশেষিত। এই সত্তায় মানুষ বিশ্ব-প্রবাহে নিয়ত চঞ্চল, উৎক্ষিপ্ত, আশ্রয়শূন্য।

"মায়ার আবর্তে রচে আসায় যাওয়ায়

চঞ্চল সংসারে।"

তুমির স্পর্শে কবির চেতনা যখন উদ্দীপ্ত তখন এই ব্যক্তি-সত্তার এক দুর্লভ মহিমা ফুটিয়া উঠে।

গণনাতীত রূপসমন্বিত অপার বিস্ময়পরিপূর্ণ এই যে সীমা-লোক, একটি ব্যক্তি-সত্তার মধ্যেও সেই অসীম বিস্ময়ের প্রকাশ। বিশ্ব-পরিব্যাপ্ত এক চেতনাই সংখ্যাতীত ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে প্রকাশমান। সেই কারণে সেই এক আদি চেতনার সহিত যোগে ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বের সকল সত্তার সহিত পরামাশ্চর্য মিলন-বোধ করিতে পারে।

সীমা-অসীমের আনন্দ-রূপের, প্রেমের প্রকাশ। মানুষ যখন সেই আনন্দ-রূপের সেই প্রেমের সহিত যুক্ত হইয়া বিশ্বের সকল রূপের সহিত মিলন-বোধ করে তখন ব্যক্তি-সত্তা একদিকে অসীমের সহিত যুক্ত হইয়া যেমন মুক্তি-বোধ করে তেমনি অন্যদিকে বিচিত্র সীমার সহিত মিলন-বোধের ভিতর দিয়া অসীমের আনন্দ ও প্রেমকেই উপলব্ধি করে। বিশ্বের সকল সত্তার মত ব্যক্তি সত্তারও

একদিকে অসীম, অন্যদিকে সীমা, একদিকে মুক্তি আর একদিকে বন্ধন। ব্যক্তি-সত্তায় এই দুই ওতপ্রোত হইয়া আছে।

"—বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তায় মোর রচি' নিজ সীমা
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী মাঝে
সে দীপে জ্বলেছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে ;
সেই তো বাখানে,
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।" (সত্যরূপ)

সকল রূপকে আশ্রয় করিয়া রূপের অতীত একটি সত্তা কোন-না-কোন স্বরূপে আছেই। এই অতীত সত্তা আছে বলিয়া তাহারই যোগে আমরা সকল রূপকে উপলব্ধি করিতে পারি। সেই অতীত সত্তাটিকে লাভ করিতে পারিলে স্বাভাবিক ভাবে বিশ্বের সকল রূপের সহিত মিলন ঘটে। তেমনি বিশ্বের অগণিত নর-নারীর অন্তরে যে ভাব-লোক তাহা ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পৃথক হইলেও তাহাদের সকলকে অতিক্রম করিয়া একটি সীমাহীন ভাব-লোক আছে। এই-জন্য তাহা যেমন সংযোগশূন্য হইয়া অন্তহীন বৈচিত্র্যে নিরর্থকতার মধ্যে হারাইয়া যায় না, তেমনি একমাত্র তাহারই যোগে বিশ্বের সংখ্যাতীত ভাব-বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহা না হইলে অন্য সত্তা আমাদের সম্পূর্ণ অননুভূত রহিয়া যাইত। এই যে সকল রূপের এবং সকল ভাবের অতীত সত্তা, তাহা সকল অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। বিশিষ্ট রূপ বা ভাব অনুধ্যানের ভিতর দিয়া মানবীয় সত্তা এই সকল দেশ-কাল ব্যাপ্ত নির্বিশেষ রূপ বা ভাব-লোকটিকে লাভ করিতে পারে।

সার্থক রূপ বা ভাবের তাই দুইটি দিক আছে, তাহা একদিকে নির্বিশেষ পরিণামের সহিত যুক্ত, ইহা রূপ ও ভাবের মুক্তির দিক, অন্যদিকে আকারবদ্ধ। কবির কাব্যে যে রূপ ও ভাবের অনুধ্যান তাহা যদি ওই নির্বিশেষ পরিণাম লাভ করিয়া থাকে, তবে সকল দেশের সকল কালের পাঠক চিত্তের রূপ ও ভাবের অনুধ্যানের সহিত তাহার গাঢ় মিল থাকিবেই। এই উপলব্ধিটিকেই তিনি 'পাঠিকা' কবিতাটির মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

কবির কাব্যপাঠের ভিতর দিয়া প্রাণের, সৌন্দর্য-লোকের সেই প্রথম নিগূঢ় সঞ্চার, একটি অনির্দেশ্য বেদনাবোধ।

"নয়ন মম করিছে ছলোছলো।
হিয়ার মাঝে কী কথা তুমি বল।" (পাঠিকা)

কবির কাব্যে যে রূপের ধ্যান তাহারই তন্ময়তার ভিতর দিয়া সেই রূপের সহিত একপ্রকার একাত্মতা ঘটে। কেবল তাহাই নয়, এই একাত্মতা-বোধের ভিতর দিয়া চেতনা পরিণামে সেই নির্বিশেষ রূপকে লাভ করিতে পাবে বলিয়া আমি-রূপের সহিতও তাহার মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কবি-প্রিয়ার যাহা মুক্তির দিক তাহার সহিত সকল যুগের প্রিয়ার মিল আছে।

"ওগো আমার কবি
ছন্দ বুকে যতই বাজে
ততই সেই মূরতি মাঝে
জানি না কেন আমারে আমি লভি। (পাঠিকা)

কবির প্রিয়ার ধ্যান এই রূপে সকল যুগের প্রিয়ার ধ্যানে, কবির কণ্ঠের মালিকা অর্থাৎ সৌন্দর্যের বিচিত্র অর্ঘ্য এইরূপে সকল যুগের প্রিয়ার অর্ঘ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে।

"জেনেছ যারে তাহারো মাঝে
অজানা যে সে-ই বিরাজে,
আমি যে সেই অজানাদের দলে।
তোমার মালা এল আমার গলে।" (পাঠিকা)

অসীম যখন আপনাকে সীমিত করিলেন, তখনই দেশ-কালের, অন্তহীন রূপ-লোকের সৃষ্টি হইল, মাধুর্য তখনই নিঃসীম হইয়া উঠিল, দিকে দিকে কী অনির্বচনীয়তার আভাসই না ফুটিয়া উঠিল। প্রেম মানেই অসম্পূর্ণতা, এই অসম্পূর্ণতায় বা প্রেমে তাঁহার এই সৃষ্টি রূপলাভ করিয়াছে।

যে সাধনা দেশ-কালের ঊর্ধ্বে কেবলমাত্র অসীম বা অরূপকেই লাভ করিতে চায়, তাহা আর যাহাই লাভ করুক না-কেন, তাহাতে বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত এই দুর্লভ প্রেম, প্রেমে আশ্চর্য প্রকাশ, এই রস আস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

অসম্পূর্ণতায় প্রেমে এই যে আশ্চর্য প্রকাশ তাহা অসীম বা অরূপ হইতে কোন অংশে ন্যূন তো নয়ই, বরং মানবীয় সত্তা একমাত্র এই প্রেমের সহিত

একাত্মতা বোধ করিতে পারে বলিয়া এবং তাহাতে মানবীয় সত্তা এক আশ্চর্য মূল্য লাভ করে বলিয়া তাহা অধিক আকাঙ্ক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। মানবিক বোধকে ছাড়াইয়া উঠিয়া যে সম্পূর্ণতার সাধনা তাহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা নয়, মানবিক বোধের মধ্যে তাহার সকল ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা লইয়া যে পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথ সেই পূর্ণতাকে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন। কবির এই গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধিটি 'ভুল' কবিতার মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

সকল সীমার বোধ-মুক্ত, অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি-মুক্ত যে সৌন্দর্য তাহার পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দান করিয়াছেন।

"নিখুঁত শোভা নিরতিশয় তেজে
অপরাজেয় সে যে
পূর্ণ নিজে নিজেরই সম্মানে।" (ভুল)

এই সৌন্দর্যকে আশ্রয় করিয়া মানব-প্রেম চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে না। মানব-প্রেম অসম্পূর্ণ, ত্রুটি-বিজড়িত বলিয়া সেই সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আকাঙ্ক্ষা করে যাহার মধ্যে ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আছে। অসম্পূর্ণতা ছাড়া প্রেম আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। করুণা-তত্ত্বের সহিত অসম্পূর্ণতার বোধ বিজড়িত।

"একটুখানি দোষের ফাঁক দিয়ে
হৃদয়ে আজ নিয়ে এসেছ, প্রিয়ে,
করুণ পরিচয়—

*　　*　　*

এখন আমি পেয়েছি অধিকার
তোমার বেদনার
অংশ নিতে আমার বেদনায়।" (ভুল)

অদ্বৈতবাদীদের সাধনার স্বরূপ আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথের সাধনা কি তাহাও আমরা জানি। জীবন ও জগৎ, এই সীমাবোধ যে অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরা। এই মাধুর্যে সীমা জাগতিক অর্থ হারাইয়া পরমার্থতঃ অসীম হইয়া উঠে। সীমার প্রকাশ যে অসীমের প্রকাশ হইতে কোন অংশে ন্যূন নয় এই সত্যটিকেই তিনি সমস্ত জীবন ধরিয়া নানা দিক হইতে নানা ভাবে উদ্‌ঘাটিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

"অকুণ্ঠিত দিনের আলো
টেনেছে মুখে ঘোমটা কালো"
আমার বেদনাতে।" (ভুল)

এই মর্তেই দেবতার আবির্ভাব ঘটে, অর্থাৎ এই মর্তেই মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়। সেই অমৃতের আস্বাদ লাভ জীবনে কোন্ কোন্ অবস্থায় ঘটে কবি তাহারই পরিচয় দান করিয়াছেন 'দেবতা' কবিতাটির মধ্যে।

অমৃতের আস্বাদ মানুষ তখনই লাভ করে যখন ব্যক্তি-চেতনা সীমার সকল আবেষ্টনী মুক্ত হইয়া বিশ্বের অন্তহীন প্রাণ-লীলার ক্ষেত্রে আপনাকে পরিব্যাপ্ত দেখে, সে-প্রাণ তৃণ-কণা হইতে দূরতম জ্যোতিষ্ক-লোক পর্যন্ত প্রসারিত। কবি আপনার জীবনে এই পরিণাম কত বারবার লাভ করিয়াছেন।—সেই উপলব্ধিরই নূতন প্রকাশ।

"মাঝে মাঝে দেখি তাই—
আমি যেন নাই,
ঝঙ্কৃত বীণার তন্তুসম দেহখানা
হয় যেন অদৃশ্য অজানা;" (দেবতা)

মর্তের নারীকে আশ্রয় করিয়া মানব-অন্তরে যখন প্রেম জাগে তখন মানুষ যে অনির্বচনীয়তার আস্বাদ পায় তাহাই অমৃতের আস্বাদ। প্রেমের স্পর্শে বিশ্বের সকল অন্তর্লীন মাধুর্যের প্রকাশ ঘটে। প্রেমে সীমার সকল বোধ লুপ্ত হইয়া যায়।

মানুষ যখন অন্যায়ের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দারুণতম শেল বিদ্ধ করে, তাহার জন্য হাসিমুখে সকল দুঃসহ দুঃখ ও নির্যাতনকে বরণ করিয়া লয়, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে ইতস্তত করে না তখনই মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়। মানুষ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া আপনার অসীমতা, অমৃত-রূপকে প্রকাশ করে।

সীমার সকল বন্ধন-মুক্ত চেতনার মহান্ প্রসারের উপলব্ধির পরিচয় কবি 'শেষ' কবিতাটির মধ্যেও দান করিয়াছেন।

"বহি লয়ে অতীতের সকল বেদনা,
ক্লান্তি লয়ে, গ্লানি লয়ে, লয়ে মুহূর্তের আবর্জনা,
লয়ে প্রীতি,
লয়ে সুখ-স্মৃতি,

আলিঙ্গন ধীরে ধীরে শিথিল করিয়া
এই দেহ যেতেছে সরিয়া
মোর কাছ হতে।" (শেষ)

দেহ-মুক্ত চেতনার সেই অলৌকিক উপলব্ধি—

"ভাসিতেছে সত্তার প্রবাহে
সৃষ্টির আদি তারা সম
এ চৈতন্য মম।" (শেষ)

দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর সত্তায় এই জীবন ও জগৎ যে এই স্বরূপে প্রতিভাত হইবে না, একথা সত্য; সেদিন কি এত বড় সত্য মিথ্যায় পর্যবসিত হইয়া যাইবে? এই জিজ্ঞাসা কবি-চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে। এই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে আমাদের বোধ সীমার। এই সীমার বোধ দিয়া তাহার যে স্বরূপ উপলব্ধি করি, অসীমের দিক হইতে নিশ্চয়ই তাহা ভিন্ন স্বরূপে প্রতিভাত হইবে। সে কোন স্বরূপে তাহা কে জানে।

"যদি এ জীবন মোর গাঁথা থাকে মায়ার স্বপনে,
মৃত্যুর আঘাতে জেগে উঠে
আজিকার এ জগৎ অকস্মাৎ যায় টুটে,
সব কিছু অন্য এক অর্থে দেখি,
চিত্ত মোর চমকিয়া সত্য বলি তারে জানিবে কি।" (জাগরণ)

অদ্বৈতবাদীদের মতে এই জগৎ এক অনির্বচনীয় প্রকাশ। ইহাই মায়া। মর্ত-চেতনায় এই জগৎ ও জীবনকে যে সত্য বলিয়া বোধ হয়, তাহা আপেক্ষিক সত্য মাত্র। দেশ-কালের বোধ বা সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠিলে এই জীবন ও জগৎ তাহার সকল অর্থ সমেত ছায়া হইয়া কোথায় হারাইয়া যায়। যদি এই উপলব্ধি সত্য হয়, তাহা হইলে সমগ্র জীবনের উপলব্ধ সত্য যেখানে মিথ্যা হইয়া যায়, সেখানে তাহার সত্যতার প্রমাণ কি? তাহা কাহার সাপেক্ষে সত্য?

মহাকাল প্রতিমুহূর্তে মৃত্তিকা ও আকাশ-পটে কত অপরূপ ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আবার আপন হস্তে নির্মমভাবে তাহা মুছিয়া দিতেছেন। তাহার এই আঁকা ও মোছার বিরাম নাই। প্রাণ-স্রোতে ভাসমান ইহা যেন অন্তহীন রূপের প্রদীপ, জ্বলিতেছে নিভিতেছে। যেন মহাকবির কাব্যের এক-একটি

বিচ্ছিন্ন শ্লোক। আশ্চর্য, অপরূপ রূপের আভাস জাগাইয়া কোথায় হারাইয়া যাইতেছে। রূপ প্রতি মুহূর্তে সরিয়া যাইতেছে, হারাইয়া যাইতেছে, নিয়ত প্রসারতা লাভ করিতেছে বলিয়া অরূপের আনন্দ নিত্য সঞ্জীবিত হইয়া আছে। রূপ স্থির হইলে অরূপের আনন্দ মুহূর্তে বন্ধ্যা হইয়া যাইত।

সৃষ্টির এই তত্ত্বকে জীবনেও সত্য করিয়া তুলিতে হয়, নহিলে আসক্তি মানুষকে বাঁধে। মানুষের জীবনে তাহা ঘোর বিনষ্টি ঘটায়। এই অন্তহীন অমৃত-ধারাকে আমরা 'আমি'র (দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট সত্তা) পাত্র ভরিয়া আকণ্ঠ পান করিতে পারি মাত্র। 'আমি'র বা অহঙ্কারের একমাত্র সার্থকতা এইখানে। অর্থাৎ এই অহঙ্কারের দ্বারা নির্বিশেষকে বিশেষ করিয়া তুলিতে পারি বলিয়া আমরা একটি বিশেষ আনন্দ পাই। ইহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। কিন্তু অহঙ্কার যখন তাহাকে আপনার বলিয়া জড়াইয়া ধরিতে চায়, তখন জীবনে দুঃখ নিঃসীম হইয়া উঠে।

"মানো সেই লীলা, যাহা যায় যাহা আসে
পথ ছাড়ো তারে অকাতরে অনায়াসে।
আছে তবু নাই, তাই নাহি তার ভার;
ছেড়ে যেতে হবে, তাই তো মূল্য তার।
স্বর্গ হইতে যে সুধা নিত্য ঝরে
সে শুধু পথের, নহে সে ঘরের তরে।
তুমি ভরি লবে ক্ষণিকের অঞ্জলি,
স্রোতের প্রবাহ চিরদিন যাবে চলি। (ক্ষণিক)

দেশ-কাল পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রাণের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। তাহারই অহেতুক আনন্দ অফুরন্ত সৃষ্টি-রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। এই মহাপ্রাণের সহিত যুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া বিশ্বের সকল রূপ নিত্য ক্ষয়ের ভিতর দিয়া চির-নবীন হইয়া বিরাজ করিতেছে।

মানুষের প্রাণও যতদিন বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত যুক্ত থাকে ততদিন মহান্ অস্তিত্বের যোগে সে আপন অস্তিত্বের উপলব্ধি করে। এই পরম অস্তিত্বের উপলব্ধিই মহান্ আনন্দের। যখন ব্যক্তি-সত্তা বিশ্বের প্রাণ-ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আসে, তখনই একক সত্তার ভাব তাহাকে নিয়ত ক্লিষ্ট করিতে থাকে, নিঃশেষিত প্রাণের জন্য জরা আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত বলিয়া তুচ্ছ তৃণ অমর হইয়া আছে, আর মানুষের

অহঙ্কারের দ্বারা সৃষ্ট, প্রাণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বলিয়া প্রবলতম প্রতাপ, কীর্তি-সৌধ কালে কতই বিলীন হইয়া গিয়াছে।

"নিভৃতে পৃথক কোরো নাকো
তুমি আপনারে।
ভাবনার বেড়া বেঁধে রাখ
কেন চারিধারে।
প্রাণের উল্লাস অহেতুক
রক্তে তব হোক না উৎসুক
খুলে রাখো অনিমেষ চোখ;
ফেলো জাল চারিদিক ঘিরে,
যাহা পাও টেনে লও তীরে
ঝিনুক শামুক যাই হোক।" (প্রাণের ডাক)

প্রাণ-সমুদ্রে সন্তরণ করিয়া প্রাণের বিচিত্র আঘাত সহিবার যে সামর্থ্য তাহা কবির জীবনে আর নাই। এখন কেবল প্রাণ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া তাহারই বিচিত্র লীলা সাক্ষাৎ করা। এখন কেবল অনিমেষ দৃষ্টি মেলিয়া থাকা।

মহৎ স্রষ্টার জীবন আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় রূপ লাভ করে। এই উপলব্ধি যখন তাহার জীবনে সত্য হয়, তখন বাহিরের কোন নিন্দা, কোন ক্ষতি, কোন প্রলোভন, নির্মমতম বঞ্চনা-প্রবঞ্চনাও তাহাকে আর বিক্ষুব্ধ করিতে পারে না। অচঞ্চল দীপ-শিখার মত তাঁহার চেতনা দিব্য-চেতনার সহিত যুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার এই সৃষ্টি ঈশ্বরীয় সৃষ্টির অনুরূপ। অর্থাৎ ঈশ্বর যেমন তাঁহার অন্তরের ধ্যানকে বাহিরে সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রকাশ করেন; এই প্রকাশেই, এই সাক্ষাৎকারেই তাঁহার আনন্দ, ইহার অধিক কোন ফল লাভ তাঁহার নাই; স্রষ্টা মানুষও তেমনি তাঁহার অন্তরের ধ্যান-রূপকে বাহিরে বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে প্রকাশ করেন। এই প্রকাশই তাঁহার আনন্দ। ইহার অতিরিক্ত কোন ফল লাভ তাঁহার জীবনে থাকিতে পারে না।

"জানিয়ো মনে চিরজীবন সহায়হীন কাজে
একটি সাথি আছেন হিয়ামাঝে;
তাপস তিনি, তিনিও সদা একা,
তাঁহার কাজ ধ্যানের রূপ বাহিরে মেলে দেখা।" (রূপকার)

প্রারম্ভিক জীবনে কবি যে সকল নারীর নিকট সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, পরিণত বয়সে অবসরমুহূর্তে অন্য মনে তাহাদের এক একটি স্মৃতি মনের মধ্যে দুর্লভ মাণিক্যের দীপ্তি লইয়া ভাসিয়া উঠে।

"হঠাৎ দেখি চিত্ত পটে চেয়ে,
সেই যে ভীরু মেয়ে
মনের কোণে কখন গেছে আঁকি
অবর্ষিত অশ্রু-ভরা
ডাগর দুটি আঁখি।" (ছায়া-ছবি)

সৌন্দর্যও মাধুর্যের রসে নিমগ্ন কবি মাঝে মাঝে এমন একটি সত্তার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছেন যাহার মধ্যে অপরিমিত নগ্ন শক্তি, যাহা মাধুর্যকে দলিত করে, যাহা নিঃসঙ্কোচে প্রাণ বিসর্জন দিয়া মৃত্যুর বক্ষ হইতে অমৃত আহরণ করে। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্তা লাভেব আকাঙ্ক্ষা কবির জীবনে গভীর হইতে গভীরতর হইয়াছে।

"সেই তীব্র আলোকেতে দেখিলাম দীপ্ত মূর্তি তার—
জ্বালাময় আঁখি,
বর্ণচ্ছটা হীন বেশ,
নির্বিকার
মুখচ্ছবি।" (বিহ্বলতা)

কবি তাঁহার ইতিপূর্বের কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মাধুর্য দিয়া রঙ, রেখা ও ধ্বনির সহায়তায় যে সকল অপরূপ মূর্তি, যাহা একযোগে মূর্ত্য হইয়াও বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, অঙ্কন করিয়াছিলেন, তাহার সমতুল্য না হইলেও 'ছবি' কবিতার চিত্র-রূপের মধ্যে এমন একটি বর্ণবিরল মাধুর্য, এমন একটি কমনীয়তা, সেই সঙ্গে এমন এক বেদনাবোধ বিজড়িত রহিয়াছে, যাহাতে কবিতাটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে না। পরিণত বয়সে কবির সৌন্দর্য রচনার মধ্যে বর্ণের বৈচিত্র্য ও প্রগাঢ়তা হয়ত হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে এমন একটি সূক্ষ্ম রসবোধ যাহার ফলে সহজ সরল নিত্যদিনের তুচ্ছ বিচিত্র সামগ্রীর মধ্যে তিনি দুর্লভ মাধুর্যের সন্ধান পাইতে সুরু করিয়াছেন। বর্ণবিরল সৌন্দর্য-রচনার মধ্যে কবির বা শিল্পীর ধ্যানের প্রগাঢ়তার পরিচয় লাভ করা যায়।

সন্তানের জন্য সুতীব্র ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠাকেই আমরা মাতৃস্নেহের স্বরূপ বলিয়া জানি। এই ব্যাকুলতা এবং ত্যাগ যে মাতার মধ্যে যত বেশি তাঁহার

মহিমাও তত বেশি। মাতৃত্বের বোধ সম্পর্কে ইহাই আমাদের চিরাচরিত সংস্কার।

রবীন্দ্রনাথ 'মাতা' কবিতাটির মধ্যে মাতৃস্নেহের মহিমাকে যে বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহাতে সম্পূর্ণ এক নূতন দিক উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। তাহাতে সন্তানের প্রকাশকে ঘিরিয়া যে বিস্ময় তাহা একদিকে যেমন নিঃসীম হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি এই বিস্ময়কে ঘিরিয়া রহিয়াছে এক পরমাশ্চর্য অনাসক্তি। তাঁহার মাতৃপ্রেমের ধ্যানের পশ্চাতে রহিয়াছে জীবনের অনন্ত রহস্যময়তা-বোধ।

"এ বিশ্বের যাত্রী যারা চলে অসীমের পানে
আকাশে আকাশে নৃত্যগানে—
আমার শিশুর মুখে কলকোলাহলে
যে যাত্রীর গান আমি শুনিব এ বক্ষতলে।"
(মাতা)

কোমল করুণ হস্তের স্নেহবন্ধনে বাঁধা দুইটি শিশু কাঠবিড়ালিকে দেখিয়া কবির অন্তরে যে মাধুর্যের সঞ্চার হইয়াছে তাহার সহিত তিনি তুলনা করিয়াছেন পরপর কয়েকটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। সে সৌন্দর্য ক্ষণিক, ক্ষুদ্র এবং তুচ্ছ হইলেও তাহার মধ্যে কবি খুঁজিয়া পাইয়াছেন এক পরমাশ্চর্য মহিমাকে। তাহা কোমল, করুণ, স্নিগ্ধ সুধাবিজড়িত। সেই রূপ-কল্পনাগুলি একের পর এক উদ্ধৃত করিতেছি।

প্রথম

"চাঁপা গাছের আড়াল থেকে
একলা সাঁঝের তারা
একটুখানি ক্ষীণ মাধুরী
জাগায় যেমন ধারা—"
(কাঠবেড়ালি)

দ্বিতীয়

"তরল কলধ্বনি যেমন
বাজে জলের পাকে
গ্রামের ধারে বিজন ঘাটে
ছোটো নদীর বাঁকে,"
(কাঠবেড়ালি)

তৃতীয়

"লেবুর ডালে খুশি যেমন
প্রথম জেগে ওঠে
একটু তখন গন্ধ নিয়ে
একটি কুঁড়ি ফোটে,"

(কাঠবেড়ালি)

চতুর্থ

"দুপুরবেলায় পাখি যেমন—
দেখতে না পাই যাকে—
ঘন ছায়ায় সমস্ত দিন
মৃদুল সুরে ডাকে,—"

(কাঠবেড়ালি)

পত্রপুট

'পত্রপুট-এর মধ্যে কবির কাব্য-প্রতিভা কোন্ পরিণাম লাভ করিয়াছে সর্বাগ্রে তাহারই কিছু পরিচয় লাভ করা প্রয়োজন।

কবি-প্রতিভার বর্তমান পরিণাম বুঝিতে একাদশ সংখ্যক-কবিতাটি বিশেষ সহায়তা করে। বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত কবির প্রাণ যত গভীর করিয়া মিলিত হইয়াছে, মর্তের সৌন্দর্য ও প্রেম কবির নিকট ততই অপার মহিমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আজ কবির সত্তা বিশ্ব-সত্তা হইতে এমনই বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে যাহার ফলে বিশ্ব-প্রকৃতি কবির নিকট একান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতির সেই লজ্জা বিনম্রা নববধূর মত আবেগকম্পিত আশ্চর্য মোহিনী মূর্তি কোথায়? সেই সৌন্দর্য যাহাকে আশ্রয় করিয়া কবি ধ্যানে রূপ হইতে রূপান্তরে রসলোক হইতে রসলোকে অভিসার করিয়া ফিরিয়াছেন? অলৌকিক সৌন্দর্য-পাথারে কবির পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ দেহ-ভেলায় সৌন্দর্য-সাগর পাড়ি দিবার দিন, সেই মানসী-সোনারতরী-চিত্রা-চৈতালী-কল্পনার দিন বুঝি একেবারেই অতীত হইয়া গিয়াছে। কবির সে কি ঈর্ষা-বিজড়িত অভিযোগ!

"আজ উপেক্ষা করেছ আমার স্তুতিকে
আমার দুই চক্ষুর বিস্ময়কে ডাক দিতে ভুলে গেলে,
আজ তোমার সাজের মধ্যে কোনো আকুতি নেই,
নেই সেই নীরব ঝঙ্কার।"

এই নির্মম ঔদাসীন্য তো প্রকৃতির নয়। কবির অন্তরের রিক্ততা প্রকৃতিকে অমন রিক্ত করিয়া দিয়াছে। এই রিক্ততা বোধের দার্শনিক কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলাম যে সত্তার বিচ্ছিন্নতা বোধ। কবি আরও বলিতেছেন—

"আজ তার মধ্যে আছে
আলোছায়ার মৈত্রীবিহীন দ্বন্দ্ব।"

সৌন্দর্যবোধের অর্থই হইল সামঞ্জস্য বা সুষমা। ব্যক্তি-চেতনার সহিত বিশ্ব-চেতনার সামঞ্জস্য যত গভীর করিয়া সাধিত হইতে থাকে, সেই সঙ্গে সৌন্দর্য-বোধও ততই বাড়িয়া যায়।

আদিতে মনে হয় এই জগৎ যেন অনন্তবৈচিত্র্য-পূর্ণ সামঞ্জস্যশূন্য একটা অন্ধ আবর্তন মাত্র। তাহার পর বিশ্বের সহিত যোগ যত গভীর করিয়া অনুভূত হইতে থাকে, সামঞ্জস্যবোধটিও তত বাড়িয়া যায়। আমরা আমাদের ভালো-লাগার বিশিষ্ট কতকগুলি সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রথমে একটি রূপদানের বা সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করি। সামঞ্জস্যবোধের বৃদ্ধির সঙ্গে সৌন্দর্যের সামগ্রীও বাড়িয়া যায়। বিশ্ব-চেতনা লাভে মানবীয় চেতনা পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে। অর্থাৎ বিশ্বের অনন্ত বৈচিত্র্য কঠোর-কোমল, রূঢ়-ললিত সমস্ত কিছু যে এক পরম সত্তায় বিধৃত রহিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ গোচর হয়। আজ বিশ্ব-বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বা সুষমা নাই, সেখানে—"আলোছায়ার মৈত্রী-বিহীন দ্বন্দ্ব"—তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, যে বিশ্বের সহিত কবি-চেতনার যোগ অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

কবির মনে আজ পরিণত বয়সের ঔদাসীন্য। কোন একটি বিশিষ্ট ভাব বা ভাবনাকে সার্থকভাবে রূপ দান করিবার জন্য মনের যে শক্তি ও নিবিষ্টতা দরকার, তাহা ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে কবির জীবনে হ্রাস পাইতেছে। কবি আপনার কাব্যরচনার যে পর্যায় হইতে এই সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন, আমরা সেই পর্যায় হইতে একটি ধারা নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। অবশ্য ইহার বিনিময়ে অন্যদিক হইতে কবি কি লাভ করিতে কতটা সমর্থ হইয়াছিলেন তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। কবি আপনার এই মানসিক অবস্থা সম্পর্কে পত্র-পুটের দুই এক স্থলে মন্তব্য করিয়াছেন।

"সাঙ্গ হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন গড়নের উৎসাহ।

ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্ত প্রবাহে ভেসে-যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।" (দুই)

যাঁহারা বলেন গদ্য-কাব্য রচনার পশ্চাতে এই নিঃশেষিত কবি-প্রতিভার গোপন প্রয়াস আছে, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত নই। আমাদের ভিন্ন মতের কারণ ইতিপূর্বেই ব্যক্ত করিয়াছি। সেই ভিন্ন ফললাভের কথা কবি ইহার ঠিক পরেই বলিয়াছেন—

"সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।" (দুই)

বহু বহুল রূপ সৃষ্টির সেই দিনগুলি কবির জীবনে হয়ত অবসিত হইয়াছে। এখন কবির প্রশান্ত চিত্তে ভিন্নতর একবোধের জগৎ ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিতেছে। তাহাকে তাই ইতিপূর্বের আঙ্গিকে প্রকাশ কর, সম্ভব নয়। তাহা একদিকে অপার্থিব লোকের অনুভূতি, অন্যদিকে তাহারই আলোকে পার্থিব নিত্য নূতন বোধের জগতে অনুপ্রবেশ। গদ্য-কাব্য সেই নূতন উপলব্ধির উপযোগী একটি আঙ্গিক আবিষ্কারের চেষ্টা মাত্র।

পৃথিবী-বন্দনার মধ্যে কবি যে বৈপরীত্যের বোধ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, আমরা সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একে একে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। এই বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে বোধ করিতে পারা যাইবে যে এই বৈপরীত্য-বোধের পশ্চাতে কোন একটি সামগ্রিক রস-প্রেরণা ক্রিয়া করিয়া তাহাকে একটি অখণ্ডতা দান করিতে পারে নাই।

"বিপরীত তুমি ললিতে কঠোরে,
মিশ্রিত তোমার প্রকৃতি পুরুষে নারীতে;
মানুষের জীবন দোলায়িত কর তুমি দুঃসহ দ্বন্দ্বে।
ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,—"
(তিন)

"শুভে অশুভে স্থাপিত তোমার পাদপীঠে,
তোমার প্রচণ্ড সুন্দর মহিমা—"
(তিন)

"অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যানমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।"

(তিন)

"একদিকে অপক্ক ধান্যভার নম্র তোমায় শস্যক্ষেত্র,—

* * *

অন্যদিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্ক পাণ্ডুর মরুক্ষেত্র
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।" (তিন)

একদিকে বৈশাখের ভয়ঙ্কর কালবৈশাখীর বিধ্বংসী রূপ, অন্যদিকে ফাল্গুনের মধুর আতপ্ত আবেশ-বিহ্বলতা।

"স্নিগ্ধ তুমি, হিংস্র তুমি, পুরাতনী, তুমি নিত্য নবীনা।"

পৃথিবী-বন্দনার এই বৈপরীত্যবোধের সঙ্গে কবি একটি সুদূর ব্যাপ্ত ঐতিহাসিক-বোধ বিজড়িত করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার মধ্যেও কোন অখণ্ডতা নাই। তাহা এই বৈপরীত্য-বোধের সহিত বিজড়িত হইয়া মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মাত্র।

"অনাদি সৃষ্টির যজ্ঞ পূতাগ্নি থেকে বেরিয়ে এসেছিলে
সংখ্যা গণনার অতীত প্রত্যুষে,
তোমার চক্রতীর্থের পথে পথে ছড়িয়ে এসেছ
শত শত ভাঙা ইতিহাসের অর্থ লুপ্ত অবশেষ
বিনা বেদনায় বিছিয়ে এসেছ তোমার বর্ণিত দৃষ্টি
অগণ্য বিস্মৃতির স্তরে স্তরে। (তিন)

পৃথিবী বৈপরীত্যবোধের সহিত এই ঐতিহাসিক-বোধ ও রসসাম্যতা লাভ করে নাই, উভয়ের মধ্যে অনিবার্য কোন যোগ নাই বলিয়া।

এই বৈপরীত্য-বোধের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-সত্তার যে ধীর বিকাশ ঘটে, তাহার আত্মা যে ফলবান হয় এমন বোধের কথাও যেমন আছে,

"দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।

* * *

জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন বঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা।"
(তিন)

তেমনি একপ্রকার অতি নির্মম নিষ্করুণ মানবজীবনের নিরতিশয় কামনার পদপ্রান্তে কবি মস্তক নত করিয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যেও কোন মিল নাই।

"আমিও রেখে যাব কয়মুষ্টি ধূলি
আমার সমস্ত সুখ-দুঃখের শেষ পরিণাম ;
রেখে যাব এই নাম গ্রাসী, আকার গ্রাসী, সকল পরিচয় গ্রাসী
নিঃশব্দ মহাধূলিরাশির মধ্যে।" (তিন)

যে পূর্ণ দৃষ্টির মধ্যে এই সকল বিপরীত বোধের সার্থক সামঞ্জস্য ঘটে, এক অখণ্ডতার প্রকাশ, সেই জৈবিক সমগ্রতা কবিতাটির মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই।

জীবন ও জগতের তিনি কেবল মাধুর্য ও মহিমার দিকটিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইহা জীবনের এক অদ্বৈতবোধ। অথচ আপনার এই বোধকে সমর্থন করিবার জন্য একদিন তিনি কত-না যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন।

একদিকে সৌন্দর্য-কল্পনার অত্যুচ্চ প্রসার, অন্যদিকে বাস্তবের বিচিত্র দীনতা। উভয়কেই বিজড়িত করিয়াই জীবন এক আশ্চর্য প্রকাশ।

যে নারীকে ঘিরিয়া, তাহার সৌন্দর্য ও সুরসৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়া আমরা স্বপ্নে অসীম সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া তুলি, সেই আনন্দিত লোকে কল্পনায় অভিসার করিয়া আমরা অনির্বচনীয়তার কত-না আস্বাদ লাভ করি, বাস্তবে সে নারীর অভ্যর্থনা জীবনে প্রায়ই ঘটে না, হয়ত অবজ্ঞাই লাভ করিতে হয়। জীবনের এই স্বরূপ। 'মধুময়ের উপর' বারংবার 'ধূলার আবরণ' টানা হইয়া যায়।

একদিকে নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে কোন সীমাহীনতাকে লাভ করিবার জন্য গভীর উৎকণ্ঠা, উৎসুক প্রতীক্ষা।—জীবনের সমস্ত কিছুকে দুর্লভ, আকাঙ্ক্ষিত, মধুময় বলিয়া বোধ হয়। আর অন্যদিকে তালি দেওয়া আলখাল্লা পরা কোমরে বাঁয়া-তবলা বাঁধা এক বাউলের অদ্ভুত বিরূপ মূর্তি।

"এত এসেছে হাটের ছবি ভর্তি করতে।"

এক্ষেত্রেও যে নির্বাচন নাই তাহা নহে। কারণ আদৌ নির্বাচন ছাড়া কাব্য-সৃষ্টি অসম্ভব। তবে কবি-প্রাণের যে একটি বোধ সম্পর্কে আমরা

নিঃসংশয় হই, তাহা হইল তাঁহার কাব্য-জগৎ, সেই সঙ্গে বোধের জগৎকে প্রসারিত করিবার গভীর অধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা।

অপরিণিত যৌবনে অচরিতার্থ প্রেম কবির অন্তরে যে শূন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল, সে নিয়ত অতৃপ্তি, তাহারই ভিতর দিয়া কবির অন্তরে সঙ্গীত উৎসারিত হইয়াছে। তাহার আর বিরাম নাই। এই সুরে বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তহীন সৌন্দর্যের ছায়াপাত ঘটিয়াছে। কখন বা নিশীথরাত্রির ধ্যানমৌনতা। ইহাই কবির সাধনা ও সিদ্ধি।

"বিরহের কালো গুহা ক্ষুধিত গহ্বর থেকে
ঢেলে দিয়েছে ক্ষুভিত সুরের ঝরনা রাত্রিদিন।
সাত রঙের ছটা মেলেছে তার নাচের উড়ানিতে
সারাদিনের সূর্যালোকে,
নিশীথ রাত্রের জপমন্ত্র ছন্দ পেয়েছে
তার তিমির পুঞ্জ কলোচ্ছল ধারায়।" (বারো)

কবির স্পর্শকাতর চেতনায় বহির্বিশ্ব হইতে সংখ্যাতীত বোধ সঞ্চারিত হইয়াছে। তাহা যে কেবল নিবিড় আনন্দের তাহা নয়, তাহার সহিত বিজড়িত রহিয়াছে কত দুঃখের অনুভূতি, কত বিরূপের ঘৃণা, কত 'লজ্জার ধিক্কার', 'ভয়ের সঙ্কোচ', 'কলঙ্কের গ্লানি'। প্রকৃতির তুচ্ছতম হইতে মহত্তম পর্যন্ত গণনাতীত সত্তা কবির অন্তরে কী অপার মাধুরী না ঢালিয়া দিয়াছে। কবির সত্তায় বিজড়িত রহিয়াছে কত দুর্লভ মুহূর্তের অলৌকিক অনুভূতি, কত স্বপ্ন-সঞ্চরণ, প্রেমের কত-না মুগ্ধতা।

যুগে যুগে যে মানুষ দুঃসাধ্য সাধনায় আত্মবিসর্জন দিয়াছে, মৃত্যুর বক্ষ হইতে অমৃত ছিনাইয়া আনিবার জন্য অকাতরে মৃত্যু বরণ করিয়াছে, যাহারা বন্ধন মানে নাই, সকল সুখকে দলিত করিয়া নিশ্চিন্ত জীবন হইতে উদ্দাম বেগে ছুটিয়া বাহির হইয়াছে, কবির অন্তরে তাহাদের জন্য নিয়ত জয়শঙ্খ ধ্বনিত হইয়াছে।

এই যে অগণিত বোধের ধারা মিলিয়া মিশিয়া কবির একটি দুর্লভ, অনন্য-সাধারণ ভাব-সত্তা গড়িয়া তুলিয়াছে কবির মৃত্যুর পর তাহা মানুষের কতখানি স্বীকৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ কালে কোন্ গুণী কোন্ রসজ্ঞ তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে পারিবে?

"যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,
কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।"
(তেরো)

প্রত্যেক দেশেই নানা পূজা-পদ্ধতি আছে এবং তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া নানা ধর্ম ও দর্শন, নানা আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার ও নৈতিকবোধ। এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের পূজাপদ্ধতির মধ্যে প্রায়ই কোন মিল নেই, কোথাও তাহা সম্পূর্ণ বিপরীত। ইহা লইয়া বিবাদের অন্ত নাই। দেবতাকে এমনি ভাবে আপন আপন সীমায় বাঁধিবার প্রাণপণ চেষ্টা।

ইহার জন্য দেশের মানুষের মধ্যে অন্তরের মিল নাই, ইহার জন্ত এক দেশের মানুষের সহিত আর এক দেশের মানুষের মিল হইল না। যেটুকু মিল আছে, তাহা বাহিরের আচারের ক্ষেত্রে, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনবোধের ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া এই সকল গণ্ডীর বাহিরে এমন একটি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন যেখানে দেশের সকল মানুষ, সকল দেশের সকল মানুষ মিলিত হইতে পারে। তাহার যথার্থ স্বরূপটি কি, এক্ষেত্রে তাহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নয়। তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে তিনি এই ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন একমাত্র যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া সকলদেশের সকল কিছু ভালোকে বাহিরের দিক হইতে জোড়া লাগাইয়া একটি অদ্ভুত কল্পনার জগৎ সৃষ্টি করিয়া লয়।

বিশ্বের সকল ধর্ম ও দর্শনের পশ্চাতে যে অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার ও অনুভূতি আছে, সেই অনুভূতি এবং সাক্ষাৎকার তাঁহার জীবনেও ঘটিয়াছিল।

"হে মহান্ পুরুষ, জন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে— (পনেরো)

তিনি বিশ্বের সকল ধর্ম সাধনার এই আত্মিক সত্যতাকে স্বীকার করিয়াছিলেন। তবে যে রূপকে আশ্রয় করিয়া এই সত্যের প্রকাশ, সেই রূপের মধ্যে যে বিকাশ ঘটিতেছে, এবং এই জাতীয় সকল রূপের বাহিরে

আসিয়া একটি নির্বিশেষ স্বরূপতা লাভ করিতে চাহিতেছে এই সম্পর্কে তাঁহার মনে কোন সংশয় ছিল না। তাঁহার নিজের জীবন-সাধনা এই নূতন যুগের ধর্ম-সাধনার একটি সামগ্রিক প্রকাশ। তাহা আর যাহাই হোক, ব্রাহ্ম-ধর্ম সাধনা নয়। আপনার এই ধর্ম-সাধনার একটি সামগ্রিক পরিচয় দানের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় পনেরো সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে।

সে ধর্মসাধনার একটি দিক এবং প্রথম দিক হইল কবির অপরিসীম বিস্ময়বোধ। নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তহীন গ্রহ-নক্ষত্রের মাঝখানে, তৃণ-তরু-লতা, সহস্র প্রাণ-ধারার মাঝখানে তাঁহার এই দুর্লভ সত্তার প্রকাশ। নিখিলের সৌন্দর্য ও মাধুর্য দেখিয়া তাঁহার নয়নকমল ক্লান্তি মানে নাই। এই বিস্ময়বোধ কবির কাব্যে আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

"বিস্ময়ে আমার চিত্ত প্রসারিত হয়েছে অসীম কালে।
যখন ভেবেছি
সৃষ্টির আলোক তীর্থে
সেই জ্যোতিতে আজ আমি জাগ্রত
সে জ্যোতিতে অযুত নিযুত বৎসর পূর্বে
সুপ্ত ছিল আমার ভবিষ্যৎ।" (পনেরো)

ভুবনেশ্বরের এই প্রকাশরূপের বিরাটত্ববোধ এবং তাহার অতল মাধুর্যের প্রতি এই বিস্ময়বোধ ছিল তাঁহার নিত্য দিনের পূজা।

"আমার পূজা আপনিই সম্পূর্ণ হয়েছে প্রতিদিন
এই জাগরণের আনন্দে।" (পনেরো)

তাহার ধর্মসাধনার দ্বিতীয় ধারাকে বলা যাইতে পারে মহাপুরুষ-বন্দনা। সকল দেশে সকল কালে যে সকল মহাপুরুষ, বীর, তপস্বী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহারা আজও জীবিত কবি তাঁহাদের চেতনার সহিত আপনার চেতনাকে একাত্ম করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নিত্যদিনের অবসাদ, মালিন্য, তুচ্ছতা হইতে তাঁহাদের ধ্যান কবির চিত্তকে ঊর্ধ্বমুখ শিখার মত চিরকাল প্রোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

"যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুদ্ধে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।

তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার স্বগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।"
(পনেরো)

তাঁহার ধর্ম-সাধনা, তথা কাব্য-সাধনার তৃতীয় ধারা, যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে সৌন্দর্য ও প্রেম।

তাঁহার প্রেমের অনুভূতি নারী ও পুরুষের মধ্যে অতল বিস্ময়কে আবিষ্কার করিয়াছে, পরস্পরের সত্তা সম্পর্কে অসীমতার বোধ। সত্তার এই বিস্ময় ও অসীমতাকে ঘিরিয়া তাহার কণ্ঠে অবিরাম সঙ্গীত উৎসারিত হইয়াছে।

"দুই হাতের মধ্যে আমার হাত তুলে নিয়ে বললে,
"তুমি চেন না আমাকে, তোমাকে চিনিনে আমি,
আজ পর্যন্ত কেমন করে এটা হল সম্ভব
আমি তাই ভাবি।"
আমি বললেম, দুই না চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু,
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।" (পনেরো)

এই প্রেমের একটি বোধ কবিকে মানব-সংসারের নিত্যদিনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ সুখ-দুঃখ বোধের আবর্ত সম্পর্কে সচেতন করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যে এই বোধের একটি ধারাও পূর্বাপর লক্ষ্য করা যায়।

নিখিল বিশ্ব-প্রকৃতি ও মানব-সংসারের অতীতে একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের লোক আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং নর-নারীর স্নেহ-প্রেম-প্রীতির ভিতর দিয়া সেই লোকই আপনাকে নিয়ত প্রকাশ করিতেছে। ব্যক্তিগত সৌন্দর্য ও প্রেমবোধের ক্ষেত্রেই যে একথা সত্য তাহা নয়, জাতিগত জীবনেও একথা সত্য, নিখিল বিশ্ব সম্পর্কেও ইহা সত্য। অর্থাৎ সমগ্র দেশ তাহার সর্ববিধ সাধনাকে আশ্রয় করিয়া যে ধীর বিকাশ ঘটাইতেছে তাহার পশ্চাতে আছে এই পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাধুর্য-লোকের প্রেরণা। ইহা যে কেবল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাধুর্য তাহাই নয়, ইহা পূর্ণ শক্তিও। এই বিকাশের পথে যেখানে অন্তরায় দেখা দেয়, সেখানে সেই পূর্ণ শক্তি ভয়ঙ্কর বিপ্লব, বিপর্যয় রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া সেই সকল বন্ধনকে বারংবার ছিন্ন করিয়া দেয়।

"ইতিহাসের সৃষ্টি আসনে
তাকে দেখেছি বিধাতার বামপাশে ;
দেখেছি সুন্দর যখন অবমানিত
কদর্য-কঠোরের অশুচি স্পর্শে
তখন সেই রুদ্রাণীর তৃতীয় নেত্র থেকে
বিচ্ছুরিত হয়েছে প্রলয় অগ্নি,
ধ্বংস করেছে মহামারীর গোপন আশ্রয়।"
(পনেরো)

এই প্রসঙ্গে কোলরিজের 'Dejection, an Ode' কবিতা স্মরণে পড়িতে পারে। সেক্ষেত্রে তিনি স্বাভাবিক এই মনস্তাত্ত্বিক কারণটিকে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন যে প্রকৃতির আনন্দদানের শক্তি আমাদের মানসিক অবস্থার দ্বারা সীমিত। প্রকৃতিকে আমরা যাহা দিই তাহাই আবার আমরা ফিরিয়া লাভ করি। বহির্জগতে চিন্তার ক্ষেত্রে যদি আমরা আনন্দ সঞ্চার করিতে পারি তাহা হইলে প্রকৃতির নিকট হইতে সেই আনন্দ আবার আমাদের কাছে ফিরিয়া আসিবে।

বিশ্ব-প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে সংখ্যাতীত রূপ ভাসিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, যেন সৌন্দর্যের এক একটি ফুল, ফুটিয়া আবার ঝরিয়া পড়িতেছে। পশ্চাতে প্রাণের (মৃত্যুর ?) কৃষ্ণ-নীল মহাসমুদ্রের নিথর সীমাহীন বিস্তার, তাহারই বক্ষে রূপের পদ্ম একটির পর একটি দল বিস্তার করিয়া পরিপূর্ণ মাধুর্যের ভরে টলমল করিতেছে, সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। তাহার পর একটির পর একটি দল ঝরাইয়া দিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। রূপের প্রকাশ এত অপরূপ অথচ এত ক্ষণিক! এমনি অন্তহীন রূপের সৃষ্টি ও বিনষ্টি অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া চলিতেছে।

মহাপ্রাণের বুকে রূপ-লীলার এই অন্তহীন বিস্ময়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। ওই বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় তাঁহার অন্তরের সকল দার্শনিক জিজ্ঞাসা স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ,—

"ফোটে না ফুল
বহে না কলমুখরা নির্ঝরিণী।"

অর্থাৎ প্রাণের বুকে রূপের সে লীলা তো নাই।

আজ প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য ও প্রেম আস্বাদের দিন কবির জীবনে একান্ত গত হইয়াছে। আজ শুধু অতীতের স্মৃতিমাত্র সম্বল।

"আমি বাস করি
তোমার ভাঙ্গা ঐশ্বর্যের ছড়ানো টুকরোর মধ্যে।
আমি খুঁজে বেড়াই মাটির তলার অন্ধকার,
কুড়িয়ে রাখি যা ঠেকে হাতে।"

বিশ্বের সকল রূপ আপাতদৃষ্টিতে শৃঙ্খলাহীন, যোগসূত্রবিরহিত, সামঞ্জস্য-শূন্য বলিয়া বোধ হয়। এই দেখা ইন্দ্রিয়ের দেখা। এমনি ক্রমিক উন্নততর চেতনায় দেখা আছে; প্রাণে দেখা, মনে দেখা, ধ্যানে দেখা, অতীন্দ্রিয় বোধে দেখা। চেতনা যতই উন্নততর পরিণাম লাভ করে মানুষ ততই রূপকে অনুবিদ্ধ করিয়া ক্রমাগত গভীরে দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হয়, ততই আপাত বিরোধের, বৈপরীত্যের মধ্যে সে সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পায়। কবি বা স্রষ্টার অন্তরে এক একটি দিব্য আবিষ্ট মুহূর্তে কতকগুলি আপাত বিরোধ ও বৈপরীত্য মিলাইয়া এক একটি অখণ্ড রূপ ভাসিয়া উঠে। এই দেখার সম্পূর্ণতা সেইখানেই যেখানে এই বিশ্বের সমস্ত বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য এক অখণ্ড বোধে পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত হইয়া যায়।

আজ বিশ্বের সকল রূপ এমনি খণ্ড খণ্ড হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যেন কোন রূপসীর মণি-মুক্তাখচিত কঙ্কন আকস্মিক আঘাতে ভাঙ্গিয়া রেণু রেণু হইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কুড়াইয়া এক করিয়া লইতে পারা যায় না।

জাগতিক বোধে জগৎ ও জীবনের সামঞ্জস্যবোধ যত উর্ধ্বে উঠিতে পারে রবীন্দ্র-কাব্যে সেই সর্বাধিক সামঞ্জস্যবোধের পরিচয় আমরা পাইয়াছি; কিন্তু ওই বোধ ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ না করিয়া এমন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল কেন, তাহার একটি কারণও আমরা ইতিপূর্বে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছি।

দ্বিতীয় সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে একস্থলে কবি আপনার জীবনের এই পরিণতিকে একটু পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। (ইতিপূর্বে ইহার নানা রূপ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।) তাহা এই যে জীবন ও জগতের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় আজ কবির পক্ষে তাঁহাকে দূর হইতে দেখা সম্ভব হইয়াছে।

"সাঙ্গ হল দুই তীর নিয়ে
ভাঙন-গড়নের উৎসাহ।

ছোটো ছোটো আবর্ত চলেছে ঘুরে ঘুরে
আনমনা চিত্ত প্রবাহে ভেসে যাওয়া
অসংলগ্ন ভাবনা।
সমস্ত আকাশের তারার ছায়াগুলিকে
আঁচলে ভরে নেবার অবকাশ তার বক্ষতলে
রাত্রের অন্ধকারে।”

ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের বিক্ষোভ যখন শান্ত হইয়া আসে তখন সেই ধ্যান-তন্ময় অন্তরে জীবন ও জগতের সার্থক রূপটি ফুটিয়া উঠে।

পরিণত বয়সে এই চাঞ্চল্য দূর হইতে কবির পক্ষে তাই এই জগৎ ও জীবনকে তাহার স্বরূপে তাহার সম্পূর্ণতায় প্রত্যক্ষ করা সম্ভব হইয়াছে। প্রাণচাঞ্চল্যে, বিক্ষুব্ধ মানসে রূপ তাহার স্বাভাবিকতা হারায়। সূর্যের সার্থক প্রতিবিম্ব পড়ে নিস্তরঙ্গ জল-বিস্তারে।

তৃতীয় সংখ্যক কবিতাটির মধ্যে আজ পৃথিবীর সমগ্র বৈচিত্র্য একটি অখণ্ড স্বরূপে কবির দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় নাই। বৈচিত্র্যগুলি অসংলগ্ন ভাবে কবির দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছে। ইহারই উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছিলাম। পৃথিবী ললিতে-কঠোরে মধুরে-ভীষণে এক অপূর্ব প্রকাশ। একথা সত্য, কিন্তু আজ পৃথিবী-বন্দনায় তাহার সকল বৈচিত্র্য-বিজড়িত একক এই অপূর্ব প্রকাশটি ধরা পড়ে নাই।

অনন্ত বৈপরীত্য, বৈচিত্র্য লইয়া পৃথিবী আজ কবির নিকট এক অপরিজ্ঞাত লোক। সমগ্র বন্দনার মধ্যে তাই একপ্রকার অপরিচয়ের ভীতি, বিস্ময়-বিহ্বলতা লক্ষ্য করা যায়।

অন্তরে যে সামঞ্জস্য-বোধ থাকিলে বিশ্বের সামঞ্জস্য-তত্ত্বটির সাক্ষাৎলাভ ঘটে, সেই সামঞ্জস্য-বোধ আজ নাই বলিয়া বিশ্বের সুষমা-লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আজ তাই তাহার বিচিত্র ধাতু একান্ত হইয়া দৃষ্টি বিদ্ধ করে।

মর্ত-বন্দনা কবির জীবনে এই প্রথম নয়, বরং অনেক পুরাতন। সেই সকল ক্ষেত্রে ধরিত্রী কবির দৃষ্টিতে পূর্ণ সুষমা লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই পূর্ণ সুষমা ধরা পড়ে তখনই যখন কবি-চিত্ত বিশ্ব-চিত্তের সহিত যোগস্থাপন করিতে সমর্থ হয়।

কবির ধরিত্রী-বন্দনার সহিত মিলাইয়া পাঠ করিবার জন্য আমি ঋগ্বেদে দ্যাবা-পৃথিবীর যে সূক্তগুলি আছে, তাহাদের অন্তর্গত বিশিষ্ট কয়েকটি অংশ একত্রে

সংগৃহীত করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। তাহাতে লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে বিশ্বের প্রত্যেকটি সামগ্রী সূর্য, চন্দ্র, দিবস, রাত্রি, উষা, নক্ষত্রমণ্ডলী, তীরবিধৌত নদী সমস্ত কিছু কী জানি এক অজ্ঞাত জগতের আলোকস্পর্শে অপার রহস্য-বিজড়িত হইয়া এক প্রতীক স্বরূপতা লাভ করিয়াছে। এক পরমাশ্চর্য-বোধে সমস্ত কিছু ভাস্বর, সমস্ত কিছুই এক জ্যোতিসমুদ্রে ভাসমান।

"সুন্দর গতিবিশিষ্ট চন্দ্র আকাশের মধ্যস্থল দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে: (আমার দুই চক্ষু) সুবর্ণময় উজ্জ্বল কিরণবিশিষ্ট তোমার আবাসস্থল দেখিতে পাইতেছে না। স্বর্গ ও মর্ত্য (আমার) এই বিক্ষোভ সম্পর্কে সচেতন হও। বিশ্বের রক্ষাকর্তা অক্লান্ত সূর্যকে আমি দেখিয়াছি, ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে নানা পথে তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন: পুঞ্জিত এবং বিকীর্ণকারী দীপ্তিবিশিষ্ট তিনি লোকসমূহের মধ্যস্থলে আবর্তিত হইতেছেন। এই দুইটির (স্বর্গ ও মর্ত্য) মধ্যে কে পূর্ববর্তী এবং কে পরবর্তী; তাহাদের উৎপত্তি হইয়াছে কিভাবে, হে ঋষিগণ! কে ইহা জানেন? নিশ্চয়ই আপনি আপনার বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন এবং রাত্রি ও দিন আবর্তিত হয়, যেন তাহারা চক্রবিশিষ্ট। অপদ এবং নিশ্চল, আপনারা অসংখ্য সচল এবং পাদবিশিষ্ট জাতিদের ধারণ করিয়া আছেন, যেমন করিয়া পুত্র পিতা-মাতার ক্রোড়ে (লালিত হয়)। স্বর্গ ও মর্ত্য আপনারা আমাদের মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করুন। দুই যমজ (দিবা ও রাত্রি) নানা রূপ পরিগ্রহ করে; তাহাদের মধ্যে একটি উজ্জ্বলরূপে দীপ্তি পায়, অন্যটি কৃষ্ণবর্ণ; তাহারা যমজ ভগিনী, একটি কৃষ্ণবর্ণ, অন্যটি শ্বেত। সূর্য আপনার জ্যোতি বিকীর্ণ করে, যেন ইহা একটি বস্ত্র: আলোর কিরণ সৃষ্টিকারী, উহা তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারিয়া বিস্তৃত (অন্তরীক্ষ) হইতে আগমন করেন: নদীর ধাবমান জল তীর ভগ্ন করিয়া প্রবাহিত হয়: উত্তমরূপে নির্মিত স্তম্ভের ন্যায় স্বর্গ স্থির। মনুষ্যগণকে কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া বন্দনীয়া উষা স্বর্গলোক হইতে আগমন করুন, শক্তিময়ী মাতা, আপনার কন্যার (ধরিত্রী) জাগরণকারিণী, পবিত্রস্বরূপিনী, চিরতরুণী, মহিমান্বিতা। (আলোর) কিরণ বৃত্তাকারে বিস্তৃত হইয়া তাহাদের (দিন আনয়নের) কর্তব্য সাধন করে, অমৃতের (সূর্যের) জ্যোতির সংস্পর্শে বাস করে; অসীম, ও বিকীর্ণকারী, স্বর্গ ও মর্ত্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। বৃষ্টিধারা-বর্ষণকারী, শিশিরবিন্দু বিকীর্ণকারী, দীপ্ত এবং দ্রুতগতি বিশিষ্ট (রথ) পৈতৃক পূর্ব দিগঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিয়াছে: বহুবর্ণবিশিষ্ট পরিব্যাপ্ত (জ্যোতি), অন্তরীক্ষের উভয় পার্শ্বে অগ্রসর হয় এবং এইভাবে পৃথিবীকে

রক্ষা করে। মনুষ্যগণ (দেখ), এই বর্ণনাতীত আকার, যাহা হইতে নদী সকল উদ্ভূত হয় এবং জল যে স্থানে বাস করে; (যাহা অন্তরীক্ষ গড়িয়া তুলে), দুইটি (দিবা ও রাত্রি) সমভাবে সংযুক্ত এবং অন্যান্য ঋত সকল (ইহা হইতে জন্মলাভ করে, এই স্থান এবং অন্যত্র সঞ্জীবিত করে। জ্যোতির্ময় সূর্যের নানা আকৃতি-বিশিষ্টা দুই কন্যা, ইহাদের একটি নক্ষত্রদলের সহিত দীপ্তি পায়, এবং অন্যটি সূর্যের সহিত সমুজ্জ্বল, পরস্পরবিরুদ্ধ, বিপরীত দিকে গমন করে, সমস্ত কিছুকে পরিশুদ্ধ করে।

মর্ত্য পরিপূর্ণ সুষমা লইয়া প্রকাশ পাইলেও 'সোনার তরী', 'চিত্রা' প্রভৃতি কাব্যেও কবির সামঞ্জস্য-বোধ সম্পূর্ণ নয়। তাহা বিশ্ব-মূর্তি নয় এই কারণে যে সে সাক্ষাৎকারে মর্ত্যের ভীষণ, কঠোর, ভয়ঙ্কর, অতি নির্মম দিকটির কোন পরিচয় নাই। সেই অপরূপ রূপ সাক্ষাৎকার, যাহা সকল সুন্দর-অসুন্দরের মিলিত অলৌকিক প্রকাশ। বিশ্বের কেবল সৌন্দর্য-ভাগটিকেই কবি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে একপ্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। ইহার পরিচয় লাভ করিতে পত্রপুটের দ্বাদশ সংখ্যক কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"দেখেছি শুধু আপনার নিভৃত রূপ
ছায়ায় পরিকীর্ণ,
যেন পাহাড়তলিতে একখানা অনুত্তরঙ্গ সরোবর।"

বিশ্ব-সত্তা লাভের পূর্ণ উপলব্ধির আস্বাদ-বঞ্চিত হইয়া কবি পরিণত বয়সে গভীর বেদনা বোধ করিতেন, এক মর্ম-নিপীড়নকারী হাহাকার, তীব্র জ্বালাময়ী ক্ষোভ।

"মৃত্যুর গ্রন্থি থেকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে
যে উদ্ধার করে জীবনকে
সেই রুদ্র মানবের আত্মপরিচয়ে বঞ্চিত
ক্ষীণ পাণ্ডুর আমি
অপরিস্ফুটতার অসম্মান নিয়ে চলে যাচ্ছি চলে।"

এই অসম্পূর্ণতা-বোধ কবির জীবনে ইতিপূর্বেই দেখা দিয়াছে। 'বলাকা'র মধ্যে এই অসম্পূর্ণতাবোধের প্রথম নিঃসংশয় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তাহার পর হইতে এই বোধ ক্রমাগত গভীর হইয়াছে।

ভারতীয় মোক্ষ-সাধনা জন্ম-মৃত্যুর বারংবার আবর্তনের ঊর্ধ্বে যে পরিণাম

লক্ষ্য করিয়াছে, সেই নির্বাণ মুক্তি রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য নয়। পূর্ণবিকশিত ব্যক্তি-সত্তা যখন দিব্য-সত্তার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ লাভ করে, রবীন্দ্রনাথের নিকট তাহাই মুক্তি, মুক্ত-স্বরূপে লীলা। ব্যক্তি-সত্তার ধীর বিকাশ ঘটে, আবার বিশ্বের যোগে। বিশ্ব-সত্তা লাভে ব্যক্তি-সত্তার পূর্ণ প্রকাশ।

এইরূপে রবীন্দ্রনাথের মুক্তিসাধনায় ব্যক্তি, বিশ্ব ও দিব্য-সত্তা একটি একতান সূত্রে বিধৃত হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের সাধনার এই স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্যক্তি যতদিন না বিশ্ব-সত্তার সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করে, অর্থাৎ ব্যক্তির প্রকাশ যতদিন না সম্পূর্ণ হয় ততদিন দিব্য-সত্তা লাভের যে মূল অভিপ্রায় অর্থাৎ ব্যক্তি-সত্তার, এইরূপে জগতের পূর্ণ রূপান্তরসাধনের যে লক্ষ্য তাহা সাধিত হইতে পারে না।

কবি বিশ্ব-সত্তায় পূর্ণ পরিণাম লাভ করিতে কেন অসমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি স্বয়ং পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যে নানাভাবে দান করিয়াছেন। আমি পূর্বাপর ইহার একটি ধারা নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। কারণ কবির অধ্যাত্ম জীবনবিকাশের ক্ষেত্রে ইহা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অধ্যায়।

বিশ্ব-সত্তার যে স্বরূপের পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি, বিশ্বের সৌন্দর্যভাগের মিলিত প্রকাশ। তাহা যথার্থ বিশ্ব-সত্তা নহে। বিশ্ব-সত্তায় রূপ-বিরূপের, পাপ-পুণ্যের, আলো-অন্ধকারের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটে। তাহাতে পরিণামে এই দ্বৈতবোধটাই লুপ্ত হইয়া যায়। সাধনার যে বৈশিষ্ট্যের জন্য বিশ্বের একমাত্র সৌন্দর্য ভাগটিই একান্ত হইয়া কবির জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভের পথে মহৎ অন্তরায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কোন-না-কোন স্বরূপে এই অসামর্থ্যের বীজ নিহিত আছে।

পত্রপুটের মধ্যে কতকগুলি তত্ত্বকে কবি যেভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন, এখন তাহাদের কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

সুরের স্পন্দন আশ্রয় করিয়া ব্যক্তির প্রাণ-স্পন্দন কেমন করিয়া বিশ্ব-প্রাণ-স্পন্দনে একাকার হইয়া যায় এবং এই পরিণামের মধ্যেই যে সঙ্গীতের সার্থকতা সে পরিচয় নানাভাবে নানা প্রসঙ্গে কবি দান করিয়াছেন। এ ক্ষেত্রে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে সঙ্গীতের এই সামর্থ্যের দিকটির সুন্দর একটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"শুনতে শুনতে সরে গেল সংসারের ব্যবহারিক আচ্ছাদনটা,
যেন কুঁড়ি থেকে পূর্ণ হয়ে ফুটে বেরোল
সরোবরের অপরূপ প্রকাশ।"

যে কবিতাটি হইতে অংশটি উদ্ধৃত করিলাম, সেক্ষেত্রে সুরের এই স্পন্দনে রূপ-ধ্যানটিও বিজড়িত হইয়া গিয়াছে। ধ্যান-লোকে সৌন্দর্যের তাহা এক বিশিষ্ট মানস-সম্ভোগ। এই সম্ভোগে 'আমি' ও 'তুমি'র পৃথক বোধটি থাকিয়া যায়।

"অকূল সরোবরে সুরের ঢেউ উঠেছে মৃদু মৃদু
আমার বুকের কাঁপনের কাঁপন-লাগা হাওয়া
ওকে স্পর্শ করছে ধীরে ধীরে।"

একটি ধ্যান যেন সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হইতে চায়। কোন্ অনাদি কাল হইতে সৃজন-প্রলয়ের ভিতর দিয়া, নিত্য রূপান্তরের ভিতর দিয়া এই সৃষ্টি গিয়াছে কোন্ অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে একটি সম্পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য। কোন একটি চেতনায় নিশ্চয়ই অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিধৃত হইয়া আছে এবং সেই চেতনায় নিশ্চয়ই সম্পূর্ণতার একটি ধ্যান রহিয়াছে। যে চেতনায় অনন্ত দেশ-কাল বিধৃত, সেই চেতনাই বা কি, তাঁহার যে ধ্যান বাহিরে সৃষ্টির মধ্যে রূপায়িত হইতে চায় সেই ধ্যানই বা কি?

"এই দেহহীন সঙ্কল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
সে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
সে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।"

একটি ধ্যান ঈশ্বরের অন্তরে সম্পূর্ণ হইয়া আছে। নিখিল বিসৃষ্টির ভিতর দিয়া সেই ধ্যান ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে পর্যায়ের পর পর্যায়ে।

সেই পূর্ণতার উপলব্ধি না থাকিলেও এ সম্পর্কে কবি নিঃসংশয় যে নিখিল বিশ্বের এই নিয়ত পরিবর্তনের পশ্চাতে একটি শাশ্বত নিয়ম আছে। এই পরিবর্তন কেবল পরিবর্তন মাত্র নহে, ইহার মধ্যে অভিব্যক্তির একটি ধারা আছে। এই অভিব্যক্তি আবার অন্তহীন নহে, তাহার একটি পরিণাম বা পরিণতি আছে, এই সমস্ত কিছুর পশ্চাতে রহিয়াছে এক চিরস্থির চেতনার লীলা।

মর্ত্য-লোকে আমাদের সকল প্রয়াস, সকল অনুভূতি যেন এক স্বপ্ন সঞ্চরণ মাত্র। মানুষ যখন মনেরও ঊর্ধ্বে সকল সীমার বোধ ছাড়াইয়া উঠে তখন এই স্বপ্ন মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া যায়।

সীমা-বোধের মধ্যে আমরা যতদিন থাকি ততদিন ভয়ের অন্ত থাকে না। সীমার বোধ ছাড়াইয়া যখন অসীমের বোধে পরম স্থিতি লাভ করিতে পারি তখন এই সমস্ত ভয় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সীমার বোধ যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভয় থাকে, কারণ মৃতুতে এই সীমা একান্তরূপে বিনষ্ট হইয়া যায়। অসীমের দিক হইতে সীমাকে দেখিলে ভয় থাকে না, কারণ বিনষ্টির ভয় লুপ্ত হইয়া যায়।

"দ্বারে দাঁড়িয়ে তোমার আলো তুলে ধরো,
ছায়া যাক মিলিয়ে,
থেমে যাক ওর বুকের কাঁপন।"

সৌন্দর্য-সাক্ষাৎকার এবং তাহার অনুধ্যান কবির চেতনাকে ক্রমে কেমন বিশ্ব-চেতনার সহিত একাত্ম করিয়া দেয় তাহার পরিচয় আমরা সর্বত্র পাইয়াছি। বর্তমান কাব্যেও তাহার কিছু পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ করে।"

কবির জীবনে এই উন্নততর চেতনালাভের মুহূর্ত বারংবার আসিয়াছে। পরমের স্পর্শ লাভ যদি কিছু ঘটিয়া থাকে তবে ওই সকল আবিষ্ট মুহূর্তে বলিয়া কবি তাহাদের আশ্রয় করিয়া এমনি নানা রূপ-কল্পনা করিয়াছেন। এই মুহূর্তগুলি যেন তাঁহার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ, কাল আপনার সূত্রে তাহাদের একে একে গ্রথিত করিয়া মাল্যরূপে পরম দেবতার কণ্ঠে দুলাইয়া দিবে। কবির জীবনে কেবল ওই মুহূর্তগুলি অমর। ওই সকল মুহূর্তে কবি মৃত্যুর যবনিকা ছিন্ন করিয়া অমৃতের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন।

ব্যক্তির লীলায় রহিয়াছে একটি অশাশ্বত সত্তা, তাহা জন্ম হইতে জন্মান্তরে নিত্য নূতন রূপ লাভ করিতেছে। আর একটি শাশ্বত সত্তা, সকল জন্ম সকল রূপ লাভের ভিতর দিয়া যাহার চকিত স্পর্শ লাভ ঘটে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাস, যে এই ক্ষণিক রূপেরও একটি অবিচ্ছিন্ন চিরন্তন ধারা আছে, আবার এই ক্ষণিক রূপ আশ্রয় করিয়া দিব্য-উপলব্ধির একটি ধারা আছে, শাশ্বত-চেতনার চিরস্থির প্রকাশ তো আছেই। রবীন্দ্রনাথের নিকট এই ত্রিধারাই

সত্য, ক্ষণ, পরম ক্ষণ, শাশ্বত চেতনা। একটি জীব-সত্তা, দ্বিতীয়টি অধ্যাত্ম-সত্তা, তৃতীয়টি দিব্য-সত্তা।

"এই রস নিমগ্ন মুহূর্তগুলি
আমার হৃদয়ের রক্তপদ্মের বীজ;
এই দিয়ে বিধাতার দরবারে গাঁথা চলেছে একটি মালা
আমার চিরজীবনের খুশির মালা।"

একদিকে অন্তহীন রূপের লীলা, অন্যদিকে 'আমি'র প্রকাশ। যে অনন্ত প্রাণের যোগে এই রূপ সত্য, সেই একই প্রাণের যোগে আমিও সত্য। অসীম প্রাণের একদিকে অসংখ্য রূপের মধ্যে 'আছে'-রূপে প্রকাশ, সেই একই প্রাণের যোগে 'আমি'র 'আছি'-রূপে অস্তিত্ববোধ।

ব্যক্তিকে বিশ্ব-প্রাণের যোগে অনন্ত রূপের সহিত মিলাইয়া তাহারই একটি বিশিষ্ট প্রকাশ রূপে যখন দেখি তখন বিস্ময়বোধের আর সীমা পাওয়া যায় না। এই বিস্ময়বোধের প্রেরণা রবীন্দ্র-কাব্যের বিশিষ্ট একটি প্রেরণা।

"অপূর্ব সুর যেদিন বেজেছিল
ঠিক সেদিন আমি ছিলেম জগতে
বলতে পেরেছিলাম
আশ্চর্য।"

উন্নততর চেতনা লাভের গোপন প্রেরণা সকল কালের নর-নারীর মধ্যে আছে। ব্যষ্টির ব্যাকুলতার মধ্যে তাই সমষ্টির ব্যাকুলতার একটি আধ্যাত্মিক স্বাধর্ম্য লক্ষ্য করা যায়।

এই বোধ আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তায় একাত্মতা লাভ করিয়া আপনাকে অসীম দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত দেখে। এই বোধ তাই অতীত বর্তমান-ভবিষ্যৎ সকল কালের নর-নারীর সাধারণ বোধ। এই বোধে আর পৃথক বোধ থাকে না।

"সেদিনকার বসন্তের বাঁশিতে
লেগেছিল যে প্রিয় বন্দনার তান,
আজ সঙ্গে এনেছি তাই,
সে নিয়ো তোমার অর্ধ-নিমীলিত চোখের পাতায়,
তোমার দীর্ঘ নিশ্বাসে।"

যে ব্যাকুলতা কবি সেদিন বোধ করিয়াছিলেন, সেই ব্যাকুলতাকে তিনি একালের নর-নারীর অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চান। সে ব্যাকুলতা যে সকল কালেই সত্য। যেমন করিয়া হোক, যে বোধ আশ্রয় করিয়া তাহা ঘটুক না কেন, এই আকাজ্ক্ষা, অন্তরে এই ব্যাকুলতা-বোধ জাগিবেই। এই ব্যাকুলতাকে মর্ত্যের কোন সম্পদের দ্বারা লুপ্ত করিয়া দিতে পারা যায় না।

মানুষের একটি বোধ সীমার আর একটি চিরন্তন ভাবের বোধ। মৃত্যুতে এই সীমার বোধ লুপ্ত হয়, কিন্তু এই ভাব-লোকটি থাকিয়া যায়। সীমার বোধে বিশ্বের নরনারী আপনাদের পৃথক পৃথক বোধ করে, কিন্তু ভাব-লোকের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য-বোধটি লুপ্ত হইয়া যায়, কালের ব্যবধানও থাকে না।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য কেবল তো ব্যক্তি-সত্তার পরিচয় বহন করে না। তাহা ধীরে ধীরে চেতনাকে ব্যক্তির সীমা ছাড়াইয়া সকল কালের নর-নারীর নির্বিশেষ ভাব-লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

"সেদিনকার ব্যথা
অকারণে বাজবে তোমার বুকে,
মনে বুঝবে, সেদিন তুমি ছিলে না তবু ছিলে,
নিখিল যৌবনের রঙ্গভূমির নেপথ্যে
যবনিকার ওপারে।"

এবং

"যখন তুমি থাকবে না তখনো তুমি থাকবে আমার গানে।"

বিশ্ব-মন বলিতে বিশ্বের সকল মানব-মনের মিলিত প্রকাশ বুঝায় না। বিশ্ব-মন বিশ্বের সম্মিলিত মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া পূর্ণ করিয়া অনন্ত প্রসারিত। সম্মিলিত মানব-মন বিশ্ব-মনকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিয়া চলিয়াছে। ব্যক্তি-মনে যাহার প্রকাশ নাই, তাহার প্রকাশ আছে সম্মিলিত মানব-মনে, সম্মিলিত মানব-মনে যাহার প্রকাশ নাই, তাহার প্রকাশ আছে বিশ্ব-মানব মনে।

বিশ্বের এমনি একটি চিরন্তন ভাব-লোক আছে। বিশ্বের সম্মিলিত ভাবনা-লোক (সকল অতীত সমেত) এই চিরন্তন ভাব-লোকটিকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিতেছে। ব্যক্তির ভাবনার সহিত বিশ্বের সম্মিলিত ভাবনার যেমন যোগ আছে, ইহার সহিত আবার বিশ্ব-ভাবনা-লোকের নিগূঢ় যোগ আছে। বিশ্ব-ভাবনা তাহার সহিত যুক্ত করিয়া বিশ্ব-মানবের সম্মিলিত ভাবনার

যোগ আছে বলিয়া ব্যক্তির ভাবনা ব্যষ্টিতে ব্যষ্টিতে পৃথক হইয়াও অন্তহীন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে হারাইয়া পরস্পরের উপলব্ধির ক্ষেত্রে দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করে না।

ব্যক্তির নিজস্ব ভাবনার ক্ষেত্রে যাঁহারা বাঁচেন তাঁহাদের জীবনের পরিধি অত্যন্ত ক্ষুদ্র. মৃত্যুতে তাহা একান্তরূপে হারাইয়া যায়। যাঁহারা বিশ্বের সম্মিলিত ভাবনার ক্ষেত্রে বাঁচেন, অর্থাৎ যাহাদের মধ্যে বিশ্বের সকল অতীত বর্তমানের ভাবনার মিলিত প্রকাশ ঘটে, তাঁহাদের জীবনের পরিধি যে বহুদূরবিস্তৃত, তাহাতে সংশয় নাই। বিশ্বের সকল নর-নারীর অন্তরে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা। বিশ্বের সকল নর-নারী আপন আপন ভাবনার প্রতিরূপ তাঁহাদের মধ্যে দেখিতে পান। ইঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ আছেন, যাঁহাদের চেতনা অতীত-বর্তমানের ভাবনা-লোককেও অতিক্রম করিয়া যায়। তাঁহারা সেই বোধের মধ্যে জন্ম লাভ করেন, যেখানে সকল অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের ভাবনার পূর্ণ প্রকাশটি রহিয়াছে। সেই প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহারই মধ্যে থাকিয়া সমগ্র মানবীয় চেতনা আবর্তিত হইয়া চলিয়াছে।

পত্রপুটের মধ্যে দুটি কবিতা আছে, যাহাদের মধ্যে কবি স্বয়ং আপনার কাব্য-প্রবাহের তিনটি ধারা নির্দেশ করিয়াছেন। আপনার কাব্য-সাধনা সম্পর্কে কবির নিজস্ব অভিমত এই প্রসঙ্গে বুঝিয়া লইতে পারা যাইবে।

কবির কাব্যের প্রথম ধারা,—

> "যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
> আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।"

কিংবা

> "মর্ত্যলোকে যার আবির্ভাব
> মৃত্যুর আলোকে আপন অমৃতকে উদ্ধার করবার জন্যে
> দুর্দাম উদ্যমে।"

রবীন্দ্র-কাব্যের দ্বিতীয় ধারা,

> "এরা নারীর হৃদয় থেকে এনে দিয়েছে আমার হৃদয়ে
> প্রাণ-লীলার প্রথম ইন্দ্রজাল আদি যুগের।"

অন্যত্র

"আমি বললেম, তুই না চেনার মাঝখানে
চিরকাল ধরে আমরা দুজনে বাঁধব সেতু
এই কৌতূহল সমস্ত বিশ্বের অন্তরে।"

তৃতীয় ধারা,—

"এরা ধরেছে সূক্ষ্মকে, বস্তুর অতীতকে,
এরা তাল দিয়েছে সেই গানের ছন্দে
যার সুর যায় না শোনা।"

অথবা

"সে এসেছে অপরিসীম ধ্যান-রূপে
আমার সর্ব দেহ-মনে
পূর্ণতর করেছে আমাকে আমার বাণীকে
জ্বেলে রেখেছে আমার চেতনার নিভৃত গভীরে
চিরবিরহের গভীর শিখা।"

রবীন্দ্র-কাব্যে রহিয়াছে মহামানব বন্দনা, সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান এবং উন্নততর চেতনা-লোক লাভের আকাঙ্ক্ষা। অবশ্য এই তিনটি ধারা একটি কোন গভীরতর অধ্যাত্ম প্রেরণাপুষ্ট। সেই উৎস-প্রবাহটিকে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যানের পশ্চাতে যে প্রেরণা, তাহা যে উন্নততর জগতের আভাস লাভের আকাঙ্ক্ষাজাত তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে নানাভাবে লাভ করিয়াছি। কবি মুখ্যতঃ এই দুই পথ আশ্রয় করিয়া উন্নততর জগতের আভাস লাভ করিয়াছেন, সুতরাং শেষ দুই ধারার মধ্যে একটি যোগসূত্র এই রূপে খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট হয় না।

ইহাও আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, মানুষ যখন উন্নততর চেতনা লাভ করে তখন সে আপনারই অসীম ব্যাপ্তিবোধে মৃত্যুভীতি জয় করিয়া উঠে। মহামানবের অমরতার উপলব্ধি সৌন্দর্য ও প্রেমবোধ আশ্রয় করিয়াও জীবনে ঘটিতে পারে।

যেমন করিয়াই হোক মানুষকে একটি শাশ্বত-সত্তার উপলব্ধি করিতেই হইবে। তাহা সৌন্দর্য ও প্রেম বোধ আশ্রয় করিয়া হোক, অথবা অন্য নানা রূপ আত্মত্যাগের প্রবল প্রেরণায়। রবীন্দ্রনাথ মুখতঃ এই তিনটি ধারা আশ্রয় করিয়া

এক পরিণাম লাভ করিয়াছেন। এই পরিণামলাভে মানুষের মৃত্যুভয় ঘুচিয়া যায়, সে হয় অমৃতের অধিকারী। এইখানেই মানুষের সর্বশেষ সার্থকতা।

শ্যামলী

কবি প্রতিভা-প্রদীপ্ত যৌবনে রূপ অথবা ভাবকে যেমন একটি পরিপূর্ণ আকার দান করিতে পারিতেন, তেমনি ওই ধ্যানের পথ ধরিয়া তিনি মাঝে মাঝে বিশ্ব-সত্তার সহিত একাত্ম হইয়া যাইতেন।

আজ একান্ত পরিণত বয়সে রূপ অথবা ভাব কোনটিই কবির চেতনায় সুস্পষ্ট আকার লাভ করিতে পারিতেছে না, সেই সঙ্গে কবি বিশ্ব-সত্তায় ওই বিশিষ্ট পরিণাম লাভ হইতেও বঞ্চিত। একটি সত্য এই সঙ্গে অনুভূত হয়, যে যেখানে ভাব বা রূপ একটি পরিপূর্ণ সুষমা লাভ করিতে পারে নাই, যেখানে মানস-লোকে ধ্যান একান্ত দুর্বল এবং সেইজন্যই চেতনার ওই উত্তরণও সম্ভব হয় না। চেতনার উন্নততর পরিণামে রূপটিকে আদিতে সত্য হইতে হয়।

শ্যামলী আলোচনার প্রারম্ভে তাহারই একটি পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে।

> "এ কান্না নয়, হাসি নয়, চিন্তা নয়, তত্ত্ব নয়,
> যত কিছু ঝাপসা হয়ে যাওয়া রূপ
> ফিকে হয়ে যাওয়া গন্ধ,
> কথা-হারিয়ে যাওয়া গান,
> তাপ-হারা স্মৃতি-বিস্মৃতির ধূপছায়া
> সব নিয়ে একটি মুখ ফিরিয়ে চলা স্বপ্নছবি
> যেন ঘোমটা-পরা অভিমানিনী।" (বিদায় বরণ)

কবি রূপের ওই পরিণামটিকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন, অর্থাৎ রূপ আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-সত্তা লাভ।

> "তোমার ছবি আঁকা অক্ষরের লিপিখানি
> সবখানেই"—(বিদায় বরণ)

কিন্তু ইহা আজ আকাঙ্ক্ষা মাত্রেই রহিয়া গিয়াছে। প্রাণের প্রবল প্রেরণা যেমন অন্তরে সুসম্পূর্ণ রূপ গড়িয়া তুলে তেমনি প্রাণের প্রেরণাই চেতনাকে মর্ত্যসীমার ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়।

আজ কবির প্রাণের অনুভূতি যে একান্ত আচ্ছন্ন, তাহা তাঁহার ওই আকারহীন, রূপহীন, ভাবশূন্য, নিরুদ্ধ, মূক, একপ্রকার বেদনাবোধ হইতে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়। প্রাণের যে শক্তি মানস-লোকে একটি সুস্পষ্ট রূপ ফুটাইয়া তুলে, সেই শক্তিই পরিণামে মানুষকে সকল রূপের উর্ধ্বের বোধে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়।

'আমি' বা 'বিশ্ব-আমি' দেশকালের সেই তত্ত্ব যাহাকে আশ্রয় করিয়া অসীম এই অন্তহীন বিচিত্র দেশ-কাল বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাই বিশ্ব-মনের তত্ত্ব। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমি বা মন সেই এক বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মনের অন্তর্গত। বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মন সকল'আমি'র মিলিত প্রকাশ নয়, সকল অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের আমি বা মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের অতিক্রম করিয়া অবস্থিত। ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত মন তাহাকে ক্রমাগত গভীর করিয়া লাভ করিয়া চলিয়াছে।

"মানুষের অহঙ্কার পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্ব শিল্প।" (আমি)

অসীম যে তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া এই অন্তহীন রূপ-লোক সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাই আমি-র তত্ত্ব

'আমি'র তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার আনন্দ ও ঐশ্বর্য অফুরান হইয়া উঠিয়াছে, তাঁহার প্রেম আর কোথাও বাধা মানিতেছে না।

"অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে 'আমি'।
সেই আমির গহনে আলো-আঁধারে ঘটল সঙ্গম,
'দেখা দিল রূপ, জেগে উঠল রস।
'না' কখন ফুটে উঠে হল 'হাঁ' মায়ার মন্ত্রে,
রেখায় রঙে সুখে দুঃখে।" (আমি)

এই নিখিল বিসৃষ্টি তাঁহার আনন্দ-রূপের প্রকাশ। তাঁহারই আনন্দ-রস সকল রূপের ভিতর দিয়া নিত্য প্রকাশ লাভ করিতেছে। এই প্রকাশের কোন অর্থ নাই।

মানুষের সৃষ্টিও তেমনি অলৌকিক, অহেতুক আনন্দ-রূপের প্রকাশ। ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণকে যতই গভীর করিয়া লাভ করিতে থাকে, ব্যক্তির চেতনায়

এক পরম অস্তিত্বের মহান, গূঢ় অনুভূতি ততই জাগ্রত হয়, তাহার সৃষ্টি-প্রেরণা তত অনায়াস তত অন্তহীন হইয়া উঠে।

"আমার মন হয়েছে পুলকিত
বিশ্ব আমির রচনার আসরে
হাতে নিয়ে তুলি পাত্রে নিয়ে রঙ।" (আমি)

মহাপ্রলয় বৈজ্ঞানিক চিন্তার দিক হইতেও সত্য। সেদিন এত রূপ, রঙ্গ, রেখা, এত রস সব বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সেদিন অন্তহীন মহাকাশে কেবল এক সুর-হারা শক্তির কম্পন ছুটিয়া চলিবে। সেদিন অসীমের এত প্রেম, প্রেমে এমন অন্তহীন মাধুর্যের প্রকাশ সম্পূর্ণ নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। কোথাও তাহার লেশমাত্র প্রকাশ থাকিবে না।

"বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগ যুগান্তর ধ'রে।'
প্রলয় সন্ধ্যায় জপ করবেন,
'কথা কও, কথা কও',
বলবেন 'বলো, তুমি সুন্দর'
বলবেন 'বলো, আমি ভালবাসি'? (আমি)

এই জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া কবিতাটির সমাপ্তি ঘটিলেও ইহা যে সংশয়ব্যাকুল নয়, তাহা নিঃসংশয়ে বোধ করিতে পারা যায়। তাঁহার রূপ-হারা প্রেম আবার একদিন রূপ লাভ করিবে। এমনি করিয়া কোটি কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া তাঁহার লীলা চলিতেছে; একবার সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মধ্যে, আবার সকল রূপ-হারা একাকারত্বের মধ্যে।

ঈশ্বর কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন,—ধর্মীয় এই মতবাদ তাপচালন-বিদ্যার (thermodynamics) প্রত্যেকটি গ্রন্থে লাভ করা যায়। ঈশ্বর লক্ষ কোটি বৎসর আগে কোন এক সময়ে এই জড়জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাকে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে সমর্পণ করিয়াছেন।

বৈজ্ঞানিক এড়িংটন এই মত স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন বৈজ্ঞানিক হিসাবে এই জগৎ কোন এক সময়ে হঠাৎ সৃষ্টি হইয়াছে এই ধারণাকে স্বীকার করিতে পারা যায় না। ধর্মশাস্ত্রে যাহাকে সৃষ্টির আদি কারণ বলা হয় কোন কোন বৈজ্ঞানিক তাপচালন-বিদ্যার এই সত্য অনুসারে তাহাতে আরো বেশী বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছেন।

বিজ্ঞান অবশ্য আদি-সৃষ্টির সত্তাকে স্বীকার করিতে পারে না, কারণ, কারণ-ছাড়া কার্যের কোন ধারণা বিজ্ঞানে সম্ভব নয়। অনস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের প্রকাশ বৈজ্ঞানিক ধারণারও বহির্ভূত সামগ্রী। ইহার একমাত্র পরিবর্ত হইল এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টা কল্পনা করা। এডিংটন তাহাও অস্বীকার করিয়াছেন।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক আছেন, যেমন Dean Inge প্রভৃতি যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদের মত অগ্রগতির ধারণায় বিশ্বাস করেন না, আবার জগৎ যে একদিন শূন্যতায় বিলীন হইয়া যাইবে এবং ফলে মানুষের সকল মূল্য-বোধেরও নিঃশেষ বিলুপ্তি এই বিশ্বাসকেও মানিয়া লইতে পারেন নাই।

বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের লীলা চলিয়াছে, নানা রূপের, নানা রঙ্গের, নানা সুরের, নানা খেলার ভিতর দিয়া। নিত্যকাল ধরিয়া এক কী আশ্চর্য অনির্বচনীয় প্রকাশ। মহান্ এক অস্তিত্বের যোগে অস্তিত্বের এক কী নিবিড় অনুভূতি, কী নিঃসঙ্কোচ, নির্ভীক প্রকাশ। এই প্রাণের লীলায় আমার প্রাণও রহিয়াছে! অনন্তকোটি রূপ-লোক, তৃণ-পুষ্প হইতে দূরতম জ্যোতিষ্ক-লোক পর্যন্ত রূপের সকল প্রকাশের মধ্যবর্তী হইয়া আমি আছি। সেই এক অনির্বচনীয় রস আমার মধ্য দিয়াও প্রকাশ লাভ করিতেছে। এ কী অপার বিস্ময়!

"আছি, আমরা আছি, বেঁচে আছি,
বেঁচে আছি এই আশ্চর্য মুহূর্তে। (প্রাণের রস)

প্রাণের এই লীলাকে ইহার বিপরীত দিক হইতে দেখা সম্ভব। তাহাতে দেখা যায় বিশ্বের সমস্ত কিছু নিয়তই অনস্তিত্ব হইয়া যাইতেছে। বিশ্বজোড়া এক সুমহৎ বিভীষিকা। কিন্তু এই সকল চলমানতার ভিতর দিয়া রূপ যে নিয়তই এক স্থিতিকেই ফুটাইয়া তুলিতেছে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টিই যায় না। কেবল বিনষ্টির দিক হইতে রূপকে দেখিলে রূপ বিবিক্ত এমন একটি সত্তাকে স্বীকার করিতে হয় রূপের সহিত যাহার কোন সংযোগ নাই; কিংবা এই বিভীষিকার ঊর্ধ্বে এক মহান্ শূন্যতাকে স্বীকার করিয়া বসি। রূপ-শূন্য অস্তিত্বের বোধে এবং শূন্যতার বোধে কোন পার্থক্য নাই

রূপ নিয়ত বিনষ্টির ভিতর দিয়া যে এক পরম অস্তিত্বের আনন্দকেই নিয়ত ব্যক্ত করিতেছে, এই সাক্ষাৎকারই একমাত্র সত্য।

"তারাও ছিল বেঁচে,
তারা যে নেই তার চেয়ে সত্য ঐ কথাটি।" (প্রাণের রস)

কবি সমগ্র মানব-সভ্যতাকে গতিশীল করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। যে

অধ্যাত্ম উপলব্ধির ভিতর দিয়া এই গতিতত্ত্ব অপরোক্ষ হইয়াছিল, সেই মূল দার্শনিক উপলব্ধিকে তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাহার সমগ্র জীবনের, সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া এই উপলব্ধি মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার ফলে ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, মানুষের সৃষ্টিপ্রেরণার ও জ্ঞানের সকল বিভাগকে তিনি গতিশীল করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। নিত্য নূতন রূপ-লাভের ভিতর দিয়া এই সমস্ত কিছু ক্রমিক উন্নততর মূল্য লাভ করিতেছে।

ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই গতিতত্ত্ব স্বীকৃত নয়। তাহার ফলে ভারতীয় সাধনা এমন কতকগুলি দার্শনিক পদ্ধতি গড়িয়া তুলে যাহার মধ্যে মূল্যের স্থিতির দিকটিই একমাত্র স্বীকৃত। তাহা এইরূপে যে-ধর্মবোধ ও সমাজ-দর্শন গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহাতেও গতির দিকটি সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। মানুষের সৃষ্টির আর সকল দিকগুলিকেও একটি চিরস্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। মূল এই দার্শনিক উপলব্ধির পার্থক্যের জন্য রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির প্রত্যেকটি বিভাগের বন্ধন-মুক্তিসাধনে সমগ্র জীবন ধরিয়া সংগ্রাম করিয়াছেন।

সমগ্র প্রকাশটিকে এইরূপে স্থিতিশীল করিবার চেষ্টা ভারতীয় মধ্যযুগেই যে কেবল দেখা দেয় তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বে সর্বত্র এইরূপ একটি চেষ্টা প্রায় একই সময়ে লক্ষ্য করা যায়। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে এইরূপ এক একটি অবস্থা লক্ষ্য করা যায় যখন লব্ধ সম্পদকে সে চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখিতে চাহিয়াছে। এই মানসিক প্রবণতার ফলে সে ইহার অনুকূল বিচিত্র জীবন-দর্শন গড়িয়া তুলে। কিন্তু প্রাণের আবেগ পুঞ্জীভূত হইতে হইতে একসময় সকল বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

প্রাণের যে প্রেরণা এইরূপে যুগে যুগে প্রাচীনের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া নিত্য নবীন সৃষ্টি-প্রেরণার প্রকাশ ঘটায় রবীন্দ্রনাথ আপনাকে সেই প্রাণ-তত্ত্বের সহিত একাত্ম করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বের মূর্ত্য প্রকাশ।

'চিরযাত্রী' কবিতাটির মধ্যে সেই 'চিরনূতনের' 'চিরযৌবনের', 'চির-বিদ্রোহী'র বন্দনা-গান।

"সীমানা ভাঙার দল ছুটে আসছে
বহু যুগ থেকে
বেড়া ডিঙিয়ে, পাথর গুঁড়িয়ে,
পার হয়ে পর্বত,

আকাশে বেজে উঠছে নিত্যকালের তুন্দুভি,
"পেরিয়ে চলো,
পেরিয়ে চলো।" (চিরযাত্রী)

নারী-সত্তার মধ্যে যে প্রকাশ, তাহার তুর্লভ রূপটি ধরা পড়ে পুরুষের প্রেমে। সত্তার একক প্রকাশ তো বন্ধ্যা, সে সত্য নয়। বিশ্ব-প্রাণের যোগে মানুষের প্রাণের যোগ, এবং এই যোগের ভিতর দিয়া সে যখন বিশ্বের সকল সত্তার সহিত মিলন বোধ করে, তখন তাহা মৃত্যুকে জয় করিয়া উঠে। পরম মিলনের আনন্দই অমৃত। অন্তহীন প্রাণের যোগে তখন প্রাণ সত্য বলিয়া প্রাণের বিনাশের ভয় থাকে না। ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের সহিত যে বোধে মিলন বোধ করে, সেই বোধকেই বলে প্রেম।

পুরুষের অন্তরে প্রেমে নারীর যে-রূপ উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায় তাহা বাহিরের রূপ অপেক্ষাও সত্য। যাহা নিবিড় অনুভূতির সঞ্চার করিয়া সমগ্র চেতনাকে উন্মুখ করিয়া তুলে। আমরা তাহাকেই বলি সত্য। অন্তরে ধ্যানের মধ্যে নারীর যে রূপ পুরুষ গড়িয়া তুলে তাহা এই কারণেই সত্য। এই রূপকেই পুরুষ অন্তরের মধ্যেই কেবল নানাভাবে আস্বাদ করে না, তাহাকেই বাহিরে বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার সাধনা করে। এই রূপকেই সৃষ্টি করিতে চাহিয়া মানুষের শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত।

"দিনে দিনে তোমাকে রাঙিয়েছি
আমার ভাবের রঙে।" (দ্বৈত)

প্রেমে এইরূপে পুরুষ ও নারী একটি নূতন ভাব-লোকে জন্মগ্রহণ করে। সেই লোকে তাহারা বিচিত্র ভাবনার জন্ম দেয়।

"আমি বেঁধেছি তোমাকে তুয়ের গ্রন্থিতে,
তোমার দৃষ্টি আজ তোমাতে আর আমাতে
তোমার বেদনায় আর আমার বেদনায়।" (দ্বৈত)

পুরুষের অন্তরে নারীর আর এক যে রূপ ফুটিয়া উঠে তাহাতে অন্তহীন বিস্ময় বিজড়িত হইয়া যায়। তাহাতে এক অনির্বচনীয়তার আভাস ফুটিয়া উঠে, তাহা অস্তমিত সূর্যের আভায় রাঙা একখণ্ড মেঘের মত বহুদূরের অথচ নিত্য নব নব বর্ণের ও রূপের প্রকাশে মায়াময়। নারী আপনার এই আশ্চর্য রূপ সাক্ষাৎ করিয়া ধন্য হইয়া যায়। একথা যেমন সত্য, তেমনি একথাও সত্য যে পুরুষের অন্তরের সৌন্দর্য-লোকটিকে নারী-রূপই উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়।

"আজ তুমি আপনাকে চিনেছ
আমার চেনা দিয়ে
আমার অবাক চোখ লাগিয়েছে সোনার কাঠির ছোঁওয়া
জাগিয়েছে আনন্দরূপ
তোমার আপন চৈতন্যে।" (দ্বৈত)

এমন এক-একটি অধ্যাত্ম উপলব্ধির মুহূর্ত জীবনে আসে যে মুহূর্তে জগৎ ও জীবনের দৃশ্যপটটি পরিবর্তিত হইয়া যায়। অকস্মাৎ মনে হয় এই আমি এবং আমার পরিচিত প্রিয়জন, এই নিখিল বিশ্ব, বিশ্বের অনন্ত কোটি নর-নারী যেন গভীর ঘুমে স্বপ্ন সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে। যেন অন্তরের অন্তরতম লোকে কাহার, অনিবার্য গূঢ় অশ্রুত বংশীধ্বনি হইতেছে, তাহারই প্রেরণায় বিস্ফারিত আঁখি মেলিয়া জীবনভোর আমরা চলিয়াছি। সে বাঁশির সুরে ব্যাকুল আহ্বানের বিরাম নাই, এই যাত্রারও শেষ নাই।

কোন সুরের অনিবার্য আকর্ষণে এই অনন্ত কোটি নর-নারী এই জগতে আসিয়া পড়িয়াছে, আবার সেই সুরের টানে কোন্ অপরিচিত লোকে ইহারা চলিয়া যায়। ইহারাই বা কে ইহাদের তো আমি চিনি না, আমাকেও ইহারা চেনে না। সকলেরই তো দৃষ্টি আচ্ছন্ন। বাঁশির সেই গূঢ় আহ্বানের স্বরূপ কি, অনন্ত কোটি জীবের এ যাত্রা কোথায় গিয়া শেষ হয়? কোন দিব্য-চেতনা-লোক কি রহিয়াছে, যে চেতনা-লোক অধিষ্ঠিত হইয়া সমগ্র জীব-জগতের এই নিয়ত রূপটি প্রত্যক্ষ করা যায়? কেমন করিয়াই বা তাহাকে লাভ করিতে পারা যাইবে?

"সে কি সেই বিরহ
যার ইতিহাস নেই।
সে কি অজানা বাঁশির ডাকে অচেনা পথে স্বপ্নে-চলা।
ঘুমের স্বচ্ছ আকাশতলে
কোন্ নির্বাক রহস্যের সামনে ওকে নীরবে শুধিয়েছি,
'কে তুমি।
তোমার শেষ পরিচয় খুলে যাবে কোন লোকে!" (অকাল ঘুম)

হিন্দু নারীর জীবনে সহস্র লাঞ্ছনা ও বঞ্চনাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই যে বিশিষ্ট একটি সাধনা ও সিদ্ধির দিক আছে, কবি 'বাঁশিওয়ালা' কবিতাটির মধ্যে তাহারই একটি আশ্চর্য পরিচয় দিয়াছেন।

বাহিরের সহস্র লাঞ্ছনা, অসম্মাননা এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে ইহারা যেন কোন প্রতিবাদই করিতে পারে না। প্রতিবাদ করিতে পারে না বলিয়াই অন্তর্জীবনে অধ্যাত্ম-জীবনে ইহারা বাঁচিবার একটি পথ অন্বেষণ করিয়াছে।

এই অন্তরের পথ বাহিয়া ইহারা দিব্য আর এক মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছে। সেই মুক্তির আস্বাদ মুহূর্তে মর্ত্য জীবনের সকল বন্ধন, দারুণতম গ্লানি-বিজড়িত যে 'আমি' তাহা কোথায় ছায়া হইয়া মিলাইয়া যায়। তাহাকে মানুষের কোন পাপ, কোন অপরাধ আর স্পর্শ মাত্র করিতে পারে না। নারী এমনি অন্তরের পথে মুহূর্তে মুহূর্তে অমৃত আস্বাদ করিতে পারে বলিয়াই সমাজের এতবড় পাপের বোঝাকেও বুক দিয়া ঠেলিতে পারে। এমনি করিয়া সে প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুকে বুকে জড়াইয়া তাহাকে অমৃতে অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে। নারীর ইহাই সাধনা ও সিদ্ধি।

ইউরোপীয় নারীসমাজে বাহিরের বন্ধন ছিন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা প্রবল। হিন্দু নারী বাহিরের শৃঙ্খলকে মানিয়া লইয়া অন্তরে মুক্তি অন্বেষণ করিয়াছে। অবশ্য পূর্ণতার সাধনা অন্তর এবং বাহির উভয়ের যুগপৎ মুক্তিলাভের মধ্যে। দুই আদর্শের মিলিত প্রকাশে শ্রেষ্ঠ আদর্শ জন্মলাভ করিবে।

অন্তর্জীবনের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হয়ত মুষ্টিমেয় কয়েকজন নারী করিয়াছে, কিন্তু বাহিরের বঞ্চনা ইহাদের অধিকাংশ জীবনকেই পঙ্গু করিয়াছে। অন্তরের এই সাধনার নামে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় ইহারা আত্মবঞ্চনা করিয়া চলিয়াছে।

"বেজে ওঠে তোমার বাঁশি
ডাক পড়ে অমর্ত্য লোকে,
সেখানে আপন গরিমায়
উপরে উঠেছে আমার মাথা।" (বাঁশিওয়ালা)

কৈশোরে, প্রারম্ভিক যৌবনে কত প্রেম গড়িয়া উঠে, কয়জন নর-নারীর ভাগ্যে সে প্রেম সার্থক হয়। বৈচিত্র্য-পরিপূর্ণ, কর্মময় সংসারে কে কোন্ দিকে যে সরিয়া যায় তাহার ঠিকানা মিলে না।

ওই বিচ্ছেদে পুরুষের ধ্যানে সেদিনের প্রেম চিরন্তন হইয়া থাকে। যে বিশিষ্ট রূপ আশ্রয় করিয়া কোন এক দিব্য মুহূর্তে পুরুষের অন্তরে প্রেম সঞ্চারিত হইয়াছিল, সেই রূপ অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। তাহার পর জীবনে কত পরিবর্তন আসে, কত বিচিত্র বোধ জাগে, কিন্তু ওই

রূপ-ধ্যানের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসে না। অসীম কাল-প্রবাহ ওই মূর্তির চতুর্দিক ঘিরিয়া যেন স্তব্ধ হইয়া থাকে।

"আমার কাছে তোমার স্মরণ রয়ে গেছে
প্রকৃতির বয়স-হারা এইসব পরিচয়ের দলে!
সুন্দর তুমি বাঁধা রেখায়
প্রতিষ্ঠিত তুমি অচল ভূমিতে।" (মিল ভাঙ্গা)

আজ সেই নারীর সহিত যদি সাক্ষাৎও হয় তবে সেই রূপ, সেই প্রেমের সহিত তাহার কোন মিল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। বাস্তব নারী অপেক্ষা ওই ধ্যানের রূপটিই বুঝি সত্য।

কেবল তাহাই নহে, পরিণত জীবনে সে প্রেমের সহিত যেন বিচ্ছেদ আসে। তবু এই বিচ্ছেদ জীবনে একান্ত সত্য নয়। সকল বিস্মৃতির পরপারে দাঁড়াইয়া সে প্রেম আজিও জীবনে নূতন প্রেরণা প্রতি মুহূর্তে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে।

"এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিল ঠেলে
কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে,
এর মধ্যে আছে তার বেগ।" (মিল ভাঙ্গা)

সাধারণ জীবনকে অসাধারণত্বের মূল্য দিতে পারে যে বোধ, অর্থাৎ রোমান্টিক কল্পনা, তাহার একপ্রকার চরমোৎকর্ষ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। সকল সত্তার, মানব-জীবনের সকল সম্পর্ক এবং মানবিক সকল বোধকে এমন আশ্চর্য প্রসারতা দান, তাহাকে এমন অলৌকিক বিস্ময় রস-পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া। এই জাতীয় অনুপ্রেরণার ক্ষেত্রে বিশ্বের আর কোন কবি এতদূর কৃতকার্য হইতে পারিয়াছেন কি-না জানি না। মনে হয়, কেবল মাত্র এই জীবন লাভ করিয়া, এই জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমরা যাহা পাইয়াছি, জীবনের সর্ববিধ বঞ্চনা ও লাঞ্ছনাও তাহার লেশমাত্র ভাগকে ম্লান করিতে পারে না। জীবন ঘিরিয়া এ কী অপার বিস্ময়, এ কী অনন্ত রহস্য, প্রতিটি সত্তাকে আবেষ্টন করিয়া সৌন্দর্য ও মাধুর্যের এ কী অসীম প্লাবন।

নারীর আত্মনিবেদনের মধ্যে আছে এমনি বিস্ময় মহিমা। প্রাত্যহিকতায় আমাদের দৃষ্টি ম্লান হইয়া যায়। বিস্ময়বোধ আমাদের চেতনাকে আর স্পর্শ করে না। মাঝে মাঝে সেই চিরন্তন মহিমার লোকে আমরা উত্তীর্ণ হইয়া যাই। পুরুষ ও নারী আপনারই দুর্লভতম সত্তার পরিচয় লাভ করে। সে

সত্তার সহিত বিশ্বের সকল সৌন্দর্য, মাধুর্য ও মহিমার সহিত মিল আছে। মানব-ভাষার কোন অত্যুক্তি তাহার যথার্থ স্বরূপটিকে প্রকাশ করিতে পারে না।

"বলব, 'প্রিয়ে, এই পরদেশী ফুলের মঞ্জরী
আকাশ চেয়ে খুঁজছিল বসন্তের রাত্রি,
এনেছি আমি তাকে দয়া করে
তোমার ঐ কালো চুলে।" (সম্ভাষণ)

কালিদাসের কাব্য-জগৎ মথিত করিয়া কবি যেমন একটি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য-সত্তা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বৈষ্ণব কবিদের কাব্য-লোক মন্থন করিয়াও তিনি একটি সৌন্দর্য-সত্তা গড়িয়া তুলেন। এই দুইটি সৌন্দর্য-সত্তার মধ্যে আশ্চর্য নিগূঢ় মিল আছে। তাঁহার যে 'মালবিকা' এক 'অনসূয়া'র ধ্যান তাহার সহিত 'স্বপ্ন' কবিতার অন্তর্গত শ্রীরাধার ধ্যানের মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই।

"সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালোবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল-পরা,
ঘাটের থেকে নীল শাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি' চলা।" (স্বপ্ন)

বাস্তবে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নারীর সৌন্দর্য-ধ্যান তাঁহার কাব্যে যে আদৌ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাহার চেয়ে বেশি আছে অতীত কাব্য-সাহিত্য ও পুরাণ অন্তর্গত নারীর সৌন্দর্য-ধ্যান। ফিরিয়া ফিরিয়া তিনি স্বপ্নে, কল্পনায় সেই লোকটিকে সন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। কবির সৌন্দর্য-কল্পনায়, ধ্যান-নেত্রে ফুটিয়া উঠা এই যে সৌন্দর্য-সত্তা তাহা তো কোনো কালে নির্দিষ্টীকৃত ছিল না, তাহা সকল কালের অতীত কোন এক সৌন্দর্য-লোক, তাহারই ছায়া পড়িয়াছে বাস্তব নারী, বিশ্বের সকল সৌন্দর্যসামগ্রীর উপর। সেই ছায়াবেষ্টনীতে সমস্ত কিছু অলৌকিক হইয়া উঠিয়াছে।

কোন সৌন্দর্য-সত্তা যখন মানুষের ব্যক্তিগত প্রয়োজনবোধের সঙ্গে বিজড়িত হয় তখন তাহার যথার্থ স্বরূপটি আর ধরা পড়ে না। তাহার ফলে

এমন অনেক সুন্দর সামগ্রী আছে, যাহাকে আমরা কালের বিষয়বস্তু করিতে দ্বিধা করিয়াছি। ইহার জন্য যেমন তেমনি বিশ্বে অনেক সুন্দর সামগ্রী আছে যেগুলি সম্পর্কে আমরা আদৌ সচেতন নই। এইসকল তথাকথিত তুচ্ছ সুন্দর সামগ্রীর মধ্যে যে কি অপার্থিব সৌন্দর্য আছে তাহা প্রচলিত সংস্কার-বোধের বাহিরে না আসিতে পারিলে আমরা বোধ করিতে পারি না। সকল মহৎ কবি-প্রতিভার মত রবীন্দ্রনাথ কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করেন নাই, তিনি সৌন্দর্য আবিষ্কারও করিয়াছেন। 'তেঁতুলের ফুল' তাহার অন্য বহুবিধ দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি।

"ফুলের পরিচয়ে আজ ওকে দেখছি।
যেন গন্ধর্ব চিত্ররথ,
যে ছিল অর্জুন-বিজয়ী মহারথী
গানের সাধন করছে সে আপন মনে একা
নন্দনবনের ছায়ার আড়ালে গুনগুন সুরে।"

(তেঁতুলের ফুল)

জ্যোতিস্বরূপ ঈশ্বরীয় সত্তার সঙ্গে কবির ব্যক্তি-সত্তার যোগের অনুভূতি।

"প্রভাতসূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম 'চাইনে কিছু চাইনে'—
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ।
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।"(কালরাত্রে)

প্রান্তিক

জীবনের বিচিত্র গ্রন্থি ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে কবির জীবনে সেই অনুভূতি আসে যখন জাগতিক বিচিত্রবোধের সমষ্টিভূত,

তাহার বিচিত্র অনুপ্রেরণায় গড়িয়া তোলা এই দেহ-প্রাণ-মন শরতের লঘু মেঘের মত আকাশপ্রান্তে বিলীন হইয়া যায়। দেহ-প্রাণ-মনের সম্পূর্ণ বোধ মুক্ত-চেতনার সে এক অলৌকিক উপলব্ধি। এই বিশিষ্ট উপলব্ধির কথা ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার উপলব্ধির ক্ষেত্রে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। প্রান্তিকের কবিতাগুলির মধ্যে এই অনির্বচনীয় উপলব্ধির কথাই নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু কবির এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কবির সেই উপলব্ধির সহিত এই বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গত উল্লেখ করিব।

প্রারম্ভের কবিতাটির মধ্যে সত্তা হইতে চেতনার ধীর বিশ্লেষ এবং পরিণামে তাঁহার সত্তামুক্ত অলৌকিক উপলব্ধির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। প্রথমে জাগতিক বোধের ধীর বিলুপ্তি। এক অলৌকিক বেদনাবোধের ভিতর দিয়া দৃঢ় হস্তে তাহার মার্জনা। সম্পূর্ণ জাগতিক বোধ মুক্ত সাময়িক শূন্যতা এবং অন্ধকারের বোধ।

তাহার পর উর্ধ্ব হইতে এক দিব্য জ্যোতির প্লাবন নামিয়া সেই অন্ধকারের বক্ষকে যেন শতদীর্ণ করিয়া দিল। অন্ধকারের বক্ষে সেই আলোর সঞ্চার আশ্চর্য গোপন, নিগূঢ়, শ্রাবণের ধারাপাতে যেমন করিয়া প্রতি বৃক্ষের শিরায় শিরায় রস-ধারা প্লাবিত হইয়া যায়।

> "শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
> স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে
> আলোকের থরথর শিহরণ চমকি চমকি
> ছুটিল বিদ্যুৎ বেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে
> দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে।"

কিয়ৎক্ষণের জন্য আলো-অন্ধকারের এক অপরূপ সমন্বয়। মন ও দিব্য-চেতনার মধ্যবর্তী এই অন্ধকার-লোকই মৃত্যু-লোক। খ্রীষ্টানদের ভাষায় যে চিরন্তন evil বা sin দ্বারা এই জগৎ পরিবৃত, ইহা সেই অজ্ঞানতার জগৎ। অন্ধকার-লোক বিদীর্ণ করিয়া যে দিব্য আলোর প্লাবন কবি-চেতনায় নামিয়া আসিতেছে, তাহা ব্যক্তি-জীবনে যেমন সত্য, তেমনি সমগ্র বিশ্ব-মানব-মনের জগতেও তাহা সত্য। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ব-মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া দিব্য-চেতনা নিম্নতর চেতনা-লোকে অবতরণ করিতে চান, সমগ্র সত্তার আমূল রূপান্তর-সাধনের জন্য।

"আলোক আঁধারে মিলি
চিত্তাকাশে অর্ধস্ফুট অস্পষ্টের রচিল বিভ্রম।"

তাহার পর সেই জ্যোতিপ্লাবনে কবির সমগ্র সত্তা বিধৌত হইয়া গিয়াছে। তাহাতে দেহ-প্রাণ-মনের সর্বশেষ বন্ধন, ক্ষীণতম আবরণ পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে উম্ভিন্ন হইয়া গিয়াছে। দেহমুক্ত সত্তার তাহা এক নূতন জন্মলাভ।

"নূতন প্রাণের সৃষ্টি হল অবারিত
স্বচ্ছ-শুভ্র চৈতন্যের প্রথম প্রত্যুষ অভ্যুদয়ে।"

কবির উপলব্ধির এই যে ধীর পরিণাম আমরা লক্ষ্য করিলাম তাহাতে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় কবির নিকট জীবন ও জগৎ যেন মায়া হইয়া উঠিয়াছে। জীবনে এমন এক উপলব্ধির সম্মুখীন তিনি হইয়াছেন, যে উপলব্ধির মুহূর্তে জীবন ও জগৎ তাহার বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধের প্রকাশ লইয়া মহাশূন্যে ছায়া হইয়া দেখিতে দেখিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, এই পরিণামলাভের মধ্যেও কবির চেতনা সম্পূর্ণ-রূপে বিলুপ্ত হয় নাই, সত্তার একটি অস্তিত্ববোধ কোন-না-কোন স্বরূপে আছে। কবির মুক্তি-তত্ত্বে সত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তি কোন পরিণামে ঘটিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে বিশ্ব-কর্মটাই যে নিরর্থক হইয়া যায়। এই পরিপূর্ণতার উপলব্ধি তাঁহাকে সেই সামর্থ্যই দান করিয়াছে, কিংবা করিবে, যে সামর্থ্যে স্বয়ং ঈশ্বর অনাদ্যন্ত কাল ধরিয়া অন্তহীন রূপ-সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন।

দিব্য-চেতনাশ্রয়ী হইয়া মানুষ যে আশ্চর্য সমৃদ্ধি ও সৃষ্টি-প্রেরণা লাভ করিবে, তাহাতে যে বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে সে আপনাকে প্রকাশ করিবে তাহার কতটুকু কল্পনা আজ আমরা করিতে পারি।

কবির জীবনে এই উপলব্ধি যে নবতর সৃষ্টির প্রেরণা দান করিবে, তাঁহার ইতিপূর্বের সৃষ্টি-প্রেরণা ও সৃষ্টি-রূপ হইতে তাহা যে অনেক বেশি উন্নত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই বিশ্ব-কর্মের তত্ত্বই কবিকে মায়া-তত্ত্ব হইতে বিশিষ্টতা দান করিয়াছে।

"বিশ্ব সৃষ্টিকর্তা একা, সৃষ্টিকাজে আমার আহ্বান
বিরাট নেপথ্যলোকে তাঁর আসনের ছায়াতলে।
পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়।"

এই পরিপূর্ণ সত্তার উপলব্ধির স্বরূপ যেমনই হোক, তাহাতে এই জীবন ও জগতের পরিপ্রেক্ষি যে বদলাইয়া যায় তাহাতে কোন সংশয় নাই। দেশ-কালের বোধশূন্য, শূন্য দিগন্তের ভূমিকায় 'নূতন জীবনচ্ছবি'র বিরচন যে কী রূপ তাহা আমাদের বোধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত সামগ্রী। সৌন্দর্যের সম্যক উপলব্ধি ও প্রকাশের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে একটি ব্যবধান রচনা অনিবার্যরূপে করিতে হয়, কিন্তু দেশ-কালের ঊর্ধ্বে উঠিয়া যে চরম ব্যবধান স্থষ্টি তাহাতে এই বিস্থষ্টির কোন্ রূপ ফুটিয়া উঠে ?

কবি এই জীবনে এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যে বিচিত্র রূপ স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহা কালে ম্লান হইয়া আসিতেছে, (ইহা কবির বোধ) অতি পরিচয়ে তাহার বিস্ময় ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে, মূল্য-নিরূপণের জন্য মানুষের কাছে তাহার বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা। স্থষ্টি-কর্মকে আশ্রয় করিয়া বাহিরের এই যে পরিচয়, তাহা ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক, সুন্দর হোক বা বিকৃত হোক, জীবনান্তর লাভে তাহার আদৌ কোন মূল্য নাই। মানুষকে এই সমস্ত কিছু পশ্চাতে ফেলিয়া, নিঃস্ব হইয়া মহা অজ্ঞাত সংখ্যাতীত গ্রহ-নক্ষত্রের পথে ভয়ঙ্কর একাকিত্বের ভিতর দিয়া যাত্রা করিতে হয়। এই উপলব্ধি মুহূর্তের জন্যও ঘটিলে জীবনে সার্থকতা ও অসার্থকতাবোধ সম্পূর্ণ বহিঃ-নিরপেক্ষ হইয়া যায়।

"হেনকালে একদিন আলো-অঁাধারের সন্ধিস্থলে
আরতি-শঙ্খের ধ্বনি যে লগ্নে বাজিল সিন্ধুপারে,
মনে হল, মুহূর্তেই থেমে গেল সব বেচাকেনা,
শান্ত হল আশা-প্রত্যাশার কোলাহল।"

যে সত্তার ভিতর দিয়া আদি স্থষ্টির আনন্দ প্রকাশ লাভ করে, কালে তাহার দীপ্তি ম্লান হইয়া যায়। তাহাকে তাই মৃত্যুর ভিতর দিয়া বারংবার পরিশুদ্ধতা লাভ করিয়া নূতন দেহ লাভ করিতে হয়।

"আদিম স্থষ্টির যুগে
প্রকাশের যে আনন্দ রূপ নিল আমার সত্তায়
আজ ধূলিমগ্ন তাহা, নিদ্রাহারা রুগ্ন-বুভুক্ষার
দীপধূমে কলঙ্কিত। তারে ফিরে নিয়ে চলিয়াছি
মৃত্যু-স্নান তীর্থ-তটে সেই আদি নির্ঝর তলায়।"

এমনি করিয়া বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া স্থষ্টি-প্রেরণাকে নূতন করিয়া লাভ করিতে হয়। এই নিখিল বিশ্ব-শিল্পের শিল্পী যিনি, তিনিও নূতন করিয়া

সৃষ্টি-প্রেরণা লাভের জন্য এই রূপের প্রকাশকে নির্মম হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলেন; অথবা উন্নততর চেতনার প্রকাশের ভিতর দিয়া উন্নততর সৃষ্টি-রূপের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেন।

"বুঝি এই যাত্রা মোর স্বপ্নের অরণ্যবীথি পারে
পূর্ব-ইতিহাস-ধৌত অকলঙ্ক প্রথমের পানে—
যে প্রথম বারে বারে ফিরে আসে বিশ্বের সৃষ্টিতে
কখনো বা অগ্নিবর্ষী প্রচণ্ডের প্রলয় হুঙ্কারে,
কখনো বা অকস্মাৎ স্বপ্নভাঙ্গা পরম বিস্ময়ে
শুকতারা নিমন্ত্রিত আলোকের উৎসব-প্রাঙ্গণে।"

রবীন্দ্রনাথের মুক্তির স্বরূপ আমরা জানি। তাহা ব্যক্তি-প্রাণের সহিত বিশ্ব-প্রাণের পরিপূর্ণ যোগের নিবিড়তম আনন্দের বোধ। বিশ্ব-চেতনা সংখ্যাতীত সত্তা বা রূপ আশ্রয় করিয়া আপনার যে আনন্দকে ব্যক্ত করিতেছে, সেই এক আনন্দই তো কবির বিচিত্র সৃষ্টি-রূপের ভিতর দিয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে। এমনি করিয়া প্রাণের যোগে প্রাণ অফুরন্ত সৃষ্টি করে, আবার প্রাণেই বিলীন হইয়া যায়।

যাঁহারা জীবন ও জগৎকে অস্বীকার করিয়া মুক্তি লাভ করিতে চান তাঁহাদের জীবনে ভয়ঙ্কর শূন্যতা নামে। তিনি যে অন্তহীন কাল ধরিয়া আপনার আনন্দকে, রসকে রূপের ভিতর দিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাই রূপকে পরিহার করিলে তাঁহাকেই পরিহার করা হয়।

"মুক্তি এই সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্র-সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে।"

বনস্পতির কম্পমান পল্লবে পল্লবে প্রাণের যে আনন্দ-উল্লাস, সেই আনন্দই তো লোক-লোকান্তরে পরিব্যাপ্ত, সেই আনন্দই আকাশে, পুষ্পে, পাখির কল-কাকলিতে উৎসারিত। ইহাই তো সৃষ্টির আনন্দ-রূপ, মুক্তির পূর্ণ প্রকাশ।

বিশ্ব-প্রাণের সহিত যখন প্রাণের সংযোগ ঘটে তখন বিশ্বের সকল প্রাণের সহিত তৃণ-লতা হইতে জীব-জগৎ মনুষ্য-লোক পর্যন্ত সকলের সহিত নিবিড় একাত্মতা-বোধ জাগে। মানুষের জীবনে ইহার ঊর্ধ্বতর প্রাপ্তি আর কিছু নাই।

"অনিঃশেষ যে তপস্যা
প্রাণরসে উচ্ছ্বসিত, সব দিতে সব নিতে
সে বাড়ালো কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে, তারি বর
পেয়েছি অন্তরে মোর, তাই সর্ব দেহ মন প্রাণ
সূক্ষ্ম হয়ে প্রসারিল আজি ওই নিঃশব্দ প্রান্তরে—"

বিশ্ব-প্রাণ-লীলায় কবি যোগ দিয়াছেন, তাহারই আনন্দ-বেদনাকে নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। ধ্যান-লোকে অপূর্ব মানসী-মূর্তি তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশ্ব-সৌন্দর্যসাগরমন্থনে লক্ষ্মীর মত ভাসিয়া ওঠা অপরূপ সে নারী-মূর্তি। 'মানসী' হইতে 'কল্পনা' পর্যন্ত কাব্যগুলির মধ্যে কবির এই মানসী মূর্তির কত-না-পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। অপরূপ দিব্য-রূপ এমনি করিয়া কবির চিত্ত-পটে বারংবার ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া গিয়াছে। আজ কবির জীবনে তাহার কোন প্রকাশ না থাকিলেও তাহা যে কোন-না-কোন স্বরূপে তাঁহার চেতনায় যুক্ত হইয়া আছে তাহাতে সংশয় নাই। তাহা এমনি সুপ্ত থাকিয়া নিগূঢ়ভাবে আজও তাঁহার চেতনায় অনুপ্রেরণা দান করিতেছে। প্রভাত আকাশ যেমন অনির্বচনীয় বিচিত্র সুরে, মাধুর্যে স্পন্দিত কবির মনও তেমনি অনির্বচনীয় কত-না ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তাহা কতক প্রকাশ লাভ করিয়াছে, কতক অপ্রকাশের বেদনায় নিয়ত সজল, বর্ষণ-কাঙাল মেঘের মত।

এমনি করিয়া বিশ্বের যোগেই কবির সত্তা ধীরে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। জীবন-শতদল একের পর এক দল মেলিয়া বিকাশ লাভ করিয়াছে। নট-নটী যেমন মহা-নাটকের এক একটি বিশিষ্ট চরিত্র অভিনয় করিয়া নেপথ্য ভূমিতে প্রয়াণ করে, তেমনি কবিও বিশ্ব মহাকবির মহা নাটকের কোন একটি অংশ অভিনয় করিয়া প্রচ্ছন্ন অন্ধকারলোকে প্রয়াণ করিবেন। এই জীবনের কোন অর্থ যদি থাকে তাহা একমাত্র সেই মহানাট্যকারই জানেন।

"—আলোকিত রঙ্গমঞ্চে
প্রচ্ছন্ন নেপথ্যভূমে, সুগভীর সৃষ্টি রহস্যের
যে প্রকাশ পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে উদ্‌বারিত
আমার জীবন-রচনায়।"

কেবল এই উপলব্ধিই কবির জীবনে সত্য নয়। জীবনের প্রত্যেক পর্যায়ে জাগতিক এই বিচিত্রবোধকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা বারংবার সকল সীমার বোধমুক্ত এক অনির্বচনীয়তার আস্বাদ লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

জীবনের কোন একটি বিশিষ্ট পরিণামে সত্য লাভ ঘটে, তাহা ছাড়া আর সমস্ত বোধটিই অজ্ঞানতা এই বোধে রবীন্দ্রনাথের যে লেশমাত্র বিশ্বাস ছিল না তাহা বলা বাহুল্য।

"—তাহারে বাহন করি
স্পর্শ করেছিল মোরে কতদিন জাগরণ ক্ষণে
অপরূপ অনির্বচনীয়।"

মৃত্যু জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, জীবনের একটি পর্যায়ের অবসান। বারংবার মৃত্যুর ভিতর দিয়া মানুষ নিত্য নূতন জগৎ লাভ করিয়া চলে মাত্র।

"আজি লয়ে যাও
মৃত্যুর সংগ্রামশেষে নবতর বিজয়-যাত্রায়।"

জাগতিক বোধ হইতে সত্তার ধীর বিশ্লেষ এবং পরিণামে অন্তহীন রূপ ও বোধের বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের সম্পূর্ণ বিলুপ্তির যে অভিজ্ঞতা তিনি এইকালে লাভ করিয়াছিলেন তাহার আর একটি পরিচয় নবম সংখ্যক কবিতার মধ্যে লাভ করিতে পারা যায়।

"এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ব বৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে, বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়।"

দেহ-প্রাণ-মনের বোধ মুক্ত, বিশ্বের বোধ মুক্ত চেতনার যে মহান একাকীত্ববোধ তাহা সাধারণ মানুষের বোধের সম্পূর্ণ বহির্ভূত সামগ্রী। ব্যক্তির এই পরিণাম লাভই সর্বশেষ পরিণাম নয়। ইহারও ঊর্ধ্বতর পরিণাম লাভের পক্ষে বুঝি মানুষের ব্যক্তিগত সাধনাই যথেষ্ট নয়। এইখানে ঈশ্বরীয় করুণার কথা আসে। তিনি স্বয়ং যদি তাঁহার সর্বশেষ আবরণ, মায়ার আস্তরণ না সরাইয়া নেন, তাহা হইলে মানুষ বুঝি আপনার চেষ্টায় তাহা উদ্ভিন্ন করিতে পারে না। এই কথাই উপনিষদে উক্ত হইয়াছে, আত্মা যাঁহাকে নির্বাচন করেন, একমাত্র তিনিই আত্মাকে লাভ করিতে পারেন। এই সর্বশেষ আবরণ দূর করিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ করিবার ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা পরিশেষে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা কবির সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, যুগে যুগে ব্রহ্মর্ষিগণ ঈশ্বরের নিকট যে ব্যাকুল প্রার্থনা নিবেদন করিয়াছেন।

"হে পূষণ, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।"

"হে পূষণ * * তোমার রশ্মিজাল বিকীর্ণ কর, তোমার তেজ সংহরণ কর, যেন তোমার কল্যাণতম রূপ দেখিতে পাই। আমি সেই পুরুষকে দেখিতে চাই যে পুরুষ তোমার এবং আমার মধ্যে এক।" (বৃহদ্ আরণ্যক উপনিষদ)

"লোক-দ্বার অপাবৃত কর, বৈরাজ্য লাভের জন্য যেন তোমার সাক্ষাৎলাভ করি।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

"হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত। হে পূষণ, উহা অপাবৃত কর। আমি সত্যপ্রিয়, যেন সত্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি।" (ঈশ উপনিষদ্)

"যিনি এক, বর্ণহীন হইয়া বহুধা শক্তিযোগের দ্বারা আপনার নিহিতার্থ বহুবর্ণ প্রদান করেন, আদিতে এবং অন্তে বিশ্ব যাঁহার মধ্যে সমাহিত হয় তিনি আমাদের শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্)

আমরা লক্ষ্য করিয়াছি কবি যাহাকে পূর্ণ পরিণাম বলিয়াছেন, তাহা লাভ করিতে পারেন নাই। মায়ার সর্বশেষ সূক্ষ্মতম আবরণ তাঁহার দৃষ্টির পথরোধ করিয়াছিল। "দৃষ্টি মোর ছিল আচ্ছাদিয়া আমার আপন ছায়া।" ঈশ্বর তাঁহার জীবনে সর্বশেষ পরিণাম চিহ্নিত করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আপনার অহঙ্কারের আবেষ্টনী হইতে সম্পূর্ণরূপে বাহির হইয়া আসিতে পারেন নাই।

"সেই আলোকের সামগান
মন্দ্রিয়া উঠিবে মোর সত্তার গভীর গুহা হতে
সৃষ্টির সীমান্ত-জ্যোতির্লোক, তারি লাগি ছিল মোর
আমন্ত্রণ।"

জাগতিক বোধের ভিতর দিয়া কবির জীবন ধীরে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ইহার ভিতর দিয়া জীবন পরিশেষে জাগতিক বো-ধপ্রসূত সকল অনুপ্রেরণাকে ছাড়াইয়া যায়। তাহাতে জীবন ও জগতের আর এক অর্থ ফুটিয়া উঠে, সৃষ্টি-প্রেরণার আর এক দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়। দিব্য-চেতনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত জীবনের কবিত্ব প্রেরণাকে কবি 'চরমের কবিত্ব মর্যাদা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই পূর্ণ পরিণতি লাভের জন্যই কবি সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া দেহ-প্রাণ-মনকে প্রস্তুত করিয়াছেন, "এরি লাগি সেধেছিনু তান"।

কোন্ স্বরূপে কবির সাধনার মধ্যে অসম্পূর্ণতা ছিল, যাহার ফলে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রত্যাশা চরিতার্থ হয় নাই? ইহারই একটি কারণ অনুসন্ধান করিয়াছি, বিশেষ করিয়া গীতাঞ্জলি-গীতিমাল্য-গীতালি-পর্যায়ের পর হইতে।

তাহাকে এই ভাবটিই বারংবার সুস্পষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কবিরা পূর্ণতার সাধনায় ব্যক্তি-সত্তা, বিশ্ব-সত্তা ও দিব্য-সত্তার পূর্ণ সামঞ্জস্যসাধন প্রয়োজন। ব্যক্তি-সত্তা যতক্ষণ না বিশ্ব-সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারিতেছে, ততদিন কবির সাধনায় পরিপূর্ণরূপে দিব্য-সত্তা লাভের প্রশ্ন উঠে না। কারণ তাহা হইলে যে ব্যক্তির বিশ্ব-কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। বিশ্ব-সত্তা লাভ ঘটিলে স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপে কবি-চেতনা দিব্য-চেতনায় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। বিশ্ব-সত্তায় কবি-সত্তা পূর্ণতা লাভ কেন করিতে পারেন নাই, ইতিপূর্বে তাহার একটি কারণ নির্দেশের চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নের উদ্ধৃত অংশ হইতেও এই কারণ নির্দেশ সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়।

"আসিবে আরেক দিন যবে
তখন কবির বাণী পরিপক্ব ফলের মতন
নিঃশব্দে পড়িবে খসি আনন্দের পূর্ণতার ভারে
অনন্তের অর্ঘ্য ডালি—'পরে।"

জীবন পরিপক্ব ফলের মতন সুসম্পূর্ণ হইলে তবেই পরিপূর্ণ আনন্দলাভের মধ্যে সর্বশেষ চরিতার্থতা লাভ করিতে পারিবে।

কবি সুদীর্ঘ জীবন ধরিয়া সংখ্যাতীত ভাবকে বাণী-রূপ দান করিয়াছেন। অপরূপ দীপ্তিতে তাহারা সমুজ্জ্বল। জীবনে তাহাদের প্রভাব অনিবার্য। বর্ণ ও গন্ধ সমৃদ্ধ খ্যাতিবান কুসুমের মত মানুষের প্রাণ-মনকে তাহারা হরণ করিবেই। এই অতুল ভাব-রাশি ছাড়া এমন অসংখ্য ভাবনা তাঁহার হৃদয়ে রহিয়া গিয়াছে যাহাদের তিনি অতি সামান্য বলিয়া, অত্যন্ত দ্রুত পরিণামী বলিয়া, অতি লঘু স্পর্শকাতর বলিয়া ভাষা-বন্ধনে বাঁধিতে পারেন নাই।

মহৎ ভাবকে রূপায়িত করিতে প্রাণ-মনের যে সামর্থ্যের প্রয়োজন কবির জীবনে তাহার অবসান ঘটিয়াছে। প্রাণের স্রোত-হারা-হৃদয়-লোকে আজ সেই অবহেলিত তুচ্ছ ক্ষুদ্র ভাবনাগুলিই পথ-পার্শ্বে অবহেলিত অখ্যাত অনামা কুসুমের মত ফুটিয়া উঠিতে চাহিতেছে। মানুষের সমাদর তাহারা লাভ করিতে পারিবে না, প্রাণের প্রাচুর্যে তাহারা রূপ লাভ করিয়া ঝরিয়া যাইবে, লোক-চক্ষুর অন্তরালে যেমন করিয়া অসংখ্য তৃণ-পুষ্প ফুটিয়া ঝরিয়া যায়।

"—আজন্মের
বিচ্ছিন্ন ভাবনা যত, স্রোতের সেঁউলি-সম যারা
নিরর্থক ফিরেছিল অনিশ্চিত, হাওয়ায় হাওয়ায়,

রূপ নিয়ে দেখা দেবে ভাঁটার নদীর প্রান্ততীরে
অনাদৃত মঞ্জরীর অজানিত আগাছার মতো—"

বিশ্বের সংখ্যাতীত রূপ-লোকের মধ্যে আমার এই সত্তা বিরাজিত। যে চেতনার যোগে, প্রকাশের যে তত্ত্বে এই সমস্ত কিছুর প্রকাশ, সেই একই চেতনার যোগে, প্রকাশের সেই একই তত্ত্বে আমারও প্রকাশ। এই বিস্ময়ের কী পার আছে। দ্যুলোক-ভূলোক ব্যাপ্ত অন্তহীন চেতনা প্রসারের সহিত আমার চেতনাবিজড়িত। যে আলোক-সূত্রে মর্ত্যের সকল প্রাণ বিধৃত, সকল প্রাণের প্রকাশ, সেই আলোক সূত্রে আমার সত্তাও বিধৃত, সঞ্জীবিত। সেই এক আলোকের সহিত যুক্ত হইয়া আছি বলিয়া তাহারই সহিত যোগে সকল আলোক-সত্তার সহিত আমি গূঢ় মিলন বোধ করি। আমার চেতনা অন্তহীন প্রসারতায় হারাইয়া যায়। যে অন্তহীন ভাবনা-লোক যুগ-যুগান্ত কাল ধরিয়া সংখ্যাতীত নরনারীর চিত্ত-লোক আশ্রয় করিয়া ক্রমিক প্রসারতা লাভ করিয়া চলিয়াছে, কবির চেতনা তাহাকে নানারূপে স্পর্শ করিয়াছে, তাহার প্রকাশের নানা বাধা দূর করিয়া তাহাকে আরো ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াছে। এমনি করিয়া বিশ্ব-ভাবনার যোগে কবি এই মর্ত্য-লোকে এক অপার ব্যাপ্তি বোধ করিয়াছেন। এই বিস্ময়ের অন্ত কোথায়। তাহার পর জীবনকে বারংবার মৃত্যুর গ্রন্থি ছেদন করিয়া বারংবার নূতন রূপ লাভ করিয়া একাকী অনন্ত ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করিতে হয়।

কবির এই মিলনবোধের প্রসারতা একদিকে রূপের ক্ষেত্রে, অন্যদিকে ভাবের ক্ষেত্রে, আবার তাহা জন্ম-জন্মান্তর লোক-লোকান্তর ব্যাপ্ত। চেতনার এই ব্যাপ্ত বোধের মধ্যে কবির সকল দার্শনিক জিজ্ঞাসা অবসান লাভ করিয়াছে।

বিশ্বের যে অপার সৌন্দর্য-লোক আজ কবির দৃষ্টি সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে, মনে হয় যেন সবকিছু অলৌকিক মাধুর্যে ভরা, নূতনের অক্লান্ত বিস্ময়বিজড়িত, তাহা কোন্ চেতনা পরিণাম লাভ করিলে ঘটা সম্ভব, বর্তমান কবিতাটির মধ্যে একমাত্র তাহাই আমাদের লক্ষণীয়।

"আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন।"

ইহা তিনি ইতিপূর্বে নানাভাবে বুঝাইয়াছেন যে সৌন্দর্য-সাক্ষাৎকার

ইন্দ্রিয়ের সহায়তার আছে, তাহাতে সৌন্দর্য-লোক একান্ত সীমিত। যখন প্রাণের সম্যক প্রকাশ ঘটে, তখন সৌন্দর্য-লোক আরোও প্রসারতা লাভ করে, এইরূপে মনের সহায়তার সৌন্দর্য-লোকের প্রসারতা আরোও বাড়িয়া যায়। পরিশেষে অধ্যাত্ম-বোধের যখন বিকাশ ঘটে তখন সৌন্দর্যের আর সীমা থাকে না। অধ্যাত্মবোধ কি, না যে বোধে মানুষের সকল সীমিত বোধ লুপ্ত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য কবি-চেতনা সেই পরিণাম লাভ করিতে বিশ্বের সৌন্দর্য অফুরান হইয়া উঠিয়াছে।

'সোনার তরী' কাব্যের পর হইতে কবির জীবনে এমন একটি বোধের প্রকাশ বারংবার লক্ষ্য করিতে পারা যায়, যে ক্ষেত্রে তিনি কোন এক অসীম সত্তার (অবশ্য ইহার স্বরূপ কবির কাব্য-ধারায় সর্বত্র এক নয়) মধ্যে আপনাকে নিমজ্জিত করিতে অথবা তাহার সাযুজ্য লাভের জন্য উৎসুক, কিন্তু সেই সত্তা তাঁহাকে বারংবার মর্ত্য জীবনে ফিরাইয়া দিয়াছে, কবির সত্তায় অসম্পূর্ণতা ছিল বলিয়া।

ব্যক্তি-সত্তার সম্পূর্ণতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বুঝাইয়াছেন। বিশ্বের অন্তহীন বোধ-বৈচিত্র্যকে ব্যক্তি-চেতনায় সঞ্চারিত করিয়া দেওয়া এবং পরিণামে সেই সকল বোধের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যসাধন করা। বিশ্বের সহিত যোগে ব্যক্তির জীবনে এই ক্রিয়া যুগপৎ ঘটিতে থাকে। ব্যক্তির এই সম্পূর্ণতা ছাড়া বিশ্বেশ্বরের সহিত পূর্ণমিলন লাভ অসম্ভব। অন্তত রবীন্দ্রনাথ যে সাধনাকে লক্ষ্য করিয়াছেন তাহাতে ইহার অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন আছে।

তাহার ফলে তাঁহার শেষজীবনের কাব্যে এই উভয়মুখীন প্রেরণা সর্বত্র লক্ষ্য করিতে পারা যায়। একদিকে যেমন নিত্য নূতন বোধের জগতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, (ইহাকেই রবীন্দ্র সমালোচকবর্গের কেহ কেহ কাব্যে আধুনিকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা যে রবীন্দ্র-কাব্য-ধারার মূল প্রেরণাবিরোধী তাঁহারা এমন মন্তব্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। ইহার পশ্চাতে তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন কবির আধুনিক হইবার আকাঙ্ক্ষা, হয়ত তাহা সর্বাংশে ব্যর্থ!) অন্যদিকে আবার অসীম বা অরূপের মধ্যে ব্যক্তি-চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে বিগলিত করিয়া দিবার সুতীব্র ব্যাকুলতা, অতি কঠোর তপশ্চর্যা। উপরোক্ত সমালোচকবর্গ এই ধারাটিকেই রবীন্দ্র-কাব্যের যথার্থ দিগ্‌দর্শন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-কর্মকে সামগ্রিকরূপে বিচার করিলে এই অভিমতকে ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়।

সেঁজুতি

'প্রান্তিক'-এর পর 'সেঁজুতি' আমাদের সত্যই একটু বিস্মিত করে। কারণ কাব্যখানির মধ্যে নূতন কোন বোধের জগৎ আবিষ্কারের চেষ্টা নাই। অন্যদিকে মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করিয়া অসীম বা অরূপের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের জন্য যে দুঃসহ তপশ্চর্যার পরিচয় প্রান্তিকের মধ্যে লাভ করিয়াছি, সেঁজুতির মধ্যে তাহারও কোন পরিচয় নাই।

জীবসত্তার যে চিরন্তন আনন্দময় স্বরূপের তিনি পরিচয় দিয়াছেন (এই পরিচয় সেঁজুতি কাব্যে একাধিক কবিতায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে। সেঁজুতি কাব্যের ইহাই মূল এবং একমাত্র ভাব-প্রেরণা) তাহা যে এই কাব্যে আমরা প্রথম লাভ করি তাহা নহে, তাঁহার ইতিপূর্বের কাব্যে এই পরিচয় বারংবার আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার দার্শনিক স্বরূপ বিচার আমরা সেই সকল প্রসঙ্গে করিয়াছি। জীবনের আসক্তিকেই অমনি একটি বোধের সহায়তায় চরিতার্থ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি স্বয়ং ইহার অসারতা বোধ করিয়াছেন এবং এইভাবে জীব-জীবনের চিরন্তন নিয়তিকে যে জয় করিতে পারা যায় না সে সম্পর্কে তিনি স্বয়ং অত্যন্ত সচেতন। এত পরিণত বয়সে এই বোধের পুনঃপ্রকাশ তাই আমাদের বিস্মিত করে। তাঁহার পূর্ববর্তী প্রকাশ-রূপ হইতে ইহা যে উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে তাহাও সত্য নয়।

মানব-সত্তার এই চিরন্তন স্বরূপের যে পরিচয় তিনি কাব্যমধ্যে দান করিয়াছেন, নিম্নে তাহারই দুই একটি দৃষ্টান্ত কেবল উদ্ধৃত করিতেছি।

"তবু সে অমৃত রূপ সঙ্গে রবে যদি ভাব জেগে
মৃত্যু পরপারে। তারি সঙ্গে এঁকেছিল পত্রলিখা
আম্রমঞ্জরীর রেণু, এঁকেছে পেলব শেফালিকা
সুগন্ধি শিশির-কণিকায়; তারি সূক্ষ্ম উত্তরীতে
গেঁথেছিল শিল্প কারু প্রভাতের দোয়েলের গীতে
চকিত কাকলী সূত্রে; প্রিয়ার বিহ্বল স্পর্শখানি
সৃষ্টি করিয়াছে তার সর্বদেহে রোমাঞ্চিত বাণী,
নিত্য তাহা রয়েছে সঞ্চিত।" (জন্মদিন)

এই একই ভাবের প্রকাশ—

"সে-দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,

যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।"
(অমর্ত্য)

মূল এই বোধের সহিত বিজড়িত হইয়া কবির আর একটি যে বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা হইল বিশ্বের বিচিত্র রূপ-সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-প্রাণে বিশ্ব-প্রাণ-ধারার বিচিত্র আস্বাদ লাভ। রূপের যোগে ব্যক্তির সহিত বিশ্বের এই মিলন-অনুভূতিকেই কবি বলিয়াছেন 'ভালোবাসা'। এই ভালো-বাসার অনুভূতিকে, এই আনন্দকেই কবি তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"ওই যে শিমূল, ওই-যে সজিনা, আমারে বেঁধেছে ঋণে—
কত-যে আমার পাগলামি-পাওয়া দিনে
কেটে গেছে বেলা শুধু চেয়ে-থাকা মধুর মৈতালিতে,
নীল আকাশের তলায় ওদের সবুজ বৈতালিতে।
সকাল বেলার প্রথম আলোয় বিকাল বেলার ছায়ায়
দেহ প্রাণ মন ভরেছে সে কোন্ অনাদি কালের মায়ায়।
পেয়েছি ওদের হাতে
দূর জনমের আদি পরিচয় এই ধরণীর সাথে।"
(যাবার মুখে)

কিংবা

"তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা;
কাজল-কালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়ে ছিল তটের বনে বনে;
ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে;
সর্ষে তিসির খেতে
দুই রঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে;

তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে
বলেছিল, এই তো ভালো লাগে।"

(জন্মদিন)

জীবন ও জগতের কোন গভীর রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা কাব্যের মধ্যে কোথাও নাই। কবির জীবন ঘিরিয়া নামিয়াছে ঔদাস্য ও নিশ্চেষ্টতা। আর সেই উদাসীন নিশ্চেষ্ট মনের উপর দিয়া বহির্বিশ্বের বিচিত্র রূপ ছায়াছবির মত একের পর এক ভাসিয়া চলিয়াছে প্রাণের ক্ষীণধারা সঞ্চার করিয়া। অখণ্ড রূপ সৃষ্টির সে প্রয়াসও কোথাও সত্য হইয়া ধরা পড়ে নাই। এই মনোভাব একটানা বহিয়া চলিয়াছে 'সানাই' রচনাকাল পর্যন্ত। তাহার পর কবির জীবনে অকস্মাৎ অতি উজ্জ্বল বিচিত্র আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অগ্নি-বিচ্ছুরণ আমরা লক্ষ্য করি। তাঁহার শেষজীবনের চারটি কাব্য ইহারই পরিচয় বহন করিয়া আছে।

প্রান্তিকের উপলব্ধি কবির জীবনে এক নূতন দিগন্তরাল উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে। জীবন ও জগৎ তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আর এক নূতন অর্থ লইয়া পরিস্ফুট হইয়াছে। মানস-চক্র ভাঙ্গিয়া আর এক নূতন দেশ-কালের আবির্ভাব। পূর্বের জগৎ হইতে এ জগৎ কত বিপুল, কী অলৌকিক দীপ্তি-বিজড়িত। সে দীপ্তির কতটুকু প্রকাশ ধরা পড়িয়াছিল কবির ইতিপূর্বের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের মধ্যে। আপনার দীর্ঘ ছায়ার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া ইহা যেন জ্যোতির্ময় সূর্যের দিকে দৃষ্টিপাত। দৃষ্টিভঙ্গীর এমনি আমূল পরিবর্তন।

বর্তমানের এই উপলব্ধি এবং ইতিপূর্বের প্রাণের আনন্দ-বেদনা ও দুঃখ-সুখের বিচিত্র লীলা-আস্বাদের মধ্যে পার্থক্য যে গভীর তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এই উভয় উপলব্ধি বিপ্রকৃতিক নয়। প্রাণের এই লীলার ভিতর দিয়া আমাদের অন্তর্গূঢ় চেতনা যে পরিপূর্ণতা লাভ করে তাহাই পরিণামে চেতনাকে উন্নততর বোধের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। যে চেতনা সুখ-দুঃখের নাট্য-লীলায় দীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছিল, সেই চেতনাই—

"—নিয়ে যেতে চায়
অচিহ্নিতের পারে,
নব প্রভাতের উদয় সীমায়
অরূপ লোকের দ্বারে।" (উৎসর্গ)

কবির ইতিপূর্বের জীবন যদি হয় রাত্রির নাট্যলীলা, তবে এখনকার জীবনকে নবীন প্রভাত বলিয়া উল্লেখ করা যায়। একটি দীপ-শিখা, অপরটি অন্তহীন

আলোকধারাবর্ষী উদয় সূর্য। প্রথম সাক্ষাৎকারের বিস্ময় ও অভিভূত অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ কাটে নাই বটে, তবে ভীতি-বিহ্বলতা অনেকটা দূর হইয়াছে সে বোধ অনেকটা সহনীয় হইয়াছে।

"আলো-আঁধারের ফাঁকে দেখা যায়
অজানা তীরের বাসা,
ঝিমি ঝিমি করে শিরায় শিরায়
দূর নীলিমার ভাষা।" (উৎসর্গ)

সে জগৎ অপরিচিত সন্দেহ নাই, তাহার ভাষাও কবির সম্পূর্ণ আয়ত্তের মধ্যে আসে নাই, তবু কবি জানেন এখন হইতে তাঁহাকে ওই নূতন জগতের ভাবকে নূতন ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে। সেঁজুতি কাব্যের মধ্যে কবির সেই চেষ্টাই রূপ লাভ করিয়াছে।

কবি মৃত্যুর জন্য জীবনকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। তাহাকে সত্য করিয়া তুলিবার জন্য আসক্তির সকল-বন্ধন একে একে ছিন্ন করিয়া দিতেছেন। যে চেতনা তাঁহাকে জন্ম হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিয়াছেন, সেই চেতনার নিকট আসন্ন বিদায়-মুহূর্তে কবি ব্যাকুল প্রার্থনা জানাইয়াছেন।

"করো মোরে
আশীর্বাদ, মিলাইয়া যাক তৃষাতপ্ত দিগন্তরে
মায়াবিনী মরীচিকা।"

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া তাহারই আলোকে জীবনের একটা দিক যে 'মায়াবিনী মরীচিকা' হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। তাহা জীবনের কোন্ দিক?

ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন বিশিষ্ট কবির যে সত্তা বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধ আস্বাদ করিয়াছে, তাঁহার চেতনায় নানা বোধের সঞ্চার করিয়াছে, নানা সত্তার বা রূপের সহিত তাঁহার সত্তাকে যুক্ত করিয়াছে, সেই সত্তা আজ একান্ত জীর্ণ, ভগ্ন দেউলের মত শ্রীহীন। ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সে সামর্থ্য আজ প্রায় নিঃশেষিত। বিশ্ব একদিন যে সম্পদ অফুরন্ত করিয়া কবিকে দান করিয়াছে, সে আজ তাহা একে একে ফিরাইয়া লইতেছে। প্রাণের সকল দান মৃত্যুতে কি নিঃশেষ করিয়া পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়? মৃত্যু পরিণামে জীবনকে কি এমনি শূন্য করিয়া দেয়? কিছুই কি অবশেষ থাকে না? জীবন বলিতে কি ইহাই বুঝায়? প্রাণের সম্পদে একবার ভরিয়া উঠা, একবার নিঃশেষে ফুরাইয়া যাওয়া?

প্রাণের এই হরণ-পূরণের অন্তরালে আর একটি সত্তা আছে যাহা মৃত্যুকেও জয় করিয়া ওঠে।

"জীর্ণতার অন্তরালে জানি মোর আনন্দ-স্বরূপ
রয়েছে উজ্জ্বল হয়ে।" (জন্মদিন)

এই 'আনন্দ-স্বরূপের' সহিত বিশ্বের সকল রূপের অন্তরালবর্তী আনন্দ-সত্তার সহিত যোগ। কবির কাব্য এই উভয়ের মিলনের আনন্দ-প্রকাশ।

"সুধা তারে দিয়েছিল আনি
প্রতিদিন চতুর্দিকে রসপূর্ণ আকাশের বাণী;
প্রত্যুত্তরে নানা ছন্দে গেয়েছে সে 'ভালোবাসিয়াছি'।" (জন্মদিন)

এই 'ভালোবাসা' কবির চেতনাকে এমন এক সমুন্নতি দান করিয়াছে, এমন এক অপূর্বতার আস্বাদ দান করিয়াছে, এমন এক লোকে উত্তীর্ণ করিয়াছে, যাহা সকল জন্ম-মৃত্যুর সীমাকে অতিক্রম করিয়া যায়।

"সেই ভালোবাসা মোরে তুলেছে স্বর্গের কাছাকাছি
ছাড়ায়ে তোমার অধিকার। আমার সে ভালোবাসা
সব ক্ষয় ক্ষতি শেষে অবশিষ্ট রবে।" (জন্মদিন)

এই প্রেমের আশ্রয়স্বরূপ কবির বাণী-রূপ একদিন হয়ত দীপ্তিহীন; ম্লান হইয়া পড়িবে, কিন্তু কবির চেতনায় তাহা চির অম্লান হইয়া বিরাজ করিবে।

"তবু সে অমৃত রূপ সঙ্গে রবে যদি উঠি জেগে
মৃত্যু পরপারে।" (জন্মদিন)

ফাল্গুনের কত আম্রমঞ্জরীর রেণু, শরতের কত শেফালিকা; দোয়েলের কল-কাকলি, বিশ্বের বিচিত্র রূপ সেই রূপকে কত না ভাবে বিচিত্রিত করিয়াছে আর এই সকল রূপের ভিতর দিয়া কবির চেতনা কত বারবার সেই লোকের আভাস লাভ করিয়াছে, 'সেথা নাহি যায় হাত নাহি যায় বাণী।'

মানবিক বিচিত্র স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, জাগতিক বিচিত্র সৌন্দর্য একান্ত মিথ্যা নয়, কারণ কবি যে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছেন, তাহা এই মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেম আশ্রয় করিয়া।

"তবু জেনো অবজ্ঞা করিনি
তোমার মাটির দান, আমি সে মাটির কাছে ঋণী
জানায়েছি বারংবার, তাহারি বেড়ার প্রান্ত হতে।" (জন্মদিন)

মর্ত্তের সৌন্দর্য ও প্রেমের নিবিড় উপলব্ধি তাঁহাকে যে রহস্যের আভাস দান করিয়াছিল, মৃত্যুতে হয়ত সেই রহস্যকে তিনি অপরোক্ষ করিবেন।

জীবন ও জীবনাতীত, রূপ ও অরূপের মধ্যে এইরূপে একটি সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা বর্তমান কবিতাটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু পরিশেষে মর্ত্ত্যের প্রেমই যে কবির নিকট পরম আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

আর মৃত্যুতে তাহাকে কোন স্বরূপে ফিরিয়া লাভ করিতে পারা যাইবে না বলিয়া একটি পরিব্যাপ্ত বিষাদের সুরের মূর্ছনা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষ প্রাণের সম্পদ আর আহরণ করা যাইবে না। স্মৃতি-লোকে প্রাণের যে সম্পদ রহিয়াছে তাহাকেই তিনি ফিরিয়া ফিরিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিবেন। অরূপের পূজারতি নয়, জীবনের শেষ কয়েকটি দিন এমনি করিয়া তিনি প্রাণের বন্দনা করিয়া যাইবেন।

> "জীবনের স্মৃতি-দীপে আজিও দিতেছে যারা জ্যোতি
> সেই ক'টি বাতি দিয়ে রচিব তোমার সন্ধ্যারতি
> সপ্তর্ষির দৃষ্টির সম্মুখে।" (জন্মদিন)

মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমকে তিনি বলিয়াছেন, 'খেয়াতরী হারা'। অর্থাৎ মৃত্যুর কৃষ্ণসাগর পার হইয়া মর্ত্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমকে অমর্ত্ত্য-লোকে লইয়া যাইতে পারা যায় না। পশ্চাতে তাহাদের অসহায়ভাবে ফেলিয়া যাইতে হয়। জীবন ও জীবনাতীতের মধ্যে এই চিরন্তন যোগের লীলা? না ইহাতে উভয়ের যোগের রহস্য আরো নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে?

> "আর রবে পশ্চাতে আমার, নাগকেশরের চারা
> ফুল যার ধরে নাই, আর রবে খেয়াতরী হারা
> এ পারের ভালোবাসা—" (জন্মদিন)

রূপকে আশ্রয় করিয়া কবি রূপের অতীত লোকের যখন আভাস লাভ করিয়াছেন, তখনই কৃতার্থতায় তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। সেই অপূর্বতার ভিতর দিয়া কবি নিঃসংশয়ে বোধ করিয়াছেন জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা কোথায়। কিন্তু সেই বোধে নিঃসংশয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাহারই অলৌকিক প্রেরণায় যে শ্রেষ্ঠ কাব্যকলা তাহা কবির জীবনে আজও সত্য হয় নাই।

"শুধু মনে জানি বাজিল না বীণাতারে
পরমের সুরে চরমের গীতি কলা।" (পত্রোত্তর)

সেই 'প্রিয় অনির্বচনীয়'কে কত রূপে তিনি লাভ করিয়াছেন। তাহারই সুধাস্পর্শে তাঁহার জীবন অপরূপ মাধুর্যে আবিষ্ট হইয়াছে। সেই অমৃত রূপেরই তো প্রকাশ দেখা যায় প্রাণের বিচিত্র চঞ্চলতায়। বিশ্ব-প্রাণের এই অমৃত লীলায় যোগ দিয়া তাঁহার চেতনা বারংবার সকল সীমার অতীত লোকে প্রমাণ করিয়াছে।

জীবনে পরম পরিণাম চিহ্নিত না হইলেও, সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ বাণী-রূপের প্রকাশ আজও না ঘটিলেও কবি ইহা নিঃসংশয়ে জানেন, যে রূপের ভিতর দিয়া মৃত্যু পার হইয়া অরূপের অমৃতকে লাভ করিতে হয়। রূপকে আশ্রয় করিয়াই সত্তার ধীর বিকাশ ও পরিপূর্ণতা এবং এই পরিপূর্ণ জীবন আশ্রয় করিয়া পরিণামে অরূপের অমৃত লাভ করা।

দেশ-কালের উভয় তট পূর্ণ করিয়া প্রাণের প্রবাহ ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই ছুটিয়া চলার বেগে সংখ্যাতীত রূপ-বুদ্‌বুদ একবার জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

"ওই শুনি আমি চলেছে আকাশে বাঁধন-ছেঁড়ার রবে
নিখিল আত্মহারা;
ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্তার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা।" (পত্রোত্তর)

মুক্তি এই মহা প্রাণ-লীলার সহিত ব্যক্তি-প্রাণকে যুক্ত করিয়া দেওয়া।

"সেই ছন্দেই মুক্তি আমার পাব,
মৃত্যুর পথে মৃত্যু এড়ায়ে যাব।" (পত্রোত্তর)

সীমা যদি কেবলমাত্র সীমাই হইত তবে অসীমকে আমরা কোন কালেই জানিতে পারিতাম না, অসীমের অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সমার্থক হইয়া যাইত। সীমাও তত্ত্বত সীমা নহে। তাহার নিয়ত চঞ্চলতা, নিয়ত বিকাশ, ক্ষয়, প্রসার, বিদারণের ভিতর দিয়া সে অসীমের আনন্দ-রূপকেই প্রকাশ করিতেছে। চলিয়া চলিয়া ক্ষইয়া ক্ষইয়া এই বাণীকেই সে নিয়ত উচ্চারণ করিতেছে, 'আমি কোন-রূপে তাহাকে নিঃশেষ করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না; অফুরান তাহার ঐশ্বর্যের দান।' সেই কথাই তিনি বলিয়াছেন, 'সীমা থাকে থাক্, তবু তার সীমা নাই।" জীবন ও জগৎ তাই অনির্বচনীয়।

মৃত্যুতে কবির জীবনের আর সমস্ত কিছুর বিনাশ ঘটিবে, কিন্তু কবির জীবনে এমন বোধের জগৎ আছে, যাহাকে মৃত্যু স্পর্শ মাত্র করিতে পারিবে না। সীমাবোধের মৃত্যু ঘটে ; কিন্তু যে বোধ সকল সীমার অতীত তাহার মৃত্যু ঘটিবে কেমন করিয়া।

মর্ত্যের এই তৃণ-তরু-লতা এই নীল আকাশ নিম্নে আলো-ছায়ার বিচিত্র লীলা কবির মনকে কী অনির্বচনীয়তারই না আভাস দান করিয়াছে। তাহাদের বিচিত্র রূপ-রঙ্গ-রেখা কবি-প্রাণকে বারংবার বিশ্ব-প্রাণের সহিত একাত্ম করিয়া দিয়াছে।

'অসীম কাল', 'অসীম আকাশ' পরিপূর্ণ করিয়া প্রাণের যে অন্তহীন প্রবাহ, রূপের যে নিয়ত ভাঙ্গা ও গড়া, বিশ্বের বিচিত্র রূপের ভিতর দিয়া কবি পরিণামে সেই আদি প্রাণ-উৎসের সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

"অসীম আকাশে যে প্রাণ-কাঁপন অসীম কালের বুকে
নীচে অবিরাম, তাহারি বারতা শুনেছি ওদের মুখে।"
(যাবার মুখে)

সেই বাণী হইল, যে-এক প্রাণের দ্বারা বিশ্বের সকল প্রাণ সঞ্জীবিত সেই এক প্রাণ আমার মধ্যেও লীলায়িত। সেই অন্তহীন প্রাণের উপলব্ধিকেই কবি তাঁহার কাব্যে রূপায়িত করিয়াছেন।

"সে আমি সকল কালে
সে আমি সকল খানে,
প্রেমের পরশে সে অসীম আমি বেজে ওঠে মোর গানে।"
(যাবার মুখে)

কবির এই স্থূল সত্তার অতীতে একটি সূক্ষ্ম ভাবময় সত্তা আছে। মৃত্যুতে এই স্থূল দেহ-রূপের বিনাশ ঘটিবে, কিন্তু সেই অপর ভাবময় সত্তার বিনাশ ঘটিবে না। কবির সেই অপর ভাবময় সত্তা গড়িয়া উঠিয়াছে দিনে দিনে পলে পলে বাহিরের বিচিত্র রূপ-রঙ্গ-রেখা-গন্ধ-স্পর্শকে আশ্রয় করিয়া।

এই ভাবময় সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কবি অসীম বা অরূপের স্পর্শলাভ করিয়াছেন। এই সত্তার আধারে তিনি অমৃত পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন। মৃত্যুতে আর সব কিছুকে হারাইতে হয়, পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতে হয়, কিন্তু এই ভাব-সত্তা অটুট থাকে। অনন্ত যাত্রাপথে মানবাত্মার তাহাই একমাত্র সঙ্গী।

"সে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো।
যে দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—" (অমর্ত্য)

জগতের সমস্ত কিছু দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে, মুহূর্তে যাহাকে সত্তায় অস্তিত্ববান দেখিতেছি, পরমুহূর্তে তাহা অনস্তিত্ব হইয়া যাইতেছে। সমস্ত কিছু ফুরাইয়া হারাইয়া যাইতেছে, বিশীর্ণ, বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জীবনকে যখন এই দিক দিয়া দেখি, তখন জীবন ও জগৎ এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকা বলিয়া বোধ হয়।

কিন্তু জীবন ও জগৎকে অন্য দিক দিয়াও দেখা আছে এবং তাহাই সত্যকারের দেখা। রূপ এই নিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া অরূপের আনন্দকেই ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে। অরূপের মধ্যে যে আনন্দ-তত্ত্ব তাহা সীমা বা রূপ না থাকিলে কিছুতেই প্রকাশ লাভ করিতে পারিত না।

"অচঞ্চলের অমৃত বরিষে
চঞ্চলতার নাচে,
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি সে
নেই নেই ক'রে আছে।" (পলায়নী)

"ইহা চঞ্চল এবং ইহা অচঞ্চল। ইহা দূরে ইহা নিকটে। ইহা এই সমস্ত কিছুর মধ্যে, ইহা এই সমস্ত কিছুর বাহিরে।" (ঈশ উপনিষদ)

"এখানে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু সেখানে আছে। সেখানে যাহা কিছু আছে, সেই সমস্ত কিছু এখানেও আছে। যে এখানে বৈচিত্র্য দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করে।" (কঠ উপনিষদ)

"উহা পূর্ণ, ইহা পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ আসিয়াছে। পূর্ণ হইতে পূর্ণ লইলে পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে।" (ঈশ উপনিষদ)

কেবল রূপ বা মুহূর্ত সত্য হইলে কোন রূপ বা মুহূর্তকে আমরা আদৌ উপলব্ধি করিতে পারিতাম না। ইহাদের পশ্চাতে একটি স্থায়ী সম্বন্ধ-সূত্র নিশ্চয়ই আছে, যাহার সহিত যুক্ত করিয়া আমরা ক্ষণকে উপলব্ধি করিতে পারি। এই স্থায়ী সম্বন্ধসূত্রকেই বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় বলে পরিণামবাদ। অর্থাৎ

রূপের নিয়ত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া একটি ভাবের ধীর বিকাশ আছে। রূপের জগৎ তাই অর্থহীন প্রহেলিকা নয়।

রূপের জগতে এই অভিব্যক্তিকে আমরা স্বীকার করিতে চাই না। এক একটি সময় আসে যখন আমরা অতীতের সমস্ত চিন্তা, ভাবনা, বোধ ও উপলব্ধিকে সজ্জিত করিয়া তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। ইহাতে বিকাশধারা সাময়িকভাবে কতকটা ব্যাহত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু একটি সময়ে প্রাণ-প্রবাহে তাহা উৎক্ষিপ্ত হইয়া জীর্ণ তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যায়।

চিন্তা বা ভাব-জগৎকে অচল করিয়া তুলিবার এই যেমন একটি চেষ্টা আছে, বস্তুজগতেও শক্তিকে ক্রমাগত বিপুল করিয়া তুলিয়া প্রাণকে নিরুদ্ধ করিবার প্রয়াসও আছে। এই সম্পর্কে নানা প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত নানা আলোচনা করিয়াছেন। তাহার দুই-একটি অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ইতিহাসে বড়ো বড়ো জাতির মধ্যেও দেখতে পাই যে, তারা এক জায়গায় এসে বলে এইবার আমার পূর্ণতা হয়েছে, এইবার আমি সঞ্চয় করব, রক্ষা করব, বাঁধাবাঁধি হিসাব বরাদ্দ করব, এইবার আমি ভোগ করব; তখন আর সে নূতন তত্ত্বকে বিশ্বাস করে না—তখন তার এতদিনের পথের সম্বল ধর্মনীতিকে দুর্বলতা বলে উপহাস ও অপমান করতে থাকে, মনে করে এখন আর এর প্রয়োজন নেই—এখন আমি বলী, আমি জয়ী, আমি প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু প্রবাহের উপরে যে-লোক প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করতে চায় তার যে দশা হয়, সে কারও অগোচর নেই। তাকে ডুবতেই হয়। এমন কত জাতি ডুবে গেছে।" (পাওয়া)

"যে স্রোতের ঘূর্ণিপাকে এক এক জায়গায় এইসব বস্তুর পিণ্ডগুলোকে স্তূপাকার করে দিয়ে গেছে সেই স্রোতেরই অবিরত বেগে ঠেলে ঠেলে সমস্ত ভাসিয়ে নীল সমুদ্রে নিয়ে যাবে, পৃথিবীর বক্ষ সুস্থ হবে। পৃথিবীতে সৃষ্টির যে লীলা-শক্তি আছে সে যে নির্লোভ, সে নির্লোভ, সে নিরাসক্ত, সে অকৃপণ, সে কিছু জমতে দেয় না, কেননা জমার জঞ্জালে তার সৃষ্টির পথ আটকায়; সে-যে নিত্য নূতনের নিরন্তর প্রকাশের জন্যে তার অবকাশকে নির্মল করে রেখে দিতে চায়। লোভী মানুষ কোথা থেকে জঞ্জাল জড়ো ক'রে সেইগুলোকে আগলে রাখবার জন্য নিগড়বদ্ধ লক্ষ লক্ষ দাসকে দিয়ে প্রকাণ্ড সব ভাণ্ডার তৈরি করে তুলছে। সেই ধ্বংসশাপগ্রস্ত ভাণ্ডারের কারাগারে জড়বস্তুপুঞ্জের অন্ধকারে বাসা বেঁধে সঞ্চয়-গর্বের ঔদ্ধত্যে মহাকালকে কৃপণটা বিদ্রূপ করছে;

এ বিদ্রূপ মহাকাল কখনোই সইবে না। আকাশের উপর দিয়ে যেমন ধূলানিবিড় আঁধি ক্ষণকালের জন্যে সূর্যকে পরাভূত করে দিয়ে তারপরে নিজের দৌরাত্ম্যের কোনো চিহ্ন না রেখে চলে যায়, এ সব তেমনি করেই শূন্যের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাবে।" (জাপানযাত্রী)

বহুদূরের প্রজ্বলন্ত, মহাবেগে ধাবমান গ্রহ-নক্ষত্র সকলকে স্থির, স্নিগ্ধ এক-একটি জ্যোতির্বিন্দু বলিয়া বোধ হয়। যদি এই ব্যবধান না থাকিত তাহা হইলে তাহাদের ভয়ঙ্করতায়, বিপুলতায়, প্রচণ্ড গতিবেগ দৃষ্টে আমরা মুহূর্তে বিমূঢ় হইয়া যাইতাম।

এই বিপুল বিশ্বের যে অধিকাংশ নর-নারী অখ্যাত, অজ্ঞাত, জীবন যাপন করিয়া যুগে যুগে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করে; তাহাদের কতটুকু পরিচয় আমরা জানি। সে পরিচয় বহুদূরের যেমন দূরের আকাশের নক্ষত্রমালা। তাই তাহাদের জীবনকে শান্ত, অবিক্ষুব্ধ, একান্ত সহজ সরল অনাড়ম্বর বৈচিত্র্যবিহীন বলিয়া বোধ হয়।

তাহাদের হৃদয়-লোকের ঠিক মাঝখানটিতে স্থান লাভ করিতে পারিলে এক বিস্ময়কর নূতন জগৎ তাহার অন্তহীন রসবৈচিত্র্য লইয়া নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত।

আমরা দূর গ্রহ-নক্ষত্রের স্বরূপ জানিবার জন্য ব্যাকুল ;—

"কিন্তু এই-যে এই মুহূর্তে বেদন হোমানল
আলোড়িছে বিপুল চিত্ততল
বিশ্বধারায় দেশে দেশান্তরে
লক্ষ লক্ষ ঘরে—
আলোক তাহার, দহন তাহার, তাহার প্রদক্ষিণ
যে অদৃশ্য কেন্দ্র ঘিরে চলছে রাত্রিদিন
তাহা মর্ত্যজনের কাছে
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে।" (চলতি ছবি)

এই দূরের মানব-সমাজের হৃদয়-লোকের পরিচয় লাভের জন্য কবি অন্তরের মধ্যে নিয়তই একটি ব্যাকুলতা বোধ করিতেন। তাহা লাভ না করিতে পারিলে তাঁহার বিশ্ব-প্রেম যে পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে না। প্রেমের প্রবাহ এমনি করিয়া ধীর প্রসারতা লাভ করিয়া সমগ্র মানব-সমাজকে একদিন প্লাবিত করিয়া দিবে। দূরের মানুষ এইরূপে একদিন একান্ত নিকটের মানুষ হইয়া ধরা

দিবে। সমগ্র মানব-সমাজে যতদিন একটি মানুষও অজ্ঞানতায় নিমগ্ন থাকিবে, দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করিবে ততদিন কোন একজনও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না। এই নিঃসংশয় বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ছিল। রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-তত্ত্বে একক মুক্তি বলিয়া কিছু নাই।

দেশ-কালের ঊর্ধ্বে কোন্ পরম পুরুষের দৃষ্টি সম্মুখে অন্তহীন রূপের তরণী ভাসিয়া চলিয়াছে, কোন্ অনাদি কাল হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া। এই রূপের প্রবাহ তাঁহার চেতনায় যে বিচিত্র বোধের ঢেউ তোলে তাহাতেই তাঁহার আনন্দ। কী নির্মম নিরাসক্ত এই লীলা।

এমনি নিরাসক্তভাবে জীবন ও জগতের সমস্ত কিছুকে দেখা সম্ভব। এই যে আমার সৃষ্টি সম্মুখে ছায়া-ছবির মত সমস্ত কিছু ভাসিয়া চলিয়াছে, তাহাতে আমার অন্তরে আনন্দ-বেদনার যে বোধ সঞ্চারিত হইতেছে, এই বোধের সম্বন্ধ-সূত্রের ভিতর দিয়া যাহা গড়িয়া উঠে, তাহাকেই আমরা বলি জীবন। প্রত্যয় বা বোধ সমেত সমস্ত জীবনকে এমনি নিরাসক্তভাবে দেখা যে সম্ভব, তাহা কবি আপনার উপলব্ধির ভিতর দিয়াই বোধ করিয়াছেন।

> "যেতে যেতেই ছাড়া
> দিন-রাত্রির মনটাকে দেয় নাড়া।
> বেঁচে থাকার চলতি খেলা লাগছে ভালোই তবু॥"

(পালের নৌকা)

তাহার পর একদিন এই লীলার অবসান ঘটে। অর্থাৎ এই বিচিত্র প্রত্যয় এবং প্রত্যয়ের পরম্পরাপ্রসূত জীবনের অবসান ঘটে। যে-আমির যোগে এই প্রত্যয়ের উপলব্ধি, এই প্রত্যয়গুলিকে অন্তরে বাহিরে দেশ-কালের মধ্যে সজ্জিত করিয়া (দেশ-কালের বোধও একটি প্রত্যয়, তাও আমার চেতনার দ্বারা গড়িয়া তোলা) আমি অন্তরে বাহিরে এই নাম-রূপ, এই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, আমির অনস্তিত্বের সঙ্গে এই সমস্ত কিছু অনস্তিত্ব হইয়া যায়। জীবনের এই স্বরূপ। ইহা আমারই লীলা। ঈশ্বরের পরিপূর্ণ লীলা-তত্ত্বের সহিত মিলিত করিয়া জীবনের এই লীলাকেও দেখা সম্ভব; কারণ উভয়ের মধ্যে স্বরূপত কোন পার্থক্য নাই।

> "তাহার পরে রাত্রি আসে, দাঁড় টানা যায় থামি,
> কেউ কারেও দেখতে না পায় আঁধার তীর্থগামী।
> ভাঁটার স্রোতে ভাসে তরী, অকূলে হয় হারা —"

(পালের নৌকা)

পরিশেষে কবির এই জীবন-পর্যায়ের কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে কিছু আলোচনা করিতেছি।

জীবনের প্রান্তসীমায় কবি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনিতেছেন একান্ত নিকটে। সুদীর্ঘকালের প্রীতিবিজড়িত এই জগৎ ও সংসার হইতে কবির বিচ্ছেদের লগ্ন আসন্ন। এই বিরহভাবনা লইয়া তিনি পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইয়াছেন। ইহারই ছায়া পড়িয়া কবির শৈশব-স্মৃতির জগৎ আর এক রূপ লইয়া প্রতিভাত হইয়াছে। তাহা অত্যন্ত করুণ, তাহার ম্লান শান্ত শ্রীর অতি গভীরে রহিয়াছে এক সীমাহীন বেদনা-সমুদ্রের দূরশ্রুত গুঞ্জরণ। এই একটি ভাবনাই 'সেঁজুতি' 'আকাশ প্রদীপ', 'সানাই' প্রভৃতি কাব্যে ফিরিয়া ফিরিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

জীবন ও জগৎ আজও কবির নিকট অপার রহস্য ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বলিয়া বোধ হয়। আজও তাহাকে ঘিরিয়া কবির অন্তরে কী অপরিসীম ভালোবাসা। এই ভালোবাসা, রহস্য ও বিস্ময়কে কবি ফিরিয়া ফিরিয়া প্রকাশ করিতে কোনদিন ক্লান্তিবোধ করেন নাই। এই ভালোবাসার স্পর্শ লাগিয়াছে, কবির শৈশব-স্মৃতির জগতের উপর। জীবনের সুদুর্লভতার একটি দিকের প্রকাশ ঘটিয়াছে এইভাবে। সমস্ত তত্ত্বানুভূতির কথা বাদ দিলে জীবন ও জগতের এই স্বরূপ আবিষ্কারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্র-কাব্যের একটি মূল সুর শুনিতে পাওয়া যায়।

জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়নের দিন কবির জীবনে অবসিত বলিয়া কবি বাল্যস্মৃতিকে আশ্রয় করিয়াছেন। ইহা মানবজীবনের স্বাভাবিক চিরন্তন আসক্তির দিক বলিয়া রবীন্দ্র-কাব্যের কোন কোন সমালোচক মন্তব্য করিয়াছেন। এই জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে চমৎকৃতি থাকিতে পারে, কিন্তু কবির কাব্যের স্বরূপ বিশ্লেষণে ইহা সব কথা নয়।

কবির ধ্যানের দৃষ্টিতে একটি অপরিচিত জগতের আভাস ধীরে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহারই সহিত মিলাইয়া তাহারই আলোকসম্পাতে কবি আপনার সমগ্র অতীত জীবনকে এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া পাঠ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ যে শৈশব ও কৈশোরকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে ব্যক্তিগত জীবনের কয়েকটি খুঁটিনাটি ঘটনা বাদ দিলে তাহা সকল মানুষের চিরকালের আদর্শের কৈশোর। তাহা তাঁহার বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও স্বপ্ন লইয়া অত্যন্ত সমৃদ্ধ, মানবতায় সমুজ্জ্বল। অতীত স্মৃতি-লোকে নিষ্ক্রমণের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে

লাভ করিয়াছি, বিশেষ করিয়া তাঁহার 'পলাতকা', 'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' প্রভৃতি কাব্যের মধ্যে।

খাঁটি গীতি-কবিতার ইহাই বৈশিষ্ট্য। কবি ইতিপূর্বে যৌবনের যে সৌন্দর্য-কল্পনাকে রূপায়িত করিয়াছেন, তাহা চিরকালের মানুষের সৌন্দর্য ও কল্পনার জগৎ, তাহা চিরন্তন যৌবনের স্বপ্ন ও সাধ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা বিজড়িত। তাহার মধ্যে তাই প্রত্যেকটি তরুণ-তরুণী আপনারই শাশ্বত সত্তাকে উপলব্ধি করে।

স্মৃতিকে কল্পনার দোসর বলা হয় এই কারণে যে বাস্তব ও স্মৃতির মধ্যে যে ব্যবধান, তাহাকে পূর্ণ করিয়া তুলে কল্পনা। কল্পনার প্রসারতার ক্ষেত্রে স্মৃতি সকল সময় অবলম্বন না হইলে স্মৃতিও যে ইহার একটি আশ্রয় তাহা সত্য। জড়ের বন্ধন হইতে স্মৃতি তাই কল্পনাযোগে বস্তুকে মুক্তি দেয় রসলোকে।

আকাশ প্রদীপ

কবি যাহাদের প্রাণের সহিত প্রাণ মিশাইয়া এই জীবন ও জগৎকে অপরূপ সুন্দর বলিয়া বোধ করিয়াছেন, যাহাদের আশ্রয় করিয়া তাঁহার চিত্তে বিচিত্র ভাব-ভাবনার সঞ্চার হইয়াছিল, একে একে তাহারা জীবন রঙ্গভূমির নেপথ্যে কোথায় হারাইয়া গিয়াছে। কবির সে প্রেম আজ স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া আছে মাত্র। জীবনে যাহাদের কোন কালে কোন রূপে লাভ করিতে পারা যাইবে না, স্বপ্নে আমরা তাহাদের সহিত মিলিত হইতে চাই। সে মিলন আমাদের চেতনাকে পরিণামে সেই লোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়, যেখান হইতে কোন কিছু কখনই হারাইতে পারে না। লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে, প্রত্যক্ষ-লব্ধ প্রেম একের পর এক আনন্দ-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া পরিণামে চেতনাকে যে অন্তহীন আনন্দ-সাগরে বিলীন করিয়া দেয়, স্মৃতি-লোক আশ্রয় করিয়া আজ তাহা একের পর এক বেদনা-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া অন্তহীন ব্যথা-সমুদ্রে বিলীন হইয়াছে।

"অকারণে তাই এ প্রদীপ জ্বালাই আকাশ পানে
যেখান হতে স্বপ্ন নামে প্রাণে।" (আকাশ প্রদীপ)

রূপের জগতে নিরন্তর ভাঙ্গা-গড়া চলিতেছে, কিন্তু এই রূপের অতীতে চিরন্তন একটি idea বা ভাবের জগৎ আছে। এই আকারবিহীন ভাবই একবার আকার লাভ করিতেছে আবার তাহা ভাবমাত্র রূপে পর্যবসিত

হইতেছে। কবি বা শিল্পী বস্তু আশ্রয় করিয়া, বাণী, রঙ্গ ও রেখা আশ্রয় করিয়া সেই চিরন্তন কল্প বা ভাবলোককে রূপায়িত করেন বলিয়া বাহিরের আশ্রয় লুপ্ত হইলেও তাহা দেশ-কাল ব্যাপ্ত করিয়া চিরকাল বিরাজ করে। আকার বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ কল্পনা বা ভাবনা একান্তরূপে হারাইয়া যায় না, আবার কোন মানব-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া তাহা আত্মপ্রকাশ করে। কবির এই উপলব্ধির পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে বহুবার লাভ করিয়াছি, পরেও ইহার নানা পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"কালস্রোতে বস্তু মূর্তি ভেঙে ভেঙে পড়ে,
আপন দ্বিতীয় রূপ প্রাণ তাই ছায়া দিয়ে গড়ে

* * *

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে" (ভূমিকা)

অন্তহীন দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত যে প্রাণের প্রবাহ সেই প্রাণেরই এক-একটি বিচি-বিক্ষেপ এক-একটি রূপ, যাহা ফল রূপে, ফুল রূপে, পত্র রূপে প্রকাশিত। এই রূপ ব্যক্তির অন্তরে প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া পরিণামে ব্যক্তি-প্রাণকে বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

"সে রহস্য আমি করিতাম লাভ
যার আবির্ভাব
অলক্ষ্যে ব্যাপিয়া আছে সর্ব জলে স্থলে।" (স্কুল পালানে)

ব্যক্তির অন্তরে প্রাণের যে অনুভূতি বিচিত্র ভাবনা রূপে প্রকাশ লাভ করে সেই এক প্রাণ তৃণ-তরু-লতায় পুষ্পপত্র-রূপে প্রকাশিত। এক প্রাণ-স্পন্দনে মানুষ ও প্রকৃতি বিধৃত হইয়া আছে।

"যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রস রক্ত ধারে
মানব শিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।" (স্কুল পালানে)

আজ প্রাণ অবসানের দিনে, প্রাণের অনুভূতি-ক্ষীণ-জীবনে কবির সেই কালের কথাই বারংবার মনে পড়িয়া যায় যখন কবি-চেতনা সহজেই প্রকৃতির যে-কোন রূপ আশ্রয় করিয়া সকল রূপের আশ্রয়ভূত, সকল রূপ যাহার দ্বারা

সঞ্জীবিত আবার সকল রূপ যাহার মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, সেই নির্বিশেষ প্রাণ-চেতনায় একাকার হইয়া যাইত। আজ সেই প্রেরণা নাই, আছে সেই প্রেরণাশ্রয়ী বিচিত্র তত্ত্বোপলব্ধি।

বস্তু হইতে ভাব উপজাত হোক, অথবা ভাব হইতে বস্তুর উদ্ভব ঘটুক, রবীন্দ্র-দর্শনে ভাব ও বস্তুর চিরন্তন দ্বন্দ্ব নাই। একটি অপরটির অনিবার্য পরিণাম। বস্তুকে বিশ্লেষণ করিতে করিতে বিজ্ঞান আজ এমন একটি পরিণামে আসিয়াছে যেখানে কেবল শক্তির স্পন্দন। এই আকারহীন শক্তির স্পন্দন-সমুদ্রে এক-একটি ছন্দ-বিশিষ্ট হইয়া শক্তির যে প্রকাশ ঘটিতেছে, তাহাই এক-একটি বস্তু-রূপ। মানুষের চেতনাও একটি বিশিষ্ট শক্তি-স্পন্দন ছাড়া আর কিছু নয়। পরমাণুতে বিপরীত তড়িৎকণার মাঝে মাঝে যে ফাঁক, যে শূন্যতা, সেই শূন্যতা হইতেই যে তড়িতের বস্তুকণার উদ্ভব, আজ তাহাতেও সংশয় নাই। অন্তহীন শূন্যতার বক্ষে আকারহীন শক্তি-স্পন্দনের উদ্ভব, আবার এই শক্তি-স্পন্দন হইতে এই রূপ-বৈচিত্র্যের প্রকাশ। এই ক্রম-পরিণামের মধ্যে ছেদ বা বিরোধ কোথাও নাই।

রূপের স্পন্দন কবি-চেতনাকে কত বারবার সকল রূপের অতীত আকারহীন মহা স্পন্দ-সমুদ্রের সহিত যুক্ত করিয়া দেয়।

"কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যুষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।" (ধ্বনি)

নারীর সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে আশ্রয় করিয়া বালকের অন্তরে প্রথম যে কল্পনা-লোক যে ছায়া-প্রতিমার সৃষ্টি হয়, তাহার প্রসার যেমনই হোক, তাহা প্রত্যক্ষ প্রাণের অনুভূতির যোগে তখন সত্য হইয়া উঠিতে পারে না।

"বালকের প্রাণে
প্রথম সে নারী মন্ত্র আগমনী গানে
ছন্দের লাগাল দোল আধো জাগা কল্পনার শিহর দোলায়,
আঁধার-আলোর দ্বন্দ্বে যে প্রদোষে মনেরে ভোলায়,
সত্য-অসত্যের মাঝে লোপ করি সীমা
দেখা দেয় ছায়ার প্রতিমা।"

যত অসম্পূর্ণ ভাবে হোক-না-কেন, নারীর এই মাধুর্যই যে বালকের কল্প-

লোকের সকল দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় তাহাতে সংশয় নাই। সৌন্দর্যের অনুভূতি, প্রাণেরই অনুভূতি, যত ক্ষীণভাবেই হোক-না-কেন বালকের অন্তরেও তাহা অনুভূত হইবেই।

তাহার পর এই মানস-প্রতিমার সহিত মিশিয়াছে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য। প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া কবি এই মাধুর্য-লোকের আভাস লাভ করিয়াছেন। এই অতল মাধুরীর প্রকাশ ঘটিতেছে নারীর সৌন্দর্য এবং প্রকৃতির বিচিত্র রূপ আশ্রয় করিয়া প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের যে প্রকাশ সৌন্দর্য রূপে, নর-নারীর মধ্যে তাহারই প্রকাশ ঘটে প্রেমরূপে। ব্যক্তি-প্রাণের সহিত বিশ্ব-প্রাণের যোগ যতই গভীরতা ও প্রসারতা লাভ করিতে থাকে, পুরুষের অন্তরে সৌন্দর্য-লোক ঘিরিয়া ততই অনির্বচনীয়তার যেমন প্রকাশ ঘটিতে থাকে, তেমনি বিশ্বের সকল রূপ যে ওই রূপেরই বিচ্ছুরণ এমনি একপ্রকার বোধ জাগে।

অন্তরের এই সৌন্দর্য-লোকটিকে পুরুষের চেতনা নিঃশেষ করিয়া লাভ করিতে পারে না। পুরুষের চেতনা যতই প্রসারিত হোক-না-কেন, নারীর মাধুর্য-লোক তাহার সীমাকে সকল অবস্থায় ছাড়াইয়া যায়।

প্রেমে পুরুষ-চিত্তে প্রাণের যে উপলব্ধি, এই পরিণাম তাহারও পূর্বের। প্রেমে চেতনার এমন এক আশ্চর্য প্রসার ঘটে, যাহাতে এইখানে আসিয়া সৌন্দর্য-লোক পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

"অকস্মাৎ একদিন কাহার পরশ
রহস্যের তীব্রতায় দেহ মনে জাগাল হরষ ;
তাহারে শুধায়েছিনু অভিভূত মুহূর্তেই
তুমিই কি সেই,
আঁধারের কোন ঘাট হতে
এসেছ আলোতে।" (বধূ)

সৌন্দর্য-লোকে যে মানস অভিসার তাহার অন্ত কোথাও নেই। চেতনা যতই বিকাশ লাভ করে ততই নূতন নূতন মাধুর্য-দিগন্তের রস-লোকের একের পর এক দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। নিঃশেষ করিয়া যাহাকে লাভ করা যায় তাহা স-সীম, সৌন্দর্যের সীমা নাই বলিয়া তাহাকে কখনই কোন অবস্থায় ফুরাইয়া ফেলিতে পারা যায় না।

প্রেমের প্রথম সঞ্চারমুহূর্তে নারী-রূপ বেষ্টন করিয়া মাধুর্যের যে মায়া-লোক সৃজিত হইয়া যায়, তাহাকে বহুদূরের, অপ্রাপণীয় বলিয়া বোধ হয়।

'ওযে দূরে, ওযে বহুদূরে,
যত দূরে শিরীষের উর্ধ্ব শাখা হতে ধীরে,
ক্ষীণ গন্ধ নেমে আসে প্রাণের গভীরে।" (শ্যামা)

সেই মাধুর্য-লোকের ধ্যানে পুরুষের মন নিমগ্ন হইয়া যায়, সমগ্র সত্তাকে পরিপূর্ণ করিয়া লাবণ্যের ধারা বহিয়া যায়। তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া অন্তরের মধ্যে কত-না স্বপ্নের জাল বোনা হইতে থাকে, কিন্তু তাহাকে নিকটে লাভ করিতে পারা যায় না।

প্রেম যখন পরিচয়ের ভিতর দিয়া সত্য ও নিবিড় হয়, যখন নারী ও পুরুষ পরস্পরকে নিকটে লাভ করে তখনও এই অসম্পূর্ণতার বেদনা রহিয়া যায়। উভয়ের মাঝখানে ইহা যে অতল মাধুরীর ব্যবধান। তাহাকে পার হইয়া কেমন করিয়া পরস্পরকে লাভ করিতে পারা যাইবে। বাহুবেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়াও তাই কান্নার অন্ত নাই। যাহাকে লাভ করিবার জন্য কান্না তাহা তো বাহিরে কোথাও নাই, আছে অন্তরে, নিত্য নব রূপতার ভিতর দিয়া তাহা অনির্বচনীয়। প্রেম রূপের দুয়ারে অশ্রু বিসর্জন করিয়া রূপের অতীত সেই অরূপমাধুরীকে লাভ করিতে চায়।

"তবু ঘুচিল না
অসম্পূর্ণ চেনার বেদনা।
সুন্দরের দূরত্বের কখনো হয় না ক্ষয়,
কাছে পেয়ে না পাওয়ার দেয় অফুরন্ত পরিচয়।" (শ্যামা)

বিচ্ছেদে বা বিয়োগে এই রূপমাধুরী যখন হারাইয়া যায়, তখন মন অন্তরে তাহার মূর্তি গড়িয়া তাহাকে নিত্য অশ্রুজলে অভিষিক্ত করে। প্রেমে অন্তরে এই যে পাওয়া তাহা বাহিরের পাওয়া অপেক্ষাও বড়। বসন্তের রূপের ঐশ্বর্যের, চঞ্চলতার অবসানের পর ইহা চৈত্রের ফসল পরিণাম। মানবাত্মা মৃত্যুতে কি এই সুপরিণত প্রেম বক্ষে লইয়া যাইতে পারে? কোন স্বরূপে কোথাও তাহার দান অফুরান, তাহার দীপ্তি অনিঃশেষ হইয়া বিরাজ করে?

"পুলকে বিষাদে মেশা দিন পরে দিন
পশ্চিম দিগন্তে হয় লীন।
চৈত্রের আকাশতলে নীলিমার লাবণ্য ঘনাল,
আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই।" (শ্যামা)

নারী মর্তের সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। নারী-বন্দনার ভিতর দিয়া কবি মর্তের সৌন্দর্য ও প্রেমের বন্দনা করিয়াছেন। কবির কাব্যে একদিকে এই সৌন্দর্য ও ধ্যান, অন্যদিকে চিরন্তন ব্যাকুল জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসা সত্য প্রেমের উপলব্ধির সহিত অনিবার্যরূপে জাগিবেই। মৃত্যুতে আমি হারাইয়া যাইব, বাণীর সকল বন্ধন কালে একদিন জীর্ণ হইয়া যাইবে, কিন্তু আমার এমন প্রেম, এমন মাধুর্যে ভরিয়া উঠা, নিখিল বিশ্বময় বিতত হইয়া যাওয়া, সকল সীমার বোধকে ছাড়াইয়া যাওয়া, তাহাকে কি মর্ত কোন স্বরূপে চিরন্তন করিয়া রাখিবে না ?

"এই প্রশ্নই গানে গেঁথে
একলা বসে গাই,
বলার কথা আর কিছু মোর নাই।" (প্রশ্ন)

ব্যক্তি-প্রাণ বিশ্ব-প্রাণের যোগে অন্তরের মধ্যে সৌন্দর্য ও প্রেমের যে-লোক উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয় তাহাতে মানব-সত্তা এমন এক প্রাপ্তির আস্বাদে নিমগ্ন হইয়া যায় যাহার নিকট বহির্জীবনের আর সমস্ত কিছু তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়। পরিণত বয়সে কবি আর সব পাইয়াছেন, বিশ্বজোড়া খ্যাতি প্রতিপত্তি ও সম্মান, কিন্তু প্রাণের যোগে প্রাণ উপলব্ধি করিবার দিন সৌন্দর্য ও প্রেম উপলব্ধির দিন চিরকালের জন্য অবসান লাভ করিয়াছে।

"তরুণী সে ললাটে তার
কুঙ্কুমেরি ফোঁটা,
অলকেতে সদ্য অশোক ফোটা,
সামনে পদ্ম পাতা,
মাঝখানে তার চাঁপার মালা গাঁথা,
সন্ধ্যেবেলার বাতাস গন্ধে ভরে।
নিশ্বাসিয়া বললে কবি,
এই মালাটি নয় তো আমার তরে।" (বঞ্চিত)

আম্রবৃক্ষে প্রাণের সকল ঐশ্বর্যের প্রকাশ শীতে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, বাহিরের আপাত দীনতার অন্তরালে তাহা যেন একপ্রকার প্রচ্ছন্ন হাসি। তাহার পর যখন ফাগুন আসে তখন সেই প্রচ্ছন্ন হাসি অকস্মাৎ উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে বাহির হইয়া আসে, সুপ্ত ঐশ্বর্য নবীন পুষ্পে মুকুলে অফুরন্ত হইয়া উঠে।

কবির বাহিরের দীনতার অন্তরালে প্রাণের ঐশ্বর্য কি অমনি প্রচ্ছন্ন হইয়া

আছে মাত্র ? কোন একটি পরিণাম লাভে কোন এক নূতন লোকের সম্মুখীন হইলে নূতন কোন চেতনার স্পর্শে তাহা আবার অফুরান হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবে ? বর্তমানের দীনতা তাহারই এক লীলার ছল ?

"একটা যেন চাপা হাসি কিসের ছলে
অবাক শ্যামলতার তলে
শিকড় হ'তে শাখে শাখে
ব্যাপ্ত হতে থাকে।
অবশেষে খুশির দুয়ার হঠাৎ যাবে খুলে
মুকুলে মুকুলে।" (আমগাছ)

মহাশূন্য হইতে আলোর ধারা দুকুলপ্লাবী বন্যার মত যেমন অবিশ্রান্ত ধারায় নামিয়া আসিতে থাকে, আর তাহারই সজ্ঘাতে সজ্ঘাতে বিচিত্র রূপ-রঙ্গ-রেখা অন্তহীন হইয়া ফুটিয়া উঠে, তেমনি কোন্ অলক্ষ্য প্রদেশ হইতে প্রাণের স্রোত নিম্নে নামিয়া আসিতেছে আর তাহারই সজ্ঘর্ষণে চতুর্দিকে সংখ্যাতীত সত্তার মহান্ উল্লাস বিকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। সৃষ্টির কোন্ আদিম যুগে প্রাণের এই লীলা সুরু হইয়াছিল ?

প্রাণের এই মহা লীলায় মৃত্যু আছে, সত্তার বিনষ্টি আছে। কিন্তু এই মৃত্যু আছে বলিয়া মৃত্যুর শূন্যতা পূর্ণ করিয়া নিত্য নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটিতেছে। মৃত্যু যদি না থাকিত, রূপ যদি গতিহারা হইত তবে মুহূর্তে বস্তুর পাষাণ-ভিত্তিতলে প্রাণ মহান্ আর্তনাদ তুলিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া যাইত। রূপ নিয়ত পরিবর্তিত হইয়া বিনষ্ট হইয়াই তো অরূপের অনির্বচনীয়তাকে প্রকাশ করিতে পারে। রূপ স্থির থাকিলে অরূপের অনির্বচনীয়তা হারাইয়া মুহূর্তে কালো হইয়া যাইত।

"রন্ধ্রে রন্ধ্রে হাওয়া যেমন সুরে বাজায় বাঁশি,
কালের বাঁশি মৃত্যুরন্ধ্রে সেই মতো উচ্ছ্বাসি
উৎসারিছে প্রাণের ধারা।
সেই প্রাণেরে বাহন করি আনন্দের এই তত্ত্ব অন্তহারা
দিকে দিকে পাচ্ছে পরকাশ।
পদে পদে ছেদ আছে তার, নাই তবু তার নাশ।" (পাখির ভোজ)

বৃহৎ বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের মহাযজ্ঞে প্রাণী মাত্রেরই নিমন্ত্রণ। মাঝে মাঝে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে। প্রাণ প্রাণকে নির্মমভাবে হত্যা করিতে এক এক

সময় বিশ্বজোড়া গোপন কুটিল জাল বিস্তার করে। প্রাণের কান্না মহাশূন্যে নক্ষত্র-লোক পর্যন্তকে স্পন্দিত করে। এই দুর্যোগ আবার দূর হইয়া যায়, প্রাণের তখন সহজ আনন্দ রূপ ফুটিয়া উঠে।

পুরুষ নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া অন্তরে এক অপরূপ সৌন্দর্য-প্রতিমা গড়িয়া তুলে। পুরুষ এমনি করিয়া রূপ সৃষ্টি করিতে ভালোবাসে। আপনার সৃষ্ট রূপের ধ্যানে সে আপনি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যায়। আপনার প্রাণ দিয়া গড়া মূর্তির নিকট সে আপনার প্রাণ, ইহকাল পরকাল সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়া বসে। ইহাই পুরুষের ধর্ম। পুরুষের এই স্বধর্ম কেন, তাহার বুঝি কোন উত্তর নাই।

"পুরুষ যে রূপকার,
আপনার সৃষ্টি দিয়ে নিজেরে উদ্‌ভ্রান্ত করিবার
অপূর্ব উপকরণ
বিশ্বের রহস্যলোকে করে অন্বেষণ।
সেই রহস্যই নারী
নাম দিয়ে ভাব দিয়ে মনগড়া মূর্তি রচে তারি ;" (নামকরণ)

এই আনন্দের আকারহীন আবর্তনে ঘুরিতে ঘুরিতে কত উপমা কত তুলনা ভাসিয়া উঠিয়া ওই মানসী মূর্তিকে সুস্পষ্ট আকার দান করে। শিল্পীর সৃষ্টি-প্রেরণার মূলে রহিয়াছে সমগ্র বিস্‌ষ্টির আনন্দ-তত্ত্ব।

তাঁহারই অকারণ আনন্দের টানে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্ মহা শূন্যলোক হইতে এই অন্তহীন রূপ-লোক প্রস্ফুটিত গোলাপের মত পূর্ণ সুষমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার পর হইতে এই রূপ-লোককে তিনি অন্তহীন কাল ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। তাঁহার এক লীলা, এই রূপ-সৃষ্টি অহেতুক, তাই মায়া। পুরুষের সৃষ্টিও তেমনি অহেতুক, মায়া।

"এই যারে মায়া রথে পুরুষের চিত্ত ডেকে আনে
সে কি নিজে সত্য করে জানে
সত্য মিথ্যা আপনার,
কোথা আসে মন্ত্র এই সাধনার।" (নামকরণ)

সকল রূপের অতীত যে স্পন্দন-সমুদ্রে নিত্য নব রূপের প্রকাশ ঘটিতেছে, তাহারই যোগে পুরুষের চেতনায় নিত্য নব রূপের, ছন্দ ও ধ্বনির প্রকাশ ঘটে। সৃষ্টির তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য কোন ব্যাখ্যা নাই। আমরা ব্যাখ্যা করি কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য।

আমরা তাহাকেই মন্ত্র বলি যাহার ধ্বনি মাত্র (গৌণভাবে শব্দ ও অর্থকে আশ্রয় করিলেও, কোথাও এই অর্থের আদৌ কোন আশ্রয় নাই) পরিণামে চেতনাকে বুদ্ধির অতীত লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়। শ্রেষ্ঠ কাব্য-কৃতিও মন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত। তাহার সমগ্র বাণী-রূপটাই কবির সচেতন মানস-ক্রিয়ার বহির্ভূত বিষয়।

সীমা ও অসীমের যোগের সম্পর্ক নিরূপণ বিষয়ে তাঁহার একটি নিঃসংশয় অধ্যাত্ম উপলব্ধি ছিল। এই মূল উপলব্ধিকেই তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া নানা ভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই মূল উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার সামগ্রিক জীবন-দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রেই ভারতীয় অধ্যাত্ম সাধনা তাঁহার মধ্যে পূর্ণ পরিণাম লাভ করিয়াছে। এই সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা নানা প্রসঙ্গে নানা ভাবে করিয়াছি। 'তর্ক' কবিতাটির মধ্যে সেই একই ভাবের পরিচয় লাভ করা যায়।

"পূর্ণতা আপন কেন্দ্রে স্তব্ধ হয়ে থাকে,
কারেও কোথাও নাহি ডাকে।
অপূর্ণের সাথে দ্বন্দ্বে চাঞ্চল্যের শক্তি দেয় তারে,
রসে রূপে বিচিত্র আকারে।" (তর্ক)

শুধু অরূপ বা অসীম বন্ধ্যা আপনার ঐশ্বর্যের পরিচয়-হারা। এখানে সৃষ্টি নাই, রূপ নাই, রস নাই। তাহা তাই একপ্রকার ভয়ঙ্কর শূন্য পরিণাম। অপূর্ণ অর্থাৎ সীমার সহিত (এইখানে মন বা দেশ-কালের তত্ত্ব আসিয়াছে) সজ্ঘাতে রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ অন্তহীন হইয়া পড়িয়াছে।

এক জাতীয় বিশিষ্ট সাধনায় এই সীমাকে মায়া বলিয়া পরিহার করিয়া কেবল মাত্র অসীম বা অরূপকে লাভ করিবার চেষ্টা লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ইহাকে শূন্যতার সাধনা বলিয়াছেন।

"এরে নাম দিয়ে মোহ
যে করে বিদ্রোহ
এড়ায়ে নদীর টান সে চাহে নদীরে
পড়ে থাকে তীরে।" (তর্ক)

অরূপের আস্বাদ লাভ করিতে হয় একমাত্র রূপকে আশ্রয় করিয়া রূপের ভিতর দিয়া। মৃত্যুর ভিতর দিয়াই অমৃত লাভ করিতে হয়। কোন একটিকে পরিহার করিলে পূর্ণতা লাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

"পুরুষ যে ভাবের বিলাসী,
মোহ-তরী বেয়ে তাই সুধা-সাগরের প্রান্তে আসি
আভাসে দেখিতে পায় পরপারে অরূপের মায়া
অসীমের ছায়া।" (তর্ক)

সীমা বা রূপকে আশ্রয় করিয়া এই যে সাধনা এই বিশ্বে তাহার একমাত্র এবং প্রধান উপকরণ নারী। নারী-রূপ আশ্রয় করিয়া পুরুষের অন্তরে যে সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে, বাহিরে তাহার কতটুকু পরিচয় আছে। অন্তরের এই সৌন্দর্য-লোক আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনা-মাধুর্য ও রস-লোকের গভীর হইতে গভীরে যাত্রা করে, পরিণামে ওই রূপ আশ্রয় করিয়া অসীমের আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায়।

অন্তরে এই মোহ সঞ্চারিত করিয়া দিবার উপকরণ বিশ্বের সর্বত্রই ঈশ্বর বিস্তার করিয়া দিয়াছেন। যে মন এই মোহে বিস্মৃত হয় না, 'সেইখানে সৃষ্টি-কর্তা বিধাতার হার'। বস্তুত প্রেম আর মোহ, সীমা ও অসীম দুই বিপরীত বা বিরুদ্ধ তত্ত্ব নয়।

'নারীর সূক্ষ্ম শিল্প কারুময়ী কায়া'র সহিত বিধাতা কায়ার অতীত একটি মায়া বিজড়িত করিয়া দিয়াছেন। তাহা প্রত্যক্ষ লাভের বহির্ভূত সামগ্রী। তাহার অপরূপ রূপ ধরা পড়ে একমাত্র ধ্যানে হৃদয়ের আলোকে। এই রূপকে প্রকাশ করিতে চাহিয়া শিল্পীর শিল্প, কবির কাব্য। আর তাহাকে নিঃশেষ করিয়া লাভ করিতে প্রকাশ্ করিতে পারা যায় না বলিয়া সকল সৃষ্টি-রূপের মধ্যে একটি বিষাদ বিজড়িত হইয়া যায়। এই মায়া আছে বলিয়া নারী-রূপের মধ্যে মাধুর্যের অন্ত নাই। ইহাকে নিশ্চিতরূপে লাভ করিবার জন্য যে পুরুষ নারীকে আপনার ভোগের আয়ত্তের মধ্যে লাভ করিতে চায়, সে নারীকে যেমন আপনাকেও তেমনি সার্থকতা হইতে বঞ্চিত করে।

নারী-রূপ এবং বিশ্বের সকল সৌন্দর্যের মধ্যে এই মোহ বিজড়িত হইয়া আছে। পুরুষকে এই মোহ আশ্রয় করিয়া কামনার অতীত লোকে বিচিত্র সৃষ্টিরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে হয়। ইহার ভিতর দিয়াই এই অরূপ বা অসীমের আস্বাদ লাভ ঘটে। পূর্ণতাকে লাভ করিবার আর কোন উপায় নাই।

যুগে যুগে মানুষের কত প্রবল প্রতাপ, কত মহৎ কীর্তি ধূলায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের চিহ্ন নাই। সেই সঙ্গে মানুষের সৃষ্ট কত শিল্পরূপ কত কাব্যও হারাইয়া গিয়াছে। মহাকালের বক্ষে কবির অতুল কাব্যও একদিন

রেখামাত্র পাত না করিয়া শূন্যে হারাইয়া যাইবে। মানুষের সৃষ্টির প্রতি মহাকাল এমনি নির্মম উদাসীন। মানুষের সকল সৃষ্টি কালে এমনি জীর্ণ হইয়া হারাইয়া যায়, কিন্তু বিশ্ব-প্রাণের সহিত যুক্ত বলিয়া এই সামান্য তৃণ-তরু-লতা চিরকাল অম্লান হইয়া বিরাজ করে।

কবির সকল সৃষ্টি-রূপ যদি কালে বিনষ্ট হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি, মর্তের যে-প্রেম তাঁহার কণ্ঠে সুর জাগাইয়া তুলিয়াছে, সে প্রেমের প্রকাশ ক্ষণিক হইলেও তাহার বক্ষে অমৃত লুকান আছে। তাহা তাই সকল ক্ষণকালকে অতিক্রম করিয়া চিরকাল বিরাজ করিবে।

"—প্রকৃতির ঔদাসীন্য অচল রয়েছে
অসংখ্য বর্ষকালের চূড়ায়,
তারই উপরে একবারমাত্র পা ফেলে চলে যাবে
আমার শুনায়নী,
ভোরবেলার শুকতারা।
সেই ক্ষণিকের কাছে হার মানবে বিরাট কালের বৈরাগ্য।"
(ময়ূরের দৃষ্টি)

প্রকৃতি-লোকের মধ্যে তো কোথাও কোন পরিবর্তন হয় না। শৈশবে প্রভাতে ও সন্ধ্যায় যে শুকতারা বা সন্ধ্যাতারাকে আকাশে নিত্যদিন প্রত্যক্ষ করিয়াছি, সেই তারা আকাশে আজো তেমনি করিয়া কিরণ দেয়। অথচ আমাদের জীবনে কী পরিবর্তন না ঘটিয়া যায়। প্রভাতে প্রকৃতি তাহার সহস্র ঐশ্বর্য দিয়া আমাদের জীবনকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলে, আবার জীবন-সায়াহ্নে একে একে সেই সকল ঐশ্বর্যকে সে ছিনাইয়া লইয়া জীবনকে নিঃস্ব করিয়া দেয়। পরিণত বয়সে বঞ্চিত জীবনে থাকে তাই অতীত জীবনের বিচিত্র স্মৃতি, কত স্নেহ, কত প্রেম, কত মুগ্ধতা, কত সৌন্দর্য ও মাধুর্য, করুণায় কোমল।

ব্যক্তিগতভাবে মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু মানুষ কল্পনার যোগে এমন কিছু সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে যাহা দেশ-কালে পরিব্যাপ্ত। এমনি করিয়া কল্পনার একটি ধারা যুগ হইতে যুগে সমৃদ্ধি লাভ করিয়া চলিয়াছে। সকল কালের সকল দেশের কবি ও শিল্পীরা সেই পরিব্যাপ্ত কল্পনা-সমুদ্রে আপনার এক-একটি ক্ষীণ স্রোতধারা যুক্ত করিয়া দিতেছে। আপনার সৃষ্টির মাধ্যমে কল্পনার যোগে

যে মানুষ এই দেশকাল পরিব্যাপ্ত কল্পনার সহিত যুক্ত বোধ করিতে পারে, সেই সার্থক।

সুবৃহৎ বনস্পতি যেমন তাহার সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জালকে মাটিতে, আকাশে, বাতাসে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া দেয়, লক্ষ লক্ষ পত্রের পাত্র ভরিয়া তেজ গ্রহণ করে; কবিও তেমনি কল্পনায় ভর করিয়া জলে স্থলে আকাশে, বহুদূর দেশে কালে আপনার চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দেন। উভয় সত্তার পশ্চাতে রহিয়াছে বিশ্ব-প্রাণের নিগূঢ় যোগ। প্রকৃতি-লোকের তুচ্ছতম সত্তাও কবি-চেতনাকে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-চেতনার সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে।

"সেই মৌনী বনস্পতি
সুবৃহৎ আলস্যের ছদ্মবেশে অলক্ষিত গতি
সূক্ষ্ম সম্বন্ধের জাল প্রসারিছে নিত্যই আকাশে,
মাটিতে বাতাসে,
লক্ষ লক্ষ পল্লবের পাত্র লয়ে
তেজের ভোজের পানালয়ে।
বিনাকাজে আমিও তেমনি বসে থাকি
ছায়ায় একাকী,
আলস্যের উৎস হতে
চৈতন্যের বিবিধ দিগ্বাহী স্রোতে
আমার সম্বন্ধ চরাচরে
বিস্তারিছে অগোচরে
কল্পনার সূত্রে বোনা জালে
দূর দেশে দূর কালে।" (স্কুল পালানে)

কিন্তু আজ ফিরিয়া ফিরিয়া কবির শৈশবের দিনগুলির কথা মনে পড়িয়া যায় কেন? ইহাতেই বোধ করিতে পারা যায় বিশ্ব-সত্তার সহিত কবি-চেতনার যোগ ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।

রঙ ও রেখা দিয়া আঁকা কোন ছবি নয়, ছবি যে কয়টি আছে তাহা ধ্বনি দিয়া ফুটাইয়া তোলা। রঙ যেটুকু আছে তাহা কেবল সাদা ও কালো। বিশ্ব-সত্তার যে স্পর্শ তিনি এখানে লাভ করিয়াছেন, তাহা সূক্ষ্ম বিচিত্র ধ্বনির সহায়তায়। বিশ্ব-সত্তাকে তখন তিনি রূপের ভিতর দিয়া অনুভব করিয়াছেন,

তখন তাহা অখণ্ড রূপের তত্ত্বরূপে অনুভূত হইয়াছে, তখন তিনি ভাবের ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তখন তাহা অখণ্ড ভাব রূপে, আবার তখন তিনি ধ্বনির ভিতর দিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তখন তাহা অখণ্ড সঙ্গীত রূপে অনুভূত হইয়াছে। এইরূপে একই সত্তা কখন ভাব, কখন রূপ, কখন ধ্বনি রূপে কবি-চেতনায় মুহুর্মুহু পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে।

কবি-চেতনা আজ এমন একটি সমুন্নতির স্তরে উত্তীর্ণ হইয়াছে যেখান হইতে তিনি অনায়াসে ক্ষণে ক্ষণে বিশ্ব-সত্তার লোকে পৌঁছাইয়া যাইতেন। কবির জীবনে ব্যক্তি ও বিশ্বের ব্যবধান ক্রমেই স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে।

দুই-একটি চিত্রের পরিচয় দিই—

"এক ঝাঁক পাতিহাঁস
টলোমলো গতি নিয়ে উচ্চ কলভাষ
পুকুরে পড়িত ভেসে।
বটগাছ হতে বাঁকা রৌদ্ররশ্মি এসে
তাদের সাঁতার-কাটা জলে
সবুজ ছায়ার তলে
চিকন সাপের মতো পাশে পাশে মিলি
খেলাত আলোর কিলিবিলি।" (ধ্বনি)

একটি সুস্পষ্ট রূপ, কেবল সাদা ও কালোর রেখার টানে ফুটাইয়া তোলা। তাহাতে মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে এক ঝাঁক পাতিহাঁসের উচ্চকলধ্বনি। তাহা আমাদের শ্রুতিমূলে আসিয়া পৌঁছায়।

এই ধরনের আর একটি চিত্র—

"দক্ষিণে গঙ্গার ঘাট থেকে
গম্ভীর মন্দ্রিত হাঁক হেঁকে
বাষ্পশ্বাসী সমুদ্র খেয়ার ডিঙা
বাজাইত শিঙা,
রৌদ্রের প্রান্তর বহি
ছুটে যেত দিগন্তে শব্দের অশ্বারোহী" (ধ্বনি)

এই চিত্রটিরও মুখ্যদিক ধ্বনি। যে স্টীমারের গুরুগম্ভীর-ধ্বনি চতুর্দিক ব্যাপ্ত নিস্তব্ধতাকে ছিন্ন করিয়া দূর হইতে দূরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া মিলাইয়া যাইতেছে তাহাতে তিনি একান্ত শ্রুতিগোচর করিয়া তুলিয়াছেন।

কোন রূপের আভাস নয়, এক বিলীয়মান ধ্বনির আবেশ আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে অনুরণিত হইতে থাকে।

মৃত্যুর ছিদ্রপথ দিয়া নিয়ত নূতন সত্তার প্রকাশ ঘটিতেছে। এই বিশ্ব তাই চির-পুরাতন হইয়াও চির-নবীন। সব জড়াইয়া প্রাণের কী অপার আনন্দ নিত্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।

মানব-সংসারে মাঝে মাঝে দুর্যোগ ঘনাইয়া আসে। প্রাণ তখন প্রাণকে হত্যা করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে। তাহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যত্বের কী বিচিত্র লাঞ্ছনা। আবার সংসারে শান্তি ফিরিয়া আসে। দিকে দিকে আবার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে। চিরন্তন কল্যাণের বোধ সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

"প্রাণোৎসবের অতিথিরা আবার পাশাপাশি
মহাকালের প্রাঙ্গণেতে নৃত্য করে আসি।" (পাখির ভোজ)

দুর্যোগের দিনে মানব-সংসার তখন আপনার চিরন্তন মূল্যবোধকে বিস্মৃত হয়, তখন অসত্য সত্যের স্থায়ী সিংহাসনকে অধিকার করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে, তখন মহাপুরুষগণ, মহাকবিগণ অবতীর্ণ হন বিভ্রান্ত মানব-সংসারের সম্মুখে চিরন্তন কল্যাণের আদর্শ তুলিয়া ধরিবার জন্য। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি-কর্ম এমনি এক চিরন্তন মঙ্গলের আদর্শ বহন করিতেছে। ব্যক্তিগতভাবে কত পরাভূত মনুষ্যত্ব যে তাঁহার রচনাবোধের ভিতর দিয়া, তাহার সান্নিধ্যলাভের ভিতর দিয়া মনুষ্যত্বকে ফিরিয়া লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আপনার জীবনের এই মহৎ দায়িত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন।

"পরাভূত হতভাগ্য মোর দুয়ারের কাছে
ক্ষত অঙ্গে শরণ মাগিয়াছে। (পাখির ভোজ)

সত্যের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার অনুরূপ একটি ভাবকে অন্তরে সঞ্চারিত করিয়া নেয়, সেই ভাব অসহনীয় তীব্রতার ভিতর দিয়া আবার আপনার অনুরূপ কতকগুলি রূপ-কল্পনাকে আকর্ষণ করিয়া আনে। এইরূপে সমগ্র কাব্য পরিণামে অরূপের রূপক হইয়া উঠে।

'সময়হারা' কবিতাটির মধ্যে কয়েকটি সার্থক রূপ-কল্পনা আছে বটে, কিন্তু সেগুলি একটি ভাব-সূত্রে বিধৃত হইয়া অখণ্ডতা লাভ করিতে পারে নাই। এই রূপ-কল্পনাগুলির যে মূল্য তাহা বিচ্ছিন্ন, একক। সমগ্র কাব্যান্তর্গত হইয়া

সামগ্রিকভাবে তাহার যে এক গভীরতর মূল্য আছে তাহার প্রকাশ এক্ষেত্রে ঘটে নাই।

যেমন

"পানা-পুকুর, ভাঙন-ধরা ঘাট,
একলা এক চালতাগাছের চলে ছায়ার নাট।"
(সময়হারা)

কিংবা

ঝিল্লিরবের তানপুরা-তান স্তব্ধতা-সংগীতে
লেগেই আছে একঘেয়ে সুর দিতে।"
(সময়হারা)

এই ধরনের রূপ-কল্পনাগুলিকে ইংরেজিতে বলে 'broken image'। রূপ-সৃষ্টির প্রেরণা কবির জীবনে যে ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসিতেছে সে সম্পর্কে কবি স্বয়ং সচেতন। এই জাতীয় খেয়াল গড়ার যে দার্শনিক মূল্য তিনি নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করুন-না-কেন, তাহাতে যে প্রাণের শূন্যতা পূর্ণ হয় না, তাহা স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়।

তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন—

"আগে ছিল সাট্‌ন্ বীজে বিলিতি মৌসুমী
এখন মরুভূমি।"

কিংবা

"রবিশস্যে ভরা ছিল, শূন্য এখন মরাই।"

ইহাও অবশ্য সত্য যে এই জাতীয় কবিতার মধ্যে কবি-কল্পনা পরিচিত জগতের বাহিরে এক সৌন্দর্যময় নূতন জগৎ আবিষ্কার করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছে।

স্বপ্নের অবহেলিত সমৃদ্ধি হইতে কবি তাঁহার প্রয়োজনীয় রূপ-কল্পনা আকর্ষণ করেন। যুক্তির জগতের বাহিরে বিশৃঙ্খলার এই জগতের মধ্যে ডুব দিয়া তিনি তাহার মধ্য হইতে কতকগুলি চিত্র-রূপ, কতকগুলি ভাবনা সংগ্রহ করিয়া বাস্তব বিষয়ের সহিত সঙ্গত করিয়া সেইগুলিকে পুনর্বিন্যস্ত করেন। যাহা অপ্রয়োজনীয়, যাহা অবহেলিত তিনি কখন কখন সেগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

কবি আপনার অভিজ্ঞতার জগৎ হইতে যে কেবল এই ভাবে চিন্তা এবং

রূপ কল্পনা সংগ্রহ করেন তাহা নয়, সেই সঙ্গে তিনি এই সকল বিষয়বস্তুর সহিত একই উৎস হইতে সংগৃহীত অনেক সূক্ষ্ম অলঙ্কার যুক্ত করেন। বুদ্ধি যে ভাবাবেগকে পরিহার করে, কবিরা প্রথমে সেই ভাবাবেগকে আশ্রয় করেন। বহুদূর বিচ্ছিন্ন চিন্তাসমূহকে সংযোগসূত্রে আবদ্ধ করে ভাবাবেগ। এই ভাবাবেগের আবর্তে রূপ-বিরূপ মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়।

কবিরা এইভাবে যে রূপের জগৎ গড়িয়া তুলেন তাহা আমাদের প্রকৃতির মূল প্রবণতার সহিত অধিকতর সঙ্গতিযুক্ত এবং আত্মার চরম সম্ভাবনার নিকটতর সত্য।

চৈত্র-পূর্ণিমার সৌন্দর্যের মধ্যে আছে ফাল্গুনের লীলা-চঞ্চলতার অবসানে অপ্রমত্ত গম্ভীর মহিমা। বৈশাখের মধ্যে যে নিরাসক্ত তপঃশুচিতা চৈত্র-পূর্ণিমার মধ্যে আছে তাহারই আভাস। এই রূপটিই তো চৈত্র-প্রকৃতির সমস্ত কিছুর মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। আম্রবৃক্ষের মুকুলের দিন শেষ হইয়া গিয়াছে, এখন তাহার শাখা-প্রশাখা পরিণত ফলভারে আনত। প্রকৃতির চরম নির্দেশ তো ওই ফল পরিণামলাভের মধ্যে। প্রকৃতির মধ্যে ফুলের ঐশ্বর্য আজ আর নাই। তাহারই ক্ষীণ আভাস বাতাসকে আজও ক্লান্ত করুণ করিয়া তুলিয়াছে। চৈত্র-পূর্ণিমার মধ্যে তাহারই করুণ ক্লান্ত শ্রী। শুকতারার মধ্যে যেমন উদয় ও অস্ত একত্র বিজড়িত হইয়া আছে, চৈত্র-পূর্ণিমার মধ্যে তেমনি একদিকে আছে ফাল্গুনের স্মৃতি, অন্যদিকে আছে তাপদগ্ধ বৈশাখের আসন্ন মূর্ছনা। ভাবী পরিণামটিকে লাভ করিবার জন্য তাহা আমন্থর।

সৌন্দর্যের একটি স্বরূপ ব্যাখ্যা আমরা এমনি করিয়া করিতে পারি। কিন্তু যে কোন সৌন্দর্য-সত্তার মত, সৌন্দর্য-সৃষ্টি মাত্রেই নিষ্কারণ, অহেতুক। প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় কোন অজ্ঞাত রহস্যে যেমন ফুল ফুটে, তাহার যেমন কোন অর্থ নাই, তেমনি প্রকৃতি-লোকের নিগূঢ় প্রেরণা মানব শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া যে বিচিত্র সৌন্দর্য-কল্পনা রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহাও তেমনি নিরর্থক। নারী-সত্তাকে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব-প্রাণ পুরুষের চেতনায় প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই প্রাণের নিগূঢ় প্রেরণায় পুরুষের রূপ সৃষ্টি আর বিরাম মানে না।

নব জাতক

নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের একদিকে অন্তহীন সৃষ্টি, রূপের নিত্য প্রকাশ, অন্যদিকে সৃষ্টির কী নির্মম অপচয় ও বিনষ্টি।: কেন মহাকাল নিত্যকাল ধরিয়া এমনি

এক হাতে পরিপূর্ণ করিয়া দান করিতেছেন, আবার অন্য হাতে সব অপহরণ করিয়া লইতেছেন? তাঁহার লীলার অর্থ কি? এই জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথ কবি-জীবনের একেবারে প্রারম্ভ হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বারংবার করিয়াছেন, বারংবার মহামৌনতার মধ্যে তাঁহার এই জিজ্ঞাসা কোন উত্তর লাভ না করিতে পারিয়া মহাশূন্যে কেবল প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিয়াছে।

"—একি মহাকাল কল্প কল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান ক'রে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন।" (কেন)

এই লীলা কেবল বাহিরে রূপের জগতে নয়, মানুষের মনোরাজ্যেও অনুষ্ঠিত দেখিতে পাই। নিখিল বিশ্ব-চিত্ত-লোকে কত ভাবনার, কত আশা-আকাঙ্ক্ষার, কত কল্পনার বুদ্বুদ নিয়ত জাগিয়া উঠিতেছে, আবার বিলীন হইয়া যাইতেছে। বাহিরে কত শিল্প-রূপ, কত সৌধ, কত মহানগর বারংবার গড়িয়া উঠিয়া আবার ধূলায় হারাইয়া গিয়াছে।

"মানুষের চিত্ত নিয়ে সারাবেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূত খেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন।" (কেন)

প্রভাত সঙ্গীতের 'প্রতিধ্বনি' কবিতার মধ্যে কবি আপনার যে উপলব্ধির পরিচয় বাণী-বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারই একটি ধারা পরবর্তী কাব্যগুলির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বীথিকার 'অতীতের ছায়া' কবিতাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান কবিতাটির মধ্যে কবি তাঁহার প্রারম্ভিক জীবনের সেই উপলব্ধির উল্লেখ করিয়াছেন।

অরণ্য ও সমুদ্রের নিয়ত ক্ষুব্ধ গর্জন, ঝটিকার ভয়ঙ্কর স্বনন শব্দ, দিবস-রাত্রি মানব-হৃদয় ঘিরিয়া বোধের বিচিত্র সঙ্ঘাত, ঋতুতে ঋতুতে মানবের নিত্য বিচিত্র প্রয়াস, বিচিত্র কলরোল, বিশ্বের বিচিত্র ধ্বনি, এই সমস্ত কিছু বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে কোথাও রহিয়া যাইতেছে। সেই কেন্দ্রস্থল হইতে তাহা আবার প্রতিধ্বনি রূপে, নূতন ধ্বনি ও সৃষ্টি রূপে নিয়তই প্রকাশ লাভ করিতেছে। কবির সত্তা তেমনি এক প্রতিধ্বনির প্রকাশ।

"বহু যুগ যুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথ হারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।" (কেন)

কবির মৃত্যুতে এই কায়-বদ্ধ বাণী আবার রূপ-শূন্য অবস্থায় নক্ষত্রে নক্ষত্রে প্রতিধ্বনিত হইয়া ফিরিয়া বেড়াইবে। কত কল্প-কল্পান্ত কাল ধরিয়া তাঁহার রূপ-হারা এই যাত্রা চলিবে কে জানে। আর সেই যাত্রাপথে এই জীবনের সকল ব্যথার সঞ্চয় ধীরে ধীরে নিঃশেষিত হইয়া যাইবে? কে এই রূপের পাত্র পূর্ণ করিয়া বোধের বিচিত্র রস আস্বাদ করে, আবার আস্বাদশেষে নির্মমভাবে ভাঙ্গিয়া দেয়? কেন এমন পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া, কেন আবার এমন নিঃশেষ করিয়া নেওয়া?

"আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার।
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙ্গা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু কেন।" (কেন)

মানুষ কেবল এই সৃষ্টির রহস্যই ভেদ করিতে চান নাই, যখন কোন সৃষ্টি ছিল না, তখনকার সেই আদি অবস্থার রহস্যও ভেদ করিতে চায়। মানব-মনের সঙ্গে বিশ্ব-মানব-মনের যোগের রহস্যই শুধু ভেদ করা নয়, অনন্ত কোটি বিশ্ব-মন যে-সত্তায় ('মানুষের ধর্মে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে পরম জাগতিক সত্তা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন) কেবল বুদ্বুদের মত ফুটিয়া উঠিয়া হারাইয়া যাইতেছে, মানব-মন সেই সত্তারও স্বরূপ জানিতে চায়।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে দুইটি সূক্ত উদ্ধৃত করিতেছি। তাহাতে বোধ করিতে পারা যাইবে রবীন্দ্রনাথের যে জিজ্ঞাসা তাহা মানুষের চিরপুরাতন ও চিরনবীন জিজ্ঞাসা।

৬। কেই বা প্রকৃত তথ্য জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে কোথা হইতে এই সকল জন্ম লাভ করিল, কোথা হইতে এই সব বিচিত্র সৃষ্টির উদ্ভব হইল।

দেবতারা এই সকল নানা সৃষ্টির পর আবির্ভূত হইয়াছেন। কোথা হইতে এই সব সম্ভব হইল তাহা কেই বা জানে ?

৭। এই বিচিত্র সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল, কি হইতে হইল, কে সৃষ্টি করিয়াছেন, কিংবা করেন নি—এইসব প্রশ্নের উত্তর তিনিই জানেন যিনি এই সৃষ্টির প্রভু স্বরূপ হইয়া দিব্যধামে বিরাজিত। হয়ত তিনিও জানেন না।

রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্ব-মানব-মনের স্বরূপ বিশ্লেষণের বিচিত্র প্রয়াসের পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি। কবির বর্তমান কাব্য-পর্যায়ের বিচিত্র জিজ্ঞাসা সেই পরম জাগতিক সত্তা-সম্পর্কিত।

অজ্ঞাত কোন এক রূপকার তাঁহার সত্তা আশ্রয় করিয়া একটি শিল্প-রূপ যে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন তাহাতে কবির সংশয় নাই। এই শিল্প-রূপ হইল কবির অধ্যাত্ম-সত্তা। এই সত্তার নিঃসংশয় প্রথম প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি 'মানসী'র মধ্যে, যাঁহার সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, 'আর্টিস্টের হাতে রচিত ঈশ্বরের প্রথম অসম্পূর্ণ প্রতিমা'। এই প্রতিমা বা কবির অধ্যাত্ম-সত্তার ধীর বিকাশের বিস্তারিত পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি।

রূপকারের যে-ধ্যান কবির অধ্যাত্ম-সত্তা আশ্রয় করিয়া ধীরে রূপলাভ করিতে চাহিয়াছে, তাহা তাঁহার জীবনে এখনও সম্পূর্ণতা লাভ করে নাই। তাই তাঁহার সত্তাকে ঘিরিয়া এমন অপরিচয়ের বিস্ময়, এমন বেদনার উদ্বেলতা। সেই রূপ-ধ্যান সম্পূর্ণতা লাভ করিলে বিশ্বের সকল রূপ বা সত্তার রহস্য উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত; কারণ সকল রূপের মধ্যে এক রহস্য নিহিত। আর সেই পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-সত্তার সহিত অরূপের প্রত্যক্ষ যোগের লীলা যে কীরূপ তাহা কবি বোধ করিয়া ধন্য হইতে পারিতেন। মুক্তি বলিতে কবি এই যোগের লীলাটিকে বুঝিতেন।

"মনে যে কী ছিল মোর
যেদিন ফুটিত তাহা শিল্পের সম্পূর্ণ সাধনাতে
শেষ রেখাপাতে,
সেদিন তা জানিতাম আমি;
তার আগে চেষ্টা গেছে থামি।" (ভাগ্যরাজ্য)

যে কারণের জন্যই হোক সাধনার এই অসম্পূর্ণতাবোধের পীড়ার বারংবার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় কবির পরবর্তী জীবনের কাব্যগুলির মধ্যে। তাহার

কারণ যিনি নির্দেশ করিতে পারিবেন, তিনি কবির অধ্যাত্ম ও শিল্প-সাধনার সকল রহস্য ভেদ করিতে পারিবেন।

তবু এই অসম্পূর্ণ ধ্যান-লোক আশ্রয় করিয়া কবি স্বপ্নে কত কল্প-রূপই না সৃষ্টি করিয়াছেন।

"সেই শেষ না জানার
নিত্য নিরুত্তরখানি মর্মমাঝে রয়েছে আমার;
স্বপ্নে তার প্রতিবিম্ব ফেলি
সচকিত আলোকের কটাক্ষে সে করিতেছে কেলি।" (ভাগ্যরাজ্য)

মৃত্তিকা-নিম্নের বীজ আলোর ইঙ্গিত বক্ষে করিয়া অন্ধকার পথ অতিক্রম করিয়া চলে। বাহিরে চতুষ্পার্শ্বে যখন তাহার লেশমাত্র পরিচয় নাই, বরং সর্বত্রই নির্মম প্রতিবাদ ও অস্বীকৃতি তখনও সে তাহার বিশ্বাস হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হয় না। তাহার পর একদিন তাহার এই যাত্রার অবসান ঘটে, যখন মৃত্তিকা ভেদ করিয়া সে আলোকে বাহির হইয়া আসে। আলোর সহিত আকাশের সহিত তখন তাহার প্রত্যক্ষ যোগের লীলা।

একথা সমগ্র বিশ্ব-লোক সম্পর্কেও সত্য। একটি আবেগের প্রেরণা বক্ষে লইয়া সে ক্রমাগত পথ পরিক্রমা করিয়া চলিয়াছে। কোথায় গিয়া কোন্ পরিণামে তাহার এই যাত্রার অবসান ঘটিবে তাহা আমরা জানি না, তবে তাহার যে একটি ধ্রুব পরিণাম আছে তাহাতে সংশয় নাই। ব্যক্তি-সত্তা সম্পর্কেও একথা সত্য। মাঝে মাঝে মানব-মনের উপর কোন্ অজানিত লোক হইতে চকিতে আলোক উদ্ভাসিত হইয়া যায়, তাহার কোন স্বরূপ আমরা জানি না, তবে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে একটি স্থির প্রত্যয় কেমন করিয়া গড়িয়া উঠে, যাহাতে যাত্রার লক্ষ্য সম্পর্কে বারংবার আমরা সচেতন হই। যতদিন না এই যাত্রার অবসান ঘটিতেছে, ততদিন ইহার সম্পূর্ণ অর্থ আমরা কোন মতেই বোধ করিতে পারিব না। 'রাতের গাড়ি' কবিতাটির কয়েকটি অংশ পরপর উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে মূল এই ভাবটির প্রকাশ ঘটিয়াছে।

"ক্ষণ আলো ইঙ্গিতে উঠে ঝলি,
পার হয়ে যায় চলি
অজানার পরে অজানায়,
অদৃশ্য ঠিকানায়।" (রাতের গাড়ি)

"বলে, সে অনিশ্চিৎ, তবু জানে অতি
নিশ্চিৎ তার গতি।" (রাতের গাড়ি)
"ঘুমের ভিতরে থাকে অচেতনে
কোন্ দূর প্রভাতের প্রত্যাশা নিদ্রিত মনে।"
(রাতের গাড়ি)

ইস্টেশনের নিয়ত আসা ও যাওয়ার, মিলন ও বিরহের নিত্য লীলা কবির দৃষ্টিসমক্ষে সমগ্র বিশ্বের এই লীলা-রূপটিকে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে।

"চলচ্ছবির এই-যে মূর্তিখানি
মনেতে দেয় আনি
নিত্য মেলার নিত্য ভোলার ভাষা
কেবল যাওয়া-আসা।" (ইস্টেশন)

সমগ্র বিশ্বে একদিকে কেবলই যাওয়া কেবলই হারান কেবলই মুছিয়া মুছিয়া যাওয়া, আর অন্যদিকে সেই শূন্যতা পূর্ণ করিয়া কেবল নূতন নূতন রূপের ফুটিয়া ফুটিয়া উঠা। কোন উদাসীন চিত্রকরের ইহা যেন নিতকাল ধরিয়া অন্তহীন অপরূপ ছবি ফুটাইয়া তোলা, আবার তাহাকে নির্মম হস্তে মুছিয়া দেওয়া।

"ওদের চলা ওদের পড়ে থাকায়
আর কিছু নেই, ছবির পরে
কেবল ছবি আঁকার।

* * *

চিত্রকরের বিশ্ব ভুবনখানি
এই কথাটাই নিলেম মনে মানি।" (ইস্টেশন)

সাধারণ মানুষের রূপ সাক্ষাৎকারের সঙ্গে হৃদয়বোধ বিজড়িত থাকে বলিয়া রূপের প্রকাশ ও বিলয়, সৃষ্টি ও বিনষ্টি তাহাদের অন্তরকে আনন্দ-বেদনায় নিয়ত বিক্ষুব্ধ করিয়া রাখে। হৃদয়বোধকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়াইয়া উঠিতে না পারিলে জগৎ-সংসারের এই লীলা-রূপটিকে সামগ্রিক রূপে দেখা কিছুতেই সম্ভব হয় না।

বিসৃষ্টির ক্রম বিপরিণামকে ধ্বনি-তত্ত্ব, (এই ধ্বনি-তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় শব্দ ব্রহ্ম বা স্ফোটবাদের সুবৃহৎ দার্শনিক পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছে, তন্ত্র-সাধনার মন্ত্রভাগ এই ধ্বনি-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত) সুর, ভাব বা রূপ-তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক হইতে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনে এই প্রত্যেকটি দিক ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। তবে

সমগ্র সৃষ্টি-তত্বকে কেবলমাত্র রূপ-তত্ত্বের দিক হইতে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সেই লক্ষ্য করা যায়। এই সময় হইতে তাঁহার শিল্প-সৃষ্টি আশ্চর্য প্রাচুর্যের সহিত সম্পূর্ণ নূতন এক রূপের জগতের দ্বার আকস্মিক ভাবে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

"দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা,
এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা।" (ইস্‌টেশন)

কবির অন্তর্জীবনকে আশ্রয় করিয়া যে অদৃশ্য চেতনা ধীরে একটি রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আপনার সেই শিল্প-রূপকে কবি আপনি কি সম্পূর্ণরূপে চিনিতেন। তাহার কতকটা প্রত্যক্ষ গোচর, অধিকাংশ বোধের সীমার বাহিরে। কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া সেই শিল্প-রূপেরই কতকটা আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কবির সমগ্র সৃষ্টি-কর্মের আশ্রয়ভূত, মর্মগত সেই যে কল্প-লোক, তাহার কতকটা আভাস হয়ত তিনি লাভ করিতে পারেন, যিনি সমগ্রভাবে কবির সৃষ্টি-চেতনার সহিত আপনার চেতনাকে যুক্ত করিতে সমর্থ।

কবির এই অন্তর্জগৎ বা অধ্যাত্ম-লোক, যাহা সৌন্দর্য-প্রেমের ধ্যান-লোকই, তাহার ধীর উন্মেষ, বিকাশ ও পরিণতির পরিচয় লাভই কবির যথার্থ পরিচয় লাভ। বাহিরে বিচিত্র কর্ম, বিচিত্র লৌকিক অভিজ্ঞতা ও পরিবেশের মধ্যে তাঁহার যে পরিচয় ব্যাপ্ত হইয়া আছে তাহার অন্য মূল্য যাহাই থাক, তাহাকে আশ্রয় করিয়া কবির যথার্থ পরিচয় লাভ কখনই সম্ভব নয়। এ কথা কবি স্বয়ং নানাভাবে বলিয়াছেন। 'আমায় খুঁজো না অমন করে আমায় খুঁজো না বাহিরে'। এই জীবনের সমগ্র প্রকাশ, যথার্থ রূপ একমাত্র তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ঘাটিত যিনি এই জীবনকে ধীরে রূপদান করিতেছেন।

"কাল সমুদ্রের তীরে
বিরলে রচেন মূর্তিখানি
বিচিত্রিত রহস্যের যবনিকা টানি
রূপকার আপন নিভৃতে।" (জন্মদিন)

কেবল তাহাই নয়, আমরা মানুষকে জানি আমাদের বিচিত্র সীমিত বোধ, বিচিত্র সংস্কারের সহিত অন্বিত করিয়া, বিচ্ছিন্ন পরিচয়ের সহিত কল্পনা মিশাইয়া। তাহা এইরূপে আমাদের মনগড়া আর একটি মূর্তি হইয়া উঠে।

“বাহির হইতে
মিলায়ে আলোক অন্ধকার
কেহ এক দেখে তারে, কেহ দেখে আর।
খণ্ড খণ্ড রূপ আর ছায়া,
আর কল্পনার মায়া
আর মাঝে মাঝে শূন্য, এই নিয়ে পরিচয় গাঁথে
অপরিচয়ের ভূমিকাতে।” (জন্মদিন)

মৃত্যুতে এই দেহ-রূপের বিনষ্টির সঙ্গে, তাঁহার অন্তরের শিল্প-রূপেরও যে বিনষ্টি ঘটে তাহা সত্য। যদি তাই হয়, তবে মানুষের মন দিয়া গড়া কবির রূপও একদিন নিঃশেষে হারাইয়া যাইবে তাহাও সত্য।

রবীন্দ্র-কাব্যে সত্তার বিস্ময়-বোধের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নক্ষত্র-লোক হইতে-তৃণ-পুষ্প পর্যন্ত বিশ্বের সকল অস্তিত্বের মাঝখানে আমার সত্তাও রহিয়াছে। এই বিস্ময়ের পার কোথায়! যে এক চেতনা সকল সত্তার পশ্চাতে থাকিয়া বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, সেই এক চেতনা আমার মধ্যেও বিচিত্র সৃষ্টি-রূপে প্রকাশমান। পরম অস্তিত্বের সহিত যুক্ত হইয়া সকল রূপের সহিত যে মিলনবোধ, তাহারও বিস্ময়ের অন্ত নাই। আমার অস্তিত্ব যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ হোক, আমি নহিলে বিশ্বের ছবি কোন-না-কোন রূপে অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইত। আমার অস্তিত্বের এই মূল্যবোধেরও বিস্ময় অপার। বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রঙ্গ, বিচিত্র গন্ধ-স্পর্শের সহিত সঙ্ঘাতে আমার চেতনার ধীর বিকাশ ঘটিয়াছে। আমার এই সত্তার প্রকাশের পশ্চাতে জল-স্থল-আকাশের কত কোটি কল্প বৎসরের সাধনা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সত্তাকে ঘিরিয়া তাই অন্তহীন বিস্ময়। সকল অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কাল ধরিয়া আমার চেতনার প্রসার। এ কী বিস্ময়! রবীন্দ্র-কাব্যে এই প্রত্যেকটি বোধের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে এই বোধেরই একটি প্রকাশ।

“আপনার পানে চাই,
লেশমাত্র পরিচয় নাই।
এ কি কোনো দৃশ্যাতীত জ্যোতি।
কোন্ অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্যগতি।
বহু যুগে বহু দূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে রূপান্তরে।
‘আমি’ উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।” (প্রশ্ন)

বহু দূরের চিন্তার অতীত বিপুল এক নক্ষত্র-লোকের বিস্ময় একটি সত্তাকে ঘিরিয়া প্রকাশিত। নক্ষত্রলোকের মধ্যে উত্তপ্ত বাষ্পরাশি, অগ্নিপিণ্ড যেমন নিয়ত আলোড়ন, আবর্তন তুলিতেছে, প্রবল আকর্ষণ ও বিকর্ষণের, সঙ্কোচন ও প্রসারণের ভয়ঙ্কর লীলা চলিতেছে, মানবিক বিচিত্র বোধের মধ্যে তেমনি নিয়ত সঙ্ঘাত চলিতেছে। বিচিত্র বোধ-সমন্বিত সত্তার এই প্রকাশ কী বোধাতীত বিপুল।

মৃত্যুতে এই অচিন্তনীয় রহস্য পরিপূর্ণ সত্তা আবার বুদ্বুদের মত কোথায় চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়।

" এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নামি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানা রঙা জলবিম্ব প্রায়," (প্রশ্ন)

সত্তার এই সৃষ্টি ও বিনষ্টির হয়ত কোন অর্থ আছে, কিন্তু কবির নিকট তাহা অজ্ঞাত। বিস্ময়বোধ কবিতাটির মুখ্য প্রেরণা নয়, অসম্পূর্ণতার বেদনাবোধই কবিতাটির মর্মমূলে স্পন্দিত।

"অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।" (প্রশ্ন)

যখন কবি এই মর্ত্যে থাকিবেন না, তখনও আকাশে অগণিত নক্ষত্রলোক বিরাজ করিবে, আর অনির্বান জ্যোতি শূন্য হইতে মহাশূন্যে উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিবে। এই মহৎ সৃষ্টি ও বিনষ্টির অর্থ তখনও মানবের নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে।

"তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ মাঝে,
কিছুই জানি না কোন্ কাজে,
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনোই উত্তর।" (প্রশ্ন)

সৌন্দর্য নারীর হোক বা প্রকৃতির হোক, তাহার মধ্যে রূপের অতীত অনির্বচনীয় একটি মায়া আছে। এই মায়া বা মোহকে আশ্রয় করিয়া নারী ও প্রকৃতির সৌন্দর্য পুরুষের অন্তরে আর এক সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করে। চেতনা যতই সমুন্নতি লাভ করিতে থাকে, এই সৌন্দর্য-লোক ততই গভীরতা

ও প্রসারতা লাভ করিয়া চলে, ততই তাহা অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরিয়া উঠে। এই সৌন্দর্য-লোককে আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনা রস বা মাধুর্য-লোকের গভীরে নিমজ্জিত হইতে থাকে। এই সৌন্দর্যমুখীনতাই পুরুষকে ধ্যানী ও মিস্টিক করিয়া তুলে। কবির কাব্যে ও শিল্পীর শিল্পে এই সৌন্দর্য-ধ্যানেরই রূপায়ণ। এই সৌন্দর্যের তরণী বাহিয়া পুরুষের চেতনা সুধা-সাগরপারে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করে। রূপের আশ্রয় না হইলে অরূপের আভাস লাভ করিতে পারা যায় না।

"যে কল্পলোকের কেন্দ্রে তোমারে বসাই
ধূলি-আবরণ তার সযত্নে খসাই
আমি নিজে সৃষ্টি করি তারে।" (রোমান্টিক)

কবিতাটির মধ্যে বাস্তব-প্রেরণা ও সৌন্দর্য-প্রেরণা একটি অখণ্ড বোধের সূত্রে বিধৃত না হইয়া স্পষ্টই দ্বিধা হইয়া গিয়াছে।

আমাদের সীমাবদ্ধ চেতনার দ্বারা বহির্বিশ্বকে আমরা যতটুকু আবেষ্টন করিতে পারি ততটুকুই আমাদের বোধের জগৎ। তাহার বাহিরে যে কোন জগৎ আছে আমার উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাহার কোন প্রমাণ নাই। এমনি ভাবে প্রত্যেকটি মানুষ পৃথক পৃথক ভাবে এক-একটি জগতের মধ্যে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে। একের বোধের জগৎ হইতে অন্যের বোধের জগতে প্রবেশ করিবার কোন উপায় নাই।

"বিচিত্র বোধের এ ভুবন
লক্ষকোটি মন
একই বিশ্ব লক্ষকোটি ক'রে জানে
রূপে রসে নানা অনুমানে।" (প্রজাপতি)

রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-মনের তত্ত্বের পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। বিশ্ব-মন নিখিল মানব-মনের সম্মিলিত প্রকাশ নয়। নিখিল মানব-মনকে পরিপূর্ণ করিয়া তাহা অনন্ত ব্যাপ্ত। তাহা না হইলে মনের বিকাশ ঘটিতে পারিত না। নিখিল মানব-মনের বিকাশ যতই ঘটুক না কেন, তাহা কোন পরিণামে বিশ্ব-মনকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না।

প্রত্যেকটি মন বিশ্ব-মনের সহিত যুক্ত বলিয়া আমরা পার্থক্য সত্ত্বেও অন্য মনের পরিচয় লাভ করিতে পারি। তাহা না হইলে অন্য মনের কোন উপলব্ধিই আমাদের ঘটিত না। 'লক্ষকোটি বোধের ভুবন' হইলেও সকল

ভুবন এক সত্তার সহিত যুক্ত বলিয়া তাহা কোন পরিণামে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারিতেছে না।

বিশ্ব-মনের বা দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর সত্তার অস্তিত্বকে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, তাহার নাম তিনি দিয়াছেন, পরম জাগতিক সত্তা। তবে মানবীয় চেতনাবিকাশের ক্ষেত্রে তাহার কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া তাহাকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ওই সত্তায় মানবীয় চেতনার কোন গতি নাই। পরে তিনি বোধ করেন মানবীয় চেতনা দেশ-কালের সীমাকেও ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। নিম্নের উদ্ধৃতির মধ্যে যে ভিন্নতর চেতনা-লোকের উল্লেখ রহিয়াছে তাহা যে দেশ-কালের ঊর্ধ্বতর চেতনা বা বিশ্ব-মনের তত্ত্বের ঊর্ধ্বতর তত্ত্ব তাহাতে কোন সংশয় নাই।

"কী আছে বা নাই কী এ,
সে শুধু তাহার জানা নিয়ে।
জানে না যা, যার কাছে স্পষ্ট তাহা, হয়তো বা কাছে
এখনি সে এখানেই আছে
আমার চৈতন্য সীমা অতিক্রম করি' বহুদূরে
রূপের অন্তরদেশে অপরূপ পুরে।
সে আলোকে তার ঘর
যে আলো আমার অগোচর।" (প্রজাপতি)

তিনি তাঁহার কাব্য-সাধনার, অধ্যাত্ম-সাধনাই বটে, অসম্পূর্ণতার কথা বারংবার বলিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি প্রথম সচেতন হন 'বলাকা' কাব্য-গ্রন্থ রচনার সময় হইতে। পরবর্তী কাব্য-ধারার মধ্যে এই অসম্পূর্ণতা-বোধের পীড়া যে ক্রমাগত গভীর হইয়া চলিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই ধারার একটি পরিচয় দানের চেষ্টা পূর্বাপর করিয়া আসিয়াছি। এই অসম্পূর্ণতার কারণ সম্পর্কেও কবি সচেতন।

তিনি বিশ্বের কেবল সৌন্দর্য-মাধুর্যের দিকটিকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাকে বাণী-রূপ দান করিয়াছেন; কিন্তু বিশ্বে কেবল সৌন্দর্য-মাধুর্যই নাই, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা ও ভয়ঙ্করতার দিকও আছে, যেখানে মানুষের দেবভাগ নিয়তই নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইতেছে। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া এই দিকটিকে তিনি পরিহার করিয়াছিলেন। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিয়াও তিনি যে বেদনা ও অসম্পূর্ণতা বোধ করিতেন তাহা যে বিশ্বকে

তাহার সামগ্রিক স্বরূপে না লাভ করিতে পারিবার জন্য, তাহা বোধ না করিয়া তিনি প্রাণপণে অসুন্দর ভাগটিকে আরো একান্ত করিয়া পরিহার করিবার চেষ্টা করেন। অনেক পরে যখন আপনার ভ্রম সম্পর্কে সচেতন হন, তখন জীবনে নূতন করিয়া সাধনা স্থরু করিবার দিন অবসিত হইয়াছে।

তিনি উপলব্ধি করেন বিশ্ব-সত্তা অখণ্ড বা পরিপূর্ণ রূপময় কোন সত্তা নয়। তাহা রূপ-বিরূপের এক আশ্চর্য সমন্বয়; কিংবা তাহাও নয়, কারণ রূপ-বিরূপের বোধ মানসিক, তাহা অনির্বচনীয় এক সত্য স্বরূপ। তিনি তাঁহার ইতিপূর্বের কাব্য-সাধনার পরিচয় এই ভাবে দান করিয়াছেন।

"স্থকুমারী লেখনীর লজ্জা ভয়
যা পরুষ, যা নিষ্ঠুর, উৎকট যা, করে নি সঞ্চয়
আপনার চিত্রশালে;
তার সঙ্গীতের তালে
ছন্দোভঙ্গ হল তাই,—" (রূপ-বিরূপ)

অভিব্যক্তিবাদকে রবীন্দ্রনাথ কোন্ দিক দিয়া কতটা পরিমাণে স্বীকার করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক অভিব্যক্তিবাদ হইতে তাহা কোথায় বিশিষ্ট তাহার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে লাভ করিয়াছি।

প্রাচীন দার্শনিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যেখানে জড় ও চেতনার, দেহ ও আত্মার সৎ ও অসতের, 'Matter' ও 'Form'-এর চিরন্তন দ্বন্দ্বকে স্বীকার করা হইয়াছে, (ভারতীয় ও গ্রীক দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি আমরা করিয়াছি) সেখানে কোথাও অভিব্যক্তিকে আদৌ স্বীকার করা হয় নাই, (ভারতীয় দর্শনে এই অস্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়) কোথাও আংশিক এবং কতকটা বিশিষ্ট অর্থে স্বীকার করা হইয়াছে। গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারার সেই স্বীকৃতির পরিচয় নিম্নের উদ্ধৃতি দুইটির মধ্যে লাভ করিতে পারা যাইবে।

"The doctrine of matter and form in Aristotle is connected with the distinction of potentiality and actuality. Bare matter is conceived as a potentiality of form : all change is what we should call 'evolution', in the sense that after the change thing in question has more form than before. That which has more form is considered to be more 'actual'. God is pure form and pure actuality; in Him, therefore, there can be no change. It will be seen that this doctrine is optimistic and teleological; the universe and everything in

it is developing towards something continually better than what went before."

"Only God consists of form without matter. The world is continually evolving towards a greater degree of form, and thus becoming progressively more like God. But the process can not be completed, because matter can not be wholly eliminated. This is a religion of progress and evolution, but God's static perfection moves the world only through the love that finite beings feel for Him."

(History of Western Philosophy: Bertrand Russel)

বিশ্ব-চিন্তার ইতিহাসে কয়েকটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা বিশ্ব-সৃষ্টির মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া ঈশ্বরীয় প্রকাশ (revelation) ও সৃষ্টি-তত্ত্বকে নানাভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। ইহা মানুষের ধর্ম ও অধ্যাত্ম-সাধনার দিক) আর একটি বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা। তৃতীয় ধারা হইল এই উভয় চিন্তাধারা অর্থাৎ মন ও অতিমনের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। যাঁহারা এই দুটি ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া, সেইহেতু কোন অবস্থায় সমন্বয়সাধন করা যাইতে পারে না বলিয়া বোধ করেন, অথচ দুই ধারাকে পৃথক পৃথক ভাবে মূল্য দিতে প্রস্তুত তাহারও একটি ধারা আছে।

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিংটনের মতে প্রকৃত জগৎ রহিয়াছে ইন্দ্রিয়ের জগৎ এবং বিজ্ঞানের জগতের অতীত। ইহা আধ্যাত্মিক ধর্মবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়। এবং বিজ্ঞানের জগৎ প্রতিভাস মাত্র। ইহা প্রকৃত জগৎকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

মানসিক ক্রিয়ার ভিতর দিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়ের জগৎ যেমন গড়িয়া উঠে তেমনি বিজ্ঞানের জগৎও গড়িয়া উঠে। আমরা যাহা কিছু উপলব্ধি করি তাহা আমাদের মনের আরোপিত সামগ্রী। এডিংটনের মতে আমরা আমাদের মনের জগতের বাহিরে আর কিছুই উপলব্ধি করি না। প্রকৃত জগৎ-মনের বাহিরে নয়, মনের দ্বারা উপলব্ধ হইলে তবে তাহাকেই আমরা বলি সত্য। তাঁহার এই উপলব্ধি কাণ্ট, ডেস্কার্টেস্ এবং বার্কলে প্রভৃতি দার্শনিকবর্গের চিন্তাধারার অনুকূল।

এডিংটনের চিন্তার সহিত স্যার জেমস্ জীনসের চিন্তাধারার গভীর সাদৃশ্য আছে।

তিনিও অনুমান করেন এই তথ্যময় জগৎ ছায়ালোক, সত্যের প্রতিষ্ঠা ইহার অতীতে। এই নিখিল বিশ্বলোক বিশুদ্ধ গাণিতিক চিন্তার প্রকাশ। তাঁহার মতে দেশ-কাল সীমিত বলিয়াই ইহা যে চিন্তাপ্রসূত এই বোধ অনিবার্য-

রূপে জাগে। চিন্তার ভিতর দিয়া দেশ-কালের প্রকাশ। ঈশ্বর স্বয়ং দেশ-কালের মধ্যে ক্রিয়া করেন না। দেশ-কাল তাঁহার চিন্তার প্রকাশ। বার্কলের দর্শনেও এই উপলব্ধির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

ইঁহারা জগৎকে প্রতিভাস এবং সত্য,—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এডিংটন এবং জীনসের মতে এই সত্য হইল মন, ঈশ্বরীয় মন। তাঁহাদের মতে বৈজ্ঞানিক জগৎ ও সত্য জগৎ নয়।

তাঁহারা বলেন, সত্য এক, প্রতিভাসের জগতে আমরা অন্তহীন বৈচিত্র্যকে প্রত্যক্ষ করি। হেগেল এবং ব্র্যাডলের চিন্তাধারাও অনুরূপ। ইঁহাদের মতে আমাদের মন প্রকৃত সত্য বা ঈশ্বরীয় মনের একটি অংশ।

এই আদর্শবাদী বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকগণ জগৎকে প্রতিভাস এবং সত্যে বিভক্ত করিয়া সত্যের মঠে মূল্যের প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপে তাঁহারা ইন্দ্রিয়ের এবং বিজ্ঞানের জগৎ অপেক্ষা সত্যের জগৎকে অধিক মূল্যবান বলিয়া বোধ করেন। তাঁহারা বলেন যে প্রকৃত জগৎ মানসধর্মবিশিষ্ট এবং তাহা আমাদের চেতনারই প্রসার। ইহার উপলব্ধির মুহূর্তে মানুষ ভাব ও বস্তুর পার্থক্যকে অতিক্রম করে এবং জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের সহিত একাত্ম হইয়া যায়।

সকল দেশের সকল কালের মিস্টিকদের অনুভূতির সাক্ষ্য হইতে জানিতে পারা যায় যে মানুষ রূপের জগৎকে অনুবিদ্ধ করিয়া উপলব্ধির সামগ্রীর সহিত একাত্ম হইয়া যাইতে পারে। ঈশ্বরীয় সত্তার মধ্যে ব্যক্তিসত্তার নিঃশেষ বিলুপ্তি।

রূপের জগতের অতীতে এই সত্য জগতের উপলব্ধির কথাই জীনস্, এডিংটন, রাসেল, আইনস্টাইন এবং প্ল্যাঙ্ক প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ নানাভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন।

এই গভীরতর সত্তার জগৎকে যুক্তিবিচারের সহায়তায় উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। যুক্তিবিচারের সহায়তায় কেবল দেশ-কালের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বিচ্ছিন্ন সত্তাকে উপলব্ধি করিতে পারা যায়; সমগ্রতা বা অখণ্ডতাকে উপলব্ধি করিতে তাই ভিন্নতর বোধের প্রয়োজন। তবে মিস্টিকদের রূপের জগৎকে আধুনিক বিজ্ঞান ইন্দ্রিয়লব্ধ জগৎ এবং বিজ্ঞানলব্ধ জগৎ—এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ প্রতিভাসিত জগৎ এবং সত্য জগতের মধ্যে যেভাবে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা করিয়াছেন, ভূমিকা-অংশে তাহার বিস্তৃত পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি।

সক্রেটিশের পূর্ববর্তী গ্রীক দর্শনের সামগ্রিক রূপটিকে বলা হয় হেলেনিক। গ্রীক জীবন-সাধনার সকল বিভাগকে ইহা অনুপ্রাণিত করিয়াছে। রেনেসাঁ দর্শন বলিতে আমরা মোটামুটি এই দর্শনকেই বুঝি। এই জীবন-দর্শনেরই ভিন্ন নাম প্রকৃতিতন্ত্র (Naturalism)।

তাঁহারা জগৎকে দেখিয়াছিলেন একটি বৃহৎ অট্টালিকা অথবা মহান্ যন্ত্ররূপে। ইহার প্রত্যেকটি অংশ একটি অন্যটির উপর ক্রিয়া করিতেছে এবং জীবন অথবা একটি সাধারণ পরিব্যাপক প্রক্রিয়ার সূত্রে পরস্পরের বিকাশ ঘটিতেছে। সমস্ত কিছু নিয়ত গতিশীল উপাদান (পরমাণু) হইতে উদ্ভূত, এবং এই সকল উপাদান নিয়ত পুনর্বিন্যস্ত হইতেছে, ফলে প্রাচীন সামগ্রীর বিনাশ এবং নূতন সামগ্রীর উদ্ভব হইতেছে। জগতের এই স্বরূপ হইতে যে জীবন-দর্শনের উদ্ভব হইতে পারে তাহাই ঘটিতেছে। তাঁহারা বলেন এই বিস্মিত জগতের সৌন্দর্য অবলোকন কর, কারণ পরমুহূর্তে তাহা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, পরমুহূর্তে জীবনেরও অবসান ঘটিতে পারে। তাই সংযত, নিয়ন্ত্রিত ভোগ এবং শিল্পকলার জীবনযাপন করাই ছিল তাহাদের লক্ষ্য।

ইহার প্রায় এক সহস্র বৎসর পরে জীবনের সমস্ত কিছু, সকল প্রতিষ্ঠান ধর্মবোধের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই বিশ্বে মানবাত্মা তীর্থযাত্রী। জগৎ পুণ্যলোক হইতে স্খলিত, শয়তানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত। জগতে দুঃখ ও দারিদ্র্য স্বাভাবিক, এখানে সুখলাভ অসম্ভব এবং তাহা একমাত্র পরলোকে লাভ করিতে পারা যায়। অবশ্য বর্তমান জীবন যদি অপরাধমুক্ত হয়।

এই জীবন-দর্শনকে বলা হয় অতি-জাগতিক দর্শন। ক্যাথলিক ধর্মপ্রতিষ্ঠান এই জীবন-দর্শন প্রচার করে। পরবর্তীকালে প্যাগানরা এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করে। সমগ্র এশিয়ায় মোটামুটিভাবে এই জীবন-দর্শন স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

ইহার প্রায় পাঁচশত বৎসর পরে প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়। সমস্ত কিছুকে জানিবার, জয় করিবার অস্থির উত্তেজনা, এক অপরিতৃপ্ত ইচ্ছাশক্তি, দুর্দমনীয় সাহস। ইহাকেই বলা হয় রোমান্টিসিজ্‌ম। ইংরেজি গীতিকাব্যে এবং জার্মান সাহিত্য ও দর্শনে ইহার প্রকাশ ঘটে।

পাশ্চাত্য জীবন-দর্শনের এই তিনটি দিক। তাহার পর হইতে পাশ্চাত্য সাহিত্যক্ষেত্রে এই তিন প্রকার জীবন-দর্শনের সংযোগ এবং বিয়োগ, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সঙ্ঘাত নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে।

বিশ্বে সাংস্কৃতিক সংযোগ অবাধ হইয়া উঠিবার ফলে এই সকল চিন্তাধারা বিশ্বের সকল জাতি-চিত্তে স্বাভাবিকভাবে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। আমাদের কবির জীবন-দর্শনে অন্যান্য সকল জীবনবোধের সহিত এই সকল জীবন-দর্শন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। তাহা এক অংশের সহিত অপর অংশের সচেতন মিলনসাধনের ফল নয়। একটি পূর্ণতার বীজ ছিল তাঁহার অন্তরে এবং বৃহৎ বনস্পতি যেমন বাহিরের আলো-হাওয়া এবং মৃত্তিকা হইতে খাদ্য ও উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া ধীরে বিকাশ লাভ করিয়া চলে, রবীন্দ্র-বনস্পতি তেমনি এই সকল চিন্তাধারা হইতে আহার্য সংগ্রহ করিয়া আপনাকে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর একশত বৎসরের মধ্যে চিন্তাজগতে যে উৎসারণা দেখা দেয়, তাহার তুলনা পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার ইতিহাসে পরবর্তীকালে কোথাও লাভ করিতে পারা যাইবে না।

রেনেসাঁ যুগের প্রথম পর্যায়ের সৃষ্টিগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য প্রথম দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইল জীবনের প্রতি ধর্মবিবিক্ত দৃষ্টি, শিল্প ও প্রাচীন জগতের নূতন অর্থের আবিষ্কার। সাহিত্যে এবং শিল্পে সর্বত্র জীবনের প্রতি ধীর প্রত্যাবর্তনের একটি আবেগ লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বরের পরিবর্তে আজ মানুষ সমস্ত কিছুর কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত। ইহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ অনুভব করেন জীবন জীবনের মধ্যেই সম্পূর্ণ এবং সমাপ্ত ; অসীম কালের যাত্রার একটি ক্ষণস্থায়ী পর্যায় নয়। সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তাই জগতের বাহিরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নাই।

মধ্যযুগ প্রাচীন সংস্কৃতিকে অনৈতিক এবং অপকৃষ্ট বলিয়া বোধ করিত। ইতালিতে দ্বাদশ শতাব্দীর পর হইতে প্রাচীন সভ্যতার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা দেখা দেয়। প্রাচীন রোমের সাহিত্য ও শিল্পের মধ্যে তাঁহারা যে জীবনবোধ খুঁজিয়া পান, তাহাতে এই বিশ্বাস আছে, যে মানুষ যেমন অধ্যাত্ম-সত্য লাভের জন্য সাধনতৎপর হইবে, তেমনি জগৎ ও জীবনের বিচিত্র গুরুদায়িত্বও বহন করিবে।

মধ্যযুগ যে সুশৃঙ্খলার জগৎ আবিষ্কার করে তাহার কেন্দ্রস্থলে এই জীবন ও জগৎ নাই, তাহার পরিবর্তে আছেন ঈশ্বর এবং অসীমতা। রেনেসাঁ যুগ এক নূতন শৃঙ্খলার আবিষ্কার করে। তাহারা ঈশ্বরকে অস্বীকার করে নাই বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশ্ব-সুষমার কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করে। এই জগৎ এবং এই মুহূর্তকে তাহারা অসীম করিয়া তুলে। ঈশ্বরীয় মহিমা বোধ করিবার জন্য

মানুষকে তুচ্ছ করিবার আর কোন প্রয়োজন রহিল না। মনুষ্য, শিল্প এবং সঙ্গীতের সুসম্পূর্ণ প্রকাশ রূপ সৃষ্টি করিবার প্রয়াসের পশ্চাতে আছে এই প্রেরণা।

মাইকেল এঞ্জেলো দৈহিক সংগঠন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন হইলেও বাস্তব লোকে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছায়া অনুসন্ধান করিবার জন্য ইহার গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়াছেন। এই প্রবণতা রেনেসাঁ যুগের বহু লেখকের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তাঁহারা উন্নততর এক বাস্তব লোক অনুসন্ধান করিয়া ফিরিয়াছেন। র‍্যাফেল, টিশিয়ান প্রভৃতি শিল্পী শিল্পের মধ্যে সমসাময়িক জীবনের প্রতিফলনের পরিবর্তে আপন আপন অন্তরস্থিত সৌন্দর্যময় অতীত জগতের স্বপ্নকে রূপায়িত করেন।

এই যুগ শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এতদূর সমুন্নতি লাভ করে যাহার ফলে পরবর্তী কালের তরুণরা সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া পড়ে। সমাধানের জন্য আর কোন কলাকৌশল অথবা শিল্পগত সমস্যা রহিল না। ইহার ফলে তাহারা সাহিত্য, শিল্প এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এক নূতন জগৎ আবিষ্কার করিতে চাহিলেন।

জীবনে অনিশ্চয়তা-বোধ দেখা দিল। জীবন যে কোন এক রহস্য-শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এমনি একটি বিশ্বাস নানাভাবে গড়িয়া উঠিতে থাকে। এই সময়কার সর্বাধিক বিশিষ্ট লক্ষণ হইল প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা।

রেনেসাঁ যুগে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক অনেকটা শিথিল হইয়া আসে এবং মানুষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়। ইহার পরবর্তীকালে কবি ও শিল্পীগণ দেহ ও আত্মা, ব্যষ্টি এবং সমষ্টির মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া ফেলে।

এখনকালের বৈশিষ্ট্য হইল বিচিত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রাম। এই সংগ্রাম পূর্ণ সুষমা ও সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে মাইকেল এঞ্জেলো, সেক্সপীয়র, সাবাভন্টেস অথবা ম্যান্টেভার্তি প্রভৃতি কয়েকজন প্রতিভাবান কবি ও শিল্পীর মধ্যে।

প্রাচীন যুগের শিল্প ও সাহিত্যে যে সুসম্পূর্ণতা ও পরিচ্ছন্নতা ছিল এই যুগের শিল্প ও সাহিত্য তাহাকে পরিহার করে। এই যুগের সাহিত্যে ও শিল্পে সর্বত্র অন্তর্দ্বন্দ্ব, বৈপরীত্য, অস্থিরতা এবং চরম ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। রেনেসাঁ যুগের সহজ ও সরল আনন্দের পরিবর্তে দেখা দিল ক্ষয়, বিষাদ, মৃত্যু, অনিশ্চয়তা এবং উদ্বেগ।

ইহার পরবর্তীকালে আবার রেনেসাঁ যুগের মত রোমান মহিমায় শ্রদ্ধা, সুষমার প্রতি ভালবাসা এবং আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসে।

ইহার পরবর্তী রোমান্টিক যুগের শিল্প ও সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

সুদূর প্রাচীনকাল হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত সাহিত্য ও শিল্পের ভাব ও রূপ পর্যালোচনা করিয়া সমালোচকগণ এইরূপে তাহাদের কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাগ যে কেবল পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কেই সত্য তাহা নহে, বিশ্বের সকল প্রাণবান জাতির সৃষ্টি-কর্ম সম্পর্কেও এ কথা সত্য।

প্রাচীন যুগের সহজ সরল আনন্দময় সুষমাটি মধ্যযুগে অতি জাগতিক বোধের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়, রেনেসাঁ যুগে প্রাচীনের সেই সুষমাটি আবার ফিরিয়া আসে, তবে অনেকটা সমৃদ্ধতর হইয়া। এই সুষমায় অন্তর ও বহির্বিশ্ব, জীবন ও জীবনাতীত, সীমা ও অসীম, পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিতে চাহিয়াছে। তাহার পর হইতে সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে কোথাও ব্যক্তির অন্তর্জগৎ, কোথাও বা বহির্জগৎ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে মাত্র। সুষমার মূল আদর্শ হইতে কোন যুগ ভ্রষ্ট হয় নাই। সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ চিরকালের আধুনিকতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মধ্যযুগের অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে যে সঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়, আনন্দ কেন্টিশ কুমার স্বামীর নিম্নের উদ্ধৃত উক্তি কয়েকটির মধ্যে তাহার পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়।

"মৃত্যুতে জীবের আর সমস্ত কিছু বিনাশ পায়, কেবল 'নাম' অবিনশ্বর হইয়া থাকে। 'নাম' হইল 'ভাব' এবং চেতনার মধ্যে কর্মের মূল প্রতিরূপ স্বরূপ নামের চিরন্তন স্থায়িত্ব বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাই ব্যক্তি-সত্তা। ইহার 'মনন' আমাদের 'স্থিতি'। "শিল্পীর মধ্যে শিল্প" একহার্ট, ১,২৮৫, ঈশ্বর-বুদ্ধি অথবা বৌদ্ধ-আলয়-বিজ্ঞান, একহার্ট যাহাকে বলেন আমাদের 'ভাব ও বিদেহী রূপের ভাণ্ডার,' ১,৪০২ "ঈশ্বরের শিল্প" ১,৪৬১, "দিব্য-সত্তার মধ্যে সকল জীবের স্বাভাবিক প্রকাশ-রূপ আদর্শীকৃত", ১,২৫০। সত্তার সকল আনুষঙ্গিক গুণের ব্যক্তিগত মূল প্রতিরূপের চিরন্তনতা এবং ব্যক্তি-আত্মার চিরন্তনতা এক বস্তু নয়, কারণ আত্মা কোন উপায়ে পুরস্কার নয়, উহা নিছক অমূর্ত্য এবং নামাত্মক।" (অনূদিত)

"যাঁহারা এখনও সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞ নন, অথচ উহা লাভ করিবার পথে, কিংবা যাঁহারা সৎ কর্মের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন, তাঁহারা এই স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারেন। এই স্থায়িত্ব দিব্য-অস্তিত্বের কোন একটি নিম্নতর স্তর। এখানে আত্মা কর্মের দ্বারা কর্মফল ভোগ করেন। এখানে হয়ত তিনি বৈকুণ্ঠ-লোক পর্যন্ত পৌঁছাইতে পারেন এবং আপনার শাশ্বত

মূল প্রতিরূপের মধ্যে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, 'জীবন গ্রন্থে'র মধ্যে তাঁহার নাম লিখিত। ইহা তাঁহারই স্বরূপ, কারণ প্রকাশমান 'পুত্রের' মধ্যে তাঁহার অবস্থান। "আত্মা তাঁহার জৈবিক সত্তা পরিহার করিলে তাঁহার অনভূত মূল প্রতিরূপ (নাম) উদ্ভাসিত হইয়া যায়, এখানে আত্মা বিগ্রহের মূল প্রতিরূপ অনুসারে অনুভূতির মধ্যে আপনাকে আবিষ্কার করে," একহার্ট ১,১৭৫ অর্থাৎ তিনি আপনাকে আদর্শবস্তু, খ্রীষ্ট, মেষ, অশ্ব, প্রজাপতি, বৎসরের মধ্যে দেখিতে পান। এই সত্তা সেখানে পূর্ণ বিকশিত, পুষ্পিত, আপনার অস্তিত্বের ভূমিতে ইহা প্রথম উদ্গত কলিকা, এখানে সমস্ত উপলব্ধ, এখানে ঈশ্বর আপনাকে অর্থাৎ আনন্দ উপলব্ধি করেন, একহার্ট ১,২৯০ এবং ৮২।" (অনূদিত)

"কিন্তু এই অবস্থা যত মহান্ যত আকাঙ্ক্ষিত হোক-না-কেন এবং চিন্তার অতীত (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪র্থ অধ্যায় ৩, ৩৩, তৈত্তিরীয় উপনিষদ ১২,৮) যেমনই আনন্দ হোক-না-কেন তাহা দিব্য মিলনের সর্বশেষ পরিণাম নয় বলিয়া আত্মার আবাসস্থল নয়।" একহার্ট "সর্বজ্ঞতা ছাড়া নির্বাণ নাই" সৎধর্ম পুণ্ডরিক ৫ম অধ্যায় ৭৪,৭৫ "জ্ঞাতব্য সমস্ত কিছু না জানা পর্যন্ত আত্মা অপরিচিত সৎকে লাভ করিতে পারে না," একহার্ট ১,৩৮৫। ইহা তাই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে কিংবা খ্রীষ্টান দৃষ্টিভঙ্গীতে সর্বশেষ পরিণাম নয়। কারণ "আপনার আদর্শ বস্তুর মধ্যে আত্মা যে শাশ্বত প্রকৃতি প্রত্যক্ষ করে, তাহা বহুত্ববোধ-সমন্বিত, কারণ ব্যক্তি-সত্তা পৃথক। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "কেহ আমার মধ্য দিয়া ছাড়া পরমপিতার নিকট আসিতে পারে না।" যদিও তাঁহার মধ্যে আত্মার আবাসস্থল নাই, যিশুর বাণীর অনুসারে, আত্মাকে তাঁহার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

"এই উত্তিন্ন করিয়া যাইবার মধ্যে আত্মার দ্বিতীয় মৃত্যু ঘটে এবং প্রথম মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" একহার্ট, ১,২৭৫ "তাঁহার প্রকাশের দ্বার দিয়া প্রবেশ করিবার জন্য তিনি আমাদের আমন্ত্রণ করেন এবং যে উৎস হইতে আমরা আসিয়াছি তাহার মধ্যে ফিরিয়া যান—এই দ্বারের ভিতর দিয়া সমস্ত কিছু তাহাদের পরমানন্দের মধ্যে ফিরিয়া যায়," একহার্ট ১,৪০০। ইহার প্রকাশ বৈদিক দেবতা আদিত্যের মধ্যে। ইনি লোক-দ্বার। ইহার ভিতর দিয়া তত্ত্বজ্ঞকে ব্রহ্মলোকে (প্রাণারাম, আত্মার লীলাস্থল) প্রবেশ করিতে হয়।" (অনূদিত) (A New Approach to the Vedas)

অধ্যাত্ম-সাধনা এবং বৈজ্ঞানিক সত্যোপলব্ধির মধ্যে সমন্বয়সাধনের যে চেষ্টা

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মধ্যযুগে ফুটিয়া উঠে, তাহারই একটি ধারা আধুনিক যুগ পর্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে। জীন্‌স্‌, এডিংটন, বাটলার প্রভৃতির মধ্যে এই জাতীয় চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'চিত্রা' কাব্যে জীবনদেবতা-শ্রেণীর কবিতা রচনা-প্রসঙ্গে তিনি প্রথম সুস্পষ্ট রূপে বোধ করেন (মানসী কাব্যের মধ্যে এই বোধের প্রথম সঞ্চার লক্ষ্য করা যায়)। কোন এক দিব্য অভিপ্রায় তাঁহার জীবন ও সৃষ্টি-কর্মকে আশ্রয় করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতে চায়। এই সম্পর্কে কবি জীবনের প্রথম হইতেই এক প্রকার সচেতন ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা এক-একটি বিশেষ মুহূর্তের এক-একটি বিশেষ ভাবের সুসম্পূর্ণ প্রকাশ হইলেও তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি-কর্মকে আশ্রয় করিয়া ভাবের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ রহিয়াছে। কোন এক শিল্পী তাঁহার অন্তরের মধ্যে থাকিয়া অপূর্ব কোন একটি ভাব, অজ্ঞাত কোন একটি ধ্যান-রূপকে ধীরে ফুটাইয়া তুলিতেছেন। এই অজ্ঞাত একটি অভিপ্রায় আছে বলিয়া তাঁহার সৃষ্টি-কর্মসচেতন ভাবনাকে অতিক্রম করিয়া এমন একটি ভাবকে প্রকাশ করিতেছে, যাহার সম্বন্ধ-সূত্রে তাঁহার পূর্বাপর সমগ্র কাব্য বিধৃত। এই পরিপূর্ণ ধ্যান-রূপটি কি? কবির জীবনে তাহা পরিণামী বলিয়া তাহা নির্দেশ করা অসাধ্য। তবে কবির সমগ্র কাব্য-প্রবাহ বিশ্লেষণ করিয়া তাহার কিছু আভাস বা ইঙ্গিত লাভ করা যাইতে পারে মাত্র। যখন জীবনে ও সৃষ্টি-কর্মে এই ধ্যানরূপ সম্পূর্ণ হয়, কেবলমাত্র তখনই তাহার পরিচয়লাভ সম্ভব।

সত্তার স্বধর্মের ভিতর দিয়া এই যে ধীর বিকাশ ও সম্পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের নিকট ইহাই মুক্তি। ঔপনিষদিক বা বৌদ্ধ নির্বাণ-মুক্তির সহিত রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তি-তত্ত্বে যে সুদূর কোন সাদৃশ্য নাই তাহা নিশ্চয় আর উল্লেখ করিতে হইবে না।

তাঁহার বর্তমান সত্তা ও সৃষ্টি-রূপ অতীত কত জন্মের ধীর বিকাশের ফল-স্বরূপ। যতদিন না এই সত্তা এবং তাঁহার সৃষ্টি-রূপাশ্রয়ী ধ্যান পূর্ণতা লাভ করিতেছে, ততদিন জন্ম হইতে জন্মান্তর লোক হইতে লোকান্তর লাভের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবন-লীলা অব্যাহত থাকিবে। কর্ম ও কর্মফল লাভের সহিত যুক্ত করিয়া ভারতীয় জীবন-দর্শনে যে জন্মান্তর-তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তর-তত্ত্বের সুদূর কোন সম্পর্ক নাই। রবীন্দ্রনাথের জন্মান্তর-তত্ত্বে রহিয়াছে সত্তার বা রূপের ধীর বিকাশ ও পরিণামে সম্পূর্ণতা,

অন্যদিকে ভারতীয় জন্মান্তর-তত্ত্বে রহিয়াছে সত্তার ধীর বিনষ্টি ও পরিণামে নিশ্চিহ্নতা।

সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন, সত্তার বিকাশের ক্ষেত্রে তেমনি তিনি এই পূর্ণতা লাভ করিতে পারেন নাই। এইজন্য অসম্পূর্ণতার বেদনা বহন করিয়া তাঁহাকে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু এই সম্পর্কে মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার স্থির অধ্যাত্ম প্রত্যয় ছিল যে ইহার জন্য তাঁহাকে আরো একটি জীবনের প্রতীক্ষা করিতে হইবে মাত্র। অপরিপূর্ণতায়, অসম্পূর্ণ জানায় জীবনের ছেদ হইতেই পারে না।

তাঁহার সমগ্র সৃষ্টি-কর্মকে আশ্রয় করিয়া একটি ধ্যান-রূপ যেমন ধীর বিকাশ লাভ করিতেছে, তেমনি সকল অতীত সমেত সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টি-কর্মকে আশ্রয় করিয়া যে একটি সমগ্রতার ধ্যান ধীরে রূপলাভ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে, এই সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। ব্যক্তি-সত্তার মুক্তি বলিতে তিনি যেমন সত্তার সম্পূর্ণতা বুঝিতেন, তেমনি বিশ্বের মুক্তি বলিতে তিনি বিশ্ব-মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া যে ধ্যান ধীরে রূপ লাভ করিয়া চলিয়াছে তাহারই সম্পূর্ণতা বুঝিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবন-দর্শন এই গতি ও বিকাশ-তত্ত্বের সহিত বিজড়িত। অথচ ভারতীয় জীবন-দর্শনে বিশেষ করিয়া মধ্যযুগের জীবন-সাধনায় এই গতি ও বিকাশ-তত্ত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এইরূপে বিশ্বের প্রত্যেকটি নর-নারী আপন আপন স্বধর্মের পূর্ণতা সাধন করিয়া (স্বধর্মে স্থিত হইয়া) বিশ্ব-মনের রূপ-ধ্যানকেই পরিণামে বিশ্বে ফুটাইয়া তুলিবে। উভয়ের ইচ্ছা ও কর্মের মধ্যে তাই পরিণামে বিরোধ অসম্ভব। ইহাতে ব্যক্তি বাহিরে কর্মের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মুক্তিলাভ করিয়াও বিশ্ব-সত্তার অমোঘ নিয়মকে আনন্দে চরিতার্থ করিবে।

Whilehead যে পরিপূর্ণ ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহার সহিত রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরীয়বোধের আশ্চর্য সাদৃশ্য আছে। Aristotle-এর ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সহিত ঔপনিষদিক ব্রহ্মের তত্ত্বত কোন পার্থক্য নাই। ইহা সকল পূর্ণতার অতীত অবস্থা। রবীন্দ্রনাথ সেই তত্ত্বকেই লক্ষ্য করিয়াছেন, যাহার মধ্যে মানবিক বা জাগতিক বিচিত্র বিরুদ্ধবোধের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মুক্তির ক্ষেত্রে তাই পূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনা অপরিহার্য।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা ও কাব্য-সাধনা পৃথক ছিল না। তাই কাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে, বিশ্বের সকল রূপ ও বিরূপের সমন্বয়-তত্ত্বটিকে লাভ

করিবার চেষ্টা ধীরে তীব্র হইয়া পরিণামে একটি আর্তিরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।

ইহা রবীন্দ্রনাথের একক জীবনের বিশিষ্ট কোন সাধন-পদ্ধতি ও দার্শনিক উপলব্ধি নয়। ইহাকে আধুনিক যুগের পূর্ণ জীবন-দর্শন লাভের সাধনা বলা যাইতে পারে। আধুনিক যুগে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্ত্যে যে কোন বড় প্রতিভার ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট জীবন-দর্শনের কোন-না-কোন রূপ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

কীটসের সাহিত্যোপলব্ধির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া Douglas Bush একস্থলে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"In a world of inexplicable mystery and pain the experience of beauty is the one sure revelation of reality; beauty lives in particulars, and these pass, but they attest principle, a unity, behind them. And if beauty is reality, the converse is likewise true, that reality, the reality of intense human experience, of suffering, can also yield beauty, in itself and in art. This is central in the poet's creed..."

(Keats and His Ideas: Douglas Bush)

"Here, or in the whole episode, seem to be concentrated, and perhaps reconciled on a new plane, some of Keat's central perplexities—the fluidity of experience and the enduring truth of art,—a vision of life that embraces but transcends all suffering, that unifies all diverse and limited human judgments sub specie aeternitatis; the supreme sensation and insight of death without death itself. Moneta's face and eyes reflect, in calm benignity, the knowledge that had rushed upon Apollo, and Keats is reaffirming the Godlike supremacy of the poetic vision but his conception has risen above mere negative capability to what suggests, to one critic at least, Christ taking upon himself the sorrows of the world."

(Keats and His Ideas : Douglas Bush)

তিনি পরিশেষে মন্তব্য করিয়াছেন,

"Though his poetry in general was in some measure limited and even weakened by the romantic preoccupation with 'beauty', his finest writing is not merely beautiful because he had seen 'the boredom, and the horror' as well as 'the glay'."

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কবিতাও কতকটা 'romantic preoccupatic with 'beauty' জাত এবং পরবর্তীকালে এই রোমান্টিক সৌন্দর্যের বিচিত্র তত্ত্ব

হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সেই সত্যকেই তিনি লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যেখানে সুন্দর ও অসুন্দর একই সত্যের দুটি দিক মাত্র।

সুখও সত্য নয়, দুঃখও সত্য নয়, সুন্দরও সত্য নয়, অসুন্দরও সত্য নয়, ইহাদের সঙ্ঘাতের ভিতর দিয়া যে আত্মা ফলবান হইয়া উঠে একমাত্র তাহাই সত্য। কীটসের জীবনের এই উপলব্ধির কথা উক্ত সমালোচক বলিয়াছেন।

"In this view of life as a series of trials Keats finds 'a system of Salvation' more rational and acceptable than the Christian."

ভারতীয় মোক্ষসাধনার অতিমানবিক লক্ষ্যের জন্য ভারতীয় সাহিত্য-তত্ত্বমূলক আলোচনাগুলি কোন-না-কোন রূপে ওই পরিণাম লক্ষ্য করিয়াছে। তাহার আনন্দ ও রসতত্ত্ব অতিমানবিক চেতনালব্ধ। তাহার মধ্যে সমন্বয়ের কোন তত্ত্ব নাই। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারায় মুক্তি-তত্ত্ব সম্পূর্ণতার, পূর্ণ মনুষ্যত্ববিকাশের, সমন্বয়ের তত্ত্ব, তাই তাঁহার সৃষ্টি-কর্মও এই এক পরিণাম-লাভকে লক্ষ্য করিয়াছে।

রবীন্দ্র-দর্শন সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি যে বিশ্বানুভূতি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহার সহিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রাচীন ঋষিও দ্রষ্টামনের বিশ্বানুভূতির কোন সাদৃশ্য নাই। তাঁহারা যে বিশ্বানুভূতি লাভ করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা আদিতে জগৎ ও জীবনকে পরিহার করিয়া পরে আধ্যাত্মিক অনুভূতির উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে উঠিয়া এইরূপে জীবন ও জগতের সহিত পুনরায় চেতনার যোগে ধীরে মিলিত হইবার ভিতর দিয়া লাভ করিতে পারা যায়।

রবীন্দ্র-কাব্যে বিশ্বের সহিত মিলিত হইবার যে আকাঙ্ক্ষা এবং এইরূপে অসম্পূর্ণতার যে পীড়া ধীরে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে তাহার জন্য রবীন্দ্র-কাব্যের কোন কোন সমালোচক রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক অনুভূতির অসম্পূর্ণতাকে দায়ী করিয়াছেন। বস্তুত এই জাতীয় অভিমত রবীন্দ্র-দর্শনকে সামগ্রিকরূপে না অনুধাবন করিবার ফলেই সম্ভব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার লক্ষ্য কি তাহা ইতিপূর্বে বারংবার উল্লেখ করিয়াছি। তাহা ব্যক্তির সহিত বিশ্বের এবং পরিণামে বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীতের যোগ। ব্যক্তির সহিত বিশ্বের এবং বিশ্বের সহিত বিশ্বাতীতের যোগকে রবীন্দ্রনাথ সামগ্রিক যোগে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। অর্থাৎ তাহা কেবল চৈতন্য-

যোগে মিলন নয়, তাহা ব্যক্তির দেহ-প্রাণ-মন ও চেতনার সহিত বিশ্বের দেহ-প্রাণ-মন ও চেতনার যোগ। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য তিনি সাধনাকে একই কালে উভয়মুখীন করিয়াছিলেন। একটি গিয়াছে সীমা হইতে অসীমের দিকে, আর একটি আসিয়াছে অসীম হইতে সীমার দিকে। এইরূপে একদিকে তিনি সীমার পরিধিকে ক্রমাগত ব্যাপক, অচিন্তনীয় বিপুল করিয়া তুলিতে যেমন সচেষ্ট, অন্যদিকে তেমনি এই বিপুল বিচিত্র সীমার লোককে তিনি যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন অসীমের সহিত।

পরবর্তীকালে যে সত্য সম্পর্কে তিনি সচেতন হন—

"সৃষ্টি রঙ্গভূমি তলে
রূপ-বিরূপের নৃত্য একসঙ্গে নিত্যকাল চলে,
সে দ্বন্দ্বের করতাল ঘাতে
উদ্দাম চরণ পাতে
সুন্দরের ভঙ্গী যত অকুণ্ঠিত শক্তিরূপ ধরে,
বাণীর সম্মোহ বন্ধ ছিন্ন করে অবজ্ঞার ভরে।"

(রূপ-বিরূপ)

এই উপলব্ধিকে ভিত্তি করিয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-সাধনাকে স্পষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত করিতে পারা যায়।—এই উপলব্ধি লাভের পূর্ববর্তী জীবন ও পরবর্তী জীবন। দুটি জীবন-সাধনার মধ্যে জন্মান্তরের পার্থক্য। পরবর্তী জীবনে সম্পূর্ণ নূতন এক বোধ-ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তিনি বিচিত্র সৃষ্টি-কর্মের ভিতর দিয়া তাহাকেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সাধনা কোন মহামানবের জীবন-সাধনায় সম্পূর্ণতা লাভের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে।

নানা রূপে বারংবার তিনি একই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জীবনের এই যে ধীর অপরূপ দুর্লভ প্রকাশ, বিশ্বের বিচিত্র রূপ-রস-গন্ধের সহিত সঙ্ঘাতে চেতনার এই ধীর বিকাশ, হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া নিয়ত এই যে বিচিত্র বোধের প্রকাশ, যাহা সমগ্র সত্তাকে মাঝে মাঝে কোন্ সীমাহীন মাধুর্য-লোকে নিমগ্ন করিয়া দিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার একান্ত বিনষ্টি ঘটে? সত্তার প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন দিব্য-চেতনার লীলা যে আছে তাহাতে সংশয় নাই। যে সত্তাকে তিনি আপন হস্তে ভাঙ্গিয়া ফেলেন, তাহাকে তিনি আবার আর কোন রূপে ফুটাইয়া তুলেন, না চিরকালের জন্য তাহা হারাইয়া যায়?

"কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে, আঁকিবে কি তুমি, শিল্পী কবি।"
(শেষ কথা)

নব জাতকের মধ্যে কবির দার্শনিক বিচিত্র জিজ্ঞাসার নানা পরিচয় আছে সত্য, কিন্তু আধ্যাত্মিক নিবিড় উপলব্ধি বলিতে যাহা বোঝায় তাহার কোন প্রকাশ এখানে নাই। সাধারণ মনুষ্য-জীবনের সহিত একাত্মতা-লাভের জন্য কবির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা ছিল নব জাতকের মধ্যে সেই দিকটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। 'এপারে ওপারে' প্রভৃতি মাত্র দুই একটি কবিতা আছে যে-ক্ষেত্রে কবি সাধারণ মানবজীবনের কিছু কিছু চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, কিন্তু তাহা কোন আবিষ্ক্রিয়া নয়। চেতনার কোন একটি নূতন দিক্‌চক্র তাহাতে উদ্ঘাটিত হইয়া যায় নাই। মানববোধের কোন একটি নূতন দিক।

"প্রাণের প্রবাহে ভেসে
বিবিধ ভঙ্গীতে ওরা মেশে
চেনা ও অচেনা
লঘু আলাপের ফেনা
আবর্তিয়া তোলে
দেখাশোনা আনাগোনা গতির হিল্লোলে।"
(এপারে ওপারে)

কবির মনের শক্তি এই কালে কতটা হ্রাস পাইয়াছিল, দার্শনিক চিন্তাও কবির অবসাদগ্রস্ত মনকে আর যে তেমন করিয়া উৎসুক করিতে পারিতেছে না,—একপ্রকার অসহায় শূন্যতাবোধ, তাহা এই কবিতার পরবর্তী অংশ পাঠ করিলে স্পষ্টই বোধ করিতে পারা যায়।

"জীবনের তথ্য যত ফেলে রেখে দূরে
জীবনের তত্ত্ব যত খুঁজি,
নিঃসঙ্গ মনের সঙ্গে যুঝি,

সারাদিন চলেছে সন্ধান
দুরূহের ব্যর্থ সমাধান।
মনের ধূসর কূলে
প্রাণের জোয়ার মোরে একদিন দিয়ে গেছে তুলে।"
(এপারে-ওপারে)

সানাই

জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সত্যোপলব্ধি নিত্য নূতন হয় না, তাহার ধীর বিকাশ ও পরিণতির একটি ধারা থাকে মাত্র, এবং পূর্ণতা লাভের পর স্রষ্টা তাহাকে নানারূপে প্রকাশ করিয়া চলেন। একই উপলব্ধিকে ফিরিয়া ফিরিয়া বলা। কবির পরবর্তী কাব্য-ধারার মধ্যে পরিণত সত্য-বোধের বিচিত্র প্রকাশই লক্ষ্য করা যায়।

সীমা ও অসীমের সম্পর্ক নিরূপণের উপর বিচিত্র দর্শন গড়িয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন-দর্শনও স্বাভাবিকভাবে এই উভয়ের সম্পর্ক নিরূপণের উপর দাঁড়াইয়া আছে। বর্তমান কাব্যের মধ্যে দুটি কবিতা আছে, 'সানাই' ও 'যক্ষ' যাহাদের মধ্যে তিনি এই উভয়ের যোগের স্বরূপ নির্দেশ করিয়াছেন।

একদিকে আছেন অসীম বা পূর্ণ। তিনি চিরস্থির, আপনার মহিমায় আপনি চির সমাসীন।

"সেথাকার রাত্রিদিন দিনহারা রাতে
পদ্মের কোরক-সম প্রচ্ছন্ন রয়েছে আপনাতে।"(সানাই)

আর অন্যদিকে সীমা বা রূপের লোক। এই সীমা বা রূপ যে অসীম বা অরূপ হইতে বিচ্ছিন্ন সত্তা নহে, বরং সেই এক অসীম বা অরূপই যে দেশ-কালের মধ্যে অন্তহীন সীমা-রূপ লাভ করিয়াছে, সীমা যে অসীমের মাধুরীকে নিয়ত চঞ্চলতার ভিতর দিয়া কেবলই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে, এই দিক দিয়া সীমা যে তত্ত্বত অসীম,—এই বোধ রবীন্দ্রনাথের ছিল। অসীমের সীমা-রূপ লাভকেই তিনি বলিয়াছেন, 'ইন্দ্রজাল'। ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা 'অনির্বচনীয়' 'মায়া।'

"বিশ্বের যে মূল উৎস হতে
সৃষ্টির নির্ঝর ঝরে শূন্যে শূন্যে কোটি কোটি স্রোতে
এ রাগিণী সেথা হতে আপন ছন্দের পিছু পিছু

নিয়ে আসে বস্তুর অতীত কিছু
হেন ইন্দ্রজাল
যার সুর যার তাল
রূপে রূপে পূর্ণ হয়ে উঠে
কালের অঞ্জলিপুটে।" (সানাই)

মহান্ কবি বা শিল্পী কোন-না-কোন রূপে সৃষ্টির এই রহস্যকে কতকটা ভেদ করিতে পারেন, যে রহস্যকে আশ্রয় করিয়া অসীম নিয়তই সীমারূপে অন্তহীন ধারায় নিম্নে বহিয়া আসিতেছেন। এই রহস্যকে যিনি যতখানি আয়ত্ত করিতে পারেন, তাঁহার সৃষ্টি তত অফুরন্ত, তত অপরূপ, অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরিয়া উঠিতে থাকে।

রূপ-লোকের অচিন্তনীয় নিয়ত রূপান্তরতা সত্ত্বেও যে একটা প্রত্যয় কোন-না-কোন রূপে আমরা লাভ করিতে পারিতেছি, ইহার পশ্চাতে একটি স্থায়ী সত্তা আছে বলিয়া। এই স্থায়ী সত্তার একটি নির্দিষ্ট ধ্যান দেশ-কালের মধ্যে রূপ-লোক আশ্রয় করিয়া ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

ভারতীয় দর্শনে সীমা ও অসীমের যোগের তত্ত্ব লীলার দিক দিয়া কোথাও স্বীকৃত হইলেও তাহার এমন প্রকাশ যে কোথাও নাই তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়। কেবল তাহাই নহে, রূপের জগতে পরিবর্তনের পশ্চাতে যে একটি স্থির অভিপ্রায় আছে এবং ইহার ভিতর দিয়া যে মূল্যেরও পরিবর্তন ঘটিতেছে, এই সত্য ভারতীয় দর্শনে বীজরূপে কোথাও থাকিলেও ('মানুষের ধর্ম' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ অথর্ববেদ এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন) তাহার ব্যাখ্যাশ্রয়ী একটি সামগ্রিক দর্শন যে একমাত্র তিনিই গড়িয়া তুলেন তাহাতে সংশয় নাই। মানুষের মুক্তি যে নিখিল মানবের সামগ্রিক মুক্তির সহিত জড়িত, মুক্তি বলিতে সমগ্র সত্তার পূর্ণতা, সেইজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের পূর্ণতা বুঝায় এই নিঃসংশয় সত্যবোধও রবীন্দ্র-দর্শনে নূতন। রূপের জগতে সেই ধীর বিকাশের পরিচয়—

"এই সুর প্রত্যহের অবরোধ 'পরে
যতবার গভীর আঘাত করে
ততবার ধীরে ধীরে কিছু কিছু খুলে দিয়ে যায়
ভাবীযুগ আরম্ভের অজানা পর্যায়।" (সানাই)

সীমা-লোকের মধ্যে অপূর্ণতার বোধ আছে বলিয়াই সীমার মধ্যে

অনির্বচনীয়তার এমন প্রকাশ। এই অপূর্ণতার বেদনা বক্ষে লইয়া রূপ নিত্য নব রূপতা লাভ করিয়া চলিয়াছে, নিত্য নূতন মাধুরী ক্রমাগত অফুরান হইয়া উঠিয়াছে। অপূর্ণতা পূর্ণকে লাভ করিতে চায়, তাহার এই নিয়ত ব্যাকুল প্রার্থনায় সৌন্দর্যের আনন্দ-লোক নিয়ত উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইতেছে। ব্যবধান বা বিচ্ছেদ আছে বলিয়া গান জাগে সে গানে সীমা সীমা-রূপেই অতল মাধুরীর সন্ধান দেয়। ব্যথার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া এই যে অমৃত শতদলের প্রকাশ, ইহার সৌন্দর্যে কবির প্রাণ-মন ভুলিয়াছে। ইহার আনন্দাস্বাদ কবির নিকট পূর্ণতার আস্বাদকেও অনাকাঙ্ক্ষিত করিয়া দিয়াছে।

"পথিক কালের মর্মে জেগে থাকে বিপুল বিচ্ছেদ ;
পূর্ণতার সাথে ভেদ
মিটাতে সে নিত্য চলে ভবিষ্যতের তোরণে তোরণে
নব নব জীবনে মরণে।" (যক্ষ)

পূর্ণতার মধ্যে এই ঐশ্বর্যের প্রকাশ নাই।

"নিত্যপুষ্প নিত্য চন্দ্রালোক,
অস্তিত্বের এত বড় শোক,
নাই মর্ত্যভূমে
জাগরণ নাহি যার স্বপ্নমুগ্ধ ঘুমে।" (যক্ষ)

অসীমের স্থির পাষাণবক্ষের উপর সীমা ক্রমাগত আছড়াইয়া পড়িয়া তাহাকে মুখর করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন ; আর নিত্যকাল ধরিয়া উচ্চারণ করিয়া চলিয়াছে চির অনুনয়ের বাণী, 'কথা কও কথা কও'।

"স্তব্ধগতি চরমের স্বর্গ হতে
ছায়ায় বিচিত্র এই নানা বর্ণ মর্ত্যের আলোতে
উহারে আনিতে চাহে
তরঙ্গিত প্রাণের প্রবাহে।" (যক্ষ)

কবি-চেতনা সেই পরিণাম লাভ করিতে চাহিয়াছেন, যে পরিণামে অসীমের পরিপূর্ণ আনন্দ-লীলাটিকে সাক্ষাৎ করা সম্ভব। অসীম নিত্যকাল ধরিয়া কাল-স্রোতে সংখ্যাতীত রূপের-তরী ভাসাইয়া দিতেছে। তাহারা ক্ষণকাল ভাসিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। চিরস্থির দিগন্ত-প্রসারিত নির্মল আকাশের বক্ষে কোথা হইতে মেঘ আসিয়া জমে, আপনার বক্ষে বিচিত্র রঙ্গের ছবি ফুটাইয়া

তুলিয়া আবার কোথায় হারাইয়া যায়। সমগ্র বিসৃষ্টি অসীমের বক্ষে এমনি লীলা মাত্র। ক্ষণেক প্রকাশ অন্তে আবার অবসান লাভ।

"ফেনোচ্ছল সে নদীর বন্ধহারা জলে
পণ্য তরী নাহি চলে,
কেবল অলস মেঘ ব্যর্থ ছায়া-ভাসানের খেলা
খেলাইছে এবেলা ওবেলা।" (দূরের গান)

আমার এই সত্তা বিশ্বের অগণিত সত্তার মত দুর্বার প্রাণের স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া তেমনি এক রূপের তরণী, এক ছিন্ন তান। ক্ষণকালের জন্য ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইবে।

বিশ্বের সৌন্দর্য ও নারীর প্রেম আশ্রয় করিয়া হৃদয়ে যে-সৌন্দর্য-লোক, স্বপ্ন-লোক গড়িয়া উঠে, সেই সৌন্দর্যই তো ক্ষণে ক্ষণে চেতনাকে বেদনায় নিপীড়িত করিয়া সেই সীমাহীন লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দেয়, যেখানে সংখ্যাতীত রূপ-লোক বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠিয়া বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। নিকটতম সত্তা সেই দূরতম লোকের আলোকে ছায়াছবির মত বিচরণ করিতে থাকে।

"নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে;
চেয়ে চেয়ে দেখি সেই নিকটতমারে
অজানার অতিদূর পারে।" (দূরের গান)

চেতনার সেই সমুন্নতি লাভ ঘটিলে তাহারই আলোকে বিশ্বের যে রূপ ফুটিয়া উঠে কবির কাব্যে তাহারই চকিত আভাস লাভ করিতে পারি মাত্র।

কবির কাব্যে সেই তত্ত্বের প্রকাশ আছে, যে তত্ত্ব আশ্রয় করিয়া অসীম নিত্যকাল ধরিয়া আপনাকে অন্তহীন রূপে রূপে উৎসর্জিত করিতেছেন।

কবির কাব্যে সৌন্দর্য-লোকের প্রকাশ আজ তেমন করিয়া ঘটে না। ইহার ধীর ম্লানিমার একটি ধারাও পূর্বাপর নির্দেশ করিয়াছি। ইহার কারণ, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মনের সামর্থ্যের ধীর অবসান। তাহার ফলে বিশ্ব-সত্তা বা 'তুমি'র মাধুর্য ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে।

আর একটি ধারাও লক্ষ্য করিয়াছি, জীবনের অসুন্দর ভাগের প্রতি তাঁহার ইতিপূর্বের ঔদাসীন্যের জন্য তীব্র পীড়াবোধ। ইহাই যে নিয়তিস্বরূপ হইয়া কবিকে সাধনার সর্বশেষ সিদ্ধিলাভের ক্ষেত্রে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি। কবির সাধনার অসম্পূর্ণতা-বোধ যেমন তেমনি এই

নিয়তিকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা কবির জীবনে দিনে দিনে প্রবল হইয়া উঠিতে থাকে।

কবির অধ্যাত্ম-সাধনা বা কাব্য-সাধনার ধীর পরিণামের ক্ষেত্রে এই দুটি ধারাই ওতপ্রোত হইয়া আছে। বিশ্ব-সত্তায় সুন্দর-অসুন্দর ভাগ বলিয়া কিছু নাই। বিশ্ব-সত্তা যখন কেবলমাত্র মাধুর্যরূপে প্রকাশমান তখনও তাহা যেমন সম্পূর্ণ সত্য নয়, তাহা যখন আবার শুধুই নির্মম, কঠোর ও ভীষণ তখনও তাহার প্রকাশ অসম্পূর্ণ। তাহা উভয়ের মিলনে এক পরমাশ্চর্য প্রকাশ।

"এ নহে তো ঔদাসীন্য, নহে ক্লান্তি, নহে বিস্মরণ
ক্রুদ্ধ এ বিতৃষ্ণা তব মাধুর্যের প্রচণ্ড মরণ," (বিপ্লব)

বিশ্ব-প্রকৃতির আচ্ছন্ন রূপকে তিনি একদিন 'ঔদাসীন্য', 'ক্লান্তি' ও 'বিস্মরণ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আমরা সে পরিচয় লাভ করিয়াছি। আজ তিনি নিঃসংশয়ে বোধ করেন, প্রকৃতির মাধুর্য-রূপ যদি অন্তর্হিত হইয়া গিয়া থাকে তবে তাঁহার জীবনে প্রকৃতি আর এক সাধনাকে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে চান। নিরাভরণ শক্তির সেই নির্মম, ভয়ঙ্কর সাধনাকে তিনি জীবনে সত্য করিয়া তুলিবেন। পূর্বের সাধন-ধারাকে পরিহার করিয়া এক নূতন সাধন-পথে যাত্রার জন্য তিনি আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন।

"তবে তাই হোক,
ফুৎকারে নিবায়ে দাও অতীতের অন্তিম আলোক।
চাহিব না ক্ষমা তব, করিব না দুর্বল বিনতি,
পরুষ মরুর পথে হোক মোর অন্তহীন গতি,
অবজ্ঞা করিয়া পিপাসারে,
দলিয়া চরণতলে ক্রূর বালুকারে।" (বিপ্লব)

প্রেমে বাহিরের রূপকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে বিস্ময়ের আর অন্ত থাকে না। তাহাকে নিত্য নূতন ভাবে আমরা লাভ করিতে আস্বাদ করিতে পারি, কিন্তু নিঃশেষ করিয়া দিতে পারি না। এই মাধুর্য (মায়া) আস্বাদের ভিতর দিয়া আমাদের চেতনা কোন্ অতলতায় তলাইয়া গিয়া স্বপ্নাবিষ্ট চোখে এক দিব্য-রূপের আভাস লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যায় তাহাকে বাহিরে লাভ করিবার কোন উপায় নাই।

"অনন্তের সমুদ্রমন্থনে
গভীর রহস্য হতে তুমি এলে আমার জীবনে।
* * *
তোমা মাঝে শিল্পী তার রেখে গেছে তর্জনীর মানা,
সব নহে জানা।" (জ্যোতির্বাষ্প)

'মায়া' রূপাশ্রয়ী অনির্বচনীয়তার সেই তত্ত্ব যাহাকে আশ্রয় করিয়া এক অলৌকিক মুহূর্তে অন্তরে চিরকালের জন্য এক সৌন্দর্য-লোক সৃষ্ট হইয়া যায়। তাহার পর হইতে বাহিরের রূপ গৌণ হইয়া যায়। অন্তরের রূপকে আশ্রয় করিয়া পুরুষের চেতনা নব নব সৌন্দর্য-লোক সৃষ্টি করিয়া চলে।

"আমার জীবনে তুমি আজ শুধু মায়া;
সহজে তোমায় তাই তো মিলাই সুরে,
সহজেই ডাকি সহজেই রাখি দূরে।" (মায়া)

বাহিরে রূপের জগতে নিয়তই পরিবর্তন ঘটিতে থাকে, কিন্তু তাহা অন্তরের সৌন্দর্য-লোকটিকে স্পর্শমাত্র করিতে পারে না। প্রেমে সৌন্দর্য-ধ্যান নর-নারীর একটি রূপ চিরন্তন হইয়া থাকে। বাহিরের রূপের সহিত তাহার আর মিল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

"যদি জীবনের বর্তমানের তীরে
আস কভু তুমি ফিরে
স্পষ্ট আলোয় তবে
জানি না তোমার মায়ার সঙ্গে
কায়ার কি মিল হবে।" (মায়া)

প্রেমে অন্তরে যে মানসী মূর্তি চিরন্তনী হইয়া ফুটিয়া উঠে, সে মূর্তি কি পুরুষের চেতনাকে পরিণামে মুক্তি দিতে পারে, যদি না নারীর অন্তরে প্রেম উপলব্ধ হয়? এমনি একপ্রকার সংশয়মূলক জিজ্ঞাসা রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ছিল। প্রেমের সাধনা যুগলের সাধনা। কেবল সৌন্দর্য-বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য-লোক গড়িয়া উঠে তাহা পুরুষের চেতনাকে পরিণামে মুক্তি দেয় না। সৌন্দর্যের সাধনা যে অর্থে মায়ার সাধনা তাহা প্রেমাশ্রয়ী। অর্থাৎ উভয়ের প্রেমে উভয়ের অন্তরে যে মায়া-জগৎ গড়িয়া উঠে, একমাত্র তাহাই নর-নারীকে মুক্তি দেয়।

সৌন্দর্য-সাধনায় মুক্তি কি তাহা পুরুষ উপলব্ধি করিয়াছে। নারী রূপকে বেষ্টন করিয়া যে মায়া তাহা পরিণামে মায়ার অতীত সত্তার অভাব দান করে।

নারীর মধ্যে প্রেম না থাকিলেও নারী-রূপ পুরুষের চেতনায় রূপের অতীত সত্তার প্রতি নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে; কিন্তু নারীর মধ্যেও যদি সেই প্রেম সত্য না হয় তাহা হইলে পুরুষের একক প্রেম সাধনার শেষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। তাহার অন্তর নিয়ত অশ্রুমুখী হইয়া থাকে।

"অস্পষ্ট তোমারে যবে
ব্যগ্র কণ্ঠে ডাক দিই অত্যুক্তির স্তবে
তোমারে লঙ্ঘন করি সে-ডাক বাজিতে থাকে সুরে
তাহারি উদ্দেশে আজো যে রয়েছে দূর
হয়তো সে আসিবে না কভু,
তিমিরে আচ্ছন্ন তুমি তারেই নির্দেশ কর তবু।" (শেষ কথা)

উভয়ের প্রেমে উভয়ে সার্থকতা লাভ করে। এক পক্ষের বঞ্চনায় উভয়েই সার্থকতা হইতে বঞ্চিত হয়।

"আমারে যা পারিলে না দিতে
সে-কার্পণ্য তোমারেই চিরদিন রহিল বঞ্চিতে!" (শেষকাল)

দূরে ধ্যান-মূর্তিতে পাওয়াই সত্যকারের পাওয়া। তাহাতে চেতনা বিচিত্র রূপ-সৃষ্টির ভিতর দিয়া মুক্তি লাভ করে। মিলনে এই সৌন্দর্য-ধ্যান ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে আসক্তি একান্ত হইয়া উঠে। পুরুষের জীবনে তাহা ঘোর বিনষ্টিকর।

"ছায়া তোমার মনের কুঞ্জে ফিরত চুপে চুপে
কায়া নিত অপরূপের রূপে।" (দূরবর্তিনী)

বাহিরে রূপের জগতে নিয়ত পরিবর্তন ঘটিতেছে, এক-একটি অলৌকিক মুহূর্তে বাহিরের বিচ্ছিন্ন এক-একটি রূপ অন্তরে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। ইহাই মায়া-তত্ত্ব। এই অচঞ্চল এক-একটি রূপ আশ্রয় করিয়া নর-নারী বিচিত্র রূপ সৃষ্টি করিয়া চলে। এই সৃষ্ট রূপ কত বারবার সেই লোকের আভাস দান করে, যেখান হইতে বাক্য ও মন প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।

"বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।" (মানসী)

'সানাই', 'অনসূয়া' কবিতা দুইটি আলোচনা করিবার পূর্বে নবজাতকের রোমান্টিক কবিতাটি উল্লেখ করা প্রয়োজন।

আমরা জানি কবির বাস্তব জীবনের নিকট-সংস্পর্শ লাভের আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে ছিল অতি গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা। কত ব্যক্তি-সত্তাকে এইরূপে সুসম্পূর্ণ এবং ফলবান করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।

কবির আত্ম-সম্বন্ধীয় এই যেমন একটি দিক, তেমনি পরসম্বন্ধীয় দিকটি হইল আপনার অন্তশ্চেতনায় লব্ধ পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার আকাঙ্ক্ষা।

রোমান্টিক কবিতাটির মধ্যে কবির এই উভয়জাতীয় প্রেরণার কোন একটিরও প্রকাশ নাই। কবির সৌন্দর্য ও প্রেমের ধ্যান এবং বাস্তব জীবন এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। মানব-সত্তায় এই উভয়মুখীন প্রেরণার মধ্যে কোন যোগ নাই। কেবল তাহাই নয়, বাস্তব জীবনের নগ্নতা, দুঃখ, বঞ্চনা ও বিচিত্র লাঞ্ছনাকে যেন একপ্রকার চিরন্তন নিয়তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, মানুষ তাহাদের বিরুদ্ধে যতই সংগ্রামতৎপর হোক না কেন। এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-জীবনে যে আধ্যাত্মিক ফললাভ তাহার কোন ইঙ্গিত এখানে নাই।

'সানাই' কবিতাটির মধ্যে বাস্তব জীবনের যে নগ্ন পরিচয় আছে, তাহার মধ্যে শ্রদ্ধার মনোভাবটি কিছুমাত্র ফুটিয়া উঠে নাই। ইহা আদৌ সেই দৃষ্টি দিয়া দেখিবার চেষ্টা নয়; বরং সৌন্দর্য-কল্পনায় বিভোর হইয়া কবি ইহার প্রকাশনে যতদূর শীঘ্র সম্ভব বিস্মৃত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'অনসূয়া' সম্পর্কেও ঠিক এই একই মন্তব্য করা যাইতে পারে। রোমান্টিক সৌন্দর্য-কল্পনার বাহিরে আসিয়া কবির জীবনে যে প্রকৃত আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা দেখা দেয়, তাহা একদিকে অমর্ত্য সত্যলাভের জন্য কবিকে যেমন ধ্যানতন্ময় করে, তেমনি সেই প্রকৃত আধ্যাত্মিক প্রেরণার জন্যই তাহা অন্যদিকে কবি-চেতনাকে মানব-সংসারে বিচিত্র দিগ্‌গ্রাহি করিয়া তুলে। কবির জীবনে সেই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা 'সানাই' কাব্যের মধ্যে অনেকাংশে আচ্ছন্ন স্তিমিত।

শেষের চারটি কাব্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিয়াছেন এমন একটি জগতে যাহার পূর্বপ্রকাশ কতকটা দেখা দিয়াছিল একমাত্র প্রান্তিকের মধ্যে। কবির রোগক্লিষ্ট চেতনার সহিত মিশিয়াছে বিচিত্র আধ্যাত্মিক অনুভূতি। মৃত্যুর আলোকে পরমের সহিত তাঁহার শেষবারের মত বোঝাপড়া। এই জগতের উপলব্ধির পরিমাপ তাই সাধারণ-সাহিত্যের নিয়মে সম্ভব নয়।

সেই সুদুঃসহ অনুভূতির তাপে বিগলিত হইয়া কবির কাব্যের ভাষা আশ্চর্য দীপ্তিবিজড়িত, গভীরতম অনুভূতিকে চিত্তে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিবার জন্য তাহা একান্ত নিরাভরণ, তাহা হইতে মোহাবেশের সকল বর্ণ বিলুপ্ত। স্বল্পবাক্, অতিগম্ভীর ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ, আধ্যাত্মিক বোধের সহিত মিশিয়াছে কবির বহু বিচিত্র বোধ। তাহার ফলে কবির এখনকার খণ্ডকাব্য মহাকাব্যোচিত বোধ-বৈচিত্র্য ও নাটকীয়তায় সমৃদ্ধ।

বিপরীতের প্রেরণা বিরুদ্ধতার সমাবেশ রবীন্দ্র-কাব্যে সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়; কিন্তু এই পর্যায়ের কাব্যে তাহা বিপুল বৈচিত্র্য ও গভীরতা লাভ করিয়াছে। অথচ প্রকাশ এমনি সংযত, এমনি গভীর, এতদূর অনলঙ্কৃত যে তাহা প্রথম দৃষ্টিপাতে কাব্যোচিত বলিয়াই বোধ হয় না। এই বিরল ঐশ্বর্যের প্রকাশ রবীন্দ্র-কাব্যে ইতিপূর্বে ধরা পড়ে নাই।

সেই চিরজ্যোতির্ময় লোকে প্রবেশ করিতে চেতনাকে যে বহুবিচিত্র আধ্যাত্মিক সঙ্কটের ভিতর দিয়া যাইতে হয়, মারের যে বিচিত্র লীলা, হৃদয়রাজ্যে কুরুক্ষেত্রের যে মহাসংগ্রাম কবি তাহাকেই রূপায়িত করিয়াছেন এই সকল স্বল্পবাক্ মর্মভেদী কবিতার ভিতর দিয়া।

কবি-চেতনা এখন ইন্দ্রিয়ের সর্ব বন্ধনমুক্ত। জীবন ও জগতের নিগূঢ় নিয়ম-জাল কবির দৃষ্টিতে এখন ধরা পড়িয়াছে। জীবন ও জগৎকে বিধৃত করিয়া আছে যে পরিব্যাপ্ত সুষমা, কবি এখন অনায়াসে তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতেছেন কবির বোধের দৃষ্টি এবং ভাষা এখন তাই অতি স্বচ্ছ। কবির এখনকার ভাষা ঋষি-কবিদের ভাষার ন্যায় অনুমান ও ইঙ্গিত-ধর্মী হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ দুইটি কাব্যে কবির বিশ্বের সহিত বন্ধন আরো শিথিল হইয়াছে। কিংবা বন্ধন আদৌ নাই। এখন কবি সাধকদের চিরনির্দেশিত পথে অবি-চলিত শ্রদ্ধায় পথ চলিয়াছেন। এখনকার কাব্যে আবেগ ও মননশীলতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও শাশ্বত দর্শন মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। কী এক দুরন্ত বর্তিকা, এক দূরপ্রসারী দৃষ্টি, একান্ত সহজ সরল কয়েকটি শব্দের বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া ধীর, আবেগে কম্পমান, অথচ প্রতিটি শব্দপ্রয়োগের মধ্যে রহিয়াছে ভাস্কর্যসুলভ কাঠিন্য।

রোগ-শয্যায়

বিশ্বের একদিকে নিরন্তর সৃষ্টি, অন্যদিকে নিরন্তর বিনষ্টি। একদিকে অফুরান ঐশ্বর্যের সংহৃতি, অন্যদিকে তাহার মহৎ সংহার। সঞ্চয় ও অপচয় প্রকাশ ও অপ্রকাশ—এই উভয়কে আশ্রয় করিয়া এক মহান্ অস্তিত্বের প্রকাশ। রূপ আপনার সৃষ্টি, রূপান্তর ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া সেই এক পরম অস্তিত্বের নিত্যপ্লাবী আনন্দকে নিয়ত প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে। তাহাকে যে-নামে চিহ্নিত করা যাক-না-কেন, সকল সত্তার মত কবির সত্তা তাহারই বক্ষে জন্ম লাভ করিয়া আবার তাহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।

"চলমান রূপহীন যে বিরাট, সেই
মহাক্ষণে আছে তবু ক্ষণে ক্ষণে নেই।
স্বরূপ যাহার থাকা আর নাই-থাকা,
খোলা আর ঢাকা,
কী নামে ডাকিব তারে অস্তিত্ব প্রবাহে—
মোর নাম দেখা দিয়ে মিলে যাবে যাহে।"

যাহারা কবির অন্তরে অতুল প্রাণের সম্পদ আনিয়া দিয়াছে, যাহাদের মধ্য দিয়া কবির অন্তর সুখ-দুঃখের বিচিত্র দোলায় দোল খাইয়াছে, জীবন-নাট্যের রঙ্গমঞ্চে একে একে তাহারা যবনিকার অন্তরালে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে। যাহাদের আশ্রয় করিয়া কবির প্রাণধারা ক্রমাগত প্রসারতা লাভ করিয়াছে, একে একে তাহাদের হারাইয়া সেই প্রাণধারা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে।

নির্জন অবসরে সেই প্রিয়জনদের স্মৃতি কবির অন্তরকে আকুল করিয়া তুলে। তাহাদের ছায়ামূর্তি অন্তর হইতে একে একে বাহির হইয়া দূর আকাশ-পটে ভাসিয়া বেড়ায়। সেইদিকে স্থির দৃষ্টি মেলিয়া অনুরাগে ফিরিয়া ফিরিয়া তাহাদের নামের মালা জপিতে জপিতে কখন বেলা বহিয়া যায়। প্রকাশশূন্য অসহায় একপ্রকার বেদনাবোধ।

"আজকে তারা এল আমার
স্বপ্নলোকের দুয়ার ঘিরে
সুরহারা সব ব্যথা যত
একতারা তার খুঁজে ফিরে।"

কোন একটি সত্তাকে আশ্রয় করিয়া কবির অন্তরে যখন প্রাণ উপলব্ধ হয়, তখন কবি সেই উপলব্ধির ভিতর দিয়া বোধ করিতে পারেন যে নিখিল বিশ্ব

পরিব্যাপ্ত প্রাণের মধ্যেই সকল প্রাণ সঞ্জীবিত। প্রাণের ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রাণ আপনাকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করিতেছে।

"যখন সহসা দেখি
তোমার জাগ্রত আবির্ভাব,
মনে হয়, যেন
আকাশে অগণ্য গ্রহতারা
অন্তহীন কালে
আমারি প্রাণের দায় করিছে স্বীকার।"

এই বোধের প্রকাশ বর্তমান কাব্যে একাধিক কবিতায় লক্ষ্য করা যায়। যেমন প্রারম্ভের 'উৎসর্গ' কবিতাটি।

যে অপার প্রাণধারা বিশ্বের অন্তরালে থাকিয়া পশু-পক্ষী তৃণ-তরু-লতায় নিয়ত প্রাণ সঞ্চারিত করিতেছে, যাহা কিছু জীর্ণ, বিদীর্ণ, বিশুষ্ক তাহাকে ঝরাইয়া দিয়া নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটাইতেছে, সেই এক প্রাণের নিগূঢ় ক্রিয়াকে তিনি নিয়ত সেবারতা দুটি নারীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"বিশ্বের আরোগ্য লক্ষ্মী জীবনের অন্তঃপুরে যাঁর
পশুপক্ষী তরুতে লতায়
নিত্যরত অদৃশ্য শুশ্রূষা
জীর্ণতায় মৃত্যু পীড়িতেরে
অমৃতের সুধা স্পর্শ দিয়ে,
রোগের সৌভাগ্য নিয়ে, তাঁর আবির্ভাব
দেখেছিনু যে-দুটি নারীর
স্নিগ্ধ নিরাময় রূপে—"

কিংবা সর্বশেষ কবিতাটি।

সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যে প্রাণ, যে চেতনা, যে পরিব্যাপ্ত অখণ্ড শান্তি, নারীর মধ্যে তিনি তাহারই প্রকাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

"দেখি, তুমি নতশিরে বুনিছ পশম
বসি মোর পাশে
সৃষ্টির অমোঘ শান্তি সমর্থন করি।"

পরম তত্ত্ব লাভের দৃঢ়সঙ্কল্প লইয়া গৌতম বুদ্ধ বোধিবৃক্ষমূলে ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। বারংবার তাঁহার এই প্রয়াস ব্যর্থ হইয়া গেল। সেদিন সুজাতা পায়সান্ন রন্ধন করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। তিনি তাহা গ্রহণ করিয়া আবার ধ্যাননিমগ্ন হইলেন। তাঁহার সুচির আকাঙ্ক্ষা সেদিন সফল হইল। সেই

সিদ্ধিলাভের পশ্চাৎ-রহস্য কি? কবি বলিতেছেন যে, সেই দিনই তিনি প্রত্যক্ষ করেন, যে যে-চেতনা নিখিল বিশ্ব পূর্ণ করিয়া শূন্যে শূন্যে বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই চেতনাই পরমাশ্চর্যরূপে সুজাতার প্রেমে, তাঁহার অপার করুণায় তাঁহার কল্যাণ-ব্যাপ্ত সৌন্দর্য-মাধুর্যের মধ্যে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

জীবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের এই স্বরূপ বিশ্লেষণ কবি বহুকাল পূর্বে করিয়াছিলেন। আজ আপনার জীবনে সেই শ্রেষ্ঠ সাক্ষাৎকার লাভ সম্ভব হইয়াছে।

একথা সত্য প্রাণ-মনের অসামর্থ্যের জন্য আজ কবি আপনার বিচিত্র কল্পনাকে সার্থক রূপদান করিতে পরিতেছেন না। অন্তশ্চেতনায় অবশ বিচিত্র সৌন্দর্য্য-কল্পনা ও ভাবনা কেবল ভাসিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

সৃষ্টির আদিম অবস্থা কি এমনি ছিল? এমনি আকারহীন, মূঢ়, মূক, বিকলাঙ্গ স্বপ্নের কেবল উঠা ও নামা? তাহার পর কোন্ রূপকারের স্পর্শে তাহা এই সৌন্দর্যরূপে প্রকাশলাভ করিয়াছে? তাঁহার সেই ধ্যান তো সৃষ্টির মধ্যে আজও সম্পূর্ণ হয় নাই। নিয়ত গ্রহণ ও বর্জন, প্রকাশ ও অপ্রকাশের ভিতর দিয়া তাঁহার ধ্যান ধীরে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে।

"অপেক্ষা করিছে অন্ধকারে
কালের দক্ষিণ হস্তে পাবে কবে পূর্ণ দেহ,
বিরূপ কদর্য নেবে সুসংগত কলেবর
নব সূর্যালোকে।
মূর্তিকার দিবে আসি মন্ত্র পড়ি,
ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিবে বিধাতার অন্তর্গূঢ় সঙ্কল্পের ধারা।"

মৃত্যুতে কবি কি কোন এক উন্নতর চেতনালোকে জাগিয়া উঠিবেন যেখানে এই জীবনের সকল অসম্পূর্ণতা একটি পুষ্পিত গোলাপের মত পূর্ণ সুষমায় ফুটিয়া উঠে? এ সম্পর্কে কবির অন্তরে কোন সংশয় ছিল না।

সৃষ্টির নিয়ত পরিবর্তন, প্রকাশ ও অপ্রকাশের মধ্যে যে একটি বিকাশের ধারা আছে এই সম্পর্কে কবির যে একটি গভীর অধ্যাত্ম-প্রত্যয় ছিল, তাহার বিচিত্র প্রকাশ আমরা তাঁহার ইতিপূর্বের রচনায় লাভ করিয়াছি। নিম্নের উদ্ধৃত অংশটির মধ্যে এই বোধেরই পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"দারুণ ভাঙ্গন এযে পূর্ণেরই আদেশে।
কী অপূর্ব সৃষ্টি তার দেখা দিবে শেষে

গুড়াবে অবাধ্য মাটি, বাধা হবে দূর,
বহিয়া নূতন প্রাণ উঠিবে অঙ্কুর।"

এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া যে-প্রাণ তাহার অফুরন্ত ঐশ্বর্যের প্রকাশ ঘটায় পরিণত বয়সে সেই প্রাণই সত্তা হইতে সকল সম্পদ একে একে হরণ করিয়া লয়। জীবনের এই নিয়তি-সাক্ষাৎকারের মধ্যে মানুষের কোন সান্ত্বনা নাই। প্রাণ-সম্পদের হরণ-পূরণের ভিতর দিয়া সুখ-দুঃখ-বোধের বিচিত্র লীলাকে আশ্রয় করিয়াই মানুষ এমন একটি সত্তার নিঃসংশয় অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়াছে, যাহা চির-জ্যোতির্ময় চিরস্থির। বঞ্চিত প্রাণের লাঞ্ছনার ভিতর দিয়া কবি সেই বোধ-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। তাহারই জন্য প্রার্থনা।

"যে প্রভাত-সূর্য,
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত,
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,—"

কবি বারংবার তাহারই চকিত আভাস লাভ করিয়াছেন, যাহা সকল সীমিত বোধের পরপারবর্তী। মৃত্যুতে জাগতিক সকল সীমিতবোধ পুষ্পের বহিরাবরণের মত জীর্ণ হইয়া ঝরিয়া যাইবে, আর তাহারই ভিতর দিয়া পরিপূর্ণ লোকের প্রকাশ ঘটিবে পূর্ণ বিকশিত পুষ্পের মত। মৃত্যুতে সেই আদি চৈতন্য-সাগর কূলে জাগিয়া উঠা যেখানে এই সংখ্যাতীত রূপ বুদ্‌বুদের মতো নিয়ত জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে।

"সে দেয় জানায়ে
এই ঘন আবরণ উঠে গেলে
অবিচ্ছেদে দেখা দিবে
দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতি,
শাশ্বত প্রকাশ পারাবার,—"

রূপের নিরন্তর ভাঙ্গা-গড়া, সৃষ্টি ও বিনষ্টি, নিয়ত রূপান্তরতার ভিতর দিয়া কেবল উদ্দেশ্যহীন এক শক্তির প্রবাহ চলিয়াছে ; (বৌদ্ধ স্পন্দবাদের মধ্যে যাহার

প্রকাশ দেখি) কিংবা এই সকলকে আশ্রয় করিয়া এমন এক জ্ঞানময়, চৈতন্যময় সত্তা বিরাজিত যাহার নিকট রূপ-বিরূপের কোন পার্থক্য নাই, অস্তিত্বের যে কোন প্রকাশ সম্পর্কে যাহা সম্পূর্ণ উদাসীন (সাংখ্যের প্রকৃতি-পুরুষ অথবা অদ্বৈত-বেদান্তের মায়া-তত্ত্ব) ইহার কোন একটি সত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল না।

পরমের একটি ধ্যান এই সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশলাভ করিয়াছে। সকল সৃষ্টি ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া সকল অবস্থাতেই অনন্তকোটি গ্রহলোকাশ্রয়ী এই রূপ-জগৎ এক আশ্চর্য সুষমার চিরস্থির আদর্শকে প্রকাশ করিতেছে।

"লক্ষ কোটি গ্রহতারা আকাশে আকাশে
বহন করিয়া চলে প্রকাণ্ড সুষমা,
* * *
ঐ তো আকাশে দেখি স্তরে স্তরে পাপড়ি মেলিয়া
জ্যোতির্ময় বিরাট গোলাপ।"

বিশ্বকে এইরূপে পরিপূর্ণ সুষমা, আনন্দ ও অমৃত রূপে উপলব্ধি করাই জীবনের শ্রেষ্ঠ ফল লাভ।

"অন্তহীন দেশ কালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।"

জীবনের কোন একটি বিশেষ পরিণামে ধ্যানে তাঁহাকে লাভ করা যায় এ সত্য রবীন্দ্রনাথের সত্য নয়। তিনি আপনাকেই যে দেশ-কালের মধ্যে বিচিত্র-রূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

মানুষের মধ্যে যে চেতনার প্রকাশ, তাহা একটি আকস্মিক প্রহেলিকা মাত্র, তাহার আবির্ভাবের পূর্বে কোন অস্তিত্ব ছিল না, মৃত্যুতে সেই অস্তিত্ব আবার নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে; অর্থাৎ মানুষ আসে এক শূন্যতা হইতে মৃত্যুতে আবার ওই শূন্যতায় হারাইয়া যায়, এই সাক্ষাৎকার সত্য নয়। মানুষের এমন একটি সত্তা আছে, যাহার যোগে নিখিল বিশ্বের সকল সত্তা সত্তাবান।

"এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃত রূপে
* * *
এ বাণী গাঁথিয়া চলে সূর্য গ্রহ তারা,
অস্খলিত ছন্দসূত্রে অনিঃশেষ সৃষ্টির উৎসবে।"

এক চেতনা-সূত্রে এই বিশ্বের সমস্ত কিছু বিধৃত। চেতনার যে আবেগ বক্ষে লইয়া মহাশূন্যে অনন্তকাল ধরিয়া অনন্তকোটি গ্রহ-নক্ষত্র অচিন্তনীয় বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই এক চেতনার প্রকাশ মানুষের মধ্যে। সৃষ্টির মধ্যে রূপ-বৈচিত্র্যের প্রবাহ-বৈচিত্র্যের অন্ত নাই, কিন্তু এই সকল বৈচিত্র্যের অন্তরালে এক চেতনার দুর্নিরীক্ষ্য প্রবাহ বহিয়া চলিয়াছে।

এই জীবনে দুঃখ আছে। অসহনীয় দুঃখের নাগপাশে মানুষ বিজড়িত। ইহার মূল রহিয়াছে মানুষের অজ্ঞানতা ও প্রবৃত্তির মধ্যে। এই অজ্ঞানতা ও প্রবৃত্তি হইতে কেমন করিয়া দুঃখের উৎপত্তি হয়, তাহার পরিচয় পাই সাহিত্যে, বিচিত্র নৈতিক জিজ্ঞাসায়। মানুষের দুঃখভোগের কারণ অনুসন্ধান করিলে একটি-না-একটি কারণ নিঃসন্দেহে লাভ করা যায়। এই অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষাই সমগ্র নীতি-শাস্ত্রের মর্মকথা।

কিন্তু এই সাক্ষাৎকারে মানুষ সান্ত্বনা পায় না। কারণ এই অজ্ঞানতা ও প্রবৃত্তিকে নিঃশেষে লুপ্ত করিয়া দিবার কোন উপায় নাই, তাই মানুষের জীবনে দুঃখভোগও চিরন্তন। মানুষের অধ্যাত্ম-চেতনা নৈতিক জিজ্ঞাসার সীমাকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে। নৈতিক বোধ হইল সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্যের বোধ।

এই অধ্যাত্ম-সংগ্রামের ভিতর দিয়া সে পরিণামে এমন একটি চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে, যেখানে সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্যের এই বিচিত্র জিজ্ঞাসা অর্থহীন হইয়া গিয়াছে। সৎ-অসৎ পাপ-পুণ্যের বোধ কেবল মানবিক সত্তায়, দিব্য-চেতনা সাক্ষাৎকারে সীমার বোধ, তাহার সহিত বিজড়িত হইয়া পাপ-পুণ্যের, কার্য-কারণ-শৃঙ্খলার সকল বোধ একত্রে বুদ্বুদের মত শূন্যে বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই অধ্যাত্ম সত্তা লাভই মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা, সর্বশেষ সিদ্ধি। নৈতিক বিচিত্র জিজ্ঞাসায় মানুষের কোন সান্ত্বনা নাই।

জীবনের অতীতে কোন পাপ ও পুণ্য-লোক আছে কি-না, এই জীবনের ব্যর্থতা ও বঞ্চনা পরবর্তী জীবনের কোন ফললাভের দ্বারা চরিতার্থ হইয়া উঠে কি-না, এই জাতীয় যে বিচিত্র ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ নানা ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে লাভ করা যায়, সেই সকল যুগযুগসঞ্চিত ধর্মবিশ্বাসকে নিরুদ্ধ করিয়া দিয়া বলা যাইতে পারে যে জীবন আপনার মধ্যেই চরম পুরস্কার বহন করিয়া আছে। সকল ব্যর্থতা ও বঞ্চনা, সকল স্খলন-পতন ও ত্রুটি সত্ত্বেও মানুষ যদি অন্তরে সাহসকে ধারণ করিয়া রাখিতে পারে তবে মানুষ মৃত্যুতেও চরিতার্থতা লাভ করে। সেক্সপীয়রের সকল ট্রাজিক-বোধের মধ্যে এই মূল ভাবটি লক্ষ্য করা যায়।

বার্নার্ড শ' তাঁহার "Heartbreak House"-এর মধ্যে একস্থলে মন্তব্য করিয়াছেন, "Courage will not save you. But it will show that your souls are still alive."

সেক্সপীয়রের নাটকের দুঃখ-দুর্দশা জীবন ও জগতের অসারতা-বোধকে জাগ্রত করে না। খ্রীষ্টীয় কোন বিশ্বাস, আশা, এমন কি করুণা-বোধও নয়, পরিপূর্ণতাই তাঁহার নাটকের সর্বশেষ কথা।

জীবনের মূল এই উপলব্ধির দিকটি গ্যেটের জীবনেও লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার ফাউস্ট চিরন্তন সংগ্রামের প্রতীক। হেগেলের 'Bad Infinite' অথবা সোপেনহাওয়ারের 'Will'-এর ন্যায় গ্যেটের সংগ্রাম কিন্তু পরিণামশূন্য তৃপ্তিহীন অসীমের দিকে যাত্রা নয়। গ্যেটে এই সংগ্রামের ভিতর দিয়া আপনাকে চরিতার্থ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সংগ্রামের মধ্যে আছে ব্যক্তি-মুক্তির, তথা বিশ্ব-মুক্তির তত্ত্ব।

নিম্নে রবীন্দ্রনাথের যে কাব্যাংশটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে অনুরূপ মনোভাবের কতকটা আভাস লক্ষ্য করিতে পারা যাইবে।

"আপন আত্মায় যারা—
ফলবান করে তারে
তারাই চরম লক্ষ্য মানব-সৃষ্টির।"

সকল সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্যের বোধকে আশ্রয় করিয়াও যাঁহারা এই জীবনে পরম সত্তার সাক্ষাৎলাভ করিয়াছেন, মানুষের ইতিহাসে তাঁহারাই অমরতা লাভ করেন।

অধিকাংশ মানুষের জীবন কতকগুলি সুখ-দুঃখ-বোধের সমষ্টিমাত্র। তাহারা এ সংসারে প্রাণ-লীলায় বুদ্বুদের মত একবার ভাসিয়া উঠিয়া চিরকালের জন্য হারাইয়া যায়।

"আর যারা সবে
মায়ার প্রবাহে তারা ছায়ার মতন—"

মহাকাল এক হাতে রঙের পাত্র, অন্য হাতে তুলিকা লইয়া শূন্য পটে অনন্ত-কাল ধরিয়া সংখ্যাতীত রূপ ফুটাইয়া তুলিতেছেন, আবার তাহা মুছাইয়া ফেলিতেছেন। সৃষ্টি ও বিনষ্টি লইয়া তাঁহার এই এক নির্মম, নিরাসক্ত লীলা।

কবির কাব্যসৃষ্টি, বিচিত্র রূপসৃষ্টির পশ্চাতে তেমনি যেন এক নিরাসক্তি

থাকে। কারণ যুগে যুগে কত বিচিত্র সৃষ্টি-রূপ হারাইয়া গিয়াছে। আজিকার দুর্লভ রূপ কাল নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

"কবির ছন্দের মেলা সেও থাকি থাকি
নিশ্চিহ্ন কালের গায়ে ছবি আঁকি আঁকি।

একদিকে অসীমের বিচিত্র অনুভূতি, অসীমকে অপরোক্ষ করিবার জন্য নিয়ত ব্যাকুল প্রার্থনা, তাহারই জন্য প্রস্তুতি, অন্যদিকে মর্ত্যের সৌন্দর্য ও প্রেমে অমৃতের আস্বাদ লাভ। কবির জীবনে এই উভয় প্রেরণাই সত্য। সীমা ও অসীমের সম্পর্কের স্বরূপ নির্দেশের মধ্যে কবি-প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তাই এমন পরিণাম লাভেও কবির জীবনে এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে নাই।

"আমি জানি, যাব যবে
সংসারের রঙ্গভূমি ছাড়ি,
সাক্ষ্য দেবে পুষ্পবন ঋতুতে ঋতুতে
এ বিশ্বেরে ভালোবাসিয়াছি।
এ ভালোবাসাই সত্য, এ জন্মের দান।
বিদায় নেবার কালে
এ সত্য অম্লান হয়ে মৃত্যুরে করিবে অস্বীকার।"

কবির কাব্যের মূল্য কালে কালে অতি পরিচয়ে একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে কি-না জানি না, আজ কবি আপনার সেই বিপুল সৃষ্টি-কর্মকে ব্যক্তি-জীবন হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিরাসক্ত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এমনি করিয়া অতীতের সমস্ত কিছুকে পশ্চাতে ফেলিয়া এক চির অজ্ঞাতলোকে যাত্রার জন্য কবি প্রস্তুত হইয়াছেন। অন্তরের মধ্যে কী গভীর প্রশান্তি! এক পরিব্যাপ্ত বৈরাগ্যের সুর।

"মহেন্দ্রের পদতলে-করি সমর্পণ
যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়;"—

কবি আপনার সকল ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্বিশ্ব হইতে যে অনিঃশেষ সৌন্দর্য ও মাধুর্য আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিলেন, সেই সকল ইন্দ্রিয়ের সমর্থ্য আজ একান্ত-রূপে হ্রাস পাইয়াছে। তবু ইহাদের আশ্রয় করিয়া বহির্বিশ্বের সহিত এখনও যে ক্ষীণ সংযোগ আছে, কবি তাহারই শিথিল আনন্দ-প্রেরণাকে কাব্যে রূপায়িত

করিবেন। এমনি করিয়া একদিন অনিচ্ছায় জীবনের সর্বশেষ পরিণাম যদি আসে আসুক।

এই কাব্যের মধ্যে এইরূপে একদিকে মর্ত্য-জীবনের সৌন্দর্য ও মাধুর্যের প্রতি কবির গভীর আকাঙ্ক্ষার যেমন প্রকাশ ঘটিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি এই সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া অমর্ত্য সত্যলাভের জন্য গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারও প্রকাশ ঘটিয়াছে।

"যেথা তব রথ
শেষ চিহ্ন রেখে যায় অন্তিম ধূলায়
সেথায় রচিতে দাও আমার জগৎ
অল্প কিছু আলো থাক,
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।"

সমগ্র সৃষ্টির অন্তরালে আছে অনিঃশেষ বেদনার তপস্যা। সেই তপস্যা হইতে নিখিল বিশ্ব জুড়িয়া সত্তার নিয়ত প্রকাশ ও বিলয়। এই তপস্যার ক্ষেত্রে মানুষের গভীরতম সত্তার সহিত বিশ্ব-সত্তার মিল আছে। এই বেদনার তপস্যায় তাহারও তো নিরন্তর সৃষ্টি। এই অপরিসীম বেদনার বহ্নি জ্বালাইয়া সে যুগে যুগে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে, দিকে দিকে অভিযান চালাইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, এমন মর্মান্তিক যন্ত্রণাকে সহ্য করিয়াছে, আর তাহার এমন উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা। এই দুঃখ-ভোগ ও দুঃখ-প্রকাশের ভিতর দিয়া সে দুঃখকে নিয়ত জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই দুঃখের পারে যাহাকে সে লাভ করিতে চাহিয়াছে তাহাও কি এক জ্বালাময় তীর্থ?

এই জীবন ও জগৎ তবে কি একান্ত মরুময়? কবি সেই কথাই বলিয়াছেন, এই অপরিসীম দুঃখের দাহে মানব-সত্তাকে নিঙড়াইয়া নিয়ত যাহা ঝরিয়া পড়িতেছে তাহাই প্রেম, যাহা সেবা-রূপে আত্মপ্রকাশ করে। জীবন ও জগৎ জুড়িয়া এই দুঃখ ও প্রেমের অনিঃশেষ দুইটি ধারা পাশাপাশি বহিয়া চলিয়াছে। কোন্ অনাদি কাল হইতে কোন্ অনন্তকালের দিকে।

সত্তার চরম পরিণতি মানব-সত্তায় বলিয়া তাহার দুঃখভোগের শক্তিও অপরিসীম। বিশ্বে তাহার তুলনা আর কোথাও নাই।

"মানুষের ক্ষুদ্র দেহ,
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।"

কিংবা

দেহ দুঃখ-হোমানলে
যে অর্ঘ্যেরে দিল সে আহুতি
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা কোথা আছে।”

ব্যক্তিগত জীবনে, মানব-সভ্যতার ইতিহাসের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন দুর্দিন আসে যখন মিথ্যার বিচিত্র ছদ্মবেশ চিরন্তন সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। পরাভবের সে কী লজ্জা! মত্ততার মূঢ়তার সে কী আস্ফালন!

“মনে হয় হেমন্তের দুর্ভাষার কুজ্ঝটিকা-পানে
আলোকের কী যেন ভর্ৎসনা
দিগন্তের মূঢ়তারে তুলিছে তর্জনী।”

কবি যাহাকে বিশ্ব-জগতের শিশুলোক বলিয়াছেন, তাহার স্বরূপ কি? মানুষের সকল চিন্তা ও দার্শনিক যুক্তিবিচার, বিচিত্র নৈতিক ও অধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসার বাহিরে যে সহজ সরল আত্মনিবেদনের সহজ ভক্তির যে একটি জগৎ আছে, কবি তাহাকেই শিশুলোক বলিয়াছেন। ইহা অপরিণত জ্ঞানের মূঢ়তার সারল্য নহে। এই সারল্য দেখা দেয় বিশ্বের সকল জ্ঞানকে মথিত করিয়া পরিণামে তাহার অকিঞ্চিৎকরতা-বোধ হইতে। জীবনের দীর্ঘযাত্রাশেষে কবি আজ সেই চিরন্তন জন্মলাভের জন্য উৎসুক।

“বালকের চিন্তাহীন লীলাচ্ছলে
সহজ উত্তর তার পাই যেন মনে
সহজ বিশ্বাসে—
যে বিশ্বাস আপনার মাঝে তৃপ্ত থাকে,
করে না বিরোধ,
আনন্দের স্পর্শ দিয়ে সত্যের প্রত্যয় দেয় এনে।”

পরিণত বয়সে স্বাভাবিকভাবে প্রাণ-মনের সামর্থ্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতে থাকে। কবির অসুস্থ শরীরে সে সামর্থ্য আরো দ্রুত নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে। জীবনের ইহাই কি নিয়তি! বিশ্ব-প্রাণের যোগে ব্যক্তি-প্রাণ বিচিত্র ঐশ্বর্যে ধীরে ধীরে পূর্ণ হইয়া উঠে; আবার তাহার সহিত যোগ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে থাকিলে প্রাণের সম্পদও ক্রমে ক্রমে হারাইয়া যাইতে থাকে। জীবন কেবল কি এক হরণ ও পূরণের লীলা?

"—আমার রুগ্‌ণবাণী
স্পর্ধা হারায়েছে তার,
শক্তি নাই জীবনের সঞ্চিত গ্লানিরে
ধিক্কার দিবার।
আত্মগত ক্লিষ্ট জীবনের কুহেলিকা
তাহার বিশ্বের দৃষ্টি করিছে হরণ।"

পরিণত বয়সে ইন্দ্রিয়ের সামর্থ্য যখন হ্রাস পায়, তখন ক্ষীণ অবশেষকে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিবার একটি চেষ্টা জাগে, এবং সেই চেষ্টার ভিতর দিয়া মানুষ পরিশেষে অনিচ্ছায় অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। কিন্তু জীবনের ইহাই একমাত্র স্বরূপ নয়। মানবজীবন হইতে প্রকৃতি যখন তাহার দানের ঐশ্বর্যকে একে একে ছিনাইয়া লয়, তখন তাহার শূন্যস্থান পূরণ করে বিচিত্র অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি। এই সকল পাওয়া ও হারানোর অতীত যে চিরন্তন সত্য তাহাকে লাভ করিবার জন্য কবির অন্তরে তাই আজ এমন ব্যাকুলতা।

"হে প্রভাত সূর্য,
আপনার শুভ্রতম রূপ
তোমার জ্যোতির কেন্দ্রে হেরিব উজ্জ্বল,
প্রভাত ধ্যানেরে মোর সেই শক্তি দিয়ে
করো আলোকিত;
দুর্বল প্রাণের দৈন্য
হিরণ্ময় ঐশ্বর্যে তোমার
দূর করি দাও,
পরাভূত রমণীর অপমান-সহ।"

রোগশয্যায় কবি মানুষের আর একটি যে পরিচয় একান্ত করিয়া লাভ করিয়াছেন তাহা হইল মানুষের প্রাণের দৈন্যকে প্রাণ দিয়া সেবা দিয়া দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা। মৃত্যুপথযাত্রী কবিকে মানুষের এই পরিচয় অমৃতের আস্বাদ দিয়াছে।

"নূতন বিস্ময় সে যে
দেখা দেয় অপরূপ রূপে।
সমস্ত বিশ্বের দয়া
সম্পূর্ণ সংযত তার মাঝে,
তার করস্পর্শে, তার বিচিত্র ব্যাকুল আঁখিপাতে।"

এক নূতন চেতনার দিক্‌চক্রবালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিবার এবং সেই বোধাশ্রয়ী হইয়া এক অপূর্ব নূতন কাব্য-রূপ সৃষ্টি করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির। কবি যাহা সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে কবির সংখ্যাতীত বোধের প্রকাশ ঘটিয়াছে। তাহার আর যে মূল্য থাক মৃত্যুর পূর্বে তাহার জন্য কবির অন্তরে কোন বেদনাই নাই। এই সমস্ত কিছুর ভিতর দিয়া যাহাকে জীবনে তিনি আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, সেই যে অজ্ঞাত, অপূর্ব লোক যাহা তাঁহার জীবনে অচরিতার্থ রহিয়া গিয়াছে তাহারই জন্য আজ কবির জীবনে বেদনা একান্ত হইয়া উঠিয়াছে।

"সে মোর অতীত নহে
যারে লয়ে সুখে দুঃখে কেটেছে আমার রাত্রিদিন।
সে আমার ভবিষ্যৎ
যারে কোন কালে পাই নাই,
যার মধ্যে আকাঙ্ক্ষা আমার
ভূমিগর্ভে বীজের মতন
অঙ্কুরিত আশা লয়ে
দীর্ঘরাত্রি স্বপ্ন দেখেছিল
অনাগত আলোকের লাগি।"

নিম্নে যে অংশটি উদ্ধৃত করিতেছি তাহাতে কবির যে সাক্ষাৎকার তাহা দেশ-কালাতীত আদি জ্যোতির অরূপ সাক্ষাৎকার নহে। প্রথম দৃষ্টি মুহূর্তের যে বিস্ময়, একদিকে এই অপার বিস্ময়বোধ, এবং অন্যদিকে জন্ম-জন্মান্তরের ভিতর দিয়া সত্তার অন্তহীন প্রসারতার বোধ। এই উভয়দিক কবি-চেতনায় এক-যোগে উদ্ভাসিত হইয়া গিয়াছে। এক অলৌকিক আনন্দের অনুভূতি, যে এক আনন্দ রহিয়াছে, সকল সৃষ্টির মর্মমূলে।

"কল্প-আরম্ভের
অন্তহীন প্রথম মুহূর্তখানি
প্রকাশ করিল মোর কাছে ;
বুঝিলাম, এই এক জন্ম মোর
নব নব জন্মসূত্রে গাঁথা।
সপ্তরশ্মি সূর্যালোক সম
এক দৃশ্য বহিতেছে
অদৃশ্য অনেক সৃষ্টিধারা।"

মানব-সভ্যতার বারংবার বিপর্যয় দেখা দেয়। নৈরাশ্য আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। বিশ্বের শাশ্বত সত্যকে নানা মিথ্যাচার আচ্ছন্ন করে। জীবনের সকল মূল্যকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা। কিন্তু বিশ্বের মর্মস্থলে যে ধ্রুব শান্তির প্রতিষ্ঠা তাহা আদৌ বিচলিত হয় না। সেই শান্তিই ফিরিয়া ফিরিয়া আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে। দারুণ বিপর্যয়, অশান্তি ও ব্যভিচারের দুর্দিনে সকল যুগের কবিরা চিরন্তন সত্যের বাণীর শান্তি ও কল্যাণের বাণী প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইহাই কবির একমাত্র কাজ। নির্মল বিশ্বের সেই শান্তির রূপটিকে কবি প্রতিদিনের প্রভাতে ও সন্ধ্যায় ফিরিয়া ফিরিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এবং আপনার সত্তার গভীরতম লোকে তাহাকে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

"যে শান্তি বিশ্বের মর্মে ধ্রুব প্রতিষ্ঠিত,
রক্ষা করিয়াছে তারে
যুগ-যুগান্তের যত আঘাতে সংঘাতে।
বিক্ষুব্ধ এ-মর্ত্যভূমি
নিজের জানায় আবির্ভাব
দিবসের আরম্ভে ও শেষে।
তারি পত্র পেয়েছে তো কবি, মাঙ্গলিক।"

কবি আপনার সমগ্র অতীত কীর্তির সহিত বিজড়িত যে আমিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়া বোধ তাহার আবেষ্টনী হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া আসিয়া তাহাকে এক ঊর্ধ্বতর চেতনায়, সম্পূর্ণ নিরাসক্ত নিস্পৃহ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন তাহার পরিচয় এই কাব্যে একাধিক স্থলে লক্ষ্য করিতে পারা যায়।

সুখে দুঃখে নিরন্তর
লিপ্ত হয়ে আছে যে আপনা
আপন-বাহির তারে স্থাপন করিতে যেন পারি
সংসারের শত লক্ষ ভাসমান ঘটনার সমান শ্রেণীতে,
নিঃশঙ্ক নিস্পৃহ চোখে দেখি যেন তারে
অনাত্মীয় নির্বাসনে।"

এই ঊর্ধ্বতর চেতনাই যে দিব্যচেতনা, মানবিক সকল বোধের অতীত সত্তার অনুভূতি এবং ইহাকেই লাভ করিতে পারা যে জীবনের সর্বশেষ লক্ষ্য, জীবনের পরিপূর্ণতা যে ইহার মধ্যে কবি ঠিক ইহার পরেই সেই মন্তব্য করিয়াছেন।

"এই শেষ কথা মোর,
সম্পূর্ণ করুক মোর পরিচয় অসীম শুভ্রতা।"

ইহার পরবর্তী কবিতাটির মধ্যে কবির এই একই অনুভূতির পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"যাহা কিছু চেয়েছিনু একান্ত আগ্রহে
তাহার চৌদিক হতে বাহুর বেষ্টন
অপসৃত হয় যবে,
তখন সে বন্ধনের মুক্ত ক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।"

জীবনের এক বিপুল অনুভূতির কী আশ্চর্য সংহত রূপ!

"ভেবেছি পীড়িত মনে, পথভ্রষ্ট পথিক গ্রহের
অকস্মাৎ অপঘাতে একটি বিপুল চিতানলে
আগুন জ্বলে না কেন মহা এক সহমরণের।
তার পরে ভাবি মনে,
দুঃখে দুঃখে পাপ যদি নাহি পায় ক্ষয়
প্রলয়ের ভস্মক্ষেত্রে বীজ তার রবে সুপ্ত হয়ে,
নূতন সৃষ্টির বাষ্প
কণ্টকিয়া উঠিবে আবার।"

আরোগ্য

মৃত্যুতে কোন্ অজ্ঞাত লোকে আমাদের নিঃসঙ্গ অভিসার তাহা আমরা জানি না। তবে মর্ত্যের প্রেম যে সেই মহাযাত্রায় দুর্লভ পাথেয়স্বরূপ হইয়া থাকে, ধ্রুবতারকার মত স্থির স্নিগ্ধ কিরণ বিকীর্ণ করিয়া দিক নির্দেশ করে তাহাতে কবির অন্তরে কোন সংশয় ছিল না। জীব-লোক হইতে চিরকালের জন্য বিদায় লইয়া যাইবার পূর্বে জীব-লোকের শেষ স্পর্শ লাভের জন্য যে ব্যাকুলতা তাহার সত্য মূল্য এইখানে। তাহা মানুষের আসক্তি মাত্র নয়। মর্ত্যের প্রেমই ঈশ্বরীয় প্রেমের দিকে নর-নারীকে অনিবার্যরূপে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়। মর্ত্যপ্রেমের প্রতি কবি তাই কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়াছেন।

"তোমরা আপন দীপ আনিয়াছ হাতে,
খেয়া ছাড়িবার আগে তীরের বিদায়স্পর্শ দিতে।
তোমরা পথিক বন্ধু,
যেমন রাত্রির তারা,
অন্ধকারে লুপ্ত পথযাত্রীর শেষের ক্লিষ্টক্ষণে।"

মর্ত্যের সীমা-রূপের ভিতর দিয়া অসীমের আনন্দই যে নিয়ত ব্যক্ত হইতেছে, অসীম সীমা রূপেই যে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন, জীবনের এই শ্রেষ্ঠ উপলব্ধিকেই কবি সমস্ত জীবন ধরিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

"এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি,"

মর্ত্যের সীমা-রূপকে আশ্রয় করিয়া কবির চেতনা সেই অনির্বচনীয়তার বারংবার আভাস লাভ করিয়াছে, যাহা সকল জন্ম সকল মৃত্যুর অতীত। সীমা বা রূপ কেবলমাত্র সীমা হইলে তাহার মাধুর্য মুহূর্তে অন্তর্হিত হইয়া যাইত। সীমা তাই পরমার্থত অসীম। তাই তাহাকে ঘিরিয়া এমন অতল মাধুরীর উদ্বেলতা। কবির রূপের প্রতি শ্রদ্ধা তাই তত্ত্বত অরূপের প্রতি শ্রদ্ধাই। এই দৃষ্টিতে রূপ ও অরূপ সমার্থক হইয়া গিয়াছে।

"সত্যের আনন্দরূপ এ ধূলিতে নিয়েছে মুরতি,
এই জেনে এ ধূলায় রাখিনু প্রণতি।"

এই স্থির উপলব্ধিই নানাভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে। রূপের নিয়ত প্রকাশ, অস্থিরতা ও বিনষ্টির ভিতর দিয়া অরূপের আনন্দই নানাভাবে প্রকাশ-লাভ করিতেছে।

"অসীম অরূপ
রূপে রূপে স্পর্শমণি
রস-মূর্তি করিছে রচনা,—"

চিরপুরাতন এক প্রাণই নিত্য নূতন রূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে। প্রাণের আনন্দ-লীলায় কোথাও কোন ছেদ ও বিকৃতি নাই। নিত্য সৌন্দর্য-রূপে প্রকাশিত এক প্রাণই মানব-অন্তরে প্রেমরূপে প্রকাশিত। এই প্রাণের যোগে, প্রেমে মানুষ পরিণামে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনার চেতনাকে অনুপ্রবিষ্ট দেখে। এই প্রাণ-সূত্রে গাঁথা রহিয়াছে সকল লোক-লোকান্তর,

সকল অতীত-ভবিষ্যৎ। মানুষ তাই কোথায় হারাইয়া যাইবে? পরম অস্তিত্বের আনন্দবোধে মানুষ অমৃতের আস্বাদ পায়।

"সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,
মধুময় করে দেয় ধরণীর ধূলি,
সর্বত্র বিছায়ে দেয় চিরমানবের সিংহাসন"।

ওপারের আহ্বান যখন একান্ত হইয়া কানে বাজে, যখন ছুটির ঘণ্টা ধ্বনিত হয়, মর্ত্যের সহিত সকল বন্ধন যখন একে একে ছিন্ন করিয়া তরী ভাসাইয়া দিবার সময় আসন্ন, তখনই কেন অন্তদিকে মর্ত্যের বিচিত্র উপেক্ষিত ছবি চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে ছায়াছবির মত ভাসিয়া অতি দ্রুত আবর্তিত হইয়া যায়। অবশ মন তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারে না। কেবল স্থির দৃষ্টি মেলিয়া দেখা। ইহা এক আশ্চর্য মানসিক অবস্থা। একটি ভাবনা-সূত্রে এই সকল আপাত-বিশৃঙ্খল চিত্রগুলি নিশ্চয় বিধৃত। সেই ভাবনাকে মর্ত্য-প্রেম ছাড়া আর কি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রেম আসন্ন বিচ্ছেদ-বেদনায় করুণ। আবার এই বিচ্ছেদ-বেদনা আছে বলিয়া তাহা সুদুর্লভ।

"পথে চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদ বেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

পরিণত বয়সে বাহিরে প্রাণের সম্পদ তিলে তিলে ক্ষয় হইয়া আসিতে থাকে পরাজয়ের বিচিত্র প্রকাশ ফুটিয়া উঠে। ইহা যেমন সত্য, তেমনি অন্তরে আর এক প্রাপ্তির দ্বারা সেই শূন্যতা ধীরে ভরিয়া উঠে। ইহাই অধ্যাত্ম সত্তা। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়া মানবীয় চেতনা ক্ষণে ক্ষণে এমন একটি সত্তার আভাস লাভ করে যাহার বিনাশ নাই। মানুষের গভীরতম সত্তার সহিত তাহার মিল।

"এ পরাভবের লজ্জা এ অবসাদের অপমান
যখন ঘনিয়ে ওঠে, সহসা দিগন্তে দেখা দেয়
দিনের পতাকাখানি স্বর্ণকিরণের রেখা আঁকা;"

কিংবা

"প্রভাতের প্রসন্ন আলোকে
দুঃখবিজয়ীর মূর্তি দেখি আপনার
জীর্ণ দেহ দুর্গের শিখরে।"

মৃত্যুতে সীমার সকল বোধ স্খলিত হইয়া গিয়া কবি আপনার জ্যোতির্ময় অসীম সত্তায় আপনি নিমগ্ন হইয়া যাইবেন।

কবি আপনার জীবনের দুর্লভ মুহূর্তের কথা ইতিপূর্বে বারংবার বলিয়াছেন। দুর্লভ মুহূর্ত বলিতে তিনি সেই সকল মুহূর্তের কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন, যে সকল মুহূর্তে কোন একটি রূপকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছে। এই সকল মুহূর্ত যেন এক একটি রক্তপদ্মের বীজ, প্রাণ-সূত্রে গাঁথা হইয়া যাইতেছে, জীবনশেষে তাহা একটি মাল্যের আকার ধারণ করিবে। মৃত্যুতে পরমের কণ্ঠে সেই মাল্যখানি তিনি দুলাইয়া দিবেন।

আজ কবি জীবনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। কবির সেই প্রত্যাশা আজ সার্থক হইয়াছে। মৃত্যু আর কিছু নয়, জীবনের যে সব সুন্দর অসীম বা অরূপের আভাস দান করিয়াছে, তাহারই সম্মিলিত প্রকাশ। মৃত্যু কী অপরূপ রূপ লইয়াই না কবির দৃষ্টিসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে। মৃত্যুর (সীমার সর্বশেষ লোক) এই রূপের ভিতর দিয়া তিনি অসীম বা অরূপের সহিত মিলিত হইবেন।

"সেথা সিংহদ্বারে বাজে দিন অবসানের রাগিণী
যার মূর্ছনায় মেশা সে এ জন্মের যা কিছু সুন্দর,
স্পর্শ যা করেছে প্রাণ দীর্ঘ যাত্রাপথে
পূর্ণতার ইঙ্গিত জানায়ে।"

অনাদ্যন্ত দেশ-কাল জুড়িয়া অনন্ত কোটি রূপ লইয়া ইহা যেন কোন এক জাদুকরের আতসবাজির খেলা। মুহূর্তে বিচ্ছুরিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত অগণিত রূপ মহাশূন্যে জাগিয়া উঠিয়া আবার হারাইয়া যাইতেছে। অর্থহীন পরিণাম-হীন, উদ্দেশ্যশূন্য এই সৃজন-প্রলয়ের লীলা। এই রূপ-লীলার মাঝখানে অতি ক্ষুদ্র দেশ-কালে এই 'আমি'-চেতনার আকস্মিক আবির্ভাব ও বিলয়। ইহারও বুঝি কোন অর্থ নাই।

"বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতসবাজির খেলা আকাশে আকাশে

সূর্য তারা লয়ে
যুগ-যুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।"

"—সেই লোক অগ্নি, স্বয়ং সূর্য তাহার সমিধ, রশ্মি ধূম, দিন শিখা, চন্দ্র অঙ্গার, নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

"—পর্জন্য অগ্নি, বায়ু তাহার সমিধ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ শিখা, অশনি অঙ্গার, বজ্র বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

"—সূর্য অগ্নি, বৎসর তাহার সমিধ, আকাশ ধূম, রাত্রি শিখা, দিকসমূহ অঙ্গার, অবান্তর দিকসমূহ বিস্ফুলিঙ্গ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্)

দেশ-বন্দনার নামে কবি একদিন 'জনগণমনঅধিনায়ক' ঈশ্বরের বন্দনা করিয়াছিলেন, যাঁহার পুণ্য নামে আসমুদ্রহিমাচল সমগ্র দেশ সুপ্তি হইতে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

দেশ-বন্দনার নামে সেই ঈশ্বর-বন্দনা নানা রূপান্তরের ভিতর দিয়া আজ প্রত্যক্ষ মানব-বন্দনায় পর্যবসিত হইয়াছে। এই ধীর রূপান্তরের পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার উপন্যাসে, নাটকে, বিচিত্র নিবন্ধে। যে মানুষ নিয়ত কর্মভারে পীড়িত হইয়াও আত্মার অনিঃশেষ তেজের দ্বারাই মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনাকে দেবতার মত প্রতি মুহূর্তে জয় করিয়া উঠিতেছে, ইহা সেই কর্মরত মানুষের বন্দনা-গান। আত্মার শুভ্রতম প্রকাশ তাহাদেরই মধ্যে। সমগ্র জীবনবোধের কী আশ্চর্য পরিবর্তন। কবির গদ্য-রচনা হইতে কেবল একটিমাত্র অতি-সংক্ষিপ্ত অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহার বিস্তারিত আলোচনা এক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন।

"যে কর্মের অন্তরে মুক্তি নেই, যেহেতু তাতে কেবল লোভ, তাতে প্রেমের অভাব, সেই কর্মেই শূদ্রত্ব। জাত-শূদ্রেরা পৃথিবীতে অনেক উঁচু উঁচু আসন অধিকার করে বসে আছে। তারা কেউ বা শিক্ষক, কেউ বা বিচারক, কেউ বা শাসনকর্তা, কেউ বা ধর্মযাজক। কত ঝি, দাই, চাকর, মালী, কুমোর, চাষি আছে যারা ওদের মতো শূদ্র নয়—আজকের এই রৌদ্রে উজ্জ্বল সমুদ্র-তীরের নারকেলগাছের মর্মরে তাদের জীবন-সঙ্গীতের মূল সুরটি বাজছে।" (জাভাযাত্রীর পত্র)

যে জীবন-বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই জাতীয়

মন্তব্য করা সম্ভব হইয়াছে, তাহার সহিত একদিকে গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারা এবং অন্যদিকে খ্রীষ্টান, স্টোইক ও ডেমোক্র্যাটিকদের চিন্তাধারার সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য লক্ষ্য করিবার জন্য বার্ট্রান্ড রাসেলের 'History of Western Philosophy' গ্রন্থ হইতে দুই-একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"The close connection between virtue and knowledge is characteristic of Socrates and Plato. To some degree, it exists in all Greek thought, as opposed to that of Christianity. In Christian ethics, a pure heart is the essential, and is at least as likely to be found among the ignorant as among the learned. This difference between Greek and Christian ethics has persisted down to the present day."

"Can we regard as morally satisfactory a community which, by its essential constitution, confines the best things to a few, and requires the majority to be content with the second best? Plato and Aristotle say yes, and Nietzsche agrees with them. Stoics, Christians, and democrats say no. But there are great differences in their way of saying no. Stoics and early Christians consider that the greatest good is virtue, and that external circumstances can not prevent a man from being virtuous; there is therefore no need to seek a just social system, since social injustice affects only unimportant matters. The democrat, on the contrary, usually holds that, at least so far as politics are concerned, the most important goods are power and property; he can not, therefore, acquiesce in a social system which is unjust in these respects.

The Stoic Christian view requires a conception of virtue very different from Aristotle's since it must hold that virtue is as possible for the slave as for his masters. Christian ethics disapproves of pride, which Aristotle thinks a virtue, and praises humanity, which he thinks a vice. The intellectual virtues, which Plato and Aristotle value above all others, have to be thrust out of the list altogether, inorder that the poor and humble may be able to be as virtuous as any one else."

"Greek philosophers, including Plato and Aristotle, had a different conception of justice, and it is one which is still widely prevalent. They thought originally on grounds derived from religion—that each thing or person had its or his proper sphere, to overstep which is 'unjust'. Some men, in virtue of their character and aptitudes, have a wider sphere

than others, and thus is no injustice if they enjoy a greater sphere of happiness."

এইরূপে বিশ্বের সর্বত্র সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে দুটি বিশিষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি বিধি-বিধান দ্বারা সমাজকে ক্রমাগত দৃঢ়বদ্ধ করিতে এবং এইরূপে সামাজিক স্তরবিন্যাসকে স্থায়িত্ব দান করিতে চাহিয়াছে; অন্যটি সামাজিক বিধি-বিধানকে ক্রমাগত শিথিল করিয়া সামাজিক স্তরবিন্যাসকে সচল করিতে চাহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা কোন্ ধারাকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

"ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র নদীর ঘাটে ঘাটে
পাঞ্জাবে বোম্বাই গুজরাটে।
* * *
দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে।"

জীবনের সমগ্র সমস্যাকে যে একটিমাত্র প্রশ্নের সহায়তায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় শ্রীঅরবিন্দ সেই প্রশ্নটিকে এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

"What are to do with this soul and nature set face to face with each other, this Nature, this personal and cosmic activity, which tries to impress itself upon the soul, to possess, control, determine it, and this soul which feels that in some mysterious way it has a freedom, a control over itself, a responsibility for what it is and does, and tries therefore to turn upon Nature, its own and the world's and to control, possess, enjoy, or even, it may be, reject and escape from her ?" (On Yoga)

একদিকে দেহ-প্রাণ মন, অন্যদিকে দেহ-প্রাণ-মন ব্যতিরিক্ত সম্পূর্ণ ভিন্নতর অধ্যাত্মবোধ। কেহ একটিকে এবং কেহ অন্যটিকে সম্পূর্ণ একান্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কেহ উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যসাধনের চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দের জীবন-সাধনার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি জীবনকে অধ্যাত্মবোধের উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই সহায়তায় জীবনকে সম্পূর্ণরূপে

রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত করিতে চাহিয়াছেন। তাহাতে জীবন কেবল নব রূপ ও নূতন সামর্থ্য লাভ করিবে না, দিব্য ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত জীবন বর্তমান মানব-সমাজকে সম্পূর্ণ নূতন রূপ দান করিতে সমর্থ হইবে। আমাদের বর্তমান চেতনায় সে রূপ সম্পর্কে কোন ধারণা একপ্রকার অসম্ভব। সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে তিনি বুদ্ধি বিচার ও বিচিত্র নৈতিক প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত বর্তমান মানবসমাজের সমগ্র প্রয়াসকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিয়াছেন। অভিব্যক্তির একটি পর্যায়মাত্র রূপে তাহা সত্য।

রবীন্দ্রনাথের এই স্থির অধ্যাত্ম বিশ্বাস ছিল যে, মানবিক ও আধ্যাত্মিক দুটি প্রেরণা যুগপৎ ক্রিয়া করিয়া কোন একটি পরিণামে অলৌকিক উপায়ে পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিবে।

উভয়েই বিশ্ব-মুক্তি ও বিশ্ব-মৈত্রীর কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বিশ্ব-মুক্তি ও বিশ্ব-মৈত্রী সম্পূর্ণ অধ্যাত্ম-বোধের জগতে; অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রারম্ভে মানবিক বোধের সমগ্র মনুষ্যসমাজকে সম্পূর্ণরূপে মিলিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহা একান্তরূপে সম্ভব। মানবিক বোধের জগতে এই মিলন সম্পূর্ণ না হইলে সমগ্র মনুষ্য-সমাজ অধ্যাত্ম-জগতে কখনই উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না।

বিশ্বের সকল প্রকাশ রূপের অন্তরালে থাকিয়া যে চেতনা নিয়ত শুশ্রূষার ভিতর দিয়া বিশ্বকে চির নবীন রাখিয়াছে, লক্ষ কোটি প্রাণী বক্ষে ধৈর্যময়ী মাতা বসুন্ধরার ন্যায় যে চেতনা যাহা কিছু জীর্ণ, বিশুষ্ক, ক্ষীণ পাণ্ডুর যাহা কিছু বিরূপ তাহাকে নিয়ত ঝরাইয়া দিয়া নূতন প্রাণের প্রকাশ ঘটাইতেছে, নারী সেই চেতনার মূর্ত্য বিগ্রহ। মর্ত্যের প্রাণের দীনতা এমন সেবা দিয়া, সহনশীলতা, ত্যাগ ও দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া জয় করিয়া উঠিবার এমন প্রাণপণ প্রয়াস আর কোথাও নাই। নারীকে কত রূপে তিনি বন্দনা করিয়াছেন। নারীর এই স্বরূপের একটি প্রকাশধারাও সেই সঙ্গে সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

> "যে জীব লক্ষীর মনে পালনের শক্তি বহমান,
> নারী তুমি নিত্য শোন তাহারি আহ্বান!"

কিংবা

> "বিশ্বের পালনী শক্তি তুমি নিজ বীর্যে বহ চুপে চুপে
> মাধুরীর রূপে।"

ব্যষ্টির ভাবনা-লোককে মিলিত করিয়া বিশ্বের সকল মানবের সমষ্টিগত ভাবনা-লোকের কল্পনা করা সম্ভব। ব্যষ্টির ভাবনা-লোক এই সমষ্টিগত ভাবনা-লোকের অন্তর্গত। বিশ্ব-ভাবনা-লোক বলিতে ওই সমষ্টিগত ভাবনা-লোক বুঝায় না। সমষ্টিগত ভাবে ভাবনা যতই বিকাশ লাভ করুক না কেন, তাহা বিশ্ব-মানব-মনের ভাবনাকে কোন অবস্থায় অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। সমষ্টি-মনের ভাবনার বিকাশ ঘটে বিশ্ব-মানব-মনের ভাবনার যোগে।

চেতনা যতই বিকাশ লাভ করে ব্যক্তি-চেতনায় নিখিল মানবের বিচিত্র ভাব-ভাবনার ততই প্রকাশ ঘটিতে থাকে। চেতনার এমন সমুন্নতি মহামানবদের মধ্যে কোথাও কোথাও দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে তাহা নিখিল বিশ্বের সমষ্টিগত ভাবনাকে গ্রাস করিয়া বিশ্ব-মানব-মনের ভাবনার সহিত যুক্ত হইয়া সমষ্টিগত ভাবনাকে ক্রমাগত বিকাশ, উন্নততর পরিণাম দান করিয়া চলিয়াছে।

নিখিল মানব-চিত্ত আশ্রয় করিয়া ভাবের বিকাশের এই যেমন একটি দিক আছে, তেমনি ভাব রূপায়ণের মধ্যেও যে ধীর সম্পূর্ণতার একটি ধারা আছে তাহাও রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন।

চেতনার পূর্ণ বিকাশের স্বরূপ নির্দেশ করিতে তিনি উপনিষদের বাণী উদ্ধৃত করিয়া ইতিপূর্বে বারংবার বলিয়াছিলেন, যিনি আপনার চেতনাকে বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেখেন, বিশ্বের সমস্ত কিছু যাঁহার চেতনার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় তিনি অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন। এই পূর্ণ উপলব্ধির আস্বাদ কবি আপনার জীবনে লাভ করিয়াছিলেন।

> "জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
> পরম আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
> বিচিত্র জগতে
> প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।"

জাগতিক সকল বোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া মন ও দেশ-কালের সীমারও পরপার-বর্তী দিব্য-চেতনা-লোক লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা।

> "এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
> চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি
> ভেদ করি কুহেলিকা
> সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।"

কিন্তু তাহার পরেই আবার এই প্রার্থনা আছে—

"সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকীরিত।"

যে বিশ্ব-আমি বা বিশ্ব-মন সকল আমি বা মনকে আশ্রয় করিয়া তাহাদের পরিপূর্ণ করিয়া তাহাদের সকল অবস্থায় সকল পরিণামে অতিক্রম করিয়া রহিয়াছেন, সেই বিশ্ব-আমির আনন্দকে অব্যবহিত রূপে লাভ করিবার প্রার্থনা। এইরূপে কবির প্রার্থনায় বিশ্ব-সত্তা এবং পরম জাগতিক সত্তাকে একযোগে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যক্তি-সত্তা বিশ্ব-সত্তা এবং পরম জাগতিক সত্তার মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্য সাধনের সাধনা রবীন্দ্রনাথের সাধনা।

সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের চিত্রচিত্রণে রবীন্দ্রনাথের তুলিকা কখন শ্রান্তি মানে নাই। রবীন্দ্রনাথের আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত ইহার কত না প্রকাশ-রূপ দেখিতে পাই। আর সেই সঙ্গে বিজড়িত হইয়া কবি-মনের কত বিচিত্র ভাবনা। কিন্তু শেষ পর্যায়ের এই কয়খানি কাব্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের বর্ণনা যেরূপ আশ্চর্য নিবিড় ও সংহত রূপ লইয়া প্রকাশ লাভ করিয়াছে, রবীন্দ্র-কাব্যে তাহার কোন পূর্ব-পরিচয় নাই। ইহা কবির কাব্যের এক নূতন বাণী, নূতন সামর্থ্য লাভ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দুই-একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে পরপর উদ্ধৃত করিতেছি:

"মিলিয়া শ্যামলে নীলিমায়
ধরণীর উত্তরীয়
বুনে চলে ছায়াতে আলোতে।
আকাশের হৃৎস্পন্দন
পল্লবে পল্লবে দেয় দোলা।
প্রভাতের কণ্ঠ হতে মণিহার করে ঝিলিমিলি
বন হতে বনে।
পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবন-লক্ষ্মীরে। (আরোগ্য)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া এবং মানব-প্রেমের ভিতর দিয়া এক অনির্বচনীয়তার, অপরূপের আস্বাদ লাভ করিয়াছে। তাহারই আনন্দ-প্রেরণায় প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং মানবপ্রেম একটি অখণ্ডতায় বিধৃত হইয়াছে।

সেইজন্য ইহার ঠিক পরেই তিনি বলিয়াছেন—

"সবকিছু সাথে মিশে মানুষের প্রীতির পরশ
অমৃতের অর্থ দেয় তারে,—"

কিংবা এই কাব্যের ছয় সংখ্যক কবিতাটি—

"অতি দূরে আকাশের সুকুমার পাণ্ডুর নীলিমা।
অরণ্য তাহারি তলে ঊর্ধ্বে বাহু মেলি
আপন শ্যামল অর্ঘ্য নিঃশব্দে করিছে নিবেদন।
মাঘের তরুণ রৌদ্র ধরণীর 'পরে
বিছাইল দিকে দিকে স্বচ্ছ আলোকের উত্তরীয়।"

আরোগ্যের মধ্যে অন্তত দুইটি কবিতা আছে যাহাদের ভিতর দিয়া তিনি আপনার বর্তমান সৃষ্টি-কর্মের মূল্য নিরূপণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাব্য-মূল্যের কথা নয়, আমরা পূর্বাপর সর্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছি যে কবি যখন যে চেতনাপর্যায় লাভ করিয়াছেন, তাহারই অনুরূপ জীবন ও জগতের এক-একটি স্বরূপ তাঁহার নিকট সেই সঙ্গে উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। সেই স্বরূপের সহিত বিজড়িত হইয়া কতকগুলি রূপ-কল্পনা কবি-চেতনায় ভাসিয়া উঠিয়াছে। সার্থক রূপ কল্পনা-সৃষ্টি যদি অম্লান কবি-প্রতিভার পরিচায়ক হয়, তবে কবির জীবনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে রিক্ত নীরস মাঠ পড়িয়া থাকে। তাহাতে তখন স্বল্প মূল্যের অনাদরের শাক জন্মায়। তাহার পশ্চাতে কাহারও কোন সযত্ন তত্ত্বাবধান থাকে না। গরীব ঘরের মেয়েরা আঁচল ভরিয়া সেই শাক তুলিয়া বাড়ী ফেরে। মাটির মধ্যে রস যে একেবারে ফুরাইয়া যায় নাই, তাহার যে কিছু অবশেষ এখনও আছে, তাহা প্রমাণ করে ওই সব অনাদরের শস্য। চৈত্রের প্রখর তাপে নদীর ধারা শুষ্ক। তাহারই তীরে তীরে কেবল বুনো ফলের ঝোপের তলায় বিশীর্ণ ছায়া।

চতুর্দিক ব্যাপ্ত নীরসতা ও শ্রীহীনতার এই যে রূপ কবি তাহার তুলনা করিয়াছেন তাঁহার বর্তমান সৃষ্টি-কর্মের সঙ্গে। আর আপনার ইতিপূর্বের সৃষ্টির সহিত তুলনা করিয়াছেন শ্রাবণ দিনের শস্য-পরিপূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্রের সহিত। ফল শস্যকে নিয়ত ফলাইবার জন্য কবির সে কী নিরন্তর প্রয়াস। সে প্রয়াসে কবির দিন-রাত্রি উদ্দাম হইয়া বহিয়া গিয়াছে।

বিশ্ব-প্রাণ-ধারার সহিত কবি-প্রাণের সংযোগ যত ক্ষীণভাবে হোক-না কেন,

আজও অটুট আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই তাহার প্রমাণ কবির এই সকল সৃষ্টি।

গীতি-কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবটি এইরূপে দুইটি চিত্র-রূপের ভিতর দিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ লাভ করিয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে জোনাকির দল গাছে গাছে ঝলমল করে। দীপ-শিখার মত তাহা অন্ধকারকে আলোকিত করিতে পারে না। ইহা যেন অন্ধকার রাত্রির বিন্দু বিন্দু আলোক গাঁথিয়া খেলা করা। বৃহৎ সৃষ্টির মধ্যে এমনি এক একটি দিক আছে যাহাকে কেবল খেলা ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না।

প্রান্তর জুড়িয়া ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটে, যেন রঙের এক-একটি বিন্দু। ইহার সৌন্দর্য ও মাধুর্য কোনটিই আমাদের উদাসীন দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারে না। সৃষ্টিতে তবুও ইহা অফুরন্ত হইয়া আছে। বিধাতার কাজের সঙ্গে ইহা খেলার একটি দিক।

ঊষর মাটিকে উর্বরা করিতে ঝরনার জল বহিয়া যায়। তাহার বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে অগণিত বুদ্বুদ ভাসিয়া উঠিয়া পরমুহূর্তে আবার হারাইয়া যায়। সৃষ্টি জুড়িয়া এমনি খেলার একটি দিক আছে বলিয়া সৃষ্টির মধ্যে এত আনন্দ ধরা পড়িয়াছে।

কবির এই জীবন-পর্যায়ের সকল রচনা কি এমনি খেলা! তাহা নিশ্চয়ই সত্য নয়। তবে কতকগুলি রচনা যে এই পর্যায়ের তাহা স্বীকার করিতেই হয়। বস্তুত রবীন্দ্র-কাব্যের প্রথম হইতেই সৃষ্টি ধারার সঙ্গে সঙ্গে এমনি একটি খেলার দিক আমরা লক্ষ্য করি। ইহা কবির অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্যের একটি দিক।

এই প্রসঙ্গে ২৬ সংখ্যক কবিতাটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা ভূমিকায় সাহিত্য-জিজ্ঞাসা প্রসঙ্গে কবির নির্দেশিত সৃষ্টির ক্রম লইয়া যে আলোচনা করিয়াছি কবিতাটির মধ্যে তাহারই একটি দিকের পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে। অনুরূপ অনুভূতির পরিচায়ক আর একটি উক্তি কেবল নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Yet in our alertest moment the depths of the soul are still dreaming; the real world stands drawn in bare outline against a background of chaos and unrest. Our logical thoughts dominate experience only as the parallels and meridians make a checker-board of the sea. They guide our voyage without controlling the waves, which toss for ever

inspite of our ability to ride over them to our chosen ends. Sanity is a madness put to good uses; waking life is a dream controlled."

(The Elements and Function of Poetry : George Santayana)

সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে কবির এই উক্তি নিঃসন্দেহে সত্য।

"শিল্পের নৈপুণ্য এই উদ্দামের শৃঙ্খলিত করা,
অধরাকে ধরা।"

কিন্তু আজ কবির এই শিল্প-তত্ত্ব উল্লেখের নিহিত একটি তাৎপর্য আছে। কবির প্রাণ-শক্তি আজ বুঝি অবসন্ন, তাই মনের বিচিত্র সংখ্যাতীত ভাবনাকে এক-একটি ভাবের আবেষ্টনী দিয়া সুদৃঢ় করিয়া বাঁধিতে পারিতেছেন না!—যে বন্ধনে অপরূপ এক-একটি শিল্প-রূপ গড়িয়া উঠে।

জন্মদিনে

যে সম্পূর্ণতা কবির লক্ষ্য ছিল, মুক্তি বলিতে তিনি যাহা বুঝিতেন, তাহার আভাস নানারূপে তিনি লাভ করিলেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহা যে তাঁহার আপ্রাপণীয় রহিয়া যায়, তাহা স্বীকার করিতে তিনি লেশমাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন নাই। লক্ষ্য বড় বলিয়া এই অসম্পূর্ণতার জন্য পীড়া-বোধ থাকিলেও প্রকাশে কুণ্ঠা ছিল না। অধ্যাত্ম-সাধনার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেখানে পাওয়া সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া দাবি করা হইয়াছে, সেই প্রত্যেক ক্ষেত্রে তিনি আকাঙ্ক্ষার সম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়াছেন। সমগ্র জীবনের সমাধান তাহার মধ্যে নাই, জীবন ও জগতের সমগ্র অর্থের প্রকাশ সেখানে নানারূপে ব্যাহত।

এমনি একপ্রকার নিঃসংশয় বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে ছিল যে, যে-শিল্পী তাঁহার জীবন আশ্রয় করিয়া বিচিত্র বোধের রঙ্গ মিলাইয়া মিলাইয়া একটি পরিপূর্ণ ছবি ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাঁহার তুলিকার শেষ রেখাপাতের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জীবন একটি অখণ্ড চিত্ররূপে তাঁহার চরম অর্থ এক মুহূর্তে উদ্ঘাটিত করিয়া দিবে। এই বিশ্বাসবোধ হইতে তিনি আজও লেশমাত্র বিচলিত হন নাই; কিন্তু এই জীবনে যে সেই শেষ রেখাপাত ঘটে নাই তাহা তিনি বোধ করিতে পারেন। ইহার জন্য তাঁহার কেবল জন্মান্তরের প্রতীক্ষা।

"এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন আবরণ
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।

নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়।”

রবীন্দ্রনাথ ভক্তিবাদীদের ন্যায় ব্যক্তি-সত্তার চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তবে ভারতীয় বিচিত্র ভক্তিসাধনায় ব্যক্তি-সত্তার যে মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে, অথবা তাহার যে স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা হইতে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ নির্ধারণে ও মূল্যনিরূপণে মূলগত পার্থক্য আছে। তাঁহার ব্যক্তি-সত্তা ধীর বিকাশের ভিতর দিয়া পরিণামে কোন্ মূল্য অথবা কোন্ স্বরূপতা লাভ করিতে চাহিয়াছে ভূমিকায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা যেমন করিয়াছি, তেমনি কাব্য বিশ্লেষণ করিয়া পূর্বাপর তাহারই একটি ধারা নির্দেশেরও চেষ্টা আছে। রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক চিন্তাধারার সামগ্রিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োজনীয়তা বোধ হয় সর্বাধিক।

ব্যক্তি-সত্তার মূল্য অন্য বহুবিধ দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির ক্ষেত্রে কী ভাবে এবং কতদূর স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে শ্রীঅরবিন্দের একটি মন্তব্য হইতে তাহার কিছু পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। ভূমিকায় যাহা আলোচিত হইয়াছে উক্তিটির মধ্যে তাহারই সমর্থন লাভ করিতে পারা যাইবে।

“—মানবিক চিন্তা দুটি বিপরীত প্রান্তকে আশ্রয় করিয়াছে, একটি পার্থিব, ইহা ব্যষ্টি বা সমষ্টির দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট অহংবোধের চরিতার্থতাকেই জীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করে, ইহার অতীত কোন দৃষ্টি তাহার নাই ; অন্যটি আধ্যাত্মিক দার্শনিক অথবা ধর্মীয়, ইহা চরম সত্য বা চরম মূল্যের (তাহা আত্মা, চেতনা প্রভৃতি যাহাই হোক-না-কেন) জন্য অহংকে জয় করিয়া উঠিতে চায়। অহং-এর অস্তিত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধ-চিন্তা লক্ষ্য করা যায়। তাহাতে বিশ্বের জড়বাদী ব্যাখ্যা দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি চিন্তাধারার মতে মানসিক অহংবোধ আমাদের মন দ্বারা সৃষ্ট, দেহ সেই সঙ্গে মনের বিনষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বিনষ্ট হইয়া যায়। একটি স্থির সত্য এই যে জাতির ভিতর দিয়া চিরন্তন প্রকৃতি ক্রিয়া করিতেছে এবং আমাদের নয়, তাহার অভিপ্রায়ই অনুসৃত হওয়া উচিত। অপর চিন্তাধারাটি আরো বেশি শক্তিশালী। ইহা সচেতন অহংবোধকে প্রকৃতির চরম প্রকাশ বলিয়া মনে করে। ইহা যতই ক্ষণস্থায়ী হোক-না-কেন, এই চিন্তাধারা ইহাকে ইচ্ছার মানবিক প্রতিনিধিরূপে গৌরব দান করে এবং ইহার মহিমা-বোধ ও চরিতার্থ-সাধনাকে আমাদের অস্তিত্বের সর্বোচ্চ লক্ষ্য

বলিয়া ধারণা করে। ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে যে বহুল পদ্ধতি আছে তাহাদের মধ্যে নানা বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। বৌদ্ধরা প্রকৃত সত্তা বা অহং-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, অতিমানবিক কোন সত্তায়ও তাহাদের বিশ্বাস নাই। অদ্বৈতবাদীরা আপাত পৃথকসত্তাকে চরমসত্তা বা ব্রহ্মরূপে অনুমান করে, ব্যক্তি-সত্তা মায়া, একমাত্র প্রকৃত মুক্তি ব্যক্তি-সত্তাকে বিসর্জন দেওয়া। অন্যান্য পদ্ধতি এই দৃষ্টিভঙ্গীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে। তাহারা মানবাত্মার চিরন্তন অস্তিত্বে বিশ্বাসবান; তাহাদের মতে আত্মা একের মধ্যে বহু চেতনার ভিত্তিস্বরূপ, অথবা নির্ভরশীল হইলেও পৃথক অস্তিত্বে অস্তিত্ববান, ইহা চিরস্থায়ী, সত্য, অবিনাশী।" (On Yoga গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ও অনূদিত)

শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তি সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেও, ওই পরিণামে ব্যক্তিমাত্রেই সে এক নির্বিশেষ অবস্থা লাভ করে না. স্বধর্মের বৈচিত্র্য অনুযায়ী মুক্ত সত্তারও যে অন্তহীন বৈচিত্র্য থাকে, তাহা তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু স্বধর্মের রহস্যভেদের চেষ্টা তাঁহার দার্শনিক চিন্তায় কোথাও নাই। আমরা স্বধর্ম বলিতে যাহাই বুঝি না কেন, তাহা নিঃসন্দেহে মানবিক বোধাশ্রয়ী। অধ্যাত্মবোধ যাহা সম্পূর্ণ অতিমানবিক তাহা পুনরায় কিরূপে মানবিক বোধাশ্রয়ী স্বধর্মের সহিত সামঞ্জস্য লাভ করে তাহার স্পষ্ট স্বরূপ নির্দেশ তিনি কোথাও করেন নাই।

কবির এই জগৎ হইতে বিদায় লইবার দিন একান্ত আসন্ন। অথচ এই জগৎ কবির নিকট তেমনি চিরকালের মত অপরূপ মাধুর্যে ভরা, তেমনি অপার রহস্য-বিজড়িত। সেই মাধুর্যে সেই রহস্যে প্রাণ-মন তেমনি করিয়া উতলা হইয়া উঠে। প্রাণের স্পর্শে প্রাণের আনন্দ সম্পদ প্রত্যর্পণের ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতার মুহূর্তে কবি অন্যমনা হইয়া পড়েন। ব্যথায় নিপীড়িত হইয়া আবার সচেতন হন। এই লীলার পরিপূর্ণ অমৃতপাত্র পথপার্শ্বে রাখিয়া দিয়া তাঁহাকে চিরকালের জন্য মর্ত্য-লোক হইতে বিদায় লইতে হইবে। সেই বিদায়মুহূর্ত ঘনাইয়া উঠিল বলিয়া এই অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতা পরিমাপ আমাদের সাধ্যাতীত।

"মনে করি, গান গাই বসন্ত বাহারে।
আসন্ন বিরহ স্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।"

কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই পৃথিবী সূর্য প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে। সেই প্রদক্ষিণপথে একে একে চেতনার কত পর্যায়, কত মাধুর্য-লোকের দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছে। মনের বিকাশে মানুষের শক্তি, সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য আজ যেন

অফুরান হইয়া পড়িয়াছে। মানব মনকে আশ্রয় করিয়া সেই উর্ধ্বমুখী প্রেরণার সৃষ্টি-শক্তি যেন সীমহীন হইয়া পড়িয়াছে ; কিন্তু এখানে আসিয়া এই পরিণাম সম্পূর্ণ হয় নাই। সমগ্র মানব-সমাজের সৃষ্টি প্রেরণার ধারাটিকে একটু গভীর ভাবে অনুধাবন করিলে মনেরও যে ধীর বিকাশ ঘটতেছে এই সম্পর্কে নিঃসংশয় হইতে পারা যায়। কেবল তাহাই নয়, এই ধীর বিকাশের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে এমন অসামান্যতার প্রকাশ ঘটে, যাহার ভিতর দিয়া মনেরও উর্ধ্বতর চেতনার নিঃসংশয় আভাস লাভ করিতে পারা যায়। সমগ্র মানব-মনকে আশ্রয় করিয়া এই বিকাশ ঘটিলেও যাহার মন যত উন্নত তাহার ভিতর দিয়া এই বিকাশ তত অধিক পরিমাণে ঘটে। মাঝে মাঝে এমন এক-একটি মানব-সত্তার আবির্ভাব ঘটে যাঁহার ভিতর দিয়া সমগ্র মানব-সমাজের অভিব্যক্তি ক্রিয়া করে। রবীন্দ্রনাথ নিঃসংশয়ে তেমনি একটি সত্তা। সমগ্র বিশ্ব ও মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া এই যে ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে, ইহার সম্পূর্ণ অর্থ পরিণাম-পর্যায়ে কোন সত্তার পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়।

"আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।"

সীমাহীন প্রাণ-সমুদ্রের বক্ষে অন্তহীন রূপের কেবলই উঠা ও নামা, কেবলই প্রকাশ ও বিলয়। রূপের এই নিয়ত সরা, নিয়ত চলা, নিয়ত সৃষ্টি-বিনষ্টির ভিতর দিয়া অসীমের মাধুর্যই কেবল ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাকে তিনি বলিয়াছেন, 'অধরার প্রতিবিম্ব'।

'মহাকাল দুই রূপ ধরে
পরে পরে
কালো আর সাদা
কেবলি দক্ষিণে ও বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা
অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,
গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে।"

বিশ্বের এই প্রাণ-প্রবাহের সহিত ব্যক্তি-প্রাণ যুক্ত হইলে হৃদয়ে অন্তহীন ভাবের নিয়ত উঠা-নামা চলিতে থাকে। আর এই সকল ভাবকে আশ্রয় করিয়া এক অলৌকিক আনন্দের নিয়ত স্পর্শলাভ ঘটে। এই আনন্দের প্রকাশ ছাড়া সমগ্র সৃষ্টির যেমন কোন অর্থ নাই, তেমনি রূপের যোগে হৃদয়ে এই আনন্দের

আস্বাদ ছাড়া জীবনে আর কোন ফল লাভ নাই। এই শাশ্বত আনন্দময় সত্তাকে তিনি বলিয়াছেন, 'অধরা', 'স্তব্ধমৌনী অচল'।

"স্তব্ধ মৌনি অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়,—"

রূপের মধ্যে এই ইশারা বা প্রতিবিম্বকে আশ্রয় করিয়া অন্তরে যে একটি ধ্যান-লোক গড়িয়া উঠে, তাহার ভিতর দিয়া মন ক্ষণে ক্ষণে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করে।

মানবিক বিচিত্রবোধের পূর্ণ বিকাশ ও সামঞ্জস্যসাধনের ভিতর দিয়া যে জীবন-দর্শন অসীমের সহিত যোগের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করিয়াছে, রবীন্দ্র-দর্শনের এই মূল উপলব্ধিকে আশ্রয় করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে এই জাতীয় উপলব্ধির একটি ধারা অন্বেষণ করিয়া ফিরিয়াছি।

জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে যেখানে স্বীকার করা হইয়াছে সেখানে চেতনার ক্রমিক বাধামুক্তির উপর সেই জড়ের ক্রমিক প্রভাব হ্রাসের উপর রূপের ক্রমিক উন্নততর তত্ত্বও স্বীকৃত। ঈশ্বর একমাত্র তত্ত্ব যিনি সম্পূর্ণরূপে রূপের বন্ধনমুক্ত। এই তত্ত্বে অধ্যাত্ম-সাধনার সর্বশেষ লক্ষ্য হইল চেতনাকে রূপের সর্বশেষ পরিণামের ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া। এই পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নতম হইতে উচ্চতম পর্যন্ত সকল রূপের জগৎ অস্বীকৃত হইয়া যায়।

মানব-মন কোথাও সৌন্দর্য ও প্রেমের একটি কল্প-লোক সৃষ্টি করিয়া জড় ও চেতনার এই চিরন্তন দ্বন্দ্বকে জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা করে। শেলী, কীট্স ও রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য-সাধনার মধ্যে এই বিশিষ্ট সাধন-রূপটি লক্ষ্য করা যায়।

শেলীর কাব্য-সাধনার এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া একজন পাশ্চাত্ত্য সমালোচক লিখিতেছেন,

"He believed literally that there is a spirit in Nature, and that Nature therefore is never a mere 'outward world.' When he invoked the breath of Autumn's being, he was not indulging in an empty figure. The breath ('Spiritus') that he invoked was to him as real and as awful as the Holy Ghost was to Milton. He believed that this spirit works within the world as a soul contending with obstruction and striving to penetrate and transform the whole mass. He looked

forward to that far-off day when the 'plastic stress' of this power have mastered the last resistance and have become all in all, when outward nature, which now suffers with man, shall have been redeemed with him. This is the faith of the prophet, the faith held by the authors of Isaiah and of the Revelation, though of course their Theologies differed widely and fundamentally from Shelley's. Shelley's main passion as a poet was not, in the ordinary sense, to reform the world; it was to create an apocalypse of the world formed and realized by Intellectual Beauty or Love."

(The Case of Shelly: Frederic Pottle)

এই সাধনা জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে স্বীকার করিয়া অন্তর্জীবন ও দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিবর্তনকে একমাত্র পথস্বরূপ আশ্রয় করিয়াছে।

সাধনার আর একটি দিক হইল জড় বা রূপ-লোকের কেবল স্বীকৃতি নয় তাহার মূল্যের পরিবর্তনেরও স্বীকৃতি। এই সাধনা জড় ও চেতনার চিরন্তন দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে। মূল্যের ধীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়া রূপ এমন একটি পরিণাম লাভ করিবে যেখানে অরূপের সহিত যোগের লীলা একান্ত অনায়াস হইবে। এই পরিণামকে রূপ ও অরূপের পূর্ণ সামঞ্জস্যীভূত অবস্থা বলা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম বিশ্বাস ও সাধনপথ কি ছিল তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রে যেমন, তেমনি জাতীয় জীবনে এমনকি সমগ্র মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের কোন একটি অভিপ্রায় যে ধীরে চরিতার্থতা লাভ করিতেছে রবীন্দ্র-কাব্যে এই উপলব্ধির প্রথম পরিচয় পাই 'খেয়া' কাব্যের দুই-একটি কবিতার মধ্যে। তাহার পর হইতে তাঁহার এই বোধ ক্রমিক গভীরতা এবং সেই সঙ্গে সমগ্র মানব-সভ্যতা সম্পর্কে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী উচ্চারণ করিবার ক্ষমতাও উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়াছে।

ভারতীয় সংস্কৃতিতে অধ্যাত্ম-সাধনা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধি ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নূতন। এই উপলব্ধির ক্ষেত্রে তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দ্বারা কতটা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। তবে 'Old Testament'-এ ইসরাইলের সাধকদের কথা স্বাভাবিক-ভাবে মনে আসে। এক-একটি জাতির উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া এক-একটি বিশিষ্ট কোন অভিপ্রায় যে চরিতার্থ হইতেছে, কেবল তাহাই নয়, এইরূপে সমগ্র

মানব-সমাজকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বরীয় কোন একটি অভিপ্রায় যে ধীরে ধীরে রূপ লইয়া উঠিতেছে এই বিশ্বাসবোধ বিশ্ব-সভ্যতায় তাঁহাদের মধ্যেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করিতেন, এই অভিপ্রায়ের প্রকাশ ঘটিতেছে ধীর অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া। এ ক্ষেত্রে খ্রীষ্টানধর্মবিশ্বাস হইতে তাঁহার বিশ্বাস যথেষ্ট বিশিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই বিশ্বাসবোধে বিশ্ব-সংস্কৃতির সমগ্র রূপটি গতি ও পরিবর্তনশীল হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে ভারতীয় অধ্যাত্ম-উপলব্ধির ক্ষেত্রে সংস্কৃতির এই সমগ্র রূপটি স্থির পিরামিড আকৃতিবিশিষ্ট একটি সুসম্পূর্ণ স্থাপত্যের মত। অসীম বা অরূপ যিনি, তিনি রূপের ভিতর দিয়া আপনাকে ক্রমাগত প্রকাশ করিতেছেন বলিয়া বিশ্ব-সংস্কৃতি স্থির কোন রূপাশ্রয়ী হইতেই পারে না।

ব্যক্তি-হৃদয়কে ঈশ্বরের বধূরূপে কল্পনা সকল দেশের প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কোন-না-কোন রূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। কিন্তু সমগ্র জাতি বা জাতি-চিত্তকে ঈশ্বরের বধূরূপে কল্পনা বোধ হয় ইসরাইলের মধ্যেই প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। জাতীয়তাবোধকে যেখানে অধ্যাত্ম সাধনার ভিত্তিস্বরূপে আশ্রয় করা হইয়াছে, সেখানে ব্যক্তি-হৃদয়ের ভিতর দিয়া যেমন তেমনি জাতি-হৃদয়ের ভিতর দিয়া ঈশ্বরীয় বোধের প্রকাশের কথা বলা হইয়াছে। এই বোধও অবশ্য যথেষ্ট আধুনিক। কেবল ব্যক্তি বা জাতি-চিত্তকে আশ্রয় করিয়া নয় ঈশ্বরের এই যোগের লীলা চলিতেছে সমগ্র মানব-চিত্তকে আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বাসবোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এক আশ্চর্য পরিণতি লাভ করিয়াছে।

বিশ্বপ্রকৃতি ও নিখিল মানব-সংসারকে আশ্রয় করিয়া এই মর্ত্য-লোক। কবির কাব্যে এই অখণ্ড মর্ত্য-লোকের বিচিত্র প্রকাশ। প্রকৃতি ও মানবের অন্তহীন ভাব-ভাবনাকে তিনি তাঁহার কাব্যে রূপদান করিয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবে তাহার সমগ্র প্রকাশ তাঁহার কাব্যে ধরা পড়ে নাই। অসম্পূর্ণতার একটি দিকের কথাই তিনি বিশেষ করিয়া এক্ষেত্রে বলিয়াছেন।

যে লাঞ্ছিত মানব-সমাজ তাহাদের ব্যথা-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া দূর গ্রহের মত আবর্তিত হইতেছে, যাহাদের সম্পর্কে আমাদের কোন কৌতূহল নাই, কেবল এক আশ্চর্য মনগড়া ধারণা পোষণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকি মাত্র; যাহারা বিশ্বের সকল কর্মের ভার বহন করিতেছে, অথচ বিনিময়ে মনুষ্যত্বের সকল দাবি যাহাদের ক্ষেত্রে অস্বীকৃত; তাহাদের হৃদয়-লোকটি যদি উদ্‌ঘাটিত

করিয়া দেখাইতে পারা যাইত তবে কী এক আশ্চর্য জগৎই না প্রকাশ হইয়া পড়িত। এই দায়িত্ব কেবল মহৎ প্রতিভাসাপেক্ষ নয়, ইহা তাঁহারই পক্ষে সম্ভব যিনি ওই মানব-সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার সুখ-দুঃখবোধের মধ্যে তাহাদের সুখ-দুঃখবোধের প্রকাশ, তাঁহার সম্মান-অসম্মানে তাহাদের সম্মান-অসম্মান। যাঁহার আত্ম-প্রকাশের সংগ্রামের মধ্যে ওই সমগ্র মানব-সমাজের আত্মপ্রকাশের সংগ্রাম, কবি তাঁহারই আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়াছেন। সেই অনাগত মহৎ প্রতিভার উদ্দেশে তিনি আপনার শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন। ততদিন মহামানবের প্রকাশ অচরিতার্থ রহিয়া যাইবে, বিশ্ব-মানব-মনের প্রকাশ সীমিত কুণ্ঠিত হইয়া থাকিবে। কবির ধর্ম সামগ্রিক ধর্ম বলিয়া তাহা সমাজের কোন একটি অংশকে, জীবনের কোন একটি দিককে অস্বীকার করিয়া পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

"এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারিধারে,
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।"

এই জীবনের সমস্ত ক্রিয়াকে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে যে দেখা সম্ভব তাহা কবি স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াছেন। কবির এই উপলব্ধির পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে একাধিকবার লাভ করিয়াছি। এমনি ভাবে জন্ম-জন্মান্তর ব্যাপ্ত জীব-জীবনের সকল ক্রিয়াকে কোন এক উর্ধ্বতর চেতনায় অধিষ্ঠিত হইয়া কি দেখা সম্ভব? এই জিজ্ঞা র সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর অধ্যাত্ম উপলব্ধির আভাসও সেই সঙ্গে লাভ করা য়। হিন্দু যোগশাস্ত্র বলেন, জীবের দিব্য চেতনার সাক্ষাৎ লাভ করিবার পরেও জাগতিক ক্রিয়া কিছুকাল অব্যাহত থাকিতে পারে, যে-পর্যন্ত না পূর্ব এবং ইহ জীবনের কর্মফল সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া যায়। একটি উপমার সহায়তায় এই তত্ত্বটিকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। দ্রুত ধাবমান রথ হইতে চাকা খুলিয়া গেলেও তাহার মধ্যে রথের গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়া থাকিবার জন্য তাহা যেমন অনেকটা দূর পর্যন্ত আপনি আবর্তিত হইতে থাকে, তেমনি মুক্তি লাভের পরেও কর্মফল নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত জীবন ক্রিয়া চলিতে থাকে। যোগশাস্ত্রের এই পরিপূর্ণ নিরাসক্ত অনুভূতির কথা রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন।

"আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে।"

কিন্তু যোগশাস্ত্র হইতে তাঁহার এই উপলব্ধির পার্থক্য এই যে যোগশাস্ত্র যেখানে বলিতেছেন, যে মুক্ত অবস্থা লাভের পর একটি পরিণামে জীব-সত্তার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে, রবীন্দ্রনাথ সেই সত্তার বিলুপ্তিকে কেন পরিণামে স্বীকার করিতে চান নাই। তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া রূপের (দেহ-প্রাণ-মন বিশিষ্ট সত্তা) রহস্য ভেদ করিতে চেষ্টা করিয়া ছিলেন। তাহা না হইলে রূপ ও অরূপের রহস্য ভেদ যে হয় না। তিনি যোগের মুক্তি-তত্ত্বকে যেমন একদিকে স্বীকার করিয়াছেন, তেমনি চিরন্তন রূপের লীলাকেও স্বীকার করিয়াছেন। এই উভয়ের মধ্যে যোগ কোন-না-কোন স্বরূপে আছেই। রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন ধরিয়া এই যোগের রহস্যভেদের সাধন করিয়াছেন।

"এই বাহ্য আবরণ জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আসি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।"

বিশ্বের সীমিত বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার চেতনা বারংবার সকল সীমার অতীত সত্তার আভাস লাভ করিয়াছে। মৃত্যুতে সীমার সকল বোধ লুপ্ত হয়; কিন্তু এই দুর্লভ অনুভূতির মুহূর্তগুলি অক্ষয় হইয়া থাকে, অজ্ঞেয় যাত্রাপথের একমাত্র পাথেয়, অনির্বাণ আলোক-বর্তিকা।

"সে পথের পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে
সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।"

সেই অপর সত্তা, যাহা অসীম বা অরূপ, লাভের মধ্যে জীবনের সর্বশেষ সার্থকতা।

"বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,—"

একথা তিনি নানাভাবে বারংবার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন শক্তি, উপকরণ, ঐশ্বর্য ও শিক্ষা-দীক্ষায়। যে জাতির মধ্যে সমাজে অসাম্য যত কম সে জাতি তত সভ্য, উন্নত; অন্যদিকে অসাম্য বাড়িতে বাড়িতে জাতিকে

এমন এক পরিণামের সম্মুখীন করে যেখানে ধর্ম জাতির একেবারে মর্মস্থলে দারুণ আঘাত করে। কত জাত এইরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে!

"এক পাখা শীর্ণ যে পাখীর
ঝড়ের সঙ্কট-দিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধূলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।"

মৃত্যুর পরপারবর্তী সেই চিরজ্যোতির্ময় অমৃত লোকটিকে লাভ করিবার জন্ত প্রার্থনা।

"হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।"

বর্তমান কাব্যে একটি কবিতা আছে, যেখানে জীবনের নিয়তিকে কোন তত্ত্বাশ্রয়ী হইয়া জয় করিয়া উঠিবার চেষ্টা নাই। জীবনের নিয়তিকে কেবলমাত্র জীবনের স্বরূপে মানিয়া লইবার আকাঙ্ক্ষা।

ধরিত্রীর বুকে ফুল যেমন করিয়া ধীরে বিকশিত হয়, তাহার পর আপনার সৌন্দর্য, সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া একদিন নিঃশেষে ঝরিয়া যায়, ঝরিবার কালেও শেষ ক্ষণ পর্যন্ত সৌরভ বিকীর্ণ করিতে কার্পণ্য করে না, মানব-জীবনকেও তেমনি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়।

আপন হৃদয়ের ঐশ্বর্য সম্পদ দিয়া এই ধরিত্রীকে যতদিন জীবন থাকিবে ততদিন কেবল ভালোবাসিয়া লওয়া, তাহার পর মৃত্যুতে মানব-ভাগ্যকে অক্লিষ্ট অন্তরে বরণ করিয়া লওয়া।

ইহাকে আরো একটু তত্ত্বান্বিত করিয়া বলা যায়, যে-ধরিত্রী ফুলের মধ্যে অমন অপরূপ সৌন্দর্য সৌরভের প্রকাশ ঘটাইয়াছে, স্বাভাবিক নিয়মে ধরিত্রী যেদিন একে একে তাহার সব দান ফিরাইয়া লয়, সেদিন ফুল তাহাকে আসক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া আমার বলিয়া ধরিয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করে না।

মানব-জীবনে ইহাকেই সত্য করিয়া তুলিতে হয়। ধরিত্রীর অন্তহীন প্রাণের যোগে এই প্রাণ সৃষ্ট। প্রাণের যোগ জীবনে যত গভীর হয়, অন্তরে সৌন্দর্য ও প্রেমের সম্পদ ততই অফুরান হইয়া উঠে। তাহার পর ধরিত্রী যদি

প্রাণের যোগ ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন করিয়া সকল সম্পদ একে একে ছিনাইয়া লয়, তবে তাহাকে আমার বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার কি আছে। তাহাতে আসক্তির নিদারুণ বিকৃতিই শুধু নামে। মানব-ভাগ্যের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম শুধু ব্যর্থ। তাই মৃত্যু যেদিন আসিবে সেদিন কবি যেন হাসিমুখে ধরিত্রীর দেওয়া সম্পদকে আপন হস্তে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া যাইতে পারেন।

"ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি,
শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের
পানে অসুন্দর।"

কবি আপন সত্তার এক অন্তহীন বিস্ময় ও রহস্যকে উপলব্ধি করিয়াছেন। ইহাকে সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত করিবার কোন উপায় নাই। আর তাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন মহান্ এক দূরত্ব,—যাহাকে কোন কালেই অতিক্রম করিয়া একান্তরূপে লাভ করিবার কোন উপায় নাই। আপনার সত্তাকে ঘিরিয়া এই যে অন্তহীন বিস্ময় ও রহস্য, এই যে সুদূরতা তাহাকে তিনি বিশ্বের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। জীবন ও জগৎ ঘিরিয়া এমনি অসীম রহস্যবোধ কবির জীবনে আমৃত্যু রহিয়া গিয়াছে।

একদিকে বিশ্বের সুদূর মহিমা
"দেখিলাম সত্তস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোক চন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।
যে মহা দূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন 'পরে।"

অন্যদিকে ব্যক্তির দূরত্ববোধ—
"যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকা জ্যোতির্বাষ্প মাঝে
রহস্য আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী অজানা তাহার পরিণাম।"

মৃত্যুতে জীবনের যে ভয়ঙ্কর পরিণাম তাহাকে জয় করিয়া উঠিবার জন্য কবি যে সকল তত্ত্ব আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় আমরা লাভ করিয়াছি। আবার ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি সেই সকল তত্ত্ব উৎক্ষিপ্ত করিয়া কবি-চেতনা বারংবার সান্ত্বনাহীন হাহাকারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নিম্নে এই বোধের আর একটি দৃষ্টান্ত লাভ করিতে পারা যাইবে।

"জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়।
পুষ্প বীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া।"

মহামানব-বন্দনার যে একটি ধারা রবীন্দ্র-কাব্যে পূর্বাপর বহিয়া আসিয়াছে আমরা ইতিপূর্বে তাহার বিস্তারিত পরিচয় লাভ করিয়াছি। তাহাতে মহামানবের যে সকল লক্ষণের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, নিম্নের উদ্ধৃতিটির মধ্যে তাহারই একটি সামগ্রিক পরিচয় লাভ করিতে পারা যাইবে।

"এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহুযুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরার সৃষ্টির অভিপ্রায়—"

আতপ্ত ধরণী কত যুগযুগান্ত কাল তপস্যার পর ফুলের এমন পরমাশ্চর্য দান লাভ করিয়াছে। এমনি এক আশ্চর্য প্রকাশ মানব-প্রীতি। কত যুগ-যুগান্ত ধরিয়া চিত্তশোধনের ফলে মানুষ ইহা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

মানুষের কল্যাণকামনায়, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনে এই ফুল এবং এই প্রেমের চেয়ে বড় দান আর কি হইতে পারে।

"নক্ষত্র-খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃ সম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।"

কবির বিশ্ব-সত্তা লাভের আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ আমরা জানি, তাহা হইল বিশ্বের অন্তহীন ভাব-ভাবনার সহিত ব্যক্তি-সত্তার যোগের অনুভূতি। সে যোগ দেহে-প্রাণে-মনে-আনন্দে। একদিকে তিনি যেমন অতীন্দ্রিয় সত্যলাভের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলেন, অন্যদিকে তেমনি তিনি বিশ্বের যোগে জীবনকে পরিপূর্ণ ফলবান করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যে পূর্ণতাকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন তাহা এইরূপে বিশ্বের যোগে ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ এবং তাহারই যোগে বিশ্বাতীতের আনন্দানুভূতি। ভারতবর্ষীয় ধর্ম ও অধ্যাত্ম সাধনা যাহাকে লক্ষ্য করিয়াছে তাহাকে লাভ করিতে হয় মানবিক সকল বোধের ঊর্ধ্বে উঠিয়া। মনুষ্যত্বের সাধনার ক্রম সেই উপলব্ধির ক্ষেত্রে কোন আপেক্ষিকতা সৃষ্টি করে না।

এই মনুষ্যত্বের সাধনা একদিকে বিশ্বের সহিত যোগে—

"আমি পৃথিবীর কবি, সেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বর সাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।"

অন্যদিকে মানব সংসারের সহিত যোগে—

"সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোন পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

এই পূর্ণতা কবির লক্ষ্য ছিল বলিয়া একদিকে পূর্ণচেতনার সাগরসঙ্গমে আপনার চেতনাকে মিলিত করিবার জন্য কবি যেমন প্রস্তুত হইতেছেন—

"সেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে সেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর-সঙ্গমে।"

তেমনি সেই চরম অনুভূতিলাভের মুহূর্তেও যে ব্যক্তি-সত্তার অবশেষ থাকে এমন নিঃসংশয় উপলব্ধির কথাও কবি ইহার ঠিক পরেই ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনায় জীব-সত্তার এই অবশেষের উপলব্ধির কথা যেখানে আছে সেখানে পূর্ণ উপলব্ধিকে অস্বীকার করা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনার প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করিতে একদিকে অরূপের রহস্যভেদ যেমন প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে ব্যক্তি-সত্তার এই মূল্য-নিরূপণের চেষ্টার রহস্যভেদও প্রয়োজন।

"এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।"

দেশ-কাল অন্তর্গত সত্তার এই যে 'অজানা তীর্থে' যাত্রা, আমাদের সেই তীর্থের স্বরূপটিকেও জানিতে হইবে।

প্রভাতের আর একটি অপরূপ চিত্র এবং, এই সৌন্দর্য সাক্ষাৎকারের ভিতর দিয়া কবি-চেতনার সহিত বিশ্ব-চেতনার যোগের নিবিড় আনন্দানুভূতির পরিচয় লাভ করিতে নিম্নে একটি অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি।
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।"

শেষ লেখা

মর্ত্যের রূপের মধ্যে কবি ক্ষণে ক্ষণে যে অসীম বা অরূপের আভাস লাভ করিয়াছিলেন, সেই যে অধরা অনির্বচনীয়, আজ সকল রূপের ঊর্ধ্বে উঠিয়া তাহাতে নিঃসংশয়ে স্থিতি লাভ করিবার ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে।

"হয় যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয়,
বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়,
পায় অন্তর নির্ভর পরিচয়
মহা অজানার।"

এই প্রার্থনার মধ্যে মর্ত্য বা রূপের সত্য মূল্য অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ করিবার কোন কারণ নাই। রূপকে আশ্রয় করিয়া তিনি যে সমগ্র জীবন ধরিয়া অরূপের সহিত লীলা করিয়াছেন, এইরূপে মৃত্যুর সকল ভয়মুক্ত যে প্রকাশ, তাহাও মৃত্যুর মুখোমুখি হইতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। একটা মহা অজ্ঞাত লোকের দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইতে তাঁহার ইতিপূর্বের সকল লীলা-তত্ত্ব যে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে তাহাও অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। বর্তমান কাব্যেই তাহার নিঃসংশয় পরিচয় আছে।

প্রেমে মানুষ এমন কিছু আস্বাদ করে যাহা মৃত্যুর অতীত। তাহা মৃত্যুর অধিকার লোকের বাহিরের সম্পদ। এই জীবন ও জগৎ যে স্বরূপত মিথ্যা, তাহা যে কেবল এক মহৎ বঞ্চনা, এক সুবৃহৎ পরিহাস, তাহা সত্য নয়। বিশ্বের সর্বত্রই পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্য করা যায়। সত্তা মাত্রেরই এই ধর্ম। জীবন মৃত্যুতে একান্তরূপে বিনষ্ট হয় একথা তাই কখনই সত্য হইতে পারে না।

> "সবকিছু চলিয়াছে নিরন্তর পরিবর্ত বেগে
> সেই তো কালের ধর্ম।
> মৃত্যু দেখা দেয় এসে একান্তই অপরিবর্তনে,
> এ বিশ্বে তাই সে সত্য নহে—"

মায়াবাদীরা বলেন, একটি অস্তিত্বের প্রত্যয় বা অনুভূতি যে আমাদের আছে তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু প্রত্যয় বা অনুভূতি থাকিলেই বাহিরে তাহার অস্তিত্ব থাকিবে এমন কোন প্রমাণ নাই। আমি আছি সত্য এবং এই অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আমি এই দেশ কালের বোধ (ইহাও বিভিন্ন প্রত্যয়ের যোগে সৃষ্ট এক নূতন প্রত্যয়) গড়িয়া তুলিয়া তাহাতে এই সকল প্রত্যয়কে বিন্যস্ত করিয়া এই নিখিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছি। ইহার আমি-নিরপেক্ষ কোন অস্তিত্ব নাই। আমার চেতনা-বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও লুপ্ত হইয়া যায়। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের এই নিঃসংশয় সত্যোপলব্ধি।

> "বিশ্বেরে যে জেনেছিল আছে ব'লে
> সেই তার আমি
> অস্তিত্বের সাক্ষী সেই;
> পরম আমির সত্যে সত্য তার
> এ কথা নিশ্চিত মনে জানি।"

বিশ্বের অস্তিত্বের সত্যতা যে আমির চেতনাযোগে, সে আমির সত্যতা আবার পরম আমির সত্যে। মায়াবাদীরা বলেন, মনের সীমাকে ছাড়াইয়া

উঠিলে, অর্থাৎ 'পরম আমি'কে লাভ করিলে 'আছে' বা রূপের এই বিচিত্র তত্ত্ব মুহূর্তে ছায়া হইয়া মিলাইয়া যায়। এই উপলব্ধিও আংশিক সত্য। পূর্ণ উপলব্ধিতে রূপ ও অরূপ শাশ্বত যুগ্ম-তত্ত্ব। ইহাকেই তিনি বলিয়াছিলেন, 'আছি আর আছে অন্তহীন আদি প্রহেলিকা'। রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক জীবন-দর্শনে 'আমি', 'বিশ্ব আমি' ও 'পরম আমি' এই তিন তত্ত্ব পূর্ণ সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে।

অবতার অর্থ অবতরণ। এক-একটি সময় আসে যখন পূর্ণ স্বরূপ আপনার পূর্ণ স্বরূপত্ব ও চৈতন্য লইয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিয়া মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। এমনি বিশ্বাস প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক জাতির অধ্যাত্ম-সাধনার ক্ষেত্রে কোন-না-কোন রূপে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথ মহামানব বলিতে এই অবতার-তত্ত্ব বুঝিতেন না। তিনি মহাপুরুষদের কথা বলিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতর দিয়া মর্ত্যের মানুষ পূর্ণ মনুষ্যত্বের শুধু নয়, ঈশ্বরীয় বিভূতির নানা আভাস লাভ করিতে পারেন, যাঁহাদের ভিতর দিয়া সমগ্র মনুষ্য-সভ্যতা উন্নততর পরিণাম লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ অভিব্যক্তিবাদে বিশ্বাসী। তাই স্বাভাবিকভাবে তাঁহার পক্ষে জীবের মধ্যে ঈশ্বরের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশে বিশ্বাস করা সম্ভব নাই। সমগ্র মানব-সমাজ ঈশ্বরের ঐশ্বর্যকে ক্রমাগত অধিক পরিমাণে লাভ করিয়া চলিয়াছে। তিনি যেখানে বলিয়াছেন, 'ঐ মহামানব আসে', সেখানে সমগ্র মনুষ্যসমাজের মধ্যে অভাবনীয় সৌন্দর্য ও প্রেমের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অনাস্বাদিত সামর্থ্য ও শক্তির, সৃষ্টি-শক্তির পরমাশ্চর্য প্রকাশের কথাই বলিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্য-সমাজকে আশ্রয় করিয়া যে মনুষ্যত্বের ধীর বিকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে, মহামানব-বন্দনা তাহারই সম্মিলিত রূপের বন্দনা, সমগ্র 'মানব-অভ্যুদয়ে'র বন্দনা।

মহামানব বলিতে রবীন্দ্রনাথ কি বুঝিতেন তাহার কিছু পরিচয় আমরা ভূমিকায় লাভ করিয়াছি। অবতার বা অবতরণ বলিতে হিন্দুধর্ম যাহা বুঝিয়া থাকেন তাহার স্বরূপও আমরা জানি। মহামানব বলিতে রবীন্দ্রনাথ ইহা বুঝাইতে চান নাই।

মিলিত মানবচেষ্টার ভিতর দিয়া মানববোধাশ্রয়ী রূপে যাঁহার নিয়ত প্রকাশ ঘটিতেছে, যিনি মানবিক সমস্ত খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রয়াসকে একটি লক্ষ্যাভিমুখীন করিয়া পরিচালিত করিতেছেন, দেশ-কালের মধ্যে ঐতিহাসিক বিকাশের বোধ-রূপে যাঁহার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই মহামানব বলিয়াছেন।

যাঁহারা দেশ-কালের অন্তর্গত এই বিকাশ-তত্ত্বকে স্বীকার করেন না, দেশ-

কালাতীতের সহিত ইহার একপ্রকার মিস্টিক যোগকে স্বীকার করিলেও মূলত 'মায়া' বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন তাঁহারা স্বাভাবিক ভাবে অবতার বলিতে যে অবতরণ বুঝাইবেন তাহাতে বিচিত্র কি! মাঝে মাঝে মানব-সংসারে পাপের আধিক্য ঘটে (ইহাদের চিরন্তন প্রতিনিধিদের রাক্ষস প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।) তাহারা লীলা (!) করিবার জন্য মাঝে মাঝে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করে। আবার এই শক্তিকে প্রতিহত এবং বিনষ্ট করিবার জন্য পুণ্যের চিরন্তন প্রতিনিধিদল একই কালে মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। ইঁহারা ঈশ্বরের লীলা পরিকর, তাঁহারই বিচিত্র আংশিক শক্তির প্রকাশ। এই পরিকরদের বেষ্টিত হইয়া, তাঁহাদের নিয়ত উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। তখন ঈশ্বর মর্ত্যে অবতীর্ণ হন এই পাপকে পরাভূত করিয়া ধর্ম-সংস্থাপন করিবার জন্য। এমনি করিয়া যুগে যুগে তাঁহার প্রকাশ ঘটিয়া চলিয়াছে। এমনি চলিতেছে কল্প-কল্পান্ত ধরিয়া। পাপ-পুণ্যের এই মিশ্রিত-অবস্থাই বিশ্বের চিরন্তন স্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ মহাপুরুষ বলিতে ঈশ্বরের পূর্ণপ্রকাশস্বরূপ কোন মানব-সত্তাকে বুঝিতেন না। তিনি মহাপুরুষ বলিতে তাঁহাদেরই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরীয় গুণাবলীর বহুল বিচিত্র প্রকাশ ঘটিয়াছে। ঈশ্বরীয় অভিপ্রায় চরিতার্থতার পক্ষে মানবসংসারে যে বহু বিচিত্র বাধা সেই বাধাকে আংশিক দূরীভূত করিয়া পূর্ণতাভিমুখীন মানবযাত্রাকে ত্বরান্বিত করিবার জন্য তাঁহারা মর্ত্যে অবতীর্ণ হন।

তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে মানবিক সকল ত্রুটিমুক্ত, কেবল তাহাই নয়, তাঁহাদের দিব্য-জীবনের প্রভাব সমস্ত মানব-সংসারের উপর আসিয়া পড়ে।

সকল দেশে সকল কালে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ নিয়তই তাঁহাদের স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আপন চিত্তের যোগ-স্থাপনের জন্য ধ্যানতন্ময় হইয়াছেন। মানব-সংসারে যেখানে যতটুকু মনুষ্যত্বের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ সেইখানেই ঈশ্বরের প্রকাশকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য বোধ করিয়াছেন। সকল দেশের মহাপুরুষ সম্পর্কে তাঁহার কৌতূহলের সীমা ছিল না, তাঁহাদের নিকট সান্নিধ্যলাভের জন্য তিনি নিয়ত উৎসুক ছিলেন।

এই ধরনের বিচিত্র মহামানব-বন্দনা রবীন্দ্র-কাব্য-ধারায় সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। তাহাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে আলোচনা করা যাইতে পারে।

প্রথমে ঈশ্বরীয় উপলব্ধিকে জীবনে সত্য করিয়া লাভ করা, তাহার পর

তাহারই অনুপ্রেরণায় বৃহৎ কর্মে আপনাকে সমর্পণ করা। মহাপুরুষদের জীবনে এই দুইটি দিক আমরা প্রত্যক্ষ করি। রবীন্দ্রনাথ সংসারের মাঝখানে তাঁহাকে লাভ করিতে চাহিয়াছেন। নৈবেদ্যের ৬০ সংখ্যক কবিতাটি এই প্রসঙ্গে পাঠ করা যাইতে পারে।

মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনা, পাপের বিচিত্র কুটিল প্রয়াস, চতুর্দিক ব্যাপ্ত হতাশা, ব্যর্থতা ও সংশয়ময় অন্ধকারের মধ্যে কবি সেই মহামানবকে ফিরিয়া ফিরিয়া আহ্বান করিয়াছেন।

"আজ কি আসিল প্রলয়রাত্রি ঘোর।
চিরদিবসের আলোক গেল কি মুছিয়া।
চিরদিবসের আশ্বাস গেল ঘুচিয়া ?
দেবতার কৃপা আকাশের তলে কোথা কিছু নাহি বাকি ?"

(উৎসর্গ ৩১)

গীতাঞ্জলির ৫১ সংখ্যক কবিতাটি এই শ্রেণীর কবিতার আর একটি দৃষ্টান্তস্থল।

"কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস—
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো
পাগল ওগো ধরায় আস।"

ঈশ্বরীয় অনুভূতি ইঁহাদের জন্মলব্ধ সামগ্রী। ইঁহাদের দৃষ্টি তাই অভ্রান্ত। ইঁহাদের কর্মপ্রেরণা অনিঃশেষ। কোন মহৎ বঞ্চনা, কোন প্রতারণা, কোন ক্ষতি, কোন লাঞ্ছনা ও অবমাননা ইঁহাদের চিত্তকে চঞ্চল করিতে পারে না। সকল মালিন্যের ঊর্ধ্বে ইঁহারা আপনাদের হৃদয়কে চিরস্থির রূপে ধারণ করিয়া রাখিতে পারেন। বিশ্বের যেখানে মনুষ্যত্ব লাঞ্ছিত সেখানে তাঁহারা মনুষ্যত্বের বোধ ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হন। তাঁহারা চিরন্তন প্রাণের আনন্দময় তত্ত্বটিকে আপনার জীবনে উপলব্ধি করেন বলিয়া তুচ্ছতম প্রাণের জন্যও প্রাণ বিসর্জন করিতে ইতস্তত করেন না।

কিংবা গীতালির ৫৩ সংখ্যক কবিতাটি। এখানে যে মাঝির কথা বলা হইয়াছে তিনি সেই দিব্য-প্রেরণা, জাতি-জীবনের উত্থান-পতনের ভিতর দিয়া যাঁহার প্রকাশ। ঈশ্বরীয় লীলাকে এই দিক হইতে আমরা কখন দেখি নাই। ঈশ্বরের যে একটি বিশিষ্ট অভিপ্রায় সমগ্র জাতীয় জীবনকে আশ্রয় করিয়া সঙ্কট-আবর্তের ভিতর দিয়া ধীরে চরিতার্থ হইতেছে এবং কেবল জাতীয় জীবনকে

আশ্রয় করিয়া নয় সমগ্র মানব-সংসারকে তিনি অজ্ঞাত কোন লক্ষ্যাভিমুখীন করিয়া পরিচালিত করিতেছেন এই বিশ্বাস ইসরাইলের মনীষী দ্রষ্টাদের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় বিশ্বাসের পশ্চাতে ইহার কোন প্রভাব আছে কি-না, কিংবা ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল তাহা নিঃসংশয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। গীতালি রচনাকালের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরীয় লীলাকে ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রেই শুধু নয় তাঁহাকে জাতি ও বিশ্বজীবনের ক্ষেত্রেও নিঃসংশয়রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

গীতালির ৯০ সংখ্যক কবিতাটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মহাপুরুষদের মহান্ চেতনা-প্রকাশের মধ্যে আছে নিখিল বিসৃষ্টির আত্মপ্রকাশের গোপন অভিপ্রায়। বিশ্বের মধ্যে ক্রমিক উন্নততর চেতনালাভের যে দুঃসহ আবেগ আছে, তাহা মহাপুরুষদের মধ্যে আসিয়া যে পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং চেতনা-প্রসারের ক্ষেত্রে তাহাই যে সর্বশেষ পরিণাম তাহা সত্য নয়, আরো উন্নততর পরিণামের দিকে তাহার অভিসার।

বলাকার ৫ সংখ্যক কবিতাটি এই শ্রেণীর আর একটি কবিতা। আমরা 'বলাকা' কাব্য আলোচনা প্রসঙ্গে ইহা আলোচনা করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে তাহা ফিরিয়া পাঠ করা যাইতে পারে।

কবি যখনই দেশব্যাপী, বিশ্বব্যাপী, মনুষ্যত্বের বিচিত্র লাঞ্ছনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মনুষ্যত্বকে হত্যা করিবার কত না নির্মম ষড়যন্ত্র, অপরাধের পাষাণতটে তরুণ প্রাণের বুকফাটা আর্তনাদ, তখনই তিনি বিক্ষোভে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছেন। চিরন্তন সেই ধর্মকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য কবি তখন ব্যাকুল হইয়াছেন, যে ধর্ম মহৎভয় মহাত্রাস-রূপে নিখিল বিশ্বকে পরিচালিত করিতেছেন। তাঁহার সেই মহাক্রোধে জাগ্রত অনিমেষ-দৃষ্টিকে বারেকের জন্য প্রত্যক্ষ করিয়া কবি সান্ত্বনা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। ঈশ্বরীয় লীলার সেই গূঢ় রহস্যকে উদ্ঘাটন করিবে কে? কিংবা তাঁহার প্রেমের সীমা পরিমাণ করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। যে প্রেমে এমন অপরাধীকেও ক্ষমা করা যায়।

বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপরিসীম শ্রদ্ধা সর্বজনবিদিত। এই শ্রদ্ধা তাঁহার বিচিত্র রচনার ভিতর দিয়া নানাভাবে প্রকাশলাভ করিয়াছে।

তাঁহার মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন অনিঃশেষ প্রাণ-ধারা, যাহার স্পর্শে একদিন মৃতপ্রায় ভারতবর্ষ প্রাণ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার মধ্যে ছিল অপরিমিত প্রেম, যে প্রেমে মানুষ বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে আপনাকে পরিব্যাপ্ত

করিয়া দিয়া শান্তি লাভ করে। তিনি ছিলেন ঈশ্বরীয় প্রেমের মূর্ত্য প্রকাশ। তাঁহার মধ্যে যে অনন্ত পুণ্য, যে অপার করুণা, যে দিব্যজ্ঞান, যে অমিতবীর্য তাহাতে জীবন ও জগতের সকল অপরাধের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

তাঁহার জীবনলব্ধ সত্যই মানব-সংসারকে স্বার্থের বিচিত্র সঙ্ঘাত হইতে মারামারি হানাহানি, সন্ত্রাস ও গ্লানি হইতে মুক্ত করিয়া চিরকল্যাণ ও শান্তির লোকে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারে। ফিরিয়া ফিরিয়া কবি তাই তাঁহার নূতন জন্মলাভের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।

দেশে দেশে যখন স্বার্থের সঙ্ঘাত বাধে, শক্তিমান উদ্ধত মানুষ যখন দুর্বলের সকল প্রত্যাশাকে দলিত করে, দুঃখীর দুঃখভারকে অসহনীয় করিয়া তুলে, সংসারে আত্মতৃপ্তি স্বার্থসিদ্ধি যখন সকলের বড় হইয়া উঠে, যুগে যুগে মানুষ যাহাকে শ্রদ্ধা করিয়া আসিয়াছে, তাহাকে দলিত করিতে এতটুকু দ্বিধা ও সঙ্কোচ বোধ করে না, এই সকল দেখিয়া যখন কবির চিত্ত পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর মত নিষ্ফল পাখা ঝাপটাইয়া মরিয়াছে, তখনই তাঁহার দৃষ্টিসমক্ষে ভাসিয়া উঠিয়াছে সংসারবিরাগী সর্বত্যাগী রাজকুমারের চিরজ্যোতির্ময় মূর্তি। যাহাদের ভরসা নাই, জীবনে বিশ্বাস যাহাদের ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে বুদ্ধদেবের জীবন তাহাদের প্রাণে ভরসা ও বিশ্বাস সঞ্জীবিত করিয়া তুলে। বুদ্ধদেবের মহাজীবন পাঠে বারংবার কবির মনুষ্যত্বে বিশ্বাস ফিরিয়া আসিয়াছে। পরিশেষের 'বুদ্ধদেবের প্রতি,' 'বুদ্ধ-জন্মোৎসব' ও 'প্রার্থনা'—তিনটি কবিতার মধ্যে কবির বুদ্ধদেবের প্রতি এই গভীর শ্রদ্ধার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বুদ্ধদেবের প্রতি যেমন তিনি সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন, ঠিক অনুরূপ শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন খ্রীষ্টের প্রতি। খ্রীষ্টকে তিনি কোথাও দেখিয়াছেন ঐতিহাসিক পূর্ণ মনুষ্য-সত্তা রূপে, কোথাও তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন অধ্যাত্ম-চেতনার প্রতীক রূপে। নিত্যকাল ধরিয়া যে মনুষ্যত্ব সংসারে বিচিত্র পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া আত্মসুখ বিসর্জন দিতেছে, বিচিত্র নির্যাতন ও দুঃখভোগ করিতেছে, মৃত্যুবরণ করিতেছে তাহারই নির্বিশেষ শক্তির প্রকাশরূপ যীশুখ্রীষ্ট।

সংসারে পাপ যীশুর কালে যেমন ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে, কেবল তাহার প্রকাশ-রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আজও মানুষ তাহার বিরুদ্ধে নিয়ত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুবরণ করিতেছে। এই সংসারে প্রতি মুহূর্তে খ্রীষ্টের হত্যা সাধিত হইতেছে।

"খ্রীষ্ট বুকে হাত চেপে ধরলেন ;
বুঝলেন শেষ হয়নি তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মৃত্যুর মুহূর্ত।" (মানবপুত্র)

সকল মানুষের হৃদয়ের মধ্যে তিনি বিরাজ করিতেছেন। দারুণ দুঃখে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইলেই তাঁহার বাণী শুনিতে পাওয়া যায়। আবার আমরা বিস্মৃত হই। প্রবৃত্তি আর সংশয় আবার আমাদের ভাসাইয়া লইয়া যায়।

ইতিহাসে এক-একটি যুগ থাকে শান্তির, সমৃদ্ধির। অপরাধের গোপন কাঁটা ইতস্তত কোথাও কোথাও বিছান থাকিলেও মোটামুটিভাবে উচ্চতর নৈতিক ও ধর্মবোধের প্রেরণা সর্বত্র ক্রিয়া করে। আবার অন্ধকার আসে। তখন সমগ্র জাতি-জীবন পরিব্যাপ্ত করিয়া সংশয় দেখা দেয় ; ধর্ম ও নীতি সম্পর্কে শাশ্বত জীবন সম্পর্কে সংশয়। তখন মানুষ আপন বিবেককে হত্যা করে। মহাপুরুষগণ মানবসংসারের সম্মিলিত বিবেকের প্রকাশ।

আবার চিরন্তন বিবেকবোধ ফিরিয়া আসে। মানব-সংসারে এই এক নাটক ফিরিয়া ফিরিয়া অভিনীত হইতেছে।

"পূর্ব দেশের বৃদ্ধ বললে,
আমরা যাকে মেরেছি সেই দেখাবে।
সবাই নিরুত্তর ও নতশির।
বৃদ্ধ আবার বললে, 'সংশয়ে তাকে আমরা অস্বীকার করেছি,
ক্রোধে তাকে আমরা হনন করেছি,
প্রেমে এখন আমরা তাকে গ্রহণ করব
কেননা, মৃত্যুর দ্বারা সে আমাদের সকলের জীবনের মধ্যে সঞ্জীবিত,
সেই মহামৃত্যুঞ্জয়।" (শিশুতীর্থ)

যে আদর্শ জীবন ও জগতের দিকে কবি মানব-যাত্রীকে পরিচালিত করিয়াছেন, তাহার পরিচয় লাভ করিতে কবিতাটির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি

"পথের দুইধারে 'দিক্ প্রান্ত অবধি
পরিণত শস্যশীর্ষ স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে দোলায়মান—
আকাশের স্বর্ণলিপির উত্তরে ধরণীর আনন্দ-বাণী।
গিরিপদবর্তী গ্রাম থেকে নদীতলবর্তী গ্রাম পর্যন্ত
প্রতিদিনের লোকযাত্রা শান্ত গতিতে প্রবহমান।

কুমোরের চাকা ঘুরছে গুঞ্জন স্বরে,
কাঠুরিয়া হাটে আনছে কাঠের ভার,
রাখাল ধেনু নিয়ে চলেছে মাঠে,
বধূরা নদী থেকে ঘট ভরে যায় ছায়াপথ দিয়ে।" (শিশুতীর্থ)

এই সরল অনাড়ম্বর, সর্বপ্রকার পাপপ্রয়াস ও কুটিলতামুক্ত শান্ত গ্রাম্য জীবন ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনের আদর্শ। একদিন পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশ ঘটিবে এই জীবনধারার মাঝখানে। হয়ত বিশ্বের কোথাও কোন গ্রামপ্রান্তে কোন অবহেলিত পরিবেশে তিনি আবার জন্মলাভ করিয়াছেন।

বীথিকায় একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা আছে, 'দেবতা'। ধর্মবোধের সর্বশেষ লক্ষ্য কি, রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা নির্দেশ করিয়াছেন। ধর্মবোধ মানুষকে পরিণামে সেই লক্ষ্যে পৌঁছাইয়া দেয়, যেখানে তাঁহার চেতনা সর্বত্র অনুপ্রবেশ করে, এবং বিশ্বের সমস্ত কিছু যেখানে তাঁহার চেতনায় অনুপ্রবিষ্ট হয়। তাঁহাদের প্রেমদৃষ্টিতে বিশ্বের সমস্তকিছু অতল মাধুর্য লইয়া দেখা দেয়। অপরাধের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য তাঁহারা প্রাণবিসর্জনেও দ্বিধা করেন না।

এই দেবত্বের প্রকাশ রবীন্দ্রনাথের জীবনেও কি আমরা প্রত্যক্ষ করি না ? তিনি স্বয়ং আপনার জীবনে এই বিচিত্র উপলব্ধির কথা বলিয়াছেন।

স্রষ্টা আপন সৃষ্ট রূপের ভিতর দিয়া আপনার অন্তর রূপকেই নানাভাবে প্রত্যক্ষ করেন। এই রূপে সমগ্র জীবন-ব্যাপী সমগ্র সৃষ্টি-কর্মকে আশ্রয় করিয়া স্রষ্টা আপনার সত্য পরিচয়টিকে বাহিরে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হন। সৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহাকে উপলক্ষ করিয়া আত্মপরিচয়-লাভটিই বড় কথা। মৃত্যুতে সে সৃষ্টিরূপের কী পরিণাম ঘটিবে সে চিন্তা নিরর্থক। কালে তাহা বিনষ্ট হইয় যায়। সব কি বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রকাশরূপের কিছুই কি অবশেষ থাকে না, যাহা ধ্রুবতারকার অম্লান জ্যোতিতে চির-সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে ?

"জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে।
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,

তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে ;
কিছু না যায় মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা।

কবির জীবনে মনের ভাবনাকে সার্থক বাণী-রূপ দান করিবার সামর্থ্য একান্ত রূপে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার জন্য কবির কী অপরিসীম গ্লানিবোধ। কিন্তু তাহার চেয়েও গভীর বেদনার কথা এই যে, কবি যে দিব্য-স্বপ্নকে, যে অমর্ত্য-রূপকে, অলৌকিক ভাব-ভাবনাকে একদিন সার্থক রূপদান করিয়াছিলেন, তাহা ধীরে ধীরে ক্ষয় হইয়া এককালে নিঃশেষে হারাইয়া যাইবে; কিন্তু সেই স্বপ্ন, সেই রূপ, সেই সকল ভাব-ভাবনা যে কোন স্বরূপে রহিয়া যায় এ সম্পর্কে আজও কবির মনে সংশয় নাই।

"বিস্মৃত স্বর্গের কোন্
উর্বশীর ছবি
ধরণীর চিত্তপটে
বাঁধিতে চাহিয়াছিল
কবি
তোমারে বাহন রূপে
ডেকেছিল,
চিত্রশালে যত্নে রেখেছিল,
কখন সে অন্যমনে গেছে ভুলি—
আদিম আত্মীয় তব ধূলি,
অসীম বৈরাগ্য তার দিকবিহীন পথে
তুলি নিল বাণীহীন রথে।"

জীবন ও জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া এক অখণ্ড সত্য বিরাজিত। সকল প্রয়াস, সকল দুঃখভোগের ভিতর দিয়া মানুষ সেই সত্যকেই নানাভাবে লাভ করে। সমগ্র জীবন এক নিরবচ্ছিন্ন তপশ্চর্যা, মৃত্যুতে তাহারই চরম মূল্য দান।

"আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা-শোধ করে দিতে ;"

অধ্যাত্ম বিচিত্র তত্ত্ব অপরোক্ষ করা সত্ত্বেও কবির নিকট সত্তা বা রূপের রহস্য কোন কালে ঘুচে নাই। এই সম্পর্কে বিস্ময়বোধ কবির অন্তরে চিরকাল রহিয়া গিয়াছিল। সকল তত্ত্বকে অস্বীকার করিয়া কেবল অসীম বা অরূপ লাভের জন্য যে সাধনা তাহা রবীন্দ্রনাথের সাধনা ছিল না। আত্ম-তত্ত্বে এই রূপের জন্য তো কোন সান্ত্বনা নাই। তাহা তাই পূর্ণ সত্য নহে। রূপ ও অরূপ উভয়কে লইয়া পূর্ণ সত্য রূপের প্রকাশ। পূর্ণতার সাধনায় তাই উভয়ের স্বীকৃতি প্রয়োজন।

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।
*   *   *
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।"

কবি পরমের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই মন্তব্য করিয়া অনেকে কবির এই কবিতার অংশ উদ্ধৃত করিয়া আত্মমত সমর্থন করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। তাহা যে রবীন্দ্রনাথের সাধনা ও সিদ্ধির স্বরূপ আদৌ না জানিবার ফল এক্ষেত্রে কেবল তাহাই মাত্র আমরা বলিতে পারি।

মৃত্যুতে জীবনের কি পরিণাম ঘটে, তাহা লইয়া আমাদের অন্তরে জীবনের প্রথম প্রভাত হইতে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কত-না সংশয়ের জাল বোনা হইতে থাকে; কিন্তু আসন্ন-মৃত্যুর স্পর্শে এই সকল সংশয়ের জাল ছিন্ন হইয়া যায়। মৃত্যু এই ভীতির মুখোশ দিয়া জীবন ও জগতের অমৃত রূপটিকে কেবল আড়াল করিয়া রাখে মাত্র।

"ভয়ের বিচিত্র চলচ্ছবি—
মৃত্যুর নিপুণ শিল্প বিকীর্ণ আঁধারে।"

বাহিরে রূপের জগৎ প্রতি মুহূর্তে আমাদের চেতনাকে বহির্মুখী করিয়া

দিতেছে, সুখ-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তির প্রতি মনকে আকৃষ্ট করিতেছে। বাহিরের কোন কিছুর সহায়তায় পরম সত্যকে লাভ করিতে পারা যায় না বলিয়া বহির্জগৎ 'ছলনাময়ী', 'মায়া' হইয়া উঠিয়াছে। যাঁহারা প্রতি মুহূর্তের এই প্রলোভনকে জয় করিয়া উঠিয়া কেবল অন্তর্জগৎকে আশ্রয় করিতে পারেন তাঁহারাই পরিণামে পরম সত্য লাভ করিয়া যান। সুখ-সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য-প্রতিপত্তির মধ্যবর্তী হইয়া মানুষ ইঁহাদের বঞ্চিত বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ করে কিন্তু তাহারাই যে জীবনে সর্বাধিক বঞ্চনা লাভ করিয়া যায় তাহা তাহারা বোধ করিতে পারে না। তথাকথিত বঞ্চিত বিড়ম্বিত এই মানুষগুলিই অন্তরের জ্যোতিপথ ধরিয়া মৃত্যুর অন্ধকার-লোক পার হইয়া যায়। সৃষ্টি মানব-মনকে বাহিরের দিকে নিয়ত আকর্ষণ করে বলিয়া মায়া।

"তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।"

মহত্ত্বের পরীক্ষা এই ছলনা জয় করিয়া উঠিবার জন্য।

"এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত।"

কেবলমাত্র অন্তরের পথে পরম সত্যের পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। অন্তর্জগৎকে আশ্রয় করিবার মধ্যে এই সকল মানুষের অন্তরে কেমন করিয়া নিঃসংশয় বিশ্বাস গড়িয়া উঠে। এই 'সহজ বিশ্বাস'ই ভক্তি।

"সে যে তার অন্তরের পথ
সে যে চির স্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে সমুজ্জ্বল।"

বহির্জগতের ঐশ্বর্য-বঞ্চনায়, খ্যাতি-প্রতিপত্তিহীনতায় লোকে তাঁহাদের জীবনকে বিড়ম্বিত বলিয়া বোধ করে, কিন্তু পরম সম্পদকে তাঁহারাই কেবল লাভ করিতে পারেন।

"লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত
সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।"

নির্ঘণ্ট